রবীন্দ্রজীবনী

প্রথম খণ্ড

১২৬৮-১৩০৮ ॥ ১৮৬১-১৯০১

রবীন্দ্রজীবনী

ও

রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

"বর্ত্ম কর্ষতি পুরঃ পরমেক
স্তদ্‌গতানুগতিকো ন মহার্ঘ্যঃ।"

একজনই আগে পথ কেটে দেন। পরে সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করার লোক দুর্লভ হয় না।

যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ,
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ,
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥
যে-কেহ মোরে বেসেছ ভালো
জ্বেলেছ ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি
পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥

উৎসর্গ

ভাই   স্নু ও বোন কাতুর স্মরণে

ছোট দা'

বর্তমান সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

বহু নূতন তথ্য সংবলিত হইয়া রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড পরিমার্জিত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। পূর্ববর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ সালে, অর্থাৎ ১৪ বৎসর পূর্বে। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কৃত ও বহু তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত উপাদান ব্যবহার করিতে পারিয়াছি বলিয়া দাবি করিতে পারি না। তবে এই সংস্করণে বহু তথ্য সংযোজিত ও পরিচ্ছেদের স্থানান্তরণ ও বিষয়বস্তুর অদলবদল হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎস-সন্ধানী পাঠকেরা গ্রন্থখানি দেখিলেই বুঝিবেন। ইহার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য এইবারকার নির্দেশিকা বিস্তারিত করা হইয়াছে।

এই সংস্করণ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বের সংস্করণ শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীসুধীরচন্দ্র করের সহায়তায় মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীসুশীল রায় ও শ্রীপার্থ বসু। তজ্জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। মুদ্রণব্যাপারে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহযোগিতা লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছি।

বোলপুর-শান্তিনিকেতন
১ পৌষ ১৩৬১

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রজীবনী মুদ্রিত হইতেছে শুনিয়া একদিন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বইখানি বুঝি ফিরে ছাপছেন?' তাঁহাকে আমি উত্তরে বলি, 'রবীন্দ্রজীবনী' ও 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়' এই দুইটি কথা ছাড়া পুরাতন গ্রন্থের কিছুই বোধ হয় ছাপা হইতেছে না, কারণ বইখানি পনেরো আনাই নূতন করিয়া লেখা। তা ছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানি আকারেও প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে যখন রবীন্দ্রজীবনী লিখিতে আরম্ভ করি তখন কবি সম্বন্ধে কিই-বা তথ্য জানা ছিল। সেই সামান্য উপকরণ অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রজীবনী-রচনায় প্রবৃত্ত হই। তার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাহিত্যিক সাংবাদিক ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষীয়েরা কবির জীবনী সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য ও উপকরণ লোকচক্ষুর গোচর করিয়াছেন। এই সকল উপাদানের মধ্যে প্রধান তাঁহার পত্রাবলী। কবির জীবিতকালে যে-সব পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই কবিকর্তৃক সম্পাদিত ও সংশোধিত; যে-সব পত্রের সাহিত্যিক মূল্য নাই অথচ তথ্যের বিচারে চরিতকারের নিকট মূল্যবান, সেগুলিকে কবি অনেক সময়েই নির্মমভাবে বর্জন করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কবির 'চিঠিপত্র' ধারাবাহিকভাবে মুদ্রণ শুরু করায় কবিজীবনের বহু তথ্য এখন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এতদ্-ব্যতীত নানা সাময়িক পত্রিকায় অসংখ্য পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক দিক হইতে জীবনীকারের নিকট সেগুলি অমূল্য।

পত্রাদি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ হয়। কারণ, তিনিই খুল্লতাতের বহু পত্র সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কবিযশ তখনো মধ্যাহ্নগগনে আরোহণ করে নাই; তিনি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার তুচ্ছ ছিন্নপত্রগুলি এককালে সাহিত্যের ডালা পূর্ণ করিবে। তাঁহারই সঞ্চিত পত্ররাজি 'ছিন্নপত্র' নামে মুদ্রিত হয়, পরবর্তী কালে বিশ্বভারতী পত্রিকায় আরও অনেকগুলি বাহির হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অচলিত রচনা সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সর্বপ্রথম বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; তজ্জন্য তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রের নিকট ধন্যবাদার্হ। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু গবেষণা করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রবন্ধাদি কবিজীবনের প্রত্যুষান্ধকারে প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছে। এই সূত্রে অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির বাল্যজীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য আমরা অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র -কর্তৃক সম্পাদিত বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'জীবনস্মৃতি' হইতে পাইয়াছি। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ হইতে যে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত হইতেছে, তাহার সংযোজন-অংশ এবং গ্রন্থপরিচয়-অংশ বহু তথ্যসমন্বিত হওয়ায় জীবনীকারের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কোন্ গ্রন্থ কখন লিখিত তাহা জীবনীকারের পক্ষে জানা একান্ত প্রয়োজন; তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী-উৎসবের প্রাক্‌কালে আমি এক 'গ্রন্থপঞ্জী' প্রস্তুত করি। উহাই এ ধরণের প্রথম প্রয়াস। তাহার প্রায় এগারো বৎসর পরে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রগ্রন্থের বিশুদ্ধ সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন; ব্রজেন্দ্রবাবুর সত্যনিষ্ঠা সর্বজনবিদিত; তাঁহার 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' আমাদের বিশেষ কাজে লাগিয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন -কালে নানা ভাবে বহু লোকের সহায়তা লাভ করিয়াছি। অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী

সেন ও শ্রীকানাই সামন্তের নাম সর্বাগ্রে করা কর্তব্য। যে-সব বন্ধু নানা সমালোচনার দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সরকার, অধ্যাপক বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুখময় চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক বিনয়গোপাল রায়, অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ, শ্রীক্ষিতীশ রায় ও শ্রীঅমিয়কুমার সেনকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি। তবে যাঁহার সহায়তার কথা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ও বিশেষভাবে বলা উচিত তিনি হইতেছেন শ্রীসুধীরচন্দ্র কর; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কর্মীরূপে তিনি আমার গ্রন্থখানির কেবলমাত্র প্রুফ সংশোধন করেন নাই, স্বভাবসাহিত্যিকের দৃষ্টিতে তিনি রচনার দোষগুণ বিচার করিয়া আমাকে সর্বদা যথাবিধ পরামর্শ দান করিয়াছেন; তাঁহার নিঃস্বার্থ সহযোগিতা না পাইলে এই গ্রন্থে ভুলত্রুটি আরও থাকিত।

গতবার এই গ্রন্থের আমিই ছিলাম প্রকাশক, অবশ্য বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের আনুকুল্যেই উহা মুদ্রিত হয়; তখন বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের মত ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁহার সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ তাঁহারা প্রকাশ করিবেন না। যাহা হউক, বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সহকারী সচীব স্বর্গীয় কিশোরীমোহন সাঁতরার চেষ্টায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এইবার বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এই রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু বিশ্বভারতী ইহার প্রকাশভার গ্রহণ করিলেও এই গ্রন্থে যে-সব মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা আমার ব্যক্তিগত মত, তাহার জন্য একমাত্র আমিই দায়ী।

এই জীবনচরিতের বহু তথ্য রবীন্দ্রভবন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; তবে এই ধন্যবাদ নিষ্প্রয়োজন, কারণ রথীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম উৎসাহ ব্যতীত কখনই আমি এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রসর হইতে পারিতাম না। ইহার প্রকাশনে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহানুভূতি না পাইলেও ইহা প্রকাশিত হইত না।

শান্তিনিকেতন প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের ধৈর্যের পরীক্ষা হইয়াছে আমার প্রুফ লইয়া; তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ইহা যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারিল। প্রেসের প্রধান কম্পোজিটর শ্রীবলরাম সাহা ও প্রধান প্রেসম্যান শ্রীসীতানাথ দের নাম এইখানে না করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে। শ্রীভূষণচন্দ্র মাইতি প্রুফের কার্য যেভাবে দেখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকেও অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুপ্রিয় ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিশ্বপ্রিয়, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান শোভনকুমার মুখোপাধ্যায় এবং লাইব্রেরির সহকারী কর্মী শ্রীমান দ্বিজপদ হাজরা ও শ্রীমান কৃষ্ণগোপাল হাজরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহারা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। এই গ্রন্থের বিস্তৃত সূচী প্রণয়নে শ্রীযুক্তা নলিনী ঘোষ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে এইখানে স্মরণ করিতেছি।

প্রথম সংস্করণ রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড মদীয় অগ্রজ রেঙ্গুন বেঙ্গল অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর বিশাল গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষতা করিবার সৌভাগ্য লাভ করায় আমি রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকাদি যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহারই নিকট ঋণী, যিনি আমাকে আমার বালক-বয়সে এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে আশ্রয় দান করেন ও কালে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসাইয়া যান; আজ তাঁহার উদ্দেশ্যে এ পুস্তক আমার সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র।

গ্রন্থভবন, বিশ্বভারতী
২৫ বৈশাখ ১৩৫৩

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন; তাঁহার লেখনী এখনো অজস্রধারে বাঙলা-সাহিত্যকে গীতে গল্পে নাট্যে প্রহসনে প্রবন্ধে সমৃদ্ধ করিতেছে; দেশের গুরুতর সমস্যার সময়ে তাঁহার বাণী জনগণের চিত্তকে কল্যাণময় সত্যের পথে চালাইতেছে।

জীবিত কোনো স্রষ্টার জীবনী লেখাই কঠিন, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষী ও কবির জীবনী কোনো কালে যথাযথ লেখা অসম্ভব। বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার জীবনবীণা ঝঙ্কৃত। তাঁহার প্রতিভা নিত্য নবধারায় আপনাকে বহুধা প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করিলে সপ্তবর্ণ পাওয়া যায়; রবীন্দ্রসাহিত্যও সেই বিপুল বর্ণচ্ছটায় বিশেষ মনের আতসকাঁচে বিশ্লিষ্ট বর্ণে ধরা দেয়। আমাদের কাহারো কাছে তিনি হয়তো কেবলমাত্র কবি বা নাট্যকার বা রাজনৈতিক; কেহ বা তাঁহাকে শিক্ষক, ধর্মগুরু, বৈয়াকরণ, সংগীতকার বা নৃত্যকলাবিদ্ এই রকম কোনো বিশেষ একটি পরিচয়ে নির্দিষ্ট করিয়া জানিতে চাই। তাঁহার প্রতিভায় এই সকল রূপেরই সমন্বয়, সব মিলাইয়াই তাঁহার স্বভাবের অখণ্ড সত্তা। বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টায় বিপদ আছে— তাঁহার নানান্ কর্ম এবং সৃষ্টির গভীর ঐক্যসূত্র ধরা না পড়িলে তাঁহার প্রতিভাকে স্ববিরোধী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমনতরো ভুল করিবার সম্ভাবনা বেশি, কেননা তিনি কোনো কিছুকেই বাদ দিতে চান নাই— জীবনের সকল বৃত্তি, সকল শক্তিকেই তিনি স্বীকার করিয়া স্বভাবের সম্পূর্ণতার মধ্যে স্থান দিয়াছেন।

জ্ঞান ও ভাব, রূপ ও রস, সৌন্দর্যের বিচিত্র নিবিড় অনুভূতি, জগৎকে ও জীবনকে নানা কল্পনায় ও চেতনায় শাশ্বতের পটে সত্য করিয়া জানিবার ও জানাইবার প্রয়াসই তাঁহার জীবনের মূলগত সাধনা। এই সাধনার মধ্য দিয়াই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ণরূপ তাঁহার অধ্যাত্মজীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছে; অন্তরে বাহিরে, ধ্যানে কামনায় কর্মকে সত্যের বিপুল মহিমা দান করিয়াছে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ কবি ও কর্মী, ধ্যানী এবং শিল্পস্রষ্টা, আত্মসমাহিত সাধক এবং বিচক্ষণ সমাজসংস্কারক।

সংসারের কোনো দায়িত্বকেই রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নাই; বিষয়কর্মের কোনো দাবিকেই এড়াইতে চান নাই, কঠিন কর্তব্যবোধের তাগিদে বারংবার তিনি দেশের ও দশের জন্য নানা দুরূহ প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জমিদারি ও বিদ্যালয় পরিচালনা, সাহিত্যসেবা, মাসিকপত্র-সম্পাদনা ও সংসার এবং আশ্রমের বিবিধ কর্মসাধন— কোনো কিছুকেই তিনি বাদ দেন নাই। ক্ষুদ্র শিক্ষায়তন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ব্যাপক কর্মপ্রবর্তনার মধ্যেও তাঁহার স্বভাবে সত্যের অনিবার্য বিকাশ দেখিতে পাই; যাঁহারা বাস্তব বিলাসের নেশায় জীবনের সমগ্র রূপ দেখিতে চান না, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জীবনের, তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির এই বিপুল সাধনার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত এবং কাব্যগত জীবনের এই বৃহৎ সম্মিলিত রূপ সংহত করিয়া দেখানোই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী বাংলায় এভাবে লিখিবার চেষ্টা পূর্বে হয় নাই; ইহার মধ্যে দোষক্রটি অনেক আছে, সে বিষয়ে গ্রন্থকার খুবই সচেতন। কিন্তু সাধ্যমত প্রয়াসের নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে। সহৃদয় পাঠক এই পুস্তকের ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের মন্তব্য আমাকে লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। সত্য প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদের কাম্য, এখানে ব্যক্তিগত মান-অভিমানের স্থান নাই।

গ্রন্থের প্রারম্ভে ঠাকুরপরিবারের ইতিহাস দীর্ঘই হইয়া পড়িয়াছে; অনেকেরই অজ্ঞানা থাকায় এ বিষয় বিশদভাবে তথ্যসংগ্রহ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই, রবীন্দ্রনাথের জীবনীর সহিত সে অংশের হয়তো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অল্প।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেকের কাছ হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছি, তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাইয়াছি শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট হইতে; তাঁহার ঋণ ভূমিকায় নামোল্লেখ দ্বারা নিঃশেষিত হইবে না। মৎকৃত 'রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী'র শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সমালোচনা ও 'প্রবাসী'তে তাঁহার 'রবীন্দ্র-পরিচয়' সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি আমার বিশেষ কাজে লাগিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পুস্তকগুলি দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন শ্রীপৃথ্বীসিং নাহার। সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য পুত্র বিশ্বভারতীর কর্মসচিব কর্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সহকারী কর্মসচিব শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা মহাশয়দ্বয়ের নিকট বিশেষ ঋণী।

এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত অনেক তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু গ্রন্থের কোনো অংশ লিখিবার সময় বা মুদ্রণকালে আমি তাঁহাকে দেখাই নাই। এ গ্রন্থের মধ্যে যে-সব মতামত আছে, তাহার জন্য আমি একমাত্র দায়ী। তিনি ছাড়া তাঁহার পরিবারের কাহারও কাহারও কাছ হইতে কিছু কিছু তথ্য পাইয়াছি, তাহার জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ দিতেছি।

এই খণ্ডে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর আলোচনা করিয়াছি। গীতাঞ্জলি ইংরেজি অনুবাদ বিলাতে প্রকাশের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বাঙালীর কবি থাকিলেন না; তিনি বিশ্বের কবিরূপে দেশে-বিদেশে গৃহীত হইলেন। আমরা সেই অংশ অর্থাৎ তাঁহার বিশ্বখ্যাতির ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিব।

গ্রন্থভবন, শান্তিনিকেতন
৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

রবীন্দ্রজীবনী

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।

যে-আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে-আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতিনিমেষের তরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

সূচনা

বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে বাংলার কোনো তরুণ সাহিত্যিক ঐ গ্রন্থ ক্রয় করিবেন কি না তৎসম্বন্ধে আর কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং কবিরই রায় সংগ্রহ করিতে তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হন। প্রশ্ন শুনিয়া কবি নাকি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের জীবনী নহে, উহা দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী। নবীন লেখকটিকে কবি কি ভাব হইতে ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। তবে গ্রন্থ-মধ্যে ঠাকুর-পরিবারের বিস্তৃত আলোচনাংশ পাঠ করিয়া কবি জীবনী-লেখককে ঐ অংশ পরিশিষ্টে সংযোজিত করিবার নির্দেশ দেন। আমাদের অনুমান, কবি মনে করিতেন যে, পূর্বপুরুষদের সহিত তাঁহার ব্যবধানটা কেবল কালের দূরত্বের দিক দিয়া নহে, গুণের গুরুত্বের দিক হইতেও দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু বস্তুবিচারী ঐতিহাসিকদের নিকট কবির বহুমুখী প্রতিভার অভিব্যক্তির জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের দোষ ও গুণ সমভাবে দায়ী। প্রতিভার সহিত প্রাকৃতের পার্থক্য যতই গভীর বলিয়া প্রতিভাত হউক গঙ্গোত্রীর সহিত গঙ্গাসাগরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্যভাবেই যুক্ত। সেইজন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণের কাহিনী-পর্বটি অবান্তর জ্ঞানে পরিত্যাগ বা পরিশিষ্টে সংযোজন করিতে পারিলাম না, গঙ্গোত্রী হইতেই আমরা যাত্রা শুরু করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ঠাকুর-পরিবারের সহিত গত এক শত বৎসরের বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস এমনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার যথার্থ উৎস আবিষ্কার করিতে হইলে সেই বংশের উৎপত্তি ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বাংলার ব্রাহ্মণসমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত এই বংশ এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও শক্তি অর্জন করিয়াছিল, যাহার বলে তাহা এককালে বাংলার বিচিত্র সামাজিক জীবনের শীর্ষস্থানে নিজ অক্ষুণ্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং এই পরিবারের ইতিহাস আলোচনা নিরর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বংশপরিচয়

ইতিহাসের আরম্ভ কোথায় এ কথার জবাব দেওয়া যায় না; তবুও মানুষ লৌকিক ব্যবহারের জন্য একটা সীমানা টানিয়া লয়। সেই সূত্র অনুসারে বাংলাদেশের কিংবদন্তিমূলক যে সামাজিক ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে তাহাকে অনুবর্তন করিতে হয়; অর্থাৎ বঙ্গদেশে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন-কথা হইতেই এই অনুসন্ধানটি আরম্ভ করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা কোনো অভিমত প্রকাশ করিব না, কেবল কিংবদন্তি আশ্রয় করিয়া এই বংশের যে ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

কিংবদন্তিমূলক ইতিহাস অনুসারে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম-একাদশ শতকের মধ্যে কোনো সময়ে, আদিশূরের রাজত্বকালে পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিচিত্র মতবাদ -প্লাবিত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে এই পঞ্চবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আগমন। এই পঞ্চ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের নাম শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধি, সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি, ও কাশ্যপ গোত্রীয় বীতরাগ। ইঁহারা

নামে মাত্র এ দেশে আসেন, বস্তুত সাক্ষাৎসম্বন্ধে যজ্ঞাদি করেন নাই ; ইঁহাদের পঞ্চপুত্র ভট্টনারায়ণ ছান্দড় বেদগর্ভ শ্রীহর্ষ ও দক্ষ হইতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণকুলের তথাকথিত উদ্ভব।

কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগের চারি পুত্র রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গে বাস করিয়া 'রাঢ়ীয়' বলিয়া বিদিত। দক্ষের চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে ধীর নামক এক ব্যক্তি আদিশূর-পুত্র ভূশূরের নিকট বাসার্থ গুড় নামক গ্রাম প্রাপ্ত হন। বর্তমানে এই গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। গুড়-গ্রামের অধিবাসী বলিয়া ধীর 'ধীরগুড়ি' বা 'ধীরগুড়' নামে পরিচিত হন। ইঁহার সপ্তম অধস্তন পুরুষ রঘুপতি আচার্য পরিণত বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'দণ্ডী' হন ; জনশ্রুতি, কাশীবাস-কালে দণ্ডীসমাজ ইঁহাকে কনকদণ্ড উপহার প্রদান করে। কেহ কেহ বলেন 'কনকদাঁড়' গ্রামে গিয়া বাস করেন বলিয়া উত্তর-কালে রঘুপতির বংশধরেরা 'কনকদণ্ডী গুড়' নামে পরিচিত হন। এই কনকদণ্ডী গুড়ের একটি শাখা যবন সম্পর্কে পীরালি দোষে দুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণসমাজে পতিত হন।

রঘুপতি আচার্যের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ জয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী বোধ হয় 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই জয়কৃষ্ণের দুই পুত্র— নাগর ও দক্ষিণানাথ। দক্ষিণানাথের চারি পুত্র— কামদেব জয়দেব রতিদেব ও শুকদেব। মুসলমান সম্পর্কে কামদেবাদি প্রথম যবনদুষ্ট হইয়া পীরালি হন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ তুর্কী-মুসলিম দ্বারা বিজিত হইয়াছিল এবং দক্ষিণানাথ রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 'রায়চৌধুরী' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। কামদেবাদি চারি ভ্রাতা বর্তমান যশোহর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগনার জমিদার ছিলেন। তুর্কী-বিজয়ের পর সকল হিন্দুই যে মুসলমানদের 'যবন' আখ্যা দিয়া দূরে রাখিয়াছিলেন তাহা নহে। বিজেতাকে অনুকরণ, তাহার অনুগ্রহভাজন হইয়া অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের লোভ চিরকাল একই ভাবে দেখা দিয়া আসিয়াছে। তুর্কী-বিজয়ের ফলে হিন্দুদের মধ্যে কেহ ধর্মের আকর্ষণে, কেহ তুর্কী-রমণী লাভের মোহে, কেহ বা ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, কেহ বা উৎপীড়নের দায় হইতে মুক্তিলাভের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এইরূপে যবনদোষে দুষ্ট হইয়া নানা পরিবার হিন্দুসমাজ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সেরখানী পীরালি শ্রীমন্তখানী প্রভৃতি থাকের উদ্ভব এইভাবেই হয়।[১]

বাংলাদেশে মেল-উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচিত্র কাহিনী কুলাচার্যগণ সৃষ্টি করিয়াছেন ; তবে আচার্যগণের সততা ও কাহিনী-সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের বহু কারণ আছে। নানা অজ্ঞাত কারণে কুলাচার্যগণ যবনদুষ্ট পরিবারসমূহের কাহাকেও মর্যাদা দান করিয়া সমাজে চালাইয়া দিয়াছিলেন, কাহাকেও বা পতিত করিয়া সমাজে অচল করিয়া রাখিয়াছিলেন। যেসব পরিবার কুলাচার্যগণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সমাজে 'পতিত' থাকিয়া গেল, তাহাদেরই অন্যতম হইতেছে 'পীরালি' ব্রাহ্মণগণ। পীরালি ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কুলাচার্যগণ কর্তৃক সৃষ্ট যে-কিংবদন্তি চলিত আছে, তাহাই আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

দক্ষিণ-বাংলার জলাজমিতে উপনিবেশের চেষ্টা শুরু হয় তুর্কী-রাজত্বকালে। খান জাহান আলি নামক এক ব্যক্তি বাংলার দক্ষিণে ব-দ্বীপের সুঁদরি বনে (বর্তমান খুলনার সুন্দরবনে) উপনিবেশ স্থাপন করিবার সনন্দ লইয়া যশোহরে উপস্থিত হন ও চেঙ্গুটিয়া পরগনার কর্তৃত্ব লাভ করেন। খান জাহানের সহিত তাহের নামে এক ব্যক্তি আসেন ; এই ব্যক্তি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এক মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার নিবাস ছিল নবদ্বীপের নিকটস্থ পিরলিয়া বা পিরল্যা গ্রাম। ইসলাম ধর্মে গোঁড়ামি দেখিয়া অথবা পিরলিয়া গ্রামে বাস থাকায় লোকে তাঁহাকে পিরল্যা খাঁ বলিয়া ডাকিত। তাহের কর্মপটু লোক ছিলেন বলিয়া খান জাহান তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়া যশোহরে আনেন।

পূর্বোল্লিখিত দক্ষিণানাথের দুই পুত্র কামদেব ও জয়দেব তাহের-এর প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন।

১ উনবিংশ শতকে ইংরেজ আমলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও য়ুরোপীয়তা, ইংরেজী ভাষা ও সভ্যতা এ দেশের মধ্যে সেই একই কারণে প্রবেশ লাভ করে।

কথিত আছে, একদিন রোজার সময় তাহের বা পীরআলি একটি নেবুর ঘ্রাণ লইতেছিলেন। এমন সময়ে কামদেব ঠাট্টার সুরে বলেন, "আমাদের শাস্ত্রানুসারে ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয়। সুতরাং রোজা নষ্ট হইল।" তাহের মুসলমান হইলেও ব্রাহ্মণসন্তান; তিনি কামদেবের বিদ্রূপ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না। তৎপর একদিন এক জলসায় ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিকেই নিমন্ত্রণ করিলেন; এমন সময়ে মজলিসের চারি দিকে মুসলমানী খানার সুগন্ধ বহিল; হিন্দুর পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠিন। অনেকেই নাকে কাপড় দিয়া চলিয়া গেলেন; ধূর্ত পীরআলি কামদেব ও জয়দেবকে ধরিয়া কহিলেন যে, "ঘ্রাণে যখন অর্ধেক ভোজন হয়, তখন নিশ্চয়ই গোমাংসের ঘ্রাণ পাইয়া তোমাদের জাতি গিয়াছে।" ভ্রাতৃদ্বয় পলাইবার চেষ্টা করিলে পীরআলির লোকেরা তাঁহাদিগকে জোর করিয়া নিষিদ্ধ মাংস মুখে ভরিয়া দিল। এইভাবে তাঁহারা উভয়ে জাতি হারাইলেন। তৎপরে কামদেব কামাল খাঁ ও জয়দেব জামাল খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। পীরআলি তাঁহার প্রভু খান জাহান সাহেবকে অনুরোধ করিয়া উভয়কে সিংগির জায়গীর পাওয়াইয়া দিলেন। পীরআলির মজলিসে কামদেবের অন্যান্য আত্মীয়গণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের শত্রুপক্ষ তাঁহাদিগের 'পীরালি' অপবাদ রটাইলেন, এমনকি অনেককে সমাজচ্যুত করিলেন। অর্থের মহিমায় ও ঘটকের কৃপায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 'জাতে' উঠিলেন, কেবল যাহাদের অবস্থা মন্দ বা ধন থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা ঘটকের মর্যাদা দান করিতে নারাজ ছিলেন, তাঁহারাই কেবল 'পীরালি' বলিয়া সমাজে অচল রহিলেন।

কামদেবের অপর দুই ভ্রাতা রতিদেব ও শুকদেব রায়চৌধুরী দক্ষিণডিহির বাটীতে থাকিতেন; সমাজের অত্যাচারে রতিদেব ক্ষুণ্ণ মনে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শুকদেবকে ভগ্নীর ও কন্যার বিবাহ লইয়া খুবই কষ্টভোগ করিতে হইল এবং বহু ছলচাতুরী ও অর্থব্যয় করিয়া ফুলিয়ার এক মুখুটির সহিত ভগ্নীর বিবাহ দিতে সমর্থ হইলেন। শুকদেবের কন্যারও বিবাহ হইল একজন শ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয়ের সহিত; জামাতার নাম জগন্নাথ কুশারী, পিঠাভোগের জমিদার। পতিত ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ করার অপরাধে জগন্নাথকে তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা 'পতিত' করিলেন এবং সেইজন্য তিনি পিঠাভোগ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণডিহিতে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আসিলেন। শুকদেব জামাতাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন; খুলনা জেলার বর্তমান বারোপাড়া নরেন্দ্রপুর গ্রামের উত্তরে উত্তরপাড়া নামে গ্রামখানি তাঁহাকে দান করেন। এইরূপে শুকদেবের ভগ্নী ও কন্যার বিবাহের ফলে 'পীরালি' শাখা পল্লবিত হইল।

জগন্নাথ কুশারীই ঠাকুরগোষ্ঠীর আদিপুরুষ; বিবাহের দ্বারা তিনি পীরালি-সমাজ ভুক্ত হইলেন। কুশারীরা ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীর বংশজাত; দীন মহারাজ ক্ষিতিশূরের নিকট 'কুশ' নামক গ্রাম (বর্ধমান জিলা) পাইয়া গ্রামীণ হন এবং কুশারী নামে খ্যাত হন। দীন কুশারীর অষ্টম কি দশম পুরুষ পরে জগন্নাথ। জগন্নাথের দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম হইতে ঠাকুরবংশের ধারা চলিতেছে; অপর তিন পুত্রের ধারা লুপ্ত বা প্রায়লুপ্ত। পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র রামানন্দের দুই পুত্র মহেশ্বর ও শুকদেব হইতে ঠাকুরগোষ্ঠীর কলিকাতা-বাস আরম্ভ।

কথিত আছে, জ্ঞাতিকলহে বিরক্ত হইয়া মহেশ্বর ও শুকদেব নিজ গ্রাম বারোপাড়া হইতে কলিকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। সে-সময়ে কলিকাতা ও সুতানুটিতে শেঠ বসাক ও দত্তচৌধুরীরা বিখ্যাত বণিক। ইংরেজরাও প্রায় এই সময়ে কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় পান। মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন ও তদীয় খুল্লতাত শুকদেব আসিয়া আদিগঙ্গার তীরে বাস স্থাপন করেন। তাঁহারা যে স্থানে বাস করিতেন সেই স্থানে মৎস্যব্যবসায়ী জেলে মালো ও কৈবর্তদের সংখ্যা ছিল অধিক; এ ছাড়া কতকগুলি পুণ্ড্র বণিক বাস করিত; ইহারা নবাগত ব্রাহ্মণদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এতগুলি তথাকথিত জল-অনাচরণীয় শূদ্রের মধ্যে পঞ্চাননরাই একঘর ব্রাহ্মণ; ক্রমে পঞ্চানন কুশারীর নাম ও উপাধি ডুবিয়া গেল, সকলেই তাঁহাকে 'ঠাকুর মশাই' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল।

শেষকালে লোকে তাঁহার কথা বলিবার সময়ে পঞ্চানন ঠাকুর নামেই উল্লেখ করিত। এই সময়ে আদিগঙ্গার মুখে বিলাতী জাহাজ আসিত; পঞ্চানন এইসব জাহাজে রসদপত্র সরবরাহ করিতেন, ক্রমে তিনি জাহাজের লোকদের নিকটও 'ঠাকুর' আখ্যাতেই পরিচিত হইলেন। তাহাদের কাগজপত্রে 'ঠাকুর' (Tagoure বা Tagore) নামই চলিল। এইভাবে এই বংশের উপাধি প্রবর্তিত হইয়াছিল।

পঞ্চানন ঠাকুরের জয়রাম ও রামসন্তোষ নামে দুই পুত্র ও শুকদেবের কৃষ্ণচন্দ্র নামে এক পুত্র হয়। তিন জনেই ইংরেজ বণিকদের নিকট হইতে কিছু ইংরেজি শিক্ষা করেন; তাহা ব্যতীত পারসি ভাষা তো তখনকার দিনে ভদ্রলোক মাত্রকেই জানিতে হইত। ১৭০৭ অব্দে কলিকাতার জরিপকার্য আরম্ভ হইলে জয়রাম ও রামসন্তোষ আমিন-পদে নিযুক্ত হন। সেইজন্য খুলনায় ইঁহাদের পৈতৃক ভিটা আমিনের ভিটা নামে খ্যাত। ইঁহারা কোম্পানির কাজ করিয়া বিলক্ষণ ধন উপার্জন করিয়া ধনসায়রে (বর্তমান ধর্মতলা ও গড়ের মাঠ) বাড়ি, জমিজমা ও যেখানে বর্তমানে ফোর্ট উইলিয়াম আছে, সেইখানে গঙ্গাতীরে বাগানবাটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ অব্দে জয়রামের মৃত্যু হয়। জয়রামের মৃত্যুকালে তাঁহার দুই স্ত্রী ও তিন পুত্র (নীলমণি দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম) দুই পৌত্র (জ্যেষ্ঠ মৃত পুত্র আনন্দীরামের পুত্র) ও এক কন্যা বিদ্যমান ছিলেন।

পলাশীযুদ্ধের (১৭৫৭) পর মীরজাফর আলি বাংলার নবাব হইয়া সিরাজউদ্দৌলা-কৃত কলিকাতা ধ্বংসের জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেন, তাহা হইতে কিছু টাকা জয়রামের বংশধরগণ ধনসায়রের সম্পত্তির খেসারত বাবদ পাইয়াছিলেন। এই সময়ে গড়ের মাঠ বাড়াইবার জন্য কোম্পানি ধনসায়রের বাড়ি ও বাগান প্রভৃতি প্রচুর অর্থ দিয়া কিনিয়া লন। তখন জয়রামের জ্যেষ্ঠপুত্র নীলমণি কলিকাতা গ্রামে আসিয়া পাথুরেঘাটায় বাস করেন (১৭৬৪)। ইহাই কলিকাতা গ্রামে ঠাকুরগোষ্ঠীর বাসের সূত্রপাত। নীলমণি পরে অনেক জমি কিনিয়া গৃহাদি নির্মাণ করেন। এই বাটীতে তিন ভাই ও তাঁহার পোষ্যরা বাস করিতেন।

কোম্পানি দেওয়ানি পাইয়া (১৭৬৫) রাজস্ব আদায়ের নূতন ব্যবস্থা করিলে নীলমণি ঠাকুর উড়িষ্যায় কলেক্টারের সেরেস্তাদার হইয়া গমন করিলেন। নীলমণি তাঁহার উপার্জিত ধন কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন, দর্পনারায়ণ অভিভাবক-রূপে দেখাশুনা করিতেন। কিন্তু দর্পনারায়ণও নানারূপ ব্যাবসা করিয়া ধনাগমে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

অর্থ অনর্থের মূল; অর্থ লইয়া দুই ভ্রাতার মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিল। পরে উভয়ে আপসে বিবাদ মিটাইয়া লইলেন। নীলমণি নগদ এক লক্ষ টাকা লইয়া পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি ও দেবত্র-সম্পত্তি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন; পিতা জয়রাম ঠাকুর নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে রাধাকান্ত জীউ-এর সেবার জন্য যে নিষ্কর জমি পাইয়া ছিলেন, তাহাও দর্পনারায়ণকে দিয়া দিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের সূত্রপাত হইল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার

জয়রাম ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র নীলমণি ঠাকুর হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের উদ্ভব। নীলমণি জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের নিকট হইতে বর্তমান জোড়াসাঁকোর বাড়ির এক বিঘা জমি দেবত্র প্রাপ্ত হন। ১৭৮৪ অব্দের জুন মাসে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরগোষ্ঠীর বাসের সূত্রপাত। তখন এই পল্লীর নাম জোড়াসাঁকো ছিল না; মেছুয়াবাজার পল্লীর নিকটবর্তী বলিয়া এ স্থানটিও ঐ নামে অভিহিত হইত।

নীলমণির তিন পুত্র ও এক কন্যা— রামলোচন (১৭৫৪), রামমণি (১৭৫৯), রামবল্লভ (১৭৬৭) ও কমলমণি

(১৭৭৩)। সুতরাং জোড়াসাঁকোর বাস যখন আরম্ভ হয় তখন (১৭৮৪) নীলমণির সকল পুত্রই বয়স্ক। নীলমণি তাঁহার পুত্রকন্যাগণের বিবাহ পীরালি সমাজে দেন নাই; তাঁহার সদাচারখ্যাতি ও ততোধিক অর্থখ্যাতি নিষ্ঠাবান হিন্দুপরিবার হইতে পুত্রবধূ ও জামাতা লাভের সহায়তা করিয়াছিল।

নীলমণির মৃত্যুর (১৭৯১) পর পরিবারের অভিভাবক হইলেন রামলোচন। তাঁহার চেষ্টায় পরিবারের বিষয়সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়। রামলোচনের কোনো পুত্র ছিল না, তাই তিনি ভ্রাতা রামমণির পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। রামমণির দুই বিবাহ; মেনকা দেবীর গর্ভে রাধানাথ জাহ্নবীদেবী রাসবিলাসী ও দ্বারকানাথের, এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে রমানাথ ও সরস্বতী দেবীর জন্ম হয়।

রামলোচন ঠাকুর ছিলেন তৎকালীন আদর্শে বিশিষ্ট বা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। বেশভূষার পারিপাট্য, সান্ধ্যভ্রমণ, সংগীতাদির প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি তৎকালীন আভিজাত্যের লক্ষণ তাঁহার জীবনে দেখা যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর : ১৭৯৪-১৮৪৬

১৮০৭ অব্দে রামলোচনের যখন মৃত্যু হয় তখন দ্বারকানাথের বয়স বারো-তেরো বৎসর। এই সময়ে তাঁহার জনক রামমণি ও পিতৃব্য রামবল্লভ উভয়ে জীবিত, তথাপি বৈষয়িক ব্যাপারের তদারকের ভার অর্পিত হইল জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধানাথের উপর। রাধানাথ ইংরেজী শিক্ষায় একজন কৃতবিদ্য লোক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বিষয়াদির ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। রামলোচনের বিধবা স্ত্রী অলকা দেবী বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে যে-পিতামহীর মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে তিনি হইতেছেন এই অলকা দেবী— দ্বারকানাথের মাতা। অলকা দেবীর মৃত্যু হয় ১৮৩৮ সালে (১২৪৪ ফাল্গুন)।[১]

দ্বারকানাথ বাল্যকালে পারসী ও ইংরেজী ভাষা ভালোভাবেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরেজী ভালোরূপে দুরস্ত হওয়ায় বৈষয়িক জীবনের উন্নতিতে উহা তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এই সময়ে কলিকাতায় ম্যাকিন্‌টস কোম্পানী সদাগরী কাজের জন্য খুবই খ্যাত; এই কোম্পানির কর্মচারীগণের ঘনিষ্ঠতায় আসিয়া দ্বারকানাথ যে-ব্যবসায়বুদ্ধি লাভ করেন তাহার ফলে তিনি যৌবনের আরম্ভেই ব্যাবসা করিতে শুরু করেন। প্রথম প্রথম তিনি ম্যাকিন্‌টসদের গোমস্তারূপে রেশম ও নীল ক্রয়ে সাহায্য করিতেন; কিন্তু কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি স্বয়ং বিলাতী অর্ডার সরবরাহ শুরু করিলেন। এই ব্যবসায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমিদারির কার্যও বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে আয়ত্ত করেন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ায় জমিদারের স্বত্ব অধিকার রাজস্ব প্রভৃতি ব্যাপারে বিচিত্র ও জটিল সমস্যা সমূহ দেখা দিয়াছিল। দ্বারকানাথ রাজস্ব ও স্বত্ব বিষয়ক সমস্যাগুলিকে উত্তমরূপে পর্যালোচনা করিয়া প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পৈতৃক জমিদারী বিরাহিমপুর পরগনাই এই সময়ে তাঁহার প্রধান ভূ-সম্পত্তি ছিল। সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার মি. ফার্গুসনের সাহায্যে তিনি আইন-বিশেষজ্ঞ হন এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা এমনকি বিহারের বহু জমিদারের আইন-পরামর্শদাতা বা মোক্তার হইয়া উঠেন। আদালতের সংস্রবে আসিয়া দ্বারকানাথ অনেক সরকারী পদস্থ কর্মচারীর সহিত পরিচিত হন। ইহার ফলে উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি চব্বিশপরগনার কলেক্‌টার ও 'নিম্‌কি' অধ্যক্ষের (Salt Agent) দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। এইখান হইতে ছয় বৎসর পরে তিনি

১ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মহর্ষি-জীবনীর কয়েকটি তথ্য': তত্ত্বকৌমুদী, মহর্ষির দীক্ষা-শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৪৩।

শুল্ক ও আবগারী বিভাগের দেওয়ান-পদে উন্নীত হন। এদিকে জমিদারদের পরামর্শদাতারূপেও তাঁহার বিশেষ অর্থলাভ হইতেছিল। ইতিপূর্বে ম্যাকিন্‌টস কোম্পানির কিছু অংশ ক্রয় করিয়া তাহাদের অংশীদার হইয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতায় সাহেবদের পরিচালিত ব্যাঙ্ক ছিল, কিন্তু বাঙালির ব্যাঙ্ক ছিল না। দ্বারকানাথ ১৮২৯ সালে কয়েকজন সাহেবকে লইয়া য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ১৮৩৪ সালে ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক ফেল হইলে বড় অংশীদার বলিয়া তাঁহার উপর অনেক দায়িত্ব আসিয়া পড়ে।

ইতিমধ্যে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি পার্লামেন্টের নির্দেশ অনুসারে (১৮৩৩) বাণিজ্য-ব্যবসায় হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইল। দ্বারকানাথ কোম্পানির চাকুরী ছাড়িয়া কার-ঠাকুর কোম্পানী নামে এক কুঠি স্থাপন করিলেন। এই কুঠির কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিলাইদহে ও অন্যান্য স্থানে নীলকুঠি ক্রয় করিয়া লইলেন; শিলাইদহের বাড়ি এখন পর্যন্ত তদঞ্চলে 'কুঠিবাড়ি' নামে খ্যাত। এই সময়ে তিনি রানীগঞ্জের কয়লাখনির ইজারা লইয়া দক্ষতার সহিত কাজ শুরু করেন। রামনগরের চিনির কারখানা তাঁহার প্রতিভার আর-একটি উদাহরণ। এ ছাড়া তিনি বিস্তর জমিদারি ক্রয় করেন; ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের জমিদারি। নাটোরের ঋষিকল্প জমিদার রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের সংসার-ঔদাসীন্যের ফলে তাঁহার বহু সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হয়, দ্বারকানাথ ঐসব সম্পত্তি কয়েকজন ট্রাস্টির নামে ক্রয় করিয়া লন।

দ্বারকানাথের সহায়তায় তৎকালীন বহু জনহিতকর কার্য অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও জমিদার-সভা স্থাপন, ইংলণ্ড্ ও ভারতের মধ্যে দ্রুত ডাক-বিনিময়ের ব্যবস্থা, সতীদাহ-নিবারণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যাপারে দ্বারকানাথ অগ্রণী হইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার লোকহিতকর ও সমাজসংস্কার কার্যে তিনি রামমোহন রায়ের প্রধান সহায় ছিলেন। যদিও তিনি রাজার ধর্মমত গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার 'আত্মীয়সভা' স্থাপন, ব্রাহ্মসমাজমন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। দ্বারকানাথের পরিবার ঘোর বৈষ্ণব ছিল; তিনিও তাঁহার প্রথমজীবনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে তাঁহার প্রবল নিষ্ঠার লোপ হয় ও ক্রমে হিন্দুদের সাধারণ সংস্কারসমূহ ত্যাগ করেন। শতাব্দীপূর্বে হিন্দুর পক্ষে বিলাতযাত্রা কত বড় সাহসের কথা ছিল তাহা বর্তমানে আমাদের কল্পনাতীত। ১৮৪২ অব্দে দ্বারকানাথ প্রথম বার বিলাত যান। সেই বৎসরেই ফিরিয়া আসেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি তাঁহার বৈঠকখানা-বাড়িতে থাকিতেন; কারণ একান্নবর্তী পরিবারের বহু আত্মীয়কুটুম্বকুটুম্বিনীদের ধর্মবিশ্বাস পাছে আহত হয় এই আশঙ্কায় তিনি এই বহির্বাটীতে বাস করিতে থাকেন।[১]

১৮৪৪ সালে দ্বারকানাথ দ্বিতীয় বার বিলাত যান। এইবার সঙ্গে ছিল তাঁহার ভাগিনেয় নবীন মুখোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ; এ ছাড়া অন্য লোকও ছিল। এই বৎসর তাঁহার চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে চারিজন বাঙালি ছাত্র ডাক্তারি শিক্ষার জন্য বিলাত যান; দুইজনের ব্যয় দ্বারকানাথ স্বয়ং বহন করেন, অপর দুইজনের ব্যয় বহন করেন গভর্নমেণ্ট। বিলাতে দ্বারকানাথ যেরূপ বিলাস ও বৈভবের মধ্যে থাকিতেন তাহাতে লোকে তাঁহাকে 'প্রিন্স্ দ্বারকানাথ' বলিত। ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হয় (১ আগস্ট ১৮৪৬); তখন তাঁহার বয়স মাত্র একান্ন বৎসর।

দ্বারকানাথের বদান্যতা সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিলাসিতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটি জিনিস বিশেষভাবে

১ বৈঠকখানা-বাড়ি বলিতে বুঝায় ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির বাড়ি। পরে গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী ইহা বাসের জন্য পান। এককালে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসংগ্রহের জন্য ইহার খ্যাতি ছিল। ১৯৪১ সালে ইহা বিক্রয় হইয়া যায়; ইহার শিল্পসংগ্রহ আমেদাবাদে চলিয়া গিয়াছে। মূল বসতবাটী হইতেছে ৬নং বাড়ি।

লক্ষ্য করিবার, সেটি হইতেছে তাঁহার সৌন্দর্যভোগের অসীম ক্ষমতা। যে বিলাসিতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা তাঁহার বেলগাছিয়া-বাগানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে বংশধরদের মধ্যে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ১৮১৭-১৯০৫

রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশে 'মহর্ষি' নামে পরিচিত; ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা প্রথম ইঁহাকে এই সম্মানসূচক উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার মাতা দিগম্বরী দেবী স্বধর্মনিষ্ঠা ও তেজস্বিতার জন্য খ্যাত ছিলেন। দ্বারকানাথ সাহেবদিগের সহিত একত্রে পান-আহার করিতে আরম্ভ করিলে দিগম্বরী দেবী 'স্বামীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে জীবননির্বাহের ব্রত ধারণ করিয়া মৃত্যুর দ্বারা তাহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।'[১] দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠা হয়তো জননীর চরিত্র হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের সন্তানগণের মধ্যে কেবল দেবেন্দ্রনাথই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পুত্র অপ্রাপ্ত-বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ চৌত্রিশ বৎসর (মৃত্যু ১৮৫৪) ও কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ (মৃত্যু ১৮৫৮) উনত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে (১৮১৭)[২] দ্বারকানাথের বয়স তেইশ বৎসর মাত্র; তখন দ্বারকানাথের অবস্থা অতি সামান্য। সাত বৎসব পরে দ্বারকানাথ চব্বিশপরগনার কলেক্টরের দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হন ও সেই হইতেই তাঁহার ভাগ্যোদয়। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবন পিতার বৈভব ও আড়ম্বরের মধ্যে কাটে। দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১৮২৯ সালের ফাল্গুন মাসে, তখন তাঁহার বয়স বারো বৎসর মাত্র। পত্নী সারদা দেবীর বয়স ছয় কি সাত বৎসরের বেশি নয়; ইনি খুলনা দক্ষিণডিহির রায়চৌধুরী রামনারায়ণের কন্যা। ইঁহার গর্ভে পনেরোটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই রবীন্দ্রনাথের গর্ভধারিণী। সারদা দেবী পঞ্চাশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

দ্বারকানাথ প্রাচীন মত ও পথ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করিলেও তিনিই ছিলেন রামমোহন রায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তাঁহার অন্দরমহল ছিল বৈষ্ণব; বাড়ির ত্রিসীমানায় মাংসাদি আসিতে পারিত না, মদ্যের তো কথাই ছিল না। পিতামহীর প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালাবধি নিরামিষ আহারেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যৌবনকালে তাঁহার পিতার ধনগৌরবশালী অবস্থায় সেই প্রাচীন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে কয়েক বৎসর পাঠ করেন, কিন্তু তথাকার উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়া ও আদর্শ তাঁহাকে স্পর্শ না করিলেও পিতার ধনৈশ্বর্যের আবিলতা তাঁহাকে সম্পূর্ণ অমলিন রাখিতে পারে নাই। কার-ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত (১৮৩৪ জুলাই) হইলে বহু দেশীয় ও ইংরেজ ধনীর সহিত দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক ও সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এইসমস্ত আমোদপ্রমোদ-সভায় সামাজিক খাতিরে দ্বারকানাথ পুত্রগণের সহিত উপস্থিত হইতেন; ইহার কুফল দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ গৃহসংসারের কর্তৃত্ব পাইয়া যদৃচ্ছভাবে জীবন যাপন করিতে থাকেন; আঠারো হইতে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কয় বৎসর দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বিলাসিতার জীবন। দ্বারকানাথ পুত্রকে এই দুর্নীতিপূর্ণ পারিপার্শ্বিক হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পিতামহী অলকা দেবীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। শ্মশানে পিতামহীর

১ মহর্ষির আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ২৯৮

২ ১৮১৭ মে ১৬, ১২২৪ জ্যৈষ্ঠ ৩।

শবপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার চিত্তে এমন-একটি আনন্দময় উদাসভাবের উদয় হইয়াছিল যাহার স্পর্শচিহ্ন মন হইতে আর মুছিল না। মহর্ষির আত্মচরিতের পাঠকমাত্রেই জানেন, কিভাবে এই মৃত্যু তাঁহার জীবনকে নূতন পথে পরিচালিত করিল। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর।

ইহার পর সংস্কৃত শিখিয়া শাস্ত্রের মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। সঙ্গেসঙ্গে তিনি য়ুরোপীয় দার্শনিকদের গ্রন্থ অধ্যয়নেও মন দিলেন। যুব-বাংলার জ্ঞানপিপাসু চিত্তকে সেদিন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ও বিপ্লববাদী লেখকগণ এবং হিউম প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদীরা কিভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। য়ুরোপীয় মনীষীদের বিপ্লববাদ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রচারলাভ করিয়া শিক্ষিত বঙ্গসমাজের মধ্যে কী আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা শিবনাথ শাস্ত্রী -কৃত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত আছে। এইসব মতের সহিত পরিচয় থাকিলেও দেবেন্দ্রনাথের মন ইহাতে সাড়া দেয় নাই। ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার জন্য তিনি মূল সংস্কৃত মহাভারত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে সংস্কৃত মহাভারত বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি মহাভারত পাঠে রত হইলেন। বাংলাভাষায় মহাভারতের অনুবাদ তখনো হয় নাই। এ ছাড়া হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ কর্তৃক স্থাপিত 'সাধারণ জ্ঞানোন্নতি সভা'র সদস্য হইয়া নানারূপ আলাপ-আলোচনায় যোগদান করিবার ফলে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত ক্রমশই প্রচলিত মত ও বিশ্বাস হইতে বিপ্লবমুখী হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার এই ধর্মজিজ্ঞাসা অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার মরুভূমির মধ্যে গিয়া আত্মঘাতী না হইয়া ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইল। তাঁহার এই দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, প্রতিমা ঈশ্বর নহে। রামমোহন রায়কে তিনি বালককালে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার কথা স্মরণ হইল। ভাইদের লইয়া একত্রে প্রতিজ্ঞা করিলেন প্রতিমাকে প্রণাম করিবেন না। অতঃপর 'সর্বতত্ত্বদীপিকা'[১] নামে সভার সদস্য হইলেন; 'ধর্মবিষয়ের আলোচনা' ছিল এই সভার বিশেষত্ব। এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গৌড়ীয় ভাষা ও স্বদেশী বিদ্যার আলোচনা; এ ছাড়া স্থির হয় 'বঙ্গভাষা ভিন্ন এ-সভাতে কোনো ভাষায় কথোপকথন হইবেক না'।[১] মোটকথা তাঁহার মন পরা ও অপরা উভয়বিধ জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্নপত্র আসিয়া তাঁহার হাতে পড়িল, তাহাতে লেখা ছিল 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্'। ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের (১৭৮৬-১৮৪৫) নিকট গমন করেন ও উহার মর্মার্থ অবগত হইয়া পরম তৃপ্ত ও চমৎকৃত হন; অতঃপর গভীর অভিনিবেশ সহকারে উপনিষদ অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন।

১৮৩৯ অব্দে দেবেন্দ্রনাথের বয়স বাইশ বৎসর; ঐ বৎসর ৬ অক্টোবর (শকাব্দ ১৭৬১ আশ্বিন ২১) 'তত্ত্বরঞ্জিনী-সভা' স্থাপন করিলেন; সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে ইহার নাম হয় 'তত্ত্ববোধিনী'। 'ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।' দেবেন্দ্রনাথ নিজ পরিবারের এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্য হইতে দশজনকে লইয়া এই সভা আরম্ভ করেন। এই সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত আসিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হইলেন। ইঁহারই ভরসায় দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪০ সালের জুন মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করিলেন। ইহা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মের স্রোত নিবারণ এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান। বিনা বেতনে এই বিদ্যালয়ে বিদ্যাদান করা হইত। এই বৎসর তিনি কঠোপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া

১ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা': বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ২৮৮-২৯৫।

রাজা রামমোহন রায়ের কার্যের অনুক্রমণ করিলেন। তেইশ বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় (১৮৪০ এপ্রিল ৮)।

১৮৪২ সালে দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় তত্ত্ববোধিনী-সভা ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিল। পর বৎসর তাঁহারই অর্থানুকূল্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইল, অক্ষয়কুমার দত্ত হইলেন প্রথম সম্পাদক। হেদুয়ার নিকটবর্তী রামমোহন রায়ের পরিত্যক্ত স্কুলবাটীতে পত্রিকার যন্ত্রালয় ছিল; দ্বারকানাথ তখন জীবিত, তাঁহার বিরাগভাজন হইবার ভয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাড়িতে না বসিয়া তথায় গিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট বেদান্ত পাঠ করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহারই চেষ্টায় মৃতবৎ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইতে লাগিল। রামমোহনের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রকাশ্যে বেদপাঠ হইত না, পাছে অব্রাহ্মণ কেহ শ্রবণ করিয়া ফেলে। দেবেন্দ্রনাথ এই বৎসর প্রকাশ্যে বেদ পঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবশেষে স্বয়ং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া (১৭৬৫ শক। ১২৫০ সাল পৌষ ৭। ১৮৪৩ ডিসেম্বর ২১) সম্পূর্ণভাবে সমাজের আদর্শ ও কর্মের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথের সমগ্র পরবর্তী জীবন যেন সেই দিনের গৃহীত সংকল্পেরই বিকাশ। তখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর। অতঃপর সারাজীবন এই দিনটিকে তিনি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। রবীন্দ্রনাথের নিকটও পিতার দীক্ষাদিন ছিল তেমনি পূত; তাঁহার বিরাট গদ্যসাহিত্যে এইদিনের স্মরণে বহু রচনা আছে। দুই বৎসর পরে (১৮৪৫) ৭ই পৌষ গেরেটির বাগানে ব্রাহ্মদের লইয়া দেবেন্দ্রনাথ এক 'উৎসব' করেন, ব্রাহ্মদের মধ্যে ইহাই প্রথম সামাজিক উৎসব।

দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মন দিলেন। সেই সময়ে একদিকে খ্রীষ্টান পাদরীরা হিন্দুধর্ম ও সমাজকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিতেছেন; অন্যদিকে দেশীয় পণ্ডিতগণ প্রাচীন শাস্ত্রকে অভ্রান্ত জ্ঞানে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; আর ইহারই পাশাপাশি হিন্দু কলেজের যুক্তিবাদী ছাত্রের দল ধর্মমাত্রকেই বিদ্রূপ করিয়া চলিতেছিল। এই ত্রিবিধ আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কাজে যতই মনোযোগী হইতে লাগিলেন বৈষয়িক ব্যাপারে ঔদাসীন্য ততই বাড়িয়া চলিল। এমন সময়ে বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যু হইল (১৮৪৬ অগস্ট ১)। পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ কিভাবে বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন, কিভাবে পিতৃঋণ শোধ ও শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করিলেন তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে বিস্তৃতভাবেই বিবৃত হইয়াছে। অপৌত্তলিকভাবে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান যে হিন্দুসমাজের চক্ষে কত বড় বিদ্রোহ তাহা বর্তমান যুগে হৃদয়ংগম করা কঠিন। ইহা ব্যক্তিগত বিদ্রোহ নহে, ইহা সামাজিক বিপ্লব।

ইতিমধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মনীষার প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের নিজের ও ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসে পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল। রামমোহন রায় যে-একেশ্বরবাদী মণ্ডলী স্থাপন করেন, উহার মতবাদের নাম দেন 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম' (১৮২৬ অগস্ট ২০। ১৭৫০ শক ভাদ্র ৬)। ১৮৩০ অব্দে (জানুয়ারি ২৩। মাঘ ১১ বুধবার) চিৎপুর রোডে মণ্ডলীর নূতন মন্দিরগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভার লইবার পরে তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থির হইল যে, অতঃপর 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম' নামের পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম অবলম্বন করা হইবে (১৮৪৭ মে ২৮)। "এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কি দুর্ধর্ষ মানসিক বলের পরিচয়, তাহা আমরা এখন কল্পনাতেও আনিতে পারি না।" বেদ অভ্রান্ত ও ধর্মের উৎসরূপে এতকাল স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, সেই মতে ভাঙন ধরিল; "শতসহস্র যুগযুগান্তরের অর্জিত মানসিক শৃঙ্খল নির্বিবাদে ও সহজে খসিয়া গেল।"

এদিকে ১৮৪৮ অব্দের প্রথম ভাগে যুনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হইল এবং অল্পকাল পরেই কার-ঠাকুর কোম্পানির দ্বারে তালা পড়িল। দেবেন্দ্রনাথ কঠোরভাবে ব্যয়সংকোচ করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু অভাবের মধ্যেও তাঁহার নিয়মিত শাস্ত্রানুশীলন বন্ধ রহিল না।

বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম যদি সত্য ধর্ম না হয় তবে সত্য ধর্ম কি— এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থের সৃষ্টি। উপনিষদাদি বহু গ্রন্থ হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন; কিন্তু কোথাও ঐসব অংশের মূল নির্দেশ করেন নাই। ইহার কারণ বোধ হয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহে যুক্তি ও সহজ জ্ঞানের পরিপন্থী বহু মতবাদ আছে, তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মন পাশ্চাত্য দর্শন ও যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া তিনি কোনো প্রাচীন গ্রন্থকে ‘শাস্ত্রে’র স্থান দিতে পারিলেন না। এইজন্য উপনিষদাদি নানা গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ গৃহীত হইলেও ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় ও তাহার শৃঙ্খলা সম্পাদনের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকার্যে দেবেন্দ্রনাথ প্রায় দশ বৎসর নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার জন্য বহু বন্ধু লাভ হয়; ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন বর্ধমান-অধিপতি মহাতাপ চাঁদ[১] ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র। উভয়েই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেহই তাহার সহিত যুক্ত হন নাই; একমাত্র রাজনারায়ণ বসুর সহিত দেবেন্দ্রনাথের যোগ আজীবন সর্বতোভাবে অটুট ছিল।

১৮৫৩ অব্দে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হইলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের বেদিতে বসিয়া উপাসনা করেন নাই। এদিকে গৃহের মধ্যে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদির সমর্থন করা ক্রমেই আধ্যাত্মিক দিক হইতে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। অথচ ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ও অন্যান্য আত্মীয়েরা তাঁহার মতবিরোধী। ইতিমধ্যে ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে (১৮৫৪) সংসারে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দিল। গিরীন্দ্রনাথই বিষয়সম্পত্তি প্রভৃতি দেখাশুনা করিতেন। তাঁহার অভাবে যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্ম দেবেন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়িল। তিনি ভ্রাতাদের বিষয়াদি যথোপযুক্তভাবে পৃথক করিয়া দিলেন, কিন্তু জমিদারি দেখাশুনা এজমালিতে থাকিয়া গেল। এইসব কারণে অনেকটা সংসারে বিরক্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ নৌকাযোগে কাশী যাত্রা করিলেন (১৮৫৬)। দুই বৎসর পরে সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা হইলে তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন (১৮৫৮ নভেম্বর)।

এইবার পাহাড় হইতে ফিরিবার পর বিশ বৎসরের যুবক কেশবচন্দ্র সেন আসিয়া মিলিত হইলেন। এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যুবককে শিষ্যরূপে পাইয়া দেবেন্দ্রনাথের কর্মজীবনে চতুর্গুণ বল আসিল। ধর্মমত পোষণ ও ধর্মজীবন পালনের মধ্যে যে-সংগ্রাম চলিতেছিল এতদিন পরে তাহারও সমাধান হইল। হিন্দুসমাজের পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদির সহিত কোনোপ্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করা কঠিন হওয়ায় তিনি গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দনের সেবা রহিত করিয়া দিলেন। অবশেষে বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হইলে গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী (গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের জননী) উহার সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া দ্বারকানাথের বৈঠকখানাবাটীতে দুই পুত্র পুত্রবধূদ্বয় দুই কন্যা ও জামাতাদের লইয়া উঠিয়া গেলেন।

এদিকে কেশবচন্দ্রের সহায়তা লাভ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের নানা কর্মে জড়িত হইয়া পড়িলেন। ১৮৫৯ অব্দে ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ স্থাপিত হইল; তথায় দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় এবং কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন। সেই বৎসর আশ্বিন মাসে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে লইয়া সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসেন; এখন হইতে কেশবচন্দ্র সকল সময়ে সকল কার্যে দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। নূতন প্রাণশক্তির প্রেরণায় এইবার দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বেদিতে বসিলেন (১৮৬০ জুলাই ২৫। ১২৬৭ শ্রাবণ ১১)। ইহারই পরদিন দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিবাহ

১ মহাতাপ চাঁদের প্রভাবে বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় এবং সেখান হইতে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়: ওঁ তৎসৎ সত্যসন্ধগণের ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি। সত্য-সন্ধায়িনী সভা হইতে প্রকাশিতা ‘সত্যসন্ধদিগের প্রতিষ্ঠা’। বর্ধমান সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে ১৮৮৭ শকাব্দে অগ্রহায়ণে মুদ্রিতা। (১৮৬৫ নভেম্বর। ১২৭২ সাল)। পৃ ১২৫+পৃ ৵০।

হইল। ব্রাহ্মধর্মমতে দেবেন্দ্রনাথের ইহাই প্রথম অপৌত্তলিক বিবাহ অনুষ্ঠান। সুকুমারী দেবীর বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ যে গতানুগতিকের পথ ত্যাগ করিয়া সত্যধর্মের পথে অগ্রসর হইলেন, মনে হয়, ইহার মূলে ছিলেন কেশবচন্দ্র। কারণ, এই সময়ে কেশব তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া জোড়াসাঁকোর বাটীতে বাস করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের উপর তখন কেশবের প্রভাব অতি প্রবল। সুকুমারীর বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিলেন; পৌত্তলিকতা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তুলসীপত্র বিল্বপত্র কুশ শালগ্রামশিলা গঙ্গাজল ও হোমাগ্নি বর্জন করিয়া এক নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি সংকলন করিলেন ও তদনুযায়ী কন্যার বিবাহ দিলেন।[১]

নূতন পদ্ধতিমতে কন্যার বিবাহদানের ফলে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সামাজিক পরিধি আরো সংকীর্ণ হইয়া আসিল। নব্য ব্রাহ্মদলের সংযোগে দেবেন্দ্রনাথের সামাজিক গণ্ডি একটু একটু প্রসার লাভ করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। নিজগৃহে পূজাপার্বণ বন্ধ হওয়ায় ও অন্যের গৃহে পূজাদিতে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করায় সাধারণ হিন্দুসমাজের সহিত ঠাকুর-পরিবারের বিচ্ছেদটা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

গৃহদেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাটীতে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপে দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হইল, প্রতিমার পীঠস্থানে উপাসনার বেদি নির্মিত হইল; ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র শ্বেতপ্রস্তরে উৎকীর্ণ করিয়া ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত হইল। পূজাপার্বণ লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি কতকগুলি নূতন উৎসবের প্রচলন করিলেন; জামাইষষ্ঠী ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি সামাজিক নির্দোষ পার্বণগুলি তাঁহার পরিবারে চলিত রহিল। নূতন উৎসবের মধ্যে মাঘোৎসব (১১ই মাঘ) তাঁহারই প্রবর্তন; এ ছাড়া নববর্ষ (১লা বৈশাখ) ভাদ্রোৎসব (৬ই ভাদ্র) দীক্ষা-দিন (৭ই পৌষ) প্রভৃতি উৎসবের সূচনা করিয়া প্রাচীন পালপার্বণের অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করেন।

অল্পকাল মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের আভিজাতিক জীবনাদর্শের সহিত তাঁহার ধর্মবন্ধুদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শের বিরোধ বাধিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সমাজের গঠনতন্ত্র, উপবীতবর্জন, ব্রাহ্মণেতরের বেদি-গ্রহণাধিকার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, জাতিভেদ দূরীকরণ প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া নবীন ব্রাহ্মদের সহিত দেবেন্দ্রনাথের মতভেদ দেখা দিল। এই বিরোধী আন্দোলনের নেতা হইলেন কেশবচন্দ্র। "কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে যে-যুবক ব্রাহ্মদল ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন যে মানবের সামাজিক জীবনের সংস্কার ব্রাহ্মসমাজের কার্যের অন্তর্ভূত। এই বিষয় লইয়া মহর্ষির সহিত মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। মহর্ষির প্রকৃতিতে প্রগতিস্পৃহার সহিত স্থিতিশীলতা আশ্চর্যরূপে সংমিশ্রিত ছিল।... তাঁহার প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক গুণ অনুসারে যুবকদলের এই নূতন ভাবের দিকে সমাজকে লইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন বোধ হইতে লাগিল। আবার, কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ও সন্তানবাৎসল্য থাকাতে তিনি প্রথমে এই পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন মনে হইল যে যুবকদল ব্রাহ্মসমাজকে নূতন বিপদের মধ্যে লইয়া যাইতেছে তখন দৃঢ়তার সহিত পশ্চাৎপদ হইলেন"।[২] অবশেষে কেশব দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিলেন (১৮৬৬ নভেম্বর ১১)। দুই বৎসর পরে (১৮৬৮ মাঘোৎসব) মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দির স্থাপন করিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজ আদিব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হইল। দেবেন্দ্রনাথের বড় আশা ছিল যে, কেশবই পুত্রের ন্যায় শিষ্যের ন্যায় তাঁহার কার্য চালনা করিবেন, তাঁহার সে-আশা পূর্ণ হইল না। দেবেন্দ্রনাথ মর্মাহত হইয়া বাহিরের সকল কাজ হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর ভ্রমণে, শান্তিনিকেতন-বাসে, ধ্যানে, মননে কাটিয়া যায়। অষ্টআশি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন (১৯০৫ জানুয়ারী ১৯। ১৩১১ মাঘ ৬)

১ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় -কৃত 'রবীন্দ্র-কথা' দ্রষ্টব্য।

২ শিবনাথ শাস্ত্রী : 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ'।

সারদা দেবী : ১৮২৩ ?—১৮৭৫

সারদা দেবী বিদুষী না হইলেও মহীয়সী, রত্নগর্ভা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় মহাপুরুষের পত্নী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ সন্তানদের জননী হইলেও সাহিত্যে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কোনো অমর সৌধ নির্মিত হয় নাই। তাঁহার কৃতকর্মা পুত্র অথবা বিদুষী কন্যাগণের কেহই তাঁহাদের মাতৃদেবী সম্বন্ধে তেমন কিছু লেখেন নাই, কেহ কোনো গ্রন্থ মাতৃনামে উৎসর্গও করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরাট সাহিত্যে জননী সম্বন্ধে কয়েকটি স্থানে মাত্র সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন। মাতৃবিয়োগের সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিশু ছিলেন না, তখন তাঁহার বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর, সুতরাং মাতৃস্মৃতি ম্লান হইয়া যাইবার কোনো কারণ ছিল না। আমাদের মনে হয় সারদা দেবী শেষজীবনে অসুস্থ থাকায়, মাতাপুত্রের মধ্যে যে-স্বাভাবিক মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে তাহা ইঁহাদের ক্ষেত্রে ব্যাহত হইয়াছিল; মাতার স্মৃতি বোধ হয় সেইজন্য এমন ক্ষীণ। তবে ১৩২৬ সালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'আগমনী' নামে বার্ষিকের জন্য রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে রচনা চাহিলে তিনি মাতৃবন্দনা নামে যে-কয়টি কবিতা লিখিয়া দেন, তাহাতে মাতৃস্মৃতি আছে।[১]

সারদা দেবী ছিলেন নিষ্ঠাবান সাধারণ হিন্দুঘরের মেয়ে। ঠাকুর-পরিবারের প্রাচীন লৌকিক হিন্দুধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার বাল্য ও যৌবনের প্রথম কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়। ১৮৪৩ হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ আঠারো বৎসর দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পর্ব। স্বামীর এই সংগ্রামের সহিত পত্নী সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারিয়া ছিলেন কি না সন্দেহ, কারণ নানা আচার-অনুষ্ঠানে তাঁহাকে প্রাচীন লোকাচারই অনুবর্তন করিতে দেখা যায়। যাহাই হউক, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কি মত পোষণ করিতেন, তাহার আলোচনা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন; তবে চারিত্রিক দিক হইতে তাঁহার মধ্যে যে-একটি কর্ত্রীত্বশক্তি ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাই। দেবেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার কর্ম উপলক্ষে বা ভ্রমণ উদ্দেশ্যে প্রায়ই বাহিরে থাকিতেন, এই সময়ে সারদা দেবী গৃহে আর-কোনো কর্ত্রীর অভাবে নিজ শান্ত সংযত শক্তিবলে এই বৃহৎ পরিবারকে চালনা করিয়াছিলেন।[২] আমাদের মনে হয় সারদা দেবীর মধ্যে এমন কতকগুলি সুকুমারবৃত্তি ছিল, যাহা বাল্যকালে অনুকূলতার অভাবে ও যৌবনে সংসারের কর্মপীড়নে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের মাতার গুণাগুণ সম্বন্ধে এত কম তথ্য জানা যায় যে, আমাদের পক্ষে অনুমানের সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায় নাই।

দেবেন্দ্রনাথের বংশধর

দেবেন্দ্রনাথের পনেরোটি সন্তান জন্মিয়াছিল। প্রথমে একটি কন্যা (১৮৩৮) অকালেই মারা যায়, তাহার নামকরণাদিও হয় নাই তজ্জন্য সাধারণত দেবেন্দ্রনাথের চৌদ্দটি পুত্র কন্যা বলা হইত। তন্মধ্যে পুত্র নয় জন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬)[৩]। কাব্যে দর্শনে সংগীতে ও গণিতে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ছিল। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে (১২৬৬) তিনি মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেন। তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণ[৪] কাব্য বাংলা সাহিত্যে নানাদিক

১ জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পরিশিষ্টে কবিতাগুলি মুদ্রিত আছে। আরো দ্রষ্টব্য; 'শ্রীহলধর হালদার' [শ্রীপুলিনবিহারী সেন]: 'মাতৃবন্দনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,' দেশ ১৩৫৪ আষাঢ় ৬। র-জী ৪, পৃ. ২৫৭-৫৮।

২ দ্র. রবীন্দ্র-কথা

৩ জন্মকাল ১৭৬১ শকাব্দ ১২৪৬ সাল ফাল্গুন ৩০। মৃত্যুকাল ১৩৩২ মাঘ ৪, ১৯২৬ জানুয়ারী ১৮।

৪ স্বপ্নপ্রয়াণ ১ম সর্গ, বঙ্গদর্শন ২য় বর্ষ, ১২৮০ আশ্বিন।

হইতে উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, সাহিত্যিক মহলে কথা উঠে যে, পৌরাণিক আখ্যান ছাড়া কাব্যরচনার উপাদান সুদুর্লভ ; আর মধুসূদন যে-সংস্কৃতবহুল ভাষায় মেঘনাদবধ-কাব্য লিখিয়াছেন, সে ভাষা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছাড়া মহাকাব্য রচনা করা দুঃসাধ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই দুই ধারণা দূর করিবার জন্যই স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথের অসংখ্য সারগর্ভ রচনা প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক (১২৮৪-১২৯০)। তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রধানত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় অতিবাহিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা ; পুত্র দ্বিপেন্দ্র (১৮৬২-১৯২২), অরুণেন্দ্র নীতীন্দ্র সুধীন্দ্র ও কৃতীন্দ্র। নীতীন্দ্র যৌবনেই মারা যান, ইনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নীর বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' প্রথম খণ্ডের মধ্যে বহুবার নীতীন্দ্রর উল্লেখ আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ (১৮৬৯-১৯২৯) 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান নিশ্চিহ্ন হইবে না। ইঁহার পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজা দেবী ও কনিষ্ঠা কন্যা উষা দেবীর সহিত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র যথাক্রমে মোহিনীমোহন ও রমণীমোহনের বিবাহ হয়। ললিতমোহন ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদের দৌহিত্র। মোহিনীমোহন ও রমণীমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। মোহিনীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র তপনমোহন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ছিলেন ; বর্তমানে বিশ্বভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সুলেখক বলিয়া সমাদর লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত উভয়ের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল ; তাঁহার শান্তিনিকেতনস্থ বিদ্যালয় পরিচালনা বিষয়ে আদিযুগে উভয়েরই যোগ ছিল। দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯৩৫) বহু বৎসর রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন ; রবীন্দ্রসংগীতে তাঁহার অপূর্ব প্রতিভা সর্বজনবিদিত ; রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটক তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে লিখিয়াছিলেন 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী' এই উক্তিটি অতি সত্য।

দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩)। তিনিই ভারতের প্রথম আই. সি. এস্.। আঠারো বৎসর বয়সে তিনি বিলাত যান ও ১৮৬৪ অব্দে সিভিল সার্বিসে প্রবেশ করেন।[১] তাঁহার চাকুরিকাল বোম্বাই প্রদেশে কাটে ; রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে ও পত্রাবলীতে বোম্বাই-প্রবাসের কথা বহুবার উল্লিখিত ও আলোচিত দেখিতে পাই। তাঁহার পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অসাধারণ রমণী ছিলেন ; সামান্য বালিকাবধূ রূপে জোড়াসাঁকোর বাটিতে প্রবেশ করেন, কিন্তু প্রতিভাবলে নিজেকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন। বাংলাদেশে মেয়েদের পর্দা ও অবরোধ -প্রথা ভাঙিবার আন্দোলনে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী ছিলেন অগ্রণী। এই মেজো-বৌঠানের নিকট কবি নানা বিষয়ে ঋণী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ অধিকার ছিল। বাংলা সাহিত্যেও তাঁহার দান কম নয়। মহারাষ্ট্রীয় সাধকদের কথা তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালি পাঠকদের গোচর করেন ; তাঁহার 'গীতা' ও 'মেঘদূতের' পদ্যানুবাদ (১৯০৫), 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' এবং 'বৌদ্ধধর্ম' সুবিদিত। ইঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (১৮৭২-১৯৪০) ও কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩) রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ পিতার প্রাচীনপন্থী মতের সহিত সর্বদা একমত হইতে পারিতেন না, পুত্রকন্যার শিক্ষা বিষয়ে স্বাধীনভাবেই চলিতেন। ইন্দিরা দেবীকে সাহেবী স্কুলে দিয়া ফরাসি ভাষায় ও য়ুরোপীয় সংগীত-বিদ্যায় পারদর্শী করেন। ইন্দিরা দেবীর বিবাহ হয় প্রমথনাথ চৌধুরীর সহিত ; প্রমথনাথ বাংলা সাহিত্যে 'বীরবল' নামে খ্যাত। সুরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সমবায় জীবনবীমা ও ব্যাঙ্কিং আন্দোলনের যে অন্যতম গুরু তাহা আজ বাঙালি ভুলিয়াছে সত্য, কিন্তু ইতিহাস তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ রাখিবে। সুরেন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ রবীন্দ্রসাহিত্যের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

১ সিবিল সার্বিসের জন্য বিলাত যাত্রা ১৮৬২ মার্চ ২৩ ; প্রবেশ ১৮৬৪ জুলাই ৩০ ; ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর কর্মে যোগদান ১৮৬৪ ডিসেম্বর ১২ ; অবসরগ্রহণ ১৮৯৭ জানুয়ারি।

তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-৮৪)। ইনি কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইঁহারই সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।" হেমেন্দ্রনাথের তিন পুত্র আট কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবী (১৮৬৫-১৯২২) রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রথম অভিনয়ে 'বালিকার ভূমিকা'য় অবতীর্ণ হন। ইঁহার বিবাহ হয় আশুতোষ চৌধুরীর সহিত। হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির অংশ দেবেন্দ্রনাথ পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ যে-সম্পত্তির মালিক হন তাহা বহু দায় ও দায়িত্বের বোঝায় ভারাক্রান্ত ছিল; কিন্তু সেসব দায় হইতে তিনি হেমেন্দ্রনাথের ওয়ারিশগণকে মুক্তি দিয়া যান।

চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫)। ইনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া বহু বৎসর জীবিত ছিলেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০-৯৯) বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত; ইনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫)। সাহিত্যে সংগীতে চিত্রকলায় ইঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ইনি ও ইঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রসাহিত্যে 'নতুনদা' ও 'বৌঠান'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন।

ষষ্ঠ পুত্র পূর্ণেন্দ্রনাথ (? ১৮৫১-৫৭)। বাল্যকালে পুকুরে ডুবিয়া ইনি মারা যান।

সপ্তম পুত্র সোমেন্দ্রনাথ[১] (১৮৫৯-১৯২৩)। অল্প বয়সে বায়ুরোগগ্রস্ত হন বলিয়া ইনি বিবাহাদি করেন নাই।

অষ্টম পুত্র রবীন্দ্রনাথ; জন্ম ১২৬৮ বৈশাখ ২৫ (১৮৬১ মে ৭)। মৃত্যু ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ (১৯৪১ অগস্ট ৭) রাখিপূর্ণিমার অন্তে— তখন তাঁহার বয়স আশি বৎসর তিন মাস। তাঁহারও পরে বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬৩-৬৪) নামে এক পুত্র জন্মে, শিশুকালেই তাহার মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথের পাঁচ কন্যা। জ্যেষ্ঠা সৌদামিনীর (১৮৪৭-১৯২০) সহিত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ইঁহাদের পুত্র সত্যপ্রসাদ (১৮৫৯-১৯৩৩) ও কন্যা ইরাবতী (১৮৬১-১৯১৮)। সারদাপ্রসাদ দেবেন্দ্রনাথের জমিদারির কাজকর্ম দেখিতেন, রবীন্দ্রনাথের বিবাহের দিন শিলাইদহে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর (? ১৮৫০-৬৪) বিবাহ হয় হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত। তৃতীয়া কন্যা শরৎকুমারীর (১৮৫৪-১৯২০) সহিত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। চতুর্থা কন্যা স্বর্ণকুমারী (? ১৮৫৬-১৯৩২) বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক ও প্রসিদ্ধ লেখিকা; ইনি রবীন্দ্রনাথের 'ন দিদি'। ইঁহার বিবাহ হয় জানকীনাথ ঘোষালের সহিত। ইঁহাদের দুই কন্যা ও এক পুত্র; কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৬৮-১৯২৫) সমাজসেবায় ও সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫) সাহিত্যক্ষেত্রে ও দেশসেবায় সুপরিচিতা। পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল (১৮৭১) সিবিল সার্ভিসের খ্যাতিমান কর্মী। পঞ্চম কন্যা বর্ণকুমারী (১৮৫৮-১৯৪৮); তাঁহার বিবাহ হয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত। ইনি জীবনস্মৃতিতে 'ছোড়দি' বলিয়া পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে ইনি জীবিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার

বাইশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় খুলনা জেলার শুকদেব রায়চৌধুরী গোষ্ঠীর বেণীমাধবের কন্যা ভবতারিণী দেবীর সহিত (১২৯০ অগ্রহায়ণ ২৪। ১৮৮৩ ডিসেম্বর ৯)। ঠাকুরবাড়িতে তাঁহার নূতন নামকরণ হয় মৃণালিনী ও

১ সোমেন্দ্রনাথ কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। দ্রষ্টব্য: জীবনস্মৃতি, ১৩৪০ অগ্রহায়ণ, "কবিতা-রচনারম্ভ" পাদটীকা ২, পৃ ৮৪।

সেই নামেই তিনি পরিচিতা ছিলেন। বিবাহের সময়ে বধূর বয়স ছিল দশ-এগারো বৎসর, ত্রিশের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৩০৮ অগ্রহায়ণ ৭)। ইঁহার গর্ভে তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

প্রথম সন্তান মাধুরীলতা বা বেলা (১২৯৩ কার্তিক ৯। ১৮৮৬ অক্টোবর ২৫)। পনেরো বৎসর বয়সে মাধুরীলতার বিবাহ হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরচ্চন্দ্রের সহিত (১৩০৮ আষাঢ় ১। ১৯০১ জুন ১৫)। ১৯১৮ অব্দে একত্রিশ বৎসর বয়সে মাধুরীলতার মৃত্যু হয়; শরচ্চন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯৪২এর জুলাই মাসে। ইঁহাদের কোনো সন্তান নাই।

দ্বিতীয় সন্তান বা জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ (১২৯৫ অগ্রহায়ণ ১৩। ১৮৮৮ নভেম্বর ২৭)। ইঁহার বিবাহ হয় (১৩১৬ মাঘ ১৪) অবনীন্দ্রনাথের ভগ্নী বিনয়নী দেবীর বিধবা কন্যা শ্রীপ্রতিমা দেবীর সহিত। ইঁহারা নিঃসন্তান; একটি গুজরাটি শিশুকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাম দেন 'নন্দিনী'; রবীন্দ্রসাহিত্যের সায়াহ্নে এই 'নাতনী' নানাভাবে বহুবার দেখা দিয়াছে।

তৃতীয় সন্তান রেণুকা (১২৯৭ মাঘ ১১। ১৮৯১ জানুয়ারি ২৩)। মাত্র ১১ বৎসর বয়সে ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সহিত ইহার বিবাহ হয় (১৩০৮ শ্রাবণ)। ১৩১০এর আশ্বিন মাসে রেণুকার মৃত্যু হয়। ১৩১৫র কার্তিক মাসে জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে।

চতুর্থ সন্তান শ্রীমতী মীরা দেবী (১২৯৯ পৌষ ২৯। ১৮৯৩ জানুয়ারি ১২)। ইঁহার বিবাহ হয় নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত (১৩১৪)। ইঁহাদের দুইটি সন্তান নীতীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী নন্দিতা। নীতীন্দ্রনাথ বিশ বৎসর বয়সে (১৩৩৯ শ্রাবণ) জার্মানিতে মারা যান। নন্দিতার বিবাহ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনি নামে সিন্ধুদেশীয় এক কৃতী যুবকের সহিত। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ লণ্ডনে মারা যান।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৩০১ অগ্রহায়ণ মাসে; মৃত্যু হয় ১৩১৪ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ।

আবির্ভাবকাল

বংশানুকূলতা যেমন ব্যক্তির চরিত্রগঠনের আদিম সম্বল, স্থানানুকূলতা তেমনি চরিত্রবিকাশের প্রধানতম সহায়। স্থান-মাহাত্ম্যের অর্থ এই নয় যে, বিশেষ স্থানে বাস করিলেই কতকগুলি গুণধর্মের অধিকারী হওয়া যায়; পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষের জীবন কতখানি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাই হইতেছে স্থানমাহাত্ম্য বা দেশপ্রভাবের যথাযথ অর্থ। ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে যে- বৈষয়িক মানসিক ও আত্মিক গুণাবলীর লক্ষণ দেখা যায়, তাহার জন্য পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত কলিকাতা কতখানি দায়ী তাহার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অদ্যাবধি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে সার্ধশতাব্দীকাল পাশ্চাত্য— বিশেষ-ভাবে ইংরেজি— সভ্যতার ও অ-সভ্যতার বিচিত্র তরঙ্গ কলিকাতার পল্লীজীবনকে নাগরিক জীবনে রূপান্তরিত করিয়াছিল। ইংরেজ বণিক কর্মচারী মিশনারি শিক্ষক সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের বহুমুখীন কর্মপ্রচেষ্টা বাঙালি নাগরিকের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার মধ্যে যে-বিপ্লব আনিয়াছিল, এই পরিবারের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া বেশ সুস্পষ্টভাবেই পরিব্যক্ত হয়। বিদেশের সহিত বাণিজ্যবিষয়ে সহযোগিতা করিয়া যেসব সাধারণ লোক ধনবান হয়, ঠাকুর-পরিবারের পূর্বপুরুষ তাহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সহিত বৈশ্যবুদ্ধির চতুরতার যোগ হওয়ায় ইঁহারা অচিরে ধনী ও অভিজাত হইয়া উঠিলেন।

ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া আচারে-ব্যবহারে আহারে-বিহারে পোশাকে-পরিচ্ছদে কলিকাতাবাসী বাঙালির

এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ইংরেজের মুদ্রাযন্ত্র থিয়েটার বিদ্যালয় আপিস ফ্যাক্টরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাঙালির আর্থিক ও নৈতিক জীবনে এমন-সব পরিবর্তন সংঘটন করিয়া তুলিয়াছিল, এক কথায় ইংরেজের সহিত মিশিয়া কলিকাতার বাঙালি তাহার জীবনে এমন-সব প্রেরণা লাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল, যাহা নাগরিক জীবনের বাহিরে আহরণ করা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্ব হইতে কলিকাতা বহুলপরিমাণে আধুনিক নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। মানব-ইতিহাসে নাগরিক জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব বরাবর স্বীকৃত ও নাগরিকের বৈশিষ্ট্য গ্রামিকদের দ্বারা চিরদিন অনুকৃত হইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বলের মধ্যে যে-পার্থক্য তাহাকে কেবল স্থানের ব্যবধান দিয়া পরিমাপ করিলে চলিবে না; পটের চিত্রিত দিক ও অচিত্রিত দিকের মধ্যে ব্যবধান না থাকিলেও চিত্রের গুণগত পার্থক্য হেতু লোকদৃষ্টি চিত্রের উপরই নিবদ্ধ হয়; নগর ও গ্রাম সম্বন্ধে সেই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে কলিকাতা বঙ্গদেশের তথা ভারতের সকলপ্রকার কর্মপ্রচেষ্টা সাহিত্যসাধনা ধর্মান্দোলন রাজনৈতিক আশা-উদ্দীপনার কেন্দ্র। ঠাকুরপরিবারের বৈষয়িক উন্নতি ও মনের বিকাশ কলিকাতা ছাড়া আর কোথাও হইতে পারিত না; কারণ চিরদিনই দেখা যায় রাজধানী বা মহানগরী মধ্যস্থিত বিচিত্র শক্তিসমাবেশ প্রতিভার সর্বতোমুখী অভিব্যক্তির সহায়তা করিয়াছে। কলিকাতা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সেই অনুকূলতা করিয়াছিল।

বংশানুকূলতা বা স্থানানুকূলতাই যে প্রতিভার জন্মের ও বিকাশের প্রধান কারণ তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। প্রতিভার আবির্ভাব কি ভাবে হয়, তাহার উত্তর দান করিতে আজ পর্যন্ত কেহ পারে নাই, এবং স্থানানুকূলতায় সকল ব্যক্তির মধ্যে সমফল দর্শায় না কেন, তাহারও জবাব এখন পর্যন্ত মিলে নাই।

বংশ ও স্থানের প্রভাব আমরা যেমন সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতে পারি না, কালের প্রভাবকেও তেমনি না মানিয়া লইলে চলে না। রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষণে কালধর্মের যেসব বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছিল সে সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। নানাদিক হইতে রবীন্দ্রনাথের জন্মাব্দ বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। রাজনৈতিক দিক হইতে সিপাহী-বিদ্রোহ একটা যুগের অন্ত। ইংরেজ কোম্পানির শাসনের অবসানে পার্লামেণ্টের শাসনের অভ্যুদয় হইল; একটি কোম্পানি শাসক ছিল, এখন হইল সমগ্র বৃটিশ জাতি। এতদিন কোম্পানিকে ভারত-শাসন বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে হইত পার্লামেণ্টের কাছে; এখন পার্লামেণ্ট স্বয়ং মালিক হওয়ায় জবাবদিহির দায় হইতে শাসকশ্রেণী মুক্ত হইলেন। দেশের অভ্যন্তরে সুশাসনের অজুহাতে ভারতীয়দিগকে দৃঢ়তর শাসনজালে বাঁধিবার জন্য বিচিত্র বিধিবিধানের নিগড় প্রস্তুত হইল। রাজস্ব ও আয়ব্যয়ের সুব্যবস্থা, নূতন হাইকোর্ট স্থাপন, ভারত-শাসনসম্পর্কীয় নূতন আইন-প্রণয়ন, বড়লাটের ব্যবস্থাপরিষদ গঠন প্রভৃতি এই শাসনশৃঙ্খলার প্রয়োগব্যপদেশে অনুষ্ঠিত হইল। রেলপথের দ্রুত প্রসার ও সুয়েজখাল খনন বিদেশী বাণিজ্যের পথ সুগম করিল। শিক্ষা-বিভাগ পুনর্গঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনে যে-যুগান্তর সাধিত হইল পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ করি তাহার তুলনা আর নাই। প্রাচীন শিক্ষা ও বিশ্বাসের সহিত এই নবীন শিক্ষা ও জ্ঞানের যে-পার্থক্য তাহা পরিমাণগত ভেদ নহে, তাহা গুণগত প্রভেদ; ইহা প্রাচীনের বিকাশ নহে, ইহা প্রাচীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বিপ্লব।

ভারতীয় বিচিত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার পাশাপাশি বাংলাদেশে বিবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন বাঙালির চিত্তকে গভীরভাবে অভিভূত করিতেছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত কালটি বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। এই স্মরণীয় কালের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মপ্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ -বিষয়ক আন্দোলন, নীলকরের হাঙ্গামা ও হরিশ মুখুজ্জের 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' তাহার প্রতিবাদ, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব (১৮১২-৫৯), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩) আবির্ভাব, 'সোমপ্রকাশে'র অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন ও নাট্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির আত্মপ্রকাশের প্রয়াস প্রভৃতি সংঘটিত হয়।[১] এইসব ঘটনা বঙ্গসমাজকে এমনভাবে আলোড়িত করিয়াছিল যে ইহার প্রত্যেকটি বিষয়ই পৃথকভাবে আলোচনার যোগ্য।

বাংলা দেশের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির ইতিহাস -পাঠকমাত্রই জানেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ধর্মবিষয়ক বিচিত্র আলোচনা ও বাদপ্রতিবাদ হইতে বাংলা ভাষা কিভাবে স্বচ্ছন্দগতি ও বাংলা সাহিত্য কিভাবে উন্নতি লাভ করে। পূর্বোক্ত আন্দোলনগুলিও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে প্রত্যক্ষভাবে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। উনবিংশ শতকে প্রথম ত্রিশ বৎসরের সাময়িক সাহিত্য এই ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষ রত ছিল। সাহিত্যের দিকে বাঙালির চিত্তকে আকর্ষণ করিবার প্রথম প্রয়াস করেন মধ্যযুগীয় বাংলার শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্ত; 'সংবাদপ্রভাকর' হইতে তাহার সূচনা। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' নব্যবঙ্গে সংবাদপত্রের আদর্শ স্থাপন করে। য়ুরোপীয় সাহিত্য-দর্শনের ভাবধারা ইংরেজি-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় বাঙালির মনের মধ্যে যে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, ঘটনাচক্রে বাংলা ভাষার প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা হেতু তাহা প্রচারলাভের সুযোগ পায় নাই; সেইজন্যে য়ুরোপীয় চিন্তাধারা মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। সংবাদপ্রভাকরের প্রভাব যখন মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, তখন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আবির্ভাব হয় (১৮৪৩)।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙালির রেনেসাঁস বা উজ্জীবনের প্রথম স্পন্দন বহন করিয়া আবির্ভূত হয়। নিজের অতীত ও তাহার যথার্থ ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অন্ধ গর্ব— ইহাই হইতেছে জাতীয় জীবনের চরম দুর্গতির অবস্থা। ঐতিহাসিকের ভাষায় তাহাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ। বাঙালি ছিল সেই আত্মবিস্মৃত জাতি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই সর্বপ্রথম প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যসম্ভার মাতৃভাষার মাধ্যমে লোকসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করে। বেদের ও উপনিষদের ধারাবাহিক অনুবাদ সর্বপ্রথম এই পত্রিকায় বাহির হয়; বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া বাঙালি বেদের পরিচয় লাভ করিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ শুরু করিলেন এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। "লোকহিতকর বহুবিধ আন্দোলনের মূল আমরা ইহার আলোচনার মধ্যে প্রাপ্ত হই। শিক্ষায় স্বাবলম্বন, মিশনারিদের ষড়যন্ত্র হইতে স্বধর্ম ও স্বধর্মীদের রক্ষা, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, সুরাপান-নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার-প্রতিরোধ, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয়, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাসীদের প্রেরণা দিয়াছিল।"[২]

এই যেমন এক দিকে প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আত্মচেতনা জাগিল, অপর দিকে তেমনি য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে বাঙালির সুপ্ত মনে সচেতনতা আসিল। এই কার্যে দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।"[৩]

দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী-পাঠশালা-স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার সাহায্যে "বৈষয়িক জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার"।

১ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : নিউ এজ সং ১৩৬২, পৃ ২০২, ২১৫।

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১৩৫০, পৃ. ২৮৭।

৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃ. ৭৬-৭৭।

"বঙ্গভাষার বিস্তার দ্বারা স্বজাতির ধর্মরক্ষার নিমিত্ত" ঐ পাঠশালা-স্থাপনের একান্ত প্রয়োজন সেদিন দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তাশীল বাঙালিরা বুঝিয়াছিলেন। "আমাদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা···হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগকে পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিরাকরণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা" কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী-পাঠশালা স্থাপিত হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতবহুল করিয়া তুলিলেন। ভাষা ক্রমেই সংস্কৃত ব্যাকরণমার্গী ও সমাসাদির বাহুল্যে জটিল ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, উহা স্বভাবের পথে না গিয়া কৃত্রিমতার পথে গেল ; বাংলা গদ্যের আদর্শ হইল ইংরেজ লেখক মিল্‌টন জনসন মেকলে প্রভৃতির রচনা ; এইসব লেখক লাতিন শব্দদ্বারা ইংরেজিকে যুগপৎ সমৃদ্ধ ও দুর্বোধ্য করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষাও সেইরূপ সংস্কৃতভাষাশ্রয়ী হইতে চলিল।

ইহারই সমকালে বিপরীত আন্দোলন চলিতেছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'— এই গ্রন্থদ্বয়ের রচনারীতির প্রতিক্রিয়া আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তৎকালীন অভিজাত লেখক-সম্প্রদায় এই 'আলালী'-ভাষাকে উচ্চ ভাবধারা বহনের উপযুক্ত মাধ্যম বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এমন সময়ে মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের অভ্যুদয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন শক্তি আসিল। রচনারীতিতে গতানুগতিকের পথ পরিত্যাগ করিয়া ইঁহারা আতিশয্যের পথকে অনুসরণ করিলেন, অর্থাৎ অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল বাংলাকে আশ্রয় করিলেন মধুসূদন ও 'আলালী'-ভাষার চরম রূপ গ্রাম্য বাংলাকে সাহিত্যে স্থান দিলেন দীনবন্ধু। বাংলা কবিতা পয়ারাদি ছন্দের বন্ধনে বন্দী ছিল, খাঁটি বাংলা ভাষার বাহনে ছিল তার মন্থর গতি ও মাধুর্য ; মধুসূদন সেই চিরাচরিতকে বিসর্জন দিয়া ছন্দে আনিলেন প্রবহমানতা, অমিত্রাক্ষরের মারফত ভাষায় আনিলেন সংস্কৃতের বাহুল্য, এমন-কি অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের বাংলা মধুসূদনের আতিশয্যের নিকট ম্লান প্রতিভাত হইল। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মধুসূদন বাংলাভাষায় আনিলেন শক্তি মুক্তি ও স্বচ্ছন্দগতি। গদ্য নাটক রচনায় দীনবন্ধু যে ভাষাকে বাহন করিলেন তাহা খাঁটি গ্রাম্য বাংলা, এখানেও আতিশয্য। দীনবন্ধুর ভাষার গ্রাম্যতার কাছে 'আলালী'র ভাষা একেবারে নিষ্প্রভ। আসল কথা, বাংলা পদ্যে ও গদ্যে মধুসূদন ও দীনবন্ধু উভয়েই আতিশয্যের পথাশ্রয়ী হইয়াছিলেন। সংস্কৃত শব্দ অথবা গ্রাম্য শব্দের বাহুল্য ব্যতীত বাংলা রচনারীতির মধ্যে প্রকাশপটুতার আর কোনো পন্থা নাই, এই ছিল সে যুগের লেখকদের ধারণা।

এই সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমের আবির্ভাব হইল ; তিনি দত্ত-বিদ্যাসাগরী ভাষায় বা আলালী ভাষায় লিখিলেন না ; তিনি লিখিলেন সেই ভাষায়, যাহা কালে 'বঙ্কিমী বাংলা' নামে চলিত এবং বহুকাল বাংলা গদ্যের আদর্শ রূপে অনুকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে বলা উচিত যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যুগে বহুকাল বিদ্যাসাগরী ভাষা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই। যাহাই হউক, বঙ্কিমের গদ্যরচনারীতি বাংলা ভাষাকে ওজস্বিনী ও সাবলীল করিল। এই ভাষার সাহায্যে নানারূপের ভাবসমাবেশে সাহিত্যের মধ্যে বঙ্কিম যে গতিবেগ ও ঘটনা-বৈচিত্র্য আনিয়াছিলেন তাহাই বাংলাকে সর্বতোভাবে আধুনিকত্ব দান করে।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যের যে-দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবধারা বাঙালির চিত্তকে অভিভূত করে, মধুসূদন ও বঙ্কিমকে তাহাদের প্রতীক বলা যাইতে পারে। বাহিরের কাঠামোকে সর্বপ্রকারে ভারতীয় রাখিয়া সাহিত্যের অন্তরে য়ুরোপীয় মনোধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন মধুসূদন তাঁহার কাব্যে ; আর য়ুরোপীয় আদর্শের ছাঁচে প্রস্তুত করিয়া ভারতীয় সনাতনী হিন্দু ভাবসমূহকে মূর্তিদান করেন বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসে। মধুসূদনের কাব্যরচনায় ও বঙ্কিমের

গদ্যরচনায় য়ুরোপীয় ও ভারতীয় এই দুই বিপরীতধর্মী মনোভাবের যে সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহারই আংশিক সমন্বয়ের সূচনা হয় বিহারীলালের কাব্যে ও পূর্ণপরিণতি হয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন মধ্যযুগীয় বাংলার সমস্ত চিহ্ন প্রায় অবলুপ্ত, স্মৃতিও তাহার ম্লান। মধুসূদন দীনবন্ধু বঙ্কিম প্রভৃতি লেখকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনাদির আদর্শে যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্য-চেতনা উদ্‌বুদ্ধ হয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার বিচরণভূমি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সাংসারিক জীবনের বিচিত্রক্ষেত্রেও গতানুগতিকের বাধা ভাঙিয়া জ্যেষ্ঠেরা তাঁহার জন্যে পথ রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ধর্মসাধনায় যে সমন্বয়মন্ত্র, সমাজব্যবস্থায় যে বিপ্লববাণী প্রচার করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত না হইলেও কালধর্মের প্রভাবে তাঁহার পুত্রদের জীবনে তাহা ব্যর্থ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে প্রাচীন সংস্কারের বহু আবর্জনা তাঁহাদের পরিবার হইতে লুপ্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে আরো অনেকগুলি একে একে লুপ্ত হয়। এই মুক্ত জীবনের মধ্যে, বহুলপরিমাণে সংস্কারহীন এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইল।

কবি সত্তর বৎসর বয়সে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করি: "যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত।··· আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

"আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি,··· পূর্বযুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজেসজ্জায় তার মধ্য দিয়ে এতদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতির বাইরেও পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নূতন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয় নি।··· আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

"এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক, মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো।"[১]

এই স্বাতন্ত্র্য ছিল সর্ববিষয়ে। তাঁহাদের পরিবারের মেয়েপুরুষের কথা বলিবার ভাষায় ছিল একটা বিশেষ ভঙ্গি, বেশভূষায় চালচলনের মধ্যে ছিল আভিজাত্যের গর্ব। পুরুষদের পোশাক ছিল পায়জামা আচকান চোগা চাপকান তাজ পাগড়ি; গৃহসজ্জা ছিল জাজিম ফরাশ মছলন্দ তাকিয়া আলবোলা ফরসী; আদবকায়দায় ইঁহারা ছিলেন মোগলাই। এইসমস্ত মধ্যযুগীয়তার মধ্যে য়ুরোপীয় আধুনিকতা নানাভাবে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দ্বারকানাথের সময় হইতেই বিলাতি ছবি মর্মরমূর্তি টেবিল চেয়ার সোফা প্রভৃতি গৃহসজ্জা জোড়াসাঁকোর বৈঠকখানায় ও বেলগাছিয়ার বাগানবাটীতে আমদানি হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রেরা ও জামাতারা ইংরেজিয়ানায় যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তাহা নহে।[২] রবীন্দ্রনাথের জন্মকালের পর বাড়িতে বিলাতি অর্গান ফ্লুট প্রভৃতির চলন বেশ দেখা যায়; এমন-কি আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের জন্য প্রকাণ্ড বিলাতি পাইপ-অর্গান কেনা হইয়াছিল। এই দেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিশুকাল কাটে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর হইতেই তাঁহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন চলিতেছিল; স্ত্রীস্বাধীনতার নব-আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ যেদিন খোলা ফিটন গাড়িতে স্ত্রীকে

১ সত্তর বৎসর বয়সে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দনের প্রতিভাষণ, ১৩৩৮ পৌষ ১৫, প্রবাসী ১৩৩৮ মাঘ, পৃ. ৫০৯। আত্মপরিচয়।

২ দ্র. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পৃ. ১২৩।

লইয়া. জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে বাহির হইলেন, আর যেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার স্ত্রী ঘোড়ায় চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে গেলেন, সেদিন ঘরে বাহিরে যে ছি ছি রব উঠিয়াছিল, তাহার রেশ মিটিতে বহুকাল লাগে।[১]

দেবেন্দ্রনাথের মার্জিত রক্ষণশীল মতামতের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের প্রগতিশীল ও বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য মতামতের মিল ছিল কম; তাই তিনি নিজ পরিবারকে প্রায়ই জোড়াসাঁকো হইতে দূরে দূরে রাখিতেন; রবীন্দ্রনাথ বড় বয়সে তাঁহার 'মেজোদাদা'র সঙ্গে বাস করিতে অধিক পছন্দ করিতেন বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে বাঙালির অন্তরে বাহিরে সমাজে সংসারে নানাভাবে মুক্তির আহ্বান আসিয়াছিল। সকল আন্দোলনের মূলে ছিল য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত আমাদের প্রথমপরিচয়ের আনন্দ ও প্রতিক্রিয়া। সাহিত্যে ও সমাজে অরুণোদয়ের আঁধার-আলোয় রবির আবির্ভাব হইল।

শৈশব

আত্মীয়স্বজন

রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ১৭৮৩ শক, ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ,[২] কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, সোমবার মধ্যরাত্রির পর। ইংরেজি পঞ্জিকা অনুসারে ইনি ভূমিষ্ঠ হন ১৮৬১ অব্দের ৭ই মে, মঙ্গলবার। মধ্যরাত্রির পর জন্ম বলিয়া উহা ইংরেজি মতে মঙ্গলবার এবং বাংলা মতে শেষরাত্রি পূর্ব দিবাভাগের অন্তর্গত বলিয়া উহা সোমবার।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জন্মদিনকে জীবনের একটি বিশেষ দিন বলিয়া অনুভব করিতেন। তাঁহার জীবনের পঞ্চাশ বৎসর হইতে শেষ জন্মদিন পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরেই 'পঁচিশে বৈশাখ' সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন। পৃথিবীতে নিজ আবির্ভাবকে এমন বিচিত্ররসে অভিষিক্ত করিয়া আর-কোনো কবি বা লেখক এত রচনা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চদশ সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চতুর্দশ। কোনো কোনো বিদেশী লেখক[৩] উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বহুসন্তানসমৃদ্ধ পরিবার মহাপুরুষের মহত্ত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে। তাঁহারা আরো বলেন যে মহাপুরুষদের মধ্যে দীর্ঘকায় ব্যক্তি কম। মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে দৈব ও জৈব বহু প্রকারের গবেষণা হইয়াছে; কিন্তু উপরিউক্ত উভয় সিদ্ধান্তই অন্তত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যর্থ।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে তাঁহার পিতার বয়স ছিল চুয়াল্লিশ বৎসর। তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিচিত্র কর্মে লিপ্ত; স্বাস্থ্য অনিন্দনীয় সুন্দর। তাঁহার জননী সারদা দেবীর বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর; বহুসন্তানবতী জননী হওয়া

১ "...মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ] বিলাত হইতে ফিরিয়া, আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধ-প্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম।...গঙ্গার ধারের কোনো বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে...হতভম্ব হইয়া থাকিত। দারোয়ানেরা আমাদের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। সেসব দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না।"— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৩৮

২ কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ১৩৪৫ বৈশাখ ২৬। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৯৬।

৩ C. T. Whitby, *Makers of Man, a Study of Human Initiative*, 1910.

সত্ত্বেও তাঁহার স্বাস্থ্য তখনো অটুট ছিল ; কনিষ্ঠ পুত্র বুধেন্দ্রের জন্মের পর তাঁহার শরীর ভাঙিতে থাকে। স্বামীর দীর্ঘ-জীবনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষণে তাঁহার ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতির কাহার কত বয়স ছিল তাহা জানিলে সাংসারিক আবহাওয়াটার একটা চিত্র পাওয়া যাইতে পারে। 'বড়দাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ বৎসর, তিনি তখন বিবাহিত, রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। 'মেজদাদা' সত্যেন্দ্রনাথ তখন উনিশ বৎসরের যুবক, সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ; ১৮৬২ অব্দের ২৩ মার্চ তিনি বিলাত যাত্রা করেন ; তিনি যখন আই. সি. এস. হইয়া ফিরিলেন (১৮৬৪ ডিসেম্বর ১২) তখন রবীন্দ্রনাথ তিন বৎসরের শিশু। সত্যেন্দ্রনাথের বালিকাবধূ জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুরবাড়িতেই আছেন। জ্ঞানদানন্দিনীর জন্মস্থান যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রাম ; জন্ম ১৮৫২, বিবাহ ১৮৫৯। বিবাহের সময় সত্যেন্দ্রনাথের বয়স ছিল সতের বৎসর। 'সেজদাদা' হেমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হইতে সতেরো বৎসরের বড়। ইনি ও সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ অনুগত ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে কেশব সস্ত্রীক মহর্ষির আশ্রয়ে ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছিলেন।[১] চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথের বয়স পনেরো ; যৌবনাবস্থায় তিনি উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন, ব্যাধির লক্ষণ তখনো দেখা দেয় নাই। 'বড়দিদি' সৌদামিনী দেবীর বয়স তখন প্রায় চৌদ্দ ; তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; পুত্র সত্যপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ হইতে কিছু বড় এবং কন্যা ইরাবতী এক বৎসরের ছোট। ইহারা উভয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের খেলার সাথী। সাহিত্যে সত্যপ্রসাদের কথা নানাভাবে স্থান পাইয়াছে ; 'ইরু' দেখা দিয়াছে কবির জীবনসায়াহ্নের কয়েকটি রচনায়। 'নূতনদাদা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর, তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। 'মেজোদিদি' সুকুমারীর বয়স মাত্র বারো বৎসর ; রবীন্দ্রনাথের জন্মের তিন মাস পরে ইহার বিবাহ হয় ; মৃত্যু হয় অল্পকাল পরেই। 'সেজদিদি' শরৎকুমারীর বয়স সাত বৎসর ; 'নদিদি' স্বর্ণকুমারীর বয়স পাঁচ ও 'ছোটদিদি' বর্ণকুমারীর বয়স চার বৎসর। সদ্য জ্যেষ্ঠ 'দাদা' সোমেন্দ্রনাথের বয়স দুই বৎসরের কম। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন দুই বৎসর, তখন তাঁহার আর-একটি ভ্রাতা জন্মে, শিশুকালেই তাহার মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথের বসতবাটীর পাশেই তাঁহার ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের বাড়ি। এই বাড়ি ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'বাহিরের বাড়ি' বা 'বৈঠকখানা বাড়ি' ; প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া দ্বারকানাথ এই বাড়িতেই উঠেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের কিছুকাল পূর্বে গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী কেন ও কী ভাবে এই বাড়িতে উঠিয়া আসেন তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষণে তাঁহাদের নিজপরিবারের সন্তানসন্ততি ও তৎসংশ্লিষ্ট আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। উভয় বাড়ির মেয়েদের মধ্যে দেখাশুনা খুব কমই হইত ; তবে গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ এ বাড়ির যুবকদের সহিত ঘনিষ্ঠ ছিলেন ; মহর্ষি কোনোদিনই ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে নিজ পুত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখিতেন না।[২]

জোড়াসাঁকোর বসতবাড়ি প্রয়োজনের তাগিদে প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া ও বাড়িয়া উঠিয়াছিল, বিশেষ কোনো পরিকল্পনার দ্বারা উহাকে সুন্দর করিবার চেষ্টা হয় নাই। এই বৃহৎ অট্টালিকা বহু আঙিনায় বহু তলায় বহু ছাদে খণ্ডিত বিভক্ত, গোলকধাঁধার ন্যায় বিচিত্র ; আজকালকার কোনো অট্টালিকার সহিত তুলনা হয় না।

১ The first opening of my eyes to the light of the sun closely coincided with my first meeting with Brahmananda Keshub Chandra Sen when he came to our Jorasanko house and made it his home for some time at the early period of his life consecrated to the service of God. I was fortunate enough to receive his affectionate caresses at the moment when he was cherishing his dream of a great future of spiritual illumination. . . . Letter. 17th Nov. 1937. See *Navavidhan* (The New Dispensation). Keshub Chandra Centenary Number, Vol. 1, p. 2.

২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, পৃ. ৩৭।

শিশুর নিকট এই সুবৃহৎ অট্টালিকার জানা-অজানা আঙিনা কুঠরি ছাদ ছিল বিরাট রহস্যে পূর্ণ ; সাহিত্যের মধ্যে নানা সুরে এই রহস্যাবৃত সৌধের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

বাড়ি যেমন বিশাল, লোকসংখ্যাও তেমনি বিপুল ও বিচিত্র। একান্নবর্তী পরিবারের পাকশালা ছিল যেন একটি বিরাট যজ্ঞশালা ; এই সাধারণ রন্ধনশালা হইতে প্রত্যেক পরিবারের ঘরে ঘরে অন্নব্যঞ্জন যাইত। এতদ্‌ব্যতীত বধূরা নিজ নিজ স্বামী-পুত্রাদির জন্য সামান্য খাদ্যাদি তোলা উনুনে রান্না করিয়া লইতেন। দেশের প্রাচীন রীতি ও নীতি অনুসারে বনিয়াদি ধনী ঘর প্রায়ই আত্মীয়-অনাত্মীয় কুটুম্ব-কুটুম্বিনী আশ্রিত-আশ্রিতাতে পূর্ণ থাকিত, এ-পরিবারে তাহার ব্যতিক্রম না হইলেও ব্রাহ্মপীরালি ঘরে বহু দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়রা 'জাতি' যাইবার ভয়ে কলিকাতায় কমই আসিত। পুত্র-পুত্রবধূ পৌত্র-পৌত্রী কন্যা-জামাতা দৌহিত্র-দৌহিত্রী প্রভৃতিতে গৃহ পরিপূর্ণ। এ ছাড়া ছিল দাস-দাসী বাবুর্চি-খানসামা পাইক-হরকরা নায়েব-গোমস্তা ওস্তাদ-বাজিয়ে প্রভৃতি। ঠাকুরবাড়ির জামাতাদের প্রায় সকলেই ঘরজামাই। তার বিশেষ কারণ ছিল ; পীরালি ব্রাহ্ম পরিবারে ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বিবাহ করিয়া পৈত্রিক সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেন, তখন জাত হারাইয়া ধনী শ্বশুরের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর থাকিত না। এইজন্য দেখা যায় ঠাকুরবাড়িতে পুত্র-পৌত্রাদির সহিত দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণ সমভাবে লালিত হইতেছে। এই বহু সন্তানসমন্বিত আত্মীয়কুটুম্ববেষ্টিত সংসারে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হন।

ভৃত্যরাজক তন্ত্র

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার শিশুজীবনের এক পর্বকে 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র' আখ্যা দিয়াছেন। ধনীর গৃহে শিশুদের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত থাকে দাসদাসীদের উপর। ভৃত্যদের হেপাজতে তাহাদের মহলে বালকদের অধিকাংশ সময় কাটে। বাড়ির বাহির হওয়া নিষেধ, কর্তাদের আভিজাত্যে আঘাত লাগে ; বাড়ির ভিতরেও যখন-তখন যাওয়ার অনুমতি মিলে না— মেয়েদের আরামে ব্যাঘাত জন্মে। বাড়িতে নূতন বধূ আসিলে তাহার সহিত পরিচয় লাভের ইচ্ছা বালকদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ সেই সহজ আনন্দ-আবেগ প্রকাশের সুযোগ হইতে তাহারা বঞ্চিত ; কল্পনা-প্রিয় বালকের মন কেবলই সেই নবাগতার পরিচয় লাভের জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।[১]

শিশুদের দিন কাটিত বাহিরবাড়িতে দোতলার দক্ষিণপূর্ব কোণের একখানি ঘরে, চাকরদের মহলে। ভৃত্যদের হৃদয়হীন ব্যবহার বালককে কিরূপ পীড়িত করিত, তাহা 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক অবগত আছেন। বৃদ্ধবয়সে রচিত 'ছেলেবেলা'য় উহা বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হইয়াছে ; শেষবয়সে লেখা 'গল্পসল্পে' ঐ-সব স্মৃতি উঁকিঝুঁকি দিয়াছে। শেষ-দিককার কাব্যের মধ্যেও পুরাতন কথা প্রায়ই পাওয়া যায়। ভৃত্যেরা নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিবার জন্য যেসব অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করিত তাহা শিশুর দেহগঠন বা মনের বিকাশের আদৌ অনুকূল ছিল না ; ফলে একপ্রকার অনাদরের মধ্যে তাঁহাদের দিন কাটিত। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর প্রতি অতিরিক্ত মনোসংযোগের ফলে আজকালকার শিশুদের দেহমনকে যেমন ঠাসিয়া ধরা হয়, ঠাকুরবাড়ির এই শিশুদের ভাগ্যে সেটা পুরামাত্রায় জোটে নাই ; খানিকটা অনাদরে অবহেলায় মানুষ হইবার সুযোগ লাভ করাতেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উদ্‌বুদ্ধ হইবার অবকাশ মিলিয়াছিল। আজকাল শিশুদের 'মানুষ' করা সম্বন্ধে যেসব কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি ধনীগৃহে অনুসৃত ও মধ্যবিত্ত ঘরে অনুকৃত হয়, তাহা সেযুগে অজ্ঞাত ছিল। সেইজন্য ঠাকুরবাড়ির শিশুজীবনের যে-চিত্র কবি

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয় কাদম্বরী দেবীর সহিত (১২৭৫ আষাঢ় ২৩। ১৮৬৮ জুলাই ৫) রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত বৎসর ; এই স্মৃতি হইতে 'বধূ' কবিতা রচিত (১৯৩৮ অক্টোবর ২৫), আকাশপ্রদীপ

বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বর্তমানে দীনতম মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদেরও কাম্য নহে। "বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল"। এ বর্ণনা দিতে আজকাল সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলেও লজ্জা বোধ করিবে।

যাহাই হউক, ঘটনাসমূহকে কেবল ঘটনা বলিয়া দেখিলে তাহাদের বাস্তবতা সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাকে তাহার স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষণা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরকালের মধ্যে ফেলিয়া দেখিলে উহাকে অনাবশ্যক বৃহৎ ও তীব্র করিয়া দেখা হয়। কবিচিত্তের এই বিশেষ ধর্ম হইতেই তিনি সামান্য ঘটনাকে বারংবার বলিতে বলিতে এমন একটি কাব্যময় লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন, যেখানে বাস্তব ও কল্পনা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া নূতন রূপ ও রসের সৃষ্টি করে এবং অবশেষে সাহিত্যধর্মী হইয়া উজ্জ্বল সুন্দর হইয়া উঠে। রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁহার শিশুজীবনের বর্ণনা অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশিত হইয়াছে; বাস্তবতার রূপলোক হইতে কল্পনার অসীম সৌন্দর্যমধ্যে তাহার পরিপূর্ণতা।[১]

বাহিরের ঘরে ভৃত্যদের হেপাজতে বন্দী অবস্থায় বাসকালে এই শিশুর একমাত্র সঙ্গী ছিল সম্মুখের মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া দৃশ্যমান জগতের শোভা। ঘরের "জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী।...গণ্ডিবন্ধনের বন্দী" হইয়া "জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া" দিতেন। বহুকাল পরে কবি গাহিয়াছিলেন 'আমার এই পথ-চলাতেই আনন্দ'; সেই শিশুকালেও সেই চেয়ে-থাকাতেই ছিল বালকের পরিপূর্ণ আনন্দ। মন ভরিয়া উঠিত রূপকল্পনায় ছন্দরচনায় সুরযোজনায়; কিন্তু তখনো তাহা মুকুলের ন্যায় মুদিত, শোভায় ও সৌরভে সার্থক হয় নাই। এই পুকুরের ছবিখানি যৌবনের দিনে লেখনীর রেখায় ছন্দে গাঁথিয়াছিলেন 'প্রভাত-সংগীত'এ 'পুনর্মিলন' কবিতায় 'পুকুর গলির ধারে, বাঁধাঘাট একপারে' ইত্যাদি পংক্তিতে। পুকুরপারের চীনা বটকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

> নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
> ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।[২]

জীবন-সায়াহ্নে এই পুকুরের স্মৃতি লইয়া লেখেন 'জল'[৩] কবিতা—

> পুলকিত সাবধানে
> নামিতাম স্নানে,
> গোপন তরল কোন্ অদৃশ্যের স্পর্শ সর্ব গায়ে
> ধরিত জড়ায়ে।
> হর্ষ-সাথে মিলি ভয়
> দেহময়
> রহস্য ফেলিত ব্যাপ্ত করি।

পুকুরটির আর-একটি আকর্ষণ ছিল; রাস্তার ধারে বাঁধানো নালা দিয়া জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসিয়া পুকুরে পড়িত। সেই জলপড়ার কলধ্বনি ও ফেনরাশি শিশুকবির চিত্তকে নানা ছন্দে ও ছবিতে ভরিয়া তুলিত।[৩] 'ছেলেবেলা'য় কবি

১ তু' 'ধ্বনি' ২১।১০।১৯৩৮, আকাশপ্রদীপ; 'সাথী' ১৬ জুলাই ১৯৩২, পরিশেষ; পথে ও পথের প্রান্তে, ৩২ নং পত্র, ১৯২৯, মার্চ ১৪

২ পুরানো বট, শিশু। বালক ১২৯২ ভাদ্র

৩ ১৯৩৮ অক্টোবর ২৬, আকাশপ্রদীপ

লিখিয়াছেন, "ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হত, ঝর্‌ঝর্‌ কল্‌কল্‌ করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উল্‌টো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম।"[১]

বালকের আর-একটি আকর্ষণের স্থান ছিল 'বাড়ির ভিতরের বাগান'; স্থানটিকে বাগান বলিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না, দুই-চারিটা অযত্নরক্ষিত গাছ ছাড়া সেখানে কিছু ছিল না। অথচ শিশু "শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত" হইত, যেন কি অসম্ভব তাহার অপেক্ষায় আছে। "সে তখন ছেলেবেলা— রজনী প্রভাত হলে, তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে—"[২] ইত্যাদি পংক্তির মধ্যে সেই-বাগানের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন।

কল্পনাকুশল বালকের বিশ্বাস করিবার শক্তি ছিল অপরিসীম; কেহ মিথ্যা বলিতেছে বা ঠকাইতেছে এ-ধারণা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সঙ্গীদের মধ্যে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ ছিলেন দুরন্ত; যত-কিছু অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করিয়া ক্ষুদ্র মাতুলটিকে অভিভূত করিতে তাঁহার অতুল আনন্দ ছিল। 'পুলিসম্যান' 'পুলিসম্যান' হাঁকিয়া তিনি মাতুলকে কি ভাবে ভয় দেখাইয়াছিলেন ও শান্তিনিকেতন-যাত্রার পূর্বে কি-সব অদ্ভুত কথা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা জীবনস্মৃতি-পাঠকের অজ্ঞাত নহে। সত্যপ্রসাদের ভগ্নী ইরাবতী ছিল রবীন্দ্রনাথের খেলার সঙ্গিনী। এই বালিকা 'রাজার বাড়ি' সম্বন্ধে প্রহেলিকাপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়া বালককে কি ভাবে উতলা করিয়া তুলিত, সে কথা কবি নানাস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। এই কয়টি পংক্তি যে-কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইল, সেটি 'শিশু' কাব্যের সুপরিচিত 'রাজার বাড়ি' কবিতা—

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেতো।

বৃদ্ধবয়সে রচিত 'গল্পসল্পে' এই শিশুকালের স্মৃতি-দিয়ে গড়া রাজবাড়ির কথা পুনরায় বলিয়াছেন। সেখানে কবি একটা কথা কবুল করিয়াছেন, "সকলেরই মধ্যে একটা বাসা করে থাকে বোকা, সেইখানে ভালো করে বোকামি চালাতে পারলে মানুষকে বশ করা সহজ হয়।" সামান্য লোকের কথা বিশ্বাস করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব মনে করিবার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল তাঁহার; ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কল্পনার রঙে আদর্শবাদী গড়িয়াছেন; অযোগ্যপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বারে বারে হতাশ হইয়াছেন; তবুও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা কোনোদিন হারান নাই। যাহাই হউক, 'রাজার বাড়ি'র মধ্যে যে কোনো অলীকতা থাকিতে পারে, তাহা বালকের কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু মনশ্চক্ষে তিনি যে রাজার বাড়ি দেখিতেন, তাহা চতুরা বর্ণনাকারিণী কখনো দেখিতে পায় নাই। এই বাল্যকালেই আর-কোনো-একটি সঙ্গিনীর কথা স্মরণ করিয়াই কি কবি 'মানসসুন্দরী' (১২৯৯ পৌষ ৪) কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

মনে আছে কবে কোন্‌ ফুল্লযূথীবনে,
বহুবাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধো-চেনাশোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে⋯

১ কলিকাতায় তখনো কলের জল হয় নাই। ঠাকুরবাড়ির পানীয় জল আসিত লালদিঘি হইতে। এ ছাড়া মাঘ মাসে গঙ্গা হইতে জল আনাইয়া বড় বড় জালা ভরিয়া রাখা হইত; তাহাতেই সম্বৎসর কাজ চলিয়া যাইত। দ্র. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পৃ. ৬১।

২ পুনর্মিলন, ভারতী, ১২৮৯ চৈত্র, পৃ. ৫৭৫-৫৭৮। প্রভাত-সংগীত, রবীন্দ্ররচনাবলী-১।

নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে…
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্য-ভবনে ;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
কী করিতে খেলা, কী বিচিত্র কথা ব'লে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার।

তাঁহার যৌবনে লেখা একখানি পত্র-মধ্যে এই শৈশবের কথা লিখিয়াছিলেন, "মনে আছে এক-একদিন সকালবেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারি দিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল।… গোলাবাড়িতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম, মনে করতেম কি একটা রহস্য আবিষ্কার হবে। দক্ষিণের বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড় করে তার ভিতর কতকগুলো আতার বিচি পুঁতে রোজ যখন-তখন জল দিতেম— ভাবতেম এই বিচি অঙ্কুরিত হয়ে উঠলে সে কি একটা আশ্চর্য ব্যাপার হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন— বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড়বাদলা— সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে আমায় সঙ্গ দান করত।"[১]

আর্টের আবহাওয়া

বাল্যকালের যেসব স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের খুবই স্পষ্ট, তাহাদের অন্যতম হইতেছে তাঁহাদের বাড়ির সাহিত্যিক ও আর্টিস্টিক আবহাওয়ার কথা। গণেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকগণের মধ্যে সাহিত্য সংগীত ও নাট্যকলার প্রতি যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল, তাহার কথা জীবনস্মৃতিতে কবি বিস্তৃতভাবেই বলিয়াছেন। গণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা প্রায়ই গীতে নাট্যে হাসি-উচ্ছ্বাসে মুখরিত থাকিত। দুঃখের বিষয় তথায় যেসব আমোদপ্রমোদ চলিত তাহা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ আর্ট-আশ্রয়ী ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও বহু সদ্‌গুণে তাঁহারা ভূষিত ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়ে তাঁহাদের মনে একটা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল।"[২]

গণেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গুণেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ— উভয়েরই নাট্যাভিনয়ের দিকে প্রবল আকর্ষণ ছিল ; তাঁহাদের চেষ্টায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি নাটকীয় দলের গঠন হয়। কিছুকাল হইতে প্রবাসী ইংরেজদের থিয়েটারের অনুকরণে কলিকাতার ধনী ও গুণী লোকেরা নিজ নিজ বাড়িতে নাট্যাভিনয়ের আয়োজনে রত হন। প্রথম প্রথম ইংরেজি নাটকের ছায়াবলম্বনে নাটক লিখিয়া অথবা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করাইয়া অভিনয় হইত। কলিকাতার অন্যান্য ধনীদের ন্যায় ঠাকুরবাড়ির যুবকেরাও এই প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিয়াছিলেন।

১ পত্র ১৮৯২। দ্র. জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৫০, পৃ. ১১২। তু. আতার বিচি, ছড়ার ছবি।

২ গণেন্দ্রনাথ ২৮ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে মারা যান (১৮৬৯ মে ১৬)। ইনি বিক্রমোর্বশী সংস্কৃত নাটকটি বাংলা গদ্য ও পদ্যে অনুবাদ (১৮৬৯ জানুয়ারি) ও 'জ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য' পুস্তকাকারে লিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত ব্রহ্মসংগীত 'গাও হে তাঁহার নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম' ইঁহারই রচনা।

অভিনয়ের আয়োজন, নাটকনির্বাচন প্রভৃতি কার্যের জন্য এক পঞ্চায়েত-সভা (কমিটি অব্ ফাইভ) গঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও অক্ষয় চৌধুরী— ইহার পঞ্চ সদস্য; বলা প্রয়োজন এই যুবকদের বয়স তখন উনিশ হইতে পঁচিশের মধ্যে। এই কমিটির ঘোষণাক্রমে (১৮৬৫) রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২৩-৮৫) 'নবনাটক' রচনা করেন। এই নাটকের প্রথম অভিনয় যখন হয় (১৮৬৭ জানুয়ারি ৫) তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। উপর্যুপরি নয় বার এই নাটকখানি ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয়। ইহার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মন হইতে একেবারে ম্লান হইয়া যায় নাই।[২] সুতরাং এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালে নাটক ও অভিনয়ের যে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্পষ্ট বোধের অগোচরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা বাংলাদেশের যাত্রাগান কৃষ্ণলীলা নিমাইসন্ন্যাস নহে, তাহা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়-আদর্শে গড়া থিয়েটরের অনুকরণে রচিত নাটকের অভিনয়। এইসব অভিনয়ের ক্ষীণ স্মৃতিকণিকাগুলি বালকের অবচেতন মনের স্তরে সঞ্চিত ছিল এবং উত্তরকালে তাহারাই পূর্ণাঙ্গ আর্ট রূপে কবির জীবনে প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে বাড়িতে কাব্য-সাহিত্যের আলোচনার একটা স্রোত বহিয়া চলিতেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যরচনায় মগ্ন।[৩] রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।" তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "আমি ঘরের একটি কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা (স্বপ্নপ্রয়াণ) শুনিবার চেষ্টা করিতাম।... শুনিয়া তাহার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।"[৪] সাহিত্যের রসগ্রাহিতা যেমন ঠাকুর-পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, গীতকুশলতা ছিল তেমনি তাঁহাদের প্রকৃতিগত। শিশুকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুকণ্ঠ; তিনি লিখিয়াছেন, "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।" বালকের এই সুকণ্ঠের জন্য তাহার আদর ছিল সর্বত্র। তাঁহার এই শিশুকালের গানের প্রধান সমঝদার ছিলেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ[৫]— দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু ও ভক্ত। শ্রীকণ্ঠ ছিলেন বিশ্ববন্ধু, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ছিল তাঁহার সমবয়সী, অন্তরঙ্গ আত্মীয়সদৃশ। 'ছেলেবেলা'য় কবি তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন; হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, গুন্ গুন্ গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল্ জ্বল্ করত, গান ধরতেন— 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী'। সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।"

আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮১৯-১৯০১ ?) ছিলেন ইঁহাদের বাড়ির গীতশিক্ষক; ধ্রুপদী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইনিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু। 'ছেলেবেলা'য় কবি লিখিয়াছেন, "যে কয়দিন আমাদের

১ কৃষ্ণবিহারী সেন এম্. এ. (১৮৪৭-১৮৯৫) ভ্রাতার প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সুবক্তা ও সুলেখক। 'অশোকচরিত'এর গ্রন্থকার।

২ দ্র. অবনীন্দ্রনাথ ও রানী চন্দ: ঘরোয়া, পৃ. ৯৮-১০৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।

৩ স্বপ্নপ্রয়াণের সমালোচনা: সতীশচন্দ্র রায়, বঙ্গদর্শন ১৩০৯। শ্রীকানাই সামন্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২। স্বপ্নপ্রয়াণ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে কিয়দংশ প্রকাশিত হয়।

৪ জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৫০।

৫ রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহের পৌত্র; ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ও নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি।" ইহার সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন, "প্রত্যহ শুনেছি সকাল-সন্ধ্যায় উৎসবে-আমোদে উপাসনামন্দিরে তাঁর গান। ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গান চর্চা করেছেন। আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাংলা ভাষায়। এর মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই, চিরাভ্যস্ত সেইসব প্রাচীন গানের নিবিড় আবহাওয়ার ভিতর থেকেও তাঁরা আপন মনে যেসব গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার রূপ ও তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"[১]

আর-একটু বড়ো বয়সে যদুভট্টের নিকট তিনি গানে যে-শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহার প্রভাবই জীবনে স্থায়ী হয়।[২] সে-যুগে ধনীদের গৃহে গানের জন্য বাঁধা ওস্তাদ থাকিত। ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোনো গতি ছিল না, দেবেন্দ্রনাথের গৃহে সংগীত নূতন রূপ ও নূতন প্রাণ পাইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় ধর্মমন্দিরে সংঘ-উপাসনার প্রবর্তক; মন্দিরে উচ্চাঙ্গে তাল-মান-লয়-সংযোগে গানের প্রবর্তন তিনিই করেন।[৩] রাজার আরব্ধকার্য দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা উজ্জীবিত হয়; তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উৎকৃষ্ট সংগীতের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মসংগীত তিনি স্বয়ং রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথ নানারকম হিন্দি গান হইতে সুর আহরণ করিয়া বা হিন্দি গান ভাঙিয়া ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে ভগবৎবিষয়ক সংগীতরচনার আদর্শ তাঁহারা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

যদুভট্টের শিক্ষাধীন অবস্থায় সবিশেষ চেষ্টা দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে মার্গ-সংগীত আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি নিয়মিতভাবে গান কখনো শেখেন নাই। এ কথা অন্য পাঁচটা বিষয় সম্বন্ধেও যেমন সত্য, গান সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। তিনি লিখিয়াছেন, "ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না।" 'কুড়িয়ে-বাড়িয়ে' যাহা পাইয়াছিলেন তাহা হইতেছে দেশী গান, নানা লোকের মুখ হইতে শোনা— দাসদাসী কর্মচারী ভিখারী-বাউল মাঝি-মাল্লার গান। এইসব বিচিত্র সুরতরঙ্গ বালককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিত। এইসব গানের ভাষা ও ভাব স্পর্শচেতন ভাবপ্রবণ বালকের চিত্তাকাশে যে সপ্তবর্ণের হোলিখেলা খেলিত, উত্তরকালে সুরসৃষ্টিতে সেসব কিভাবে কাজে লাগিয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করা কঠিন; কিন্তু ইহাদের প্রভাব সুনিশ্চিত।

১ শান্তিদেব ঘোষ প্রণীত 'রবীন্দ্র-সংগীত' হইতে উদ্ধৃত।

২ যদুভট্ট বা যদুনাথ ভট্টাচার্যকে (১৮৪০-৮৩) দেবেন্দ্রনাথ আহ্বান করিয়া আনিয়া ১৮৭০ অব্দে প্রথম তাঁহার গান শোনেন; তার কয়েক বৎসর পর যদুনাথ ঠাকুরবাড়িতে গানের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের সূত্রে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের সহিত তিনি পরিচিত হন; মহারাজ তাঁহাকে 'রঙ্গনাথ' উপাধি দান করেন। তাঁহার কয়েকটি হিন্দি গানে রঙ্গনাথ নাম পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় তিনি বাস করিতে যান নাই, তাঁহার বেশির ভাগ সময় কাটে ঠাকুরবাড়িতে। মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে এই অসামান্য প্রতিভার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদুভট্ট-রচিত হিন্দি গান ও সুর লইয়া কয়েকটি বাংলা গান রচনা করেন।

দ্র. রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, যদুভট্ট, মাসিক বসুমতী ১৩৬১ আষাঢ়। 'রবীন্দ্র-জীবনী' চতুর্থ খণ্ড। শান্তিদেব ঘোষ 'রবীন্দ্র-সংগীত' গ্রন্থে যদুভট্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

কবি লিখিয়াছেন "ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল।··· তিনি বিখ্যাত যদুভট্ট। ··· যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন, নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে; বাংলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটা originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।"

৩ রাজা রামমোহন রায় স্বয়ং বহু ব্রহ্মসংগীত-রচয়িতা; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্ম যুবসমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত' গ্রন্থে রাজা রামমোহন রায়— তাঁহার অনুবর্তী ও বন্ধুগণ কর্তৃক রচিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক আরাধনাকালীন গীতের সংখ্যা ১০৪টি। ব্রহ্মসংগীত, ১১ই মাঘ, ১৮৭১ শক, ১৩৫৬, ১৯৪৯।

শিক্ষালাভ

অক্ষর-পরিচয়ের পূর্বে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় ছড়া ও রূপকথার অরূপরাজ্যে। রবীন্দ্রনাথ ছড়ার রসকে বাল্যরস আখ্যা দান করিয়াছেন। ছড়ার অসমছন্দের অর্থহীন শব্দঝংকার শিশুর চিত্তে যে-দোলা দেয়, রূপকথার তেপান্তরের মাঠের মোহন ছবি শিশুর শিক্ষা-অপটু মনকে যে-স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়, তাহার সহিত পর যুগে আহৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের আদৌ তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কল্পনাপ্রিয় ও ভাবপ্রবণ শিশুর মনে ছড়ার ছন্দ ও রূপকথার কাহিনী যে-তরঙ্গ সৃষ্টি করিত তাহার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি রবীন্দ্রসাহিত্যে বারে বারে দেখা দিয়াছে। শিশুকবি শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠ লইয়াছিলেন একটি ছড়ার ছন্দ হইতে; গুরুমহাশয়ের নিকট ঘণ্টা ধরিয়া বই লইয়া এ শিক্ষা পাওয়া যায় নাই। এই ছন্দের শিক্ষা কবিজীবনে কি ভাবে সার্থক হইয়াছিল তাহার হিসাব দেওয়া জীবনীকারের সাধ্যের অতীত।

বহুকাল পরে রূপকথার তত্ত্ব সম্বন্ধে কবি স্বয়ং যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় এ বিষয়ের শেষ কথা। "রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ; আর এখনকার দিনের সুচতুর মিথ্যা মুখোশপরা মিথ্যা। শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি, তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটা কোন্‌টুকু।"[১]

শিশুকালের যেসব কথা তাঁহার স্মরণে ছিল, তাহাদের অন্যতম হইতেছে এই ছড়ার রাজ্যে বিচরণের স্মৃতি— বাড়ির খাজাঞ্চি কিশোরী চাটুজ্জের কথা। অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মত বলিয়া বলিয়া বালকচিত্তে তিনি কি-যে একটা চঞ্চলতা সৃষ্টি করিতেন সে কথা জীবনস্মৃতিতে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলাই ছিল আকর্ষণের প্রধান বিষয়। কবি লিখিয়াছেন, "শিশুকালের সাহিত্যরস ভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে; আর মনে পড়ে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদেয় এলো বান'। ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।"

এই স্মৃতিটার ছবি আঁকেন 'ছড়ার ছবি'তে 'বালক' কবিতায়; 'ছেলেবেলা'র মুখবন্ধেও ওই কবিতাটি মুদ্রিত হয়। তার এক জায়গায় আছে—

> কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে—
> বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
> দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া—
> থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া;
> মনে মনে ইচ্ছে হত, যদিই কোনো ছলে
> ভরতি হওয়া সহজ হ'ত এই পাঁচালীর দলে,
> ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
> গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।

বাঙালির ঘরে খুব কম বয়সেই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা আরম্ভ হয়। সেকালে শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল অজ্ঞাত, বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অনাবিষ্কৃত, বাড়িতেই অভিভাবকগণ পড়াশুনার তদারক করিতেন, 'গুরুমহাশয়' ঠাকুর-দালানে পড়াইতেন, বাড়ির ও পাড়ার শিশুরা সকলেই একত্রে পড়িত। আজকালকার শিশুদের চিত্তবিনোদনের

১ অসম্ভব গল্প, সাধনা ১৩০০ আষাঢ়। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৮শ খণ্ড।

জন্য অসংখ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থ, বহুবর্ণে চিত্রিত বই, শিক্ষণীয় খেলার সরঞ্জাম, নানা তথ্যপূর্ণ সচিত্র মাসিকপত্র ও বার্ষিকী পাওয়া যায়। সে-যুগে এসব ছিল সম্পূর্ণ অজানা ; বাড়িতে শিশুদের অনুকূল আবহাওয়া ছিল না, পাঠ্য গ্রন্থাদির অভাব ছিল বিস্তর, অভিযোগ ছিল কম। শিশুদের শিক্ষার জন্য নিত্যবরাদ্দ অন্নব্যঞ্জনের ন্যায় পৃথক ভোজ্যের আয়োজন ছিল শূন্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' ছিল সে-যুগের সর্বজনবিদিত পাঠ্যপুস্তক[১], উহারই সাহায্যে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের সহিত ভাবী কবির প্রথম পরিচয় ঘটে। প্রথম ভাগের 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র যে দিন 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পড়িতেছেন, সে-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা"।

রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার অনতিজ্যেষ্ঠ 'দাদা' সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ পড়াশুনা শুরু করেন এক সঙ্গে, যদিও রবীন্দ্রনাথ উভয় অপেক্ষা বয়সে ছোট। বহুকাল পরে পদ্মাবক্ষে ফাল্গুনের (১২৯৮) এক উতলা দিনে—

> ··· মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
> শৈশবের ; কত গল্প কত বাল্যখেলা,
> এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন —শৈশব সন্ধ্যা, সোনার তরী

প্রায় ঐ সময়ে রচিত 'কঙ্কাল' গল্পে 'তিন বাল্যসঙ্গী যে-ঘরে শয়ন' করিতেন তাহার উল্লেখ আছে। তাঁহারা তিনজনে যে-গুরুর নিকট প্রথম বিদ্যারম্ভ করেন, তাঁহার নাম ছিল মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জিলার লোক। জীবনস্মৃতিতে আছে যে, একদা বড়দের সহিত স্কুলে যাইবার জন্যে তিনি কান্না জুড়িয়া দিলে গুরুমহাশয় প্রবল চপেটাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথের স্কুলজীবনের কাহিনী পাঠের পর সকলেই স্বীকার করিবেন যে "এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী [তাঁহার] জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।" কান্নার জোরে খুব অল্প বয়সে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হইলেন।

স্কুলের সময় ছাড়া বালকদের অন্য সময়ের অনেকখানি কাটিত ভৃত্য-অভিভাবক মহলে। সেখানে যেসকল বই চলতি ছিল, তাহাদের মধ্যে চাণক্যশ্লোক ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছিল বালকদের বোধগম্য। ভৃত্যদের মধ্যে ঈশ্বর ছিল ভূতপূর্ব গ্রাম্য গুরুমহাশয়। ঈশ্বর প্রায়ই সন্ধ্যার পর বালকদিগকে রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া শুনাইত। সে-যুগের সন্ধ্যাটা শিশুদের কাছে বিশেষ সুখের ছিল না ; কারণ ভালো রোশনাইএর বন্দোবস্ত সুলভ হয় নাই, তখনো ঘরে ঘরে রেড়ির তেলের প্রদীপ বা সেজ জ্বলে। কেরোসিনের আলোর চল তেমন হয় নাই ; গ্যাসের আলো শুরু হইয়াছে মাত্র, বিজলি বাতি তো অজ্ঞাতই ছিল। সেই নিরুজ্জ্বল আলোর চারি পাশে বসিয়া বালকেরা ঈশ্বরের নিকট রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনিত।

শিশুকালে রবীন্দ্রনাথকে যেসব পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়ে'র[২] কথা বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার মনে ছিল। আকাশের যে-নীলটা দেখা যায় সেটা যে কোনো বাধা নহে— এই তথ্যটি এই গ্রন্থে পাইয়া বালকের মনের মধ্যে যে একটি অনির্বচনীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার কথা তিনি কখনো ভুলেন নাই।

১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ, ১৮৫৫ এপ্রিল, ১২৬২ বৈশাখ ; ও দ্বিতীয় ভাগ ১২৬২ আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২ সে-যুগে বালকদের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। 'বর্ণপরিচয়' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সীতার বনবাস' পর্যন্ত বহু গ্রন্থ নানা বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য পর্যায়ক্রমে (graded) তিনি লিখিয়াছিলেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়াই অধিকাংশ বই লেখা। ইংরেজি হইতে তিনি যেসব গ্রন্থ অনুবাদ করেন 'বোধোদয়' তাহার অন্যতম, উহা Chamber's *Rudiment of Knowledge*-এর অনুবাদ (১২৫৭)। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষা-শিক্ষার বুনিয়াদ গড়িল য়ুরোপীয় পাঠ্যপুস্তকের তর্জমা হইতে, যাহার বিষয়বস্তু সবই পাশ্চাত্য।

কান্নার জোরে বালক যে-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন, সেটি ছিল সে-যুগের নামকরা স্কুল— গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি[১]। তথায় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পড়েন নাই এবং সেখানকার স্মৃতি তাঁহার মন হইতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। তথা হইতে নর্মাল স্কুলে[২] বালকদিগকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয় ছিল আজকালকার গুরু-ট্রেনিং স্কুলের মত। গুরুদের হাতে-কলমে শিক্ষকতা শিখাইবার জন্য একটি মডেল স্কুল সংলগ্ন ছিল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই স্কুলের ছাত্র। তখন তাঁহার বয়স সাত-আট বৎসরের বেশি নয়, নর্মাল স্কুলের গুরু-বিদ্যার্থীরা তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়।

এই বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন বিলাতি শিক্ষাপ্রণালীর ছাঁচে চলিত; সেটি এ দেশের শিক্ষার্থীদের চিত্ত ও চরিত্র -বিকাশের অনুকূল কি না, এসব প্রশ্ন তুলিয়া শিক্ষাবিভাগের ইংরেজ কর্মকর্তারা মনকে কখনো পীড়িত করেন নাই। শিশু-ছাত্রদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ দিবার জন্য সংগীত একটা উপাদান— এই থিয়োরি অনুসরণ করিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একটা ইংরেজি গানকে রোজ ক্লাস বসিবার পূর্বে ছাত্রদের দিয়া গাওয়াইতেন। প্রত্যহ সেই একটা অর্থহীন একঘেয়ে ব্যাপারে যোগ দেওয়া বালকদের পক্ষে সুখকর ছিল না। সেই ইংরেজি গানের ভাষা বাঙালি ছাত্রদের সমবেত কণ্ঠে আসিয়া কী অদ্ভুত রূপ লইয়াছিল তাহা জীবনস্মৃতিতে কবি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন।

নর্মাল স্কুলের স্মৃতি নানা কারণে তাঁহার নিকট সুমধুর নহে। ক্লাসের মধ্যে শিক্ষক হরনাথ পণ্ডিতের কুৎসিত ভাষা প্রয়োগের অভ্যাস বালকের মনকে এমনি বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি কোনো দিন ক্লাসে তাঁহার প্রশ্নের কোনো জবাব দেন নাই। পরযুগে 'গিন্নি' (হিতবাদী, ১২৯৮) গল্পে তিনি যে শিবনাথ পণ্ডিতের কথা বলিয়াছেন, তাহা হরনাথের নামান্তরমাত্র। ভবিষ্যতের বহু রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্কুল ও স্কুল-মাস্টারদের প্রতি যে তীব্র মনোভাব প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মূল কারণ রহিয়া গিয়াছে জীবনপ্রত্যুষে নর্মাল স্কুলের অভিজ্ঞতার মধ্যে। আবার, ইহাও আশ্চর্য লাগে যে তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে কয়েকটি দেবচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই শিক্ষক বা অধ্যাপক।[৩]

নর্মাল স্কুলের ছাত্রদের সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা বড় মধুর নহে। তাঁহার ন্যায় স্বভাবকোমল সুদর্শন বালকের প্রতি বয়স্ক ছাত্ররা যেরূপ ব্যবহার করিতে প্রয়াস পাইত, তাহাকে তিনি অশুচি মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাঁহার উপর স্কুলের ছাত্রদের অন্যায় আক্রোশের কারণ ছিল অনেক। তখনকার দিনের ঠাকুরপরিবারের ছেলেদের মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা শহুরে সাধারণ ছেলের দলের পক্ষে সহ্য বা স্বীকার করা ছিল কঠিন। ইহারা

১ গৌরমোহন আঢ্য (১৮০৫-৫৪) নিতান্ত জীবিকা অর্জনের জন্য আঠারো বৎসর বয়সে একটি ইংরেজি পাঠশালা খোলেন। অচিরেই উহা কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্র-বাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখনকার দিনে ইংরেজি শিখিতে হইলে খ্রীষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। হিন্দু স্কুল নামেই হিন্দু স্কুল ছিল, উহার শিক্ষা-দীক্ষা দৃষ্টান্ত ও আদর্শ কোনোটিই হিন্দুর কাম্য ছিল না। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় গৌরমোহনের বিদ্যালয়টি হিন্দুসমাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। তৎকালীন হিন্দুবঙ্গের বহু কৃতী পুরুষ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণ এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

২ নর্মাল স্কুল ১৮৪৭ সালে প্রথম স্থাপিত হয়, দুই বৎসর পর উহা উঠিয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিবার পর তাঁহারই চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের বাটীতে এই নর্মাল স্কুল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৫৫ জুলাই ১৭)। রবীন্দ্রনাথ যখন এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তখন উহা বিদ্যাসাগরের আদর্শ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছে। কারণ বহুপূর্বেই তিনি সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিয়া শিক্ষাবিভাগের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়াছিলেন। দ্র. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: হিন্দুজাতি ও শিক্ষা, ২য় ভাগ, পৃ. ৪৮৫-৮৬। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৮, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পৃ. ৫৪।

৩ কবিশেখর কালিদাস রায়: গল্পগুচ্ছে শিক্ষকের কথা, শিক্ষা ও সাহিত্য, ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৫০ মাঘ।

আসিতেন ঘোড়ার গাড়িতে চাকর বা দ্বারবানের সঙ্গে, সাধারণের কাছে সেটা ঠেকিত বড়লোকের দেমাকি চাল। তার পরই চোখে পড়িত তাঁহাদের বেশভূষার পারিপাট্য ও আভিজাত্য। পায়জামা ও তৎসংশ্লিষ্ট পরিচ্ছদ চিরদিনই সাধারণ বাঙালি হিন্দুর কাছে 'মুসলমানি' বলিয়া অবজ্ঞাত; অথচ প্রতিদিন সে যে-পোশাক পরিয়া থাকে, তাহার বিশ্লেষণ করিলে সে দেখিতে পাইত যে, ধুতি উড়নি ও চটি ছাড়া সে আর যাহা-কিছু ব্যবহার করে, তা সমস্তই পরদেশী বা বিদেশী। ঠাকুরবাড়ির বালকদের কথ্য ভাষার মধ্যে প্রকাশ পাইত একটি মার্জিত রুচি, যাহা কেবল অভিজাত শিক্ষার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব। কলিকাতার খাসবাসিন্দাদের বিকৃত উচ্চারণাদি হইতে ইঁহাদের ভাষার বৈশিষ্ট্য ছিল খুব স্পষ্ট। এইসব কারণেই, আমাদের মনে হয়, বালকদের উপর বিচিত্র ধরণের উপদ্রব চলিত।

বাহিরে যাত্রা

ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের চলাফেরার ভৌগোলিক পরিধি ছিল খুবই সীমায়িত; কলিকাতার মধ্যে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ছাড়া শহরের বাহিরে কখনো যান নাই। তাই জোড়াসাঁকোর অবরুদ্ধ গতানুগতিক জীবনের অভ্যস্ত ধারা হইতে মুক্তি পাইয়া যেদিন পেনেটিতে[১] ছাতুবাবুর[২] বাগানবাটীতে ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় তাঁহাদিগকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল, সেটি তাঁহার জীবনের স্মরণীয় দিন; তখন বালকের বয়স দশ বৎসর হইবে। কলিকাতার বাহিরে ইহাই তাঁহার প্রথম যাত্রা। পরে বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ বহুবার বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু বাহিরের জগতের সহিত এই প্রথমপরিচয়ের তীব্র আনন্দানুভূতি তিনি কখনো বিস্মৃত হন নাই। জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারাগাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত।"—যৌবনে (পুনর্মিলন, প্রভাত-সংগীত কবিতায়) লিখিয়াছিলেন—

> আরেকটি ছোট ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
> সম্মুখে পেয়ারাগাছ ভরে আছে ফলে ফুলে।
> বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা,
> জাহ্নবীপ্রবাহ পানে চেয়ে আছি সারা বেলা।

পেনেটির বাগানে আসিয়াও চলাফেরার নিষেধ শিথিল হইল না। নিকটে বাংলার পল্লীগ্রাম, সেখানেও প্রবেশের অনুমতি নাই। "আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই।"…"কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যেসব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।" তাই লিখিয়াছিলেন—

> সাধ যেত যাই ভেসে
> কত রাজ্য কত দেশে,
> দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ
> নিয়ে যাবে কতদূর।

অবশেষে একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরিতে হইল; "দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার

১ পেনেটি বা পানিহাটি। কলিকাতার উত্তরে খড়দহ ও সোদপুরের মধ্যবর্তী স্থান।

২ ছাতুবাবু (সাতু)— আশুতোষ দেব (১৮০৪-৫৬)। ধনী বণিক রামদুলাল দেবের পুত্র। দানের জন্য বিখ্যাত।

প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।" নর্মাল স্কুলে বালকদের যাহা পড়িতে হইত তাহার চেয়ে অনেক বেশি শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল বাড়িতে। বালকদের শিক্ষাদান-বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ। তাঁহারই নির্দেশ ও সময়সূচী মতে ছেলেদের বিচিত্র বিষয়ের গৃহশিক্ষা চলিত। ভোরের অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া তাহাদিগকে লংটি পরিয়া প্রথমেই হীরা সিং নামে এক কানা শিখ পালোয়ানের সহিত কুস্তি করিতে হইত। তার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া লেখাপড়া আরম্ভ। নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল তাঁহাদের পড়াইতেন। সকাল ছয়টা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত বালকদের শিক্ষার ভার ছিল তাঁহার উপর। পাঠ্য ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ (১৮৫২-৫৬), রামগতি ন্যায়রত্নের বস্তুবিচার ও সাতকড়ি দত্তের প্রাণিবৃত্তান্ত, মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধকাব্য ; এ ছাড়া জ্যামিতি গণিত ইতিহাস ভূগোল তো ছিলই। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিক -শিক্ষক তাঁহাদের লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার পর ইংরেজি পড়াইবার জন্য আসিতেন অঘোরবাবু। মোটকথা প্রত্যুষ হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত কঠিন শারীরিক ও মানসিক ব্যায়ামের মধ্যে তাঁহাদের নর্মাল স্কুলের যুগ কাটে।

রবিবার সকালে গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট গান শিখিতে হইত এবং তা ছাড়া মাঝে মাঝে সীতানাথ ঘোষ[১] আসিয়া সামান্য যন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। যন্ত্রসাহায্যে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া সে-যুগে শিক্ষাব্যবস্থায় নূতন জিনিস, দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় ধনীর পক্ষেই পুত্রাদির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, এই শিক্ষাটি তাঁহার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল এবং যে রবিবারে সকালে বিজ্ঞানশিক্ষক না আসিতেন সে রবিবার বালকের কাছে রবিবার বলিয়া বোধ হইত না।

অঘোরবাবু নামে যে-শিক্ষক সন্ধ্যার পর বালকদিগকে ইংরেজি পড়াইতেন, তিনি ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। শিক্ষাকে সরস করিবার ও ছাত্রগণকে আনন্দ দিবার জন্য তাঁহার অপরিসীম চেষ্টা ছিল। তাঁহার সাহায্যে বালকরা একদিন মরা মানুষের কণ্ঠনলীর সাহায্যে স্বরযন্ত্রের সমস্ত ক্রিয়াকৌশল অবগত হন। ইহাতে বালকের "মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল।" আর-একদিন শিক্ষক মহাশয় তাঁহাদিগকে মেডিক্যাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ-গৃহে লইয়া যান ; সেখানে মেঝের উপর একখণ্ড পা পড়িয়া ছিল। "টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল ; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই ; কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়া ছিল,... সেই মেজের উপর পড়িয়া থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।" বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই বাল্যবয়সেই হইয়াছিল।

বাল্যকালের এইসব বিদ্যায়োজনকে রবীন্দ্রনাথ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়াছেন ; আমাদের মতে বিজ্ঞানের প্রতি কবির আজীবন অনুরাগের বুনিয়াদ গড়িয়া ওঠে এই বাল্যদিনে, এই সামান্য শিক্ষার ভিতর দিয়া। পরযুগে তাঁহার সম্পাদিত বা পরিচালিত সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার সংকলিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা প্রসঙ্গকথা এই বাল্যবয়সে বিজ্ঞানানুরাগের অভিপ্রকাশ মাত্র। বৃদ্ধবয়সে 'বিশ্বপরিচয়' (১৩৪৪) রচনা আমাদের মতবাদেরই সমর্থক। বাল্যকালে আমের আঁটি ও আতার বীচির পরীক্ষার কথা লইয়া তিনি নিজেকে ঠাট্টা করিয়াছেন ; কিন্তু পরযুগে কৃষি লইয়া তিনি যে কতরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত আলোচনা কেহ এখনো করেন নাই। বৃদ্ধবয়সে আমের চারাকে লতানে গাছ করিবার জন্য যে-উদ্যম দেখিয়াছি, তাহা কেবল বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। তাঁহারই সেই পথ ধরিয়া তাঁহার পুত্র

১ সীতানাথ ঘোষ (১২৪৮-৯০)। ভুলক্রমে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে সীতানাথ দত্ত লিখিয়াছেন। ইনি এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দ্র. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : পিতৃদেব সম্বন্ধে জীবনস্মৃতি, প্রবাসী, ১৩১৮ মাঘ পৃ. ৩৮৮। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক-তালিকায় নাম পাইলাম না। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বৈজ্ঞানিক সীতানাথ, প্রবাসী ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ পৃ. ২১৩-২১৫।

রথীন্দ্রনাথ তাঁহার শান্তিনিকেতনের বাগানে বিচিত্র ফলের গাছকে কিভাবে লতানে গাছে পরিণত করিয়াছেন, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন ; আম লিচু পেয়ারা লেবু কুল সপেতার লতানে গাছে প্রচুর ফল হইতেছে।

যাহাই হউক, বালকদিগকে সর্বশাস্ত্রবিশারদ করিবার জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকগণের সাধু উদ্যম যে-হতভাগ্যদের কল্যাণার্থে অনুসৃত হইতেছিল, তাহাদের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত 'মেঘনাদবধকাব্যে'র প্রতি যে বীতশ্রদ্ধা জন্মিল এবং শিক্ষকদের সম্বন্ধে যে বিভীষিকা ও অশ্রদ্ধার বীজ উপ্ত হইল, তাহা কবির সাহিত্যজীবনে নিরর্থক হয় নাই। শৈশবের এই বেদনাকে বহু বৎসর পরে 'অসম্ভব গল্পে'র[১] ভূমিকায় যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক প্রাইভেট-টিউটর-উপদ্রুত হতভাগ্য মানবকের অব্যক্ত মনের কথা। "বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাস্টার আসিবে না।··· তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোনো আবশ্যক নাই, কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাস্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া।··· বিশেষ কোনো নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায়, মাস্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমস্ত আশাবাষ্প একমুহূর্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল।"

বাঁধাবরাদ্দ খাদ্য দ্বারা শরীর রক্ষা পায় বটে, কিন্তু মানুষের মন তৃপ্তি মানে না। তাই দেখা যায়, খাদ্যের চেয়ে অখাদ্যের দিকে তার লোলুপতা বেশি। স্কুলের ধরাবাঁধা পাঠ্যতালিকার মধ্যে হতভাগ্য ছাত্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিবার চেষ্টা হয় বলিয়াই অপাঠ্য বইএর প্রতি তাহার টান এত প্রবল। উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে বাংলার শিশুদের মনের খোরাক মিটাইতে পারে এমন গ্রন্থের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সেইজন্য ছেলেবেলায় হাতের কাছে বাংলায় লেখা যাহা আসিত, তাহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য! যে-কয়খানি বই বালকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহাদের কথা তাঁহার স্মরণে ছিল, যেমন মৎস্যনারীর কথা, সুশীলার উপাখ্যান[২] ও রবিন্সন্ ক্রুসোর[৩] কথা। শেষোক্ত বইখানি সম্বন্ধে তিনি জীবনস্মৃতির খসড়ায় উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন।

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে এমন দুই-চারিখানি পত্রিকা ও গ্রন্থ হাতে পড়িয়াছিল, যাহা তাঁহার মনে যথার্থ আনন্দদান করিতে পারিয়াছিল ; ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ[৪] ও অবোধবন্ধু-পত্রিকা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১২২৮-৯৮) তাঁহার যৌবনে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' বলিয়া একখানা সচিত্র মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন। অনিয়মিতভাবে ছয় বৎসর (১২৫৮-৬৪) প্রকাশিত হয়।[৫] তাহারই বাঁধানো একভাগ হেমেন্দ্রনাথের

১ অসম্ভব গল্প, দ্র. গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৮। সাধনা ১৩০০ আষাঢ়, পৃ. ১০৩-১১৫। ১৩০১এ 'বিচিত্র গল্পে'র মধ্যে 'একটি ক্ষুদ্র ও পুরাতন গল্প' নামে ইহা মুদ্রিত হয়। ১৩১৪ সালের বিচিত্র প্রবন্ধে 'অসম্ভব কথা' নামে সন্নিবেশিত হয়। অতঃপর আর কোনো গল্পসংকলনের মধ্যে ইহার স্থান হয় নাই। বিশ্বভারতী সংস্করণে পুনরায় স্থানলাভ করিয়াছে।

২ সুশীলার উপাখ্যান, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, বেঙ্গল ফ্যামেলি লাইব্রেরী, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৬১-৬৫।

৩ রবিন্সন্ ক্রুসো, D. Defoe. (1659-1731) Robinson Crousoe (1719)। জন্ রবিন্সন্ কর্তৃক অনূদিত, শ্রীরামপুর ১৮৫২, বেঙ্গল ফ্যামেলি লাইব্রেরী, ৩য় সংস্করণ। ১৮৬০।

৪ "কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, একত্রে বাঁধানো বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ, আরব্য-উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, বাংলা রবিন্সন্ ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবন-চরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম।" —বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনা ১৩০১, বৈশাখ, পৃ. ৫৪০।

৫ ৭ম পর্ব, ১৭৮৩ শক, ১২৬৮ বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদন করেন। তাহার পর বন্ধ হইয়া যায়।

আলমারিতে ছিল, সেটি রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেন। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন, "বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া নর্হ্বাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।"

তাঁহার বড়দাদার আলমারিতে বহু মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে ছিল 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা। আলমারিতে বালকদের হাত দেওয়া ছিল নিষেধ। কিন্তু 'অবোধবন্ধু'র বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া বালক সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। স্কুল ফাঁকি দিয়া মধ্যাহ্নে অবোধবন্ধু হইতে 'পৌলবর্জিনী'র[১] বাংলা অনুবাদ পাঠ করিতে করিতে বালকের হৃদয় বেদনায় কি ভাবে অভিভূত হইয়া যাইত, তাহার কথা জীবনস্মৃতিতে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাহিরের প্রকৃতি তখনো বালকের নিকট অপরিচিত, তাই পৌলবর্জিনীতে সমুদ্রতীরস্থ অরণ্যদৃশ্যাবলী তাঁহার নিকট অনির্বচনীয় সুখস্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত। পৌলবর্জিনীর কথা এ-যুগের পাঠকশ্রেণীর নিকট অজ্ঞাত। সত্তর বৎসর পূর্বে বাংলায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ছিল কম। তাই এই করুণ উপাখ্যানটি তরুণ অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য[২] ফরাসি ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া অবোধবন্ধুতে প্রকাশ করেন। অবোধবন্ধুর গদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য ছিল ; ইহার ভাষা "স্কুলের পড়ার অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হইত না। বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত।··· বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।"[৩] অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত পৌলবর্জিনীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার মধ্যে অস্পষ্ট নহে, বনফুল কাব্য পাঠ করিলে সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

এই পত্রিকায় বালককবি বাংলার তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যের প্রথম পরিচয় লাভ করেন। পৌলবর্জিনীতে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, "বিহারীলালের কাব্যের সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত" হইয়া তাঁহার কবিতাকেই কাব্যাদর্শ করিয়া লইলেন। অবোধবন্ধুতে বিহারীলালের নিসর্গসন্দর্শন বঙ্গসুন্দরী সুরবালা কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এইসব রচনার মধ্যে যেসব শ্লোকের বর্ণনা এবং সংগীত মনশ্চক্ষের সম্মুখে সুন্দর চিত্রপট উদ্‌ঘাটিত করিয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তোলে সেগুলির কথা বড় হইয়াও তাঁহার মনে ছিল। বিহারীলালের কবিতা পাঠ করিয়া বাল্যকালে তাঁহারও মন হু হু করিয়া উঠিত। "ঝরনার ধারে জলশীকরসিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল দীর্ঘকোমল ঘনঘাসের মধ্যে দেহ নিমগ্ন করিয়া নিস্তব্ধভাবে জলকলধ্বনি শুনিতে পাওয়া"র কল্পনাও বালককে মুগ্ধ করিত। আবার পল্লীগ্রামের সুখময় চিত্রে কলিকাতার ধনীগৃহের নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে আবদ্ধজীবন বালকের মন যে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কিছু ছিল না। অট্টালিকার অপেক্ষা বিহারীলালের বর্ণিত "নড়বোড়ে পাতার কুটীরে, স্বচ্ছন্দে রাজার মতো ভূমে আছি নিদ্রাগত" ইত্যাদি পংক্তি যে অধিক সুখের এ মায়া বালকের মনে কে সৃষ্টি করিল। বিহারীলালের এই শ্রেণীর প্রকৃতিবর্ণনা কল্পনাকুশল বালককে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল।

আর-একটু বড় বয়সে 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) হাতে পড়ে, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স এগারো বৎসর। বহু বৎসর পরে বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক মনোভাব না হইলেও প্রণিধানযোগ্য : "পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায়

১ Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) Paul et Virginie (1787)।

২ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, পৌল ভর্জ্জীনী, অবোধবন্ধু পত্রিকা, ১২৭৫ পৌষ-চৈত্র।

দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, পৃ. ৩০-৩১।

৩ বিহারীলাল, 'আধুনিক সাহিত্য'।

গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেইসব বালক-ভুলানো কথা— কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।”[১] বঙ্গদর্শনে যে কেবল বঙ্কিমের উপন্যাস প্রকাশিত হইত তাহা নহে; সে-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিবিধ বিষয়ের রচনাসম্ভারে উহা পূর্ণ থাকিত। রবীন্দ্রনাথের বয়স অনুপাতে তাঁহার কল্পনা ও বোধশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে precocious child তিনি ছিলেন তাই; সুতরাং তাঁহার পক্ষে বঙ্গদর্শনের উপন্যাস ও গল্প ছাড়া অন্যান্য রচনাসমূহ পাঠ করা অসম্ভব ছিল না। বঙ্কিমের গদ্য রচনা হইতে যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। এইসব সমসাময়িক সাহিত্য ছাড়া যে-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহা হইতেছে বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্য। আমরা অন্যত্র সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

নর্মাল স্কুলে ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস পর্যন্ত তাঁহাদের পড়া চলে। কিভাবে নর্মাল স্কুলের পড়া হঠাৎ শেষ হয় ও বাল্যশিক্ষার অবসান ঘটে, জীবনস্মৃতিতে সে কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত আছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নর্মাল স্কুলে পড়িবার ফলে বাংলা ভাষাটা বালকদের বেশ ভালো ভাবেই আয়ত্ত হইয়াছিল; তখন চারি দিকে খুব করিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম চলিতেছে, হেমেন্দ্রনাথ— যাঁহার উপর বালকদের পড়াশুনা দেখিবার ভার ছিল, তিনি— সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া তাহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের পঠনপাঠন ব্যবস্থা করেন। ফলে বালকদের বাংলা ভাষার বুনিয়াদ হয় পাকা, বিষয়জ্ঞানও একেবারে কাঁচা হয় নাই। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও শক্ত ভিত্তি গড়িয়া ওঠে। মাতৃভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত ছিল বলিয়াই উত্তরকালে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পরযুগে রবীন্দ্রনাথ যখন নিজ বিদ্যায়তনে শিক্ষাসম্বন্ধে নূতন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তখন ছাত্রদের একটা বয়স পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা মুলতবী রাখিয়া বাংলার মধ্য দিয়া সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের বুনিয়াদ পত্তন করিবেন, এই ইচ্ছা মাঝে মাঝে প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ইচ্ছা কখনো সংকল্পে পরিণত হয় নাই বলিয়া গতানুগতিকের পথ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবনে বাংলা ভাষার বুনিয়াদ পত্তন হইবার জন্য তিনি তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী ছিলেন এ কথা তিনি কোনো দিন জীবনে বিস্মৃত হন নাই।

কিন্তু বাঙালির ঘরে যে জন্মিয়াছে তাহাকে ইংরেজি শিখিতেই হইবে। সুতরাং ডি ক্রুজ (De Cruz) সাহেবের বেঙ্গল অ্যাকাডেমি নামে ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ে বালকদের ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।

ইংরেজি ভালো করিয়া বলিতে কহিতে শিখিতে হইলে সাহেবের কাছেই শেখা ভালো, এ ধারণা তখনো ছিল এখনো আছে; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ধারণা পোষণ করিতেন, নিজ সন্তানদের শিক্ষার জন্য লরেন্স নামে ইংরেজকে নিযুক্ত করেন; শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েও সে ব্যর্থ চেষ্টা যে মাঝে মাঝে করেন নাই তাহা নহে।

বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে পড়ার থেকে পলায়নটা হইত বেশি; বিদ্যালয়ের অভাবগ্রস্ত কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে ধনী ছাত্রদের নিকট হইতে মাসিক দক্ষিণাটা নিয়মিত পাইতেন বলিয়া তাহাদের উপস্থিতি ও পাঠোন্নতি সম্বন্ধে বেশি কড়াকড়ি করিতেন না। ফিরিঙ্গি ছেলেদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, তাহারা নর্মাল স্কুলের ছাত্রদের ন্যায় গ্রাম্য ছিল না, ইহারা ছিল ‘দুর্বৃত্ত’।

বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে বালকদের শিক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ এক অভাবনীয় ঘটনায় বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেকখানি পরিবর্তন হইল, সেটি হইতেছে হিমালয়যাত্রা।

এই বিদ্যালয়ের একটি বাঙালি ছাত্র সম্বন্ধে কবি জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন; সে ম্যাজিক দেখাইতে

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ‘আধুনিক সাহিত্য’, রবীন্দ্ররচনাবলী ৯ম খণ্ড।

পারিত বলিয়া ছাত্রমহলে তাহার অশেষ প্রতিপত্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাহার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাহাকে বৃদ্ধবয়সে স্মরণ করিয়া 'গল্পসল্পে' ম্যাজিশিয়ানের গল্প সৃষ্টি করেন। সাহিত্যে কবি তাঁহার অনামা বন্ধুকে অমর করিয়া গিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার ঘরোয়া বইএ এই লোকটির কথা লিখিয়াছেন, নাম তাঁহার হরিশ্চন্দ্র হালদার— বন্ধুমহলে তিনি হ. চ. হ. নামে খ্যাত ছিলেন। বহুকাল পরে বঙ্গদর্শনে (১৩০৯) 'দর্পহরণ' গল্পের নায়কের নাম দেখি হরিশ্চন্দ্র হালদার।[১]

রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁহার কাব্যখ্যাতি তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার কাব্যরচনার যে সামান্য ইতিহাস জানা যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যশক্তি কখন কিভাবে বিকশিত হইয়াছিল, তাহার সন-তারিখ-দেওয়া-ইতিহাস কখনো পাওয়া যাইবে না। শিশু কবে কখন অস্ফুট কাকলি ত্যাগ করিয়া অর্থযুক্ত শব্দ কহিল, এই প্রশ্নের উত্তরদান যেমন কঠিন, কবি প্রথম কবিতা কবে রচনা করিয়াছিলেন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তদপেক্ষা কম কঠিন নহে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে তাঁহার বাল্যরচনার যে-সব নমুনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও স্মৃতিমাত্র, ইতিহাস নহে; সুতরাং তাহাকেই আদিরচনার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনো কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে 'কবিতা-রচনারম্ভ' পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, "আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ[২] আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।' বলিয়া, পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।"

তাঁহার এই আত্মীয়টি বালকের মধ্যে এমন-কিছু লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়া তিনি ইঁহাকে পদ্যরচনার রহস্য ধৈর্যের সঙ্গে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর বালকের পদ্য লিখিবার ভয় ভাঙিয়া গেল। তার পর কোনো-এক কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিয়া তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলি অসমান রেখা টানিয়া বড় বড় কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিলেন। বিশ্বকবির কাব্যরচনার সূত্রপাত হইল এমনি দীনভাবে।

নর্মাল স্কুলে তাঁহার কবিখ্যাতি রাষ্ট্র হয়; হেডমাস্টার সাতকড়ি দত্ত মহাশয় বালককবিকে কিভাবে পদ্যরচনায় উৎসাহিত করেন এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ গোবিন্দবাবুর আদেশে উচ্চাঙ্গের 'সুনীতি'মূলক কবিতা লিখিবার পর যেসব ঘটনা ঘটে, তাহা কবি স্বয়ং বহুবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে ও হিমালয়ে

১২৭৯ সালে শীতকালের প্রারম্ভে (১৮৭২ শেষভাগে) দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়-ভ্রমণান্তে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন— কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের উপনয়ন-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঠাকুরপরিবারে এতাবৎকাল হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণদের লোকাচার ও ধর্মসংস্কারসমূহ নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হইত।[৩] এখন পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদের উপনয়ন-সংস্কার প্রাচীন হিন্দুমতেই সম্পাদিত হইয়াছিল। সোমেন্দ্রনাথ প্রমুখ বালকদের (সোমেন্দ্র রবীন্দ্র ও সত্যপ্রসাদ) উপনয়ন

১ 'বালক' পত্রিকার (১২৯২) কতকগুলি লিথো ছবির তলায় আছে H. C. Halder। ১৮৮১ সালে ইনিই কি কালাপাহাড় নামে এক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন ? দ্র. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭।

২ জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৯), গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কাদম্বিনী দেবীর পুত্র।

৩ দেবেন্দ্রনাথের যৌবনে উপবীত-ত্যাগ করার প্রশ্ন আসিয়াছিল (১৮৫৪)। দ্র. আত্মজীবনী, পৃ. ২১৬ এবং পরিশিষ্ট ৫৩ 'পলতা'র বাগানে ব্রাহ্মদের মেলা ও উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব, পৃ. ৪৫২-৪৫৪।

যাহাতে অ-পৌত্তলিকভাবে ও বৈদিকমতে অনুষ্ঠিত হয়, দেবেন্দ্রনাথ তাহারই আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহিত দিনের পর দিন বসিয়া বৈদিক মন্ত্র চয়ন করিয়া উপনয়ন-অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সংকলন করিলেন। লৌকিক হিন্দু-আচার অনুসারে উপনয়নাদির সময়ে শালগ্রাম-শিলার প্রয়োজন অনিবার্য; আবার উহা বৈদিক দীক্ষাবিধি বলিয়া নানা যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান ইহার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। উপনয়নের সহিত একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতীকাদির পূজা ও হোমযজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বর্জন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ উপনয়নবিধি প্রণয়ন করিলেন। তদনুযায়ী বালকদের উপনয়ন হইল; তৎপূর্বে বহুদিন ধরিয়া সেইসব মন্ত্র বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করাইয়া বালকগণকে শেখানো হইয়াছিল।

মাঘোৎসবের[১] কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন[২] হয়, তখন তাঁহার বয়স এগারো বৎসর নয় মাস। এই অনুষ্ঠানে বেদান্তবাগীশ মহাশয় পুরোহিতের ও দেবেন্দ্রনাথ আচার্যের কার্য করেন। মহর্ষি বেদি হইতে যে-উপদেশ প্রদান করেন তাহাতে উপনয়নের একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বেশ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংস্কৃত ও সংশোধিত উপনয়ন-বিধি প্রাচীন বা নবীন দলের কাহারো মনঃপূত হইল না। নূতন উপনয়ন-পদ্ধতি গতানুগতিক আচার ও প্রচলিত মন্ত্রাদির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া প্রাচীনপন্থীদের পক্ষে মানিয়া লওয়া কঠিন হইল; আবার বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের দিক হইতে উপনয়নের ন্যায় প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারকে নবীন ব্রাহ্মদের পক্ষে সমর্থন করাও অসম্ভব। মহর্ষির একান্ত অনুগত ধর্মবন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মনে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে দ্বিধা একবার জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিরাট হিন্দুজাতীয়তার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন বলিয়া ইতিপূর্বে যেমন অনেক অযৌক্তিকতার সহিত আপস করিয়া লইয়াছিলেন, এবারও তাহাই করিলেন। সেইজন্য তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে এই উপনয়ন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল, "শ্রীমৎ প্রধান আচার্য প্রাচীন উপনয়ন-পদ্ধতি যতদূর ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত করা যায় তাহা করিলেন। পূর্বে যে-অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রকাশিত হয় তাহাতে উপনয়ন বলিয়া একটি ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্রাহ্ম উপদেষ্টার নিকটে কোনো বালককে আনিয়া তাঁহার উপর তাহার ধর্ম ও শিক্ষার ভার অর্পণ করা।· ·কিন্তু নূতন প্রবর্তিত উপনয়ন-পদ্ধতিতে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাপূর্বক উপবীত গ্রহণ করার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। পৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সকল নিয়ম পালন করিয়া উপনয়নক্রিয়া সম্পাদিত হয়।· ·প্রথমে আমি নূতন উপনয়ন-প্রথার বিপক্ষে ছিলাম, কিন্তু এরূপ উপনয়ন ব্যতীত আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সর্বাবয়ব সম্পন্ন হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম।" —পৃষ্ঠা ১৯৮-৯৯।

ব্রাহ্মণমাত্রেই জানেন যে উপনয়নের পর নূতন ব্রহ্মচারীকে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল।" মন্ত্রজপের সময় তিনি গ্রহমণ্ডল-সমেত আকাশের বিরাট রূপকে মনে আনিতে চেষ্টা করিতেন। বিশ্বানুভূতির চেষ্টা এই প্রথম; তাঁহার বয়সের বালকের পক্ষে যেটুকু সম্ভব উহা তাহাই মাত্র, তদতিরিক্ত কিছু কল্পনা করিবার কারণ নাই।

রবীন্দ্রনাথের উপর ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থোদ্ধৃত উপনিষদাদি মন্ত্রের ও বিশেষ ভাবে গায়ত্রীমন্ত্রের প্রভাব অতীব গভীর। রাজা রামমোহন রায়ের ও মহর্ষির জীবনে এই মন্ত্রের কী প্রভাব ছিল তাহা তাঁহাদের জীবনচরিত-পাঠকের নিকট অবিদিত

১ ৪৩তম মাঘোৎসবের সময়ে 'সুধা-বর্ষী বালকবালিকারা মধুর স্বরে নূতন দুইটি সংগীত করিলেন।' গান দুইটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত 'শঙ্কর শিব সঙ্কটহারি' ও বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়-কৃত 'জয় জগজ্জীবন জীবনপাতা হে'। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৮ম কল্প, ২য় ভাগ, ১৭৯৪ শকাব্দ (১২৭৯) ফাল্গুন, পৃ-১৮১। রবীন্দ্রনাথ বালকবালিকাদের মধ্যে ছিলেন বলিয়া মনে হয়। বৃদ্ধবয়সে এই গানের সুর তাঁহার মনে ছিল।

২ ১২৭৯ মাঘ ২৫।১৮৭৩ ফেব্রুয়ারি ৬। ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান, উপনয়ন, সমাবর্তন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৪ শক, চৈত্র, পৃ ২০৩-৬।

নাই। দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন প্রাতে, অভুক্ত অবস্থায়, দশবার গায়ত্রীমন্ত্র জপের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা[১] করিতেন। শিষ্য ও পুত্রাদির মধ্যে এই পদ্ধতি প্রচলিত করিবার চেষ্টায় কোনো দিন তিনি শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা পাঠে জানা যায় যে সংস্কৃত মন্ত্র ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ যেমন অকৃত্রিম তেমনি গভীর। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একসময় পর্যন্ত উপনয়নাদি হিন্দুসংস্কারে বিশ্বাসবান ছিলেন; কারণ আমরা দেখিতে পাই তিনি যথাবিধি জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করেন; কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ-সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জামাতাকে উপবীত ধারণের জন্য বৃথাই জিদ করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল এইসব সামাজিক আচারকে স্বয়ং মানিয়া চলিয়াছিলেন। প্রাচীন মন্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে তাঁহার মজ্জাগত সামাজিক সংস্কারসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই মনের মুক্তির ইতিহাস আমরা উন্মোচন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

উপনয়নের পর মুণ্ডিত মস্তকে কেমন করিয়া ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ে যাইবেন এই ভাবনায় যখন বালক অত্যন্ত ম্রিয়মাণ, এমন দুশ্চিন্তার সময়ে তিনি খবর পাইলেন পিতা এবার তাঁহাকে লইয়া হিমালয়ে যাত্রা করিবেন। বিদেশে যাত্রা এই প্রথম; মনে কী যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা প্রৌঢ়কালেও তিনি ভুলিয়া যান নাই; তবে যে-সামান্য ঘটনাটি খুব স্পষ্ট করিয়া মনে ছিল সেটি হইতেছে যে, তাঁহার জন্য এই প্রথম নূতন পোষাক প্রস্তুত হইল, এমন-কি মাথার জন্য জরি-দেওয়া টুপিও আসিল।

হিমালয়ে যাইবার পূর্বে কয়েকদিন বোলপুরে থাকিবার কথা হইল। কলিকাতা হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বীরভূম জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামের সহিত দেবেন্দ্রনাথের কি সম্বন্ধ তাহা এইখানে বিবৃত করা প্রয়োজন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারব্যপদেশে বাংলার নানা স্থানে ভ্রমণকালে বহু ধনী মানী ব্যক্তির সহিত পরিচিত ও প্রীতিবদ্ধ হন। সেই সময়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম রায়পুর ধনে-জনে পূর্ণ ছিল; তথাকার সিংহ-পরিবার ছিলেন সর্ব বিষয়ে নেতৃস্থানীয়। দেবেন্দ্রনাথ একদা রায়পুর যাইতেছিলেন; পাল্‌কি হইতে তাঁহার চোখে পড়ে উত্তরদিকে সীমাশূন্য প্রান্তর; সেই প্রান্তরে দুটি মাত্র ছাতিম বা সপ্তপর্ণী গাছ ও বন্য খর্জুর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িত না; সেই সীমাহীন প্রান্তর তাঁহার মন ভুলাইল।

সেই প্রান্তরের মধ্যে ছিল একটি দিঘি বা বাঁধ (ভুবনডাঙ্গার বাঁধ বা ভুবন-সাগর) এবং তাহার নিকটে ছিল কয়েক ঘর দরিদ্রের বাস। এই প্রান্তরে ছাতিমগাছের নিকট বিশ বিঘা জমি তিনি রায়পুরের জমিদারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লন (১২৬৯ ফাল্গুন ১৮)। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স দুই বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। কালে দেবেন্দ্রনাথ তথায় একখানি ক্ষুদ্র একতল অট্টালিকা নির্মাণ করেন, উত্তরকালে উহা শান্তিনিকেতন অতিথিশালায় পরিণত হয়। সময় সময় মহর্ষির পুত্রদের বা কন্যাজামাতাদের কেহ কেহ গিয়া কয়েকদিন করিয়া বাস করিয়া আসিতেন, শান্তিনিকেতন নাম তখনো হয় নাই।

দেবেন্দ্রনাথ কোন্ সময়ে কোন্ পথে বোলপুর আসেন তাহা এক সমস্যা হইয়া আছে। লুপলাইনের রেলচলাচল ১৮৬০ সালের পূর্বে হয় নাই মনে হয়। কারণ অজয় সেতু হইতে সাঁইথিয়া পর্যন্ত রেলপথ ১৮৫৯ সালের ৩রা অক্টোবর খোলা হয়। কিন্তু রায়পুরের সিংহপরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল ইতিপূর্বেই। ১৮৫৯ জুলাই ২৭ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ সিমলা পাহাড় হইতে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন: "তুমি শুনিয়া অবশ্য আহ্লাদিত হইবে যে বীরভূম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ ব্রহ্মরসের আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন।"

১ মহর্ষির আত্মজীবনী। ২৭ পরিশিষ্ট।

হিমালয় হইতে নামিয়া আসিবার পর দেবেন্দ্রনাথ রায়পুর আসেন; আমাদের মনে হয় নৌকাযোগে ভাগীরথী দিয়া কাটোয়া হইয়া গুনুটিয়ার ঘাটে নামেন ও সেখান হইতে পালকী-পথে রায়পুর আসেন। চীপ্ সাহেব নির্মিত সুরুল-গুনুটিয়া রাস্তার পাশেই বর্তমান শান্তিনিকেতন ও ছাতিম গাছ দুটি পড়ে। বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুর যাইতে শান্তিনিকেতন পথে পড়ে না।

পরবর্তী যুগে যে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের জীবনের কর্মকেন্দ্র ও সাধনপীঠ হয়, বাল্যকালে সেই স্থানকে তিনি কী চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা জীবনস্মৃতিতে লিখিয়া গিয়াছেন। এই বোলপুরে পিতার সহিত পুত্রের, প্রবীণ সাধকের সহিত কিশোর শিল্পীর যেন প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে বাসকালে বালক পিতার বিবিধকার্যে সহায়তা করিয়া আত্মগৌরব বোধ করিয়াছিলেন। পিতাও পুত্রের উপর প্রচুর দায়িত্ব ও অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। উত্তরকালে এই শান্তিনিকেতন আশ্রমের ভার পিতার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পিতার আরব্ধ কার্য সার্থক করেন। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মাদর্শ রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া উজ্জীবিত হইয়া নবকলেবরে বিশ্বধর্ম-রূপে বিশ্বভারতীর মধ্যে মূর্তি গ্রহণ করে।

শান্তিনিকেতনে বাসকালে পিতার কাছে পাঠগ্রহণ ব্যতীত বালক-কবির কাব্যরচনা চলিতেছে: "শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা" জন্মিয়াছিল। শিশু-নারিকেলগাছের তলায় কাঁকরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া বালকের কবিতা লিখিয়া খাতা ভরাইতে ভালো লাগে। "তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য" লিখিয়া ফেলিলেন। কবি লিখিয়াছেন, "তাহার প্রচুর বীররসও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।" তবে আমাদের মনে হয় এই কাহিনীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বোধহয় রুদ্রচণ্ড নামক নাটকের মধ্যে শোনা যায়, রুদ্রচণ্ড পৃথ্বীরাজের এক প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম।

শান্তিনিকেতনে এই আগমন জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। তিনি লিখিয়াছেন, "শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি।··আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথমবয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।··সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম— এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল-শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শান্তি স্মৃতির সম্পদ্‌রূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে-বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য।"[১]

ফাল্গুনের শেষদিকে মহর্ষি পুত্রকে লইয়া অনুচরাদিসহ হিমালয়-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন-প্রত্যুষের যে কয়টি ঘটনা তাঁহার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহার অন্যতম হইতেছে এই হিমালয়যাত্রা; জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃতভাবেই উহা বর্ণিত হইয়াছে; এমন-কি সামান্য একখানি পত্রে যখন একবার তাঁহাকে নিজ জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে হয়, তখন তিনি হিমালয়বাসের কথাটাকে খুবই উজ্জ্বল করিয়া স্বল্পকথায় প্রকাশ করেন।[২]

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে

১ শান্তিনিকেতনে বাসকালে একদিন বালক বাগানের মালি হরিশের সঙ্গে চীপ্ সাহেবের কুঠি দেখিতে যান। সেখানে হরিশ খরগোস শিকার করে। সেই রক্তাক্ত প্রাণীর নির্জীব দেহের ছবি বালকের মনে গভীর রেখাপাত করে; বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর সেই স্মৃতি স্পষ্ট ছিল।—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, মাসিক বসুমতী ১৩৬১ বৈশাখ পৃ. ১৫-১৬।

২ আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা, প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন। পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র ১৩১৭, ভাদ্র ২৮। প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক। দ্র. আত্মপরিচয়।

করিতে অবশেষে পিতাপুত্র অনুচরগণসহ অমৃতসরে পৌছিলেন। অমৃতসরে শিখদের বিখ্যাত গুরুদ্বার বা ধর্মমন্দির তথাকার প্রধান দর্শনীয় স্থান ; মন্দিরে গ্রন্থসাহেব হইতে অখণ্ড পাঠ ও ভজন চলে, নামকীর্তন মুহূর্তমাত্র ক্ষান্ত হয় না। মহর্ষি আবিষ্ট হইয়া সেইসব ভক্তিপূর্ণ গান শুনিতেন, সে-কথা রবীন্দ্রনাথের মনে খুবই স্পষ্ট ছিল। আমাদের মনে হয় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মহর্ষি তথায় প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ হইতে স্বাধ্যায়পাঠ ও ব্রহ্মসংগীতের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার আদর্শ অমৃতসর গুরুদ্বারের অখণ্ড পাঠ হইতে গৃহীত।

অমৃতসরে তাঁহারা মাসখানেক ছিলেন ; সেখান হইতে চৈত্র মাসের শেষে (১২৭৯) ডালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করেন ; হিমালয়ের আহ্বান বালককে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, অমৃতসরে দিন আর কাটিতেছিল না।[১] ডালহৌসি চম্বারাজ্যের মধ্যে বক্রোটা তেহ্‌রা পোত্‌রেন পর্বতত্রয়ের উপর অবস্থিত ক্ষুদ্র জনপদ ; সর্বোচ্চ পর্বত বক্রোটা (৭,৮১৯ ফিট) শিখরে ছিল তাঁহাদের বাসা। বৈশাখ মাস (১২৮০), কিন্তু শীত এত প্রবল যে ছায়াশীতল স্থানে বরফ তখনো জমিয়াছিল।

বক্রোটা শৈলে বাসকালে বালক রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণাদি ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিলেন। "কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড় ভ্রমণ করিতে" মহর্ষি তাঁহাকে কোনোদিন বাধা দেন নাই। বাসার নিম্নবর্তী অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবনে বালক একাকী একাকী দীর্ঘ লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায়ই বেড়াইতেন। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়া তিনি কী আহরণ করিতেন তাহা বলা সুকঠিন ; কিন্তু অল্পকাল পরে তিনি যে-সব কাব্যোপন্যাস বা কাব্যনাটক রচনা করেন, তাহার মধ্যে এই হিমালয়ভ্রমণের এই নির্জন বনের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

হিমালয়ভ্রমণে আসিয়াছেন বলিয়া বালকের পড়াশুনা যাহাতে নিয়মিত রূপে হয়, তদ্‌বিষয়ে মহর্ষির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মহর্ষি পুত্রকে কিভাবে পড়াইতেন তাহার বিস্তৃত সংবাদ আমরা জীবনস্মৃতি হইতে পাই। প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠাইয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ 'উপক্রমণিকা' মুখস্থ করিতে দিতেন। ইতিপূর্বে বালককে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশে সংস্কৃত পড়াইবার পদ্ধতি ছিল আবৃত্তি অর্থাৎ বিদ্যার্থীকে সমগ্র একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তৎসঙ্গে অমরকোষ অভিধানখানি মুখস্থ করিতে হইত। যখন সংস্কৃতই বিদ্যার্থীদের একমাত্র পঠনীয় বিষয় ছিল, তখন 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী'-পদ্ধতি সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার কিছুই ছিল না ; কিন্তু উনবিংশ শতকের নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতিহেতু বিদ্যার্থীর পক্ষে বিচিত্র বিষয় ও বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা আবশ্যিক হইয়া উঠে। সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ অম্লান রাখিবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহতাকে শিথিল করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাঙালি ছাত্রের জন্য বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃত শিখাইবার ব্যবস্থা করেন ; তজ্জন্য উপক্রমণিকা ব্যাকরণ-কৌমুদী ঋজুপাঠ প্রভৃতি প্রণীত হয় (১৮৫১-৫৩)। হিমালয়ে রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছে উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ দিয়া সংস্কৃতে পাঠগ্রহণ আরম্ভ করেন। তবে মহর্ষি ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ না পড়াইয়া একেবারে দ্বিতীয় ভাগ শুরু করিয়া দেন। বাংলার বুনিয়াদ খুব ভালো ছিল বলিয়া "সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া যাইত।" এছাড়া গোড়া হইতেই যথাসাধ্য রচনাকার্যে তিনি বালককে উৎসাহিত করিতেন।

ইংরেজি পড়াইবার জন্য মহর্ষি Peter Parley's Tales পর্যায়ের অনেকগুলি বই[২] সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পিটার পার্লি হইতেছে Samuel Griswold Goodrich (1793-1860) নামে আমেরিকান শিশুসাহিত্য-লেখকের ছদ্মনাম। এই গ্রন্থমালা হইতে বেন্‌জামিন ফ্রাংকলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন ; কিন্তু

১ মহর্ষির পত্রাবলী, পৃ ১০৫। বক্রোটা ১৪ বৈশাখ, ১৭৯৫ শক [২৫ এপ্রিল ১৮৭৩ (১২৮০)] "আমি অমৃতসর হইতে আবার সেই আমার বক্রোটাশিখরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।"

২ পিটার পার্লির বইগুলি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে।

ফ্রাংকলিনের 'হিসাবকরা কেজো ধর্মনীতি' তাঁহার নিকট অত্যন্ত সংকীর্ণ মনে হইত ; পড়াইতে পড়াইতে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এই হিমালয়ভ্রমণ-পর্বে পিতার সাহচর্যে বালকের আরেকটি বিষয়ের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইল। সেটি হইতেছে জ্যোতিষ্কশাস্ত্র। মহর্ষি পুত্রকে প্রকটরের[১] রচিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষের বই হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতেন, বালক তাহা বাংলায় লিখিতেন।[২] অমৃতসর হইতে বক্রোটায় যাইবার পথে ডাকবাংলায় বিশ্রামকালে সন্ধ্যার পর প্রায়ই পিতাপুত্রে জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা চলিত। জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-কৌতূহল বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত অম্লান ছিল, তাহার পত্তন হয় এই সময়ে ; এবং পিতার নিকট হইতে ইহার দীক্ষা হইয়াছিল।[৩]

এমনি করিয়া চারি মাস পিতার সঙ্গে ভ্রমণ ও বাস করিয়া কাটিলে পর রবীন্দ্রনাথ পিতৃ-অনুচর কিশোরী চাটুজ্জের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।[৪]

প্রত্যাবর্তন

হিমালয়ভ্রমণ-পর্বটা রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে নানাদিক হইতে স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন, গৃহে "পূর্বে যে-শাসনের মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেছে।.. বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে—এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে-নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আর আমাকে কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ (কাদম্বরী দেবী) ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।"

কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশের ছুটির পর বেঙ্গল অ্যাকাডেমি স্কুলে যথারীতি যাইতে হইল। বাহিরের উন্মুক্ত জীবনের মধ্যে চারি মাস কাটাইয়া আসিয়া ও পিতার নিকট প্রচুর স্বাধীনতা পাইয়া পুনরায় ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ের চারি প্রাচীর বেষ্টিত কক্ষ তাঁহার কাছে পাষাণকারার ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিল।

১ R. A. Proctor (1837-88) রচিত *Half-hours with the Telescope* (1868) অথবা *The Orbs around Us* (1872) গ্রন্থ হইতে এই পাঠ দেওয়া হইত।

২ জ্যোতিষ সম্বন্ধে এই বালকোচিত রচনা বোধ হয় কোনো পণ্ডিত ছাঁটিয়া কাটিয়া 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। দ্র. শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ কার্তিক।

৩ শান্তিনিকেতনে একবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের টেবিলে ভূতত্ত্ব-বিষয়ক একখানি সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ দেখিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু বিস্ময় প্রকাশ করেন। মহর্ষি বলেন, 'আমি পাহাড়ে পর্বতে থাকিয়া বহু বৎসর ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করিয়াছি, এমন-কি, এ বিষয়ে আমাকে একটা authority বলিলে হয়, তুমি কি তাহা জান না।' এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী নিজের রচিত 'পৃথিবী' নামক গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছিলেন যে, মহর্ষির ক্রোড়ে বসিয়াই তিনি ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুরাগিণী হইয়াছেন।

দ্র. শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ। পৃ. ২৩।

৪ মহর্ষির পত্রাবলী, পৃ. ১০৭। বক্রোটাশিখর ১৭৯৫ শক আষাঢ় ১৪ (১৮৭৩ জুন ২৭) "রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি।"

বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে মন টেঁকে না, মনে জাগে নানা আশা বহু আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র সাধ। বোধ হয় এই সময়ে অভিলাষ নামে এক দীর্ঘ কবিতা লেখেন। এই কবিতা সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

বিদ্যালয়ের নিয়ম-করা পড়াশুনার মধ্যে বালককে বাঁধা ক্রমশই অভিভাবকগণের পক্ষে সমস্যাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ এক পত্রে[1] লিখিতেছেন যে বালকেরা স্কুলে টিকিতে না পারায় তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে পড়াইতেছেন, প্রাতে রামসর্বস্ব পণ্ডিত সংস্কৃত শিখাইতেছেন। তিনি বালকদিগকে শকুন্তলা অর্থ করিয়া পড়াইতেন। মাঝে কিছুকাল মহর্ষির অনুরোধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে পড়াইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু অমন ক্ষণজন্মা শিক্ষকের শিক্ষারীতিকেও তিনি পরাভূত করিলেন। অতঃপর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের যুবকপুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য[2] ইহাদের গৃহশিক্ষক হইলেন;

তিনি যখন বালককে স্কুলের পড়ায় কিছুতেই বাঁধিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার রুচিমতো সাহিত্যরস পরিবেশনে মন দিলেন। জ্ঞানচন্দ্র আসিয়া সংস্কৃতে কালিদাসের কুমারসম্ভব মহাকাব্য ও ইংরেজিতে শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটক পড়ানো শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য এই দুই গ্রন্থ বালকের সম্মুখে দুইটি নূতন জগৎ উদ্ঘাটিত করিল— একটি প্রকৃতির সৌন্দর্য, অপরটি মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য। কুমারসম্ভব পড়িতে পড়িতে তিন সর্গ তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানচন্দ্র কেবল পড়াইয়া ক্ষান্ত হইতেন না, যাহা পড়াইতেন তাহা বালককে দিয়া লিখাইয়া লইতেন।[3] ম্যাকবেথ নাটকখানিও এইভাবে সম্পূর্ণরূপে তর্জমা হইয়া যায়। কবি লিখিয়াছেন, "যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।"

তাঁহার গৃহশিক্ষক জ্ঞানবাবুর শাসনে তাঁহাকে ম্যাক্‌বেথের যে-অনুবাদ করিতে হইয়াছিল, তাহার কথা প্রচার করেন তাঁহাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য। ইনি ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় -প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের হেড পণ্ডিত। ইনিই একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুবাদ শুনাইবার জন্য পাণ্ডুলিপিসহ লেখককে নিয়া তাঁহার সমক্ষে হাজির করিলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬-৮৬) সেই সময়ে তাঁহার কাছে বসিয়া ছিলেন। বালকের অনুবাদ শুনিয়া উভয়েই প্রীত হইলেন। রাজকৃষ্ণবাবু উপদেশ দিয়াছিলেন নাটকের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত। বোধ হয় এই উপদেশ অনুসারে তিনি সেই অংশ নূতন করিয়া লেখেন। "সেই অনুবাদের (ম্যাকবেথের) আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেক দিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।"[4]

১ ১৭৯৫ শক মাঘ ২৫ (১২৮০।১৮৭৪ ফেব্রুয়ারি ৬)। দ্র. জীবনস্মৃতি, ১৩৫৪ সং পৃ. ৭৪।৯

২ জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য— আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র। ১৮৭১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন। ১৮৭৩-এ রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। জীবনস্মৃতিতে আছে যে ইনি ওকালতি পড়িতে গেলে এই কাজ ছাড়িয়া দেন। তিনি ওকালতি পাস করেন নাই বা শেষ পর্যন্ত পড়েন নাই; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের B. L. পাসের তালিকায় তাঁহার নাম পাই নাই। ১৯১০ কি ১১ সালে তিনি কয়েক মাসের জন্য শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিতে আসেন। তখন তিনি জরাগ্রস্ত।

৩ কুমারসম্ভব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছিলেন, "তিন সর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্ত আমার মুখস্থ হইয়াছিল।" মুদ্রিত জীবনস্মৃতিতে আছে, "আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন।" ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ কি 'কুমারসম্ভব' বাংলায় তর্জমা করিয়াছিলেন; জীবনস্মৃতিতে তাহার কোনো ইঙ্গিত নাই। যদি উহার অনুবাদ তিনি করিয়া থাকেন তবে ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে কেবলমাত্র ম্যাকবেথ অনুবাদ শুনাইলেন— কুমারসম্ভবের কোনো কথা নাই। সেইজন্য ইহার যে-অনুবাদ ১২৮৪ সালে ভারতীতে প্রকাশিত হয় তাহার অনুবাদক কে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

৪ জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি। দ্র. ভারতী, ৪র্থ বর্ষ ১২৮৭ আশ্বিন। রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে এই অংশটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

জ্ঞানচন্দ্র শিক্ষকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক ব্রজনাথ দে মহাশয় আসিয়া গোল্ডস্মিথের ভিকার অব ওয়েকফীল্ড-এর তর্জমা করিতে দিলেন; কিন্তু তাঁহার পরীক্ষা সফল হইল না। ১৮৭৪ সালটা ঘরে-পড়ার পরীক্ষায় কাটিয়া গেল; অবশেষে বালকদিগকে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সেখানেও ফল ভালো হইল না। ইতিমধ্যে জননীর মৃত্যু হইল, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ বৎসর। মাতৃবিয়োগের পর[১] "মাতৃহীন বালক বলিয়া অন্তঃপুরে বিশেষ প্রশ্রয় পাওয়াতে স্কুলে যাওয়া প্রায় একপ্রকার ছাড়িয়াই" দিলেন। বিদ্যালয়ে গিয়া বাঁধাধরা পড়াশুনা না করিলেও সাহিত্যসাধনা সাধ্যমত চলিতেছে; লেখনীও শান্ত নহে। বনফুল কাব্য এই সময়ে রচিত, যদিও মুদ্রিত হয় আরো কিছুকাল পরে। এই কাব্য সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব; এইখানে যে-সব কবিতা তাঁহার রচিত বলিয়া দাবি করা হয়, অথচ যাহাতে রচয়িতার নাম নাই সেইসব কবিতা সম্বন্ধে আলোচনাটা শেষ করিব।

'শৈশবসংগীত' কাব্যখণ্ড রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত কবিতার সংগ্রহ। এই গ্রন্থের কোন্ কবিতা কোন্ বয়সে রচিত, তাহা নির্দেশ করা কঠিন; তদুপরি ইহা নির্বাচিত কবিতাগ্রন্থ বলিয়া দুই-চারিটি কবিতা নিশ্চয়ই কবি বাদ দিয়াছিলেন। সেইরূপ দুইটি কবিতা হইতেছে 'অভিলাষ' ও 'প্রকৃতির খেদ'। হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে মন যখন কিছুতেই টিঁকিতেছে না, মনে যখন নানা আশা নানা স্বপ্ন জাগিতেছে বোধ হয় সেই সময়ে 'অভিলাষ'[২] নামে দীর্ঘ কবিতাটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১২৮১ অগ্রহায়ণ) 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা' রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে কি বালক-কবির মনের অভিলাষই বালকোচিত ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছিল?

> জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
> তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
> অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা
> তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।১॥· ·
> উচ্চ অভিলাষ! তুমি যদি নাহি কভু
> বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবীমণ্ডলে
> তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
> বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে? ৩৮॥· ·

অ-নামে বা 'বালকের রচিত' বলিয়া আর-একটি কবিতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সাত মাস পরে। ইহার নাম 'প্রকৃতির খেদ'[৩] কবিতাটি বালক-কবি পাঠ করেন বিদ্বজ্জনসমাগম-সভায়। এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল

১ সারদা দেবীর মৃত্যু ১২৮১ ফাল্গুন ২৭, ১৮৭৫ মার্চ ১০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৭ শক (১২৮২) বৈশাখ পৃ. ১৭। মাতার চতুর্থী শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াতে শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর প্রার্থনা ১২৮১ ফাল্গুন ৩০ শনিবার। ৭ই চৈত্র শনিবার, মাতার আদ্যশ্রাদ্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনা। দ্র. সৌদামিনী দেবী, পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী ১৩১৮ ফাল্গুন।

২ অভিলাষ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৬ শক, ১২৮১ অগ্রহায়ণ, ১৮৭৪ নভেম্বর, পৃ. ১৪৮-১৫০। ৩৯ স্তবক। তখন রবীন্দ্রের বয়স ১৩ বৎসর। তবে খুব সম্ভব উহা ১২৮০ শীতকালে রচিত হয়। শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ। দ্র. প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ ৬৪৭-৬৬৩।

৩ প্রকৃতির খেদ, বালকের রচিত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৭ শক, ১৮৮২ আষাঢ়, ১৮৭৫ জুন, পৃ. ৫২-৫৪

গুণেন্দ্রনাথের বাড়িতে (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ); সভায় রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ প্রায় এক শত গ্রন্থকার ও বিদ্বান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 'সাধারণী' নামে সাপ্তাহিকের সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার উপস্থিত ছিলেন; তিনি লিখিয়াছিলেন, "ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল।[১]

এই দীর্ঘ কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

বিস্তারিয়া উর্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা
অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে।
প্রদীপ্ত তুষাররাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিখরে॥
ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে
নির্ঝরের একধারে দুলিছে তরঙ্গভরে
ঢুলে ঢুলে পড়ে জল প্রভাত পবনে।

'প্রকৃতির খেদ' হইতে ভারতের দিকে তাকাইয়া—

অভাগী ভারত হায়, জানিতাম যদি—
বিধবা হইবি শেষে, তাহলে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ।

তাহলে কি হিমালয়, গর্বেভরা হিমালয়,
দাঁড়াইয়া তোর পাশে পৃথিবীর উপহাসে
তুষার মুকুট শিরে করি পরিধান॥
... ...
আবার গাহিল ধীরে প্রকৃতি সুন্দরী
"কাঁদ কাঁদ কাঁদ অভাগী ভারত।
হায় দুখনিশা তোর, হল না হল না ভোর
হাসিবার দিন তোর হল না আগত।

'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' ও 'বালকের রচিত' অ-নামে লিখিত কবিতা দুইটি ছাড়া বালক রবীন্দ্রনাথের আরো দুইটি কবিতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুইখানি নাটকের মধ্যে প্রায় লুপ্তভাবে আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিভাবে কবিতা দুইটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে আশ্রয় পাইল, তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে এই :

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী[২] নাটক ছাপা হইতেছে। তিনি রামসর্বস্ব পণ্ডিতের সাহায্যে প্রুফ দেখেন; রামসর্বস্বের অভ্যাস ছিল খুব জোরে জোরে পড়া। পাশের ঘর রবীন্দ্রনাথের পড়ার ঘর; রবীন্দ্রনাথ তখন সেন্ট্ জেভিয়ার্স

১ সাধারণী, ১২৮২ সাল ৩ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার। ইং ১৬ মে ১৮৭৫। দ্র. জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয়।

২ রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়। সরোজিনীর প্রকাশকাল ১২৮২ অগ্রহায়ণ ১৫। ১৮৭৫ নভেম্বর ৩০।

স্কুলের ছাত্র। প্রুফের পাঠ কানে যাওয়াতে মাঝে মাঝে তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্দেশে কোন্ স্থলে কি করিলে আরো ভালো হয়, তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশ উপলক্ষ্যে একটা গদ্য বক্তৃতা ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মচরিতে বলিয়াছেন, "গদ্য রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন, এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।· ·রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'— এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।" —পৃ. ১৪৭।

অপরটি স্বপ্নময়ী[১] নাটকের মধ্যে লুকানো রহিয়াছে ; ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলার জন্য রচিত কবিতাটিরই অঙ্গহানি ও শব্দপরিবর্তন করিয়া উহাকে নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমরা এ-সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিব।

আমরা এতক্ষণ বালক-কবির যে-কয়টি কবিতা লইয়া আলোচনা করিলাম, সেগুলির রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায় না। বাহিরের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সেগুলিকে তাঁহার রচনা বলিয়া মানিয়া লইতে হইয়াছে।

স্বাদেশিকতা : হিন্দুমেলা

ছাপার অক্ষরে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই নাম-যুক্ত যে-কবিতা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, সেটি হইতেছে 'হিন্দুমেলায় উপহার'[২]। কবিতাটি হিন্দুমেলায় (১২৮১ মাঘ ৩০) পঠিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর আট মাস মাত্র ; রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি বা অন্য কোনো রচনার মধ্যে এই কবিতা সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইহার দুই বৎসর পরে যে-কবিতা হিন্দুমেলায় আবৃত্তি করেন, তাহার কথা জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃতভাবেই বলিয়াছেন।

সত্তর বৎসর পূর্বে কী সূত্রে উহা রচিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা এ-যুগের পাঠকদের পক্ষে সহজ নহে ; সেইজন্য আমরা সেই অতীতযুগের বিস্মৃত কাহিনী সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করিব। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে এই বালকবয়সে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতির বুনিয়াদ কিভাবে পত্তন হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে বাংলাদেশের হিন্দুমেলা বা এই প্রথম স্বদেশী-আন্দোলনের ইতিহাসটা জানা প্রয়োজন।

স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্ পদার্থটা য়ুরোপীয় শিক্ষার ফল এ-কথা লইয়া আশা করি বাদপ্রতিবাদ হইবে না। হিন্দুকলেজ স্থাপনের ফলে যে-ইংরেজি শিক্ষা দেশের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার ফল সর্বতোভাবে দেশের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকর হয় নাই ; তবে দেশের জন্য দরদ বা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য এই বিদেশী শিক্ষাই যে দায়ী তদ্‌বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই। যাহাই হউক, নূতন শিক্ষা-বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রতিক্রিয়ায় দেশের ধর্মশাস্ত্র ধর্মসাধনা ও সকল প্রকার হিন্দু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন বিরূপতা শিক্ষিতদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রচারকার্য এই অশ্রদ্ধার অগ্নিতে ইন্ধন জোগায়। হিন্দুসংস্কৃতি-গ্রাসোদ্যত য়ুরোপীয়তাকে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ যুগপৎ বাধাদান করিতে উদ্যত হইল ; তবে ব্রাহ্মসমাজের বাধাদান-পদ্ধতির সহিত সনাতনীদের পদ্ধতির মূলগত পার্থক্য ছিল। য়ুরোপীয় শিক্ষার ফলে একটি সুষ্ঠু দেশাত্মবোধ বা ন্যাশনালিজমের আদর্শে নবীনদের মন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল ; বৃহত্তর আন্তর্জাতিক জগতের মধ্যে নিজ দেশকে দেখিবার শিক্ষা তাহারা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সনাতনীরা য়ুরোপীয়তার বিরুদ্ধে যে-

১ স্বপ্নময়ীর প্রকাশকাল ১৮৮২। রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ. ৬৫-৬৭।

২ ১২৮১ ফাল্গুন ১৪, ১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি ২৫ তারিখের দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী ১৩৩৮ মাঘ সংখ্যায় উহা পুনঃপ্রকাশ করেন। দ্র. রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ. ৭৫-৭৭। জীবনস্মৃতি, পরিশিষ্ট।

অভিযান পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা পশ্চাৎধাবনতা বা go-backism— ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরাভব বা বর্ণাশ্রমের বিলোপভয়ে আতঙ্কজনিত কর্মপ্রচেষ্টা। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আজ পর্যন্ত এই দুইটি বিপরীত স্রোতের গতিবেগের দ্বন্দ্বে বাঙালির চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত, তাহার প্রগতি কখনো বাধাগ্রস্ত কখনো নকলনবীশী পর্যায়গ্রস্ত। দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা হিন্দুজাতীয়তাবোধকে উদ্‌বুদ্ধ ও য়ুরোপীয় তথা খ্রীস্টীয় স্রোতকে প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর এবং যুগপৎ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান দেশমধ্যে চালু করিবার জন্য সচেষ্ট। বাহির হইতে দেখিতে ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে অনেক কিছু বিদেশী প্রথার প্রচলন ছিল; কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটি প্রবল 'স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল'। স্বদেশের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের[১] যে একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির খসড়ায় লিখিয়াছেন, "আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই, ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া ছিলেন। আমার পিতামহ ও ছোটোকাকা মহাশয় (নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বিলাতের সমাজে বর্ষযাপন করিয়া ইংরাজের বেশ পরিয়া আসেন নাই, এই দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে সজীব হইয়া আছে।· ·আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছিয়ার বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা ভোজ দিতেন,· ·কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়। তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংস্রব আর আমাদের নাই; এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট খেতাব-লোলুপতার উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।"

রাজনারায়ণ বসুকে বাংলা দেশের এই নূতন স্বাদেশিকতার গুরু বলিলে বোধ হয় শব্দের অপপ্রয়োগ হইবে না। ১৮৬১ অব্দে তিনি মেদিনীপুর হইতে 'শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভা স্থাপনের এক প্রস্তাব'[২] শীর্ষক ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর পরে (১৮৬৫) কলিকাতায় আসিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়া 'স্বাদেশিকদের সভা' স্থাপন করেন। প্রধানত ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্যে ও রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও নবগোপালের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলা স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম অধিবেশন ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১৮৬৭ এপ্রিল ১২); মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ, সহকারী সম্পাদক নবগোপাল। মেলার অধ্যক্ষগণ স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সংগীতের চর্চা, কুস্তি ও ব্যায়ামাদির পুনর্বিকাশে উৎসাহদান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ[৩] বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা সাধারণের লজ্জার বিষয়।· ·অতএব যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।" সংক্ষেপে আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মসম্মান জাগরণ জাতীয়-চরিত্রে স্বাবলম্বনপ্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করাই ছিল হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য।[৪]

১ দেবেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ-ভারত-সভার (British Indian Association) সহকারী সম্পাদক ছিলেন (১৮৫১)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।" —জ্যোতিস্মৃতি।

২ Prospectus of a Society for the promotion of National feeling among the educated natives of Bengal.

৩ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৪ কার্তিক-পৌষ সংখ্যা পৃ. ১২৯-১৩৪।

৪ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ. ১০০-১০২।

'হিন্দুমেলা' নামকরণের মধ্যে সে যুগের ভাবুকদের দেশ সম্বন্ধে মনোভাবটি প্রকাশ পাইয়াছিল। "সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতির এ দেশের উপর দাবী-দাওয়া আছে ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহারই জন্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মবিবাহ বিধির (১৮৭২) প্রতিবাদ করেন; আর সেই স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই নবগোপাল হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা করেন।"[১]

হিন্দুমেলা স্থাপনের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর; সুতরাং বাল্যকাল হইতে হিন্দুমেলার উচ্ছ্বাস উৎসাহের সহিত বালকের নিবিড় পরিচয় হয়। ক্রমে কিশোর বয়সে তাঁহারও একদিন আহ্বান আসিল মেলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে। মেলার নবম অধিবেশনে বালক-কবি, 'হিন্দুমেলায় উপহার' লইয়া উপস্থিত হইলেন।[২] সভা বসে পার্শীবাগানে; শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব সভার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন, সভাপতি হন রাজনারায়ণ বসু। বালক-রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি[৩] আবৃত্তি করেন, তাহা কবিতা হিসাবে তুচ্ছ— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভারতসঙ্গীত'[৪] কবিতা ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র। হেমচন্দ্রের "বাজ্‌রে বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে"— এই পদগুলি সেদিন বাঙালির মুখে মুখে শোনা যাইত। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম স্বনামে মুদ্রিত কবিতা। হেমচন্দ্রের সুরে বাঁধা ও বিহারীলালের রঙে রঞ্জিত। আমরা নিম্নে 'হিন্দুমেলায় উপহার' হইতে কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি :

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বতশিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়!

৪

ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়,
কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস। হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

১ বিপিনচন্দ্র পাল, হিন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র, বঙ্গবাণী, ১৩২৯ অগ্রহায়ণ, দ্র. প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ, কষ্টিপাথর, পৃ. ৩৬০-৬১।

২ হিন্দুমেলার অধিবেশন ১২৮১ মাঘ ৩০। ১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি ১১। এই মেলা উপলক্ষে বরোদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয় এবং যশোহরের নড়াল নিবাসী জমিদার রায়চরণ রায় ব্যাঘ্রশিকারের নৈপুণ্যের জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। —রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত পৃ. ২১৪।

৩ Indian Daily News 1875, 15 Feb. *"The Hindoo Mela."* The Ninth Anniversary of the Hindu *mela* was opened at 4 P.M. on Thursday, the 11th instant, at the well-known Parseebagan .... on the Circular Road, by Rajah Kamal Krishna, Bahadoor, the President of the National Society. Baboo Rabindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendra Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharut (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone much pleased his audience."

৪ ভারতসঙ্গীত— হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে (১৮৭০ নভেম্বর) আছে। ২য় সংস্করণে উহা বর্জিত হয়। এই কবিতা এডুকেশন গেজেট ১৮৭০, ২২ জুলাই প্রকাশিত হয়। দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৯।

৯

অমার আঁধার আস্থক এখন,
মরু হয়ে যাক ভারত কানন,
চন্দ্রস্থর্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক।

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায় রে নূতন জীবন
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবে রে জ্যোতি।

২২

মুছে যাক মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।

জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় গৌরবসঞ্চারিণী কবিতা বাংলা ভাষায় এই যুগের নূতন স্থষ্টি; তেমনি নূতন স্থষ্টি 'জাতীয় সংগীত'। স্বদেশপ্রেমোদ্দ্যোতক সংগীত রচনায় ঠাকুর-পরিবারের যুবকদের দান স্মরণীয়। হিন্দুমেলার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করেন—'মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ',[১] গণেন্দ্রনাথ লিখিলেন, 'লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে', দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিলেন, 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, এই সব রচনার মধ্যে "দেশমুক্তি কামনার স্থর ভোরের পাখির কাকলির মত শোনা যায়"। বালক রবীন্দ্রনাথের কাকলিও এই প্রত্যুষে শোনা গিয়াছিল, তবে তাহা অতি ক্ষীণ ও অস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম জাতীয় সংগীত কোন্‌টি তাহা সঠিক নির্দেশ করা কঠিন। 'জাতীয় সংগীত'[২] নামে একখানি সংগীতসংগ্রহে 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা' কবিতাটিকে গান বলা হইয়াছে; পাদটীকায় আছে যে গানটি ইংরেজি স্থরে গেয়। এই কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য বালক রবীন্দ্র কিভাবে রচনা করিয়া দেন তাহার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সরোজিনী নাটকের মুদ্রণকালে উহা রচিত হয়; স্থতরাং রচনাকালে বালকের বয়স চৌদ্দ বৎসর ছিল। কিন্তু এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'জাতীয়' সংগীত আখ্যা দেওয়া যায় না; আমরা জাতীয় সংগীত অর্থে এখন যাহা বুঝি সেই দেশমাতৃকাবোধ হইতে রচিত সংগীত ইহা নহে। যথার্থ জাতীয় সংগীত রচিত হয় সঞ্জীবনীসভার যুগে, সে কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

'জাতীয় সংগীত' গ্রন্থে আর-একটি গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন; সন্দেহের কারণ এই যে, ইহাতে রচয়িতার নাম নাই; কিন্তু 'ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী' নামক গ্রন্থে

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে (১৮৭৪) প্রথম অঙ্কে গানটি আছে।

২ জাতীয় সংগীত (প্রথম ভাগ) প্রথম সংস্করণ ১২৮২ ফাল্গুন [১৮৭৬ মার্চ]; দ্বিতীয় সংস্করণে 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,' (ভারতী ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ১২৮৪ আশ্বিন) আছে।

গানটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াই উক্ত।[১] এই জাতীয় সংগীতের প্রথম পংক্তি ছিল, 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি'। গানটির ভাবধারা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিকয়টি হইতে স্পষ্ট হইবে।—

এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ,
প্রাচীন হিন্দুর কীর্তি-ইতিহাস
যত দিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে
অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে
তত দিন তুই কাঁদ্ রে।

যে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া
সে দিন তো আর আসিবে না।
যে রবি পশ্চিমে পড়েছে ঢলিয়া
সে আর পুরবে উঠিবে না।

এই যুগের আর-একটি গান যার সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সেটি হইতেছে

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

গানটি[২] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম নাটক'এর দ্বিতীয় সংস্করণে[৩] প্রথম পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনাকালে বোধ হয় ইহারই প্রথম পংক্তি ভাঙিয়া দস্যুদের গান 'একডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' লিখিয়াছিলেন (১৮৮১)। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার ১২৯৬ কার্তিক সংখ্যায় ৩৬৫ পৃষ্ঠায় 'স্নেহলতা' গল্পে 'সঞ্জীবনী' সভার অনুরূপ একটি সভার বর্ণনায় এই গানটি আছে—

এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন।
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয়গান
সহায় আছেন ধর্ম কারে আর ভয়।

চারু নামে ষোড়শবর্ষীয় বালক এই গুপ্ত সভার সদস্য, সেখানকার সে Poet Laureate বা রাজকবি; সকলে একসঙ্গে

১ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী, ২য় সংস্করণ, ১৮৯৬ (১২৯১ পৃ. ৪৪), দ্র. শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, পৌষ।

২ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-গীত-জিজ্ঞাসা, গীতবিতান বার্ষিকী, পৃ. ১৫৫-১৬৭।

৩ পুরুবিক্রম নাটকের ১ম সংস্করণে (১৮৭৪ জুলাই) এই গানটি নাই। দ্র. গীতবিতান, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৯৮০-৮২।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি'।— রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় পৃ. ৯১।

দ্র. শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রনাথের একটি গান, দেশ ২৬ চৈত্র ১৩ ০, পৃ. ২৫৭

ইহা গাহিয়া উঠিলে চারু আপনাকে শেক্স্‌পীয়রের সমকক্ষ মনে করিত। এই উপন্যাস-লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী গল্পচ্ছলে ভ্রাতা সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই বলিয়া একটি বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন।[১]

আমরা এতক্ষণ যেসব গান রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া আলোচনা করিলাম তাহার কোনোটিতেই রচয়িতা হিসাবে তাঁহার নাম না পাওয়ায় সন্দেহের বা প্রশ্নের অতীত তাহারা নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাতীয় সংগীত বলা যাইতে পারে— 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ'[২]— যাহার মধ্যে 'সঞ্জীবনী সভা'র সুর প্রতি শব্দে ধ্বনিত হইতেছে। উভয় গানের রচনাকালের মধ্যে ব্যবধান কমই মনে হয়।

জ্ঞানাঙ্কুর : বনফুল

তেরো বৎসর বয়সের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছাপার অক্ষরে নিজ নামে কোনো রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত গ্রন্থ হইতেছে— বনফুল কবি-কাহিনী ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী শৈশব-সংগীত এবং বোধ হয় রুদ্রচণ্ড। ভানুসিংহের পদাবলী ব্যতীত আর গ্রন্থগুলি একবারমাত্র লোকসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ কোনোটিকে সাহিত্য-দরবারে প্রবেশ করিতে দেন নাই। অবশ্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত খণ্ডদ্বয়ে এগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই কাব্য ও কাব্যনাট্যগুলি কবির তৎকালোচিত বয়সের এবং তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যের মানসূচীর উপযুক্ত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, তাহার অধিক স্থান দিই না। সেগুলিকে সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা, এ কথা কবি স্বয়ং ভালো করিয়াই জানিতেন এবং সেইজন্য বারে বারে নানাবয়সে নিজ কাব্য সম্পাদনকালে নির্মমভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়াছেন। তাঁহার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত কবিতা 'শৈশব-সংগীত' গ্রন্থে (১৮৮৪) সংগৃহীত হয়, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ নহে। তিনি সেখানেও কঠোরভাবে নির্বাচননীতি অনুসরণ করিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা কাব্যমধ্যে সংগৃহীত হয় নাই; তখন কবির বয়স বাইশ-তেইশ বৎসর।

কিন্তু কবির সাহিত্যবিচারের মানসূচীতে সে-সংগ্রহও টিকিল না। ১৩০৩ সালে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীতে কৈশোরক-অংশে বনফুল কবি-কাহিনী রুদ্রচণ্ড ভগ্নহৃদয় ও শৈশব-সংগীত হইতে নির্বাচিত অংশসমূহ সন্নিবেশিত হইল, সম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে কোনোটিই স্থান পাইল না। ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে কৈশোরকের অতি সামান্য অংশ 'যাত্রা'-খণ্ডে স্থান লাভ করে। অতঃপর ১৩২১ সালে তাঁহার কাব্যগ্রন্থের শোভন সংস্করণ প্রকাশকালে 'সন্ধ্যাসংগীত'কে তাঁহার আদি গ্রন্থরূপে স্বীকার করিলেন; কিন্তু মনের দ্বিধা তখনো ঘুচিল না, তাহা ঐ সংস্করণের ভূমিকা পাঠ করিলেই জানা যায়। ১৩৩৮ সালে যখন কবি স্বয়ং তাঁহার নিজ কাব্যের 'সঞ্চয়িতা' নামে একটি চয়নিকা প্রকাশ করিলেন, তখন স্পষ্টভাবেই তাঁহার পুরাতন কাব্যগুলিকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন বলিয়া তিনি কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত ছবি ও গান-কে তিনি অত্যন্ত অপরিণত সাহিত্য বলিয়া সঞ্চয়িতা হইতে বাদ দিতে পারিলে খুশি হইতেন— কেবল সঞ্চয়নের অসম্পূর্ণতার অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য কয়েকটি কবিতার অংশমাত্র উদ্‌ধৃত করিয়া পার্শ্বচরদের ক্ষুব্ধচিত্তকে শান্ত করেন। এই কাব্যগুলি এখনো যে গ্রন্থাকারে চলিতেছে, তাহা কবির ভাষায় 'কালাতিক্রমণ দোষ'।[৩]

১ দ্র. গীতবিতান, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৯৮১। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' উপন্যাস গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

২ 'তোমারি তরে মা'; ভারতী, প্রথম খণ্ড ১২৮৪ আশ্বিন পৃ. ১৪৪। গীতবিতান।

৩ ভূমিকা : সঞ্চয়িতা

বাল্য কৈশোর ও অপরিণত যৌবনের রচনাসমূহ মুদ্রণ-যন্ত্রের কৃপায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে ইহা সাহিত্যিকদের দুর্ভাগ্য। কবির অপরিণত বয়সের কবিতা ও গান লইয়া তাঁহাকে প্রৌঢ়বয়সে লজ্জিত করিবার চেষ্টা আধুনিকযুগের সমালোচনা-সাহিত্য খুঁজিলে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "মনে আছে, কোনো-এক প্রবন্ধে আমার গানের সমালোচনায় এমন-সকল গানকে আমার কবিত্বের পঙ্গুতার দৃষ্টান্তস্বরূপে লেখক উদ্‌ধৃত করেছিলেন যেগুলি ছাপার বইয়ে প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে অনেক দিন থেকে লজ্জা দিয়ে এসেছে। সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়।"[১]

বিশ্বভারতী হইতে কবির এইসব অচলিত গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে কবি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে বোঝায় অনেকখানি অংশ যা প্রাগৈতিহাসিক। যার সঙ্গে আমার সাহিত্য-ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে কিন্তু চলতি কারবার বন্ধ হয়ে গেছে।"[২] এটি সাহিত্যিকের সত্য দৃষ্টিভঙ্গি; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসলেখকগণ তাহাতে তৃপ্ত নহেন। সেইজন্য কবি তাঁহাদের উদ্দেশে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্‌ধৃত করিলাম: "ইতিহাসের সম্বল আর কাব্যের সম্পত্তি এক জাতের নয়।··· ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা।" যেসব কাব্যের মধ্যে পরিণতি ঘটে নাই সে-সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "তারা কোনো-এক সময়ে দেখা দিয়েছিল বলেই যে ইতিহাসের খাতিরে তাদের অধিকার স্বীকার করতে হবে এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়; সেগুলোকে চোখের আড়াল করে রাখতে পারলেই সমস্তগুলোর সম্মান থাকে।"[৩] এই কথাটাই কবি জীবনসায়াহ্নে রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন 'অবর্জিত' নামে কবিতায়।

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে,
সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যে-জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।
··· ··· ···
সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা—
জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণপাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা।
যাহা কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবি,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি—
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক;

১ ভূমিকা: সঞ্চয়িতা
২ নিবেদন: রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড।
৩ ভূমিকা: রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড।

কিন্তু, হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।[১]

কিন্তু জীবনীলেখক হিসাবে আমাদের মত অন্যরূপ; সাহিত্যসৃষ্টির এই অরুণ যুগকে রবীন্দ্র-কাব্যজিজ্ঞাসা হইতে বর্জন করিবার অধিকার আমাদের নাই। রবীন্দ্রপ্রতিভা উন্মেষের সূচনা হয় এই যুগেই; প্রতিভার দীপ্তি এই বালক-বয়সে কি উজ্জ্বল, তাহা কাব্যালোচনাকালে পরিস্ফুট হইবে। এখানে এইমাত্র বলিতে পারি যে, সে-সময়ে এমন কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন না, যিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারিতেন— অবশ্য অরসিকের দল চিরদিনই ব্যঙ্গজীবী।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা চিরদিনই সাময়িক পত্রিকা আশ্রয় করিয়া সার্থক হইয়াছে। অন্তরের ভাবনাকে ভাষায় মূর্তিদান করিবার প্রয়াস মানুষের অন্যতম ধর্ম। বহির্জগতের কাছে আত্মপ্রকাশের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতেছে সাহিত্য-সৃষ্টির মূলসূত্র। বালক-কবির আত্মপ্রকাশের সুযোগ মিলিল 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'[২] নামে এক ক্ষুদ্র মাসিকপত্রের আনুকূল্যে। কবি লিখিয়াছেন, "কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।" 'জ্ঞানাঙ্কুর' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মন্তব্য করিয়াছেন, পত্রিকাখানি সেরূপ অকিঞ্চিৎকর ছিল না বলিয়া আমাদের ধারণা। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্য যে মাসে প্রথম বাহির হইল, সে মাসের লেখকশ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা সকলেই বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রজনীকান্ত গুপ্ত, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। সুতরাং বালক-কবি বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সহিত এই পত্রিকা-মধ্যে একাসন লাভ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানাঙ্কুরে যখন 'বনফুল' প্রকাশিত হইল তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর সাত মাস। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কবিকে এই কাব্যখানির রচনাকাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "বেশ কিছুদিন আগে।"[৩]

১ ১৯৩৫ জুন ৫, চন্দননগর। নবজাতক। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪।

২ জ্ঞানাঙ্কুর, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র ও সমালোচন। রাজশাহী, বোয়ালিয়া [১২৭৯ (১৮৭৩)] শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস, সম্পাদক। Jnanankura or The Seed of Knowledge, a monthly Anglo-Vernacular Magazine and Review of Literature, Philosophy, Science, History, Biography, Antiquities and Researches, Politics, Arts, Commerce etc. ১২৮২ অগ্রহায়ণ মাস হইতে ৪র্থ বৎসর শুরু হয়। এই সংখ্যা হইতে 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সহিত প্রতিবিম্ব মিলিত হইল। ইহার কার্যভার হস্তান্তরিত হইল'। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব (মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন) ১২৮২ ৪র্থ খণ্ড। কলিকাতা ৫৫নং কলেজ স্ট্রীট· ক্যানিং লাইব্রেরী। শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে· মুদ্রিত। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ৪র্থ খণ্ড ১২৮২ অগ্রহায়ণ ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫-১৬। বনফুল, প্রথম সর্গ।

মাঘ ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৫-১৩৮, বনফুল দ্বিতীয় সর্গ ফাল্গুন চতুর্থ সংখ্যা, প্রলাপ (কবিতাগুচ্ছ)। চৈত্র পঞ্চম সংখ্যা পৃ. ২২৮-২৩৪। বনফুল তৃতীয় সর্গ। ১২৮৩ বৈশাখ ষষ্ঠ সংখ্যা পৃ. ২৭৮-২৮০, প্রলাপ। জ্যৈষ্ঠ সপ্তম সংখ্যা পৃ. ৩১৬-১৯। বনফুল কাব্য চতুর্থ সর্গ। পঞ্চম সর্গ।

শ্রাবণ নবম সংখ্যা পৃ. ৪২০-২৫। বনফুল ষষ্ঠ সর্গ। ভাদ্র দশম সংখ্যা পৃ. ৪৫৭-৪৬১। বনফুল সপ্তম সর্গ আশ্বিন-কার্তিক একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা, পৃ ৫৬৭-৫৭৩। বনফুল অষ্টম সর্গ।

৩ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, রবীন্দ্রপরিচয়, প্রবাসী ১৩২৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৪।

জীবনস্মৃতির প্রথম খসড়ায় আছে যে পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া বনফুল রচনা করেন।[১] বৎসর তিন-চারি পরে "দাদা সোমেন্দ্রনাথের অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উৎসাহে" উহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।[২]

'বনফুল' আখ্যায়িকা-কাব্য। বাংলাসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতার অন্যতম প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি গাথা-কবিতা বা আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' প্রভৃতি কাব্যের রচনারীতিতে বিহারীলালের প্রভাব স্পষ্ট নহে, অক্ষয়চন্দ্রেরই প্রভাব আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনায় জাজ্বল্যমান। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে আছে, "ইঁহার সদ্য রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইঁহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।"[৩] অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী' কাব্য এককালে বালক-রবীন্দ্রনাথ যুবক-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিকে যে নূতন প্রেরণা দিয়াছিল সে কথা আজ বিস্মৃত হইলে চলিবে না। 'উদাসিনী'র পংক্তি পর্যন্ত বনফুলের মধ্যে উদ্ধৃত দেখা যায় ; তা ছাড়া imageryর মধ্যে বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। যে 'উদাসিনী' কাব্য সে যুগের আখ্যায়িকা-কাব্যের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা ইংরেজ কবি টমাস পার্নেলের (১৬৭৯-১৭১৮) 'হার্মিট্' কাব্যের ছায়াবলম্বনে রচিত। সে যুগের বহু কবির কাব্যপ্রেরণার উৎস ছিল ইংরেজি কাব্য, ইংরেজি আদর্শ। 'বনফুল' সেই আদর্শে রচিত, উহার নায়ক-নায়িকাদের প্রেমকাহিনীর পটভূমি পাশ্চাত্য সমাজ।[৪]

'বনফুল' কাব্য আট সর্গে বিভক্ত ; প্রথম দ্বিতীয় সপ্তম ও অষ্টম সর্গের বিশেষ নাম আছে, অবশিষ্টের নাম নাই। রবীন্দ্ররচনাবলী অচলিত-সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হইবার পূর্বে ইহার আর-কোনো সংস্করণ ছাপা হয় নাই ; ইহার কোনো অংশ কাব্যগ্রন্থের কোনো অংশে স্থান পায় নাই। এই কাব্যোপন্যাসের গল্প সংক্ষেপে এই—

কমলা শিশুকাল হইতে নির্জন কুটিরে পালিত, শৈশবে মায়ের মৃত্যুর পর সে তাহার পিতা ছাড়া আর-কোনো মানুষ দেখে নাই। বিজন কাননের তরুলতা-পশুপক্ষীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। বালক-কবি বিজন কুটিরের বর্ণনা দিতেছেন :

চৌদিকে মানব-বাস নাহিক কোথায়
নাহি জন-কোলাহল, গভীর বিজন-স্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায় !
কুসুম-ভূষিত-বেশে, কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকা-মালা প্রসারিয়া কর,
কুসুমস্তবক রাশি, দুয়ার উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীর ভিতর !
কুটীরের এক পাশে, শাখা-দীপ ধূমশ্বাসে
স্তিমিত আলোক শিখা করিছে বিস্তার।

১ জীবনস্মৃতি ১৩৫০ সংস্করণ। পৃ. ৮৪ পাদটীকা হইতে উদ্ধৃত।

২ বনফুল (কাব্যোপন্যাস) অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূণং কররুহৈ গুপ্তপ্রেস, ২২১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৮৬ সাল, (পৃ. ৯৮) দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭-১১৬।

৩ জীবনস্মৃতি, ১৩৫০ সংস্করণ,পৃ. ৮০ পাদটীকা হইতে উদ্ধৃত।

৪ পার্নেল ছিলেন পোপ সুইফ্‌ট প্রভৃতির সমসাময়িক ; কবি গোল্ড্‌স্মিথ পার্নেলের জীবনী লিখিয়াছিলেন।

অস্পষ্ট আলোক তায় আঁধার মিশিয়া যায়
ম্লান ভাব ধরিয়াছে গৃহ-ঘর দ্বার !
গভীর নীরব ঘর, শিহরে যে কলেবর !
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে রয়—[১]
বিষাদের অন্ধকারে, গভীর শোকের ভারে
গভীর নীরব গৃহ অন্ধকারময় ![২]

কমলা যখন ষোড়শী বালিকা তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় সর্গে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। পথভ্রান্ত পথিক বিজয় আসিয়া দুয়ারে আঘাত করিতেছে। দ্বার খুলিয়া ভিতরে আসিয়া বিজয় দেখে কমলা অচেতন ; সে নিকটের নদী হইতে জল আনিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। কমলা পিতা ছাড়া অন্য কোনো মনুষ্য দেখে নাই।

মেলিয়া নয়ন পুটে, বালিকা চমকি উঠে
একদৃষ্টে পথিকেরে করে নিরীক্ষণ
পিতা মাতা ছাড়া কারে, মানুষ দেখে নি হা রে
বিস্ময়ে পথিকে তাই করিছে লোকন !
আঁচল গিয়াছে খ'সে, অবাক্ রয়েছে ব'সে
বিস্ফারি পথিক পানে যুগল নয়ন ![৩]

বিজয় বৃদ্ধের মৃতদেহ তুষারের মধ্যে রাখিয়া আসিল। তার পর বনভূমি হইতে কমলার বিদায়দৃশ্য, এ স্থানে শকুন্তলার কথা মনে পড়ে ; বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে শকুন্তলার মত কমলাও তাহার হরিণ ও পাখির নিকট বিদায় লইল।

তৃতীয় সর্গে কমলা লোকালয়ে আসিয়াছে। বিজয়ের এক সখী তাহাকে নানাপ্রকারে ভুলাইয়া সান্ত্বনা দিয়া সুখী করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কমলার হৃদয় ভারাক্রান্ত ; সে কিছুতেই তাহার সেই বন গিরি নদী তাহার হরিণ, পাখির কথা ভুলিতে পারিতেছে না।

লভেছি জনম, করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভোরে !
ভুলিব সে বন ?— ভুলিব সে গিরি ?
সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে ?
মৃগে যাব ভুলে— কোলে লয়ে তুলে
কচি কচি পাতা দিতাম ছিঁড়ে।
হরিণের ছানা একত্রে দুজনা
খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াত সুখে !

১ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্য হইতে গৃহীত পংক্তির সহিত তুলনীয়।
২ বনফুল, ১ম সর্গ। জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮২ অগ্রহায়ণ। পৃ. ৩৫-৩৬। ঐ গ্রন্থ পৃ. ৩-৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড পৃ. ৫২-৫৩।
৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০।

শিঙ্গ ধরি ধরি খেলা করি করি
আঁচল জড়িয়ে দিতাম মুখে ![1]

কমলা কখনো মানবসমাজের সংস্পর্শে আসে নাই, তাই মানুষের প্রতি তাহার আকর্ষণ কম। ক্রমে বিজয় কমলাকে বিবাহ করিল ; কিন্তু কমলা সংসারের কিছুই বোঝে না, সে ভালোবাসিল বিজয়ের বন্ধু নীরদকে। বালক-কবি বালিকার মুখ দিয়া বলাইতেছেন।—

জেনেছি মানুষ কাহারে বলে !
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে !
জেনেছি রে হায় ভাল বাসিলে
কেমন আগুনে হৃদয় জ্বলে ![2]

কমলা ও সখী নীরজা বাগানে বেড়াইতেছে, এমন সময়ে দূরে নীরদ গান করিল—

কি জানি লো বালা ! কিসের তরে
হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া উঠে !
কি জানি কি ভাব ভিতরে ভিতরে
জাগিয়া উঠেছে হৃদয় পুটে !
অস্ফুট মধুর স্বপনে যেমন
জাগি উঠে হৃদে কি জানি কেমন
কি ভাব কে জানে কিসের লাগি !
বাঁশরীর ধ্বনি নিশীথে যেমন
সুধীরে গভীরে মোহিয়া শ্রবণ
জাগায় হৃদয়ে কি জানি কেমন
কি ভাব কে জানে কিসের লাগি।
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত এ মনে
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত স্মরণে
ঘুমন্ত পরাণ উঠেছে জাগি ![3]

কমলা মনের কথা লুকাইতে জানে না, নীরদকে সে তাহার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করিল।

চতুর্থ সর্গে কমলার সহিত নীরদের সাক্ষাৎ হইল। নীরদ কমলাকে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না বলিয়া কমলাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল ; বলিল, বিজয় তাহার স্বামী, এখন অপুর কাহারও কথা মনে করা পাপ। কিন্তু কমলা সেসব কথা কিছুই বুঝিতে পারে না।

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড. পৃ. ৬৭।
২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড. পৃ. ৭০।
৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড. পৃ. ৭৪।

বিবাহ কাহারে বলে জানি না তা আমি···
কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী,
কারে বলে ভালবাসা আজিও শিখি নি।
এইটুকু জানি শুধু এইটুকু জানি,
দেখিবারে আঁখি মোর ভাল বাসে যারে
শুনিতে বাসি গো ভাল যার সুধাবাণী—
শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে!···
বিবাহ কাহারে বলে জানিতে চাহি না—
তাহারে বাসিব ভাল, ভাল বাসি যারে![১] ···

নীরদ তাহাকে ভর্ৎসনা করিল ও অশ্রু সংবরণ করিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কমলা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমেই সংসারের জটিলতা ঘনাইয়া উঠিতেছে। সখী নীরজা বিজয়কে ভালোবাসে, কিন্তু সে কথা বিজয় জানে না এবং নীরজাও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, কারণ সে জানে বিজয় কমলাকে বিবাহ করিয়াছে। এদিকে বিজয় বন্ধু নীরদের উপর সন্দিহান হইয়া গোপনে তাহাকে হত্যা করিল; কমলা নীরদের মৃত্যুশয্যার পাশে নীরবে বসিয়া থাকিল। মৃত্যুকালে নীরদ বলিয়া গেল,

একদিন অশ্রুজল ফেলিবে বিজয়
একদিন অভিশাপ দিবে ছুরিকায়!

নীরদের মৃত্যুর পর কমলা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইল; পুরাতন আরণ্যকুটিরে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু সে অরণ্যে আশ্রয় পাইল না; শিশুকালের স্বর্গ আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা আজ অসম্পূর্ণ মনে হইল। বনভূমির এই কঠিন নিদারুণ প্রত্যাখ্যান বেদনাকাতর কমলার পক্ষে কি সাংঘাতিক সকরুণ। বনফুলের 'ট্র্যাজেডি' এইখানে চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

তেরো বৎসরের বালক-কবি যে এই আখ্যায়িকাটি নির্বাচন করিয়াছিলেন, ইহা আমরা একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুগভীর সম্বন্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যে নানাস্থানে ঘটিয়া উঠিয়াছে। তপোবনকে আশ্রয় করিয়া মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলন যে এই ভারতবর্ষেই একদিন চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল এ কথা কবির মনকে চিরদিন নাড়া দিয়াছে। বাল্যকালেও কাব্যের বিষয় নির্বাচন করিবার সময়ে তিনি প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত কবিতা, যাহাকে কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে পদ্যপ্রলাপ আখ্যা দান করিয়াছেন, তাহা সত্যই 'প্রলাপ' নামে কবিতাগুচ্ছ। বালক-কবির কল্পনাশক্তি ও রচনাভঙ্গির নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইতেছে।[২]—

আয় কল্পনা মিলিয়া দুজনা
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, পৃ. ৮২।
২ জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮২ অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৬-১৭। দ্র. শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ কার্তিক, পৃ ১৫১

সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।
দেখিব উষার পুরব গগনে
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।
তুষারদর্পণে দেখিছে আনন
সাঁঝের লোহিত জলদঘটা॥
ঝর ঝর ঝর নদী যায় চলে,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
চপল নিঝর ঠেলিয়া পাথর
ছুটিয়া-নাচিয়া-বহিয়া যায়।
বসিব দুজনে— গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয় ব্যথা ;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগৎ শুনিবে সেসব কথা।

বোধ হয় আরো কিছুদিন পরে লিখিত—

ঢাল্ ঢাল্ চাঁদ! আরো আরো ঢাল্।
স্থনীল আকাশে রজতধারা।
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হয়েছে পাগলপারা।
গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি।
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরাণ আজিকে উঠেছে মাতি।

বালক-কবির অন্তরের জ্বালার কথাও এই প্রলাপগুচ্ছে প্রকাশ পাইয়াছে—

আয় লো প্রমদা! নিঠুর ললনে
বার বার বলি কি আর বলি!
মরমের তলে লেগেছে আঘাত
হৃদয় পরাণ উঠেছে জ্বলি।

ইংরেজিতে যাহাকে বলে precocious child তাহা না হইলে তেরো বৎসরের বালকের পক্ষে এই স্তবকটি লেখা সম্ভব নহে। বালকহৃদয় হইলেও বালকোচিত হৃদয়াবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রের অভাব ছিল না, এবং সেইসব fancyকে ঘিরিয়া বিচিত্র অনুভূতি বা অনুভূতির ভান করিয়া কবিতা লেখা এই অসাধারণ বালকের পক্ষে আশ্চর্য নহে।

'বনফুল' ও 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছের সমকালে রচিত কতকগুলি কবিতা আছে 'শৈশব সংগীত'এর (১২৯১) মধ্যে। কিন্তু কোন্‌টি এই সময়ের রচনা তাহার কোনো নির্দেশ নাই। চারিটি ছাড়া শৈশব সংগীতের কবিতাগুলি সবই ভারতীতে

(১২৮৪ হইতে ১২৮৭) প্রকাশিত হয়; সেগুলি পুরাতন রচনা না সমসাময়িক রচনা, তাহা জানিবার উপায় না থাকায় আমরা ঐ কবিতাসঞ্চয়নের মধ্যে কবির বনফুলের সমকালীন রচনা সন্ধানে নিবৃত্ত হইলাম।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যেগদ্য প্রবন্ধ লেখেন তাহাও জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হয়; সেটি গ্রন্থসমালোচনা বা ক্রিটিসিজম (১২৮৩ কার্তিক)। প্রবন্ধটির নাম 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'।[১] তিনখানিই কবিতাগ্রন্থ—প্রথমখানির রচয়িতা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,[২] 'অবসর সরোজিনী'র কবি রাজকৃষ্ণ রায়[৩] ও 'দুঃখসঙ্গিনী'র লেখক হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী[৪]। 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' কাব্যের লেখককে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে অমর করিয়া গিয়াছেন। জীবনস্মৃতির পাঠকরা অবগত আছেন 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র লেখিকাকে (?) লইয়া যখন খুবই গবেষণা চলিতেছে, তখন বালক-কবির সন্দেহ হয় যে ঐ কাব্যের রচয়িতা রমণী নহে। তাঁহার এক বন্ধু, বোধ হয় প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, (যিনি পরে কবি-কাহিনী প্রকাশ করেন) লেখিকার (?) নিজ হস্তে সহি করা পত্র আনিয়া বালক-কবিকে দেখাইতেন। কিন্তু ইহাতেও বালকের সন্দেহ নিরাকৃত হয় নাই। অতঃপর বালক ভুবনমোহিনীপ্রতিভা প্রমুখ কাব্যত্রয়ের সমালোচনা লিখিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশ করিলেন।

এই প্রবন্ধে খুব ঘটা করিয়া খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত বালক আলোচনা করিয়া মত দেন যে, আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে গীতিকাব্যের ধর্ম নাই। বাংলা গদ্যের নমুনাস্বরূপ আমরা কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—"মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়তো শত শত মনোভূমি উর্বর করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে। ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্বরা করিতে পারে।"[৫]

১ জ্ঞানাঙ্কুর, ৪র্থ খণ্ড, ১২৮২-৮৩। ১২৮৩ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা, পৃ. ৫৪৩-৫৫০।

২ ভুবনমোহিনীপ্রতিভা (১২৮০) কাব্যের লেখকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এই কাব্যখানিকে অমর করিয়া গিয়াছেন। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৬০-১৩২৯) ছিলেন বীরভূম জিলার কীর্নাহারের অধিবাসী; পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেন। এতদঞ্চলে নবীনবাবুর লৌহসার ছিল 'ডি গুপ্তের'ই সমতুল্য খ্যাত ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধ। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি একদা যশোলাভ করেন। নবীনচন্দ্রের অপর গ্রন্থ হইতেছে 'আর্যসঙ্গীত' (দ্রৌপদী-নিগ্রহ কাব্য ১৮৮০), 'আর্যসঙ্গীত' (জাতিনিগ্রহ কাব্য ১৯০২) সিন্ধুদূত (১২৮৩)। এই শেষোক্ত কাব্যের রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় 'ভারতী'তে (১২৮৩) ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কবিতাগুলিকে ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার রচনা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মাইয়া নবীনচন্দ্র বোধ হয় কৌতুক দেখিতেছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'বান্ধব' পত্রিকায় (১২৮২ ফাল্গুন) ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেটে' (১২৮২ চৈত্র ২৬) ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী' কাগজে এই মহিলা (?) কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করেন। আসল কথা বিনোদিনী নামে এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন ভুবনমোহিনী দেবী, রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী। নবীনচন্দ্রই যথার্থ পত্রিকা পরিচালনা করিতেন; এবং তাঁহারই রচিত কবিতা 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' নামে প্রচারিত হওয়ায় সাহিত্যিক মহলে এই ধারণা জন্মে যে লেখক রমণী। দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৪৪: নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৩ রাজকৃষ্ণ রায় (১২৬২-১৩০৮) বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে সমসাময়িকভাবে যশ অর্জন করেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাস হিরণ্ময়ী, কিরণ্ময়ী এক কালে পাঠকদের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তাঁহার বীণা থিয়েটার একসময়ে কলিকাতায় সুখ্যাত ছিল।

৪ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী। দুঃখসঙ্গিনী (১২৭৫), ভারতের সুখ (১২৭৫, প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত-আগমন উপলক্ষে রচিত কাব্য)। 'বিনোদমালা' (১২৮৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০৫), 'মালতীমালা' (১৮৯) 'প্রীতি উপহার' ইত্যাদি রচয়িতা। 'দুঃখসঙ্গিনী' বঙ্গদর্শনে প্রশংসিত হইয়াছিল। দ্র. সুকুমার সেন, বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬২।

৫ জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮৩ কার্তিক পৃ. ৫৪৩। দ্র. শনিবারের চিঠি ১৩৪৬, কার্তিক পৃ. ১৫১

জ্ঞানাঙ্কুরে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কবির এক বন্ধু (প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ?) উত্তেজিত হইয়া আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেন যে, একজন বি. এ. তাঁহার সমালোচনার জবাব লিখিতেছেন। এই দুঃসংবাদে রবীন্দ্রনাথ কীরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন তাহা জীবনস্মৃতি পাঠকদের নিকট অবিদিত নাই। সুখের বিষয়, কোনো বি. এ. তাঁহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

বালক-কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'হিন্দুমেলায় উপহার' দ্বিভাষিক-সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে উহা সাহিত্যিকদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ হয়তো করে নাই। কিন্তু 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় মাসে মাসে বনফুল কাব্য ও অন্যান্য রচনাবলী প্রকাশের প্রতিক্রিয়া যে অভিজাত সাহিত্যিক সমাজে কিছুই হয় নাই— এ কথা তো আমাদের মনে হয় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে অনেকেই আসিতেন, তাঁহারা এই বালক-কবির প্রতিভার কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস-লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত, দার্শনিক পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি জ্ঞানাঙ্কুরের লেখকরা নিশ্চয়ই জানিয়াছিলেন যে 'বনফুল' কাব্য রচয়িতা তাঁহাদের সহ-লেখক বালকটি কে। যুবক সাহিত্যিকরা এই সম্ভ্রান্ত সুদর্শন সুকণ্ঠ কবির সহিত পরিচিত হইবার জন্য নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা করিতেন। চন্দ্রনাথ বসু (১২৫১-১৩১৭) ছিলেন সে যুগের ছাত্র ও তরুণ সাহিত্যিক মহলের নেতৃস্থানীয়। সে সময়ে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি বার্ষিক সভা বসিত। দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে[১] (১৮৭৬ জানুয়ারি) তিনিই সম্মিলনীর সম্পাদকরূপে বালক-রবীন্দ্রনাথকে সভায় লইয়া যান। চন্দ্রনাথের বয়স তখন একত্রিশ বৎসর, রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় পনেরো, তখন তিনি সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলের নামে-মাত্র ছাত্র। কলেজ রি-ইউনিয়ন-সভা হয় রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত-কুঞ্জে' (Emerald Bower)। রাজনারায়ণ বসু প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতম; রবীন্দ্রনাথের উপর কি একটা কবিতা পড়িবার ভার অর্পিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই অন্যের রচনা, নিজের কোনো রচনা হইলে স্মরণ থাকিত। এই সভাতে তিনি সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (বয়স ৩৮) দেখেন। বঙ্কিমের সেই স্মৃতি তাঁহার মনে চিরকাল অম্লান ছিল। এই অধিবেশনে তৎকালীন খ্যাতনামা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৩৮) 'সুহৃদ্‌-সমাগম' নামে কবিতা পাঠ করেন।[২]

স্বাদেশিকতা : সঞ্জীবনী সভা

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাজনীতিক্ষেত্রে যুবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে সার্‌ সুরেন্দ্রনাথ) ভারতীয় সিবিল সার্বিসের চাকুরি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টিকল্পে দেশময় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইতালির স্বাধীনতা-মন্ত্রের গুরু মহাবিপ্লবী মাৎসিনির (১৮০৫-৭২) শিষ্য। আমাদের আলোচ্যপর্বে ইংরেজি ভাষায় মাৎসিনির রচনাবলী ও জীবনকাহিনী প্রকাশিত (১৮৬৪-৭০) হওয়ায় এতদ্দেশীয় শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে উহা পাঠ করা সহজসাধ্য হইল। সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে উদীয়মান সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার নবপ্রকাশিত 'আর্য্যদর্শন'[৩] পত্রিকায় মাৎসিনির জীবনী[৪] ধারাবাহিক প্রকাশ করিলেন। মাৎসিনির অতুলনীয় দেশাত্মবোধ আত্মত্যাগ পরার্থপরতা ও মানবহিতৈষণা— যাহা তিনি তাঁহার *Duties of Man* নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন

১ দ্র. জীবনস্মৃতি, ১৩৫০ সংস্করণ, পৃ. ১৫৫ পাদটীকা।

২ দ্র. বঙ্গদর্শন ১২৮২ অগ্রহায়ণ। মন্মথনাথ ঘোষ : হেমচন্দ্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ২·২। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৩২২। রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, পৃ. ২০৬-৭। বারাকপুর ট্রাংক রোডের উপর এই অট্টালিকা ও সংলগ্ন জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাইয়াছেন (১৯৫৬)।

৩ আর্য্যদর্শন ১২৮১ বৈশাখ (১৮৭৪ এপ্রিল) প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪ ম্যাটসিনির ইতিবৃত্ত। চৈত্র ১২৮৮ (১৮৮০ এপ্রিল, পৃ. ২৩৯) গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

তাহারই প্রতি বাঙালি যুবকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের আহ্বান আসিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রেরিত, অন্তরে অন্তরে সংস্কারপন্থী, বিধিসংগত আন্দোলনে চরম বিশ্বাসী; অথচ মাৎসিনি ছিলেন বিপ্লবপন্থী। সুরেন্দ্রনাথ মাৎসিনির বিপ্লবাদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই[১], কিন্তু দেশমধ্যে মাৎসিনির জীবনের মূলসূত্র অনাবিষ্কৃত ও অননুসৃত থাকিল না। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার ইংরেজি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনি-সম্পর্কীয় বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পাইয়া আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় যোগ দিলাম।... আমি একটি সমিতির কথা জানি— যার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল ছিন্ন করিয়া রক্ত বাহির করিতেন ও সেই রক্তে অঙ্গীকার-পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিতেন।

এইটি সঞ্জীবনী সভাই বোধ হয়।

মাৎসিনির বিপ্লবাত্মক গুপ্ত সভার ক্ষীণ অনুকরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রমুখ যুবকগণ ঠনঠনিয়ার এক পোড়ো বাড়িতে সঞ্জীবনী সভা নামে এক গুপ্ত সভা স্থাপন করিয়াছিলেন।[২] তৎকালীন সর্বপ্রকার স্বাদেশিকতা জাতীয়তা প্রভৃতি আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন চিরতরুণ চিরবৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। সঞ্জীবনী সভার অধ্যক্ষও ছিলেন তিনি। 'জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনো সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ-সভায় যাহা কথিত হইবে যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।'

আদিব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত-ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন; বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত-ভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত: সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য (অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব) আরম্ভ হইত। কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় 'সঞ্জীবনী সভা'কে 'হামচূপামুহাফ্' বলা হইত। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না; এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।"

সঞ্জীবনী সভা স্থাপন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন না; বাঙালির মৃতকল্প প্রাণে জীবনীশক্তি দান করিবার জন্য তিনি যেসব চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সার্বজনীন পোশাক, তাঁহার শিকারবিদ্যা ও শিকারবিদ্যা-শিখানোর উদ্যম, তাঁহার তাঁত ও দেশলাইএর কল করিবার প্রয়াস ও সর্বশেষে স্বদেশী স্টীমার কোম্পানি খুলিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইবার কাহিনী আজ অজ্ঞাত। বাঙালির সকল প্রকার স্বাদেশিকতা ও

১ মহাজাতি গঠন পথে... সুরেন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (*A Nation in Making*) পৃ. ৫০।

২ মাৎসিনি যৌবনে ইতালির স্বাধীনতাকামী 'কার্বোনারি' (Carbonari) নামে গুপ্তসভার সদস্য হন। 'কার্বোনারি'র অর্থ 'কাঠপোড়ানি' (charcoal burners); ইহাদের মধ্যে কথাবার্তা চলিত সাংকেতিক ভাষায় (mystic religious language); অনুষ্ঠানাদি কাঠপোড়ানিদের ভাষা হইতে গৃহীত; সেই জন্য অদীক্ষিতদের পক্ষে তাহাদের কাজকর্ম ভাষা বুঝা শক্ত ছিল। ইতালির গুপ্ত সভা কার্বোনারিদের অনুকরণে এই গুপ্তসভা গঠিত হয়।

বিপ্লবাত্মক কর্মের মূলে এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির ব্যর্থ জীবনের অবিস্মরণীয় কথা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান পাইবার উপযোগী তথ্য রূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। ইহার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর কাল কাটিয়াছিল।

এই সঞ্জীবনী সভার উত্তেজনায় বালক-রবীন্দ্রনাথ দিল্লীর দরবার সংক্রান্ত এক কবিতা লেখেন ও হিন্দু মেলার দশম অধিবেশনে উহা পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছিলেন, "লর্ড কর্জনের সময় দিল্লী-দরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি, লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে, তখনকার ইংরেজ গবর্মেণ্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক-কবির লেখনীকে ভয় করিত না।"

কবিতাটি পঠিত হয়, কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই ; কেন প্রকাশিত হয় নাই তাহার কারণ সমসাময়িক রাজনীতির ঘটনাবলীর মধ্যে নিহিত ; সেই তথ্যটি বিশ্লেষণ করিবার পর কবিতাটির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

লর্ড লিটন ১৮৭৬ এপ্রিল মাসে ভারতের বড়লাট ও ভাইসরয় হইয়া এ দেশে আসেন ; তিনি ছিলেন পরম ইমপিরিয়ালিস্ট্। ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া তখন ভারতেশ্বরী ; তিনি ১৮৩৭ অব্দে ব্রিটিশ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। চল্লিশ বৎসর পরে লর্ড লিটন দিল্লীতে দরবার করিয়া মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী ঘোষণা করিলেন (১৮৭৭ জানুয়ারি ১)। ইংলণ্ডের রাজারা ১৯৪৭ পর্যন্ত এই নূতন উপাধিতে অভিহিত হইয়াছিলেন। লর্ড লিটন যখন দিল্লীতে দরবার আহ্বান করেন তখন দিল্লী নগণ্য নগর ; কিন্তু মুঘল যুগের বাদশাহদের কুৎসিত অনুকরণে দিল্লীতে উৎসব অনুষ্ঠিত হইল (১৮৭৭ জানুয়ারি ১) ; এই সময়ে ভারতের নানাস্থানে দারুণ দুর্ভিক্ষ ; সেই মহাশ্মশানের কোলে উৎসব-আয়োজনটা অনেকের কাছেই বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল ; কিন্তু কঠোর সাম্রাজ্যবাদী লিটন সাধারণের কথায় কর্ণপাত করিতেন না। দেশীয় কাগজগুলি সরকারী কাজের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করিত বলিয়া তাহাদের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য আইন প্রস্তুত করিলেন, অস্ত্র-আইন প্রবর্তন করিয়া দেশকে নিরস্ত্র করিলেন। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের দিল্লী-দরবার কবিতাটি লিখিত।

সমসাময়িক 'সাধারণী' সাপ্তাহিক লিখিতেছেন (১৮৭৭ মার্চ ৪), "রবীন্দ্রবাবু দিল্লী-দরবার সম্পর্কে একটি কবিতা এবং একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষছায়ায় দুর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোলো কি সতর বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আর্দ্রিত হইয়াছিলাম, তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম।··· একজন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।[১]

এই সভায় কবি নবীনচন্দ্র সেন উপস্থিত ছিলেন ; তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে তরুণ রবির সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নবীনচন্দ্র লিখিতেছেন, "স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে 'নেশনাল মেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার বৎসরেক পূর্বে আমার পলাশির যুদ্ধ প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। একজন সদ্যপরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে পাকড়াও করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮৷১৯ [১৬], শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন— ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।

১ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, 'জাতীয় মেলা,' মাতৃভূমি ১৩৫২ ভাদ্র। জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয় অংশ, পৃ. ২৫১।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোশাক। সহাসিমুখে করমর্দন-কার্যটি শেষ হইলে তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনীলাঞ্ছনকণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্যে ও ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার দুই-এক দিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়িতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি নেশনাল মেলায় গিয়া একটি অপূর্ব নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি; এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি একদিন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয়বাবু বলিলেন— কে? রবিঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ির কাঁচামিঠা আঁব। তার পর ষোল বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ। আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হইয়াছে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের দিল্লী-দরবার কবিতাটি সমসাময়িক কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই; ইহার কারণ লর্ড লিটনের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট; কিছুকাল হইতে দেশীয় কাগজগুলি ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করিতেছিল; তাহাদের সেই ক্ষীণকণ্ঠের আর্তস্বরও রোধ করিবার জন্য এই আইন পাস হইল। এই আইনের কবলে পড়িয়া ভারতের বহু দেশীয় ভাষায় লিখিত পত্রিকা লোপ পায়; বাংলাদেশের সোমপ্রকাশ সাধারণী ও নববিভাকর স্বাধীনতা-লোপের প্রতিবাদে কাগজ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিল; আর্যদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিল; দ্বিভাষী অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা কলেবর সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া ইংরেজি সাপ্তাহিক রূপে রাতারাতি পরিবর্তিত হইল— কেবল পূর্বের বাংলা নামটা তাহার গায়ে রহিয়া গেল। নূতন আইনের আওতায় দেশীয় ভাষার কাগজগুলি পড়িবে— ইংরেজি পত্রিকা পড়িবে না। রাজদ্রোহ আইন ইতিপূর্বেই ছিল, সেই আইন এড়াইবার জন্য কবি হেমচন্দ্র 'ভারতসংগীত' কবিতাটি মধ্যযুগীয় মহারাষ্ট্রীয় যুবকের জবানী প্রকাশ করিয়াছিলেন।[২]

কবি নবীনচন্দ্র সরকারী কাজ করিতেন— আইনজ্ঞ ছিলেন; তিনি আইন বাঁচাইয়া মোহনলাল, মীরমদন, রানী ভবানীর মুখে দীর্ঘ উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বদেশপ্রীতিপূর্ণ বাণী বিঘোষিত করিয়াছিলেন (১৮৭৫)। নূতন প্রেস আইন প্রবর্তিত হইবার আয়োজনে সকলেই আতঙ্কিত; রবীন্দ্রনাথের দিল্লী-দরবার বিষয়ক কবিতা কোথাও মুদ্রিত হইল না। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী (১৮৮২) নাটকের মধ্যে কবিতাটিকে সামান্য অদলবদল করিয়া 'ব্রিটিশে'র বদলে 'মোগল' বসাইয়া সন্নিবেশিত করা হইল। এ কবিতার অস্তিত্বই লোকে বিস্মৃত হয়; রবীন্দ্রনাথের স্মরণে রচনাটির ভাবধারা মাত্র ছিল; প্রাচীনকালে ভারতের সম্রাটগণ রাজসূয়াদি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন; সেসব উৎসবের দিনে ভারতের কী অবস্থা ছিল, আর আজ সেই দিল্লীতে কিসের উৎসব দেখিতে রাজন্যরা সমবেত হইয়াছিলেন।[৩]

বহু বৎসর পরে স্বপ্নময়ী নাটকের মধ্যে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে; সেখানে এই কবিতা শুভসিংহের স্বগত উক্তি।[৪]

১ নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, চতুর্থ ভাগ, পৃ. ২৬৫।

২ ভারতসংগীত, ১৮৭০ জুলাই ২২, । ১২৭৭ শ্রাবণ ৮, এডুকেশন গেজেট। হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' (১৮৭০ নভেম্বর) প্রথম সংস্করণে কবিতাটি ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়। দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা: হেমচন্দ্র, পৃ. ২২।

৩ ১৩১৭ সালে একবার অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে বেড়াইতে আসেন; সেই সময়ে কবি তাঁহাদের কাছে এই কবিতাটির কথা বলেন। "সেটি দিল্লীর দরবার উপলক্ষে লিখিত হয়। বহু উৎকট রকমের অনেক কথা আছে বলিয়া উহা কখনও ছাপা হয় নাই।"—সুপ্রভাত, ৩য় বর্ষ, ১৩১৭। দ্র. রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৭৮।

৪ চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। দ্র. রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৭৯-৮০। ব্রজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন এই তথ্যটি যতিনাথ ঘোষ তাঁহার গোচর করেন। পৃ. ৭৮।

কবিতাটির ভাষা ও ভাবের উদাহরণ স্বরূপ আমরা কয়েকটি পংক্তি উদ্‌ধৃত করিতেছি—

কিসের তরে গো ভারতের আজি সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি ?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে সন্ধান ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি !
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি একতারে কভু ছিল না গাথা,
আজিকে একটি চরণ-আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা !
হা রে হতভাগ্য ভারতভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল রাজের বিজয় রবে ?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষগান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান ।

বলা বাহুল্য, ভারত সম্বন্ধে এসব কল্পনা মোগলযুগে শুভসিংহের স্বপ্নাতীত।

সাধারণীতে 'দিল্লী-দরবার' কবিতা ছাড়া একটি গানের উল্লেখ আছে, সে গানটি হইতেছে—

ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণরাশি
যতদিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি
ততদিন তুই কাঁদ্ রে।···

এই গানটির কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

ভারতী পত্রিকা

জীবনের প্রথম প্রত্যুষে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবীর নিকট হইতে যে অযাচিত প্রেম ও প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার কাব্যজীবন-গঠনের কতখানি সহায় তাহার যথোপযুক্ত বিচার এখনও হয় নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন ঠাকুর-পরিবারের জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব কর্ম সর্ব আন্দোলনের কেন্দ্র। বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা ও চর্চায় ইঁহার আনন্দ ছিল অপরিসীম, উৎসাহ ছিল অদম্য, সাহস ছিল দুর্জয়। কিন্তু কখনো কোনো বিষয় শ্রমসহকারে অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করেন নাই, কেবল সহজ প্রতিভার দীপ্তিতে সকল বিষয় দেখিতেন বলিয়া কোনোটিই স্থায়ী ফলপ্রদ হয় নাই। চিত্রে সংগীতে নাট্যে ভাষাশিক্ষায় ব্যবসায়ে স্বাদেশিকতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা ব্যাপ্ত ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুমুখীনতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীরভাবে প্রতিফলিত ও সুন্দররূপে সার্থক হইয়াছিল। এই জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনসন্ধ্যায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় কৃতজ্ঞতার চরম স্বীকৃতি—
"পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম,

বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।"[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সুপ্ত শক্তির সন্ধান আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিলে বেশি বলা হইবে না। তিনি বুঝিয়াছিলেন এই ভাবপ্রবণ বালককে সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলের পাঠ্য বইয়ের খোঁটায় বাঁধিয়া পীড়ন করা নিরর্থক। তাই তাহার সাহিত্যশিক্ষায় ভাবচর্চায় তিনিই হইলেন প্রধান সহায়। তাঁহার সংস্রবে রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার সংকোচ খুলিয়া গেল। নূতন বৌঠানও স্নেহের দ্বারা দেবরের কাব্যজীবনের ভাবধারা উন্মোচনে সোনার কাঠির স্পর্শ দিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যমজলিসের মধ্যমণি ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।[২] ইনি ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী ও প্রায়-সমবয়সী বন্ধু, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ হইতে এগারো-বারো বৎসরের বড়। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজ অধ্যাপকের নিকট ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াও বাংলা সাহিত্যের রসগ্রহণে তাঁহার আদৌ বাধা ছিল না। তাঁহার অসামান্য রসানুভূতির শক্তিবলে তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে কাব্যবিচারের একটি সুষ্ঠু মানসূচী ধরিয়াছিলেন। সে-যুগের ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে তিনিই রবীন্দ্রনাথের কাছে মূর্তিমান করিয়া তোলেন, এবং বোধ হয় তাঁহারই প্রেরণায় তিনি সে-যুগের পক্ষে আধুনিক ইংরেজ কবিদের কবিতা বাংলা ছন্দে ও ভাষায় অনুবাদ করিতে সমর্থ হন। ইঁহারই কাছে রবীন্দ্রনাথ কবি মুরের Irish Melodies ও বালক-কবি চ্যাটার্টন সম্বন্ধে তথ্য অবগত হন।

১ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পরিপূর্তি উপলক্ষে যে জয়ন্তী হয়, তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দনের প্রতিভাষণ। প্রবাসী ১৩৩৮ মাঘ, পৃ. ৫১১। দ্র. আত্মপরিচয়, পৃ. ৮৯।

২ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮) এম. এ, বি. এল। হাইকোর্টের এটর্নী। উদাসিনী (১২৮১) মাধবমালতী (জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮২ পৌষ) ও ভারত-গাথা (কবিতায় ভারত-ইতিহাস) রচয়িতা। 'উদাসিনী' পার্নেলের (Thomas Parnell, 1679-1718) *The Hermit* নামে কাব্যের ভাবানুবাদ। (সমালোচনা, বঙ্গদর্শন ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ)। ১২৮২ সালের কাছাকাছি সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসেন। বাল্মীকিপ্রতিভার দুইটি গান অক্ষয়চন্দ্রের রচনা। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' শুনিয়া তিনি 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' (ভারতী ১২৮৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দুইটি কবিতা প্রকাশিত হয়) কবিতা লেখেন। 'প্রভাতসংগীত' প্রথম সংস্করণে (১২৯০ বৈশাখ) অক্ষয়চন্দ্রের কবিতাটি মুদ্রিত হয়। ১৮৮৩ (১২৯০) সালে কারোয়ার বাসকালে সত্যেন্দ্রনাথ একটা কোয়ারটজ পাথর রবীন্দ্রনাথকে দেন। রবীন্দ্রনাথ সেই পাথরকে হৃদপিণ্ডের আকারে কাটিয়া এই কয়টি পংক্তি খোদাই করিয়া অক্ষয়চন্দ্রকে উপহার দেন।—

পাষাণহৃদয় কেটে
খোদিনু নিজের হাতে
আর কি মুছিবে লেখা
অশ্রুবারিধারা-পাতে।

দ্র. Calcutta Municipal Gazette, 1941 Sep 13, Tagore Memorial Special number। ইঁহারই রচিত কাব্য উদাসিনী সে যুগের গাথাকাব্যে রোমাণ্টিসিজমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে— সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

শশিভূষণ বসুর কন্যা শরৎকুমারীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয় (১৮৭১ মার্চ)। শরৎকুমারীর উপন্যাস 'শুভবিবাহ' রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেন। (দ্র. আধুনিক সাহিত্য)। ইনি বাল্যকালে লাহোরে থাকিতেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে লাহোরানী বলিতেন। (দ্র. কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।) বিশ্বভারতী পত্রিকা অষ্টম বর্ষ ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র, পৃ. ২১৫-২২২। অক্ষয়চন্দ্রের কন্যা উমা দেবীর সহিত যতীন্দ্রনাথ বসুর বিবাহ হয়। ইনি রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের জামাতা শিল্পী অতুল বসু।

ইতিমধ্যে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ি হইতে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের ইচ্ছা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ভালো করিয়া জাঁকাইয়া তোলা। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ইচ্ছা সাহিত্য সেবা ও চর্চা এবং তদুপযুক্ত মাসিক পত্র প্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহার নাম দেন 'সুপ্রভাত' ; সে-নাম সকলের পছন্দ না হওয়ায় 'ভারতী' নাম রাখা স্থির হইল। জ্যোতিরিন্দ্রের নাম কখনো ভারতীর সম্পাদকীয় তালিকায় স্থান না পাইলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতী ছিল তাঁহার মানসকন্যা। দ্বিজেন্দ্রনাথ হইলেন সম্পাদক ও ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৭৭ জুলাই) ভারতীর প্রথম সংখ্যা বাহির হইল।

১২৮৪ সালে বাংলাদেশে কয়খানিই বা মাসিক পত্র ছিল। তখন 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র চিহ্নমাত্র ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন চারি বৎসর (১২৭৯-৮২) চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; এক বৎসর বন্ধ থাকিয়া ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার সে দীপ্তি আর নাই। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আর্য্যদর্শন' ধূমকেতুর ন্যায় বহু মাস অন্তর কদাচিৎ দেখা দিত। ঢাকা হইতে কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' ১২৮১ সাল হইতে প্রকাশিত হইতেছে ; আর নামকরা মাসিক পত্র না থাকিবারই মত।

তখনকার দিনে পত্রিকাদি চিত্রসম্বলিত করিবার সুলভ রীতি আবিষ্কৃত হয় নাই, রচনাগৌরবই ছিল পত্রিকার আভিজাত্য। নূতন পত্রিকার জন্য রচনাসংগ্রহের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথকেই সাহিত্যিক মহলে ঘোরাঘুরি করিতে হইত কারণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োকনিষ্ঠ এবং এক হিসাবে বেকার। এই রচনাসংগ্রহ-অভিযানের ফলে কলিকাতার বুধমণ্ডলীর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। নব-পরিচিতদের মধ্যে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সহিত পরিচয়ই বালকের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। অবোধবন্ধু পত্রিকায় ইঁহারই কাব্যসুধা তিনি কী আবেগে প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছিলেন তাহার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে ; এতদিন কবির কাব্যের সহিত পরিচয় ছিল, এখন কাব্যের কবির সহিত পরিচয় ঘটিল ; এটি একটি নূতন অনুভূতি। বিহারীলালের গৃহমধ্যে তাঁহাকে কাব্যরচনায় তন্ময় দেখিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখেন তাঁহাদের বাড়িতে বিহারীলাল সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ; দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে তাঁহার দ্বার অবারিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় দেখেন ; এমনকি অন্তঃপুরে নূতন বৌঠান কবিকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান, তাঁহার জন্য আসন বুনেন, তাঁহার কবিতা সশ্রদ্ধভাবে আবৃত্তি করেন! কবির সম্মান ও সমাদর সর্বত্র। কাদম্বরী দেবী ছিলেন বিহারীলালের বিমুগ্ধ ভক্ত ; তিনি আশা করিতেন যে কাব্যরচনায় তাঁহার আদরের দেবরটির যেরূপ প্রতিভা, কালে তিনি বিহারীলালের সমকক্ষ কবি হইতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের তখন আত্মবিশ্বাস জাগে নাই, তাই এইসব আশা ও উক্তিকে ভয়ে ভয়ে বিশ্বাস করিতেন এবং বিহারীলালের কাব্যকেই কাব্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আদর্শ জ্ঞানে অন্তর দিয়া তাঁহারই অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতীর জন্য রচনাসংগ্রহ উপলক্ষে যেমন বিচিত্র লোকের সহিত পরিচয় হইল, তেমনি নিজেদের পারিবারিক পত্রিকা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিচিত্র রচনা নির্বিচারে প্রকাশ করিবার বাধা দূর হইল। দুই বৎসর পূর্বে 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব'এর পৃষ্ঠায় তাঁহার গদ্য ও পদ্য প্রলাপ যেমন নির্বিচারে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারতীতে সেই সুযোগ দেখা দিল শতগুণে। বালকের লিখিবার শক্তি ছিল অসাধারণ, প্রকাশের বাধা ছিল সামান্য, সাহিত্যবিচারের মানসূচী ছিল অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।[১]

১ 'ঝাঁন্সীর রানী', ভারতী ১২৮৪ অগ্রহায়ণ মাসে রচনাটি ভ. (অর্থাৎ ভানুসিংহ) স্বাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই ইহা তাঁহার রচনা বলিয়া স্বীকৃত হয় ; দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সংকলিত 'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ কার্তিক। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত রচনাটির প্রাথমিক খসড়া শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। 'ইতিহাস' (লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী ১৩৬২) গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে, পৃ. ১০৩-১১৩।... ১৯৫৭ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী স্মরণে পুস্তিকাকারে প্রবন্ধটি কবির স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্রণ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। হস্তাক্ষর দেখিয়া উহা রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে বলিয়াও সন্দেহ হয়। দ্রষ্টব্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

জ্ঞানাঙ্কুরে তাঁহার গদ্য রচনা শুরু হয় সাহিত্য-সমালোচনা দিয়া; ভারতীতে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্য'এর সমালোচনা দিয়া রচনা আরম্ভ করিলেন। চিরদিনই দেখা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন লেখকগণ তাঁহাদের আবির্ভাবকে প্রবীণের সমালোচনা ও সনাতনীদের নিন্দার দ্বারা বিঘোষিত করেন; প্রতিভার ঔদ্ধত্যে বিচারবুদ্ধি তখন আবিষ্ট থাকে। রবীন্দ্রনাথ পরযুগে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনিও মধুসূদনের অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।[২]

ষোলো বৎসর বয়সের এই গদ্যরচনা কবি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কখনো পুনর্মুদ্রিত করেন নাই। কিন্তু প্রবন্ধটির সমস্তটাই যে অযৌক্তিক বাক্যচ্ছটা তাহা ভাবিবার কারণ নাই, অনেক কথা এখনো বিচার্য। আমরা একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করিব। কাব্যের প্রথমে রাবণের সভায় বীরবাহুবধের সংবাদে যে ক্রন্দনের বর্ণনা আছে, তাহা নবীন সমালোচকের মতে অত্যন্ত অশোভন। বীরের পক্ষে এইভাবে ক্রন্দন, সভাসুদ্ধ সকলের এইরূপ আত্মবিহ্বলতা ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন অশোভন, কাব্যেও তেমনি অসুন্দর। 'ম্যাকবেথ' নাটকে সিউয়ার্ড তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে যে সংযম দেখাইয়াছিলেন, অ্যাডিসন লিখিত 'কেটো' নাটকে পুত্রশোকাতুর কেটো যে গাম্ভীর্য প্রকাশ করিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে লক্ষ্মণ সিংহের দ্বাদশ পুত্র নিধনের পরেও তাঁহার যে বীরত্ব ও স্থৈর্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্যে একটা আদর্শ স্থাপন করিয়াছে; কিন্তু তাহার তুলনায় মাইকেল-বর্ণিত রাবণ অত্যন্ত দুর্বল চরিত্র। সমালোচক 'সাহিত্যদর্পণ' হইতে কাব্যের দোষ কি তাহা এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করিয়া এই মহাকাব্যকে সেই মানসূচী হইতে বিচার করেন ও পদে পদে দোষত্রুটি দেখান। লেখক তাঁহার যুক্তির সমর্থনে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণ, গ্রাম্য ও স্বভাব-কবিদের গান ও কবিতা, এমনকি কবিওয়ালা হরুঠাকুরের রচনা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন। মোট কথা, সমস্ত প্রবন্ধটি মেঘনাদবধ মহাকাব্যের একটি কঠোর সমালোচনা।

মধুসূদনের মহাকাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই কঠোর বিরূপতার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, নর্মাল স্কুলে পড়ার সময়ে তাঁহাকে যেসব গ্রন্থ 'পাঠ্যপুস্তক' হিসাবে অধ্যয়ন করিতে হইত, তাহার মধ্যে ছিল মেঘনাদবধ কাব্য। কাব্যহিসাবে কল্পনাপ্রিয় বালককে এই গ্রন্থ কখনো আকর্ষণ করে নাই; অনিচ্ছার বশে, শাসনের দায়ে, ভাষাশিক্ষার অজুহাতে কাব্যপাঠ করার মত এত বড় বিড়ম্বনা আর নাই। জীবনস্মৃতিতে মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য। "যে-জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভালো কাব্য পড়াইলে" কাব্যের অমর্যাদা হয়। "কাব্য-জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান-ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনোই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।" 'মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা'র সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই, তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইতিপূর্বে এমন নির্ভীক বিস্তারিত সমালোচনা বাংলাসাহিত্যে কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধেই হয় নাই।[৩]

স্বাক্ষরিত ফোটো, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১, পৃ. ১০৮। এই প্রবন্ধশেষে আছে "আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৩১০ সালে (১৯০৩) ঝাঁন্সীর রানী জীবনী মারাঠী হইতে (পৃ. ৭৩) প্রকাশ করেন।

১ মেঘনাদবধ কাব্য। ভারতী ১২৮৪ প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ, পৃ. ৭-১৭। ভাদ্র, পৃ. ৬৫-৬৯। আশ্বিন পৃ. ১০৩-১১১। কার্তিক পৃ. ১৬১-৬৪। পৌষ, পৃ. ২৬৯-৭৪। ফাল্গুন, পৃ. ৩৬৬-৭০— প্রায় ৩৬ পৃষ্ঠা প্রবন্ধ। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না; ছিল ভঃ। বোধ হয় ভানুসিংহের আদ্যক্ষর।

২ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জন্ম ১৮২৪ জানুয়ারি ২৫ : মৃত্যু ১৮৭৩ জুন ২৯। মৃত্যুকালে বয়স মাত্র ৪৯ বৎসর মেঘনাদবধ কাব্য ১৮৬১ অব্দে (বয়স ৩৭) প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের মৃত্যুর চারি বৎসর পর ও কাব্য প্রকাশিত হইবার ষোলো বৎসর পর এই সমালোচনা লিখিত হইয়াছিল।

৩ মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে বহুকাল পরে 'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৩১৪) প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই তাঁহার পরিপক্ব মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। দ্র. সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ড।

ছোটগল্প রচনার হাতেখড়ি হয় ভারতীর প্রথম দুই সংখ্যায়।[১] 'ভিখারিনী' গল্প হিসাবে এতই নগণ্য যে রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন ইহার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। 'ছেলেবেলা'য় এই গল্প সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সেটা যে কী বকুনির বিস্থনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না। বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।" অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃত ছোটোগল্প প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা।"..."রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে-সকল গল্প লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে 'দামিনী' [সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮১] গল্পটিতেই ছোটোগল্পের লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা 'ভিখারিনী' গল্পেও ছোটোগল্পের ঠাট বজায় আছে।"[২]

ছোটগল্প লিখিয়া বোধ হয় একটু সাহস হয়, তাই 'করুণা'[৩] নামে উপন্যাস শুরু করিলেন। এই উপন্যাস-খানি তাঁহার এই সময়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাব্যেরই অনুরূপ, গল্পাংশ তুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এইসব রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে— উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।" "তরুণ বাংলা সাহিত্যের এমন একটা বিস্তার ও প্রভাব হয় নাই যাহাতে সেই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'করুণা' উপন্যাস সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে কোনো কথাই বলেন নাই, গ্রন্থ আকারে উহা কখনো প্রকাশিতও হয় নাই ; কিন্তু ইহার প্রতি মায়া এক সময় পর্যন্ত তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয়। ভারতীতে উহা প্রকাশিত হইবার সাত বৎসর পরে তিনি চন্দ্রনাথ বসুকে ভারতীর প্রথম দুই বৎসরের পত্রিকা পাঠাইয়া দিয়া 'করুণা' সম্বন্ধে বোধ হয় তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন ; চন্দ্রনাথবাবু করুণার অতি বিস্তৃত সমালোচনাপূর্ণ যে পত্র লেখেন তাহা বহুকাল পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৪] তাহাতে তিনি লেখেন (১৭ আশ্বিন ১২৯১) "গল্পটি পুস্তকাকারে ছাপানো আবশ্যক।" কিন্তু এ যাবৎ তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

আমরা পূর্বে একস্থানে বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত প্রায় সকল কাব্যই তিনি কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করিয়াছিলেন, কেবল রাখিয়াছেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তথাকথিত

১ ভিখারিনী, ভারতী ১২৮৪ প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ ; দ্বিতীয় সংখ্যা ভাদ্র। ভিখারিনী গল্পটি দেশ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, ১৩৬১ বৈশাখ ২৫।

২ শরৎকুমারী চৌধুরানী 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "ছোটোগল্প প্রথম যেটি প্রকাশিত হয় তাহা রবিবাবুর, পরে তাঁহার একটি গল্প ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতে থাকে।" —বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ কার্তিক-পৌষ।

৩ "প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনা 'করুণা' নামক গল্প তাহার নমুনা।"—জীবনস্মৃতির খসড়া। জীবনস্মৃতিতে (চলিত সংস্করণে) করুণার নাম নাই। ভারতী ১২৮৪ আশ্বিন, পৃ. ১৩৮-১৪০ ভূমিকা ও প্রথম পরিচ্ছেদ ; কার্তিক, পৃ. ১৭০-১৮০, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ। —ঐ অগ্রহায়ণ পৃ. ২২৯-২৩৪, পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৌষ, পৃ. ২৮৪-২৮৮—ষষ্ঠ, সপ্তম পরিচ্ছেদ। মাঘ মাসে নাই। ফাল্গুন, পৃ. ৩১৫-৩৭৮— অষ্টম, নবম, দশম পরিচ্ছেদ। চৈত্র, পৃ. ৪০৮-৪১৩— একাদশ-চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।
১২৮৫ বৈশাখ, পৃ. ৩৯ পঞ্চদশ-ষোড়শ পরিচ্ছেদ, জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৭৮-৮২— সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আষাঢ়। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, শ্রাবণ, পৃ. ১৫৩-১৬৫— উনবিংশ-দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ। ভাদ্র পৃ. ২২৬-২৩৪—২৩-২৭ পরিচ্ছেদ। [ইহার পর আর প্রকাশিত হয় নাই।]

৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা। দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৫১ চতুর্থ সংখ্যা পৃ. ৪২০-২৩।

পদাবলী ভারতীর আদি যুগের রচনা, অর্থাৎ কবির ষোল বৎসর বয়সের লেখা। ১২৮৪ সালের বর্ষাকাল। কবি লিখিয়াছেন, "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'।" ইহা লিখিয়া নিজের উপর বিশ্বাস জন্মিল ও তৎপরে একটির পর একটি কবিতা লিখিয়া চলিলেন। এইভাবে পদাবলীর সৃষ্টি। ভারতীতে প্রথম যে-কবিতাটি বাহির হইল, তাহার নাম ছিল 'ভানুসিংহের কবিতা', প্রথম পংক্তি ছিল 'সজনী গো— আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা চমকত দামিনী রে'। গানের সুর মল্লার লেখা ছিল।[১] এখন প্রশ্ন ওঠে বৈষ্ণব পদাবলী অনুকরণে কাব্য রচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া ও কোথা হইতে পাইলেন। বৈষ্ণব পদাবলী রচনার স্রোত বাংলা-সাহিত্যে বহুকাল হইতে তেমন প্রচলিত ছিল না। আধুনিক যুগে মাইকেল মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' (১৮৬১) বৈষ্ণব ভাবের কবিতা রচনা করেন সত্য, কিন্তু ব্রজবুলি ভাষা তিনি প্রয়োগ করেন নাই। আমাদের মনে হয় আধুনিক কবিতায় সর্বপ্রথম ব্রজবুলি ব্যবহার করেন বঙ্কিমচন্দ্র। মৃণালিনী উপন্যাসে যে-তিনটি গান আছে তাহা এই মিশ্র ভাষায় রচিত (১৮৬৯)। বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বর্ষে (১৮৭৪) 'র, জ' স্বাক্ষরে যে-চারিটা কবিতা আছে তাহাও এই কৃত্রিম ব্রজবুলিতে লেখা। সমসাময়িক পত্রিকা সন্ধান করিলে আরও হয়তো দুই-চারিটি কবিতা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন পদকর্তাদের এমন নকল-করা 'পদাবলী' রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেহ লিখিতে পারেন নাই। সেইজন্যই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সাহিত্যক্ষেত্র হইতে একেবারে বহিষ্কৃত হয় নাই।

বৈষ্ণব কবিতার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সম্বন্ধে এক পত্রে[২] লিখিয়াছিলেন, "আমার বয়স যখন তেরো-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি, তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলুম।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবসাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন সাহিত্যরসের জন্য, তত্ত্বের জন্য নহে; তিনি লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণবপদ-সমুদ্রের অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে পারে এই আশাতেই" তিনি উৎসাহিত হন।

বাংলা সাহিত্যের এমন-একটা যুগ ছিল যখন বাংলার এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষিত সমাজের নিকট প্রায় অজ্ঞাত ছিল। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যথার্থই লিখিয়াছেন, "যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন সেকালে বটতলা ছাড়া বৈষ্ণব কবিতা আর কোথাও পাওয়া যাইত না।··বৈষ্ণব কবিতার যে শুধু সমাদর ছিল না এমন নহে তাচ্ছিল্য ভাবও লক্ষিত হইত।··বটতলার নিকৃষ্ট পুস্তকালয়ে বৈষ্ণব ভিক্ষুকের কণ্ঠে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল।"[৩]

বাংলার শিক্ষিত সমাজ বলিতে আধুনিক যুগে বুঝায় ইংরেজি-জানা সম্প্রদায়; বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি শিক্ষাভিমানী সমাজের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৮৭০ মার্চ ২৮)। কিন্তু গ্রন্থ হিসাবে প্রথম বৈষ্ণব পদাবলী সম্পাদন করেন জগবন্ধু ভদ্র (১৮৭০)। 'মহাজন পদাবলী'তে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে সমালোচনা ও বিদ্যাপতির পদাবলী ও টীকা প্রকাশিত হয়। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন।[৪]

অতঃপর অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) ও সারদাচরণ মিত্র (১৮৪৮-১৯১৭) সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'

১ ভারতী প্রথম বর্ষ ১২৮৪ আশ্বিন পৃ. ১৭৫। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৩ সংখ্যক কবিতা 'অভিসার'। মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠের কিছু পরিবর্তন আছে।

২ পত্র ২০ আষাঢ় ১৩১৭। প্রবাসী ১৩৩৪ পৌষ, পৃ. ৩৯০।

৩ রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা, প্রবাসী ১৩৩৯ বৈশাখ পৃ. ৬৭।

৪ রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত এই গ্রন্থখানি পুরাতন বইয়ের দোকান হইতে শ্রীযুক্ত পূর্ণীসিংহ নাহার সংগ্রহ করেন। ইহা দেখিয়াছিলাম।

(১৮৭৪-৭৬ তিনখণ্ড, চুঁচুড়া) বালকের হাতে পড়ে ; তৎসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত।"

জগবন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সারদাচরণ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র[১] ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[২] বৈষ্ণবসাহিত্যের কাব্য-সৌন্দর্য বাঙালি শিক্ষিতসমাজে প্রচার করেন ; যে সাহিত্য এতদিন ভক্ত বৈষ্ণবদের সাধনার ধন ছিল, তাহা এখন সাহিত্য-বিলাসীদের ভোগের বস্তু হইল। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট এই পদসমুদ্র সেই কাব্যরস-সম্ভোগের সামগ্রী, সাধনার সম্পদ নহে। তাই এই অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে কাব্যরত্ন সংগ্রহের জন্য তাঁহার এত ঔৎসুক্য।

বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যয়নের পদ্ধতি ছিল বালকের নিজস্ব ; তিনি লিখিয়াছেন, "আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।"

এই পদাবলী তিনি এমন গভীরভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, ইহার অনুকরণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। এই বয়সটা ছিল অনুকরণের যুগ। অবোধবন্ধুতে বিহারীলালের কবিতা পড়িয়া তাঁহারই মত কবি হইবার যেমন সাধ হইয়াছিল, বৈষ্ণবপদ-সমুদ্র মন্থন করিয়া পদকর্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা তেমনি জাগ্রত হয়।

কিন্তু এই কবিতাগুলি[৩] সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো মোহ ছিল না ; জীবনস্মৃতি রচনাকালে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে।" প্রাচীন পদকর্তাগণ একটি কৃত্রিম ভাষায় কবিতা রচনা করেন সে-ভাষার নকল করা যায় কিন্তু প্রাচীনদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না ; ভাবের ঘরে চুরি করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের রচনা সেই ভাবের ঘরে দুর্বল বলিয়া জহুরীর হাতে নকল ধরা পড়ে। কিন্তু সে যুগে তাহা হয় নাই।[৪]

১ বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতি ও জয়দেব (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত 'মানস-বিকাশ' গ্রন্থের সমালোচনা বঙ্গদর্শন ১২৮০ পৌষ)— বিবিধ প্রবন্ধ পৃ. ৫৩-৫৭ শতবার্ষিকী সংস্করণ।

২ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাপতি, বঙ্গদর্শন ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ, জ্ঞানদাস (১২৮০ মাঘ), বলরাম দাস (১২৮০ চৈত্র) সম্বন্ধে প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

৩ ভারতী ১২৮৪ সালে প্রকাশিত ভানুসিংহের কবিতা আশ্বিন পৃ. ১৩৫। সজনী গো— আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা (প্রথম সংস্করণ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী গ্রন্থের ১৩ সংখ্যক)

অগ্রহায়ণ, পৃ. ২০৬। গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে (…৮ সংখ্যক)

পৌষ, পৃ. ২৮৮। বজাও রে মোহন বাঁশী (…১০ সংখ্যক)

মাঘ, পৃ. ৩৩৬। হম সখি দারিদ নারী (…১৬ সংখ্যক)

ফাল্গুন, পৃ. ৩৮০-৩৮১। সখি রে, পিরীত বোঝাবে কে (…১৫ সংখ্যক)

সতিমির রজনী সচকিত সজনী (…৯ সংখ্যক)

চৈত্র, পৃ. ৪২২। বাদর বরখন (…১৪ সংখ্যক)

ভারতী ১২৮৫, বৈশাখ পৃ. ২৯। বার বার সখি বারণ করিনু (…১৭ সংখ্যক)

৪ মাইকেল মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবিতাগুলি ব্রজভাষায় লিখিত হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কৃত্রিম বৈষ্ণব পরিবেশ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস ছিল। রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের ন্যায় বৈষ্ণব কবিতাকে লিরিক্যাল আকৃতি প্রকাশের বাহনরূপে ব্যবহার করিলেন। দ্র. মোহিতলাল মজুমদার, 'কবি শ্রীমধুসূদন', ১৩৫৪ সাল, পৃ. ৩১।

জীবনস্মৃতির পাঠকগণ অবগত আছেন বালক-কবি কি ভাবে তাঁহার এক বয়স্ক বন্ধুকে বুঝাইয়াছিলেন যে পদাবলী ভানুসিংহ নামে এক প্রাচীন পদকর্তা -রচিত ও পুঁথিখানি আদিব্রাহ্মসমাজ-গ্রন্থশালায় আবিষ্কৃত।

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মগোপনের একটু ইতিহাস আছে। তিনি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নিকট ইংরেজ বালক-কবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলেন। চ্যাটার্টন পঞ্চদশ শতকের টমাস রাউলি নামে এক কল্পিত কবির কাব্য আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন এবং নিজের কবিতাগুলি প্রাচীন কবির রচনা বলিয়া প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথও সেই ভাব হইতে ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

বৎসর দুই পরে চ্যাটার্টন[১] সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা লেখেন তাহা কবির নিজেরই মনের কথা ও যুক্তি এবং এক হিসাবে ভানুসিংহের পদাবলী রচনার কৈফিয়ত। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "একটি প্রাচীন ভাষায় রচিত ভালো কবিতা শুনিলে তাহারা [লোকে] বিশ্বাস করিতে চায় না যে, তাহা কোনো প্রাচীন কবির রচিত। যদি তাহারা জানিতে পায় যে, সে-সকল কবিতা একটি আধুনিক বালকের লেখা, যে বালক তাহাদেরি ভাষায় কথা কয় তাহাদেরি মতো কাপড় পরে—বাহিরের অনেক বিষয়েই তাহাদের সহিত সমান, তাহা হইলে তাহারা কি নিরাশ হয়? তাহা হইলে হয়তো তাহারা চটিয়া যায়, তাহারা সে-কবিতাগুলির মধ্যে কোনো পদার্থ দেখিতে পায় না, নানা প্রকার খুঁটিনাটি ধরিতে আরম্ভ করে, যদি-বা কেহ সে-সকল কবিতার প্রশংসা করিতে চায়, তবে সে নিজে একটি উচ্চতর আসনে বসিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি গম্ভীর স্নেহের স্বরে বলিতে থাকে যে, হাঁ, কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই, এবং বালককে আশা দিতে থাকে যে, বড়ো হইলে চেষ্টা করিলে সে একজন কবি হইতে পারিবে বটে! তাহাদের যদি বলো, এ-সকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই হইবে না ; এরূপ অবস্থায় একজন যশোলোলুপ কবি-বালক কি করিবে?"

কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, চ্যাটার্টনের "আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

ভানুসিংহ সম্বন্ধে কৌতুককাহিনী এইখানেই শেষ হয় নাই, আরও একটু আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, জার্মানীতে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়[২] য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া এ দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লেখেন ; তাহাতে তিনি ভানুসিংহকে প্রাচীন পদকর্তারূপে প্রচুর সম্মান দান করিতে কার্পণ্য করেন

১ Thomas Chatterton (1752-1770 Aug. 24) The Ryse of Pegnctynge Yn England, Wroten bie T. Rowleie, 1469 for Mastre Canynge (March 1769)। চ্যাটার্টন বালক-কবি, ভারতী তৃতীয় খণ্ড ১২৮৬ আষাঢ় পৃ. ১৩৯-১৪৪। · ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, শেলী, রসেটি, সাদী, কীটস্‌ প্রভৃতি ইংরেজ কবিরা চ্যাটার্টনের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। রবার্ট সাদী চ্যাটার্টনের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন (১৮০৩) ; কীট্‌স চ্যাটার্টনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁহার Endymion উৎসর্গ করেন (১৮১৮)।

২ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০) জন্মস্থান ঢাকা বিক্রমপুর। ১৮৭৩এ পৈতৃক সম্পত্তি ভ্রাতাদের দিয়া কয়েক হাজার টাকা লইয়া য়ুরোপে যান। এডিনবরা, লাইপজিগ ও তৎপরে সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গ (আধুনিক লেনিনগ্রাদ) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। নিহিলিস্ট সন্দেহে তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সুইস দেশে আসেন ও ৎসুরিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৮২ সালে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিয়া ১৮৮৩ সালে দেশে ফেরেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদে কাটে। শেষজীবনে ইসলাম গ্রহণ করেন ও অশেষ দুঃখের মধ্যে জীবনের অবসান হয়। —সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বোম্বাই প্রবাস' পৃ ১৪১-২। ইঁহার ভ্রাতা নবকান্ত ও শীতলাকান্ত ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। নবকান্তের কন্যার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। নবকান্ত ভ্রাতাদের এক জীবনী লেখেন। শীতলাকান্তর কতকগুলি রচনা তৎকালীন ভারতীর মধ্যে দেখা যায়।— দ্র. জীবনীকোষ, নবকান্ত, নিশিকান্ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলীতে [১২৮১, ২৮ ফাল্গুন (১১ মার্চ ১৮৭৫)] আছে নিশিকান্তকে জার্মানীতে ৬০০৲ টাকা প্রেরণ করা হইতেছে। মহর্ষির জীবনচরিতকার অজিতকুমার চক্রবর্তী জীবনস্মৃতির উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন যে ঐ টাকা 'ডক্টর' উপাধি গ্রহণের জন্য প্রেরিত হয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি নিশিকান্ত ১৮৮২র পূর্বে ডক্টর হন নাই। সুতরাং সে টাকা অন্য ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত হয়।

নাই। তিনি আরও বলেন যে, এই গ্রন্থখানি লিখিয়া নিশিকান্ত 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। এই উক্তিটি সম্বন্ধে সামান্য বিচার প্রয়োজন। নিশিকান্ত একুশ বৎসর বয়সে (১৮৭৩) বিলাত যান। এডিনবরা লাইপজিগ সেণ্টপিটার্সবুর্গ প্রভৃতি নানাস্থানে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে ৎস্যুরিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে *The Yatras*[১] নামে একখানি ছোট বই লিখিয়া 'ডক্টর' উপাধি পান (১৮৮২)। সে-গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে ভানুসিংহের কোনো কথা নাই। তবে জার্মান ভাষায় 'ভারতীয় প্রবন্ধাবলী' নামে যে বইখানি লেখেন, তাহাতে যদি কিছু থাকে তো আমরা বলিতে পারি না। তবে সে বই লিখিয়া নিশিকান্ত 'ডক্টর' উপাধির মান পান নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভ্রমশূন্য নহে।[২]

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১২৯১ সালে মুদ্রিত হয়;[৩] প্রথম বর্ষ ভারতীতে প্রকাশিত কবিতা ব্যতীত এই শ্রেণীর আরও কয়েকটি রচনা গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হয়। এই ক্ষুদ্র কাব্যের সকল কবিতাকে একই শ্রেণীতে ফেলা যাইবে না, কারণ সবগুলি এক সময়ে রচিত নহে। 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ভারতীর ১২৮৮ সালে শ্রাবণ মাসে। সেই সময়ে কবি বিদ্যাপতি লইয়া আলোচনা করিতেছেন। এই গানটির ভাষা কৃত্রিম হইলেও উহার ভাবের মধ্যে নিছক অনুকরণ দেখা যায় না।

কবিকাহিনী

'ভারতী'র প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ছাড়া একটি নাতিদীর্ঘ কাব্য প্রকাশিত হয়— 'কবিকাহিনী'[৪]। এই গ্রন্থ রচনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পর কবি এই কাব্যের সমালোচনা যেভাবে করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্যচর্চার দিক হইতে বিচার্য। তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখিতেছেন, "যে-বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে— লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে— যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে— তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ।" জীবন-মধ্যাহ্ন অতিক্রম করিয়া কবি তাঁহার বাল্যরচনা সম্বন্ধে যে রহস্যই করুন-না কেন, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এই কাব্যের মধ্যে কৃত্রিমতা যথেষ্ট থাকিলেও ইহাতে নিজ শৈশবের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা নিঃসংকোচে প্রকাশ পাইয়াছে; জীবনস্মৃতির পাঠকমাত্রেই জানেন রবীন্দ্রনাথের শিশুকাল কী রূঢ় রুদ্ধতার মধ্যে, যুক্তিহীন নিষেধের মধ্যে

১ *The Yatras or the Popular Dramas of Bengal*, Trubner, London 1882. Dedication Zurich, January 1882. এই বইখানিকে dissertation বলা হইয়াছে। ডক্টর উপাধির জন্য thesis-কে dissertation বলে।

২ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে গ্রন্থাকারে কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ অব্দের জুলাই মাসের কাছাকাছি কোনো সময়ে।

৩ 'ভানুসিংহের কবিতা'গুলি ভারতীর প্রথম বর্ষ হইতে (১২৮৪) প্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১২৯১ সালের বর্ষায় ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে কবির কৈশোরের এই কবিতাগুলি প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রকাশক রূপে বিজ্ঞাপিত করিয়া জানান, 'ভানুসিংহের পদাবলী শৈশবসংগীতের আনুষঙ্গিক স্বরূপে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশই পুরাতন কালের খাতা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।' —প্রকাশক। ১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'নবজীবন' মাসিকপত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামক একটি স্বাক্ষরহীন ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ রহস্যছলে ইঙ্গিত করেন যে ভানুসিংহ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইলেও হইতে পারেন।— জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২৪২

'ভানু' নামের আদ্যক্ষর 'ভাঃ' 'মেঘনাদবধ কাব্য' সমালোচনায় লিখিত ছিল, ১২৮৪ শ্রাবণ।

৪ ভারতী, প্রথম বর্ষ ১২৮৪ পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত সংবৎ ১৯৩৫ [১২৮৫ সাল। ১৮৭৮]

সংকুচিতভাবে কাটিয়াছিল। বহির্জগত ছিল তাঁহার কাছে অজানা রাজ্য ; রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শময়ী প্রকৃতি রুদ্ধ দ্বার ও গবাক্ষের অন্তরাল হইতে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিত, কিন্তু স্পর্শ করিতে পারিত না। "সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ— মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।" সেই রুদ্ধ জীবনের মনের কথা অবচেতন স্তরে নিমজ্জিত ছিল, এই কাব্য রচনাকালে তাহা আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে বালকের অনেক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছন্দের মধ্য দিয়া মুক্তি পাইয়াছে। তাই দেখি 'কবিকাহিনী'র কবি সাধ মিটাইয়া প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন। কবিকাহিনীর নায়ক 'ছিল কোনো কবি বিজন কুটীর-তলে।'—

> প্রফুল্ল উষার ভূষা অরুণ-কিরণে
> বিমল সরসী যবে হত তারাময়ী, · ·
> যখনি গাহিত বায়ু বন্য গান তার,
> তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
> দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
> দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
> স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
> উঠিছেন উষা দেবী হাসিয়া হাসিয়া।[১]

প্রকৃতির কোলে শুধু খেলা নহে, শিশুকবি গাছপালা পশুপক্ষীর সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়েও খোঁজ রাখিতেন। ক্রমে শৈশব অতিক্রম করিয়া কবি যৌবনে প্রবেশ করিলেন ; প্রকৃতির সহিত যোগ এখন আরও ঘনিষ্ঠ হইল।—

> প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
> নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
> কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে ;
> প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি
> কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।

প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া কবি গাহিতেছেন—

> শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
> কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
> ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্ব চরাচরে।
> কালের মহান পক্ষ করিয়া বিস্তার,
> অনন্ত আকাশে থাকি, হে আদি জননি,
> শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
> তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন।

ইহার পর নীহারিকাপুঞ্জ হইতে ক্রমে ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি বর্ণনা করিয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের কথা

১ ভারতী, ১২৮৪ মাঘ। কবিকাহিনী, পৃ. ২। রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬।

বলিয়াছেন, এই নিয়মবন্ধন যদি একবার কোথাও ছিন্ন হয়, তবে কী ভয়ংকর প্রলয়কাণ্ড হয়, তাহা কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে
কক্ষচ্ছিন্ন কোটি কোটি সূর্য চন্দ্র তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে পড়ে হেথায় হোথায় ;
এ মহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হয়ে রহে অনন্ত আকাশে।

প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই আকর্ষণ করিয়াছে। এই কাব্যে তাহার আভাস পাই। নিশীথের বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর 'পরে
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের 'পরে রহে বিকসিত।

প্রকৃতির কোলে এইভাবে কবির জীবন কাটিতে লাগিল, কিন্তু কবির হৃদয় শূন্য থাকিয়া গেল—

এখনো বুকের মাঝে, রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর ?
মনের মন্দির মাঝে, প্রতিমা নাহিক যেন
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

পনেরো-ষোলো বৎসর বয়সের কবি বুঝিতে পারিয়াছেন—"মানুষের মন চায় মানুষেরি মন"। এ যেন "মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" সুরের পূর্বাভাস। কবিকাহিনীর নায়ক কবি শূন্য হৃদয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন অপরাহ্নে শ্রান্ত হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে শুইয়া আছেন, এমন সময়ে একটি বালিকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথা বলিয়া গেলেন, এতদিন পরে তাহার মনে হইল হৃদয় যেন একটু জুড়াইল। বালিকার নাম নলিনী, রবীন্দ্রনাথের এক অতি প্রিয় নাম। নলিনীর সহিত কবি কুটিরে চলিয়া গেলেন ; ক্রমে উভয়ে উভয়ের ভালোবাসায় আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু এত সুখেও কবির মন তৃপ্ত হইল না ; বালিকা তাহার

অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা দিয়াও কবির মন পাইল না। মনের ভিতরের অশান্তি যখন কিছুতেই মিটিল না তখন কবি দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। কিন্তু নলিনীর কথা সর্বদাই মনে জাগে, শান্তি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথাও শান্তি পাইলেন না।

এদিকে বনে নলিনী মরণদশায় উপস্থিত। বহুকাল পরে কবি নলিনীর কাছে যখন আসিলেন সে তখন চিরনিদ্রায় মগ্ন। কাছে থাকিতে কবি বুঝেন নাই যে তিনি নলিনীকেই ভালোবাসিয়াছিলেন, দূরে গিয়া তাঁহার কাছে বালিকার প্রেম প্রকাশিত হয় নাই। ভগ্নহৃদয় কাব্যে আছে মুরলা নামে মেয়েটিকে কবি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেখানেও কবি জানেন নাই মুরলা তাঁহাকেই ভালোবাসিয়াছে। সেখানেও কবি যখন ফিরিলেন, মুরলা তখন মৃত্যুশয্যায়। 'মায়ার খেলা'র অমর শান্তির প্রেম উপেক্ষা করিয়া একদিন চলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখনী তখন সংযত হইয়াছে তাই মৃত্যুশয্যার করুণ দৃশ্যের অবতারণা করিয়া কাব্যকে লঘু করেন নাই।

নলিনীর মৃত্যুর পর কবির মনে এই প্রশ্নই উঠিল যে সত্যই কি সব ফুরাইল। শোকাচ্ছন্ন কবি তখন জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন কালস্রোতে সমস্তই ভাসিয়া চলিয়াছে, কিছুই স্থির নাই। ক্রমে কবির বার্ধক্য আসিল। শ্বেত জটাসমাকীর্ণ গম্ভীর মুখশ্রী— বৃদ্ধ কবি হিমালয়ে আশ্রয় লইলেন। কবির মনে পড়িল এই হিমালয় যুগের পর যুগ মানবসভ্যতার দিকে চাহিয়া আছে ; কত পাপ, কত রক্তপাত, কত অত্যাচার তাহার চোখে পড়িয়াছে, স্বাধীনতা হারাইয়া মানুষ কিরূপ হীনতায় নিমজ্জিত হয় তাহা দেখিয়াছে—

> দাসত্বের পদধূলি অহংকার ক'রে
> মাথায় বহন করে পর-প্রত্যাশীরা!
> যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
> সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন!
> যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
> সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
> স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
> অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু!
> সবল, সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল,
> দুর্বল, বলের পদে আত্ম বিসর্জিতে।[১]

এইসব কথা স্মরণ করিয়া কবির মন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি তিনি বিশ্বাস হারাইলেন না। মরণসন্ধ্যায় কবি ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া শান্তিলাভ করিলেন—

> এ অশান্তি কবে, দেব, হবে দূরীভূত।
> অত্যাচার গুরুভারে হয়ে নিপীড়িত,
> সমস্ত পৃথিবী, দেব, করিছে ক্রন্দন!
> সুখ শান্তি সেথা হতে লয়েছে বিদায়!
> কবে দেব এ রজনী হবে অবসান?
> স্নান করি প্রভাতের শিশিরসলিলে,
> তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী!

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, কবিকাহিনী পৃ ৪১, ৪৩, ৪৪।

অযুত মানবগণ এককণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি!
নাইক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুটিরেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কেহ দাস!
সে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়![1]

বালক-কবির লেখায় বিশ্বপ্রেমের যে আদর্শ ফুটিয়াছে, তাহা গভীর না হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাহা বিশ্বপ্রেমেরই আদর্শ। কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যক হইলেও এই চতুর্থ সর্গটিকে একটি আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় না। 'বনফুলে'র ন্যায় 'কবিকাহিনী'র বিষয়নির্বাচনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। বালক রবীন্দ্রনাথ যখন 'কবিকাহিনী' লিখিয়াছিলেন, তখন হয়তো নিজেই জানিতেন না যে এই লেখার মধ্যে তাঁহার নিজের পরবর্তী জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে।[2]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বালকবয়সের বিশ্বপ্রেম লইয়া প্রৌঢ়বয়সে যে ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা না করিলেও চলিত। তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।"

'কবিকাহিনী' রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।[3] রবীন্দ্রনাথ যখন আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ছিলেন, তখন তাঁহার উৎসাহী বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এই বইখানি ছাপাইয়া তাঁহার নিকট (ফাইল কপি) পাঠাইয়া দেন। জীবনস্মৃতিতে কবি বন্ধু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, কবিকাহিনী পৃ ৪৪।

২ দ্র. অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ লিখিত কবিকাহিনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ, প্রবাসী ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।

৩ কবিকাহিনী। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা মেছুয়াবাজার রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। সংবৎ ১৯৩৫। [১২৮৫ কার্তিক ২০। ১৮৭৮ নভেম্বর ৫] পৃ ৫৩। দ্র. ভারতী প্রথম বর্ষ ১২৮৪ পৌষ ১ম সর্গ পৃ ২৬৪-৬৮; মাঘ ২য় সর্গ পৃ ৩১৮-২৪; ফাল্গুন ৩য় সর্গ পৃ ৩৬০-৬৩; চৈত্র ৪র্থ সর্গ পৃ ৩৯৩-৩৯৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে 'কবিকাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার পর। বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি উহার মুদ্রিত ফাইল পাইয়া থাকিবেন। গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আনা তুরখুড়কে ১৮৭৮ নভেম্বর ১১ তারিখে 'কবিকাহিনী' পাঠাইয়া দেন। দ্র. রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয়।

ইহাতে কোনো উৎসর্গপত্র নাই, কিন্তু খসড়াতে আছে, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই।

করি না, কিন্তু তখন আমার মনে যে-ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনো মতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বই-লেখকের কাছে নহে, বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায়, সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।"

যাহাই হউক সাহিত্যিক-মহলে এই কাব্যখানি একেবারেই উপেক্ষিত হয় নাই। জীবনস্মৃতির প্রথম খসড়ায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বান্ধব' পত্রে এই কাব্য-সমালোচন উপলক্ষ্যে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম।" কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছিলেন, "যাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষার নূতন একখানি আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যথার্থই কবিতা আছে। বাঙ্গালা কবিতার পঙ্কিল জলে এইরূপ নির্মল পুষ্প কি প্রীতিপ্রদ। ইহাতে সৌন্দর্য আছে, অথচ সে সৌন্দর্যে কোনো অংশেও রুচির বিকার সম্ভাবনা নাই।· ·কবিকাহিনী-রচয়িতা অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় মাইকেলের ন্যায় সর্বত্র মিলটনের অনুসরণ এবং হেমবাবুর ন্যায় সংস্কৃত কবিদিগের ছন্দানুবর্তন না করিয়া, কোনো কোনো স্থানে কিয়ৎপরিমাণে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যদি তাঁহার কবিতা সুন্দর না হইত তাহা হইলে এইরূপ পদ্য কাহারও নিকট ভাল লাগিত না।"[১]

কবিকাহিনীর কবিতাগুলির ছন্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বনফুলের ন্যায় ইহাও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, ইহাতে পয়ারের মিল নাই, যাহা পরবর্তী যুগের নাট্যকাব্য ও বিসর্জন -আদি নাটকের মধ্যে দেখা যায়। সে যুগে কোনো কবি কাব্য রচনাকালে মাইকেল মধুসূদনের প্রবর্তিত নূতন ছন্দকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না; রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের যতই তীব্র সমালোচনা করুন, কাব্য রচনাকালে তাঁহাকে মাইকেলেরই তেজোময় অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বৃহৎ কাব্য রচনা করিতে গেলে বাংলার চিরন্তন পয়ারাদি ছন্দ অচল; য়ুরোপীয় আদর্শের নূতন ছন্দ, যাহা মধুসূদন বাংলা ভাষায় আনিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তী যুগের কবিদের আদর্শ হয়।

বিলাতযাত্রা রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা নূতন পর্বের সূত্রপাত করিল। যাত্রার পূর্ব পর্বটায় তাঁহার মানসিক অবস্থার যে অস্থির চঞ্চলতার চিত্র কবিকাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে নৈর্ব্যক্তিক কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এ যুগের বহু কবিতা পাওয়া গিয়াছে, যাহা রচনা হিসাবে কাঁচা কিন্তু অন্তরের বেদনা প্রকাশের উদাহরণ হিসাবে মূল্যবান। সেগুলি প্রকাশের জন্য রচিত হয় নাই; তাই তাহাদের আদিম অবিকৃত রূপটি পাই—ভাষা ও ভাবের পরিমার্জনার অবসর ও প্রয়োজন হয় নাই। সেই কবিতা হইতে বালক-কবির চিত্তের মধ্যে যে-আগ্নেয়গিরি গুমরাইতেছে তাহারই তপ্ত শ্বাস অনুভব করা যায়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিলেন, কিন্তু খুচরা কবিতা বা লিরিকগুলি লিখিতেছেন মিল রাখিয়া, যথাযথ ছন্দে। এইসব লিরিকের কতকগুলি 'শৈশব সংগীতে'র মধ্যে আছে, তবে কোন্‌গুলি এই সময় রচিত বলা কঠিন। এইসকল মূল রচনা ব্যতীত অনুবাদ-সাহিত্যকেও তিনি পুষ্ট করিতেছিলেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু তথ্য সংগ্রহ করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নিকট হইতে। অক্ষয়চন্দ্রই তাঁহাকে নানা কবির কাব্য অনুবাদ

১ বান্ধব, ১২৮৫, দশম সংখ্যা, পৃ ৪৬৪-৬৭। দ্র. জীবনস্মৃতি গ্রন্থপরিচয়, পৃ ২৫৬-৫৭।

করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।[১] কবি লিখিয়াছেন তাঁহাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র-করা কবি ম্যুরের[২] রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ ছিল। তাহা হইতে অক্ষয় চৌধুরী প্রায়ই কবিতা আবৃত্তি করিতেন। বালক-কবি মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতেন। ছবির সঙ্গে বিজড়িত কবিতাগুলি কবির মনে পুরাতন আয়রল্যাণ্ডের একটি মায়ালোক সৃজন করিত। সেই মেলডীজের কয়েকটি সংগীত বাংলায় অনুবাদ করিয়া 'ভারতী'তে[৩] এই সময়ে প্রকাশ করেন ; আমরা বালক-কবির একটি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

এস এস এই বুকে নিবাসে তোমার,
যুথভ্রষ্ট বাণবিদ্ধ হরিণী আমার,
এইখানে বিরাজিছে সেই চির হাসি
আঁধারিতে পারিবে না তাহা মেঘরাশি।
এই হস্ত এ হৃদয় চিরকাল মতো
তোমার, তোমারি কাজে রহিবে গো রত।
কিসের সে চিরস্থায়ী ভালোবাসা তবে,
গৌরবে কলঙ্কে যাহা সমান না রবে ?
জানিনা, জানিতে আমি চাহিনা, চাহিনা,
ও-হৃদয়ে এক তিল দোষ আছে কিনা,
ভালোবাসি তোমারেই এই শুধু জানি,
তাই হলে হল, আর কিছু নাহি মানি।
দেবতা সুখের দিনে বলেছে আমায়,
বিপদে দেবতা সম রক্ষিবে তোমায়,
অগ্নিময় পথ দিয়া যাব তব সাথে,
রক্ষিব, মরিব কিম্বা তোমারি পশ্চাতে।

আমেদাবাদ ও বোম্বাই

রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন সতেরো। সেই-যে হিমালয় হইতে ফিরিয়াছেন, তার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কোনো বিদ্যালয়ের বন্ধনে, কোনো ধারাবাহিক বিদ্যাচর্চার নিয়ম-শৃঙ্খলে তাঁহাকে বাঁধা যায় নাই। এই স্কুল-পলায়ন ব্যাপারটা কবি তাঁহার অজস্র রচনায় বহু ভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বলিবার সময়ে বেশ একটু আনন্দ-গৌরব অনুভব করিতেন। ১৮৭৫ সালে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকে সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করিয়া

১ মুরের কবিতা ছাড়া বার্নস্, বাইরন, শেক্সপীয়ার, মিসেস আমেলিয়া ওপী (Opie ১৭৬৯-১৮৫৩), ভিক্টর হ্যুগো, মিসেস ব্রাউনিং, প্রভৃতি কবিদের লিরিক এবং কালিদাসের শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব হইতেও দুইটি কবিতা তর্জমা করিতে দেখি।

২ Moore, Thomas (1779-1852) আইরিশ কবি। ১৮০৭ সালে Irish Melodies প্রকাশিত হয়। "Few poets have ever enjoyed greater popularity with tbe public, or the friendship of more men distinguished in all departments of life."

৩ সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, ১২৮৪ মাঘ, পৃ ৩২৫-৩৩১। ঐ ১২৮৮ আষাঢ়, পৃ ১৪৬-১৪৮।

দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে পাঠ কিরূপ অগ্রসর হইয়াছিল তাহা নিজেই জীবনস্মৃতিতে কবুল করিয়াছেন। এমনকি বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই বলিয়াও জানা গিয়াছে।[১] আসল কথা অভিভাবকগণ পড়াইবার জন্য এ পর্যন্ত বহু প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—বাঙালির স্কুল, সরকারী স্কুল, ফিরিঙ্গি স্কুল, সাহেবী স্কুলে, একের পর একে পড়াইবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল; স্নেহশীল অভিভাবকগণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অভিজাত বংশের সর্বগুণসম্পন্ন সুদর্শন বুদ্ধিমান বালক সমাজে সংসারে কৃতিত্ব দেখাইতে পরাঙ্‌মুখ, ইহা হইতে উদ্‌বেগের কারণ আর কি হইতে পারে। অবশেষে সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিস্টার করিয়া আনা হউক। তখনকার দিনে ধনীঘরের ছেলেদের লেখাপড়া না হইলে বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিস্টার করিয়া আনা হইত। বিলাতে গিয়া কোনো রকমে লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা পাস করিতে পারিলেই ব্যারিস্টারি পড়িবার যোগ্যতা অর্জন করা যাইত। সহজ বুদ্ধি স্বল্প বিদ্যা ও প্রচুর বিত্ত থাকিলে ব্যারিস্টারি পাস প্রায় সকলেই করিতে পারিত। এই রেওয়াজ বহুকাল চলিয়াছিল; তার পর গ্রাজুয়েট ছাড়া অন্য কেহ ব্যারিস্টারদের ইন্ (inn)-এর সভ্য হইতে পারিবে না এই নিয়ম প্রবর্তিত হইলে সেই ব্যারিস্টারি পাসের ঢেউ কমিয়া যায়।

বিলাতে পাঠাইবার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে কয়েক মাস নিজের কাছে আমেদাবাদে রাখা স্থির করিলেন। ইংরেজি বলা-কহায় লেখাপড়ায় রবীন্দ্রনাথ খুবই কাঁচা ছিলেন—সেইসব শুধরাইয়া লইবার জন্য এই আয়োজন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদের সেসন জজ, বোম্বাই প্রদেশে প্রায় চৌদ্দ বৎসর চাকুরি হইয়াছে—পারসী মারাঠা গুজরাটি সিন্ধী বোরাহ সমাজে সুপরিচিত। সে-সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সন্তানদের লইয়া বিলাতে; সত্যেন্দ্রনাথের ফার্লো-ছুটি সরকারি নিয়মানুসারে সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে পাওয়া যাইবে না; শীতের মুখে বিলাতে পৌছাইলে শিশুরা অনভ্যস্ত শীতে কষ্ট পাইতে পারে ভাবিয়া তিনি পত্নী ও শিশুদের গ্রীষ্মের মুখেই বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শিশুদের লইয়া বিলাত যান এবং লণ্ডন হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে সাসেক্স জেলার ব্রাইটন নামে সমুদ্রতীরস্থ শহরে বাসা ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আমেদাবাদে পৌছিলেন তখন জজসাহেবের বাদশাহী যুগের প্রাসাদোপম অট্টালিকা শূন্য। বাড়ির পাদমূল দিয়া সাবরমতী নদী প্রবাহিত; এই প্রাসাদের স্মৃতি উত্তরকালে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে দেখা দিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে সত্যেন্দ্রনাথ আদালতে, রবীন্দ্রনাথ বাসায় একা। আপন মনে মেজদাদার বিরাট লাইব্রেরি হইতে ইচ্ছামত গ্রন্থ বাছিয়া বাছিয়া পড়েন, প্রবন্ধ লেখেন, কবিতা রচনা করেন, গানে সুর দেন। ইংরেজি বইয়ের যেখানে বুঝেন না, অভিধানের সাহায্যে তাহার অর্থোদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; যাহা পড়েন তাহার প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়তো পারেন না, যেটা না বুঝিতেন—সেটুকু নিজ কল্পনাবলে পূরণ করিয়া লইতেন— সমগ্রের অর্থ বুঝিতে কোনো কষ্ট হইত

১ রবীন্দ্রনাথের সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলে অধ্যয়ন সম্বন্ধে 'শনিবারের চিঠি' (১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৯০৩) লিখিতেছেন, "১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের খাতাপত্র কলেজ হইতে খোয়া গিয়াছে। তবে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের খাতায় নূতন ভর্তি হওয়ার সংবাদ না থাকাতে মনে হয় তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই ভর্তি হইয়াছিলেন। ১৮৭৫-৭৬ এই দুই বৎসরের রেকর্ডে সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উভয় ভ্রাতার নাম পাইতেছি। দুইজন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তখনকার নাম ছিল ফিফথ ইয়ার বা প্রিপ্যারেটরি এণ্ট্রাস ক্লাস। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত 'ইররেগুলার' ছিলেন। প্রায়শই কামাই করিতেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের খাতায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রোমোশন পান নাই, সোমেন্দ্রনাথ পাইয়াছেন। সম্ভবত ইহার পরই তিনি ক্ষান্ত দিয়েছেন।" আমাদের মনে হয় ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ সালে তিনি সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলে কোনো প্রকারে টিঁকিয়া থাকেন।

না। সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরিতে টেনিসনের কাব্যসমূহের উপর Dore[১]-এর ছবি আঁকা বিরাট সংস্করণের বই ছিল, বালক 'কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বার বার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া' বেড়াইতেন।

এইভাবে তিনি সংস্কৃতের ছন্দোবদ্ধ কাব্যও পাঠ করিয়া যাইতেন; হেরবলিন সম্পাদিত শ্রীরামপুরের ছাপা কাব্যসংগ্রহ[২] ছিল তাঁহার সঙ্গী। "সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরু-শতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।" সংস্কৃত ছন্দ তাঁহাকে ছোটবেলা হইতেই আনন্দ দিত। জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দের মধুর ছন্দোহিল্লোল তাঁহার বালক-হৃদয়কে কি ভাবে চঞ্চল করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে কবি বিস্তৃত ভাবেই লিখিয়াছেন। গীতগোবিন্দের যে-বইখানি তাঁহার হাতে পড়ে, সেটিতে শ্লোকগুলি ছিল টানা-ছাপা, ছেদাদি দেখিয়া পংক্তি ও ছন্দ ঠিক করা ছিল কঠিন। যেদিন তাহারই একটা শ্লোক যথার্থভাবে যতি রাখিয়া আবৃত্তি করিতে পারিয়াছিলেন, সেদিনের আনন্দের কথা তাঁহার মনে ছিল। এই ছন্দের জন্য আগাগোড়া গীতগোবিন্দখানি নকল করিয়া লইয়াছিলেন। আরও একটু বড় হইয়া কুমারসম্ভব পাঠকালে কালিদাসের ছন্দ তাঁহাকে এমনই মুগ্ধ করে যে ঐ কাব্যের প্রথম তিন সর্গ সম্পূর্ণ মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মোট কথা, সংস্কৃতের শব্দলালিত্য রূপকল্পনা ছন্দমাধুর্য বাল্য-বয়স হইতেই তাঁহাকে এই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। সংস্কৃতের জটিল শব্দার্থ ভালো করিয়া বুঝা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল না; শব্দ রূপ ও ছন্দই তাঁহার কাছে বিচিত্র রসসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, শাহীবাগের প্রাসাদোপম অট্টালিকার "ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম।" জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে কবির সেই প্রথম গানের চারিটি চরণ উদ্‌ধৃত হইয়াছিল। সমগ্র গানটি ভগ্নহৃদয়ে আছে, পরে রবিচ্ছায়া প্রকাশের সময় বা পূর্বে গানটি বদলাইয়া দেন এবং সেই সামান্য পরিবর্তিত রূপটি গীতবিতানে আছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গানটি ভগ্নহৃদয় হইতে উদ্‌ধৃত করিলাম—

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়
ধীরে ধীরে অতি ধীরে— অতি ধীরে গাও গো।
ঘুম ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
নিশীথের সুনীরব জোছনা সমান
অতি-অতি-অতি ধীরে কর সখি গান!
নিশার কুহক বলে নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হোয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর উচ্ছ্বাসময় সংগীতের স্বর!

১ Gustave Dore (১৮৩৩-৮৩) ফরাসী আর্টিস্ট। Rabelais, Balzac, Cervantes, Poe, Tennyson, La Fontaine, Dante, Milton প্রভৃতির গ্রন্থ চিত্রিত করিয়া ইনি যশস্বী হন।

২ কাব্যসংগ্রহ। অর্থাৎ কালিদাসাদি মহাকবিগণ বিরচিত ত্রিপঞ্চাশৎ উত্তম সম্পূর্ণ কাব্যানি। শ্রী ডাক্তার যোহন হেরবলিন কর্তৃক সমাহৃত মুদ্রাঙ্কিতানি শ্রীরামপুরীয় চন্দ্রোদয় যন্ত্রে ১৮৪৭।

তটিনী কি শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন-ধ্বনি শুনে চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে অতি ধীরে গাও গো,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।[১]

আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাসকালে আরও কতকগুলি গান রচনা করেন, যেমন, 'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি', 'আঁধার শাখা উজল করি' ইত্যাদি। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটিরও একটি খসড়া এই সময়ে লেখেন বলিয়া জানা গিয়াছে।[২] পরে সেই গানটিকে সংস্কার করিয়া ভগ্নহৃদয়ের উৎসর্গে যোজনা করেন এবং আরো কিছুকাল পরে অদল-বদল করিয়া ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত করেন। এখন সেটি ব্রহ্মসংগীত বলিয়াই সকলে জানে।

রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ বাসকালে ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ (১২৮৫) শুরু হয় বৈশাখ মাস হইতে; প্রথম বর্ষে নয় মাসে 'বছর' হয়, কারণ প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছিল শ্রাবণ মাসে। এ বৎসরেও রবীন্দ্রনাথের লেখনীর বিরাম নাই; প্রথম বর্ষে আরব্ধ 'করুণা' উপন্যাস এ বৎসর ভাদ্র মাস পর্যন্ত চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আশ্বিন মাসে বিলাত যাত্রা করায় বইটি সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উপন্যাস-রচনা বিষয়ে কবির পরবর্তী জীবনের অভ্যাস দেখিয়া মনে হয় তিনি 'করুণা' মাসে মাসে লিখিয়া পত্রিকায় দিতেছিলেন; সমগ্র বইখানি একসঙ্গে লেখেন নাই। বিলাত চলিয়া যাওয়াতে উহা আর শেষ হইল না। এই উপন্যাস ছাড়া বহু গদ্য-পদ্য রচনা যুগপৎ চলিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ তুকারামের অভঙ্গ মারাঠা হইতে বুঝাইয়া দেন, রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন। বহু বৎসর পরে 'নবরত্নমালা'র মধ্যে সেই অনুবাদের কয়েকটি স্থান পাইয়াছিল।[৩] এই সময়ে রচিত একটি কবিতার কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটি আমেদাবাদে ১৮৭৮ জুলাই ৬ তারিখে লিখিত।[৪]—

হে কবিতা— হে কল্পনা—
জাগাও— জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীনহীন —
ঢাল এ হৃদয়মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল—
দাও দেবি সে ক্ষমতা— ওগো দেবি শিখাও সে মায়া
যাহাতে জ্বলন্ত দগ্ধ নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি—
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া—

১ কবি লিখিতেছেন, "ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্র ছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে [রবিচ্ছায়া] ছাপাইয়াছিলাম— কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে, সেই সাবরমতীনদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর কিছুই ছিল না। 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটা এমনি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুরে বসাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম।"

২ মালতীপুঁথি, রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

৩ নবরত্নমালার ভূমিকায় আছে যে, উহার সংস্কৃত কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ-কৃত। কিন্তু রবীন্দ্রসদনের মালতীপুঁথির মধ্যে কয়েকটি পাতায় তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ আছে। নবরত্নমালার ভাষার সহিত সামান্য পার্থক্য কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়। শ্রীসঃ [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] লিখিত তুকারাম প্রবন্ধে যে কয়টি অভঙ্গের অনুবাদ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটির সহিত পুঁথির মিল আছে।

৪ রবীন্দ্রসদন, মালতীপুঁথি।

হইতেছি অবসন্ন— বলহীন— চেতনারহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে— অকর্মণ্য অনাথ অজ্ঞান
উঠাও— উঠাও মোরে করহ নূতন প্রাণ দান।
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল।

. .

পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব যুঝিব দিনরাত—
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মেরি অনুষ্ঠান
অগম্য উন্নতিপথে পৃথ্বী তরে গঠিব সোপান।[১]

বিলাত যাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র বিষয় অধ্যয়নে রত ; অনেকগুলি রচনা এই অধ্যয়নের প্রত্যক্ষ ফল। বিলাত যাইতেছেন— সেখানকার শিষ্টাচার সম্বন্ধে কোনো ইংরেজি বই পড়িয়াছেন, তাহারই উপর লিখিলেন 'ইংরেজদিগের আদব-কায়দা' শীর্ষক প্রবন্ধ।[২] ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়িতে হইতেছে। কবি লিখিয়াছেন,[৩] "মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন্ [Taine] [৪] প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমনকি অ্যাংলো-স্যাক্সন[৫] ও অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্য[৬] সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।" প্রথম প্রবন্ধের মধ্যে তিনি ইংরেজদের আদিকবি কিডমনের পদ্য-বাইবেল হইতে কয়েকটি অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার সামান্য নমুনা উদ্‌ধৃত করিলাম—

গুহা-অন্ধকার ছাড়া ছিল না কিছুই !
এ মহা অতলস্পর্শ আঁধার গভীর—
আছিল দাঁড়ায়ে শুধু শূন্য নিষ্ফল
উন্নত ঈশ্বর তবে দেখিল চাহিয়া
এই নিরানন্দ স্থান ! দেখিলা হেথায়
অন্ধকার বিষণ্ণ ও শূন্য মেঘরাশি

১ আমার মনে হয় ইহাও ইংরেজি হইতে অনুবাদ।

২ ইংরেজদিগের আদব-কায়দা। ভারতী ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৭৮-৮২।

৩ জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২য় বর্ষ ১৩৫০ কার্তিক-পৌষ, পৃ ১২১।

৪ Taine, Hippolyte Adolphe (1828-93) French historian and critic ; elected to the French Academy in 1878. ইঁহার লিখিত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস (১৮৬৪-৬৫) এক সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল।

৫ স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্য, ভারতী ১২৮৫, ২য় বর্ষ শ্রাবণ, পৃ ১৭১-১৮৪।

৬ নর্মান জাতি ও অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্য, ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন পৃ ৫০৩-৫১২। ঐ—ভারতী ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৪৯-৬০।

রহিয়াছে চিরস্থির নিশীথিনী লয়ে।
উত্থিত হইল সৃষ্টি ঈশ্বর আজ্ঞায়।
মহান্ ক্ষমতা বলে অনন্ত ঈশ্বর
প্রথম স্বর্গ ও পৃথ্বী করিলা সৃজন।

ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্য-ইতিহাস ছাড়া ইংরেজির মারফত য়ুরোপীয় সেরা সাহিত্যিকদের অল্পস্বল্প রচনা ও তাঁহাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে লাভ করেন।[১]

দান্তে পিত্রার্ক গোটে তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করে। বিয়াত্রীচের প্রতি দান্তের[২] অমর প্রেমকাহিনী, লরার প্রতি পিত্রার্কের[৩] স্বার্থশূন্য অনুরাগ, বালক-কবিকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছিল, তেমনি আশ্চর্য করিয়াছিল গ্যেটের[৪] চরিত্র। দান্তে ও পিত্রার্ক তাঁহাদের আরাধ্য প্রেমাস্পদকে দূর হইতে দেখিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে প্রেমাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন, তাসো লিওনারার প্রেমে আত্মহারা হইয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেবল যাতনা ও উৎপীড়নের ভাগী হইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। মধ্যযুগীয় য়ুরোপের এইসব কবি-কাহিনী তরুণ বাঙালি কবির মনে কী রস সঞ্চার করিত তাহার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। গ্যেটের জীবনকাহিনীও তাঁহার কাছে আশ্চর্য ঠেকিল। জর্মান মহাকবি তাঁহার বাল্যকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একজনের পর আর একজন নারীকে ভালোবাসিয়াছিলেন, বহু নারীও তাঁহাকে ভালোবাসিয়াছিল। বাল্যকালে গ্যেটে ফুলের পাপড়ি ও পাখির পাখনা ছিঁড়িয়া দেখিতেন যে উহারা কি ভাবে গ্রথিত, তেমনি আজীবন তিনি রমণীদের হৃদয় লইয়া বিশ্লেষণ ও স্বয়ং কিয়দ্‌পরিমাণে হৃদয়াবেগ

১ I myself have tried to get at the wealth of beauty in the literature of the European languages, long before I gained a full right to their hospitality. When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through an English translation, I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me.

I also wanted to know German literature and by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some month, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language, which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.

Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through *Faust*. I believe, I found my entrance to the palace, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest-room, comfortable but not intimate. Properly speaking, I do not know my Goethe, and in the same way many other great luminaries are dusky to me.—Tagore in *Contemporary Indian Philosophy*, edited by S. Radhakrishnan and Muirhead : *Talks in China* (1924).

২ বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য, ভারতী ১২৮৫ ভাদ্র। পৃ ২০১-২১২। দান্তে (Dante Alighieri ১২৬৫-১৩২১) ইতালিয়ান ভাষার আদি কবি। ভিটানুভা বা নূতন জীবন, ডিভাইনা কমেডিয়া তাঁহার বিখ্যাত কাব্য।

৩ পিত্রার্ক ও লরা, ভারতী ১২৮৫, আশ্বিন পৃ ২৭২-২৭৭। পিত্রার্ক (Petrarca, Francesco ১৩০৪-১৩৭৪)। ইতালীয় কবি। ১৩৪০ রোম মহানগরীতে ইঁহাকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ইনি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তক।

৪ গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ, ভারতী ১২৮৫ কার্তিক পৃ ২৮৯-২৯৮। গ্যেটে (Goethe, Johan Wolfgang von ১৭৪৯-১৮৩১) জার্মান কবি ও লেখক, ফাউস্ট নামে নাটকের জন্য অমরতা লাভ করিয়াছেন।

অনুভব করিতেন ; কিন্তু সে প্রেম ছিল তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড় একটা কষ্ট হইত না। গোটের রচনা হইতে এই অংশটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়া দেন।

এইসব কবিদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীর না হইলেও এই বাল্যবয়সে তাঁহাদের সাহিত্য আলোচনা কাব্যজীবনে একেবারে ব্যর্থ হয় নাই, কারণ প্রত্যেকের কবিতা হইতে কিছু কিছু তর্জমা করিয়াছিলেন। দান্তের একটি সনেটের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

প্রেম-বন্দী-হৃদি যাঁরা, সুকোমল মন, দেখে মনে হল যেন প্রফুল্ল আনন ;
যাঁরা পড়িবেন এই সংগীত আমার, মোর হৃদপিণ্ড রহে করতলে তাঁর ;
তাঁরা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ, বাহু 'পরে শান্তভাবে করিয়া শয়ন
বুঝায়ে দিউন মোরে অর্থ কি ইহার ? ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার—
যে কালে উজ্জ্বল-তারা উজলে আকাশ, অবশেষে জাগি উঠি, প্রেমের আদেশে
নিশার চতুর্থ ভাগ হয়ে গেছে শেষ, সভয়ে জ্বলন্ত-হৃদি করিলা আহার !
প্রেম মোর নেত্রে আসি হলেন প্রকাশ, তার পরে চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
স্মরিলে এখনো কাঁপে হৃদয়-প্রদেশ ! কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষণ্ণ আকার।[১]

দান্তের 'ভিটানুভা' ও 'ডিভাইনা কমেডিয়া' হইতেও কিছু কিছু অনুবাদ এই প্রবন্ধের মধ্যে আছে। বাহুল্যভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না। পিত্রার্কার কবিতার অনুবাদের একটি নমুনা আমরা উদ্ধার করিলাম—

হা রে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন ! এর সাথে মিশাতিস্ বিষাদের গান !
সুখ-ঋতু অবসানে গাহিছিস্ গীত ! কিন্তু হা— জানি না তোর কিসের বিষাদ,
ফুরাইছে গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাইছে দিন ভ্রমিস রে যার লাগি গাহিয়া গাহিয়া,
আসিছে রজনী ঘোর আসিতেছে শীত ! হয়তো সে বেঁচে আছে বিহঙ্গিনী প্রিয়া,
ওরে বিহঙ্গম, তুই দুঃখ-গান গাস্ কিন্তু মৃত্যু এ কপালে সাধিয়াছে বাদ !
যদি জানিতিস কি যে দহিছে এ প্রাণ সুখ দুঃখ চিন্তা আশ যা কিছু অতীত ;
তা হলে এ বক্ষে আসি করিতিস্ বাস, তাই নিয়ে আমি শুধু গাহিতেছি গীত ! [২]

সাহিত্যে আর যাহাই সৃষ্টি করুন, মাঝে মাঝে গল্প বা কাহিনী সৃষ্টি না করিতে পারিলে কল্পনাবিলাসী[৩] কবির সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। এইবার আরম্ভ করিলেন কবিতায় গল্প, যাহাকে গাথা নাম দিয়া শৈশবসংগীতের মধ্যে পরে সংগৃহীত হয়। কিন্তু এই গাথা-সাহিত্যের সকলগুলিই ঠিক এই সময়ে রচিত বলিয়া মনে হয় না। কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত কবিতাগুলিকে যথার্থ গাথা বলাও ভুল। 'ফুলবালা'[৪] 'প্রকৃতির খেদ' প্রভৃতি কবিতার যুগে রচিত বলিয়া

১ ভারতী, ১২৮৫ ভাদ্র পৃ ২০৪। ২ ভারতী, ১২৮৫ আশ্বিন পৃ ২৭৭।

৩ "কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতাকার।...এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরি পরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।" (সাধনা—১৩০০ বঙ্কিমচন্দ্র) দ্র, আধুনিক সাহিত্য পৃ ৯-১০।

৪ ফুলবালা, ভারতী ১২৮৫ কার্তিক পৃ ২৯৮-৩০৬। শৈশবসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম, পৃ ৪২৯-৪৪১।

ধরা যাইতে পারে। ইহাতে বনের বর্ণনা, ফুলের কথা আছে ; অশোক মালতী মাধবী প্রভৃতি ফুলেরা কাননে খেলা করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধবয়সে রচিত প্রকৃতি-গাথা বা ঋতু-উৎসবের গানে অশোক মালতী মাধবী বারে বারে আবির্ভূত হইয়াছে। এই ফুলবালা গাথার মধ্যে একটি গান [১] আছে, সেটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ, হোথা যাস্ নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস্ নে !
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা, শেফালী হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা বল্ রে মুখ ফুটিয়ে।
ভ্রমর কহে, 'হোথায় বেলা হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলি নি !
মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারই ঘায়ে জ্বলিব।'

এই গাথার আর-একটি গান হইতেছে "দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা, লো তোরা সাধের কাননে মোর আমার সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া"।[২] ফুলবালা-গাথাটির ভাষার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র এবং অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসীনী'র ছায়া ও প্রভাব যথেষ্ট আছে তাহা সামান্য প্রণিধানেই বুঝা যাইবে, নিম্নের কয়েকটি পংক্তি তাহার সাক্ষ্য।—

এ কি এ কি ওগো কল্পনা সখি ! কোথায় আনিলে মোরে !
ফুলের পৃথিবী— ফুলের জগৎ— স্বপন কি ঘুম ঘোরে ?
হাসি কল্পনা কহিল শোভনা, "মোর সাথে এস কবি !
দেখিবে কত কি অদ্ভুত ঘটনা কত কি অদ্ভুত ছবি !"· ·
কহিল হাসিয়া কল্পনাবালা দেখায়ে কত কি ছবি ;
"ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী শুনিবে এখন কবি ?"

গাথা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে 'প্রতিশোধ' [৩] 'লীলা' [৪] 'অপ্সরা-প্রেম' [৫] এবং পর বৎসর বিলাত বাসকালে রচিত 'ভগ্নতরী' [৬]। পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে যে-কয়টি কাব্য ও গাথা রচিত হয় তাহার সবগুলি ট্রাজেডি ; ইহারই অন্তে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র সূচনা। তাহারও মধ্যে বিষাদবিজড়িত হৃদয়ের বেদনা তীব্র।

কয়েক মাস আমেদাবাদে রাখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বোম্বাইয়ে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিলাত যাইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজি চালচলনে ও কথাবার্তায় পাকা করা দরকার। বোম্বাইয়ের পাণ্ডুরঙ্গ-পরিবার ইংরেজি শিক্ষায় ও ইংরেজিয়ানার জন্য তখন প্রসিদ্ধ। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের বিলাত-ফেরতা

১ গীতবিতান পৃ ৮৬৪। ২ গীতবিতান পৃ ৪১৮।

৩ প্রতিশোধ, ভারতী ১২৮৫, ২য় বর্ষ শ্রাবণ পৃ ১৬৫-১৭০। দ্র. শৈশবসঙ্গীত ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম পৃ ৪৫৫-৪৬৪।

৪ লীলা, ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন পৃ ২৮৫-২৮৮। দ্র. শৈশবসংগীত : রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম পৃ ৪৬৭-৪৭৪।

৫ অপ্সরা-প্রেম, ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন পৃ ৫১৩-৫১৮, দ্র. শৈশবসংগীত রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম পৃ ৪৭৬-৪৯১।

৬ ভগ্নতরী, ভারতী ১২৮৬ আষাঢ় পৃ ১২৩-১৩১ ; দ্র. শৈশবসংগীত : রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম পৃ ৪৯৮-৫১৪।

কন্যা আন্না তরখড়-এর (Anna) ছিল ইংরেজিতে অসাধারণ দখল; বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতে কিছু বড় হইবেন। এই অসাধারণ সুন্দরী যুবতীর নিকট তিনি ইংরেজি বলা-কওয়ার পাঠ লইতেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার শিক্ষকতায় কতখানি ইংরেজি শিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না, তবে তাঁহার 'কবিকাহিনী' কাব্যখানি তর্জমা করিয়া করিয়া নূতন বান্ধবীকে শুনাইয়া মুগ্ধ করিতেন। ভারতীর যে-খণ্ডগুলিতে 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল আন্নাকে সেগুলি উপহার দিয়া যান। গ্রন্থাকারে উহা প্রকাশিত হইলে বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে আন্নাকে একখণ্ড 'কবিকাহিনী' পাঠাইয়া দেন; তদুত্তরে আন্না তাহাকে লিখিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ ভারতী হইতে উহা পড়িয়া ও তর্জমা করিয়া তাঁহাকে শোনাইতেন; শুনিতে শুনিতে কাব্যখানি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়— read and translated to me till I know the poem by heart.[১]

এই তরুণী রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বহুদিন অধিকার করিয়া ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কবি তাঁহার 'ছেলেবেলা'য় লিখিয়াছেন "আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যে ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান্ দিয়েছিলেম তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি, মেনে নিয়েছিলেন।"

কবির কাছ থেকে তিনি একটি ডাক নাম চাইলেন, কবি নাম দেন 'নলিনী'; শুধু তাই নয় নামটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে বাঁধিয়া দিলেন, ভৈরবী সুরে সুর দিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। কবির গান প্রায়ই শুনিতেন; একদিন তরুণী বলিয়াছিলেন, "তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"

এই তরুণী কবিকে যে ভালোবাসিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। 'তীর্থঙ্করে'[২] এই তরুণীর প্রেমলীলার যে সামান্য চিত্র ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। কবি দিলীপকুমারকে বলিয়াছিলেন, "সে মেয়েটিকে আমি ভুলি নি বা তার সে-আকর্ষণকে কোনো লঘু লেবেল মেরে খাটো ক'রে দেখি নি কোনো দিন। আমার জীবনে তার পরে নানান্ অভিজ্ঞ-তার আলোছায়া খেলে গেছে— বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন— কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব ক'রে যে, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি— তা সে-ভালোবাসা যে-রকমই হোক-না কেন।" এই তরুণী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় যে-কথাটি প্রচ্ছন্নভাবে বলিয়াছেন তাহা অতি স্পষ্ট। "জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষ কালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না।"

আমাদের সন্দেহ হয় শৈশব-সংগীতের কয়েকটি কবিতা ও গানের মধ্যে এই তরুণীর মর্মবেদনা কবির ভাষায় রূপ পাইয়াছে। 'ফুলের ধ্যান' 'অপ্সরা-প্রেম' কবিতা দুইটি এই বেদনাভারে নত। রবীন্দ্রনাথের 'শুন নলিনী, খোল গো আঁখি' গানটি ইঁহারই উদ্দেশে রচিত, তাহা কবি তো স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। আর-একটি গান এই তরুণীস্মরণে রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়: 'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখী, আমারে জাগায়ো না'। আন্নার দস্তানা চুরি সম্বন্ধে যে কৌতুক-কাহিনী শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থঙ্করে' বর্ণিত আছে, ইহা তাহারই স্মরণে রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আন্নার ধারণা ছিল যে, ঘুমাইয়া পড়িলে যদি কেহ কোনো মেয়ের দস্তানা চুরি করে, তবে

১ শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ পৌষ, পৃ ৪৪৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়।

২ শ্রীদিলীপকুমার রায়, তীর্থঙ্কর ১৩৪৬, পৃ ২০৫।

অপহারকের অধিকার জন্মায় মেয়েটিকে চুমো খাওয়ার। যাহাই হউক নলিনী নাম দিয়া আরও কয়েকটি কবিতা আছে— তবে সেগুলি অনুবাদ।[১]

দামিনীর আঁখি কিবা ধরে জল জল বিভা
কার তরে জলিতেছে কেবা তাহা জানিবে।
চারি দিকে তীক্ষ্ণধার— বাণ ছুটিতেছে তার
কার পরে লক্ষ্য তার কেবা অনুমানিবে।
তার চেয়ে নলিনীর আঁখি-পানে চাহিতে
কত ভালো লাগে তাহা কে পারিবে কহিতে
সদা তার আঁখি দুটি, নিচু পানে আছে ফুটি
সে আঁখি দেখে নি কেহ উঁচু পানে তুলিতে।
যদিবা সে ভুলে কভু চায় কারো আননে—
সহসা লাগিয়া জ্যোতি— সে জন বিস্ময়ে অতি
চমকিয়া উঠে যেন স্বরগের কিরণে!
ও আমার নলিনী লো— লাজমাখা নলিনী—
অনেকের আঁখি 'পরে সৌন্দর্য বিরাজ করে
তোর আঁখি পরে প্রেম— নলিনী লো নলিনী।
দামিনীর দেহে রয়— বসনকনকময়
সে বসন অপ্সরী সৃজিয়াছে যতনে
যে গঠন যেই স্থান, প্রকৃতি করেছে দান
সে-সকল ফেলিয়াছে ঢাকিয়া সে বসনে।
নলিনী বসন পানে দেখ দেখি চাহিয়া
তার চেয়ে কত ভালো কে পারিবে কহিয়া।
শিথিল বসন তার— ওই দেখ চারিধার
স্বাধীন বায়ুর মতো উড়িতেছে বিমানে—
যেথা যে গঠন আছে, পূর্ণভাবে বিকাশিছে
যেখানে যা উঁচু নিচু প্রকৃতির বিধানে!
ও আমার নলিনী গো, সুকোমলা নলিনী,
মধুর রূপের ভাস— তাই প্রকৃতির বাস
সেই বাস তোর দেহে, নলিনী লো নলিনী!

এই পরিচ্ছেদ শেষ করিবার পূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তেরো-চৌদ্দ বৎসর হইতে তিনি অনুবাদকার্য শুরু করেন; ইংরেজি হিন্দী মারাঠি সংস্কৃত

১ মালতীপুঁথি, রবীন্দ্রসদন, ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়, সম্পাদকের বৈঠক, পৃ ১৪৬-৪৮। ইহা Mooreএর কবিতার অনুবাদ।

পালি হইতে তিনি কত টুকরা কবিতা যে তর্জমা করিয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ দেওয়া কঠিন। মূলের সহিত মিলাইয়া অনুবাদগুলি বিচার করিবার একটি বড় রকম ক্ষেত্র রহিয়াছে। হিন্দী হইতে গৃহীত গানগুলিই এই আলোচনার মধ্যে আসিতে পারে।

বিলাতে। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র'

রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন সতেরো বৎসর পাঁচ মাস, আমেদাবাদে মাস চার ও বোম্বাইয়ে মাস দুই কাটাইয়া তিনি বিলাত চলিলেন, সঙ্গে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ফার্লো[১] লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্রকন্যা ইতিপূর্বে বিলাতে গিয়াছিলেন।

বোম্বাই হইতে 'পুণা' স্টীমারে তাঁহারা যাত্রা করিলেন।[২] ছয়দিন পরে জাহাজ এডেন বন্দরে পৌঁছাইল; ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রপীড়াদি উপসর্গ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পথের ও প্রবাসের বর্ণনা দিয়া পত্রধারা লিখিতে শুরু করিলেন। তাঁহার এই প্রবাসকাহিনীর সুবিস্তৃত বিবরণ 'য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র'[৩] নামে ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। বিলাত হইতে ফিরিবার কয়েক মাস পরে (১২৮৮) এই পত্রগুলি 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' এই সংক্ষিপ্ত নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই সময়ের অনেক কথা তিনি জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন, যাহা পত্রধারার মধ্যে পাই না। এ ছাড়া এখানে সেখানে পুরাতন কথার মধ্যেও ইংলণ্ডবাসের চিত্র পাওয়া যায়। এইসব রচনা হইতেছে এ-যুগের কবিজীবনীর প্রধানতম উপাদান।

সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা এই তাঁহার প্রথম, এই নূতনের অভিজ্ঞতা কবিচিত্তে যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা তাঁহার প্রথম পত্রেই প্রকাশ পায়। তিনি লিখিতেছেন, "কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে মহান্ বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে; আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম তখন দেখতেম দূরদিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, এক বার যদি ওই দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি— দিগন্তের যবনিকা ওঠাতে পারি, অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে। ওই দিগন্তের পর যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত, তখন মনে হত না যে ওই দিগন্তের পরে আর-এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে কেমন তৃপ্তি হয় না।"

"এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল।" রবীন্দ্রনাথরা overland বা ডাঙায় পেরোনো যাত্রী; তাই লোহিত সাগরের বন্দর সুয়েজে নামিয়া রেলপথে মিশরের মধ্য দিয়া গিয়া ভূমধ্যসাগরের বন্দর অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছান। এই পথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠলেম তখন দেখলেম ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে।···এই রকম ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা

১ Substantive appointment Judge and Sessions Judge, Ahmedabad. Subsidiary leave from 14th to 19th September 1878. Furlough from 20th September 1878 to 10th May 1880.

২ যাত্রার তারিখ ১৮৭৮ সেপ্টেম্বর ২০ (১২৮৫ আশ্বিন ৫)।

৩ য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র, ভারতী ১২৮৬ ৩য় খণ্ড বৈশাখ হইতে ১২৮৭ ৪র্থ খণ্ডের শ্রাবণ সংখ্যা পর্যন্ত (মাঝে দুই মাস বাদ) বাহির হয়। শেষ পত্রের পর 'ক্রমশঃ' ছিল কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই। মোট ১৪ দফায় বাহির হয়।

অ্যালেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। অ্যালেকজান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। বিস্তর জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। য়ুরোপীয়, মুসলমান সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল হিন্দুদের জাহাজ নেই।"

'মঙ্গোলিয়া' স্টীমারে করিয়া চার পাঁচ দিন পরে ইঁহারা ইতালির বন্দর ব্রিন্দিসি পৌঁছাইলেন; তখনকার দিনে বিলাত যাইবার এই ছিল ডাঙা-পেরোনো পথ। স্বল্পক্ষণের পরিচয় এই বন্দরের সঙ্গে; তবুও সেখানকার একটি বাগানের শোভা তাঁহার মনকে বিশেষভাবেই স্পর্শ করিয়াছিল; এই ঘটনার আটচল্লিশ বৎসর পরে, ১৯২৬এ, যখন তিনি মুসোলিনির আমন্ত্রণে রাজসমারোহে ইতালিতে প্রবেশ করেন, তখন ইতালির দ্বারে য়ুরোপের সহিত তাঁহার এই প্রথম পরিচয়ের কথা উল্লেখ করিয়া ইতালিকে অভিনন্দিত করেন।

ব্রিন্দিসি হইতে রেলপথ ইতালির মধ্য দিয়া গিয়া আল্পস পর্বতমালার অন্যতম সুরঙ্গ মাউণ্ট-সেনিস ভেদ করিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়াছে। "ইটালী থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা— নির্ঝর নদী পর্বত গ্রাম হ্রদ দেখতে দেখতে পথের কষ্ট ভুলে" গেলেন। তার পরদিন সকাল বেলায় প্যারিসে গিয়া পৌঁছিলেন। তখন সেখানে ১৮৭৮ সালের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী চলিতেছে; একবার সেখানটা ঘুরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু লিখিতেছেন, "এক মাস থাকলে তবে তা বর্ণনা করবার দুরাশা করতেম।" তবে প্যারিসের 'টার্কিস্ বাথে'র বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। প্যারিসে একদিনের বেশি থাকা হয় নাই এবং লণ্ডনে পৌঁছাইয়াও দুই-এক ঘণ্টার বেশি থাকিলেন না; সোজা ব্রাইটনে চলিয়া গেলেন; মেজবৌঠান ও শিশুরা ছিল সেখানে।

ব্রাইটন লণ্ডন হইতে মাইল পঞ্চাশ দূরে সাসেক্স জেলার সমুদ্রতীরস্থ শহর। মেজোবৌঠাকুরানীর যত্নে এবং শিশু সুরেন্দ্রনাথ (৬ বৎসর) ও ইন্দিরার (৫ বৎসর) বিচিত্র উৎপাত-উপদ্রবের আনন্দে দিন বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল।" সেইজন্য সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর প্রতি কবির স্নেহ অত্যন্ত প্রগাঢ় ও অকৃত্রিম।

অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে তথাকার একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। ব্রাইটন ক্ষুদ্র শহর; তথাকার ইংরেজসমাজে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ সুদর্শন রবীন্দ্রনাথের সহজেই মিলিল। শহরের নাচসভায় বিলাতী নাচে দীক্ষা হয় এবং এইখানে ইংরেজি গানেরও শিক্ষা শুরু হয়। 'ভারতী'র য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে নাচ-পার্টি প্রভৃতির কথা বেশ ফলাও করিয়া বলিতে কোনো সংকোচ তো বোধ করেনই নাই, বরং লিখিতে যেন বেশ একটু উল্লাস বোধ করিতেন। "অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াতে" তাঁহার "ভাল লাগে না" সত্য, কিন্তু "যাদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচতে মন্দ লাগে না।"[1] কোনো কুমারীর সঙ্গে "বেশ আলাপ ছিল" আর তাঁকে বেশ দেখতে, তাই তার সঙ্গে gallop নৃত্য করিয়াছিলেন, ও তাহাতে কিছু ভুল হয় নাই। অপরিচিতদের সহিত নাচিতে গিয়া বারে বারে ভুল হইয়াছিল বলিয়া কী আপসোস প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু এমন সুখে বেশি দিন থাকা হইল না। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত তখন বিলাতে।[2] তিনি তাঁহার বালকপুত্র লোকেনকে লইয়া এবার বিলাতে আসিয়াছেন; তাহাকে ইতিপূর্বে কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন 'রবি' এমন করিয়া ব্রাইটনে বৌঠাকুরানীর কাছে বসিয়া থাকিলে না-শিখিবে লেখাপড়া, না-চিনিবে বিলাত। তাই তাঁহারই ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডনে আনিয়া একটা বাসায় একলা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে-বাসাটা ছিল রিজেণ্ট উদ্যানের সম্মুখেই। সেই বাসায় থাকিবার সময়ে তিনি

১ ভারতী ১২৮৬ শ্রাবণ

২ তারকনাথ পালিত ১৮৬৭ সালে বিলাত যান ব্যারিস্টারি পড়িতে। দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ৫০-৫৪।

যে এক ভদ্রলোকের কাছে লাতিন ভাষা শিখিতেন তাঁহার কথা জীবনস্মৃতিতে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। পালিত মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। লোকেনের সহিত এইখানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়, সে-কাহিনী তিনি জীবনস্মৃতিতে অতিবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লোকেন তাঁহার চেয়ে বয়সে বৎসর চার ছোট, কিন্তু ইংরেজি ভাষাটা এই অল্পবয়সে সে ভালোই জানিত। কবি লিখিয়াছেন, "য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে· ·আমাদের· ·হাস্যালাপ চলিত· ·সাহিত্য-আলোচনাও করিতাম। সে-আলোচনায় বালক বন্ধুকে অর্বাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। যদিও বাংলা বই সে আমার চেয়ে অনেক কম পড়িয়াছিল কিন্তু চিন্তাশক্তিতে সেই কমিটুকু সে অনায়াসেই পোষাইয়া লইতে পারিত।" লোকেনের সঙ্গে বাল্যকালে যে-সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপিত হয়, তাহা লোকেনের লোকান্তরকাল পর্যন্ত তাঁহার জীবনের নানা পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ ছিল। রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যের এমন নৈষ্ঠিক ভক্ত ও রসজ্ঞ সমঝদার সে-যুগে খুব কমই ছিল।[১]

লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে তখন হেনরি মর্লি (১৮২২-৯৪) ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। মর্লির অধ্যাপনা-প্রণালী রবীন্দ্রনাথকে সবপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে যথার্থভাবে প্রবেশাধিকার দান করিয়াছিল। সাহিত্য যে ভাষাশিক্ষার যন্ত্রমাত্র নহে, তাহা যে মুখ্যত অন্তর দিয়া রসসম্ভোগের বিষয়, তাহা তিনি ইঁহার অধ্যাপনা হইতে অনুভব করিলেন। বহুবার মর্লির নাম অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন মাসের অধিক পড়া হয় নাই।

বিলাত বাসকালে তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আছে জীবনস্মৃতিতে। কিন্তু পার্লামেণ্টে গিয়া যে গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন সে কথা বিস্তৃতভাবে পত্রধারার মধ্যে লিখিয়াছিলেন। তখন জন ব্রাইট (১৮১১-৮৯) ও গ্ল্যাডস্টোনের (১৮০৯-৯৮) যুগ— যদিও তাঁহারা বিরোধীদলের নেতা ; বেনজামেন ডিস্‌রেলি সনাতনীদের নেতা ও প্রধান-মন্ত্রী। ব্রাইট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পত্রধারায় লিখিতেছেন, "বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য ও দয়া যেন মাখানো ; ব্রাইটকে আমি যখন প্রথম দেখি, যখন আমি তাঁকে ব্রাইট বলে চিনতেম না, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারিনি।"[২]

গ্ল্যাডস্টোন সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, "এমন সময়ে গ্ল্যাডস্টোন উঠলেন ; গ্ল্যাডস্টোন ওঠবামাত্র সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, গ্ল্যাডস্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বর আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি ভরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মত গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে লাগল। সে এমন চমৎকার যে কি বলব। কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জনগর্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা, ঘরের যেখানে যে-কোনো লোক বসেছিল, সকলেই একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। গ্ল্যাডস্টোনের কি একরকম দৃঢ়স্বরে বলবার ধরণ আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতরে গিয়ে যেন জোর করে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়।"[৩] পার্লামেণ্টে আইরিশ সভ্যদের নির্যাতন ও অপমান দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন ; আয়ার্ল্যান্ডে হোমরুল-আন্দোলন শুরু হইয়াছে— ভারতের রাজনৈতিক নির্যাতিত অবস্থার সহিত আয়ার্ল্যান্ডের তুলনা করিয়া স্বভাবতই তাঁহার সহানুভূতি আইরিশদের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল।

এই সময়ে তাঁহার মেজোবৌঠাকুরানী ব্রাইটন ত্যাগ করিয়া ডেভনশিয়রে টর্কি নামে সমুদ্রতীরস্থ শহরে বাস করিতেছিলেন। তিনি সেখান হইতে ডাক দিলে রবীন্দ্রনাথ মহা আনন্দে তথায় উপস্থিত হইলেন। "সেখানে

১ লোকেন পালিত ১৮৮৬, ১৩ ডিসেম্বর আই. সি. এস. পাস করিয়া বাংলাদেশে কাজে যোগ দেন।

২ ভারতী ১২৮৬ ভাদ্র পৃ ২১৪।

৩ ভারতী ১২৮৬ ভাদ্র পৃ ২১৫।

পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় "দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া" দিনগুলি সুখেই কাটিতে লাগিল। তথাকার সমুদ্রতীরে "একটি সমুচ্চ শিলাতট চিরব্যগ্রতার মতো সমুদ্রের অভিমুখে শূন্যে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে," তাহারই উপরে বসিয়া 'ভগ্নতরী' নামে একটি গাথা রচনা করেন। কবিতাটি ভারতীতে (১২৮৬ আষাঢ়) প্রকাশিত হয়; সেটি সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে লিখিতেছেন, "সেইখানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়তো বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, জিনিসটা বেশ ভালোই হইয়াছিল। কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো সে সশরীরে সাক্ষ্য দিবার জন্য বর্তমান।" কথাটা বিনয় নয়।

কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে লণ্ডনে ফিরিয়া পুনরায় পড়াশুনা আরম্ভ করিতে হইল। এবার ডাক্তার স্কট নামে এক ভদ্র গৃহস্থের ঘরে তাঁহার আশ্রয় জুটিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া গেলেন, মিসেস স্কট তাঁহাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন! ইঁহাদের দুইটি কন্যা কবির বিশেষ অনুরক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবার ও বিশেষভাবে কন্যা দুইটি সম্বন্ধে পত্রধারায় বিস্তৃতভাবেই লিখিয়াছিলেন। জীবনস্মৃতিতেও অনেক কথা আছে। "লণ্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই— এই ডাক্তার-পরিবারের কেহ-বা পরলোকে কেহ-বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনো সংবাদই জানি না, কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

কবির প্রতি মেয়ে দুইটি যে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা পত্রধারার মধ্য হইতে আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন কি না তাহা কবুল করেন নাই। তবে 'দুদিন' নামক কবিতাটির মধ্যে এই ভাবটি অব্যক্ত নাই।[১] "আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহারজাল, শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন" প্রভৃতি পংক্তি বোম্বাই বা বাংলা দেশের চিত্র নহে, ইহা শীতের বিলাতের ছবি। আরো স্পষ্ট রহিয়াছে—

বিদেশে আসিনু শ্রান্ত পথিক একেলা।

. .

এক দিন দুই দিন ফুরাইল শেষে,
আবার উঠিতে হল, চলিনু বিদেশে।
এই-যে ফিরানু মুখ, চলিনু পুরবে,
আর কি-রে এ জীবনে ফিরে আসা হবে।

. .

সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবে যে দেখা
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,

১ ভারতী ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ। দ্র. সন্ধ্যাসংগীত। কবিতাটিতে লেখকের নাম দেওয়া হইয়াছে— শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য। কবি কেন এ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না। বহুকাল পরে আর একবার লিখিয়াছিলেন বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ফুরালো দুদিন' শীর্ষক একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি কবির পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে (দ্র. মালতীপুঁথি, রবীন্দ্রসদন): 'দুদিন' কবিতাটি তাহারই সংস্কৃত রূপ। প্রথম পাঠটি (ফুরলো দুদিন) বোধ হয় বোম্বাই বাসকালে রচিত এবং ইহার মধ্যে বিচ্ছেদের কথাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উহা প্রকাশিত হয় নাই। পরে স্কটকুমারীদ্বয়ের স্মরণে উহাকেই রূপান্তরিত করিয়া লেখেন ও ভারতীতে প্রকাশ করেন।

একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে,
দু-একটি স্বর তার উদিবে স্মরণে,· ·
সেদিনের কথাগুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।
পাষাণ মানব-মনে সহিবে সকলি!
ভুলিব যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি,
কিন্তু আহা, দুদিনের তরে হেথা এনু,
একটি কোমল প্রাণ ভেঙে রেখে গেনু।[১]

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত কবিতাস্তবক এই মেয়েদের একটিকে স্মরণ করিয়াই রচিত। বহু বৎসর পরে (১৯২৬) বৃদ্ধ বয়সে একদা যৌবনের প্রেমকাহিনী আলোচনা কালে দিলীপকুমার রায়কে স্কট কুমারীদ্বয়ের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত এ কথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই— কিন্তু তখন যদি ছাই সে কথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।" কবি এই কথা যখন বলেন তখন বোধ হয় 'দুদিন' কবিতাটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে 'ভারতী'তে য়ুরোপ থাকাকালীন তিনি যে য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহা নানা ক্ষেত্রে নানারূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। ইঙ্গবঙ্গদের সম্বন্ধে তিনি যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই সমসাময়িক বিলাতপ্রত্যাগত যুবকদের পছন্দ হয় নাই; প্রায় ষাট বৎসর পরে 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' গ্রন্থে এই পত্র পুনর্মুদ্রিত করিবার সময় ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন— "কয়েকটি চিঠিতে তখনকার দিনের ইঙ্গবঙ্গের বিবরণ কিছু বিস্তারিত করেই দিয়েছি। আজ এরা লুপ্ত জীব।· ·সেকালের ইঙ্গবঙ্গদের অনেককে আমি প্রত্যক্ষ জানতুম। তাঁদের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছি তাঁদের নিজেরই মুখ থেকে। যদি এর মধ্যে কোনো অত্যুক্তি থাকে সে তাঁদেরই স্বকৃত।"

কিন্তু ঐ পত্রধারার যে বিষয় লইয়া তাঁহার দেশস্থ শ্রদ্ধেয় অভিভাবক শ্রেণীর কর্তৃপক্ষের সহিত বিরোধ বাধিল, সে হইতেছে য়ুরোপীয় স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া। পত্রমধ্যে বিলাতী সমাজের নিন্দা তিনি যথেষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের গতিশীল জীবনের প্রচণ্ডতা মুক্তজীবনের সহজ স্বাধীনতা তাঁহার অনভিজ্ঞ তরুণ জীবনের বহু সংস্কারের মূলে টান দিয়াছিল। কলিকাতার সংকীর্ণ সমাজজীবনের বৈচিত্র্যহীন পৌনঃপুনিকতা তাঁহার সর্বগ্রাহী মনের কাছে আজ অত্যন্ত নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিলাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য কাহারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না; স্বাধীনভাবে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় বা অপব্যয় করিলে বাধা দিবার কেহ থাকে না— এসব বাঙালি যুবকের পক্ষে একটা অভাবনীয় মুক্তি। এ ছাড়া বিলাতে সব থেকে বড় আকর্ষণের বিষয় ছিল নারীসমাজে স্বাধীনভাবে মেলামেশা। তিনি এক পত্রে লিখিতেছেন, "মেয়েপুরুষে একত্রে মিলে আমোদ-প্রমোদ করাই তো স্বাভাবিক। মেয়েরা তো মনুষ্যজাতির অন্তর্গত; ঈশ্বর তো তাদের সমাজের এক অংশ করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষে মানুষে আমোদপ্রমোদ মেশামেশি করাকে একটা মহাপাতক, সমাজবিরুদ্ধ, রোমাঞ্চজনক ব্যাপার করে তোলা শুদ্ধ অস্বাভাবিক নয়, তা অসামাজিক সুতরাং এক হিসাবে অসভ্য।" অতঃপর স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা লিখিয়া তিনি বলিলেন, "সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার

১ এই কবিতাটি ভারতীতে যেভাবে মুদ্রিত হয় এবং পরে সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যে তাকে যেভাবে পাওয়া যায়, উভয়ের মধ্যে কিছু তফাত দেখা যায়। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম, পৃ ৩২-৩৩।

কর, তা হলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।" বিলাতের স্বাধীন স্ত্রী-সমাজ সত্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, নতুবা তিনি লিখিতেন না, "এখানে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এসেছেন, সর্বপ্রথমেই তাদের চোখে কি ঠেকেছে? এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি সাধনে মহিলাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এখানে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।"[১]

এই প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইলে পত্রিকার সম্পাদকরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বিলাত-প্রবাসী কনিষ্ঠের এইসব মতের প্রতিবাদ করিয়া পত্রধারার পাদটীকায় দীর্ঘ মন্তব্য লিখিলেন। ইহার পর কয়েক মাস জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে নানা বিচার চলে— একদিকে প্রাচীনপন্থী দার্শনিক ও অন্যদিকে নবীনপন্থী কবি।

এমন সময়ে দেশে ফিরিবার জন্য পিতার আদেশ আসিল। 'ভারতী'র পত্রধারা তাঁহার এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তন-আদেশের কারণ কি না তাহার সঠিক প্রমাণ দিতে পারিব না; তবে আমাদের সন্দেহ হয় তরুণ কবির প্রগলভতায় অভিভাবকগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র দেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাহা শাপে বর হইল; বিদ্যালয়ের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অন্তর হইতে নীরব আর্তনাদ করিতেছিল, "দেশের আলোক দেশের আকাশ· ·ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল।" সত্যেন্দ্রনাথের ফার্লো-ছুটি ফুরাইতে তখনো কয়েক মাস বাকি, তিনি ছুটি শেষ হইবার পূর্বেই সপরিবারে দেশে ফিরিলেন— রবীন্দ্রনাথও সঙ্গে আসিলেন (১৮৮০ ফেব্রুয়ারি)।

বিলাত-প্রবাসের এই দেড়টা বৎসর রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটা বিশেষ পর্ব। জীবনের এমন একটা সন্ধিক্ষণে তিনি বিলাত গিয়েছিলেন, যেটা না বাল্য না যৌবন। তিনি গিয়াছিলেন বালকের মত, ফিরিলেন যুবকের ন্যায়। বিলাত-বাসকালে ইংরেজসমাজের সহিত মেলামেশা বিষয়ে তিনি যে খুব দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন তাহার প্রমাণ তো পত্রধারা হইতে পাওয়া যায় না। য়ুরোপীয় সংগীত শুনিবার বা শিখিবার সুযোগ তিনি যথেষ্ট গ্রহণ করেন; নাচের পার্টি ভোজের পার্টি পিকনিক পার্টি প্রভৃতিতে যোগদান বিষয়ে তাঁর কোনো উদাসীনতা প্রকাশ পায় নাই। মেয়েদের সঙ্গে গল্প ও আলাপ-পরিচয় করিতে সংকোচভাব ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়াই যায়। তাঁহার সুন্দর কান্তি সুমিষ্ট কণ্ঠ সকলকেই আকর্ষণ করিত।

বিলাত হইতে ফিরিবার প্রায় দেড় বৎসর পরে ভারতীতে প্রকাশিত পত্রাবলী 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' নামে প্রকাশিত হয় (১৮৮১ অক্টোবর)। গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। উপহার-পৃষ্ঠায় লেখা ছিল, "ভাই জ্যোতিদাদা, ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত তাঁহারই হস্তে এই পুস্তক সমর্পণ করিলাম।" কাহাকে অধিক মনে পড়িত এবং গ্রন্থখানি কাহার হস্তে সমর্পিত হইল, তাহা উৎসর্গপত্র হইতে স্পষ্ট না হইলেও অনুমান করা কঠিন নহে।

গ্রন্থ-প্রকাশকালে এই পত্রধারার রচনার দোষগুণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে বেশ সচেতন দেখি; তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিতেছেন— "বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল; কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকি পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে, আর কোনো উপকার হউক বা না হউক, একজন বাঙালী ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।"

১ ভারতী ১২৮৬ অগ্রহায়ণ।

এই গ্রন্থের ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখক যে বেশ সচেতন তাহাও ভূমিকা পাঠে বুঝা যায়; তিনি লিখিতেছেন, "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখি একপ্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহার চোখের আড়াল হইবামাত্র আর-একপ্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।" বহু বৎসর পর ১৯৩৬এ 'পাশ্চাত্যভ্রমণে' এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি লিখিয়া ছিলেন: "নিশ্চিত বলতে পারি নে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।··বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কবির মনোভাব অত্যন্ত তীব্র; সেইজন্য স্থায়ী গ্রন্থাবলীতে উহাকে তিনি স্থান দেন নাই। ১৩১১ সালে হিতবাদী হইতে 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র যে-সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহাতে একবারমাত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল। যোলো খণ্ড গদ্য-গ্রন্থাবলীতেও উহা মুদ্রিত হয় নাই। বহু বৎসর পর কাটিয়া-ছাটিয়া 'পাশ্চাত্যভ্রমণে'র অন্তর্গত করিবার সময়েও এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার অপ্রসন্ন মনোভাব প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি লেখেন, "সাহিত্যে সাবালক হওয়ার পর থেকেই ওই বইটার 'পরে ধিক্‌কার জন্মেছিল। বুঝেছি, যে-দেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সম্মানহানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি। বিস্তর লোকের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটা প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমি প্রকাশে বাধা দিলেই ওটা যে অপ্রকাশিত থাকবে এই কৌতূহলমুখর যুগে তা আশা করা যায় না।" তবে গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য লেখক স্বীকার করিয়াছেন, "এ বইটাকে সাহিত্যের পংক্তিতে আমি বসাতে চাই, ইতিহাসের পংক্তিতে নয়। পাঠ্য জিনিসেরই মূল্য সাহিত্যে, অপাঠ্য জিনিসের মূল্য ইতিহাসে। ঐতিহাসিককে যদি সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারতুম তবে আমার পক্ষে সেটা পুণ্যকর্ম, সুতরাং মুক্তির পথ হত।" রবীন্দ্রনাথের মতে "য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়।"[১]

দেশে প্রত্যাবর্তন

বিলাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ফিরিলেন ১২৮৬ সালের মাঘ মাসের শেষাশেষি। ভারতের বাহিরে এক বৎসর পাঁচ মাস কাটে (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর ২০ - ১৮৮০ ফেব্রুয়ারি); ফিরিবার সময় তাঁহার বয়স আঠারো বৎসর নয় মাস।

প্রত্যাবর্তনটা হইল অসময়ে। এই আকস্মিক ফিরিয়া আসাটা আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে নিশ্চয় বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ব্যারিস্টার[২] হইয়া আসিবেন ও কালে কলিকাতা হাইকোর্টের যশস্বী আইনজীবী হইয়া ধন ও মান অর্জন করিবেন, তাঁহারা হতাশ হইলেন। মহর্ষি ও অগ্রজেরা মনে মনে খুশি হইয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের অনুমান। ভারতীতে প্রকাশিত য়ুরোপসংক্রান্ত পত্রধারায় রবীন্দ্রনাথ যে-সব মতামত অকুণ্ঠ লেখনীতে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অভিজাত রক্ষণশীল অভিভাবকশ্রেণীর অগ্রজাদির পক্ষে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। 'রবি' যে বিলাতের এই নব্যপ্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন ইহাতেই তাঁহারা আনন্দিত। অতি প্রিয়জন যাঁহারা 'রবি'কে কেবলই স্নেহ করিতেন, তাঁহারা বালকের সুন্দর কান্তি

১ 'পাশ্চাত্যভ্রমণ' নূতনভাবে প্রকাশিত হইলে উহা উৎসর্গ করেন চারুচন্দ্র দত্তকে; চারুচন্দ্র বিলাত-ফেরত আই. সি. এস.; অবসর গ্রহণ করার পর বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ গ্রহণ করিয়া শান্তিনিকেতনে প্রায়ই থাকিতেন। সেই ঘনিষ্ঠতার দ্যোতক হিসাবে গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন ১৯৩৬, ২৯ আগস্ট। ইহাতে 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' পরিবর্তিত আকারে ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' দ্বিতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয়।

২ ১৩০১ কার্তিক [১৮৯৪ অক্টোবর ২৪] বোলপুর হইতে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "ভাগ্যি আমি ব্যারিস্টার হইনি।"—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫২, পৃ ২৪১।

বিলাতের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় সুন্দরতর হইয়াছে দেখিয়াই খুশি। বৎসরাধিককাল বিলাতের সমাজে নানা ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া পূর্বের স্বভাবসুলভ অপ্রতিভ-অপ্রস্তুত ভাব দূর হইয়াছে; তিনি গিয়াছিলেন লাজুক বালক, ফিরিলেন প্রগল্‌ভ যুবক। বিলাতে যেসব গান শেখেন স্বজনসমাজে সেগুলি গাহিয়া শুনাইতে বেশ একটু গর্ব অনুভব করেন। বিলাতে বাসকালে কণ্ঠস্বরের বেশ বদল হয়, অনেকেই বলিলেন কেমন যেন বিদেশী রকমের হইয়াছে; এই মন্তব্য শুনিতে খারাপ লাগে না। এমনকি কথা কহিবার ঢঙেরও বদল তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন— এসব কথা কবি জীবনস্মৃতিতে স্বয়ং কবুল করিয়াছেন; আঠারো বৎসরের যুবকের পক্ষে এইরূপ পরিবর্তন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

দেশে ফিরিবার পর সব থেকে আদর-আপ্যায়ন পাইলেন তাঁহার নূতন বৌঠাকুরানীর কাছ হইতে। কাদম্বরী দেবীর বয়স এখন প্রায় একুশ বৎসর; তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার নিরুদ্ধ নারীহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ প্রেম প্রীতি ছিল রবিকে ঘিরিয়া। নয় বৎসর বয়সে বালিকাবধূ-রূপে তিনি যখন এই গৃহে প্রবেশ করেন, তখন সাত বৎসরের বালক রবি ছিল তাঁহার খেলার সাথী, গল্পের সঙ্গী; চৌদ্দ বৎসর তাঁহাকে নিরন্তর পাইয়াছিলেন। স্বভাব-কোমল নারীহৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা রবিকে ঘিরিয়া সার্থক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার নিঃসঙ্গ স্নেহাতুর জীবনের মধ্যে রবিকে পুনরায় ফিরিয়া পাইয়া যে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথও যে সুখী হইলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন; বিলাতে থাকিতে তাঁহারই কথা সব থেকে বেশি করিয়া মনে পড়িত। তাঁহারই স্নেহময় আঁখি ধ্রুবতারকার ন্যায় সর্বদা তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিত।

বিলাত হইতে দেশে যখন ফিরিলেন, বাড়িতে তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী দেশী ও বিলাতি সুরের সাহায্যে সংগীতের নানারূপ পরীক্ষায় রত, বাংলা গানে নূতন নূতন রূপসৃষ্টির সাধনায় উভয়েই তন্ময়। এই ঘটনাটি সামান্য হইলেও বাংলার সংগীতচর্চার ও বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের সংগীতরচনার ইতিহাসে স্মরণীয়। দেশী ও বিলাতি সুরের সংকরমিশ্রণ এমনকি দেশী-সুরের রাগরাগিণীর মিশ্রণেও প্রাচীনপন্থীদের ঘোর আপত্তি। কিন্তু যাঁহারা গানের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইল বলিয়া বিলাপ করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে চিরদিনই দেশী ও বিদেশী সুরের মিশ্রণে নবতর সুরের সৃষ্টি হইয়াছে; আজ আমরা যাহাকে মার্গসংগীত বলি তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লিষ্ট হইলে দেখা যাইবে যে তাহার অনেখানিই সংকর; বিশুদ্ধ সংগীত আদিম জাতির মধ্যে ছাড়া আর কোথাও থাকিতে পারে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ তরুণের দল যে-দুঃসাহসিকতার পথ উন্মোচন করিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই পথ বিস্তারিত করিয়া দিলেন; বিচিত্র সুরের সঙ্গে অনির্বচনীয় ভাবরাজি ও অনিন্দনীয় ভাষার উদ্‌বাহ সম্পন্ন করিয়া বাংলাসাহিত্যে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে যুগান্তর সাধন করিলেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সংগীতগোষ্ঠীভুক্ত হইলেন। এতদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টিতে ভাষা দান করিতেন অক্ষয় চৌধুরী, এবার তাহাতে যোগদান করিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইতিপূর্বে এই দেশী ও বিদেশী সুরের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট হইয়াছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' নামে গীতনাট্য। রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে আসিয়া দেখিলেন যে নাটকখানি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, তিনি শেষ দিকে একটি গান যোজনা করিয়া দিলেন— "আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি" ইত্যাদি।[১] নাটক রচনা করিয়া তাহার অভিনয়মূর্তি না দেখিতে পাইলে যথার্থ

১ গীতবিতান।

মানময়ী/গীতিনাটিকা/কলিকাতা/বাল্মীকিযন্ত্রে। শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮০২ শকাব্দ। (১৮৮০) পৃ. ১২। পূর্বাভাষ "উর্বশী ইন্দ্রের প্রতি মান করিয়াছে, অনেক সাধ্যসাধনাতেও সে-মান ভাঙিল না। মান ভাঙাইবার জন্য মদনকে রতি অনুরোধ করেন। মদন উর্বশীর নিকট উপস্থিত হইয়া ফুলবান মারে। তাহাতে উর্বশীর মান ভাঙিয়া যায় ও সে ইন্দ্রের জন্য অধীর হয়। এদিকে বসন্ত মদনকে মদ খাওয়াইয়া

আর্টিস্ট-লেখকরা সুখী হইতে পারেন না; মানময়ীর অভিনয় হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ মদনের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইন্দ্রের ও তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী উর্বশীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বলিয়া শুনিয়াছি। এই মানময়ীকে বাংলাসাহিত্যের গীতনাট্য রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে— কারণ ইহাতে গান ছাড়া গদ্যে কথাবার্তা ছিল। ইহার এক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকীপ্রতিভা' রচিত ও অভিনীত হয়; সেটি খাঁটি গীতনাট্য, কারণ তাহাতে সকল কথাবার্তাই গানের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

বিলাত হইতে ফিরিবার পর কালটা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, সেটি যথার্থ চিত্র বটে। "যৌবনের আরম্ভ-সময়ে বাংলাদেশে ফিরে এলেম। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারি দিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা, নিস্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব— এই সমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে পড়ে আছি।"[১] অল্পকথায় এত সূক্ষ্ম এত সত্য আত্মবিশ্লেষণ কেবল রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষীর পক্ষেই সম্ভব।

বিলাতে থাকিতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টি-বিষয়ে তেমন মন দিতে পারিতেন না; তিনি লিখিয়াছেন, "একটা আশ্চর্য এই দেখিয়াছি, যতকাল বিলাতে ছিলাম আমার কবিতা লিখিবার উৎসাহ যেন একেবারে শুষ্ক হইয়া ছিল।·· কেবল ডেভন্‌শিয়রের পুষ্পবিকীর্ণ বসন্ত বিরাজিত টর্কি নগরীর সমুদ্রতটে 'মগ্নতরী' বলিয়া একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেও জোর করিয়া লেখা।" বিলাতে থাকিতে থাকিতে আর-এক খানি কাব্যের পত্তন করেন; কতকটা ফিরিবার পথে এবং অধিকাংশটা দেশে আসিয়া লেখেন। 'ভগ্নহৃদয়' নামে উহা ভারতীতে প্রকাশিত হয়।[২] এই কাব্য সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। ভগ্নহৃদয় ছাড়া অন্য রচনা চোখে পড়ে কম, কারণ এই সময়টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরীর সহিত গানের সুরের বিচিত্র পরীক্ষা চলিতেছে, যাহাই হউক, যে-দুইচারিটা কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটির নাম 'হরহৃদে কালিকা'[৩] ইহার মধ্যে পর বৎসর প্রকাশিত 'মহাস্বপ্ন' ও প্রভাতসংগীতের 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়'এর সুরের আভাস পাওয়া যায়; ভগ্নহৃদয়ের কোনো কোনো অংশের সহিতও সুর মেলে। যথাস্থানে সে আলোচনা করা যাইবে। এইখানে 'হরহৃদে কালিকা' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

> একদা প্রলয়শিঙ্গা বাজিয়া রে উঠিবে!
> অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিশাবে তারা
> অমনি এ জগতের রাশ-রজ্জু টুটিবে।

তাহার ফুলবান চুরি করিয়া তাহাকেই মারে। মদন তাহাতে উর্বশীর প্রেমে মত্ত হইয়া তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছে, এমন সময় দুষ্টুমি করিয়া উর্বশীর পদানত মদনের কাছে রতিকে ডাকিয়া আনে। রতি মদনকে তিরস্কার করিতে করিতে চলিয়া যায় মদনও তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। পরে উর্বশীর মানভঙ্গের জন্য তাহাকে উপহাসপূর্বক সকলে উল্লাস করিতে করিতে ইন্দ্রের সহিত মিলন করাইতে লইয়া গেল।" •

এই গীতিনাটিকার শেষ গানটি রবীন্দ্রনাথের 'আয় তবে সহচরি'।

১ দ্র. জীবনস্মৃতি ১৩৫৪ সংস্করণ, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২৭১

২ ভারতী ১২৮৭ কার্তিক হইতে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম ৬ সর্গ প্রকাশিত হয়। কাব্যখানিতে মোট ৩৪ সর্গ আছে।

৩ ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন, শৈশবসংগীত পৃ. ১০৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ, ১ম। কলিকাতা ঠনঠনিয়া কালীমন্দিরে প্রস্তর ফলকে লেখা আছে "হরহৃদে কালিকা বিরাজে"।

আলোক-সর্বস্বহারা, অন্ধ যত গ্রহতারা
দারুণ উন্মাদ হয়ে মহা শূন্যে ছুটিবে !
ঘুম হতে জাগি উঠি রক্তআঁখি মেলিয়া
প্রলয় জগৎ লয়ে বেড়াইবে খেলিয়া।

. .

জগতের হাহাকার যবে স্তব্ধ হইবে,
ঘোর স্তব্ধ, মহা স্তব্ধ, মহা শূন্য রহিবে,
আঁধারের সিন্ধু রবে অনন্তেরে গ্রাসিয়া—
সে মহান্ জলধির নাই ঊর্মি নাই তীর
সেই স্তব্ধ সিন্ধু ব্যাপি রব আমি ভাসিয়া ;
তখনো রবি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনাবাসনাহীন এই বুক মাড়ায়ে ?

রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের মধ্যে 'ভীষণ মধুরে'র বিপরীত স্বরলহরী বারে বারে ধ্বনিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের মধুর বংশীধ্বনি ও নটরাজ-রুদ্রের পিনাক-টংকার রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যকে লালিত্যে ও শক্তিতে অপরূপ করিয়াছে। এই কবিতাটির মধ্যে রুদ্রের আবাহন-আভাস অস্পষ্টভাবে আছে বলিয়া এইখানে বিশেষভাবে ইহার উল্লেখ করিলাম।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের অভিব্যক্তি আলোচনা করিতে করিতে দেখা যায়, তিনি কখনো কোনো এক মনোভাবে অধিককাল আবিষ্ট থাকিতে পারিতেন না, নব নব অনুভূতি জীবনকে নব চেতনায় নব কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করিত। তাঁহার প্রত্যেক কাব্যের শেষ দিকে সেই যুগ হইতে নিষ্ক্রমণের আকৃতি দেখিতে পাই। শৈশবসংগীতের শেষ কবিতা 'পথিক'-এর মধ্যে এই যাত্রার সুরই প্রচ্ছন্ন।[১] মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) শৈশবসংগীতের এই পথিক কবিতা হইতে কিয়দংশ সংকলন করিয়া 'যাত্রা' নামে অভিহিত করেন ; এই যাত্রা খণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

'কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া বাহির হনু তিমিররাতে তরণীখানি বাহিয়া।' জীবনের পথে পথিক 'যাত্রা' করিয়া 'হৃদয়-অরণ্যে'র মধ্যে আসিয়া পড়িল এবং পরে তথা হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া 'বিশ্বে'র মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা হইতেছে রবীন্দ্র-কাব্যের আদি যুগের অভিব্যক্তি— শৈশবসংগীত, সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীত।

গীতিকাব্য কবিজীবনের আংশিক প্রকাশমাত্র , কাব্যের মধ্য দিয়া হৃদয়ের কামনারাজি প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু মানবজীবনের বিচিত্রসংস্কার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সর্বতোভাবে ব্যক্ত হয় না। ভগবৎবিশ্বাস ও ভগবৎচিন্তা মানুষের সেইরূপ একটি সংস্কার। রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ব্রাহ্মপরিবারে, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় মহাপুরুষের গৃহে ; সুতরাং ভগবৎবিশ্বাস তাঁহার জন্মগত সংস্কার। এই সংস্কার ও বিশ্বাস -বশে তিনি এই সময়ে ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন

১ পথিক, ভারতী ১২৮৭ পৌষ। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ, ১ম, শৈশবসংগীত, পৃ. ৫১৪-৫২৬।

এবং মাঘোৎসবের জন্য সাতটি গান রচনা করিয়া দিলেন; তখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। এই সাতটি গানের দুইটি মাত্র গীতবিতানের প্রথম সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছিল; বর্তমান সংস্করণে সকলগুলিই আছে।[১]

বাল্মীকিপ্রতিভা

সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চায় সংগীতের অনুশীলনে বাল্যকাল হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়। পিয়ানো এবং বেহালা বাজানো এবং বিলাতী সুরের ও গানের চর্চা ছিল জ্যোতিরিন্দ্রের যৌবনের অন্যতম বিলাস ও ব্যসন। পিয়ানো বাজাইয়া নূতন নূতন সুর সৃষ্টি করিতে তাঁহার অপার আনন্দ ছিল। এই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে তিনি পারিতেন না, সুরে ভাষা দান করিবার জন্য অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথকে নিযুক্ত করিতেন; এইটি রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাইবার পূর্বেই ঘটে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন, " 'সরোজিনী' প্রকাশের (১৮৭৫ নভেম্বর) পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সংগীত ও সাহিত্য -চর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন— অক্ষয় চৌধুরী, রবি, ও আমি।"

বিলাত যাইবার পূর্বেই গানরচনায় তাঁহার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। বৃদ্ধবয়সে লিখিত 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, "এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।" ওই কাজে অক্ষয়চন্দ্র ও স্বর্ণকুমারীও সহায়তা করিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উলটো। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।" এইভাবে আমেদাবাদ যাইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের গানরচনার সূত্রপাত হয়। গুন্‌গুন্ করিয়া সুর করিতে করিতে ভাষা আপনি আসিয়া গানে রূপ লয়, ইহাই ছিল কবির গানরচনার রীতি।

এই সময়ে সংগীত সম্বন্ধে স্পেনসরের এক প্রবন্ধ[২] রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ায়, তাঁহার মনে সংগীত ও অভিনয় সম্বন্ধে নবতর ভাবনার উদয় হইল। স্পেনসর ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকদের অন্যতম। মানুষের চিরাচরিত মোহাচ্ছন্ন মতকে জীবতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া উহাকে দৈব অপৌরুষেয়তার

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১২৮৭) ফাল্গুন। মাঘোৎসবের সময় এই গানগুলি গীত হয়: শেষ গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত—

তুমি কিগো পিতা আমাদের	রবিচ্ছায়া (১২৯২)	গানের বহি (১৩০০)	গীতবিতান নূতন সংস্করণ (১৩৩৮)
তুমি কিগো পিতা আমাদের—	২০৬	২৭৯	৮২৩
মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ—	২০৬	২৮২	৮১৯
আমরা যে শিশুমতি—	২১১	২৭৬	৮১৯
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা—	২১১	২৮০	৩১৮
একি এ সুন্দর শোভা—	২১২	২৭৭	২১৪
দিবানিশি করিয়া যতন—	২১২	২৮০	৮২০
কোথা আছ প্রভু এসেছি দীনহীন—	২১৫	২৭৭	৮২০
আজি কি হরষসমীর বহে*	২১৫	নাই	নাই

*দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত দ্র. গীতবিতান পৃ. ৯৫৮; রবিচ্ছায়া একমাত্র গ্রন্থ যেখানে ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া সংগৃহীত হয়। পরে পরিবর্জিত।

২ *Essays—Scientific, Political and Speculative.* Vol. I 1868: The Origin and Function of Music এই প্রবন্ধটি Fraser's Magazine 1857 এ প্রথম প্রকাশিত হয়।

আসন হইতে বেদিচ্যুত করিতে চেষ্টান্বিত ছিলেন ; তিনি সে-যুগের ভাঙ্গনপন্থী যুবকদের গুরুস্বরূপ। এই প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে যেন নূতন দৃষ্টি খুলিয়া গেল।

জীবনস্মৃতিতে কবি এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমকালীন মনোভাব না হইলেও উদ্ধৃতিযোগ্য : "সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু-না-কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেনসরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন।"

এই ভাবনা হইতে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতনাট্যের জন্ম। এই সময়ে তাঁহার ভাবনাকে রূপদানের সুযোগও মিলিল।

পাঠকের স্মরণ আছে, বিদ্বজ্জন-সমাগম সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান ঠাকুরবাড়ির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। সেই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে একটা-কিছু অভিনয়ের প্রস্তাব হইতে বাল্মীকিপ্রতিভার আবির্ভাব হইল। ১২৮১ সালের ৬ই বৈশাখ ঠাকুরবাড়িতে যখন এই সভা স্থাপিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর।[১]

ছয় বৎসর পরে ১২৮৭ সালে রবীন্দ্রনাথের উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহারই উপর বিদ্বজ্জন-সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অভিনয়ের উপযোগী নাটক রচনার ভার অর্পিত হইল। তখন "কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিলে এই সভার উপযুক্ত হইবে তাহারই আলোচনাকালে দস্যুরত্নাকরের কবি হইবার কাহিনীই সকলের চেয়ে সংগত বলিয়া বোধ হইল।" বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' হইতে মূল প্রেরণা পাইলেন। বিহারীলালের এই 'মঙ্গল'কাব্য (১২৮৭) এই বৎসরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে (১২৮১) আর্যদর্শন পত্রিকায় উহা যখন প্রথম বাহির হইতেছিল, তখনই উহা সাহিত্যরসিকদের মাতাইয়া তুলিয়াছিল ; এখন সমগ্র 'মঙ্গল'কাব্যখানি পাঠকদের হস্তগত হইল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতনাট্যের ক্রৌঞ্চবধের চিত্রখানি গ্রহণ করিলেন 'সারদামঙ্গল' হইতে 'ক্রৌঞ্চরুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়'। বালিকার বেশে সরস্বতীর আবির্ভাব ও তিরোধান রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনা হইলেও বিহারীলালের কাব্য হইতে তাহা বহুলপরিমাণে গৃহীত। সরস্বতীর অন্তর্ধানের পর বাল্মীকির শোক 'সারদামঙ্গলে'র দ্বিতীয় সর্গে আনন্দলক্ষ্মীর উদ্দেশে কবিচিত্তের অভিসার ও কাতরতার সহিত তুলনীয়। সারদামঙ্গলের শেষে কবিচিত্তে যে-আনন্দ উপলব্ধ হইয়াছে, বাল্মীকিপ্রতিভাতে সরস্বতীর আবির্ভাবে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।[২]

নাট্যের শেষ দৃশ্যে সরস্বতী বাল্মীকির হস্তে বীণা সমর্পণ করিতেছেন— এই চিত্রখানি মূরের আইরিশ মেলোডীজ কাব্যের চিত্রিত গ্রন্থের স্মৃতি হইতে কল্পিত। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন, "ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত।"

এইভাবে নাটকের গল্পটা একরূপে ঠিক হইলে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুরসৃষ্টিতে ও রবীন্দ্রনাথ তাহাতে ভাষা দান করিতে

১ প্রথম অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত 'পুরুবিক্রম' নাটক হইতে 'উদ্দীপনাপূর্ণ অংশ' পঠিত হয় ও "ঠাকুরপরিবারের ছোটো ছোটো কয়েকটি বালকবালিকা চৌতাল প্রভৃতি তালে তানলয়বিশুদ্ধ সংগীত করিয়া সভাস্থবর্গকে চমৎকৃত করেন ; এই দলে বালক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলিয়া মনে হয়।"—ভারতভাস্কর ১৮৭৪ এপ্রিল ২৪, দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকালের কথা, প্রবাসী ১৩৪০। জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয় অংশে উদ্ধৃত।

২ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস।

আরম্ভ করিলেন। এই সংগীতরচনায় অক্ষয় চৌধুরীও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন।[১] এইভাবে বিহারীলালের নিকট হইতে নাটিকার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট হইতে সুরযোজনা সম্বন্ধে সহায়তা লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতনাট্য রচিত হইল।

অতঃপর বিদ্বজ্জন-সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ইহার অভিনয় হইল—১২৮৭ সালের ১৬ই ফাল্গুন (১৮৮১ ফেব্রুয়ারি ২৬)[২] জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতলার ছাদে পাল খাটাইয়া, স্টেজ বাঁধিয়া। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ (১৯) বাল্মীকি ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা (.৫) সরস্বতী সাজিয়াছিলেন—"বাল্মীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।"

বিদ্বজ্জন-সমাগম সভা উপলক্ষে ঠাকুরবাড়িতে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৪৩), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৭), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২৮), রাজকৃষ্ণ রায় (২৫) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম অভিনয়।[৩] পরযুগে নাট্যাভিনয়কলায় রবীন্দ্রনাথ যে যশ অর্জন করেন ও বাংলাদেশের অভিনেতাদের সম্মুখে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার সূচনা হয় এই দিনে।

সাহিত্যে ও সংগীতে এই ক্ষুদ্র গীতনাট্যের প্রভাব সেদিন বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়াছিল। উহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। তরুণ সাহিত্যিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' বঙ্গদর্শনে (১২৮৭ পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তখনও রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভা বাহির হয় নাই। বিদ্বজ্জন-সমাগম সভা উপলক্ষ্যে ইহা মুদ্রিত হয় (১২৮৭ ফাল্গুন)। অতঃপর হরপ্রসাদ তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থখানি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়া ১২৮৮ ভাদ্র মাসে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের শেষাংশ (৪-৬ খণ্ড) যে কিশোরকবির বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গদর্শনের বিচক্ষণ সমালোচকের শ্যেনদৃষ্টি এড়ায় নাই; তিনি লিখিয়াছিলেন, "যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।"[৪] আমাদের মনে হয় এই সমালোচনা বঙ্কিমের লেখনী নিঃসৃত। কারণ তিনি নাট্যাভিনয়ে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান উকিল। তিনি এই অভিনয় দেখিয়া এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একটি গান রচনা করিয়া ফেলেন; রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশদ্‌বর্ষের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তিনি তাহা জনসমাজে প্রকাশ করেন। গানটি এই—

১ জীবনস্মৃতির দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ২৩৩।

২ শ্রীসুকুমার সেন লিখিতেছেন, 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যে বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম অভিনয় হয় সেদিন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ও (২৫) ছিলেন। অভিনয়দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইনি একটি কবিতা লেখেন 'বালিকাপ্রতিভা' নামে। ইহা রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'অবসর-সরোজিনী'তে সম্বলিত আছে। কবিতাটিতে যে-পাদটীকা আছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭ শনিবার (১৮৮১ ফেব্রুয়ারি ২৬)৹ দিবসে বাল্মীকিপ্রতিভা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।'—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩৫০, কার্তিক-পৌষ, পৃ. ১৬৩। আর্য্যদর্শন ১২৮৮ বৈশাখ সংখ্যাতেও এই তারিখটি পাওয়া যায়।

৩ বিলাত যাইবার পূর্বে ১৬ বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায় এবং বিলাত হইতে আসিয়া 'মানময়ী'তে ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এসব অভিনয় প্রায়ই বাড়ির লোক ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত।

৪ বঙ্গদর্শন ১২৮৮ আশ্বিন, পৃ. ২৮।

উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ, ঘুমায়ে থেকো না আর, অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।[১] উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি, নব বাল্মীকিপ্রতিভা দেখাইতে পুনর্বার। হেরো তাহে প্রাণ ভ'রে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে, ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার। 'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি, ও ভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর।

বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাসের যে এই গীতনাট্যখানি ভালো লাগিয়াছিল তাহার মূল কারণ হইতেছে নাটকটির আখ্যান-অংশের উচ্চ আদর্শ। তবে বঙ্কিম দেখিয়াছিলেন সাহিত্যের দিক হইতে, গুরুদাস দেখিয়াছিলেন তত্ত্বের দিক হইতে। বিশুদ্ধ সংগীত ও নাট্যের দিক হইতে ইহাকে দেখিবার মত রসশিক্ষা তখনো সার্বজনীন হয় নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে সমসাময়িক স্তুতিনিন্দা কিছুই জানা যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পুত্রের অভিনয়াদির সংবাদ পাইয়া রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লেখেন; রবীন্দ্রনাথ পত্রখানি তাঁহার বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে পাঠান; তিনি পাঠ করিয়া লেখেন 'তাঁহার অকপট স্নেহময় ভাষায় মুগ্ধ হইয়াছি।' দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পত্রখানি আমাদের হস্তগত হয় নাই।[২]

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বহু বিচার করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, "বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।"

এই গীতনাট্যের মধ্যে বৈঠকী গানভাঙা অনেকগুলি সুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের; ইহা এক হিসাবে সংগীত-জগতের একটা বিপ্লব, কারণ ওস্তাদদের মতে মার্গসংগীতের বিশুদ্ধ ঠাট ভঙ্গ করায় গানের আভিজাত্যই নষ্ট হইয়াছিল। ইহার উপর ইঁহারা নিজেদের যদৃচ্ছাক্রমরচিত সুরে গান বসাইলেন; বিলাতি সুরেরও প্রয়োগ করেন বাংলা গানে। এইসব অভিনবত্ব যে কত বড় সংগীত-দ্রোহিতা তাহা আজ আমাদের কাছে সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে না; কারণ গান এখন বহু সুরগ্রাহী হইয়াছে।

বাল্মীকিপ্রতিভায় গান লইয়া যে-পরীক্ষা করিলেন, তাহারই সমর্থনে তাঁহাকে ইহার পর তিনটি প্রবন্ধ লিখিতে দেখি— 'সংগীত ও ভাব' 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' এবং 'সংগীত ও কবিতা'।

'সংগীত ও ভাব'[৩] প্রবন্ধটি কবি পাঠ করেন মেডিক্যাল কলেজ হলে (১২৮৮ বৈশাখ ৮)— দ্বিতীয় বার বিলাত-যাত্রার পূর্বদিন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮২)। তরুণ কবির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা কণ্ঠসংগীতের মূল উদ্দেশ্য। প্রবন্ধের লিখিত অংশ দীর্ঘ নহে, দৃষ্টান্তের দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় নানাপ্রকার সুরসংযোগে নানাভাব প্রকাশ করেন। তিনি

১ এই গানটির প্রথম দুই পংক্তি বহরমপুর বাসকালে 'নবরত্ন'সভার জন্য রচিত গানে ছিল। *Reminiscences, Speeches and Writings of Sir Gooroo Das Banerjee, Kt.* Compiled by Upendra Chandra Banerjee, 1927, p. 67.

২ প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি, পৃ. ২৯৯। এই পরিচ্ছেদ রচনাকালে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বাল্মীকিপ্রতিভা ও ভারতীয় সংগীতের মুক্তির প্রেরণা'— দেশ ১১শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা, ১৩৫০ সাল ২৭ ফাল্গুন, পৃ. ১৩৭-১৪০ ও 'রবীন্দ্রগীত জিজ্ঞাসা', গীতবিতান বার্ষিকী পৃ. ১৫৫-১৬৭; হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

৩ সংগীত ও ভাব, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৬২-৬৯। বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে এই সভা আহূত হয়। মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক F. T. Movat ১৮৫১ ডিসেম্বর ১১ই বেথুন-সোসাইটি স্থাপন করেন; বেথুনের মৃত্যু হয় ১৮৫১ অগস্ট ১২।

বলেন যে, আমরা যখন কথা বলি তখনও সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতের উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়।

সংগীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ হার্বার্ট স্পেনসরের মতের অনুগামী; এবং তাঁহারই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে গীতনাট্য-রচনায় উদ্‌বোধিত হইয়াছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। বেথুন-সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধে পরিব্যক্ত মতের সমর্থনে এবার তিনি স্পেনসরের The origin and function of music প্রবন্ধটি অবলম্বন করিয়া 'সংগীতে উৎপত্তি ও উপযোগিতা'[১] শীর্ষক রচনাটি লিখিলেন। তাহাতে কবি বলেন যে, মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে সংগীত, আর রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন সংগীতের উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে ভাবটিকে রাগরাগিণীর হস্তে সমর্পণ করা।

বিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের মত রাগ-রাগিণীর অত্যাচার সহ্য করিতে তিনি নারাজ। 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে বলিলেন যে, "যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন?" বৈয়াকরণ ও সাহিত্যিকের যে প্রভেদ, গানের ওস্তাদের সহিত একজন ভাবুক গায়কেরও সেই প্রভেদ। তাই বলিতেছেন, "সংগীতের উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ— কানে মিষ্ট শোনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি ভাব না থাকিলে কেবলমাত্র সুরসমষ্টি জীবনহীন দেহ মাত্র; সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি রাগরাগিণী-আলাপ নিষিদ্ধ। আমি বলি, তাহা কেন হইবে? রাগরাগিণী-আলাপ ভাষাহীন সংগীত। অভিনয়ে pantomime যেরূপ, ভাষাহীন অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাবপ্রকাশ করা, সংগীতে আলাপও সেইরূপ। Pantomimeএ যেমন কেবল অঙ্গভঙ্গী হলেই হয় না, যে-সকল অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাব-প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক। আলাপেও সেইরূপ কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যেসকল সুরবিন্যাস দ্বারা ভাবপ্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক। গায়করা সংগীতকে যে-আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলি চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"

রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই সুর হইতে গানের সৃষ্টি করিতেছেন বলিয়া তাহারই সমর্থনে এই কৈফিয়ত দিতেছেন। কিন্তু যে মতটিকে এই বিশ বৎসর বয়সে এত জোরের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার চরম কথা নহে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে জীবনস্মৃতিতে লিখিলেন, "যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম, সে মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে।·· গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো।" ইহাকেই কি কবির চরম মত বলিয়া গ্রহণ করিব? সে আলোচনার ক্ষেত্র এখন নহে।

১ সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা, ভারতী ৫ম খণ্ড, ১২৮৮ আষাঢ়, পৃ. ১১৫-১২২।

'সংগীত ও কবিতা' গান সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় প্রবন্ধ।[১] এই রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ববক্তব্যকে আরো বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, সংগীত ও কবিতায় আমরা আর-কিছু প্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতম্য। ম্যাথু আর্নলডের চিত্র সংগীত ও কবিতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের মর্ম উদ্ধৃত করিয়া কবি দেখাইলেন যে, যে-মুহূর্ত শিল্পীর শিল্পের সর্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্ত সেইটি বাছিয়া চিত্রে গাঁথিয়া ফেলা হইতেছে তাঁহার চরম সার্থকতা; ইহার পরের মুহূর্তের ভাব চিত্রে নাই। তেমনি মনের একটিমাত্র ভাব বাছিয়া লইয়া সুর দান হইতে সংগীতের কার্য, কিন্তু কবিতার কাজ আরও বিস্তৃত; ভাব হইতে ভাবান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে তাহাকে গমন করিতে হয়। ম্যাথু আর্নলডের মতে সংগীত একটি স্থিরভাবের ব্যাখ্যা মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অননুসরণীয় তাহা নহে; তবে এখনো সংগীতের সে বয়স হয় নাই। বহু বৎসর পরে বৃদ্ধবয়সে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের সহিত সংগীতের বিবাহ দিয়া সংগীতকে গতিশীল ভাবের বাহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এ বিষয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের মত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলিতেছেন, "পূর্বে আমাদের দেশে কবিতামাত্রই ছিল সুরধর্মী; কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের কবিরা লক্ষ্য করলেন গীতিকবিতায় সুরের প্রয়োজন থাকে না, যদি ছন্দে ও ভাবে কবিতাটি নিখুঁত হয়ে ওঠে। সুতরাং গীতিকাব্য-রচনা কবিদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে উঠল। শোনা যায়, আগেকার কবিরা প্রায়ই সুবজ্ঞ গায়ক হতেন। কারণ, তখনকার সমাজে গান ছিল অত্যাবশ্যক। সুতরাং সুরজ্ঞান কিছুটা আপনা হতেই হত। পাশ্চাত্য প্রভাবে এ যুগে সুরের প্রভাব মানব-জীবনে যদিও কমে গেল, কিন্তু আমাদের দেশে রক্তে যে-আবেগ এতদিন ধরে বয়ে এসেছে তাকে দূর করা সম্ভব হল না। তাই বাংলাদেশে এক শো বছরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় বর্ধিত হয়েও, যে-কবিই গান জানতেন তিনি কেবল কবিতা লেখেন নি, গানও রচনা করেছেন ও গীতিকবিতাকেই গ্রহণ করেছেন গানরচনার অবলম্বনরূপে।·· পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের অগায়ক কবিদের অনেক সুবিধা করে থাকলেও, সমগ্রভাবে কবিদের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাটি কোন্‌দিকে ধাবিত হচ্ছে তা ভালো করে বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথ ও এ যুগের অন্যান্য খ্যাতনামা গীতরচয়িতাদের লক্ষ্য করে।"[২]

নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য

বিলাত হইতে ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যেই (১৮৮০ ফেব্রুয়ারি) রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিলাত যাওয়া স্থির করেন। এবার তিনি নিজেই পিতাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে তিনি ব্যারিস্টার হইবেন। মহর্ষি এই পত্র পাইয়া তাঁহাকে লিখিলেন, "আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে 'আমি বারিস্টার হইব'। তোমার এই কথার উপরে ও তোমার শুভবুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া তোমাকে ইংলণ্ডে যাইতে অনুমতি দিলাম।·· গতবারে সত্যেন্দ্র তোমার সঙ্গে ছিলেন, এবারে মনে করিবে আমি তোমার সঙ্গে আছি।"[৩]

কিন্তু এই প্রস্তাব-মত বিলাত যাত্রা হয় নাই; কি কারণে হয় নাই জানি না। এই সংকল্প গ্রহণের প্রায় আট মাস পরে আর-একবার বিলাত যাত্রার চেষ্টা হইয়াছিল বটে, তবে সেবারও মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসেন। ব্যারিস্টার হইবার আশা তিনি ত্যাগ করিলেও তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজনেরা সে আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

১ সংগীত ও কবিতা, ভারতী ১২৮৮ মাঘ, পৃ. ৪৫৮-৪৬৪। প্রসঙ্গত বলি, এইসব প্রবন্ধ কবির সন্ধ্যাসংগীত-যুগের গদ্যরচনা।

২ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত। শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য— 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সঙ্গম'।

৩ ৮ই ভাদ্র ৫১ ব্রাহ্মাব্দ বা ১৮৮০ অগস্ট ২৩ (বাং ১২৮৭), মহর্ষির পত্রাবলী পৃ. ২০৮।

এইবার তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ বিলাত চলিলেন; কলিকাতা হইতে জাহাজে করিয়া মাদ্রাজ গিয়া সেখান হইতে বিলাতযাত্রী জাহাজ ধরিবার কথা। মাদ্রাজে পৌঁছিয়া নববিবাহিত সত্যপ্রসাদ আর অগ্রসর হইতে নারাজ; অথচ একা ফিরিতে সাহস নাই, পাছে মহর্ষি বিরক্ত হন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন; মাদ্রাজের পথে স্টীমারে আশুতোষ চৌধুরী নামে যে যুবকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়, তিনি বিলাত চলিয়া গেলেন। সত্যপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ ফিরতি জাহাজে কলিকাতায় ফিরিয়া মসুরিতে মহর্ষির সহিত দেখা করিতে গেলেন। মহর্ষি কাহাকেও ভর্ৎসনা করিলেন না, 'কারণ তিনি সমস্ত কর্মকেই ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা বলিয়া মনে করিতেন'।

দ্বিতীয় বার বিলাত যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে (১২৮৮ বৈশাখ ৮) বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিক্যাল কলেজ -হলে রবীন্দ্রনাথ সংগীত সম্বন্ধে যে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। এইবার বিলাত যাইবার কথা উঠিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্প্রকাশিত 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' গ্রন্থদ্বয়[১] যথাক্রমে 'শ্রীমতী হে—কে' ও 'ভাই জ্যোতিদাদা'কে উৎসর্গ করেন। উভয় গ্রন্থই যে বিলাত যাত্রার পূর্বে রচিত তাহা উপহারের মধ্যে স্পষ্ট। ভগ্নহৃদয়ের উপহারে আছে—"আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে। পর পারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে॥" রুদ্রচণ্ডের উপহারে আছে—"সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পর পারে। তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।" মোটকথা উভয় গ্রন্থের উপহারের মধ্যে বিদেশযাত্রাজনিত-বিচ্ছেদবেদনার আভাস স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত। ভগ্নহৃদয় কখন রচিত হয় সে কথা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। রুদ্রচণ্ডের মুদ্রণ-কাল জানি, কিন্তু তাহার রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি বা তাঁহার অন্য কোনো রচনার মধ্যে এই গ্রন্থের নামমাত্র করেন নাই। ইহার দুইটিমাত্র গান।[২]

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা একখানি ক্ষুদ্র নাটক বা নাট্যকাব্য। রবীন্দ্রনাথের নাটক-রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে ইহার যাহা-কিছু মূল্য; সাহিত্যিক মূল্য যৎসামান্য। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুর আসিয়া 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে যে কাব্য রচনা করেন (১৮৭৩ মার্চ) এই রুদ্রচণ্ড তাহারই নাট্যরূপ। নাটকের ভাষা অত্যন্ত অপরিণত। আমাদের মনে হয় বিলাত যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়িতে নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটাকে নূতন কলেবরে সাজাইয়া 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দিলেন।

১ ১২৮৮ বৈশাখ ৯ তারিখ বিলাত যাত্রার দিন। গ্রন্থদ্বয় তৎপূর্বেই মুদ্রিত হয়, যদিও বেঙ্গল লাইব্রেরি তালিকাভুক্ত হয় যথাক্রমে ১০ই ও ১২ই আষাঢ় ১২৮৮ (১৮৮১ জুন ২৩ ও ২৫)। Hindu Patriot [১৮৮১ মে ২৩ (১১ জ্যৈষ্ঠ)] দৈনিকে রুদ্রচণ্ডের সমালোচনা বাহির হয়। বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয় ও প্রকাশের (১৮৮১ ফেব্রুয়ারি ২৬) তিন মাস মধ্যে এই দুই খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২ বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার। —গীতবিতান
তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার। —গীতবিতান

উভয় সংগীত প্রথমবার বিলাত যাইবার পূর্বে রচিত বলিয়া মনে হয়। দ্র. মালতীপুঁথি। 'রবিচ্ছায়া' (১২৯২) ও পরে কাব্য-গ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) সন্নিবেশিত হয়; কিন্তু তৎপরে প্রকাশিত কোনো গীতসংগ্রহে বা গ্রন্থাবলীতে তাহাদের আর দেখা যায় নাই। তবে গীতবিতানভুক্ত হইয়াছে।—রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড পৃ. ২৮৫।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বান্ধব' পত্রে এই কাব্য-সমালোচন উপলক্ষ্যে লেখককে উদীয়মান কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। 'বান্ধব'-সম্পাদকের মতে রবীন্দ্রনাথের "জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িবে, তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টত পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ।"[১]

নিম্নে নাটকটির উপাখ্যান সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল :

রুদ্রচণ্ড হস্তিনাপুর-অধিপতি পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী। যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অধুনা অরণ্যবাসী। প্রতিশোধ-স্পৃহাই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নাটিকা আরম্ভ হইয়াছে রাত্রির অন্ধকারে কালভৈরব প্রতিমার সম্মুখে। নিজ সংকল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রুদ্রচণ্ড ভৈরব-পূজায় আসীন।

রুদ্রচণ্ডের কন্যা অমিয়ার মনে হিংসা-প্রতিহিংসার কথা জাগে না; তাহার বন্ধু চাঁদ কবি পৃথ্বীরাজের সভাসদ্; চাঁদ কবি অনেক সময়ে অরণ্যে আসিয়া অমিয়ার সহিত গল্প করেন, তাহাকে গান শেখান। কিন্তু পৃথ্বীরাজ সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি অমিয়ার সহিত আলাপ করিবে এ-ধৃষ্টতা রুদ্রচণ্ডের নিকট অসহ্য। অমিয়াকে কঠোরভাবে বলিয়া দিল অতঃপর চাঁদ কবি অরণ্যে আসিলে তাহার আর নিস্তার নাই। চাঁদ কবির অদর্শনে অমিয়ার মন ভাঙিয়া গেল; সে ভাবিতেছে—

বড় সাধ যায় এই নক্ষত্রমালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি!
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া!
আঁধার ভ্রূকুটিময় এই এ কানন,
সঙ্কীর্ণ-হৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রূকুটির সমুখেতে দিনরাত্রিবাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া,
এমন কদিন আর কাটিবে জীবন।[২]

পরদিন চাঁদ কবি আসিলেন; সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি গেলে বল্ দেখি, বোনটি আমার, কার কাছে ছুটে যাবি মনে ব্যথা পেলে?" অতঃপর চাঁদ কবি অমিয়াকে দুইটি গান শিখাইয়া দিলেন—

বসন্ত-প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার। ইত্যাদি[৩]

১ বান্ধব, ১২৮৮, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৪২-৪৩। দ্র. জীবনস্মৃতি গ্রন্থপরিচয়।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড. পৃ, ২৮৫।

৩ রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড, ১ম পৃ, ২৮৮। রবিচ্ছায়া ৯৮। কাব্য-গ্রন্থাবলী (১ ০৩) পৃ. ৪-৫।

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার। ইত্যাদি[১]

গান দুইটি পরস্পরের পরিপূরক। চাঁদ কবি অমিয়াকে বলিয়াছিলেন—

তুই সুকুমার ফুল যখনি ফুটিলি,
যখনি মেলিলি আঁখি, দেখিলি চাহিয়া—
শুষ্ক জীর্ণ পত্রহীন অতি সুকঠোর
বজ্রাহত শাখা পরে তোর বৃন্ত বাঁধা।

অমিয়া যখন গান শিখিতেছে, অকস্মাৎ তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত। সে ভাবিয়া আকুল— কি করিয়া চাঁদ কবিকে রক্ষা করিবে। সমস্ত দোষ সে নিজ মস্তক পাতিয়া লইল, কিন্তু রুদ্রচণ্ড দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া চাঁদ কবিকে আক্রমণ করিল, কিন্তু পরাভূত হইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিতে বাধ্য হইল।

চাঁদ কবির সহিত পিতাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া অমিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। রুদ্রচণ্ড যখন চাঁদের কাছে প্রাণভিক্ষা করিলেন অমিয়ার মূর্ছা তখনো ভাঙে নাই। এমন সময় রাজধানী হইতে দূত আসিয়া চাঁদ কবিকে জানাইল যে, রাজ্যের সমূহবিপদ, রাজসভায় তাঁহার উপস্থিতি অবিলম্বেই আবশ্যক। চাঁদ কবিকে তখনই চলিয়া যাইতে হইল, অমিয়ার সহিত কথা বলিবার অবসর ঘটিল না। যাহাই হউক, অনুগ্রহক্ষুব্ধ রুদ্রচণ্ড রোষে অপমানে জ্বলিতে লাগিল; অমিয়ার জন্যই তাহার এই লাঞ্ছনা, অমিয়া তাহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল।—

অবশেষে একদিন অমিয়া চাঁদ কবির সন্ধানে হস্তিনাপুর যাত্রা করিল। তখন চাঁদ মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধায়োজনের জন্য শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না। রাত্রির অন্ধকারে ঝড় উঠিয়াছে; এই দুর্যোগে অমিয়া হতাশ হৃদয়ে পথের ধারে বসিয়া পড়িল; সৌভাগ্যক্রমে বনের এক কাঠুরিয়া তাহাকে আশ্রয়দান করিল। চাঁদ কবিও শিবিরে অমিয়ার জন্য ব্যাকুল। এমন সময়ে শত্রু-আক্রমণের সংবাদ আসিল।

এদিকে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া রুদ্রচণ্ডের নিকট সাহায্যের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। রুদ্রচণ্ড বনমধ্যে কোনো মানুষকেই সহ্য করিতে পারে না, দূতকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।—

আমি রুদ্রচণ্ড, এই অরণ্যের রাজা।
নগর-নিবাসী তোরা হেথা কেন এলি?
ঐশ্বর্য মাঝারে তোরা প্রাসাদে থাকিস,
ননীর পুতুল যত ললনারে লয়ে
আবেশে মুদিত আঁখি, গদ গদ ভাষা,· ·
নগর-ফুলের কীট হেথা তোরা কেন?· ·
বিশাল রাজসভার ব্যাধি তোরা যত
আমার অরণ্যে কেন করিলি প্রবেশ?

দূত বুঝাইয়া বলিল যে, সে তাহার কোনো উপকার করিতে আসিয়াছে; উপকারের কথা শুনিয়া রুদ্রচণ্ড আরো জ্বলিয়া

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ, ২৯০। রবিচ্ছায়া ৯০। কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩) পৃ. ৫। গান দুইটি পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে নাই।

উঠিল। দূত জানাইল যে, সে মহম্মদ ঘোরীর লোক, পৃথ্বীরাজকে পরাভূত করিতে হইলে তাহার সাহায্য প্রয়োজন। রুদ্রচণ্ড এতদিন ধরিয়া সংকল্প পোষণ করিয়া আসিতেছিল যে পৃথ্বীরাজকে সে স্বয়ং হত্যা করিবে, আজ—

ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মতো আসে আক্রমিতে দেশ।· ·
পৃথ্বীর রাজত্ব, প্রাণ এসেছে কাড়িতে,
সমস্ত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে।
এখনি নগরে যাব কহি তোরে আমি।
অশুভ-বারতা এই করিব প্রচার।[১]

রাজধানীতে আসিয়া রুদ্রচণ্ডের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সে পৃথ্বীরাজকে নিজহস্তে হত্যা করিতে চায়।—

বেধেছে তুমুল রণ ; কোথা পৃথ্বীরাজ!
ওরে রে সংগ্রাম-দৈত্য শোণিত-পিপাসী,
সমস্ত হস্তিনা তুই করিস রে গ্রাস,
পৃথ্বীরাজে রেখে দিস্ এ-ছুরিকা তরে।· ·
এ কি ঘোর কোলাহল নগরের পথে,
সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে সহস্র বর্বর
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া!
চারিদিকে রহিয়াছে প্রাসাদের বন,
বাতায়ন হতে চেয়ে শত শত আঁখি!
এত লোক এত গোল সহ্য নাহি হয়!

এদিকে চাঁদ কবি সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধে চলিয়াছে। নেপথ্যে অমিয়া গান গায়, "তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল।" কণ্ঠস্বর শুনিয়া চাঁদ কবি ক্ষণমাত্র দাঁড়াইলেন, ভাবিলেন, এ রাজপথে মধ্যাহ্নে অমিয়া কেমন করিয়া আসিবে। এমন সময়ে দ্রুত আগাইয়া যাইবার জন্য আদেশ আসিল। অমিয়া একবার চাঁদকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধযাত্রার কোলাহলে তাহার সে ক্ষীণ স্বর কেহ শুনিতে পাইল না। অবসন্ন হৃদয়ে পথপ্রান্তে বসিয়া সে বলিল—

চ'লে গেল!—সকলেই চ'লে গেল গো!
দিনরাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ,
এক মুহূর্তের তরে দেখা হল যদি
চলে গেল? একবার কথা কহিল না?
একবার ডাকিল না 'অমিয়া' বলিয়া?
স্বপ্নের মতন সব চলে গেল গো?[২]

অমিয়া যখন দেখিল পৃথিবীতে কোথাও আশ্রয় নাই, তখন সে পিতার নিকটে ফিরিবার জন্য অরণ্যাভিমুখে চলিল।

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড পৃ. ৩০২।

২ তু, সন্ধ্যাসংগীতের পরিত্যক্ত কবিতা।

এ দিকে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিহত হইলেন ; রুদ্রচণ্ড সেই সংবাদ পাইয়া অরণ্যে ফিরিল। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে রুদ্রচণ্ডের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভাঙিয়া পড়িল।—

মুহূর্তে জগত মোর ধ্বংস হয়ে গেল।
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন!
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে-জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে দুরন্ত দৈত্য শিশু দিনরাত্রি ধরে
হৃদয় মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
এ মুহূর্তে মরে গেল সেই বৎস মোর!
তারি নাম রুদ্রচণ্ড আমি কেহ নই।

রুদ্রচণ্ডের পক্ষে জীবনধারণ এখন নিরর্থক। তাই সে নিজের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিল। অরণ্যে ফিরিয়া আসিয়া অমিয়া এই দৃশ্য দেখিল। এতদিন পরে আজ মৃত্যুকালে রুদ্রচণ্ডের যেন মনে পড়িল অমিয়া তাহার কন্যা। প্রতিহিংসা-বৃত্তির কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া পিতৃস্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিল—

আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা।
এত দিন পিতা তোর ছিল না এ-দেহে
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।

এদিকে চাঁদ কবি পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর হস্তিনাপুর ছাড়িয়া চলিয়াছেন, অবশেষে সেই অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। অমিয়ার কুটিরে আসিয়া দেখেন রুদ্রচণ্ড মৃত ও অমিয়া মুমূর্ষু। অমিয়ার মৃত্যু হইলে চাঁদ কবি স্বগত কহিলেন—

ভালো বোন, দেখা হবে আর একদিন,
সেদিন দুজনে মিলি করিব রে শেষ
দুজনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা।"[১]

ভগ্নহৃদয়

'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্য, অথচ লিখিত নাটকাকারে ; তাই বোধ হয় ভারতীতে প্রকাশকালে ভূমিকায় কবি কৈফিয়ত রূপে বলিয়াছিলেন যে, "কাব্যটিকে কাহারও যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত, তাহাতে ফুল ফুটে কিন্তু সে-ফুলের সঙ্গে শিকড় কাণ্ড শাখা পত্র কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা অনাবশ্যক। কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবল ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।"[২]

বনফুল ও কবিকাহিনীর তুলনায় ভগ্নহৃদয়ের আয়তন অনেক বড়। ৩৪টি সর্গে ইহা সমাপ্ত। ইহাতে কাহিনীর

১ দ্র. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিত 'রবীন্দ্র-পরিচয়' (রুদ্রচণ্ড), প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ।

২ ভারতী ১২৮৭ কার্তিক পৃ. ৩৩৩। এই ভূমিকা মুদ্রিত গ্রন্থে সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে।

অংশ অত্যন্ত ক্ষীণ, দীর্ঘ আয়তনের জন্য পাঠককে কষ্ট পাইতে হয়। অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখিয়াছেন, "এই শিথিলবন্ধ কাব্যে ঘটনার ত্রুটি ভাবনা দিয়া পুরাইয়া লইবার চেষ্টা কবিকাহিনী ও বনফুলের চেয়ে অনেক বেশি। ইহাতে অনেকগুলি সর্গ যাহাতে কোনো ঘটনা নাই, কেবল পাত্রপাত্রীর গানের দ্বারাই সে-সর্গগুলি গঠিত। আবার ঘটনাযুক্ত সর্গেও গানের সংখ্যা বিরল নয়; গানগুলি যখন তখন আসিয়া পড়িয়া ঘটনার ক্ষীণ শোভাযাত্রাকে ধীর মন্থর করিয়া দিয়াছে।"[১]

এত বেশি গান থাকিবার কারণ আছে; বিলাত হইতে ফিরিবার পর যে-গানের আবহাওয়ার মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িয়াছিলেন, ভগ্নহৃদয় সেই সময়ে রচিত কাব্যনাট্য।

ভগ্নহৃদয় কাব্যের পাত্র হইতেছেন এক কবি, কিশোরী মুরলা ইহার নায়িকা। মুরলা কবির বাল্য-সহচরী ও কাব্যের অন্যতম পাত্র অনিলের ভগ্নী। অনিল ললিতা নামে বালিকার প্রণয়ী। কবির সহিত মুরলার বন্ধুত্ব আছে, কবি তাহাকে সখী বলিয়া জানে, প্রণয়িনী বলিয়া নয়। কিন্তু মুরলা তাহাকে সর্বান্তঃকরণ দিয়া ভালোবাসে, পূজা করে; কবির নিকট সে ভালোবাসা কোনোদিন ব্যক্ত করে নাই। সখী চপলা তাহাকে যখন খুবই পীড়াপীড়ি করে তখন সে বলে—

ক্ষমা কর মোরে, সখি, শুধায়ো না আর
মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার।

কবি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে তাহার কিসের দুঃখ; সে হতভাগ্য জানে না মুরলা তাহারই জন্য অন্তরে উন্মাদিনী।

লুকায়ো না কোনো কথা, যদি কোনো থাকে ব্যথা
রুধিয়া রেখো না তাহা হৃদয়-মাঝারে!· ·
হয়তো গো যৌবনের বসন্তসমীরে
মানস-কুসুম তব ফুটেছে সুধীরে,
প্রণয়বারির তরে তৃষায় আকুল
ম্রিয়মাণ হয়ে বুঝি পড়েছে সে ফুল?
পেয়েছ কি যুবা কোনো মনের মতন?
ভালোবাসো, ভালোবাসা করহ গ্রহণ;
তা হলে হৃদয় তব পাইবে জীবন নব,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময় হেরিবে ভুবন।[২]

মুরলা প্রকাশ করিল না তাহার প্রেমাস্পদ কে। কবির মন অশান্ত। তাহারও সংগ্রাম চলিতেছে; তাহার মধ্যে "যেন দুটি সত্তা বাস করিতেছে; তাহার কবিসত্তা, যাহা আর দশ জন হইতে স্বতন্ত্র; আবার তাহার মানবসত্তা, যাহা আর দশ জনের অনুরূপ। এই দুই পরস্পরবিরোধী সত্তার মধ্যে কবি কিছুতেই মিলন ঘটাইতে পারিতেছেন না—ইহাই তাহার ট্রাজেডি।"[৩] কবি মুরলাকেই বলিতেছে—

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৫১, পৃ. ৪০০।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম, পৃ ১৩৪।

৩ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৫১, পৃ. ৪০২।

বহুদিন হতে সখি, আমার হৃদয়
হয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয়।
চরাচরব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার
সহসা হারায় যদি আলোক তাহার,
আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া
কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তার হিয়া !
তেমনি বিস্ময় ঘোর হৃদয় ভিতরে
হতেছে দিবস-নিশা, জানি না কি তরে ![1]
সখি, আর কত দিন সুখহীন, শান্তিহীন,
হা হা করে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লয়ে !

ইহা শুনিয়া মুরলা স্বগত বলিতেছে, "হা কবি ও হৃদয়ের শূন্য পুরাইতে, অভাগিনী মুরলা গো কি না পারে দিতে!" কিন্তু কবি মুরলার হৃদয়ের সংবাদ রাখেন না।

নলিনী এক চপলস্বভাবা কুমারী। বিনোদ, প্রমোদ, অশোক, বিজয়, সুরেশ তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। সে কিন্তু কাহাকেও চায় না, হৃদয় কাহাকেও দান করে না, সকলের হৃদয় লইয়া খেলা করে। এ হইতেছে 'মায়ার খেলা'র প্রমদার পূর্বাভাস। কবি সেই স্বর্ণমৃগী নলিনীর পশ্চাতেই ফিরিতে লাগিল। মুরলা তাহার বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার ভ্রাতা অনিলকে প্রাণের কথা বলিল। অনিল তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে—

যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে,
আপনারি ভাব নিয়া উলটিয়া-পালটিয়া
দিনরাত যেই জন শূন্যে খেলা করে,
শূন্য বাতাসের পটে শত শত ছবি
মুছিতেছে আঁকিতেছে শতবার দেখিতেছে,
সেই এক মোহময় স্বপ্নময় কবি—
সদা যে বিহ্বল প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে
আঁখি যার অনিমেষ আকাশের প্রায়,
মাটিতে চরণ তবু মাটিতে না চায়
ভাবের আলোকে অন্ধ তারি পদতলে
অভাগিনী, লুটাইয়া পড়িলি কি বলে ?"[2]

এদিকে অনিল ও ললিতার বিবাহ হইল। নলিনী তাহার সখিগণ ও প্রণয়ীগণ উপস্থিত। নলিনী 'মায়ার খেলা'র প্রমদার ন্যায় এক জন প্রেমাকাঙ্ক্ষীকে বলিতেছে, "মিছে বোলো না কো মোরে ভালোবাস, ভালোবাস ! নয়নেতে ঝরে

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম, পৃ. ১৩৫।
২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম, পৃ. ১৪৭।

বারি হৃদয়ে হৃদয়ে হায় !”[১] সে প্রত্যেক যুবককে একবার করিয়া বিরক্ত করিতেছে, কিন্তু কাহাকেও গ্রহণ করিতেছে না, ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি কুমারী মেয়ের জীবনযাত্রা যে ভাবের দেখিয়াছিলেন, এ যেন তাহারই রূপ।

একদা কবি ও মুরলার সাক্ষাৎ হইল। কবি নলিনীর রূপবর্ণনা আরম্ভ করিলে মুরলা যথাসাধ্য তাহাতে যোগদান করিল ; মোহাচ্ছন্ন কবি মুরলার অন্তর্দাহ অনুভব মাত্র করিতে পারিল না। এদিকে নলিনীর ব্যবহারে কবি বুঝিয়াছেন যে, এ নারী প্রেম কাহাকে বলে জানে না। বহুকাল পরে কবি নিজ ভ্রম বুঝিয়া যখন ফিরিলেন, তখন মুরলা অন্তিম শয্যায়। কবির ভুল ভাঙিল ; মুরলার মৃত্যুশয্যায় কবির সঙ্গে তাহার মিলন হইয়া বিবাহ হইল ; একই শয্যায় বাসর ও মুরলার চিতা প্রস্তুত হইল। এদিকে অনিলের প্রেমপিপাসা লাজময়ী ললিতা মিটাইতে না পারায় অনিলও নলিনীর প্রণয়ীর দলে যোগ দিয়াছিল। ললিতার শেষ অবস্থায় অনিলের সঙ্গে তাহার মিলন ঘটিল বটে, তখন ললিতা উন্মাদিনী। আর নলিনী প্রেমের লীলার ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া আত্মজীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী যথার্থ বলিয়াছেন, “নলিনী, তাহার প্রণয়ীগণ, ললিতা, মুরলী, কবি, অনিল সকলেই ভগ্নহৃদয়, প্রেমের চোরা-পাহাড়ের আঘাতে বানচাল হইয়া সকলের হৃদয় ভগ্নহৃদয়।”

কবিকাহিনীর সহিত ভগ্নহৃদয়ের গল্পাংশের কিছু সাদৃশ্য আছে, নলিনী নাটকেরও যোগ আছে। আসল কথা, বনফুল কবিকাহিনী ভগ্নহৃদয় রুদ্রচণ্ড— সবই এক ছাঁচে ঢালা ; সবগুলি তপ্ত উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত। প্রায় সকলগুলির নায়ক এক কবি। সে কবি কে, যদি বলা হয় রবীন্দ্রনাথ কাব্যগুলির মধ্য দিয়া আত্মকথা প্রকাশ করিয়াছেন তবে ভুল করা হইবে ; কবি সম্বন্ধে যে-আদর্শ বাল্যকালে তাঁহার মনে জাগিতেছিল সে আদর্শানুসারে কবি কি ভাবে চিন্তা করিবেন তাহাই এই কাব্যগুলির মধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা জাগিতেছে ; কিন্তু তরুণ কবির রুদ্ধ মনের বাসনা ও সংগ্রাম তাঁহার অজ্ঞাতসারেই যে প্রকাশ পায় নাই এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ভগ্নহৃদয় ও তৎপূর্ববর্তী কাব্যগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য জ্ঞানে উদ্ধৃত করিলাম। “রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, ‘স্বাভাবিক হবার শক্তি পরিণত বয়সের, সে বয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নানা রকমের, কিন্তু অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোসে হাস্যকর করে তোলা তার ধর্ম নয়, অন্তত আমি তাই অনুভব করি।’ এই অক্ষম অনুকরণ বিশেষ ভাবের বা কোনো কবিবিশেষের অনুকরণমাত্র নয়, ইহা এমন-একটা শিল্পধারার অনুকরণ যাহা কবির প্রকৃতিজাত নয়। এই শিল্পধারাটি কাহিনী-কাব্য। তৎকালে দীর্ঘকাব্য, কাহিনী-কাব্য বা মেঘনাদবধের মত এপিক-কাব্য রচনা বাংলাসাহিত্যের প্রথা ছিল। তিনিও [রবীন্দ্রনাথ] দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য দিয়াই কবিজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যল্পকালের অভিজ্ঞতাতেই তাঁহার কবিপ্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিল, ওগুলি তাঁহার পথ নয়—তাঁহার প্রকৃত পথ গীতিকবিতা, লিরিক। যখন হইতে তিনি এই লিরিকে আসিয়া চূড়ান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন হইতেই তাঁহার কাব্য তিনি প্রকাশযোগ্য মনে করেন। সে কাব্য ‘সন্ধ্যাসংগীত’। অচলিত সংগ্রহ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সন্ধ্যাসংগীত হইতেই তাঁহার কাব্যের প্রকাশধারা ধরা হইত।”

এই গীতিকাব্যখানি উৎসর্গ করেন ‘শ্রীমতী হে— কে’। তৎসঙ্গে ‘উপহার’ শীর্ষক একটি গান ভারতীতে (১২৮৭ কার্তিক) প্রকাশিত হয়। এই উৎসর্গ-গীতটি কিন্তু সেই বৎসরই মাঘোৎসবের সময়ে ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম, পৃ. ১৬১।

করা হয়। সুতরাং ভগ্নহৃদয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার সময় (১২৮৮ বৈশাখ) কবিকে নূতন উপহার লিখিয়া দিতে হয়।[১] ভারতীতে প্রকাশিত উপহারটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

রাগিণী—ছায়ানট

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখি 'পরে ঢাল' গো আলোকধারা।
ও মু'খানি সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।
কখনো বিপদে যদি ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে যে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি— এ ভগ্নহৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিত-ধারা।

ভগ্নহৃদয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার সময়ে উপহার নূতনভাবে রচিত হইল বটে, কিন্তু উপহারের পাত্রী শ্রীমতী হে— থাকিয়া গেলেন। এবার যেটি লেখা হইল, সেটি গান নয়, দীর্ঘ কবিতা (৩০ পংক্তি)। এই কবিতায় একস্থানে আছে—

হয়তো জান না দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাকো তাহারি অটল বলে,
নহিলে হৃদয় মম ছিন্ন ধূমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশ তলে।

১ ১২৮৭ মাঘোৎসবের জন্য যে সাতটি গান রচনা করেন এই গানটি সামান্য রূপান্তরিত-ভাবে তাহাদের অন্যতম। ব্রহ্মসংগীতের রূপটি গীতবিতানে আছে। দ্র. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০২ শক (১২৮৭) ফাল্গুন সংখ্যা। রবিচ্ছায়া ১২৯২।—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।
যেথা আমি যাই নাক, তুমি প্রকাশিত থাক
আকুল নয়নজলে ঢাল গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।

—আলাইয়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি ৩।১৩। গীতবিতান পৃ. ৩১৮।

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে ;
দিবস ফুরাবে যবে সে-দেশে যাইতে হবে
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন-শশী,
ফুরাইবে গীতগান, অবসাদে ম্রিয়মাণ
সুখ শান্তি অবসান কাঁদিব আঁধারে বসি।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে 'শ্রীমতী হে' কে ! প্রথম ও দ্বিতীয় উপহারের ভাষা দেখিয়া মনে হয় তাঁহার বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীকে স্মরণ করিয়া এগুলি লিখিত ; এত ভক্তি, এত নির্ভর আর কাহারও উপর রবীন্দ্রনাথের ছিল না। কিন্তু 'হে'— কেন ! এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিতভাবে দেওয়া কঠিন। আমরা শুনিয়াছি 'হে'— কাদম্বরী দেবীর কোনো ছদ্মনামের আদ্যক্ষর। কেহ কেহ বলেন তাঁহার ডাকনাম ছিল 'হেকেটি'।[১]— ইনি প্রাচীন গ্রীকদের ত্রিমুণ্ডী দেবী। অন্তরঙ্গেরা রহস্যচ্ছলে এই নামটিতে ডাকিতেন। এই নারীর স্নেহ ও শাসন রবীন্দ্রনাথের যৌবনকে সুন্দরের পথে চালিত করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁহারই পবিত্র স্মৃতি ছিল তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা।

ভগ্নহৃদয় কাব্যখানি একবার মাত্র প্রকাশিত হয়। কবির এই আঠারো বৎসর বয়সের কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়সে লিখিত একখানি পত্রে তিনি যে-মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জীবনস্মৃতি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়— আমার আশেপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল।[২] আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ, তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল ; তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত।"

ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্য রবীন্দ্রনাথকে সে যুগের যুবমহলে যশস্বী করিয়াছিল ; অনেকে এই কাব্যের অংশবিশেষ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; এইরূপ একজন সমসাময়িক যুবককে তাঁহার বৃদ্ধবয়সে দেখিয়াছি, তিনি কাব্যের বহু অংশ আবৃত্তি করিয়া গেলেন। ভগ্নহৃদয় ও সন্ধ্যাসংগীতের সমতুল্য কাব্য সে যুগে বাংলা ভাষায় ছিল না ; সুতরাং সাহিত্যিক মাত্রেরই মনোযোগ প্রবলভাবেই এই কাব্যদ্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

ভগ্নহৃদয় প্রকাশিত হইলে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর কিশোর রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহা 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত আছে। প্রধানা মহিষীর অকালমৃত্যুতে মহারাজ বিরহীর মর্মবেদনা প্রকাশ

১ Hectate, a mysterious divinity, probably a moon-goddess. She was one of the Titans and the only one of this race who retained her power under the rule of Zeus. She is described with three bodies or three heads . . . . *vide* Smith's Classical Dictionary.

২ গ্যেটে তাঁহার বন্ধু একেরমান্‌কে বলিয়াছিলেন, "when I was eighteen all my country was eighteen too." Quoted by Nevinson, p. 61.

করিয়া কবিতা লিখিতেছিলেন। কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিক ভাবের সহিত 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবিতাগুলি সায় দিয়াছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে প্রতিভার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইয়া তাঁহার খাস-মুন্সী রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন; ভগ্নহৃদয় কাব্যখানি মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে তিনি জোড়াসাঁকোয় আসিয়া তরুণ কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন।[১] ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বা তাঁহার পরিবারের কাহারও সহিত ত্রিপুরারাজের সাক্ষাৎপরিচয় ছিল না। অতঃপর "বীরচন্দ্রমাণিক্য কলিকাতায় যখনই যাইতেন, তখনই রবিবাবুকে ডাকাইয়া আনিতেন। বয়সে এই দুই কবির বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও বীরচন্দ্র বাৎসল্য-ভাবে কিশোর সৌম্যদর্শন কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে কবিতা পাঠ এবং সংগীত শুনিতে বড়ই ভালোবাসিতেন।"[২]

চন্দননগরে : 'বিবিধ প্রসঙ্গ'

মসুরি হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮৮১ অব্দের বর্ষাকালে (১২৮৮) রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট চন্দননগরের গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিতেছেন, "আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ— তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল। আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।" বহুবৎসর পরে কবি বলিয়াছিলেন,[৩] "সেই সময়ে আমি প্রথম অনুভব করেছিলুম যে, বাংলাদেশের নদীই বাংলাদেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরা যে বাগানে ছিলেন তাহা মোরান[৪] সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। বিশ বৎসর বয়সের যুবক রবীন্দ্রনাথের জীবন কিভাবে আলস্যে আনন্দে বিষাদে ও ব্যাকুলতায় অতিবাহিত হইতেছিল তাহারও চিত্র জীবন-স্মৃতি হইতেই পাই। তিনি বলিতেছেন, "কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়মযন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। আমরা যে-বাগানে ছিলাম তাহা মোরান সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল।"

এই বাড়ির সর্বোচ্চ দ্বিতলে চারিদিক-খোলা একটা গোল ঘর ছিল কবির লিখিবার স্থান। এই ঘর লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলেন—

১ জীবনস্মৃতি, সংযোজন অংশ।

২ মহিমচন্দ্র ঠাকুর, ত্রিপুর-দরবারে রবীন্দ্রনাথ, রবি মাসিকপত্র।

৩ বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, চন্দননগর, ১৩৪৩।

৪ হরিহর শেঠ, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে চন্দননগরের স্থান, সচিত্র, ১৩৪৮ আশ্বিন

অনন্তে আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।
যবে আমি আসিব হেথায়
মন্ত্র পড়ি ডাকিব তোমায়।[১]

এই কবিতাটির সুর সন্ধ্যাসংগীতের অন্যান্য কবিতার মত দুঃখের ভারে ম্রিয়মাণ নহে। কবিতাসুন্দরী বা মানসসুন্দরীকে ভাষার মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিবার প্রথম আভাস যেন এই কবিতার মধ্যে পাই। অল্পকাল পরেই সন্ধ্যাসংগীতের কবিতার মধ্যে অকারণ দুঃখ-অনুভবটাকে একটা সুখসম্ভোগের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিসের অভিঘাত সেইসব কবিতার উৎস তাহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। কিন্তু চন্দননগরে বাসকালে এখনও সেই দুঃখের কারণগুলি আবির্ভূত হয় নাই। তাই এখনকার কবিতার মধ্যে বিচিত্র সুরই ধ্বনিত হইতেছে। এইখানে বাসকালে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গদ্যরচনাগুলি লেখেন। "সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে; সেও একরকম যা-খুশি তাই লেখা।··মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো-ছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম; মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব— কী লিখিব সে-খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা।"

ভারতী ১২৮৮ সালের শ্রাবণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক মাসেই দুই-চারিটা করিয়া এই টুকরা লেখা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় পরে।

'বিবিধ প্রসঙ্গ' নাম হইতেই বুঝা যায় যে রচনাগুলি[২] সমধর্মী নহে; ইহাতে যেমন একদিকে 'বসন্ত ও বর্ষা' 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল'এর[৩] মতন গভীর ভাবের প্রবন্ধ আছে, যাহা তাঁহার পরযুগের গদ্যরচনার অন্তর্গত করিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি 'শূন্য' 'স্ত্রৈণ' 'জমা খরচ' -এর[৪] মতন হালকাভাবের প্রবন্ধ আছে; আবার 'দয়ালু মাংসাশী'র[৫] মতন রাজনীতিগন্ধী প্রবন্ধও পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখক বেশ খানিকটা রসিকতা করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু প্রবন্ধপাঠের পর ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদকে আমরা মনে রাখি না, মনে থাকিয়া যায় মধুর হাস্যরেশ। এই প্রসঙ্গটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিখ্যাত ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাই, যেমন ছাগল, ভেড়া, গরু।··দেখা যাক, বোকা জানোয়ারেরা কি খায়। তাহারা উদ্ভিজ্জ খায়। অতএব উদ্ভিজ্জ যাহারা খায় তাহারা বোকা। এমন দ্রব্য খাইবার আবশ্যক? নির্বোধদের আমরা গাধা গরু ঘোড়া হস্তিমূর্খ কহিয়া থাকি। কখনো বিড়াল ভল্লুক সিংহ বা

১ কবিতাসাধন, ভারতী ১২৮৮ পৌষ, পৃ, ৪০৭। সন্ধ্যাসংগীতে গান আরম্ভ। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম, পৃ. ৩-৫। প্রিয়নাথ সেন কবিতাসাধন নামে এক দীর্ঘ কবিতা লেখেন, ভারতী ১২৮৯ ফাল্গুন।

২ জীবেন্দ্রকুমার গুহ: রবীন্দ্র প্রবন্ধের আদিপর্ব, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ. ৬৩২।

৩ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল, ভারতী ১২৮৮ ফাল্গুন, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম, পৃ. ৩৫৮।

৪ শূন্য, স্ত্রৈণ, জমাখরচ, ভারতী ১২৮৮ ভাদ্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম, পৃ. ৩৬৬-৩৬৮।

৫ দয়ালু মাংসাশী, ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম, পৃ. ৩৪৯।

ব্যাঘ্রমূর্খ বলি না। উদ্ভিজ্জভোজীদের এমন নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, বুদ্ধির যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিলেও তাহাদের দুর্নাম ঘুচে না। নহিলে 'বাঁদর' বলিয়া সম্ভাষণ করিলে লোকে কেন মনে করে তাহাকে নির্বোধ বলা হইল?· · উদ্ভিদ-ভোজী ভারতবর্ষকে ইংরাজ-শ্বাপদেরা দিব্য হজম করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন, ভালো হজম হইল না; পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী জুলুভূমি ও ট্রান্সবাল পেটে মূলেই সহিল না।· ·অতএব মাংসাশী প্রাণীর লোভ এড়াইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে মাংসাশী হওয়া আবশ্যক। নহিলে আত্মস্ব বিসর্জন করিয়া পরের দেহের রক্ত নির্মাণ করাই আমাদের চরম সিদ্ধি হইবে।"

'আদর্শপ্রেম'[১] শীর্ষক আরেকটি প্রসঙ্গ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"সংসারের কাজ-চালানো মন্ত্রবদ্ধ ঘরকন্নার ভালোবাসা যেমনই হউক, আমি প্রকৃত আদর্শ ভালোবাসার কথা বলিতেছি। যে-হউক এক জনের সহিত ঘেঁষাঘেষি করিয়া থাকা, এক ব্যক্তির অতিরিক্ত একটি অঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকা, তাহার পাঁচটা অঙ্গুলির মধ্যে ষষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় লগ্ন হইয়া থাকাকেই ভালোবাসা বলে না। দুইটা আঠাবিশিষ্ট পদার্থকে একত্রে রাখিলে যে জুড়িয়া যায় সেই জুড়িয়া যাওয়াকেই ভালোবাসা বলে না। অনেক সময়ে আমরা নেশাকে ভালোবাসা বলি।· · প্রণয়ের পাত্র নীচই হউক, নিষ্ঠুরই হউক, আর কুচরিত্রই হউক, তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকাকে অনেকে প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া থাকে।· ·প্রকৃত ভালোবাসা দাস নহে, সে ভক্ত; সে ভিক্ষুক নহে, সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন, মহত্ত্বকে ভালোবাসেন; তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে-আদর্শভাব জাগিতেছে, তাহারই প্রতিমাকে ভালোবাসেন। ভালোবাসিবার জন্যই ভালোবাসা নহে, ভালো ভালোবাসিবার জন্যই ভালোবাসা। তা যদি না হয়, যদি ভালোবাসা হীনের কাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্যের কাছে রুচিকে বদ্ধ করিয়া রাখে তবে ভালোবাসা নিপাত যাক।"

'বসন্ত ও বর্ষা'[২] এবং 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' প্রসঙ্গ দুটি মানবের মনের ও জীবনের, ঋতুর ও কালের প্রকারভেদকে প্রায় দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের অন্তর্গত করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—"বসন্ত উদাসীন, গৃহত্যাগী। বর্ষা সংসারী, গৃহী। বসন্ত আমাদের মনকে চারি দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। বর্ষা তাহাকে একস্থানে ঘনীভূত করিয়া রাখে। বসন্তে আমাদের মন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যায়, বাতাসের উপর ভাসিতে থাকে,· ·বর্ষায় আমাদের মনের চারি দিকে বৃষ্টিজলের যবনিকা টানিয়া দেয়, মাথার উপরে মেঘের চাঁদোয়া খাটাইয়া দেয়।"

গ্রন্থের শেষ রচনা 'সমাপন' গ্রন্থ-মুদ্রণের সময়ে বোধ হয় রচিত। এই রচনাটির মধ্যে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র লেখাগুলি সম্বন্ধে কৈফিয়ত অত্যন্ত কোমলভাবে লিখিত। আমরা উহা হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"আমার ভয় হইতেছে, পাছে এ লেখাগুলি লইয়া কেহ তর্ক করিতে বসেন। পাছে কেহ প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতে আসেন।··· এ বইখানি সে ভাবে লেখাই হয় নাই। ইহা একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যেসকল মত ব্যক্ত হইয়াছে,· ·সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এই মাত্র।· ·জীবনের প্রতিমুহূর্তে মনের গঠনকার্য চলিতেছে।· ·এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্যশীল পরিবর্ত্যমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিরোধী কথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবের নিবেশ থাকিতেও পারে। জীবনের লক্ষণই এইরূপ। একেবারে স্থৈর্য সমতা ও ছাঁচে-ঢালা ভাব মৃতের লক্ষণ।· ·

১ আদর্শপ্রেম, ভারতী ১২৮৮ ফাল্গুন, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম পৃ. ৩৫৬ ৬২।

২ বসন্ত ও বর্ষা, ভারতী ১২৮৮ ভাদ্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম, পৃ. ৩৫৬-৩৫৮।

"আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে!· ·এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখদুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক এক দিন খুলিয়া, তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর-এক লেখা আর-সকলে পড়িবে।"

১৮০৫ শক (১২৯০) ভাদ্র মাসে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সমাপন অংশ সেই সময়ে লিখিত। এই অংশ তাঁহার বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গের অন্তর্গত না করিলেও 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' নামে ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি[১] এবং 'মহাস্বপ্ন'[২] ও 'সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়'[৩] শীর্ষক কবিতাদ্বয়ের ভাবরাজি ঐ গ্রন্থের বিভিন্ন রচনার অন্যতম সুরে বাঁধা, অর্থাৎ দার্শনিক ভাবে সৃষ্টিকে দেখা। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় লেখকের মতে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র ব্যাপারটা নিরবচ্ছিন্ন কালের মধ্যে প্রতিভাত হইতেছে। কবির মতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়— তিনকে এক করিয়া দেখিবার একটি পদ্ধতি আছে এবং তিনটিকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখিবারও একটি পদ্ধতি আছে; প্রথমটিকে লেখক 'সংক্ষেপ' ও দ্বিতীয়টিকে 'বিক্ষেপ' আখ্যা দান করিয়াছেন; প্রথম পদ্ধতিতে তিন ব্যাপার একই কালের ব্যাপার, উহা চিরন্তন; কিন্তু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিক্ষেপ-পদ্ধতি বর্ণনে লেখক কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিক্ষিপ্ত ভাব অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নব নব ভাবে নব নব মূর্তিতে প্রকাশমান; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রকাশ সে মূর্তিতে; কিন্তু মঙ্গলই এক মাত্র উদ্দেশ্য— যেহেতু জ্ঞান এবং প্রেম সকলের মূলে বর্তমান। 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' ও 'মহাস্বপ্ন' কবিতাদ্বয়ে এই ত্রিমূর্তির সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়াছে। 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়'এ প্রথমেই ব্রহ্মার পরিকল্পনা, যিনি সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আছেন—

দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য 'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া—
কবে দেব খুলিবে নয়ান!· ·
ভাবের আনন্দে ভোর, গীতিকবি চারি মুখে
করিতে লাগিলা বেদগান।· ·
অনন্ত ভাবের দল, হৃদয়-মাঝারে তাঁর
হতেছিল আকুল ব্যাকুল—
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা,
জগতের গঙ্গোত্রীশিখর হতে
শত শত স্রোতে

১ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় (গদ্য), ভারতী ১২৮৮ মাঘ, পৃ ৪৭৮-৪৭৯।

২ মহাস্বপ্ন, ঐ, পৃ ৪৮৩-৪৮৪। প্রভাতসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম, পৃ ৮০-৮২।

৩ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, ভারতী ১২৮৮ চৈত্র পৃ ৫৪০-৫৪৪। প্রভাতসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম, পৃ ৮২-৯১।

উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী,
উচ্ছ্বসিল বাষ্পময় ভাব।
উত্তরে দক্ষিণে গেল,
পুরবে পশ্চিমে গেল,
চারি দিকে ছুটিল তাহারা !· ·

ইহার পর বিষ্ণুর আবির্ভাব সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে,
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
চারি দিকে উঠিছে নিনাদ,
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া
চারি দিকে চারি হাত দিয়া
বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্বাদ।

বিষ্ণুর নিয়মচক্রে বিশ্ব বাঁধা পড়িয়া চলিতে লাগিল; অবশেষে 'মহাছন্দে বাঁধা হয়ে· ·অসীম জগত চরাচর! শ্রান্ত হয়ে এল কলেবর।' তখন তাহারা মহাদেবের শরণ লইয়া কহিল—

নিয়মের পাঠ সমাপিয়া
সাধ গেছে খেলা করিবারে,
একবার ছেড়ে দাও, দেব,
অনন্ত এ আকাশ-মাঝারে !· ·
গাও দেব মরণ-সংগীত
পাব মোরা নূতন জীবন।
প্রলয় বিষাণ তুলি করে ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগৎ চাপিয়া,· ·
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল
জগতের সমস্ত বাঁধন !
উঠিল রে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দকোলাহল
ছিঁড়ে গেল রবি শশী গ্রহ তারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল,
ভেঙে গেল, টুটে গেল,· ·
সৃজনের আরম্ভ-সময়ে

আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।
অনন্ত আকাশ-গ্রাসী অনলসমুদ্রমাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ন
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

'মহাস্বপ্ন' কবিতার মধ্যে জগৎসৃষ্টির অখণ্ডতা ও পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি পংক্তি আছে।—

স্বপনের রাজ্য এই, স্বপন-রাজ্যের জীবগণ,
দেহ ধরিতেছে কত মুহুর্মুহু নূতন নূতন।
ফুল হয়ে যায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় শেষে,
নব নব বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে কানন-প্রদেশে।
বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিবারি-ধারা,
নির্ঝর তটিনী হয়, ভাঙি ফেলে শিলাময় কারা।
নিদাঘ মরিয়া যায়, বরষা শ্মশানে আসি তার
নিবায় জ্বলন্ত চিতা বরষিয়া অশ্রুবারিধার।
বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতকেশ শীত হয়ে যায়,
যযাতির মতো পুন বসন্তযৌবন ফিরে পায়।
এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন,
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।

কবি প্রশ্ন করিতেছেন—

পূর্ণ আত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন?
অপূর্ণ জগৎ-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন?
কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন-ভাঙা দিন
সত্যের সমুদ্র-মাঝে আধো সত্য হয়ে যাবে লীন?
আধেক প্রলয়জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়,
বলো দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয়?

'মহাস্বপ্নে'র সহিত 'হরহৃদে কালিকা'[১] পাঠ করিলে কবিচিত্তের একটি পূর্ণরূপ পাওয়া যাইবে। মহাস্বপ্নের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জগতের উদ্ভব স্থিতি ও ধ্বংস, প্রকৃতির মধ্যে পুনরাবৃত্তি ও মানবের মনের মধ্যে 'এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন'— তাহারই কথা বলিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তরের মধ্যে লোকোত্তর সৌন্দর্য ও সমস্যার প্রশ্ন যে আসিয়াছিল তাহা তাঁহার জীবনস্মৃতি হইতেও জানিতে পারি। "একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্ণের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার

১ 'হরহৃদে কালিকা', ভারতী ৪র্থ খণ্ড, ১২৮৭ আশ্বিন, পৃ ২৯১। শৈশবসংগীত।

আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।" নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন উদয় হইয়াছিল ; "জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে— তাহা আনন্দময় সুন্দর।" মনের এইরূপ একটি অবস্থায় এই শ্রেণীর কবিতা লিখিত হয় বলিয়া আমাদের ধারণা।

বিবিধ রচনা

যৌবনের প্রথম উন্মেষে ব্যথিত হৃদয়ের আত্মপ্রকাশ হয় ভগ্নহৃদয় ও সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যে। এইসব কবিতার সমর্থনে যেন রচিত হয় গদ্য প্রবন্ধ 'যথার্থ দোসর'। 'তারকার আত্মহত্যা' ও এই প্রবন্ধটি একই সময়ে প্রকাশিত হয়।[১]—

হে তারকা, ছুটিতেছ আলোকের পাখা ধরে,
তোমারে শুধাই আমি বল গো বল গো মোরে
তুমি তারা, রজনীর কোন্ গুহা মাঝে যাবে ?
আলোকের ডানাগুলি মুদিয়া রাখিতে পাবে ?

জীবনে যথার্থ দোসর পাওয়া যায় না, এই হইতেছে নরনারীর চিরন্তন অভিযোগ। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে য়ুরোপের সর্বত্র যে রোমান্টিক কাব্যের সৃষ্টি ও সম্ভোগের সূত্রপাত হইয়াছিল ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি কবিদেরও রচনার মধ্যে সেই সুরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি স্পষ্টভাবেই শোনা গেল। তৎকালীন আধুনিক কাব্যের মধ্যে যে দুঃখবাদ দেখা দিয়াছিল, যাহাকে কবি 'অকারণ কষ্ট' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই কাব্য-সাহিত্যে স্পষ্ট ও ব্যাপক ভাবেই প্রকাশ পাইল। নূতন ইংরেজি কাব্য ও সাহিত্যসমালোচনা পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "আধুনিক ইংরাজি কবিতার মধ্যে আশ্রয়প্রয়াসী হৃদয়ের বিলাপ-সংগীত প্রায় শুনা যায়। আধুনিক ইংরাজি কবিরা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির রাগিণীতেই অধিকাংশ গান গাহিয়া থাকেন।" এই তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শেলী আর্নলড রসেটি[২] ও' শগ্‌নেসি প্রভৃতির কবিতা তর্জমা করিয়া দেখাইলেন যে ইংরেজ কবিদের মধ্যে এই বিলাপ-সংগীত কী রূপ লইয়াছে।

কবিদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "যাহা ছিল ও হারাইয়া গিয়াছে তাহার জন্য যে কেহ বিলাপ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য নাই, কিন্তু যাহা ছিল না, যাহা পাইতেছি না, অথচ যাহা জানি না, তাহার জন্যই সম্প্রতি একটা বিলাপধ্বনি উঠিয়াছে।· ·এখনকার কবিরা দেখিতেছেন প্রেমে তৃপ্তি নাই, সে অতৃপ্তি নিরাশার অতৃপ্তি নহে, অভাবের অতৃপ্তি। তাঁহারা কাহাকে ভালোবাসিবেন খুঁজিয়া পান না, অথচ হৃদয়ে ভালোবাসার অভাব নাই। · ·ভালোবাসিবার জন্য তাঁহাদিগকে কাল্পনিক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।· ·ক্রমে প্রেমের অতীন্দ্রিয় ভাব কবিদিগের হৃদয়ে পরিস্ফুট হইতে লাগিল।"· ·সাহিত্যবিচার এই পর্যন্তই। ইহার পর এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত মূল প্রবন্ধের সম্বন্ধ একটু দূর। কিন্তু লেখকের অন্তরের মূলে যে-বেদনা রহিয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। তিনি বলিতেছেন, মানুষ এই হৃদয়ের দোসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার বিশ্বাস প্রতি লোকের দোসর আছেই, এককালে না এককালে পরস্পরের সহিত মিলন হইবেই। তিনি আশা করেন, মনের মানুষ মিলিবে অথচ এত কাঁদিতে হইবে না। হৃদয়ের প্রতিমার নিকট হৃদয়কে বলিদান দিতে হইবে না ; ভালোবাসা ও সুখ, ভালোবাসা ও শান্তি একপরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিবে। এ-সংসারে লোকে ভালোবাসে অথচ ভালোবাসার সমগ্র প্রতিদান

১ ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৭৭-৮৫।

২ Sir Edwin Arnold (1832-1904), Arther W. Edgar O'Shaughnessy (1844-81), Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)

পায় না, ইহা বিকৃত ও অসম্পূর্ণ অবস্থা। তরুণ কবির বিশ্বাস এই অসম্পূর্ণ অবস্থা একদিন-না-একদিন দূর হইবে।[১] প্রবন্ধ-মধ্যে বিবাহ ও প্রেমের চিরন্তন প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া লেখক বলিতেছেন, "সামাজিক বিবাহ অনন্তকাল স্থায়ী বিবাহ নহে। সচরাচর বিবাহে হয় একতর পক্ষে নয় উভয় পক্ষে প্রেমের অভাব দেখা যায়, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আমরণস্থায়ী ঘৃণার সম্পর্ক।· ·হয়তো এমন দুই জনে বিবাহ হইল, শুভদৃষ্টির পূর্বে যাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হয় নাই। · ·বিসদৃশ প্রকৃতি সামাজিক দম্পতির বিবাহ কি কখনও অনন্তকালস্থায়ী বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কিন্তু দুই-দুইটি করিয়া হৃদয় আছে, প্রকৃতি নিজে পৌরোহিত্য করিয়া যাহাদের বিবাহ দিয়াছেন তাহাদের বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে।" লেখকের মতে জীবনের যথার্থ দোসর সন্ধানকালে প্রথমেই যথার্থ ব্যক্তিকে নাও পাওয়া যাইতে পারে; "প্রথমে তাহার সহিত আমার প্রকৃত দোসরের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলাম, কিন্তু কিছু দিন নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া তাহার বৈসাদৃশ্যগুলি একে একে চক্ষে পড়িতে লাগিল, ও অবশেষে তাহার অপেক্ষা সদৃশতর লোককে দেখিতে পাইলাম, আমার ভালোবাসা স্থান পরিবর্তন করিল।"[২]

যথার্থ দোসরের প্রতিধ্বনি হইতেছে 'গোলাম-চোর'[৩]। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে যে কথা অন্তরের বিশ্বাস ও অনুভূতি হইতে গম্ভীরভাবে বিবৃত, এখানে সেই কথাটাই ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিত হইল, বেদনাটাকে বাক্যের দ্বারা তাচ্ছিল্য করিবার প্রয়াস। বিবাহাদির ব্যাপারে আমাদের সামাজিক বিধি এমন-যে মানুষ জানে না তাহার ভাগ্যে কিরূপ দোসর জুটিবে। এই বিষয়টাকে লেখক পরিহাসচ্ছলে তাসের খেলায় 'গোলাম-চোর' নাম দিয়াছেন। "অদৃষ্টের হাত হইতে যখন তাস টানি তখন হয়তো আমার হাতের সকল তাসগুলিই প্রায় মিলিয়া গেল, কেবল একটা বা দুইটা এমন গোলাম টানিয়া বসি যে, চিরকালের মতো গোলাম-চোর হইয়া থাকি।· ·আমাদের দেশের বিবাহ-প্রণালীর মতো গোলাম-চোর খেলা আর নাই। প্রজাপতি তাস বিলি করিয়া দিয়াছেন। ·আন্দাজ করিয়া টানিতে হয়, আগে থাকিতে জানিবার উপায় নাই।· ·যেই মিলিল অমনি মিল-দম্পতি বিশ্রাম পাইল। অন্যান্য অবিবাহিত তাসেরা হাতে হাতে মিল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহাদের আর বিরাম-বিশ্রাম নাই। এইখানে সাধারণকে বিদিত করিতেছি, আমি একটি অবিবাহিত তাস আছি, আমার মিল কাহার হাতে আছে জানিতে চাই। আমার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে বলেন, গোলাম। বলেন, আমার মিল ত্রিজগতে নাই। যে-কন্যাকর্তা টানিবেন তিনি গোলাম-চোর হইবেন। কিন্তু, বোধ করি, তাহারা রহস্য করিয়া থাকেন। কথাটা সত্য নহে।" প্রত্যেক লোকই জীবনে এমন-কিছু জিনিস টানিয়া বসেন বা অন্যের কৌশলে টানিয়া পান যাহা নীরবে হজম করা ছাড়া উপায় নাই। সকলেই জীবনে গোলাম-চোর হইয়া থাকেন, সেইজন্য প্রতিবেশী গোলাম-চোর হইতে দেখিলে কেহ যেন হাস্য না করেন— ইহাই হইতেছে লেখকের শেষ উপদেশ। প্রজাপতি বোধ হয় সে দিন হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তুমিও গোলাম-চোর হইবে।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ এখনো হয় নাই।

মানুষ যথার্থ দোসর খুঁজিয়া ব্যর্থকাম হয় ও প্রায়ই গোলাম-চোর হইয়া বেয়াকুব বনে। সংসার-জীবনের এই হইতেছে ট্রাজেডি। সুতরাং তরুণ কবির মতে সমাজে সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু এই সংস্কার কিভাবে রূপ লইতে পারে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা এখনও হয় নাই; তবে যে তিনি চিন্তা করিতেছেন, তাহার প্রমাণ পাই সমসাময়িক রচনা হইতে। সমাজজীবনে পরিবর্তন ঘটিবেই, কিন্তু কিভাবে ঘটিলে সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়, তাহা লেখক 'একচোখো

১ যথার্থ দোসর, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৮৪।

২ যথার্থ দোসর, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৮২।

৩ গোলাম-চোর, ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়, পৃ ১২-১১৫।

সংস্কার'[১] শীর্ষক এক প্রবন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলিলেন যে, একদল লোক কোনো প্রকার পরিবর্তন বা সংস্কার হইলেই অতীতের সহিত অধুনার তুলনা করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন। সেই সর্বসংস্কার-বিরোধী মনোভাবের সমর্থন তিনি করিতে পারেন না। আবার, যাঁহারা আমূলসংস্কারের পক্ষপাতী লেখক তাঁহাদের সহিতও একমত নহেন। যাঁহারা অর্ধপন্থী তিনি তাঁহাদেরও যুক্তির অসংখ্য ত্রুটি ধরিলেন; তাঁহার মতে লোকাচারের যে-প্রাচীর এককালে সমাজকে আশ্রয় দিয়াছিল সেই প্রাচীর ভাঙিলেই সমাজ আপনা হইতেই রক্ষা পাইবে না। তাঁহার মতে সমাজ-প্রাচীরের একটি-একটি করিয়া খিড়কি খুলিয়া বাহিরের আলোবাতাস প্রবেশের পথ করিয়া দিতে হইবে; এই শ্রেণীর সংস্কারকগণ রক্ষণশীল দলভুক্ত হইয়াও উন্নতিশীলদিগকে সাহায্য করিতেছেন; সংক্ষেপে বলিতে গেলে আদিব্রাহ্মসমাজের ধীর মন্থর গতিতে সমাজসংস্কারের আদর্শই বরণীয়। নবীনদের চোখে আদিসমাজের মত প্রগতিমূলক নহে, বরং বলা যাইতে পারে প্রয়োজনানুসারে practical বা সুবুদ্ধিমূলক।

কিন্তু সাহিত্যবিচারে বা কাব্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আদৌ সুবুদ্ধির পথাশ্রয়ী নহেন; সাহিত্যের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত রসের সৃষ্টি হইতে সাহিত্য সুন্দর ও উপভোগ্য হয়; এই কথাটাই ব্যঙ্গচ্ছলে প্রকাশ করেন 'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়'[২] প্রবন্ধে। রচনাটি আধুনিক শিক্ষা ও সাহিত্যের একটি রস-সমালোচনা। লেখক বলিতে চান যে, বয়োভেদে যেমন মানুষের খাদ্যের পরিবর্তন হয়, জ্ঞান-বিতরণের বেলাতেও সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য ও পেয় এই চারিবিধ খাদ্য গ্রহণের পন্থা ছিল সনাতন; অধুনা পঞ্চম পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে— তাহাকে বলা হইয়াছে ধৌম্য বা ধূমায়ন বা তামাকু-সেবন। ধূমপান জীবনের বা স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে লাগে না, কেবলমাত্র আনন্দের জন্যই ইহার অভ্যাস, চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের ন্যায় জীবধর্ম-রক্ষার জন্য অপরিহার্য নহে। তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রে নভেল পড়া জ্ঞানালোচনার অন্তরঙ্গ বিষয় নহে, কেবলমাত্র সাময়িক আনন্দের জন্যই এই অভ্যাসের জন্ম। আসল কথা, প্রবন্ধটিতে যথেষ্ট কৌতুকোচ্ছ্বাস আছে। এই প্রবন্ধেই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়— 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র[৩] মধ্যে যে-প্রীতিপ্রদ অম্লরসের আমেজ আছে তাহাই লেখক সুষ্ঠুভাবে বিচার করিয়াছেন।

তরুণ লেখকের মনে বিচিত্র প্রশ্ন উঠে, তাহারই অন্যতম হইতেছে জীবনে যুক্তি বা reason প্রবল, না আবেগ বা emotion প্রবল। এ মানবের চিরন্তন প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ অর্ধব্যঙ্গভরে প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে সর্বদা বিচরণ করিবার জন্য যুক্তি বা বুদ্ধি নামে একটি 'দারোয়ান'[৪] নিযুক্ত আছে। মানুষের এই প্রবলতম সম্বল তাহাকে সর্বদা চালনা করিতে চায়। কিন্তু লেখকের প্রশ্ন— এই বুদ্ধি বা যুক্তি দারোয়ান যদি মানুষকে সর্বদাই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া চালায় তবে তাহার মনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় কি না সন্দেহ। "নিতান্তই যুক্তির নির্দিষ্ট চারটি দেওয়ালের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানো মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নহে, আবার সর্বতোভাবে যুক্তিকে অমান্য করিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়ানোও ভালো নয়।" যুক্তিরাজ্যের বাহিরে কল্পনার যে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে, তাহাকেও জীবনে উপেক্ষা করা যায় না। যাহাই হউক, 'গোলাম-চোর' 'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়' 'দারোয়ান' 'নিমন্ত্রণসভা' প্রভৃতি

১ একচোখো সংস্কার, ভারতী ১২৮৮ পৌষ, পৃ ৪০১-৪০৭, সমালোচনা (১২৯৪) পৃ ৪০১-৪০৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ২য়, পৃ ১৪৪-১৪৮।

২ ভারতী, ১২৮৮ শ্রাবণ, পৃ ১৮৪-৮৯।

৩ কমলাকান্তের দপ্তর প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫ অব্দে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯২ (১৮৮৫ ? অব্দে)। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংস্করণের কথাই বলিতেছেন।

৪ দারোয়ান, ভারতী ১২৮৮ ভাদ্র, পৃ. ২১৫-১৯।

রচনাগুলির মধ্যে লেখকের বয়সোচিত ধর্মই চোখে পড়ে। রচনাগুলির মধ্যে কোনো আন্তরিকতা নাই, মতামতের মধ্যে দৃঢ়তা বা উগ্রতা নাই ; তবে জীবনের বিচিত্র সমস্যার প্রশ্ন প্রত্যেকটির মধ্যেই অল্পবিস্তর আলোচিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সমাজসংস্কারক বা ধর্মসংস্কারক নহেন ; তিনি কবি ও সাহিত্যিক। সুতরাং তাঁহার রচনার মধ্যে সামাজিক মতামত সম্বন্ধে বরাবর একই ভাবের মতবাদ পোষণ করিতে ও জীবনে পালন করিতে না দেখিলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিচিত্র ভাবে গতানুগতিকের বাধা ভাঙিয়াছেন বহুল পরিমাণে। কাব্যজগতে তিনি যে-মুক্তি আনিয়াছেন তাহাকে বিপ্লব বলা যাইতে পারে।

সন্ধ্যাসংগীতের যুগের বিচিত্র গদ্যরচনার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অর্ধরাজনৈতিক রচনার উল্লেখ না করি। আমরা যে-সময়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি তখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, লর্ড লীটনের দাম্ভিক শাসনের অবসান হয় নাই ; ইংরেজি খবরের কাগজওয়ালাদের ঔদ্ধত্য ও নীচাশয়তা ছিল অসীম। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা একদিন লিখিল, "This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says kick them first and then speak to them." এই উক্তিটি পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া 'জুতাব্যবস্থা'[১] শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক লিখিলেন, "গবর্নমেণ্ট একটি নিয়ম জারী করিয়াছেন যে, 'যেহেতুক বাঙালীদের শরীর অত্যন্ত বে-যুৎ হইয়া গিয়াছে, গবর্নমেণ্টের অধীনে যে যে বাঙালী কর্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে'।" সম্পাদক পাদটীকায় লিখিলেন, "যে সমগ্র জাতিকে কোনো বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে-জাতি উপরি-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না।··আজ অন্য কোনো দেশে যদি কোনো কাগজ ঐরূপ অপমানের আভাসমাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এতদিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে আজ উহা আমাদের নিকট গুরুপাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।" সমগ্র প্রবন্ধটি তীব্র শ্লেষপূর্ণ, রচয়িতার নাম না থাকিলেও উহা যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত—সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কমই।

এই সময়ে ভারতীতে জাতীয়তা[২] ও তৎসম্পর্কীয় নানা প্রশ্ন তুলিয়া এককিস্তি আলোচনা শুরু হয় ; মনে হয় রবীন্দ্রনাথও তাহাতে যোগদান করেন, কিন্তু কোন্‌টি তাঁহার রচনা তদ্‌বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই বলিয়া আলোচনা স্থগিত থাকিল।

কেবল দেশ নহে, দেশ অতিক্রম করিয়া জগতের সমস্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সহানুভূতি চিরদিনের। এই তরুণ বয়সেও তাঁহার একটি রচনার মধ্যে নিপীড়িত জাতির প্রতি অকৃত্রিম দরদ প্রকাশ পাইয়াছে। চীনে অহিফেন-ব্যবসায় লইয়া য়ুরোপীয় বণিকসংঘ ও বিশেষভাবে ইংরেজদের দুর্ব্যবহার জগতবিশ্রুত। ডক্টর ক্রিস্টলীব নামে একজন জার্মান পাদরি-লিখিত গ্রন্থের ইংরেজি তর্জমা[৩] পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ ভারতীতে লেখেন। অর্থের লোভে মানুষ এক সমগ্র জাতিকে কিভাবে পৃথিবীর সমক্ষে চণ্ডুখোর জাতিতে পরিণত করিতে পারে তাহারই

১ জুতাব্যবস্থা, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫৮-৬২। রচয়িতার নাম নাই ; তবে আমরা জানি উহা রবীন্দ্রনাথের রচনা।

২ জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৮৬-৯১। জাতীয়তার নিবেদন, ঐ আষাঢ় পৃ. ১৩৫-৩৯। জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার বক্তব্য, ঐ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৩-৭৩।

৩ চীনে মরণের ব্যবসায়, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৯৩-১০০। *The Indo-British Opium Trade* by Theodore Christlieb, D.D. Ph.D. Translated from the German by David B. Croom, M.A.

আলোচনা এই গ্রন্থমধ্যে ছিল। ইংরেজ অহিফেনের হীন ব্যবসায়কে কূটনীতি ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে চীনদেশে কায়েমি করে। অহিফেনের ব্যবসায় যে কেবল চীনদেশের সর্বনাশ করিয়াছিল তাহা নহে, ভারতেরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিস্তর ক্ষতি করে। মালবদেশে অহিফেনের চাষ প্রবর্তিত হওয়ায় সে দেশের কৃষির ও অধিবাসী রাজপুত জাতির যে সর্বনাশ হইয়াছে, সেদিকেও লেখক দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

আষাঢ় মাসে 'নিমন্ত্রণসভা'[১] নামে একটি প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে নিমন্ত্রণসভায় আহারের আয়োজনই প্রাধান্য লাভ করে। আহার ব্যতীত সেখানে আর কোনো অনুষ্ঠান হয় না। কেবল আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য মানুষ একত্র হয় না। লেখক সমাজের এই ত্রুটি সংশোধনের প্রস্তাব করেন।

রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয় ও সন্ধ্যাসংগীত কাব্যদ্বয়ের আলোচনা করিয়া পাঠকদের মনে এই ধারণাই হয় যে, কবি যেন সর্বদাই দুঃখে ম্রিয়মাণ, অন্তর তাঁহার বেদনায় জর্জর। এই ধারণাসৃষ্টির জন্য অবশ্য কবি স্বয়ং দায়ী। কিন্তু কাব্যের বিষাদ সুর হইতে গদ্যের রচনারীতির পার্থক্য কত ব্যাপক। সেইজন্যই আমরা বলিয়াছিলাম যে, কেবল কাব্যের দ্বারা লেখকের সমগ্র মনটিকে পাওয়া যায় না; রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজের প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা গদ্যরচনাগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিলাম।

সন্ধ্যাসংগীত

পাঠকের স্মরণ আছে ১৮৮১ অব্দের গ্রীষ্মকালে (১২৮৮ বৈশাখ) বিলাত যাইবার পথ হইতে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ মসুরিতে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান; সেখান হইতে আসিয়া বর্ষাকালটা চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত বাস করেন। বর্ষান্তেই তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু শরৎকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার স্ত্রী কাদম্বরী দেবীকে লইয়া 'দূরদেশে ভ্রমণ করিতে' চলিয়া গেলেন। ইঁহারা হঠাৎ চলিয়া যাওয়াতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। পিতা অন্যত্র; জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ আপনার কাব্য দর্শন গণিত -আলোচনায় মগ্ন; সত্যেন্দ্রনাথ দূরে বোম্বাইপ্রদেশে। হেমেন্দ্রনাথ বাড়িতে থাকিলেও তাঁহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তেমন দেখা যায় না; তাঁহার পত্নী এগারোটি ছেলেমেয়ে লইয়া নিজ সংসার-গণ্ডির মধ্যে এমনি আবিষ্ট থাকিতেন যে দেবরাদির প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর হইত কম; তা ছাড়া তাঁহারা অন্য সকলের হইতে একটু পৃথক থাকিতেই ভালোবাসিতেন। আসল কথা বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করিতে পারে এমন কেহ ছিল না। জ্যোতিদাদা ও বউঠাকুরানীর কাছে স্নেহ পাওয়াটা এমনি অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাদের অভাবটা কবির স্বভাবকোমল চিত্তে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। কাদম্বরী দেবী তাঁহার এই অদ্ভুতস্বভাব দেবরটিকে বাল্যকাল হইতেই একটু অধিক স্নেহ করিতেন, তাঁহার আব্দারও সহ্য করিতেন বিস্তর। রবীন্দ্রনাথের 'লেখাপড়া' না হওয়ায় বাড়ির সকলেই যখন তাঁহার উপর বিরূপ তখন বউঠাকুরানীর অহেতুকী স্নেহ কবির জীবনে দেবতার আশীর্বাদের ন্যায় মঙ্গলপ্রদ হইয়াছিল। বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতে মাত্র দুই বৎসরের বড়; কিন্তু মেয়েরা এই সামান্য বয়স্কতার জন্যই ছোটদের উপর অতি সূক্ষ্ম প্রভাব ও প্রতিপত্তি সহজেই স্থাপন করেন। এই ঘনিষ্ঠতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন-বিকাশের জন্য বিপুলভাবে দায়ী, তাহা রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টতর হইবে। জীবনস্মৃতিতে

১ নিমন্ত্রণসভা, ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়, পৃ. ১৩৯-১৪৪।

কবি লিখিয়াছেন, "তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন-করিতাম। এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন জানি না কেমন করিয়া কাব্য-রচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল।" এই বাঁধন-ছাড়া অবস্থা মনে মুক্তি ও কাব্যে বিপ্লব আনিবার পক্ষে যথার্থই অনুকূল। এখন হইতে কাব্যজীবনের নূতন ধারা শুরু হইল। অন্যকে খুশি করা অপেক্ষা নিজে খুশি হওয়াটাই কাব্যসাধনার বড় কথা—এই তত্ত্বটা এইবারকার নিরালা বাসের বড় আবিষ্কার। এতদিন জ্যোতিদাদা ও বউঠাকুরানী ছিলেন তাঁহার সাহিত্য ও ভাব-জীবনের প্রেরণা এবং রসগ্রাহিতার উৎস। "তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনাআপনি সেই-সকল কবিতার শাসন হইতে কবির চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।" এতদিন পরে বিহারীলালের অনুকৃতি হইতে তাঁহার মুক্তি হইল। কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের একজন বড় রকম ভক্ত ছিলেন এবং মনে মনে আশা করিতেন যে তাঁহার দেবরটির যে-রূপ প্রতিভা, কালে তিনি হয়তো বিহারীলালের সমকক্ষ কবি হইতে পারিবেন। সামান্য বিদ্যা ও স্বল্প বোধশক্তি লইয়া তাঁহার কাব্য-আদর্শের ধারণা বিহারীলালের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিত না; তরুণ কবিও নিজের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে ও বউঠাকুরানীর প্রতি সকল বিষয়ে অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলে, কাব্যের সেই আদর্শকে চরম বলিয়া এযাবৎকাল মনে করিয়া আসিতেছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতে সেই মুক্তির আহ্বান আসিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশদভাবে জীবনস্মৃতিতে এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় যথার্থ লিরিকের সুর বাজে বিহারীলালের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের মতে "সেই প্রথম বাংলা কবিতা" যাহার মধ্যে "কবির নিজের সুর" শোনা গিয়াছিল। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতায় কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে; কিন্তু চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।[১]

রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তি নিজ লিরিক রচনার সমর্থনে লিখিত; কারণ তিনি তাঁহার যথার্থ লিরিকধর্মী কবিতাগুলিকে চতুর্দশ পদের মধ্যে সীমায়িত করিয়া সংহত করিতে পারেন নাই। বাংলা লিরিকে রবীন্দ্রনাথ যুগপ্রবর্তক; ইতিপূর্ব-যুগের কোনো কবির সহিত তাঁহার লিরিকের তুলনা করা যায় না। কিন্তু নূতন লিরিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে একমাত্র কবি ছিলেন—এ কথা বলিলে বাঙালি কবিগণের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে। আধুনিক যুগে মধুসূদন বাংলা ভাষায় লিরিকের সুর সর্বপ্রথম বাঙালিকে শুনাইয়া ছিলেন; সেই হইতে নূতন কবিতার জন্ম। ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াও যুগপৎ বাংলা ভাষা ও ছন্দ সামান্যভাবে আয়ত্ত করিয়া একদল তরুণ সাহিত্যিক ইংরেজি কবিতার নকলে লিরিক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালির জীবনে অনুভূতির ক্ষেত্র এতই সংকীর্ণ ও গতানুগতিক, কবিতার মধ্যে লিরিকের আন্তরিক সুর আনা কবিদের পক্ষে কঠিন। এই নবীন লেখকদের নিজস্ব সম্পদ ছিল ভাষার দৈন্য ও ঐকান্তিক অনুভূতির অভাব। সাহিত্যের সবই ছিল ইংরেজির অনুকরণ। 'ইংরেজি' বলিতেছি— তাহার কারণ, আমরা যে-শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের দান; ইংরেজি সভ্যতা, ইংরেজি সাহিত্য— যাহাকে বলে দ্বৈপ insular— তাহাই আমাদের প্রধানতম মানসিক উপজীব্য। বৃহত্তর য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিশাল খরপ্রবাহের অতি ক্ষীণ ধারা বহু পথ ঘুরিয়া আমাদের কাছে পৌছায়। সেই ইংরেজি সাহিত্য -অনুপ্রাণিত বাঙালি লেখক-মণ্ডলী কালে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। এ কথা অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা বৃথা যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শুরু হইতে যে সাহিত্য বাংলাদেশে রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল

১ বিহারীলাল, আধুনিক সাহিত্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯।

তাহার প্রেরণা বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য। বিলাতি ফুলের বীজ গ্রীষ্মমণ্ডলের মৃত্তিকায় জন্মিলে মাতৃভূমি হইতে তাহার যেটুকু পার্থক্য মধ্য-উনবিংশ শতকোত্তর ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পার্থক্য সেইটুকু মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোনো সাময়িক প্রবন্ধে তৎকালীন বাঙালি কবিদের ইংরেজি অনুকরণ-প্রিয়তার জন্য তীব্র ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি নিজেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারও শিক্ষা-দীক্ষা বহুলপরিমাণে পাশ্চাত্য; আত্মবিশ্লেষণ করিয়া তখনও তিনি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার মনের গঠন গভীর ভাবে য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন। তাঁহার বিরাট সাহিত্য পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করিয়া মহান্। তাঁহার কবিতার সহিত মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতার স্বর রূপ ও গুণের পার্থক্য এত বেশি যে, একমাত্র ভাষা ছাড়া উভয়ের মধ্যে মিল খুঁজিতে হইলে কষ্টকল্পনা করিতে হয়। সোক্রাতিস্ তাঁহার সমসাময়িক সোফিস্ট বা পণ্ডিতগণের সহিত নিত্য কলহ করিয়া তাঁহাদের চিন্তাধারায় ভ্রম প্রদর্শন করাইতেন, কিন্তু তাঁহাকেই বলা হয় Prince of Sophists; শঙ্করাচার্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' আখ্যা দান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেই কথা প্রযোজ্য। তিনি পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি সাহিত্যের ভাব ও রীতি এমন নিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাব্যের মধ্যে বৈদেশিকতাটা উৎকটরূপে দেখা দেয় নাই, সেটাকে যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টায় তিনি অধিক কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমকে আয়ত্ত করেন, অনুকরণ করেন নাই; সেইখানেই তাঁহার মনীষা। সেইজন্য তাঁহার কাব্যে য়ুরোপীয় প্রভাব প্রচুর থাকিলেও তাহা অলক্ষিত। সে-যুগে 'আধুনিক' লেখকদের কদর হইত ইংরেজ লেখকদের মানসূচী দ্বারা, সেইজন্য বাঙালি লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হইত স্কট্, নবীনচন্দ্রকে বাইরন্, মধুসূদনকে মিলটন্, আর রবীন্দ্রনাথকে বলা হইত শেলী। এই নামকরণের দ্বারাই বুঝা যায় তখনও বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব কোনো মানসূচী নির্দিষ্ট হয় নাই বলিয়া ইংরেজি মানসূচী দ্বারা বাঙালি সাহিত্যিকদের মান ও নাম হইত।

বহু বৎসর পরে কবি নিজ রচনাকে সম্পূর্ণরূপ নৈর্ব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষণীতে দেখিয়া একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "দেশ-বিদেশ থেকে নানারকম ভাবের প্রেরণা এসে পৌঁছেছে আমার মনে এবং রচনায় তাকে স্বীকার করে নিয়েছি, তা আমার কাব্যদেহকে হয়তো বল দিয়েছে পুষ্টি দিয়েছে কিন্তু কোনো বাইরের আদর্শ তার স্বাভাবিক রূপকে বদল করে দেয় নি।·· আগাগোড়া রূপ বদল দেখলেই বুঝি সেটা আদর্শকে গ্রহণ করা নয় সেটা আদর্শকে নকল করা। এই জিনিসটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।·· আমাদের দেশের হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলছি, যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তা হলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কি করে? যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথে চলেছে তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে সনাতনীও হতে পারে অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়টের বা অডেনের বা এজ্রা পাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না।·· যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম?"[১] রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের কাব্য সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায় যে তাহা অনুকরণের স্তরে নিমজ্জিত থাকে নাই।

গোধূলিতে আলো-আঁধার পরস্পরকে এরূপভাবে অবলেপন করিয়া থাকে যে, উভয়কে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, কিন্তু বুঝা যায় না। ভগ্নহৃদয় ও সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাকে ঠিক সেই পর্যায়ে ফেলা যায়—যেখানে ভাবের অস্পষ্টতায় ভাষা বিকৃত, ছন্দ পঙ্গু। সন্ধ্যাসংগীতের বীণাতন্ত্রী ভগ্নহৃদয়ের বিষণ্ণ সুরে বাঁধা। ভগ্নহৃদয়ের মনোবেদনা গল্পের নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল; সন্ধ্যাসংগীতের ঐ বেদনাই অন্যের জবানীতে না বলিয়া, নিজের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা মাত্রেই কবির লেখনীতে অসামান্য নবীনতা আসিয়াছিল। বিহারীলালের ছন্দোবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল।

১ পত্রগুচ্ছ (২৮), ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, কবিতা ৯ম বর্ষ. ১৩৫০ পৌষ, পৃ. ১৩৮।

জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন যে, সন্ধ্যাসংগীত-রচনাকালে তিনি কোনো বন্ধনের দিকে তাকান নাই। মনে কোনো ভয়ডর যেন ছিল না। কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবেন নাই। এতদিন কেবল নিজের উপর ভরসা করিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের জিনিসকে পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব, মূর্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।" এইটাই হইতেছে লিরিকধর্মী কবিতার মর্মকথা।

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি প্রধানত ভারতীতে প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালে, কয়েকটি ১২৮৭ সালেও হয়। শৈশব-সংগীতের কবিতা তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত; ভগ্নহৃদয় উনিশ বৎসর বয়সের লেখা, আর বিশ বৎসর বয়সের লেখা হইতেছে সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, সেটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল। "অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।"

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি মনোসংযোগ সহকারে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, বিচিত্র মান-অভিমান রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্ব হইতে যে বিষাদ সৃষ্ট হয় তাহাই এই লিরিক বা সংগীতে মূর্তি লইয়াছে। কবিতাগুলি যে সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক এ কথা মনে করিবার কোনো সংগত কারণ আমরা পাই না। আঘাত-অভিঘাত ব্যতীত মানুষের অসাড় মন জাগে না, এবং আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যরচনার মধ্যেও সেই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী হঠাৎ বেড়াইতে চলিয়া গেলে কবির মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা 'পরিত্যক্ত'[১] কবিতায় অস্পষ্ট নহে।—

চলে গেল আর কিছু নাহি কহিবার
চলে গেল আর কিছু নাহি গাহিবার।
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার শুধু বলিতেছে,
'চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল, দ'লে গেল গো'· ·
পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মতো
মোরে ফেলে গেল,
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত—
সাথে না লইল।
তাই প্রাণ গাহে শুধু, কাঁদে শুধু, কহে শুধু,
'মোরে ফেলে গেল,

১ পরিত্যক্ত, সন্ধ্যাসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ৯-১১

সকলেই মোরে ফেলে গেল,
সকলেই চলে গেল গো।'
একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি ?
বুঝি চেয়েছিল।
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি ?
বুঝি কেঁদেছিল।
বুঝি ভেবেছিল—
লয়ে যাই—নিতান্ত কি একেলা কাঁদিবে ?
না-না কী হইবে লয়ে, কী কাজে লাগিবে।
তাই বুঝি ভেবেছিল—
তাই চেয়েছিল।

পার্থিব দিক হইতে ব্যর্থতার গ্লানিতে রবীন্দ্রনাথের মন তখন ভারাক্রান্ত ; কারণ বিলাত হইতে কিছু না হইয়া ফিরিয়া আসাতে সকলেই তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখেন ; তাই 'গান-সমাপন'[১] কবিতাটির মধ্যে লিখিতেছেন—

এমন মহান্ এ সংসারে জ্ঞানরত্নরাশির মাঝারে
আমি দীন শুধু গান গাই, তোমাদের মুখপানে চাই
ভালো যদি না লাগে সে গান ভালো সখা, তাও গাহিব না।
বড়ো ভয় হয়, পাছে কেহই না দেখে তারে
যে-জন কিছুই শেখে নাই।
ওগো সখা, ভয়ে ভয়ে তাই
যাহা জানি সেই গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।

ভগ্নহৃদয়ের মধ্যে যে-অবরুদ্ধ মনের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল 'সন্ধ্যাসংগীতে' তাহারই রূপান্তর দেখা যাইতেছে। বিশ বৎসর বয়স না-কৈশোর না-যৌবন। যৌবনের মদিরা শিরার মধ্যে মাদকতা আনে, কিন্তু উপভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত বলিয়া কখনও অতৃপ্ত ক্ষুব্ধ, কখনো-বা মুহ্যমান, দুঃখাতুর। 'অসহ্য ভালোবাসা'[২] কবিতাটি পাঠ করিলে আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে—

এইরূপে দেহের দুয়ারে মন যবে থাকে যুঝিবারে,
তুমি চেয়ে দেখ মুখ-বাগে এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যেথা চোখের সলিল উঠে সেথা দুখের নিশ্বাস।

১ গান-সমাপন, ভারতী ১২৮৮ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩৬৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ৪৩।

২ অসহ্য ভালোবাসা, সন্ধ্যাসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ১৯।

'অনুগ্রহ'[১] কবিতাটির মধ্যে কবির মনে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে—

এই-যে জগৎ হেরি আমি, মহাশক্তি জগতের স্বামী,
এ কি হে তোমার অনুগ্রহ ? হে বিধাতা কহ মোরে কহ।
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র একজন আমারে যে করেছ সৃজন,
এ কি শুধু অনুগ্রহ করে ঋণপাশে বাঁধিবারে মোরে ?
মহা অনুগ্রহ হতে তব মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহি না থাকিতে এ সংসারে।

কবির আকাঙ্ক্ষা কি, এই কবিতায় তাহাও ব্যক্ত—

কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়—
ভালোবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মতো,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।
আপনারে দিয়েছি ফেলিয়া,
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভালোবাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালোবাসা চায়।

মান অভিমান ক্রোধ যুগপৎ মনকে ক্লান্ত ও ক্ষুব্ধ করিতেছে—

যবে আমি যাই তার কাছে সে কি মনে ভাবে গো তখন
অনুগ্রহ ভিক্ষা মাগিবারে এসেছে ভিক্ষুক একজন ?

কবিতাটির শেষদিকে উত্তেজিত ভাবে কবি বলিতেছেন—

কেহ যেন মনে নাহি করে
মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী।
নাহয় শুনো না মোর গান,
ভালোবাসা ঢাকা রবে মনে।
অনুগ্রহ ক'রে এই কোরো—
অনুগ্রহ কোরো না এ জনে !

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি আগাগোড়া একটা নিরাশা, একটা অশান্ত হৃদয়ের অকারণ ক্রন্দনপরায়ণতায় পূর্ণ। 'দুঃখের আবাহন'[২] বোধ হয় এই কবিতাগুচ্ছের আদি রচনা। 'ভারতী'তে এই কবিতা যে মাসে প্রকাশিত হইল সেই মাসে ভগ্নহৃদয়ের ষষ্ঠ সর্গ মুদ্রিত হয়; বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হয় সেই মাসেই। এই কবিতায় কবি দুঃখকে প্রাণপণে আহ্বান করিতেছেন—

১ অনুগ্রহ, ভারতী ১২৮৮ মাঘ, পৃ ৪৪০-৪৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ ২২।
২ দুঃখের আবাহন, ভারতী ১২৮৭ ফাল্গুন পৃ ৫৪২। সন্ধ্যাসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ১৫।

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন· ·
নিরালায় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়।
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয়।

'শান্তিগীত'[১] কবিতায় সেই দুঃখের স্তব—

ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা তুই, ঘুমা রে এখন।
সুখে সারা দিনমান শোণিত করিয়া পান
এখন তো মিটেছে তিয়াষ?
দুঃখ, তুই সুখেতে ঘুমাস।

দুঃখভোগ করিতে যেন ভালো লাগিতেছে; তাই 'আশার নৈরাশ্যে'[২] লিখিতেছেন—

বলো, আশা, বসি মোর চিতে
আরো দুঃখ হইবে বহিতে।

এইরূপ বিষাদের সুর সমস্ত কবিতার মধ্যে।

কিন্তু এই বিষাদপূর্ণ মনোভাবকেই তিনি চরম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন না, বারে বারে নিজের সৃষ্টিকে কবি আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করিয়াছেন—'নিজে হাতে জ্বালা পূজাদীপের থালা' তাঁহার হাতে খান্ খান্ হইয়াছে; সুতরাং ঐ মোহ হইতে বাহির হইবার জন্য আকুলভাবে বলিয়া উঠিতেছেন[৩] —

দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা,
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।
কোথায় প্রণয়ে মন যৌবনে ভরিয়া উঠে,
জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে,· ·
তা নয়, এ কি এ হল, একি এ জর্জর মন!
হাসিহীন দু অধর, জ্যোতিহীন দু নয়ন!
দূরে যাও, দূরে যাও, হৃদয় রে, দূরে যাও—
ভুলে যাও, ভুলে যাও, ছেলেখেলা ভুলে যাও।
দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে বরাবর দেখা গিয়াছে যে, যে পরিবেশের মধ্যে কবিতাগুলি লিখিত হইতেছে তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সুর শেষ দিকে ধ্বনিয়া উঠিতেছে, তা সে-পরিবেশ সুখেরই হউক বা দুঃখেরই হউক। তাই

১ শান্তিগীত, সন্ধ্যাসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ১৭।
২ আশার নৈরাশ্য, ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ, পৃ. ১৭৩। সন্ধ্যাসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ৮।
৩ হলাহল, সন্ধ্যাসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ২০।

'হলাহল' কবিতার মধ্যে অস্বাভাবিক জীবনধারা হইতে বাহিরে আসিবার জন্য তীব্র আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রভাত-সংগীত মুখরিত হইবার পূর্বেই এ যেন প্রথম কাকলি।

সাধারণত বইএর উপহার থাকে প্রথম দিকে, সন্ধ্যাসংগীতের উপহার হইতেছে শেষভাগে। কাহাকে উপহার তাহা কবি বলেন নাই, আমরাও কোনোরূপ অনুমানের উপর সিদ্ধান্ত গড়িতে চাহি না।[১]

মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি লইয়া একটি খণ্ড হয়, নাম 'হৃদয়-অরণ্য'। প্রভাতসংগীতে 'পুনর্মিলন' কবিতায় এই যুগের কথা স্মরণ করিয়া কবি লিখিয়াছেন, "হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে· ·তারি মাঝে হনু পথহারা।" এই পংক্তি হইতে কাব্যখণ্ডের ঐ নাম সংগৃহীত হয়। কবি তাঁহার নবনামাঙ্কিত কাব্যগুলির জন্য ভূমিকারূপে যে-কবিতা লিখিয়া দেন সেইগুলি কবিতাগুচ্ছের যথার্থ প্রকাশক। 'হৃদয়-অরণ্য' খণ্ডের জন্য লেখেন "কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে, কাঁদিছে আপন মনে।" কিন্তু এই আকুতির অন্তরালে রহিয়াছে চির আশ্বাস, অনন্ত নির্ভর—

কিছু নাই তোর ভাবনা!
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পূরাবি কামনা
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি ;
জনম ব্যর্থ যাবে না।

তাই একদিন এই হৃদয়ারণ্য হইতে প্রভাতসংগীতের সুরের টানে 'নিষ্ক্রমণ' হইল 'বিশ্বে'র মাঝে।

সন্ধ্যাসংগীত সে যুগের অন্য সমস্ত কবিতা হইতে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল; সে সাজ বাজারে চলিত নয়। সুতরাং কাব্যের যথার্থ সমজদাররা প্রচুর পরিমাণে ইহার সমাদর করিয়াছিলেন। রচনাকালে "সেই উচ্ছৃঙ্খল কবিতা শোনাইবার একজন মাত্র লোক তখন ছিলেন— অক্ষয়বাবু।" তাঁহার এই কবিতাগুলি হঠাৎ অত্যন্ত ভালো লাগিয়া গেল; তাঁহার অনুমোদনে কবির পথ আরও প্রশস্ততর হইল। এই কাব্য প্রকাশিত হইলে প্রিয়নাথ সেনকে কবি একজন অকপট বন্ধুরূপে লাভ করিলেন। তিনি ভগ্নহৃদয় পাঠ করিয়া তরুণ কবি সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত হইলে তাঁহার নিকট প্রচুর সমাদর লাভ করিলেন। প্রিয়নাথ ছিলেন সেই শ্রেণীর সাহিত্যিক যিনি উৎসাহবাণী ও অনুকূল সমালোচনা দ্বারা সাহিত্যস্রষ্টাদের রচনাকে অভিনন্দিত করিতেন।

সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত লইলে[২] বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে কিভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন সে কথা জীবনস্মৃতিতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা কমলার সেদিন বিবাহ (১৮৮২ জুলাই) প্রমথনাথ বসুর[৩] সহিত। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিতেছেন, "বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার

১ "সন্ধ্যাসংগীতের প্রথম সংস্করণে মূলগ্রন্থের ভূমিকা রূপে ও গ্রন্থ 'সমাপ্ত' হইবার পর, 'উপহার' শীর্ষক দুইটি কবিতা মুদ্রিত আছে। প্রথম 'উপহার' কবিতাটি বর্তমান রচনাবলীতে 'সন্ধ্যা' নামে, এবং দ্বিতীয়টি 'উপহার' নামেই মুদ্রিত আছে। দ্বিতীয়টিকেই এই গ্রন্থের উপহার বা উৎসর্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।" রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৬২৫।

২ সন্ধ্যাসংগীত ১২৮৯ সালে ২২ আষাঢ় (১৮৮২ জুলাই ৫) প্রকাশিত হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। দ্র' রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৪।

৩ প্রমথনাথ বসু— ইনি জামসেদপুরে টাটাদের কারখানা স্থাপনের মূলে ছিলেন। মধু বোস ইঁহার পুত্র, কন্যা লেডি প্রতিভা মিত্র (মিসেস বি. এল. মিত্র)।

গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ-মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?' তিনি বলিলেন, 'না'। তখন সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"

সন্ধ্যাসংগীত-যুগের পূর্বরচিত কবিতাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব কাব্যসম্পদ বলিয়া স্বীকার করিয়া যান নাই। 'বনফুল' হইতে 'ভগ্নহৃদয়' পর্যন্ত কাব্য-কয়খানি তাঁহার তেরো হইতে উনিশ বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। এই বয়সে কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন অনুকরণে, বিহারীলালকে ও অক্ষয় চৌধুরীকে রাখিয়াছিলেন সম্মুখে।[১] এই কাব্যজীবনের অনুকরণ-পর্বের অবসানে যথার্থ লিরিকধর্মী কবিতার সুরে সন্ধ্যাসংগীতের নূতন সুর ধ্বনিত হইল। ইতিপূর্বে তরুণ কবি অস্পষ্ট হৃদয়াবেগকে কাব্যের বা গাথার নায়ক-নায়িকার জবানিতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া এতদিন যাহা-কিছু শিখিয়াছিলেন তাহা আখ্যানমূলক কাব্য, অনুভূতিমূলক গীতিকাব্য নহে। বোধ হয় বাল্য ও যৌবনের মধ্যস্থিত অবস্থায় চিত্তের ভাবনারাজি অশরীরী অস্পষ্টতার মধ্যে বিচরণ করে; তাহারা লিরিকমূর্তি ধারণ করিবার মত আবেগময়ী হয় না, অবরুদ্ধ মনের ব্যাকুল উচ্ছ্বাস নিজের ছন্দোময় ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি অর্জন করে না। সন্ধ্যাসংগীতে কবি অতীতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন আত্মশক্তি অনুভব করেন বলিয়াই এই কাব্যের এত সমাদর।

সন্ধ্যাসংগীতকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন[২]; 'ভানুসিংহের পদাবলী' পূর্বে রচিত হইলেও গ্রন্থাকারে পরে মুদ্রিত হয়। সন্ধ্যাসংগীত সম্বন্ধে কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বহুবিস্তারেই লিখিয়াছেন। কবিতাগুলিকে তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াও রচনার প্রেরণাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারেন নাই। তবে এক-এক সময় মনে হয় যে-কাব্যকে তিনি 'কালানুক্রমণদোষ-যুক্ত' বলিয়া সাহিত্য-দরবার হইতে বহিষ্কৃত[৩] করিবার জন্য এতই ব্যস্ত, সেসম্বন্ধে এত কৈফিয়ত না দিলেও তো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে; রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ নিরপেক্ষ নিজস্ব কাব্যসৃষ্টির সূত্রপাত এই কাব্যের মধ্য দিয়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই কাব্যের প্রতি দরদ অন্তত-পক্ষে তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছিল। তাহার পর মতের হয়তো পরিবর্তন হইয়াছিল; কিন্তু তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব হয় নাই।

সন্ধ্যাসংগীত-যুগের গদ্য রচনা

ভগ্নহৃদয় ও সন্ধ্যাসংগীত রচনাকালে তাঁহার মনোভাবের যে-চিত্র রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ও অন্যান্য রচনার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অনুবর্তন করিয়া অন্য লেখকেরা কবির মানসলোকের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা আমাদের মতে অসম্পূর্ণ। দার্শনিক সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে নিজ জীবনের বিশেষ পর্ব ও সৃষ্টিকে কঠোর বিশ্লেষণ দ্বারা যেভাবে রবীন্দ্রনাথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমসাময়িক গদ্য রচনার দ্বারা সমর্থিত হয় না। সন্ধ্যাসংগীতের যুগকে যদি আমরা বলি যে কবি কেবলই আপনার হৃদয়াগ্নিতে হাপর টানিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার

১ দ্র. পত্রগুচ্ছ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯। কবিতা, ১৩৫০ পৌষ, পৃ. ১৩৭।

২ "সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি।• •অতএব সন্ধ্যাসংগীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল।"—১৯১৫ সালের ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকা। সঞ্চয়িতা সম্পাদনকালে এই মনোভাবই প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকা এই কথারই পুনরুক্তি মাত্র।

৩ "যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যাসংগীতকেও বাদ দিতাম।• •দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যভাণ্ডারে আবর্জনা• •যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে বিদায় করা কঠিন।"—১৯১৫ সালের ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকা।

প্রতি অবিচার করা হইবে। একই কালে বিচিত্র রসের সম্ভোগ ও বিচিত্র সুর সাধনা মহত্ত্বের পরিচায়ক; রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, যখন সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছিলেন তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। সন্ধ্যা-সংগীতের কয়েকটি কবিতা ও বিবিধ প্রসঙ্গের রচনাগুলি একই কালে রচিত। রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডভাবে কেবল সন্ধ্যা-সংগীতের দুঃখবাদী কবি বলিয়া দেখিলে সত্যদৃষ্টির অভাব হইবে; স্রষ্টাকে সমগ্রভাবে দেখিলেই তাহার সত্য রূপটি দেখা যাইবে। তাই তাঁহার বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। আমরা যে যুগের কথা আলোচনা করিতেছি তখন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটা সুষ্ঠু মানসূচী সর্ববাদী স্বীকৃতি লাভ করে নাই। প্রাচীন কবিতা কী, নূতন কবিতা কী, যথার্থ কবিতার স্বরূপ কী, কবি কে, কাব্য বস্তুগত না ভাবগত প্রভৃতি বিচিত্র প্রশ্ন বাংলার সমসাময়িক লেখক ও পাঠকের চিত্তকে উত্তেজিত রাখিয়াছিল। বঙ্গদর্শন বাংলা সাময়িক সাহিত্যের একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। বঙ্কিমের প্রেরণায় ইহাতে আলোচনা হয় নাই এমন বিষয় ছিল না। এমনকি কবি ও কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধেও ঐ পত্রিকায় বিস্তর আলোচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনের ১২৮২ সালের পৌষ মাসে 'বাঙ্গালি কবি কেন'[১] -শীর্ষক প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ এতকাল পরে নিম্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উক্ত প্রবন্ধের লেখক যে তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বাঙালির ন্যুব্জ দেহের ও কুঞ্চিত মনের সমালোচনা, লেখকের নাম নাই, কিন্তু প্রবন্ধটির মধ্যে অনেক কঠিন কথা বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সেই প্রবন্ধটির সমগ্র অর্থ গ্রহণ না করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমগ্র রচনা হইতে কয়েকটি বাক্য পৃথক করিয়া লইলে সমালোচনার খোরাক মিলিতে পারে। সেইরূপ বাক্য হইতেছে— "কবিত্বের প্রধান উপকরণ অনুভাবকতা এবং কল্পনা। অনুভাবকতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে-কেহ কোনো ভাবের বেগ ভাবের তরঙ্গ হৃদয়-মধ্যে অনুভব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে-কেহ ভালোবাসিয়াছেন অথবা ঘৃণা করিয়াছেন তিনিই কবি।"· ·"আবার অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য। বাঙালি অশিক্ষিত, অপরিমার্জিত-বুদ্ধি, কুসংস্কারান্ধ, সুতরাং বাঙালির কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙালি কবি।"

রবীন্দ্রনাথের মনে হইল ইহা বাক্‌চাতুরী বা সফিস্ট্রি; সুতরাং সমালোচনাযোগ্য। 'বাঙ্গালি কবি নয়' ও 'বাঙ্গালি কবি নয় কেন'[২] প্রবন্ধদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধের ভূমিকায় লিখিলেন, "একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি।· · কবি শব্দের ঐরূপ অতিবিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাসান হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমনকি নীরব-কবি বলিয়া একটা কথা বাহির হইয়া গিয়াছে।" "অনেকে বলেন সমস্ত মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ কবি, ও বালকেরা অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি।" রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের লেখকের মত খণ্ডন করিয়া এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন যে বাঙালি কবি নয়। "কেহ কেহ যদি এমন করিয়া প্রমাণ করিতে বসেন যে, সমুদয় মনুষ্যই কবি, বাঙালি মনুষ্য, অতএব বাঙালি কবি; অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি, বাঙালি অশিক্ষিত, অতএব বাঙালি বিশেষরূপে কবি— তবে তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিতান্ত অপ্রামাণ্য।"

রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলাভাষায় খুব কম কবিতা আছে যাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। "কয়টি বাঙলা কাব্যে এমন কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যেন কল্পনার ক্রীড়াস্থল?· ·কোনো বাঙলা কাব্যে

১ বাঙ্গালি কবি কেন, বঙ্গদর্শন ১২৮২ পৌষ।

২ বাঙ্গালি কবি নয়, ভারতী ১২৮৭ ভাদ্র পৃ, ২১৯-২২৯ : বাঙ্গালি কবি নয় কেন ১২৮৭ আশ্বিন পৃ. ২৫৭-২৭৫। দ্র' সমালোচনা (১২৯৪) নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২ পৃ. ৭৯-৮৬।

কি মনুষ্য-চরিত্রের আদর্শ চিত্রিত দেখিয়াছ?" অতঃপর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যদ্বয়ের তুলনা করিয়া বলিলেন, "কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে", "ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কাহারো মনে কখনো মহান্ ভাব বা যথার্থ সুন্দর ভাবের উদয় হয় নাই।"

তৎকালীন আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশি আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে লিখিলেন, "আধুনিক বঙ্গ-কবিতায় মানুষের নানাবিধ মনোবৃত্তির ক্রীড়া দেখা যায় না। বিরোধী মনোবৃত্তির সংগ্রাম দেখা যায় না। মহান্ ভাব তো নাইই। হৃদয়ের কতকগুলি ভাসা ভাসা ভাব লইয়া কবিতা।" এইসব যুক্তি দেখাইয়া তরুণ লেখক বলিলেন, "কি করিয়া বলি বাঙালি কবি।" এই প্রবন্ধে তিনি আর-একটি যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা রূঢ় সত্য— "উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত সুশিক্ষিত এবং উচ্চশ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে।" মার্লোর[১] Come, live with me and be my love কবিতাটির তর্জমা ও তৎপরে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে কবিতাটির ত্রুটি কোন্খানে। 'বাঙালি কবি নয়' প্রবন্ধটি পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিয়া— 'সমালোচনা' গ্রন্থে (১২৯৪) 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' নামে প্রকাশ করেন। সেইখানে খুব স্পষ্ট করিয়া বলেন যে কল্পনা অন্তরে থাকিলেই কবি হয় না, প্রকাশধর্মে কবিত্ব সার্থকতা লাভ করে; সুতরাং নীরব কবি কথাটি নিরর্থক।

বহু বৎসর পরে একটি পত্রে এই নীরব কবি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "নীরব কবি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাকতে পারে, কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিসটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা ব'লে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্য বলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজনক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জাম মাত্র। কারও বা ভাষা আছে, কারও বা অনুভাব আছে, কারও বা ভাষা এবং অনুভাব দুই আছে, কিন্তু আর-একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনীশক্তি আছে— এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হতে পারেন, সরবও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্বদাই তাদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।"[২]

'বাঙ্গালি কবি নয় কেন' এ প্রশ্নও তাঁহার মনে উদয় হয়; তাঁহার মতে কাব্য মানুষের সমস্ত জীবনের সাধনা। বাঙালির জীবন পঙ্গু বলিয়া সে কাব্যসাধনায় দুর্বল; পৃথিবীর যত বড় বড় কাজ হইয়াছে সকলই কল্পনার প্রসাদে। বৈজ্ঞানিক সাধনার মধ্যে কল্পনা আছে, কাল্পনিকতা নাই; মনের সেই প্রসারতা আছে বলিয়া য়ুরোপীয়রা বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কবি। "যে দেশে শেক্স্পীয়র জন্মিয়াছে, সেই দেশেই নিউটন জন্মিয়াছে, যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান দর্শনের চর্চা, সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব; ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে কল্পনার কাজ কেবলমাত্র কবিতাসৃজন করা নয়। যে দেশে কাল্পনিক লোক বিস্তর আছে সে দেশের লোকেরা যদি কবি হয়, দার্শনিক হয়, বৈজ্ঞানিক হয়— সকলি হয়। বাঙালি বৈজ্ঞানিক নয়, বাঙালি দার্শনিক নয়, বাঙালি কবিও নয়।"

রবীন্দ্রনাথ যখন এই অংশ লিখিয়াছিলেন তখন ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য ছিল। বাঙালির মনস্বী জীবনের

১ Marlow Christopher (1564-1593) "In addition to his plays he wrote some short poems of which the best known is 'Come, live with me and be my love'.—*Dictionary of English Literature*. Everyman. p. 259.

২ ছিন্নপত্র। সাজাদপুর, ৩০ আষাঢ় ১৩০০ [১৮৯৩ জুলাই ১৩]

ইতিহাসে দেখা যায় যে বাঙালি একদিন দার্শনিকও ছিল, কবিও ছিল। বাংলার পণ্ডিতেরা যেমন ন্যায় মীমাংসা স্মৃতি প্রভৃতির চর্চা করিয়া ভারতের বুধমণ্ডলী হইতে প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন, তেমনি তথাকার রসের সাধকগণ অমর কাব্যসাহিত্য সৃষ্টি করিয়া অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন। কালে বাঙালি-জীবনের সেই সৃজনী শক্তির অবসান হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের 'বাঙ্গালি কবি কেন' প্রবন্ধের লেখকও এই কথাটি বলিয়াছিলেন। পুনরায় উনবিংশ শতাব্দীতে মনীষার বিচিত্র শক্তি দেখা দিলে কাব্যপ্রতিভাও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইল।

বাঙালি যে কেন দর্শনশাস্ত্রে নিজ প্রতিভার স্ফুরণ করিতে পারিতেছে না, কাব্যসৃষ্টিতেও তাহার সুস্থ মৌলিকতা দেখাইতে অক্ষম— তাহার বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "স্বাভাবিক আলস্য, স্বাভাবিক নির্জীব ভাব, সকল বিষয়ে বৈরাগ্য, ইহারাই বাঙ্গালিকে মানুষ হইতে দিতেছে না। আমরা সকল দ্রব্যই অর্ধেক চক্ষু মুদিয়া দেখি। আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত অল্প।"··"বাহ্য প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের কবিতাতে স্পষ্টই লক্ষিত হয়।" পশ্চিমের মানবসমাজে নিরন্তর যে-সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই 'অনবরত সমুদ্রমন্থনে মহা মহা ব্যক্তিদের উৎপত্তি হয়'। আর আমাদের দেশে বাঙালির বৈচিত্র্যহীন জীবনে স্বচ্ছ আনন্দ নাই, সংগ্রাম নাই, তাই এখানে সব জিনিস সংকুচিত, কুব্জ। "এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান্ চরিত্র-চিত্রই বা কোথায় থাকিবে। আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কিরূপে বর্ণিত হইবে।"

বাঙালির ন্যুব্জ দেহের মধ্যে যে প্রাণবস্তু আছে তাহা কুঞ্চিত, সংকুচিত। নবীন কবিরা যেসব কবিতা লেখেন তাহাও প্রাণহীন; তাঁহাদের মধ্যে অকারণ কষ্ট নামে একটা রোগ দেখা দিয়াছে। "বাহিরের কোনো দুর্ঘটনা হইতে ইহার জন্ম নহে।" কাব্যের মধ্য দিয়া দুঃখ ভোগ করিতে তাহাদের ভালো লাগে এই তাহাদের সান্ত্বনা। রবীন্দ্রনাথ এই অহেতুকী দুঃখভোগীদের মর্মকথা বিশ্লেষণ করিয়া 'অকারণ কষ্ট'[১] নামে প্রবন্ধ লেখেন; কয়েক মাস পরে প্রকাশিত 'যথার্থ দোসরে'র[২] সহিত একত্র এইটি পাঠ করিলে এই দুঃখবাদের প্রতি কবির মনোভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। তবে 'অকারণ কষ্টে'র মধ্যে যে-শ্লেষ আছে তাহা দ্বিতীয় প্রবন্ধে নাই। এই অকারণ দুঃখভোগীদের মনের কথা বাইরনের এক কবিতা হইতে অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—

যদিও বা ত্যজি বিরামের আশা
যখন গভীর রাতি,
হাসি-আলাপেতে থাকি নিমগন
আমোদে-প্রমোদে মাতি।
তবু সে ভগ্ন প্রাসাদের মতো
লতায়-পাতায় পোরা,
বাহিরেতে তার হরিৎ নবীন
ভিতরেতে ভাঙাচোরা।[৩]

তরুণ কবির মতে এইসব লেখক নিজে জানিতে চায় যে তাহারা দুঃখী। রবীন্দ্রনাথ যখন এই প্রবন্ধ লেখেন— অর্থাৎ বাল্মীকি প্রতিভা রচনার আনন্দে ও উত্তেজনায় নিমগ্ন— তখন নিজে জানিতেন না যে তিনি অচিরে সন্ধ্যাসংগীতে সেই 'দুঃখের আবাহন' করিবেন। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

১ অকারণ কষ্ট, ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন, পৃ. ২৮৭-২৯১।
২ যথার্থ দোসর, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৭৮-৮৫।
৩ ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন, পৃ. ২৮৯।

আমরা ইতিপূর্বে সন্ধ্যাসংগীতের কবিতা রচনার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছি; রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবিতার সূত্রপাত এইখান হইতে। কিছুকাল হইতেই কবি হিসাবে কাব্যজিজ্ঞাসা মনে জাগিতেছে। নিজের কাব্যরীতিতে নূতনের যে-প্রেরণা পাইতেছেন তাহার সহিত প্রাচীনের পার্থক্য নিতান্ত স্বল্প নহে। কবিতার মধ্যে কতকগুলি বস্তুগত বা sensuous বা realistic, আর কতকগুলি spiritual বা emotional বা ভাবগত। তরুণ কবির সমস্যা— কবিতা বস্তুগত না ভাবগত। নিজের সঙ্গে নিজের বুঝাপড়ার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি বলেন, "ভাবগত কবিতা আর কিছুই নয়, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদয় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।" এই কথাটিকে আরো স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "ভাবগত কবিতায় হৃদয়ের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে মনকে আর-এক জগতে লইয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের সহিত সে জগতের সাদৃশ্য থাকুক বা না থাকুক সে জগৎ সত্য জগৎ, অলীক জগৎ নহে।"··"আমাদের দুইটি জগৎ আছে। এক জগতে আমরা বাস করি, আর-এক অদৃশ্য জগৎ আমাদের সঙ্গেসঙ্গেই আছে। সে জগতের নাম আদর্শ জগৎ।··সেই আদর্শ জগতের জন্য ভাবের জগতের জন্যই কবিতাকে নিযুক্ত করা হউক।··যেমন কবিতার ভাষা চলিত ভাষা নহে, তেমনি কবিতার বিষয়ও চলিত বিষয় নহে। কবিতার সমস্তই দূরের দ্রব্য, আমরা তাহার আভাসমাত্র পাই, কিয়দংশ মাত্র দেখিতে পারি।"

লেখকের মনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখাইবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধের আরম্ভ হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। "চারিদিকে লোকজন, চারিদিকেই হাটবাজার, সদাসর্বদাই কাজকর্ম, বিষয়-আশয়ের চিন্তা। সম্মুখে দেনাদার, পশ্চাতে পাওনাদার, দক্ষিণে বিষয়কর্ম, বামে লোক-লৌকিকতা, পদতলে গতকল্যের খরচ, মাথার উপরে আগামীকল্যের জন্য জমা। যে-দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি— পৃথিবীর মৃত্তিকা; দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ; স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ; আরম্ভ, স্থিতি ও অবসান। মানুষের মন কোথায় গিয়া বিশ্রাম করিবে? এমন ঠাঁই কোথায় মিলিবে, যেখানে জড়দেহ পোষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা নাই, এক মুঠো আহারের জন্য লক্ষ লক্ষ আকৃতিধারীর কোলাহল নাই, যেখানকার ভূমি ও অধিবাসী মাটি ও মাংসে নির্মিত নয়; অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা আমরা যে অবস্থার মধ্যে নিমগ্ন থাকি, সে অবস্থা হইতে আমরা বিরাম চাই। কোথায় যাইব!"[১]

এখন, যুবক সাহিত্যিকের মনে এই প্রশ্ন উঠে কবিতার বিষয়বস্তু কি এবং সেই বস্তু কি শাশ্বত— তাহার কি পরিবর্তন হয় না। রবীন্দ্রনাথ কাব্য সম্বন্ধে নূতন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন; সে অনুভূতির সহিত পারিপার্শ্বিকের যোগ কোথায়? তাই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কাব্যসৃষ্টিতে আদর্শের পরিবর্তন হয় কি না।

গত কয়েক বৎসর য়ুরোপীয় সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করায়, সাহিত্যের সৌন্দর্য ও রসবোধ পরিমার্জিত এবং বিশ্লেষণী শক্তি সুতীব্র হইয়াছে। তাঁহার এই মনের মুক্তির জন্য একমাত্র ইংরেজি কাব্যসাহিত্যই দায়ী নহে, গদ্যসাহিত্যও দায়ী। তাঁহার বন্ধু প্রিয়নাথ সেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের নানা গ্রন্থের সন্ধান দিয়া ও সরবরাহ করিয়া যুবক কবির মনকে সুপুষ্ট করিতেছেন। ইংরেজ সাহিত্যিক সমালোচক ও ঐতিহাসিক ছাড়া সে যুগে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে যাঁহাদের রচনার ও চিন্তার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা হইতেছেন হার্বার্ট স্পেনসার ও টমাস হাক্স্‌লি। বিলাতে বাসকালে স্পেনসারের সদ্য প্রকাশিত *Data of Ethics* (1879 June) যে তিনি পড়িয়াছিলেন তাহা আমরা জানি জীবনস্মৃতি হইতে। দেশে ফিরিয়াও নানা গদ্যপ্রবন্ধের মধ্যে স্পেনসারের মতামত প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতনাট্য রচনার প্রেরণা পান

১ বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা, ভারতী ১২৮৮ বৈশাখ, পৃ. ১৮-২১। সমালোচনা ১২৯৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ৯২।

তাঁহারই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া। এমনকি স্পেনসারের যে মত জাগতিক সর্ব ব্যাপারের মধ্যে অভিব্যক্তিবাদ সংজ্ঞায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন'[১] শীর্ষক আলোচনার মধ্যে ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার আসল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে "সভ্যতার সমস্ত অঙ্গে যেরূপ পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, কবিতার অঙ্গেও সেইরূপ পরিবর্তন হইবে।" সভ্যতার সহিত রুচির পরিবর্তন হয়, রসবোধের মানস্থচীর স্থানচ্যুতি হয়, কবিতার সুর রূপ ও রীতিতে বিপ্লবের বন্যা আসে। সেই কথা যে কত সত্য তাহা সাম্প্রতিক কবিতার রূপ দেখিলেই বুঝা যায়।

পূর্বের একটি প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছিলেন যে, মহাকাব্য-রচনার কাল চলিয়া গিয়াছে; প্রবন্ধটি সেই কথা দিয়াই শুরু করেন। এই প্রবন্ধে মহাকাব্যের সহিত গীতিকাব্য ও খণ্ডকাব্যের ভেদ লইয়া আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে; মহাকাব্যে নানা ঘটনার নানা চরিত্রের নানা বিভিন্ন অনুভাবের সমাবেশ হয়। কিন্তু গীতিকাব্যে ও খণ্ডকাব্যে একটি কি দুইটি চরিত্র, একটি কি দুইটি ঘটনা, একটি কি দুইটি অনুভাব মাত্র ঘনীভূত হইতে থাকে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি আবার কবির নিজের ভাব নিজের কথা মাত্র। ইহা প্রায় দেখা যায়, যে সময় মহাকাব্যের সময় সে সময় খণ্ডকাব্যের সময় নহে। বাল্মীকি-ব্যাসের সময়ে কলিদাস জন্মগ্রহণ করেন নাই।··যখন জটিল, লীলাময়, গাঢ়, বিচিত্র, বেগবান মনোবৃত্তিসকল সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত, ঘটনা-বৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন আর মহাকাব্যে পোষায় না।··তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়।" সাহিত্যের ক্রমবিকাশে দেখা যায় যে আদিযুগে "ছাড়া ছাড়া বিশৃঙ্খল অস্ফুট গীতোচ্ছ্বাস, পরে পুঞ্জীভূত মহাকাব্য, তাহার পরে বিচ্ছিন্ন পরিস্ফুট গীতসমূহ।" রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে স্বয়ং সন্ধ্যাসংগীতের গীতিকাব্য রচনায় মগ্ন; নিজের মধ্যে গীতোচ্ছ্বাসের প্রেরণা আজ পরিস্ফুট সংগীত বা লিরিকে মূর্তিলাভ করিতেছে, এই প্রবন্ধ তাহারই সমর্থনে যেন লিখিত। গীতিকবিতা মানুষের হৃদয়ের ভাষার ন্যায় সর্বজনীন অর্থাৎ জাতিগত বা যুগগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে সর্বদেশের সর্বকালের সর্বভাষার গীতিকাব্যের রূপ চিত্রকলার ন্যায় শাশ্বত। সেইজন্য জগতের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা পৌরাণিকতা -নিরপেক্ষ সৃষ্টি; সেইজন্য ধর্মতত্ত্ব বা দেবতত্ত্বের প্রভাব যে কবিতার উপর প্রবল, তাহা কখনোই শ্রেষ্ঠ কবিতা হইতে পারে নাই। সেইজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের ধর্মীয় কবিতাগুলির (Theological Poems) সাহিত্যে সমাদর লাভ করে নাই। পরম্পরাগত ধর্মমতের বিরুদ্ধে যাঁহারা বিপ্লবের বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কণ্ঠ এখনও শোনা যায়। সুতরাং বিদ্রোহেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও বিদ্রোহেই নূতন সৃষ্টির উদ্‌বোধন হয়। তাহা না হইলে কবিতা যুগযুগান্তরের পুনরাবৃত্তি হইত।

রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা সকল দিক হইতে প্রাচীন বা গতানুগতিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ কেবল ছন্দে নহে ভাষায় নহে, মানুষের মূলগত ধর্মবিশ্বাস ও ভগবৎ-কল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখনও তাহা তেমন স্পষ্ট হয় নাই। জীবনস্মৃতিতে একস্থানে লিখিয়াছেন, "যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না— আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।"

কিন্তু সমসাময়িক রচনা হইতে তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ সায় পায় না। ধর্মসাধনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা পালন করিবার বয়স কবির হয় নাই; কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা তিনি কি ভাবে করিলেন, তাহা জীবনের ঘটনাবলী ও সাহিত্যের রচনাবলীর মধ্য হইতে আবিষ্কার করা কঠিন। তবে

১ ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ, পৃ ১৪৯-১৫৫। দ্র. সমালোচনা পৃ. ৮১; রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত ২, পৃ. ১০৫-১১০।

এ কথা সত্য কবি রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ব্রাহ্মসমাজের creedএর দ্বারা সীমায়িত ঈশ্বরজ্ঞান হইতে অন্যরূপ, কারণ তিনি বিশ্বসৃষ্টিকে দেখিতেন আর্টের দৃষ্টিতে, কবির চোখে; বোধ হয় সেই অর্থে তিনি ধর্মসাধনা শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের creedএর অনুরূপ। 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি'[১] শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি আদি সমাজের মতকেই সমর্থন ও প্রকারান্তরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণাকে 'খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরে'র উপাসনা বলিয়া নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে স্পষ্টত না হউক প্রচ্ছন্নভাবে যে অদ্বৈতবাদ ছিল তাহা তিনি স্বীকার করেন—"জগৎ ও পরমাত্মা একই কি না ইহা লইয়া আমাদের ভারতবর্ষীয় কবি ও দার্শনিকদের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পরিশেষে আমাদের দেশে অদ্বৈতবাদ মতেরই জয় লাভ হইয়াছে।" "সম্প্রতি ইংলণ্ডে কবিগণ অদ্বৈতবাদের প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন এবং এতদিনে খ্রীষ্টধর্মের যথার্থ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ প্রচার করিবার ভার দার্শনিকদের নহে, কবিদের। বর্তমান কবিরা খ্রীষ্টীয় পৌত্তলিকতা পরিহার পূর্বক যথার্থ নিরাকারবাদ প্রচলিত করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন।" আধুনিক ইংরেজ কবিদের মধ্যে শেলী অখ্রীষ্টীয় অদ্বৈতমতকে তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। ইংরেজের পরম্পরাগত মতধারার বিরুদ্ধে শেলীর বিদ্রোহঘোষণা ইংরেজি সাহিত্যের একটি সুপরিচিত ঘটনা।[২]

রাজকবি টেনিসন (৭২) নূতন মতবাদকে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেন; ম্যাথ্যু আর্নলড[৩] (৫৯) সমর্থন করেন। এমনকি উত্তম খ্রীষ্টান বলিয়া যাঁহার সুনাম ছিল সেই রবার্ট বুকাননের (৩০) কবিতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে "এরূপ বর্বর পৌত্তলিকতা কতদিন তিষ্ঠিবে? ঈশ্বরের এরূপ অপূর্ণ হীন আদর্শ মানুষের নীতিগত প্রকৃতিকে যে নিতান্ত অবনত করিয়া রাখে! কবিরা ভবিষ্যৎ শতাব্দীর কাজ অগ্র হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।"

বিশ বৎসর বয়সে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় সত্য হইয়াছে। গত সাত-আট দশকের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা কবিদের হাতে নূতন রূপ লইয়াছে এবং তাঁহারই মহিমা নানাভাবে, এমনকি অস্বীকৃতির মধ্য দিয়া, প্রচারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই নূতন ধাতুতে গঠিত বলিয়া তাঁহার সহিত প্রাচীনের ছেদটা খুবই স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ হইতে নূতন চিন্তাধারার সূচনা, নূতন কবিতার জন্ম।

আমরা এতক্ষণ যে-কয়টি প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, সেগুলি সাহিত্যজিজ্ঞাসার প্রথম প্রয়াস মাত্র—মোটামুটিভাবে সাহিত্যের লক্ষণ ও গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনা। কিন্তু বাংলা কাব্য সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি যে

১ ভারতী, ১২৮৮ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩৫৫-৬৪।

২ রবীন্দ্রনাথ যে-তিনজন কবির নাম করিতেছেন তাঁহারা সকলেই সমসাময়িক জীবিত কবি: টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২); ম্যাথ্যু আর্নলড (১৮২২-১৮৮৮); বুকানন (১৮৪১-১৯০১); রবার্ট বুকানন আজ বিস্মৃত।

"Yet whatever may have been the limitations of Tennyson's mind it was with thought that he became increasingly occupied, and in *In Memoriam* (1850), possibly the most effective of his longer poems, he gave a poignant expression to that mood of *uncertainty in faith which is to be discovered so often among the contemporaries.*" ইটালিক লেখকের। Chambers's Encyclopaedia. Article, English Literature. Vol. V, p. 336.

৩ ম্যাথ্যু আর্নলড সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মত: "Like so many others in the 19th century he was restless over all matters of belief, and though his prose achieved a new synthesis which satisfied his intellect his poetry shows that he was still *emotionally discontented.*" Chambers's Encyclopaedia. Article, English literature. Vol. V, p. 337.

মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা আরও বিস্মিত হই। বৈষ্ণবপদাবলী ও পদকর্তাদের সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম সমালোচনা ইতিপূর্বে বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের নামে গ্রন্থমালার অন্তর্গত 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার; বালককালে রবীন্দ্রনাথ সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবপদাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারতীর পৃষ্ঠায়[১] রবীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে কয়েক মাস পত্রিকার পাতায় উত্তর-প্রত্যুত্তরের বেশ একটু ঝড় বহিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় বীতশ্রদ্ধ দাম্ভিকতা ছিল না। এই রচনায় সম্পাদকের ভুল দর্শাইয়া সমালোচকের কর্তব্য তিনি শেষ করেন নাই, প্রাচীন কাব্য সম্পাদন করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে সম্পাদকের অবহিত হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে তরুণ লেখক যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। সম্পাদনকার্যে যে-কয়টি দোষ পরিহার্য তাহা এই: ১. ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ অর্থ ব্যাখ্যা ২. স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা ৩. সহজ শ্লোকে প্যাঁচালো অর্থ ব্যাখ্যা ৪. দুরূহ শ্লোক দেখিয়া মৌন থাকা ৫. সংশয়ের স্থলে নিঃসংশয় ভাব দেখানো। আমরা যে-যুগের কথা আলোচনা করিতেছি, তখনও বাংলাভাষার প্রাচীন শব্দসমন্বিত অভিধান সংকলিত হয় নাই। বাংলাভাষার উল্লেখযোগ্য একমাত্র অভিধান ছিল 'প্রকৃতিবাদ অভিধান'। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য শ্রমসাধনার ফলে বহু দুরূহ শব্দের অর্থোদ্ঘাটন সম্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জন্মকবি, তিনি জানেন ভাষা ও শব্দগত বিচারের দ্বারা বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য ও রস গ্রহণ করা যায় না। তাই 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' কাব্যসমালোচনায় বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বের মানসূচী প্রয়োগ করিলেন। কবিত্বের সংজ্ঞা দান করিতে গিয়া তিনি লিখিলেন, "নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।" এই সংজ্ঞা নির্ভুল হইল কি না, সে বিচারভার আমাদের উপর নহে; তবে নবীন লেখক স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে সহজ কথায় সহজ ভাবের উদ্‌বোধনে হইতেছে সত্যসাধক কবির সার্থকতা। চণ্ডীদাসের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ মহাকবির তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও এই প্রবন্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন, "বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে-বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন।" "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি উপভোগের কবি চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতি অনুরাগ। তিনি সুখের চোখেও অশ্রুজল দেখিতে পান। তাঁহার প্রেম, 'কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা', তাঁহার কাছে শ্যাম যে-মুরলী বাজান তাহাও বিষামৃতে একত্র করিয়া।"[২]

এই তুলনামূলক প্রবন্ধের উপসংহারে তরুণ কবি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সন্ধ্যাসংগীতের কবিতারই একপ্রকার মর্ম ব্যাখ্যা; সন্ধ্যাসংগীতে কবির চিত্ত যে-প্রেমের জন্য লালায়িত, যাহার জন্য দুঃখকে বরণ করিতে প্রস্তুত, সেই প্রেমই ভবিষ্যৎ জগতে স্বীকৃতি লাভ করিবে— ইহাই ছিল কবির প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, আরো দশ বৎসর

১ প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (বিদ্যাপতি), ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ, পৃ ১৭৪-৮৪। উত্তর-প্রত্যুত্তর, ভারতী ১২৮৮ ভাদ্র, পৃ ২২১-২৯; বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট, ঐ কার্তিক, পৃ ৩৪০।

২ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, ভারতী ১২৮৮ ফাল্গুন, পৃ. ৫১৬। সমালোচনা (১২৯৪) পৃ. ৯০। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ১১০-২১।

পরে 'সাধনা' পত্রিকায় 'বিদ্যাপতির রাধিকা'[১] শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথ যখন এই প্রবন্ধটি লেখেন, তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। তিনি বলিতেছেন, "গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের দাহ, প্রেমের আলোক। ছন্দ সংগীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্যসুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা। চণ্ডীদাসের মতো সুখে দুঃখে বিরহে মিলনে জড়িত হইয়া যায় নাই। বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।"

বৈষ্ণব কবিদের রচনা লইয়া তুলনামূলক আলোচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাচার্যগণের পথ অনুসরণ করেন। বহুকাল পূর্বে জগবন্ধু ভদ্র 'মহাজন পদাবলী'র ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক সমালোচনা করেন; বাংলায় বোধ হয় ইহাই এতদ্জাতীয় প্রথম আলোচনা; ভদ্র মহাশয়ের রচনা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল: "অন্যের আনন্দ উৎপাদন করা বিদ্যাপতির অভিপ্রায় ছিল। চণ্ডীদাস স্বয়ং আনন্দে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতা সমুদ্রগর্ভনিহিত অমূল্য রত্ন, চণ্ডীদাসের কবিতা সরসী-উরসে ভাসমানা সৌরভময়ী সরোজিনী সদৃশ"[২]। বঙ্কিমচন্দ্রও এই শ্রেণীর তুলনামূলক আলোচনা করেন জয়দেব ও বিদ্যাপতির মধ্যে। বঙ্কিমের তুলনাপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়; কারণ রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমকেই অনুগমন করেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিম লিখিতেছেন: "জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে-প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। বিদ্যাপতি মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার কবিতা ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য বিলাসশূন্য পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।"[৩]

বঙ্কিম যেমন জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক আলোনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী তুলনা করিলেন। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে ব্যবধান প্রায় আঠারো বৎসরের। দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক; বঙ্কিম বিদ্যাপতিকে বর্ষার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ করিতেছেন বসন্তের সহিত। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে উভয় সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে-পার্থক্য রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে একজন আধুনিক লেখক বলিতেছেন, "বঙ্কিমের মানসিক কাঠামো যুক্তিপ্রধান, রবীন্দ্রনাথের আবেগপ্রধান; বঙ্কিম বিদ্যাপতিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখেছেন আবেগের আয়নায়।"[৪] বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত রবীন্দ্রনাথের মিল কখনই হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ জন্মকবি; তাঁহার কাব্যবিচারের আদর্শ ও পদ্ধতি যে-মার্জিত রসবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বঙ্কিমী রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে রবীন্দ্রনাথ এখন পর্যন্ত বঙ্কিমের ভাষা ভাবধারা প্রকাশভঙ্গিকে অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করিয়া অসিতেছেন, কারণ সেযুগে বঙ্কিম

১ বিদ্যাপতির রাধিকা, সাধনা ১২৯৮ চৈত্র। দ্র. আধুনিক সাহিত্য; রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯ম, পৃ. ৪৪১-৪৪৫।

২ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী, পৃ. ২১৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত।

৩ 'মানস বিকাশ' (সমালোচনা), বঙ্গদর্শন ১২৮০ পৌষ, পৃ. ৪০২-৪০৭।

৪ জীবেন্দ্রকুমার গুহ: বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ১৩৫০ আষাঢ়, পৃ. ৭৫১।

অপেক্ষা মহত্তর মনীষী বাংলাদেশে ছিলেন না, যাহাকে রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ করিতে পারিতেন। কাব্যসৃষ্টির ন্যায় গদ্যরচনায় এখনও রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব রীতি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই ; বক্তব্য বিষয়ে সাবলীলতা, ভাষায় প্রবাহমানতা ধীরে ধীরে রূপ লইতেছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন বিশের কোঠায়।

এই বৈষ্ণব-সাহিত্য বিচারের ধারা সম্পূর্ণ হইল বসন্ত রায়[১] প্রবন্ধে। পূর্বোল্লিখিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে' বসন্ত রায়ের পদাবলী ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির সহিত বসন্ত রায়ের তুলনা করিয়া অতি সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত সমালোচনা লিখিলেন। তরুণ কবির চোখে বসন্ত রায় বিদ্যাপতি হইতে সহজ স্বাভাবিক এবং সেইজন্য শ্রেষ্ঠ। "বিদ্যাপতি-রচিত রূপবর্ণনার সহিত বসন্ত রায় -রচিত রূপবর্ণনার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে।··বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রূপ উপভোগ·· বলিয়া সুন্দর ; আর বসন্ত রায় বলিতেছেন, রূপ সুন্দর বলিয়া উপভোগ্য। ইহা সত্য বটে, সৌন্দর্য ও ভোগ একত্রে থাকে, কিন্তু ইহাও সত্য উভয়ে এক নহে।··সৌন্দর্যস্পৃহা হইতেও ভোগ করা যায় এবং ভোগস্পৃহা হইতেও ভোগ করা যায়। যাহার যেমন মনের গঠন। বসন্ত রায় তাঁহার রূপবর্ণনায় যাহা-কিছু সুন্দর তাহাই দেখাইয়াছেন। আর বিদ্যাপতি তাঁহার রূপবর্ণনায় যাহা-কিছু ভোগ্য তাহাই দেখাইয়াছেন।" আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এই রসবিশ্লেষণ য়ুরোপীয় সাহিত্য-বিচারের মানসূচী দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ। বৈষ্ণব-পদাবলী আলোচনাকালেই কি তিনি পুনরায় ভানুসিংহের কবিতা 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান' লিখিয়াছিলেন ?[২]

সতীশচন্দ্র রায় 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'র ভূমিকায় লিখিতেছেন, "পদকর্তা বসন্ত রায়ের ৫১টি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। বসন্ত রায় একজন উচ্চশ্রেণীর কবি। আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই·· প্রথমে বসন্ত রায়ের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার রচনার অপূর্ব ব্যঞ্জনা নির্দেশ করেন।··'ভক্তিরত্নাকরে' বসন্ত রায় নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং তিনি শেষবয়সে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।"

"কৌতুকের বিষয় যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুড়া, কায়স্থকুলজাত বসন্ত রায়কে কেহ কেহ পদকর্তা স্থির করিয়া রাজসভায় গোবিন্দদাস ও বসন্ত রায়ের মধ্যে কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটাইয়া প্রতাপাদিত্য-চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। ইহা যে ভ্রান্ত নামসাদৃশ্যমূলক কবিকল্পনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"[৩]

বউঠাকুরানীর হাট : পূর্বে ও পরে

সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীত রচনার মধ্যভাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত চন্দননগরে মোরান সাহেবের কুঠিতে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বউঠাকুরানীর হাট'[৪] লিখিতে শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস বলিলাম এইজন্য যে ইতিপূর্বে ভারতীতে ক্রমশ-প্রকাশিত 'করুণা' তিনি সম্পূর্ণ করেন নাই ও গ্রন্থকারে উহা কখনও মুদ্রিত হয় নাই।

১ বসন্ত রায়, ভারতী ১২৮৯ শ্রাবণ। সমালোচনা (১২৯৪), পৃ. ১০৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ১২১।

২ ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ, পৃ. ১৯৬। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৯ সংখ্যক।

৩ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড. পৃ. ১৫৮। রবীন্দ্রনাথ বউঠাকুরানীর হাট ও প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থে বসন্ত রায়কে বৈষ্ণব করিয়াছেন ; কিন্তু বৈষ্ণবপদকর্তার সহিত অভিন্ন করেন নাই।

৪ বউঠাকুরানীর হাট, ভারতী ১২৮৮ কার্তিক-১২৮৯ আশ্বিন। গ্রন্থাকারে পৌষ ১৮০৪ শক [১২৮৯। ১১ জানুয়ারি ১৮৮৩]।

বউঠাকুরানীর হাটের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। পূর্বপাকিস্তানের বাখরগঞ্জ জেলা মুঘল যুগে সরকার-বাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল ; তৎপূর্বে এই অঞ্চলের নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। এখনো সরকারী কাগজপত্রে এই পরগণার নাম বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ। দনুজমর্দন দেবের গুরু চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

'বউঠাকুরানীর হাটে'র গল্পাংশ আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন শুরু করেন। কিন্তু তদীয় খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় মুঘলদের সহিত মিত্রতা রক্ষার পক্ষপাতী। ইহাতে প্রতাপ পিতৃব্যের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভা উভয়েই বসন্ত রায়ের অত্যন্ত অনুগত; তজ্জন্যও প্রতাপ তাহার উপর বিরক্ত। উদয়াদিত্য অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির যুবক; যৌবনে রুক্মিণী নামে একটি রমণীকে ভালো বাসিবার ফলে এই উপন্যাসে অনেক কিছু দুঃখের ঘটনা ঘটে। রুক্মিণীই উদয়াদিত্যের পত্নী সুরমাকে গোপনে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। বিভার বিবাহ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সহিত। রামচন্দ্র একদা তাঁহার বিদূষক রমাই ভাঁড়কে স্ত্রীলোক সাজাইয়া শ্বশুরবাড়ির অন্তঃপুরে লইয়া যান। প্রতাপ সেই সংবাদ পাইয়া জামাতাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। উদয়াদিত্যের কৌশলে রামচন্দ্র রায় পলায়ন করিতে সক্ষম হন। এই অপরাধে প্রতাপ পুত্রকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু বসন্ত রায়ের চেষ্টায় কারাগার অগ্নিদগ্ধ হয় ও উদয় মুক্তি পাইয়া দাদামহাশয়ের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন প্রতাপ সৈন্য পাঠাইয়া উদয়কে বন্দী করেন; বসন্ত রায় প্রতাপ-প্রেরিত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। পরে উদয়াদিত্য পিতার নিকট রাজ্যত্যাগের শপথ করিয়া কাশী যাত্রা করেন; বিভাকে পথিমধ্যে তাহার স্বামীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন স্থির করিলেন। তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপের ঘাটে পৌঁছাইয়া জানিতে পারিলেন যে নির্বোধ রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের উপর রাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন। বিভাকে রামচন্দ্র গ্রহণ করিলেন না; তখন উদয় ভগ্নীকে লইয়া কাশী চলিয়া গেলেন। চন্দ্রদ্বীপের যে-বাজারের নিকট বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, সেই বাজার সেই সময় হইতে বউঠাকুরানীর হাট নামে পরিচিত।

বিশ বৎসর বয়সে রচিত 'বউঠাকুরানীর হাট'কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে 'নবেল' বলিয়াছেন। উহা নবেল না রোমান্স সে-সূক্ষ্মবিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। বাংলা উপন্যাস বা নবেলের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে; ইহাও বাংলার অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় য়ুরোপীয় সাহিত্য চর্চার ফলপ্রসূত— অনুকরণ ও অনুবাদে ইহার জন্ম। সামাজিক জীবনের সমস্যা হইতে আধুনিক উপন্যাসের উদ্ভব। কিন্তু উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্কিমপ্রমুখ লেখকগণ যখন উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন তখনও সমাজজীবন তাঁহাদের সমক্ষে তেমন কোনো সমস্যা লইয়া উপস্থিত হয় নাই; তাই সে-যুগের অধিকাংশ লেখকই তাঁহাদের উপন্যাসের জন্য ঐতিহাসিক-অতীত হইতে নায়ক-নায়িকাদের

নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ। দনুজমর্দন দেবের বংশের পুরুষশাখা লুপ্ত হইলে কালে কন্যাবংশীয় বসুশাখায় রাজ্যাধিকার বর্তায়। এই বংশের কন্দর্পনারায়ণ মগদের দৌরাত্ম্যে উপদ্রুত হইয়া কচুয়া ত্যাগ করিয়া মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করেন। মাধবপাশা বরিশাল হইতে সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ গ্রাম।

তিনি প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর নাবালক রামচন্দ্র রাজা হন। জেসুইট পাদরী ফন্‌সেল প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর যাইবার পথে বাকলায় বালক রাজা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন; ফন্‌সেল ইঁহাকে অমায়িক ও বুদ্ধিমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এই রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিমলার বিবাহ হয়; বিবাহের রাত্রে শ্বশুর ও জামাই-এর মধ্যে মনোমালিন্য হইলে রামচন্দ্র বধূকে নিজগ্রামে লইয়া যান নাই। বহুকাল পরে প্রতাপাদিত্যের অনুমতি লইয়া বিমলা অনেকগুলি নৌকায় পিত্রালয়ের বহুবিধ উপহার লইয়া স্বামীর রাজধানী যাত্রা করেন; মাধবপাশার নিকট ঘাটে তিনি নৌকা বাঁধিলেন। আশা করিয়াছিলেন সংবাদ পাইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে লইতে আসিবেন। কিন্তু রামচন্দ্র আসিলেন না; এদিকে রানীকে দেখিবার জন্য রাজ্যের নানাস্থান হইতে প্রজার দল আসিতে লাগিল। দরিদ্র ও ভিক্ষুকগণ বিমলার নিকট বহু অর্থ পাইল; ক্রমে সেইস্থানে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া হাট বসিতে লাগিল এবং ইহাই 'বউঠাকুরানীর হাট' নামে পরিবর্তিত হইল। এইরূপ বহুদিন অতিবাহিত হইলে রামচন্দ্র আসিয়া পত্নীকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। এই কাহিনীকে আংশিকভাবে ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস লিখিত। দ্র. বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১।

সংগ্রহ করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থকে নবেল বলা যায় না, কারণ সেখানে সমস্যা নাই, সমস্যা-সমাধানের চেষ্টাও নাই, সমাজচিত্র ও চরিত্র -অঙ্কনই উদ্দেশ্য। ইংরেজি উপন্যাসের গোড়ার ইতিহাসও অনুরূপ। মানুষের মন কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারিল না; কাব্য যেমন লিরিকধর্মী হইয়া বিবাহেতর ও বিবাহোত্তর প্রেমের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল উপন্যাসও প্রেমের সাহসিকতা -বর্ণনে অগ্রসর হইল। কিন্তু আধুনিক সমাজজীবনে নরনারীর অবাধ প্রেম -বিনিময়ের স্থান অত্যন্ত সংকুচিত; পরম্পরাগত নীতিবোধ ধর্মবোধ শ্রেণীবোধ প্রভৃতি জন্মগত সংস্কার লেখকগণের লেখনীকে সংযত রাখিত। সেইজন্য তাঁহারা আধুনিক সমাজজীবন হইতে ঘটনা ও পাত্রপাত্রী সংগ্রহ না করিয়া অতীত যুগের মধ্যে কাহিনীর সন্ধানে যাত্রা করিলেন। স্কট তাহার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই এই ধারার পথপ্রদর্শক ও দুর্গেশনন্দিনী এই নূতন রীতির প্রথম উপন্যাস, বঙ্কিমও তাঁহার সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে এই অতীত যুগের নরনারীর হৃদয়ে প্রেমের সংঘাত তুলিয়া উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইংরেজিতে যাহাকে রোমান্স বলে দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি সেই জাতীয় উপন্যাস, বাংলায় ইহাকে বলা যাইতে পারে ঐতিহাসিক উপন্যাস। বউঠাকুরানীর হাট রচিত হইবার মাত্র পনেরো বৎসর পূর্বে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জন্ম; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পূর্বে দীর্ঘকালের ধারাবাহিক আদর্শ বা tradition জমাট বাঁধে নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' ঐতিহাসিক উপন্যাস বা রোমান্স। তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহার বিশ বৎসর বয়সে উহাকে যতদূর পর্যন্ত 'নবেলি' করা সম্ভবপর তাহা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এখানে আমরা 'নবেলি' অর্থে বাস্তব-ঘেষা বুঝিতেছি, যদিও সেই বাস্তব সমসাময়িকের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমরা একটিমাত্র উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি যাহা অত্যন্ত বাস্তব বা নবেলি। উদয়াদিত্য "ভুলিয়া গেলেন যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কি করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, প্রতিদিন তাঁহার পথের সম্মুখে জাল পাতিয়া বসিয়াছিল, আবর্তের মত তাঁহাকে তাহার দুই মোহময় বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মুহূর্তের মধ্যে পাতালের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল— সে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন।" এই বর্ণনাকে কেবল sensuous বলিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না। ইহা অত্যন্ত realistic বা বাস্তব; লেখকের দর্শন শ্রবণ ও অনুভূতি -শক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম না হইলে এই শ্রেণীর বর্ণনা করা কঠিন। সেই দিক হইতে বিচার করিলে 'বউঠাকুরানীর হাটে'র মধ্যে এমন-সব উপাদান আছে, যাহা নবেল-ধর্মী, এবং সেইজন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ইহাকে নবেল বলিয়াছিলেন।

এইবার এই উপন্যাসের ঘটনাপুঞ্জের উৎস কোথায় তদ্‌বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাক। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতেই সমাদৃত হইয়াছিল; ১৮০১ সালে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হয়।[১] ইতঃপূর্বে ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের কাহিনী আশ্রয় করিয়া কবিতায় মানসিংহের উপাখ্যান লেখেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে-গ্রন্থ হইতে তাঁহার প্রেরণা পান সেটি হইতেছে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কৃত 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' (১৮৬৯); এই গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বসন্ত রায় হত্যার পর হইতে তাঁহার ধ্বংস পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপচন্দ্রকে অনুবর্তন করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে না; সমসাময়িক পত্রিকাতে আছে[২] 'The

১ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে একব্বর বাদসাহের আমলে।—রামরাম বসুর রচিত।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০১। The History of Raja Pratapaditya, By *Ram Ram Boshoo*, one of the Pundits in the College of Fort-William. Serampore, Printed at the Mission Press. 1802. দ্র. রামরাম বসু, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬।

২ দ্র, বঙ্গাধিপ-পরাজয়, পরিশিষ্ট পৃ, ৫৩২।

talented author of Bauthakuranir Hat followed out the different incidents of the same story। বঙ্গাধিপের কতকগুলি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে নূতন রূপ লইয়াছে ; বঙ্গাধিপে রমাই যদিও বিদূষক, তথাপি সে বীর ও প্রভুভক্ত, 'বউঠাকুরানীর হাটে'র রামমোহন মালের কতকগুলি গুণ ইহাতে দেখা যায়। বঙ্গাধিপের সরমা এখানে সুরমা হইয়াছে। বঙ্গাধিপে প্রতাপাদিত্য কুচরিত্র দুরাচার দস্যুরূপে বর্ণিত, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কেবলমাত্র দুরাচার মূর্তিতে দেখাইয়াছেন। উনবিংশ শতকে প্রতাপাদিত্য[১] সম্বন্ধে কোনো মোহ বাঙালিকে পাইয়া বসে নাই, কোনো ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ তখনো প্রকাশিত হয় নাই। আকবরের ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে বা মুঘল যুগের শেষ ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'সায়র-উল-মুতাক্ষরীন'এ বঙ্গের এই বীরের উল্লেখ মাত্র নাই দেখিয়া মনে হয় সমসাময়িকরা বা পরবর্তী যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকেরা যশোহরেশ্বরের বিদ্রোহকে লিপিবদ্ধ করিবার মত গুরুতর ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ রচনাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে-সময়কার ইতিহাস-লেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে-সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।"[২]

আধুনিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রই তখন বাঙালির আদর্শ, বাংলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একচ্ছত্র সম্রাট। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯) যখন রচিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত বালক ; বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসের সহিত তাঁহার যে প্রগাঢ় পরিচয় হয় তাহার কথা স্বয়ং তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। বিষবৃক্ষ ইন্দিরা যুগলাঙ্গুরীয় চন্দ্রশেখর রাধারানী রজনী কৃষ্ণকান্তের উইল রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে (১২৭৯-৮২, ১২৮৪-৮৫) প্রকাশিত হয়। কমলাকান্ত ও মুচিরাম গুড় বাহির হয় ১২৮৭ সালের মধ্যে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি লেখকের উপন্যাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় তাঁহার এত দখল হয় নাই যে, তিনি সহজে ইংরেজি নভেল পড়িয়া তাহার রস গ্রহণ করিতে পারেন, সুতরাং বাংলা বইই ছিল তাঁহার মনের প্রধানতম উপজীব্য। তাই লিখিয়াছিলেন, "বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।"

১২৮৭ সাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র যেসব উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুর্গেশনন্দিনী অর্ধ-ঐতিহাসিক রোমান্স, রাজসিংহই যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কোনো গ্রন্থেরই পটভূমি বাংলাদেশে নয়, দুর্গেশনন্দিনীতে প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশ আসিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙালি আসে নাই। 'বউঠাকুরানীর হাটে'র সমসাময়িক রচনা

১ প্রতাপাদিত্যর পূর্বনাম গোপীনাথ, পিতার নাম শ্রীহরি। পাঠান শাসনকর্তা সুলেমানের নিকট হইতে জমিদারী লাভ করিয়া শ্রীহরির উন্নতির আরম্ভ। টোডরমল্লের সহায়তায় আকবরশাহ ইঁহাকে মহারাজ উপাধি দান করেন। তখন শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া মোগলের সামন্তমধ্যে পরিগণিত হন (১৫৭৭ খৃ. অ.)। তিনি স্বীয় পুত্র গোপীনাথকে যুবরাজ করিয়া প্রতাপাদিত্য নাম প্রদান করেন। কৌতূহলী পাঠক সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাস পাঠ করিতে পারেন। রাজমালা গ্রন্থের তৃতীয় লহরে বারো ভূঞাদের সম্বন্ধে আলোচনা কালে সম্পাদক প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্র. শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪।

আনন্দমঠের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের অন্তর্গত হইলেও কৃত্রিম পটভূমিতে উহা চিত্রিত বলিয়া বাংলার যথার্থ রূপ উহাতে ফুটে নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে বাংলাদেশের কোনো আখ্যায়িকা অবলম্বনে উপন্যাস লিখিবার সংকল্প হয় এবং 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে'র প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া তিনি উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বঙ্গাধিপে' বাংলার মধ্যযুগের চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রচনাদোষে তাহা বহুবিস্তারে জটিল ও নীরস হইয়াছে, সমগ্রের ছবি তাহাতে ফুটে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নবীন লেখনী বাংলাদেশের গ্রামের ও গ্রামবাসী নরনারীর যে-চিত্র আঁকিয়াছে তাহা সত্যই আশ্চর্য বলিতে হইবে।

অল্প বয়সের রচনা হইলেও এই উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সুন্দর চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন: ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে বসন্ত রায়। রাজা বসন্ত রায়কে পদকর্তা বসন্ত রায়ের সহিত অভিন্ন করিয়া তিনি এক আদর্শ বৈষ্ণব রাজর্ষি সৃষ্টি করিলেন।[১] 'বউঠাকুরানীর হাটে' বসন্ত রায় সেই বৈষ্ণব-চরিত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। এ-ছাড়া শ্রীকণ্ঠ সিংহের চরিত্র ও চিত্র যে এই সৃষ্টির মধ্যে রূপ লইয়াছে তাহা কবি স্বয়ং বলিয়াছেন। লেখকের অপর আদর্শ-চরিত্র উদয়াদিত্য; এই দুর্বল রাজপুত্রের প্রতি কবির সহানুভূতি সমধিক। উদয়াদিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার পিতা, তদীয় পারিষদগণ, মাতা ও পুরনারীগণ কেহই কোনো আশা পোষণ করিতেন না; পিতার উপযুক্ত পুত্র তিনি নহেন, বংশের মর্যাদা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিতে অপারগ— এই কথাই তাঁহাকে নিত্য শুনিতে হইত। অথচ উদয়াদিত্য লোকপ্রিয়, দরিদ্রের বন্ধু, আদর্শবাদী, প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী। উদয়াদিত্যের প্রতি লেখকের সহানুভূতির কারণ ছিল; লেখক সম্বন্ধেও তাঁহার পিতা ভ্রাতা আত্মীয়বন্ধুর দল অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ যে-সংসারের মধ্যে কাজে-কর্মে, জ্ঞানে-ধর্মে কোনো দিন বড় হইবেন এ-আশা ত্যাগ করিয়া সকলে তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরাজিত হইয়া উদয়াদিত্য যেন পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতের কবির মধ্যে এই বিষাদঘন ছায়া; সমগ্র উপন্যাসের মধ্যেও এই দুঃখবাদ প্রবল।

অর্ধশতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই তরুণ বয়সের রচনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন— সাহিত্য-সমালোচনার দিক হইতে তাহা অতুলনীয়, কারণ নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে এত স্পষ্ট বোধ খুব কম লেখকেরই দেখা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।·· প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গল্পরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারি প্রথম প্রয়াস দেখা দিল 'বউঠাকুরানীর হাট' গল্পে— একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। আজও হয়তো এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়ে নি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে।·· সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে

১ "কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একদা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায় কবি বসন্ত রায় বলিয়া তিনি কোনো কোনো ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছেন।" —কৈলাসচন্দ্র সিংহ, চণ্ডীদাস, বসন্ত রায় ও বিদ্যাপতি; ভারতী ১৮৮৯ আশ্বিন, পৃ. ৩০৯।

পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে— এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন-কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে।· ·তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহ-বাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"[১]

এই উপন্যাস রচনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ ইহার গল্পাংশ আশ্রয় করিয়া 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নাটক রচনা করেন; আরো বিশ বৎসর পর ঐ নাটককে সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) লেখেন। মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত' ভাঙিয়া 'মুক্তধারা' (১৯২২) নামে একখানি নাটক লেখেন। কিন্তু সে যুগে বউঠাকুরানীর হাটের গল্পাংশ লইয়া 'রাজা বসন্ত রায়' নামে নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতা কেদারনাথ চৌধুরী, ইনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহযোগী ছিলেন। গিরিশ-চরিতকার লিখিতেছেন, "এই সময়ে যে-কয়খানি নাটক অভিনীত হয় তন্মধ্যে কেদারনাথ কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বউঠাকুরানীর হাট' খুব জমিয়াছিল। প্রাচীন অভিনেতা স্বর্গীয় রাধামাধব কর বসন্ত রায়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।"[২] হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে (পৃ. ৩৯) বলিয়াছেন যে, ১৮৮৬ জুলাই ৩ তারিখে উহা অভিনীত হয়। ১৯০১ এপ্রিল ৬ তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে ইহার পুনরভিনয় হয় (পৃ. ৫৭)। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন যে, 'বসন্ত রায়' নাটকের গানগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা।

সাহিত্যস্রষ্টা (creator) যুগপৎ সাহিত্য-সমালোচক (critic) হইলে নিজ রচনার সপক্ষে ও সমর্থনে কৈফিয়ত লেখা তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা ও সমালোচক। সৃষ্টি-সৌন্দর্যের একটা সুষ্ঠু মানসূচী তাঁহার ছিল, সেই মানদণ্ডে তাঁহার উপন্যাসের কল্পিত পাত্রপাত্রীদিগকে সাহিত্যের আসরে মর্যাদা দান করিতে পারেন কি না তাহাই তাঁহার বিচারের বিষয়। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে কেন্দ্র করিয়া এই আলোচনা শুরু করিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে 'ভারতী'র প্রথম বর্ষে (১২৮৪) মাইকেলের এই মহৎকাব্যের সমালোচনা দিয়া তাঁহার গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়, এবারেও তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ করিবার জন্য দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন।[৩] যে আঘাত সহ্য করিয়া আহত হয় না আঘাত তাহারই ভূষণ; সুতরাং সাহিত্যের মানসূচী প্রতিষ্ঠা-কল্পে মধুসূদনের রচনাকে আক্রমণস্থলরূপে নির্বাচন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভালোই করিয়াছিলেন; কারণ ক্ষীণপ্রাণ সাহিত্যিকদের উপর রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনাশায়কগুলি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের পক্ষে মারাত্মকই হইত। কিন্তু মধুসূদনের পরিণত প্রাণ রবিকর-পীড়নে ম্লান হইবে না।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন যে, মহাকাব্যের মধ্যে একটি মহৎ ভাব, আদর্শ থাকা চাই, উহা কোনো মহৎ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে সেরূপ কোনো মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় না। সমালোচক বলিলেন যে রাম লক্ষ্মণ নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় বধ করিলেন, ইহা মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের মধ্যে না আছে গৌরব, না আছে বীরত্ব, না আছে মহত্ত্ব। তিনি বলিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বৃত্রসংহারে'র মধ্যে বরং মহাকাব্যের উপাদান আছে, সেখানে মহত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় দধীচির জীবনে, স্বর্গোদ্ধারের জন্য দধীচির অস্থিদান, অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ,

১ সূচনা : বউঠাকুরানীর হাট, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

২ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, পৃ. ৩৩৭ ; প্রবোধচন্দ্র সেন কৃত 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' হইতে উদ্ধৃত।

৩ মেঘনাদবধ কাব্য, ভারতী ১২৮৯ ভাদ্র, পৃ. ২৩৪-২৪০ সমালোচনা (১২৯৪), রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ৭৩-৭৯।

প্রভৃতি মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় বটে। কিন্তু "মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই।" তদুপরি ইহা পাশ্চাত্য কবিদের অনুকরণে লিখিত; পাশ্চাত্য কোনো কবি তাঁহার মহাকাব্যে নরক-বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদন অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে নরকের বর্ণনা জুড়িয়া দিয়াছেন, ইহার সহিত মূল কাব্যের কোনো সম্বন্ধ নাই। গ্রীক মহাকবি হোমারের মহাকাব্যের সূচনা গ্রীক সরস্বতীর বন্দনা দিয়া, কিন্তু মধুসূদনের পক্ষে হিন্দুদের দেবতা সরস্বতীর বন্দনা অত্যন্ত কৃত্রিম। কারণ সরস্বতীর সহিত তাঁহার ধর্মজীবনের কোনোই সম্বন্ধ ছিল না। প্রবন্ধশেষে কবি বলেন মেঘনাদবধ মহাকাব্যই নহে। মোটকথা এবারকার সমালোচনা গতবারের ন্যায় তীব্র না হইলেও যুক্তির দিক হইতে বিশেষভাবে বিচার্য; সে যুগের সমালোচনা-মানসূচীর দৃষ্টিতে এই রচনা সাহিত্যে অপাংক্তেয় হইতে পারে না।

এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে লেখক ট্রাজেডি সম্বন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন; আমাদের মনে হয় তাঁহার উপন্যাস 'বউঠাকুরানীর হাট' ট্রাজেডিধর্মী কি না সে-বিষয়ে মনের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে; তাই পরোক্ষভাবে তাহার সমর্থন খুঁজিতেছেন। মহাভারতের আখ্যায়িকা আলোচনা করিয়া তিনি বলিলেন "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্রাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়।··কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে; ইহাকেই বলে ট্রাজেডি।" 'বিষবৃক্ষ' সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্রাজেডি নহে?··কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্রাজেডি নহে— কুন্দনন্দিনী তো এ ট্রাজেডির উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল। ইহাই ট্রাজেডি।"

বউঠাকুরানীর হাটে সুরমার মৃত্যু ও বসন্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডের দ্বারা ট্রাজেডি হয় নাই; ইহা ট্রাজেডি তখনই, যখন উদয়াদিত্য পিতৃসিংহাসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিজয়দম্ভের মধ্যে যে অসীম শূন্যতা সৃষ্ট হইল ট্রাজেডি সেইখানে। আর নির্বোধ রামচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহের মহোৎসব ক্ষেত্র হইতে সাধ্বী বিভা ফিরিয়া গেলে রামচন্দ্র রায়ের অন্তরের মধ্যে যে গভীর রেখাপাত পড়িল, তাহাই হইতেছে উপন্যাসের যথার্থ ট্রাজেডি। মেঘনাদবধ কাব্য উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ ট্রাজেডি সম্বন্ধে যে-আলোচনা করিলেন তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বউঠাকুরানীর হাট যে ট্রাজেডি তাহারই প্রমাণ সমর্থন।

বঙ্কিমের উপন্যাসই ছিল এই সময়ে গল্পরচনার আদর্শ, শিক্ষিত সমাজের পাঠ্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপন্যাস লিখিয়াছেন, সেইজন্য বঙ্কিমের উপন্যাসকে ক্রিটিকের চক্ষে বিচার করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; প্রায় সমসাময়িক একটি রচনায়[১] তিনি লিখিতেছেন, "বঙ্কিমবাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।··কেহ যদি প্রমাণ করে যে, কোনো একটি ক্ষমতাশালী লেখক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য হই না। কিন্তু কেহ যদি বলে, বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর বা বঙ্কিমবাবুর শেষ-বেলাকার লেখাগুলি অনুকরণ, তবে সে কথা আমরা কানেই আনি না।" রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে মেঘনাদবধ কাব্য প্রবন্ধে বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়াছিলেন।

১ বাউলের গান। সংগীতসংগ্রহ। বাউলের গাথা প্রথম খণ্ড, ভারতী ১২৯০ বৈশাখ। সমালোচনা (১২৯৪) পৃ. ১২২; রবীন্দ্র রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ১৩১।

আমাদের আলোচ্য পর্বে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'[১] বাহির হয় ; এই উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মত তিনি চন্দ্রনাথ বসুকে পত্রযোগে জ্ঞাপন করেন, তাহা তখনো প্রকাশিত হয় নাই। 'আনন্দমঠ' সাহিত্য হিসাবে কবির ভালো লাগে নাই ; তাঁহার মতে বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে individualএর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি চমৎকার সফল হইয়াছেন ; তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন সেইখানে সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ ডাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনো ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। আনন্দমঠের সমস্ত 'আনন্দ'গুলিই যেন এক রকমেরই। একটা প্রকাণ্ড idea যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolutionএর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য, তাহাদের বিচিত্র কর্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নানা শক্তির উন্মেষ যে একটা প্রকাণ্ড আবর্তে পড়িয়া একটা দিকে চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কৈ। কেন তিনি তাঁহার আনন্দগুলিকে বৈশিষ্ট্য দিলেন না।[২]

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে যে সাহিত্যের উদ্‌ভব তাহারও যেমন বিচার প্রয়োজন, খাঁটি বাংলা হৃদয়ের কাব্যে যে-অনাবিল গীতরসধারা যুগযুগান্ত হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে সাহিত্যিকের হস্তে তাহারও সুবিচার প্রয়োজন। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যরসতৃপ্ত বাঙালি শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় সর্বপ্রথম দেশীয় কাব্যের সৌন্দর্য তাঁহার অনবদ্য ভাষা ও অননুকরণীয় রীতিতে প্রকাশ করেন। তথাকথিত ভদ্রেতর গীত ও কাব্যের প্রতি তিনিই বাঙালির মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 'বাউলের গান' নামে সামান্য একখানি গীতসংগ্রহের সমালোচনাসূত্রে তিনি তাঁহার বক্তব্য লিখিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে আধুনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা-কিছু লিখিত হইতেছে তাহার মধ্যে যেন খাঁটি বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; বাঙালি-হৃদয়ের যথার্থ ভাব ও ভাষা আয়ত্ত করাই যদি আমাদের অভিপ্রায় হয়, তবে বাঙালি যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে সেইখানে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি লিখিলেন, "গ্রাম্যগাথা ও প্রচলিত গীতসমূহ সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়। আমরা আমাদের দেশের লোকদের ভালো করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-ভরসা আমাদের নিকট বিশেষ অপরিচিত থাকে না।" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ স্থাপিত হইলে তিনি গ্রাম্য গীত ছড়া ব্রতকথা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য কী চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সমসাময়িক 'সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা' ও 'সাধনা' দেখিলেই জানা যায়। শুধু সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে, এই ভদ্রসমাজ-অজ্ঞাত শিক্ষিত সমাজ-অবজ্ঞাত বিরাট লোকসহিত্যের সাহিত্যিক রসবিচার দ্বারা তিনি সাহিত্যভাণ্ডারে উহার স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সমালোচনাকালে কবি আরও যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে শিক্ষিত সমাজ ক্রমশই দেশের অন্তস্তল হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, দেশ ক্রমশই অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। বৃটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে দেশের মধ্যে শ্রেণীগত (class) বৈষম্য নূতন ভাবে দেখা দিয়াছে। পূর্বকালে দেশের ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচের জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে কম-বেশির মাত্রাগত পার্থক্য ছিল, অর্থাৎ একই বিষয়ে একজন বেশি আর একজন কম জানিত ; এক শ্রেণী একরূপ জানিত, অন্য শ্রেণী অন্যরূপ জানিত— এ ধরণের ব্যবধান ছিল না, যাহাকে বলে conflict of ideas। ইংরেজি-জানা ও ইংরেজি-না-জানা লোকের মধ্যে জ্ঞানসমুদ্রের যে-দুস্তর ব্যবধান দেখা দিয়াছে তাহা পরিমাণগত নহে,

১ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ। ভারতী ১৩২৩ চৈত্র। দ্র. সাহিত্য ১৩২৪ বৈশাখ, পৃ. ৭৪।

২ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ। ভারতী ১৩২৩ চৈত্র। দ্র. সাহিত্য ১৩২৪ বৈশাখ, পৃ. ৭৪।

তাহা গুণগত পার্থক্য। এই পার্থক্য বহুলপরিমাণে ধনবৈষম্য-সৃষ্টির জন্য দায়ী, শ্রেণীগত বৈরীবিষের কারণও এইখানে সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। এই জ্ঞানবৈষম্য হইতে দেশমধ্যে যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও অবশেষে রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির উদ্‌ভব হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন দেশের লোকের অন্তরের সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে, তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা উৎসব-বিনোদন প্রভৃতি সহজভাবে স্বীকার না করিলে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল-প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইবে। দেশকে জানা বলিতে যে কোনো abstractionএর উদ্দেশে সাময়িক হৃদয়াবেগ প্রকাশ করা নহে এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ 'চেঁচিয়ে-বলা' 'জিহ্বা-আস্ফালন' 'ন্যাশনাল ফাণ্ড' প্রভৃতি সাময়িক রচনার মধ্যে অত্যন্ত তীব্রভাবেই বলিয়াছিলেন। এইসব সাময়িক উত্তেজনার উত্তরে রচিত প্রবন্ধের কথা ছাড়িয়া দিলে, তিনি যাহা তখনো বলিয়াছিলেন এবং পরেও বলিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম হইতেছে এই যে, দেশের সাহিত্য যাহার মধ্য দিয়া মানুষ তাহার অন্তরের বাণী বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই ভাষা ও ভাবকে বুঝিতে ও সমাদর করিতে পারিলেই দেশকে জানা হয়; দেশ কোনোপ্রকার abastraction নহে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে দেশের আর যাহাই মঙ্গল হউক-না কেন, প্রধানতম অমঙ্গল হইয়াছে দেশের নাড়ীর সঙ্গে দেশের মাটির সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ বা intelligentiaর অন্তরের যোগ ছিন্ন হইয়া শ্রেণীগত সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে। এই সময়ের কয়েকটি প্রবন্ধের মূলগত তত্ত্ব ছিল এই কথাটি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার দেশজ প্রাচীন ও গ্রাম্য কবিদের প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিলেন, তেমনি বাংলার তৎকালীন নবীন উদীয়মান কবি-প্রতিভাদের কাব্যপ্রচেষ্টাকে যথাযথ সম্মান দান করিলেন। আধুনিক কবিদের আক্রমণ করিয়া ভারতীতে 'অ' স্বাক্ষরিত দুইটি প্রবন্ধ[১] প্রকাশিত হয়; রবীন্দ্রনাথ তাহার 'প্রত্যুত্তরে'[২] নবীন লেখকদের প্রগতিপরায়ণ মনের ও মতের প্রশংসাবাদ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এখন নব্য কবিদের অন্যতম, সুতরাং সমশ্রেণী কবিদের পক্ষ সমর্থন করা কর্তব্য জ্ঞান করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিলেন যে প্রাচীনকালের তুলনায় আধুনিক যুগের কবিদের প্রতি নিন্দা বর্ষণের কারণ কিছুই নাই। উদাহরণস্বরূপ উভয় যুগের প্রেম-বর্ণনার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বলিলেন, প্রেমের যে বীভৎস বর্ণনা বিদ্যাসুন্দরে খাঁটি বাঙালি কবির নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত হয়, তাহা অপেক্ষা "আজকালকার এই প্রকাশ্য মুক্ত নির্ভীক অলংকারবাহুল্যবিরহিত কালা-পাহাড়ীভাব" বিদেশী ভাবাপন্ন হইলেও সহ্য করা যায়। এই নূতনকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করা যাইবে না। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সমাজজীবনে যে বিপ্লব সাধিত হইতেছে, সাহিত্যক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী-রূপে তাহার ফল দেখা দিবেই। সমাজের রীতি ও নীতি কালধর্মে পরিবর্তিত হয়, সাহিত্য সেই পরিবর্তনকে মানিয়া লয়। যখন যুগধর্মপ্রভাবে সব-কিছুরই পরিবর্তন হইল আর একমাত্র সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মন থাকিয়া গেল প্রাচীনের নিগড়ে বাঁধা, ইহা কখনও স্বাভাবিক নহে, সম্ভবও নহে। এই মতবাদ প্রকাশ করিবার জন্য সে যুগের তরুণ সাহিত্যিকগণ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন, কারণ তরুণদের মনের কথা এমন সুযুক্তিপূর্ণ স্পষ্টতার সহিত বলিবার ক্ষমতা আর কাহারও ছিল না।

দেশজ গ্রাম্য কবিদের প্রশংসা করিলেন, নবীন লেখকদের সমর্থন করিলেন; ইহার দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন— রবীন্দ্রনাথ উভয় পক্ষকে তুষ্ট করিয়া স্বয়ং স্তুতিবাদ অর্জন করিতেছেন। কাহাকেও তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়

১ শ্রী অঃ [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী], দেশজ প্রাচীন ও আধুনিক কবি। ভারতী ১২৮৯, আষাঢ়, শ্রাবণ।

২ শ্রী রঃ—প্রত্যুত্তর, ভারতী ১২৮৯ ভাদ্র, পৃ. ২৫৭-৬২।

হইতে রবীন্দ্রনাথ খুব কম রচনাই লিখিয়াছেন; তিনি সাহিত্যকে রসের দিক হইতে, সৌন্দর্যের দিক হইতে বিচার করিয়াছেন; রাষ্ট্র ও সমাজকে মঙ্গলের দিক হইতে দেখিয়াছেন। কী সাহিত্যে, কী সমাজে, কী ধর্মে আতিশয্যকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই নিন্দা করিয়াছেন; কারণ আতিশয্য সমগ্র সত্যকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া অসুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করে। রবীন্দ্রনাথের আর্টিস্ট মন আতিশয্য ও অত্যুক্তিকে কোনোদিন স্বীকার করিতে পারে নাই।

কিন্তু তাঁহার সাহিত্যজীবনের এই গঠনশীল যুগে লেখনী সর্বদা এই উচ্চনীতি মানিয়া চলে নাই। বিরুদ্ধ মত খণ্ডনসুখের মত্ততায় ও নিজ মত স্থাপনের ব্যগ্রতায় তিনি যুক্তির মাত্রা সর্বদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সময়ে প্রত্যেকটি বিষয়কে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনা করিবার জন্য সমস্ত চিত্ত উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকিত। বলিবার ঝোঁকে সামান্য বিষয় বৃহৎ হইয়া উঠিত। এইসব রচনা সত্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে পারে নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে তাঁহার সাহিত্যসংগ্রহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। যথাস্থানে আমরা সেই শ্রেণীর কতকগুলি প্রবন্ধের আলোচনা করিব।

অধ্যয়ন ও রচনা এবং রচনা ও অধ্যয়ন যুগপৎ চলে। বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থপাঠে রবীন্দ্রনাথের অসীম আনন্দ; ইংরেজি বাংলায় নাটক-উপন্যাস সাহিত্য-সমালোচনা তো পড়েনই, ইহার সঙ্গে আছে বিজ্ঞানের গ্রন্থপাঠ। (সদর স্ট্রীটের বাসায় থাকিবার সময় বিজ্ঞানের বই পড়িবার জন্য যুবক কবির অত্যন্ত আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হক্‌স্‌লি হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্‌ইয়ার নিউকোম্ব প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেন। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরদিনই আনন্দের উৎস ছিল।[১] ইংরেজিতে যাহা পড়েন বাংলায় তাহা লিখিতে চান, কিন্তু পরিভাষার অভাবে বক্তব্য-বিষয় পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিতে পদে পদে বাধা পান। এই বিষয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা হয়। উভয়ে দেখেন যে কোনো-এক ব্যক্তির দ্বারা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠন করা সম্ভব নহে; যদিই বা কেহ করেন, তবে তাহা সর্ববাদীসম্মত হইবে কেন। সুতরাং কোনো সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান মারফত এই কার্য সংকলিত সম্পাদিত ও প্রচারিত হওয়া উচিত; অথচ বাংলাদেশে তখন সেরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল না। যাহা নাই তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবল ঝোঁক। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব খুব বিস্তৃতভাবে লিখিয়া ভারতীতে প্রকাশ করিলেন। এই প্রস্তাবিত সভার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন'।[২] ১২৮৯ সাল শ্রাবণ মাসের ২রা তারিখে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি হন; সহকারী সভাপতিগণের মধ্যে নাম পাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন কৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ। এই অধিবেশনে সভার নাম হয় 'সারস্বত সমাজ'।[৩] 'বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষদ স্থাপন করিবার কল্পনা' তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিতেছেন, "বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্য পরিষদ যে-উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।" সারস্বত-সম্মিলনের পরিকল্পনা লইয়া বোধ হয় উভয় ভ্রাতা কলিকাতার বুধমণ্ডলীর,

১ জীবনস্মৃতি পাণ্ডুলিপি হইতে। জীবনস্মৃতি ১৩৫০ সংস্করণ, পৃ. ১৫৪, পাদটীকা ১৪।

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন, ভারতী ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ।

৩ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ, বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৫০, পৃ. ২১৬-২২৪। জীবনস্মৃতি ১৩৬৪ সংস্করণ পৃ. ২৭৮-২৮১।

সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া নানারূপ আলোচনা করিয়াছিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, হোমরা-চোমরা লোকদের লইও না— তাহা হইলে সব মাটি হইয়া যাইবে। হোমরা-চোমরা অর্থ বিদ্যাসাগর বোধ হয় বঙ্কিম প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে বঙ্কিম-চন্দ্রের বঙ্গদর্শনে (১২৭৯ আষাঢ়) বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের এক পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছিল; পরিকল্পনাটির উদ্‌ভাবক ছিলেন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ বীম্‌স্‌ সাহেব, কিন্তু তাহা কার্যকর হয় নাই। বঙ্কিম উৎসাহ দান করেন বটে কিন্তু কল্পনার কোনো রূপ দিতে পারেন নাই। পাঁচজনকে লইয়া কাজ করিবার শক্তি ও সময় বঙ্কিমের ছিল না জানিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বাহ্নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের সতর্ক করিয়া দেন। তিনি যুবকদিগকেই উহা গড়িয়া তুলিবার জন্য উৎসাহিত করেন। কিন্তু তাহা হইল না— হোমরা-চোমরারা নাম দিলেন, কাজে ভিড়িলেন না; সভার একমাত্র কর্মী থাকিলেন সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম। রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর-কাহারও নহে।"

বোধ হয় বৈশাখ মাসটা (১২৮৯) এই ঘোরাঘুরি ব্যাপারেই কাটে[১]; কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তাঁহারা অর্জন করিয়াছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা হইতে লিখিলেন 'বিজ্ঞতা'[২] নামে প্রবন্ধ। মৃদুমধুর কশাঘাতে সমাজের বিজ্ঞ জনগণকে তিনি এই প্রবন্ধে সমাদৃত করিলেন। বিজ্ঞেরা সিধা জিনিসকে বাঁকা করিয়া দেখেন ও দেখান, সরল উক্তিকে অভিসন্ধি ও মতলবের ধাপ্পাবাজি বলিয়া সন্দেহ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানুষের শাশ্বত ধর্মপ্রয়াসকে শ্রদ্ধা করেন, তাই তিনি বলিলেন, "যে বিজ্ঞ সদনুষ্ঠানকে উপহাস করে তাহা অপেক্ষা যে সরল ব্যক্তি সদনুষ্ঠানে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছে, সে মহৎ; সংশয় করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, অসৎ অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া অনেক বিজ্ঞ অনেক সৎকার্যকে অঙ্কুরে দলিত করিয়া দিয়াছেন, অনেক তরুণ হৃদয়ের নবীন আশাকে তাঁহাদের হাস্যের বিদ্যুতাঘাতে চিরকালের জন্য দগ্ধ করিয়াছেন।"

যাহাই হউক ইঁহাদের পরিকল্পিত 'সারস্বত সমাজ' অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল, কিন্তু বাঙালির জাতীয় জীবনে এই স্পন্দন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই; অল্প কয়েক বৎসর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রভাতসংগীত

'বউঠাকুরানীর হাট'এর শেষ কিস্তি ভারতীতে প্রকাশিত হইল ১২৮৯ আশ্বিন মাসে। রবীন্দ্রনাথ তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটের এক বাসায় থাকেন। সেইখানে একদিন এক অভূতপূর্ব আনন্দ-আবেগ কবির জীবনে নূতন সুর আনিয়াছিল; সেই অদ্ভুত অনুভূতি সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয়

১ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন, "আমি কিছুদিন থেকে সারস্বত 'সমাজের' হাঙ্গামা নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম— এখনো অল্প অল্প চলচে তাই আর আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ প্রভৃতি হয়ে ওঠে নি।" জীবনস্মৃতি ১৩৫৪ সংস্করণ, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২৮০, পত্রখানি বোধ হয় ১২৮৯ কার্তিক মাসে লিখিত।

২ ভারতী ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ পৃ. ৮৪-৮৯। সমালোচনা (১২৯৪) পৃ. ২০। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ৬৮-৭২।

হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি[১] নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।" "শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" এইটিই হইতেছে যেন সেই অনুভূতির মর্মকথা। এই মনোভাব হইতেই 'প্রভাত উৎসব' রচিত।[২] 'মানুষের ধর্মে' কবি লিখিয়াছেন যে "এই অবস্থায় চার দিন ছিলুম। চার দিন জগৎকে সত্যভাবে দেখেছি।" 'প্রভাত উৎসব' কবিতাটি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পরিপূরক বলা যাইতে পারে; এই দুইটি কবিতাই যথার্থ প্রভাতসংগীতের মূল কবিতা। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছিলেন, "একটি অভূতপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"[৩]

দশ বৎসর পরে বোলপুর হইতে লিখিত একখানি পত্রে বলিতেছেন,[৪] "'জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের একটা বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সবপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। যেমন নবদন্তোদ্গতা রেণুকা মনে করচেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন— ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কি চায় এবং কি চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে, জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না— অবশেষে একটা কোনো কিছুর ভিতরে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশলাভ করা যায়। প্রভাতসংগীতে আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস, সেইজন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচবিচার বাধাব্যবধান নেই। এখনো আমি সমস্ত পৃথিবীকে একরকম ভালোবাসি— কিন্তু সে এ রকম উদ্দামভাবে নয়— আমার ভালোবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত মানবের উপর পড়ে সেই দীপ্তিতে এক এক সময় পৃথিবীটা ভারি সুন্দর এবং ভারি আপনার বোধ হয়।"

প্রভাতসংগীতের এই দুই কবিতার মধ্যে ধর্মের যে নূতন সংজ্ঞা পাই, তাহাকেই উত্তরকালে তিনি 'মানুষের ধর্ম'[৫] আখ্যা দান করেন। পৃথিবীর মধ্যে মানুষই জীবশ্রেষ্ঠ, মানুষই বিশ্বের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। তাই সেদিনকার অনুভূতি মানুষকে আশ্রয় করিয়া সার্থক হইয়াছিল; সে মানুষ নাম-বর্ণ-গোত্রাদির দ্বারা, বহুবিচিত্র সংস্কার দ্বারা আবৃত—

১ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, ভারতী ১২৮৯ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩৬১-৩৬৪। এই মাসেই ভারতীতে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রচিত 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি শুনিয়া অক্ষয়চন্দ্রের মনে যে-ভাবোদয় হয়, এই কবিতাটি তাহারই প্রকাশ। সেইজন্য অক্ষয়চন্দ্রের কবিতাটি 'প্রভাত সংগীত'-এর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল। পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্জিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

২ প্রভাত উৎসব, ভারতী ১২৮৯ পৌষ, পৃ. ৪২১-৪২৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

৩ জীবনস্মৃতি ১৩৫০ সংস্করণ, পৃ. ২৭৮।

৪ ছিন্নপত্র। বোলপুর, মঙ্গলবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ (১২৯৯) বিশ্বভারতী পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৫১, পৃ. ৭৬। জীবনস্মৃতিতে পত্রখানি উদ্ধৃত আছে। ভাষার কিয়ৎ পরিবর্তন দেখা যায়।

৫ মানুষের ধর্ম (Kamala Lectures), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৩।

সহজ মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বহু বৎসর পরে 'মানবসত্য'[১] নামে যে-প্রবন্ধটি লেখেন তাহাতে 'প্রভাত-সংগীতে'র কয়েকটি কবিতাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের ধর্মের ব্যাখ্যা করেন।

শরৎকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী দার্জিলিং-ভ্রমণে যান; শহর হইতে দূরে 'রোজভিলা' নামে একটি নিভৃত বাসায় তাঁহারা আশ্রয় নেন। রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন কলিকাতার ভিড়ের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে-সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহা আরো ভালো করিয়া দেখিতে পাইবেন। দাদা-বউদিদির সহিত তিনিও দার্জিলিং গেলেন। দেবদারুবনে ঘুরিলেন, ঝরনার ধারে বসিলেন, তাহার জলে স্নান করিলেন, কাঞ্চনশৃঙ্গের মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন— কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলেন সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রভাতসংগীতের গান থামিয়া গেল, শুধু তার দূর প্রতিধ্বনিস্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' নামে একটি কবিতা তথায় লিখিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তাঁহার যেসব কবিতার অর্থ লইয়া সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ হয়, এই কবিতাটি তাহাদের অন্যতম। সেইজন্য জীবনস্মৃতিতে তিনি ইহার অর্থ বহুবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে-একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি।"

কতবার আর্তস্বরে শুধায়েছি প্রাণপণে
অয়ি তুমি কোথায় কোথায়
অমনি সুদূর হতে কেন তুমি বলিয়াছ
'কে জানে কোথায়।'
আশাময়ী, ও কী কথা, তুমি কি আপনহারা
আপনি জান না আপনায়?

ইহাকেই কি কবি পরযুগে মানসসুন্দরী জীবনদেবতা বলিয়া অন্বেষণ করিয়াছেন।

প্রভাতসংগীতের কবিতায় তাঁহার কাব্যজীবন যেন প্রথম সমে আসিয়া দাঁড়াইল। তরুণ কবি নিজের কাব্যের মধ্যে নিজ কবিজীবনের প্রশ্ন ও তাহার যে-উত্তর পাইয়াছিলেন তাহা 'পুনর্মিলন' কবিতার মধ্যে ব্যক্ত করেন। এই কবিতায় কবি তাঁহার স্বল্পকালের কাব্যজীবনের একটি সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করিয়াছেন— শৈশবে প্রকৃতির সহিত সহজ মিলন, যৌবনাগমে প্রকৃতির সহিত বিচ্ছেদ এবং পূর্ণযৌবনে তাহার সহিত পুনর্মিলন। 'শৈশবসংগীত' ও বাল্যকাল হইতে আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে প্রকৃতির সহিত এই সহজ মিলনের অবস্থা হইতেছে কাব্যসৃষ্টির আদি যুগ। দ্বিতীয় অবস্থা হইতেছে 'ভগ্নহৃদয়' ও 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যুগ, যখন "রুগ্ন হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের সামঞ্জস্য ভাঙিয়া গেল", ইহা হইতেছে কব্যশ্রীর সহিত বিচ্ছেদের যুগ; অবশেষে একদিন রুদ্ধ দ্বার কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ খুলিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলেন সেই মানসসুন্দরীকে পাইলেন; শুধু পাইলেন তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় লাভ করিলেন। তাহাই হইল 'প্রভাতসংগীত'। 'পুনর্মিলন' কবিতাটিতে এই স্তরত্রয়ের বিশ্লেষণ পাই—

১ মানবসত্য, প্রবাসী ১৩৪০ বৈশাখ, পৃ. ১-৫। ঐ জ্যৈষ্ঠ পৃ. ২৬০-৬১। দ্র. মানুষের ধর্ম, পরিশিষ্ট।

সেই, সেই ছেলেবেলা
আনন্দে করিছে খেলা
প্রকৃতি গো, জননী গো, কেবলি তোমারি কোলে।
তার পরে কী যে হল— কোথা যে গেলেম চলে।· ·
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা।
সে বন আঁধারে ঢাকা,
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।· ·
কাটালেম কত শত দিন
ম্রিয়মাণ সুখশান্তিহীন।

ইহার পর হৃদয়-অরণ্য হইতে হইল নিষ্ক্রমণ—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।

জীবনস্মৃতিতে লিখিতেছেন, "যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম।···আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল।"

মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) প্রভাতসংগীতের সুরটির নামকরণ হইয়াছে 'নিষ্ক্রমণ' ;[১] রবীন্দ্রনাথ কাব্য-খণ্ডের ভূমিকার জন্য যে-কবিতাটি (নৈবেদ্য ১৫) লিখিয়া দেন তাহার মধ্যেও ইহারই মর্মকথা আছে—

আঁধার আসিতে রজনীর দীপ
জ্বেলেছিনু যতগুলি
নিবাও রে মন, আজি সে নিবাও
সকল দুয়ার খুলি।
আজি মোর ঘরে জানি না কখন
প্রভাত করেছে রবির কিরণ,
মাটির প্রদীপে নাই প্রয়োজন—
ধূলায় হোক সে ধূলি ;· ·

১ 'নিষ্ক্রমণ' কাব্যখণ্ডে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি আছে : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। প্রভাত-উৎসব। অনন্ত জীবন। পুনর্মিলন। স্রোত। প্রতিধ্বনি। অধিকাংশই সম্পাদিত ও সংক্ষিপ্তকৃত।

শুন আজি প্রাতে সকল আকাশ
সকল আলোক সকল বাতাস
তোমার হইয়া গাহে সংগীত
বিরাট কণ্ঠ তুলি।
নিবাও নিবাও রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি।

রবীন্দ্রনাথ প্রভাতসংগীত সম্বন্ধে নানাবয়সে নানাভাবে নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনস্মৃতি লিখিবার সময়ে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 'মানুষের ধর্ম' নামক বক্তৃতাগুচ্ছের পরিশিষ্টে 'মানবসত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার কবিতার ব্যাখ্যা আছে ; রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রভাতসংগীতের ভূমিকাস্বরূপ 'কবির ভণিতা' আছে ; সেগুলি বাহুল্যজ্ঞানে উদ্ধৃত করিলাম না।

যত সুন্দর, যত মহানই হউক, রবীন্দ্রনাথ কোনো ভাবনাকে মনের কোণে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিতে দেন না। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব বিচিত্র রসধারায় পুষ্ট। ক্ষীণ অস্পষ্ট শিশু ভাবনাগুলি ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করে, গতি ও শক্তি অর্জন করে, মনোরাজ্যে বৃহৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে— সাহিত্যে নূতন পথ বাহিয়া সেই সৃষ্টিধারা চলিতে থাকে। তাই প্রভাতসংগীতের আনন্দময় ভাবলোক হইতেও মুক্তির আকৃতি শোনা গেল। কারণ সন্ধ্যাসংগীতই বলো, আর প্রভাতসংগীতই বলো— উভয়ের মূল উৎস হইতেছে হৃদয়, সে-হৃদয় কখনো দুঃখে ম্রিয়মাণ, কখনো-বা আনন্দসুখে মত্ত। উভয় আন্দোলনেই হৃদয়ের চরম আতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে ; তাই প্রভাতসংগীতের শেষে বাহিরে চলিবার জন্য এত উদ্‌বেগ—

জগত-স্রোতে ভেসে চলো, যে যেথা আছ ভাই !
চলেছে যেথা রবিশশী চল রে সেথা যাই।[১]

কিন্তু কবির চলিবার ইচ্ছা নাই—

মনেতে সাধ যে দিকে চাই কেবলি চেয়ে রব।
দেখিব শুধু, দেখিব শুধু, কথাটি নাহি কব।[২]

প্রভাত সংগীত 'সমাপন'[৩] করিলেন—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না

বলিয়া। এবার তিনি দেখিবেন, কেবল দেখিয়া চাহিয়া আনন্দে নিমগ্ন থাকিবেন। সেই আনন্দ-আবেগে 'সাধ'[৪] হইতেছে—

আঁধার কোণে থাকিস তোরা, জানিস কি রে কত সে সুখ
আকাশপানে চাহিলে পরে আকাশপানে তুলিলে মুখ।

১ স্রোত : প্রভাতসংগীত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।
২ চেয়ে থাকা : প্রভাতসংগীত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।
৩ প্রভাতসংগীত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ১০১।
৪ সাধ : ভারতী ১২৯০ বৈশাখ। প্রভাতসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ৯৮।

নিজ হৃদয়ের দুঃখ-সুখের উদ্বেগ-উচ্ছ্বাস হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে মুখ তুলিতেই পৃথিবীর বিচিত্র ছবি তাঁহার মুগ্ধ নেত্রে উদ্ভাসিয়া উঠিল, তখনই তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন রূপ ও নূতন সুরের উৎস দেখা দিল 'ছবি ও গানে'র মধ্যে।

'প্রভাতসংগীত' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল ১২৯০ সালে বৈশাখ মাসে (১৮৮৩ মে)। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সে-যুগের খ্যাতিমান চিন্তাশীল, ও সাহিত্যিক; তিনি তাঁহার 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় (১২৯০ আষাঢ় ২) যে দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন তাহা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান কাব্যের আদি-সমালোচনা হিসাবে এখনো কৌতূহলোদ্দীপক ও মূল্যবান। তিনি কবিকে প্রকৃত 'আর্য কবি' বলিয়া অভিনন্দিত করেন।[১] গ্রন্থখানি উপহার দেন 'শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রাণাধিকাসু'কে। তখন ইন্দিরার বয়স দশ বৎসর মাত্র।

আমরা এযাবৎ কাল রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার বই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি— শৈশবসংগীত সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীত। সবগুলিকেই 'সংগীত' আখ্যা দেওয়ার বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে কি না সন্ধান করা প্রয়োজন। সংগীত অর্থে সাধারণত গানই বুঝায়; কিন্তু আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে কণ্ঠগেয় গীত নাই। অথচ তাহাদিগকে সংগীত বলা হইয়াছে। ইংরেজিতে যাহাকে লিরিক (lyric) বলে তাহার অনুবাদ করা হয় গীতিকাব্য। লিরিক শব্দটির মূল হইতেছে গ্রীক; lyre বা এক শ্রেণীর বীণাযন্ত্র সাহায্যে গ্রীকরা সুর করিয়া ছন্দোময় পদ আবৃত্তি করিত বলিয়া ক্রমে অন্তর্বিষয়ী কবিতামাত্রকে লিরিক নামে অভিহিত করা হয়; সেইজন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ লিরিকের অনুবাদ 'সংগীত' করিলেন।

দার্জিলিং হইতে ফিরিবার পর তাঁহারা চৌদ্দ নম্বর সার্কুলার রোডে বাসাবাটিতে আছেন। সাহিত্যচর্চার জন্য 'সমালোচনী সভা' স্থাপিত হইয়াছে— বিহারীলাল প্রিয়নাথ প্রভৃতি অনেকেই সেখানে আসেন। পৌষ মাসের শেষাশেষি (১৮৮৩ জানুয়ারি) সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। বাড়িতে পার্টি, গানের মজলিস প্রায়ই চলিতেছে; সকলেই মহা-আনন্দে আছেন।[২]

সুরহীন সংগীত বা লিরিক কবিতা লিখিলেও যথার্থ সুরসংগীতের সাধনা যুগপৎ চলিতেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির সাধনায় ভাষা দান করিয়া সংগীতের সৃষ্টিকার্য কিভাবে শুরু হইয়াছিল, বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম-ইতিহাস আলোচনায় তাহার কথা বলিয়াছি। গত দুই বৎসর বাল্মীকিপ্রতিভা কয়েকবারই বাড়ির ছেলেমেয়েদের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। এবারও বিদ্বজ্জনসমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশনে ঐ শ্রেণীর একটা গীতনাট্য অভিনয়ের কথা উঠিল; রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভার নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া 'কালমৃগয়া'[৩] নামে নাটিকা রচনা করিলেন। রামায়ণে বর্ণিত দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু বধের আখ্যান হইতেছে নাট্যের বিষয়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তেতলার ছাদে স্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় হইল।[৪] রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের, হেমেন্দ্রনাথের পুত্র

১ দ্র. জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২৫৭-২৬০।

২ এই সময়ে 'আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্' কথাটা বোধ হয় কবি জানিতে পারেন গোতিএর রচিত (১৮১১-৭২) *Madamoiselle de Maupin* (1835) নামক উপন্যাস হইতে; প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথকে বইখানি পড়িতে দেন।

৩ কালমৃগয়া (গীতিনাট্য) ১২৮৯ অগ্রহায়ণ পৃ. ৩৮। কালমৃগয়ার স্বরলিপি। বালক ১২৯২ ভাদ্র। আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ সংখ্যা। প্রথম তিনটি দৃশ্যের স্বরলিপি প্রতিভাদেবী-কৃত। কালমৃগয়া পৃথকভাবে মুদ্রিত পাওয়া যায় না; রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে (পৃ. ৩১৮-৩৩৮) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। স্বরবিতান ২৯ খণ্ডে কালমৃগয়ার স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে।

৪ ১২৮৯ পৌষ ৯। ১৮৮৩ ডিসেম্বর ২৩ শনিবার। A Conversazione of Bengali authors was held at the house of Baboo Debendranath Tagore at No. 6 Dwarkanath Tagore's Street, Jorasanko, on Saturday evening last. There

ঋতেন্দ্রনাথ ও কন্যা অভিজ্ঞা দেবী যথাক্রমে অন্ধমুনির পুত্র-কন্যার এবং পরিবারস্থ বালিকাগণ বনদেবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কালমৃগয়া এখন অচলিত গ্রন্থ; ১২৯২ সালে বাল্মীকিপ্রতিভার নূতন সংস্করণ তৈয়ারী করিবার সময়ে কবি কালমৃগয়ার বহু গান ও দৃশ্য সুনিপুণভাবে বাল্মীকিপ্রতিভার সহিত মিশাইয়া দিয়া উহাকে পূর্ব হইতে বহুগুণে সুন্দর করিয়াছিলেন। ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথেরই জয় হইয়াছিল, কিন্তু আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথেরও পরাজয় হয় নাই। দুইটি অসম্পূর্ণ নাটক মিলাইয়া একটি অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত নাটক তিনি রচনা করিলেন।

বাল্মীকিপ্রতিভার ন্যায় কালমৃগয়ারও কয়েকটি গানের সুর সম্পূর্ণ বিলাতী সুরে ঢালা, বিলাতে থাকিতে তিনি যে কেবল বিলাতী সংগীত ও নৃত্যকলা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নহে; এ দেশে সর্বোত্তম পাশ্চাত্য সংগীত শ্রবণের জন্য তাঁহার উৎসাহ ম্লান হয় নাই। কলিকাতায় কোনো য়ুরোপীয় বিখ্যাত সংগীতাচার্য বা বাদক আসিলে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁহাদের গানবাজনা শুনিতে যাইতেন।[১]

সাধারণ গান ছাড়া ব্রহ্মসংগীত-রচনারও প্রয়োজন হইল; সম্মুখে মাঘোৎসব। কালমৃগয়ার 'যাও রে অনন্তধামে মোহ-মায়া পাসরি' গানটি উৎসবে ব্রহ্মসংগীতরূপে গীত হইল, এ ছাড়াও কয়েকটি নূতন গান রচিত করিয়া দেন।[২] প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন "এগারই মাঘের গান লইয়া নিতান্ত ব্যস্ত আছি।"

প্রকৃতির প্রতিশোধ

গ্রীষ্মকালে কিছুদিনের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথ কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন; সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জজ (১৮৮১ মে ২৯- ১৮৮৪ জানুয়ারি)। কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণাংশে স্থিত কর্নাটের প্রধান শহর, এখন মহীশূর রাজ্যের মধ্যে। জীবনস্মৃতিতে স্থানটি সম্বন্ধে আছে—"এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত, এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে— সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা! প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড়ো বড়ো ঝাউগাছের অরণ্য; এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে।" জজসাহেবের বাড়ি ব্রহ্মদেশের কাষ্ঠ দিয়া নির্মিত, সুবৃহৎ না হইলেও সুন্দর; সমুদ্রতীরে তাহার ভিত্তিভূমি, এত কাছে যে বর্ষার সময় সমুদ্রের ঢেউ বাংলোর সীমানায় আসিয়া তর্জন-গর্জন করিত।[৩]

was a large gathering of Bengali authors, editors and other gentlemen. A short melodrama Kalamrigaya or "The Fatal Hunt" was written for the occasion by Baboo Rabindranath Tagore, well-known to the literary world. The drama was based upon a story from the Ramayana. The dramatis personæ were represented by the members of the Tagore family, both male and female. All the parts were well sustained.—*The Statesman*" 27 Dec. 1882. Quoted from: 'Fifty years ago' on 27 Dec. 1932.

১ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ. ২৭৪। ১৮৮৬ জানুয়ারি ২০। ৮ই মাচ ১২৯২ বিখ্যাত বেহালা বাদক রেমিনির বাজনা শুনিতে যান।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৪ শকাব্দ (১২৮৯) ফাল্গুন। ১. বড় আশা করে এসেছি, গীতবিতান, পৃ. ৮২২। ২. আজি শুভদিনে পিতার ভবনে; পৃ. ৮২২। ৩. দেখ চেয়ে তোরা জগতের উৎসব; পৃ. ৮২১। ৪. কী করিলি মোহের ছলনে; পৃ. ৮২১।

৩ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বোম্বাই প্রবাস, পৃ. ১১৫।

কারোয়ারের প্রাকৃতিক দৃশ্য রবীন্দ্রনাথের মনকে যেমন নানা দিক হইতে স্পর্শ করিতেছিল, পারিবারিক মিলনোৎসবও মনকে তেমনি আনন্দে পূর্ণ করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী আছেন। মেজোবৌঠান সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীকে লইয়া গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন; সুতরাং আমোদআহ্লাদ আনন্দ কলহাস্যের অভাব নাই।

একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোটো নৌকায় করিয়া তাহারা কালানদী বাহিয়া উজাইয়া কিয়দ্দুর গিয়াছিলেন; সেখানে শিবাজির একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া তাঁহারা নৌকা ভাসাইয়া দিলেন। তীরে নামিয়া একজন চাষীর কুটিরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকানো আঙিনায় গিয়া তাঁহারা উঠিলেন। তার পর সমুদ্রের মোহনার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল; সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ কবির মনে গভীর রেখাপাত করে। ফিরিয়া আসিবার পর তিনি 'পূর্ণিমায়' নামে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।[১] কবিতাটি 'ছবি ও গানে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে উহা পরিত্যক্ত হয়। কবি সেটি বাদ দিয়াছিলেন তাহার কারণ কবির মনে হয় রচনাটি সার্থক হয় নাই। তিনি লিখিতেছেন, "কোনো সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন সে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ ফোটে ভালো। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে— কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না। শুধু কবিত্বে নয়, সকলপ্রকার কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই— মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা আছে কর্তৃত্ব তাহারই হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয়, প্রতিমূর্তি হয় না।"[২]

কারোয়ার বাস-পর্বটা কবির জীবনে সার্থক হইয়াছিল— কবিতা নাটক গানে পূর্ণ। গদ্য রচনাও নিতান্ত কম নহে; তবে সেগুলি ব্যঙ্গ, শ্লেষে কণ্টকিত। কারোয়ার বাস-কালে 'নিশীথচেতনা'[৩] 'নিশীথজগৎ'[৪] ও 'যোগী'[৫] কবিতাগুলি লিখিত হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়; 'পূর্ণিমায়' কবিতার সহিত এই রচনাকয়টির ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে; 'ছবি ও গানে'র অন্য কবিতার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ ক্ষীণ। কিন্তু কারোয়ার বাস-কালে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে 'প্রকৃতি প্রতিশোধ'।

প্রকৃতির প্রতিশোধ "আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাটকে মিলিত।" এই কাব্যনাট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন; সে-সব কথা বিচার করিবার পূর্বে নাটিকাটির গল্পাংশ সংক্ষেপে বিবৃত করা প্রয়োজন। প্রকৃতির প্রতিশোধের গল্পাংশ অতি সামান্য।

সন্ন্যাসী অন্ধকার গুহাবাসী। সর্ব ইন্দ্রিয়বিজয়ী মহাজ্ঞানী, সর্ব ভেদাভেদ চূর্ণ করিয়া নিষ্কাম। সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী।

১ ভারতী, ১২৯০ পৌষ। দ্র. ছবি ও গান। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

২ জীবনস্মৃতি।

৩ নিশীথচেতনা, ভারতী ১২৯০ আষাঢ়, পৃ. ১০৩-১০৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ১৫৮।

৪ নিশীথজগৎ, ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ, পৃ. ১৫৪-১৫৭। ছবি ও গান। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ১৫২।

৫ যোগী, ভারতী ১২৯০ আশ্বিন, পৃ. ২৮৮। ছবি ও গান। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ১২৩।

বসে বসে চন্দ্র সূর্য দিয়েছি নিবায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।· ·
ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পুরিয়া
যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ,
পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।

তপস্যার বহুকাল পরে সন্ন্যাসী গুহা ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর।

সন্ন্যাসী অন্ধকার গুহায় বহুবর্ষ কাটাইয়াছে, সেই অন্ধগুহাই ছিল তাহার কাছে সত্য।

অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার মানসের বিচরণভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।
এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।
স্বাধীন অনন্তপ্রাণ নিমেষের মাঝে
বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলে রে নিশ্বাস।

জনপথ দিয়া নানা লোক নানা কথা নানা সমস্যার আলোচনা করিয়া চলিয়াছে; সন্ন্যাসী দেখে 'বসে বসে সংসারের খেলা'। তাহার কাছে এসব অত্যন্ত অদ্ভুত চঞ্চলতা বলিয়া মনে হয়।

অপরাহ্ণে রাজপথে অস্পৃশ্য রঘুর কন্যাকে দেখা গেলে চারি দিক হইতে 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে— অনাচারী রঘু, তাহারি দুহিতা ও যে!' -রব উঠিল। সকলের দ্বারা লাঞ্ছিতা হইয়া বালিকা সন্ন্যাসীর আশ্রয় লইল।

পথপার্শ্বে ভগ্নকুটিরে বালিকা থাকে। সন্ন্যাসী সেখানে গেল। বালিকাকে গভীর তত্ত্বকথা বুঝায়।

সুখ দুঃখ সে তো, বাছা, জগতের পীড়া।
জগৎ জীবন্ত মৃত্যু— অনন্ত যন্ত্রণা!
মরণ মরিতে চায়, মরিছে না তবু—
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।

বালিকা তত্ত্বকথা শুনিয়া বলে, "কী কথা বলিছ পিতা, ভয় হয় শুনে"। সন্ন্যাসী সংসারী লোকেদের চপলতা লঘুতা দেখিয়া বিরক্ত; সে নিজগুহায় ফিরিয়া গেল। বালিকা সন্ন্যাসীকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, অনাথিনী তাহার স্নেহের প্রার্থী। সন্ন্যাসী হাসিয়া স্বগত বলে—"নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহরেখাহীন।" এই ক্ষুদ্র বালিকার স্নেহ তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র সে চঞ্চল হইয়া উঠে। বালিকা তাহাকে যে-সুন্দর লতাগাছটি দেখাইতেছিল হঠাৎ ক্রোধভরে তাহাকে দলিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী তখনই বুঝিল সে অন্যায় করিয়াছে।

ক্ষুদ্ররোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট।‥
এতদিন অনাহারে এখনো মরে নি।‥
হৃদয়শ্মশান-মাঝে মৃতপ্রাণী যত
প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ,
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর!

সন্ন্যাসী গুহা ছাড়িয়া পর্বতশিখরে চলিল ; পথে দুইজন স্ত্রীলোক গান করিতেছে ; সন্ন্যাসী শুনিয়া বলে "জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি।" গুহাদ্বারে ফিরিয়া সন্ন্যাসী দেখে বালিকা তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া। বালিকা গান গায়, সন্ন্যাসী ভাবে—"এ কী রে চলেছি কোথা, এসেছি কোথায়।‥সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত ওরে কোন্ অতলেতে যেতেছি তলায়ে বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া"। এইরূপে বালিকার স্নেহপাশ তাহাকে জড়াইতে থাকিলে একদিন সবলে সে পাশ ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল—

চারিদিকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন,
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল।
ছিঁড়ে ফেল্ ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা—
হেথা হতে চল্ ছুটে, আর দেরি নয়।

সন্ন্যাসী দূরে চলিয়া গেল। চক্ষু মুদিয়া বলিতেছে—

হৃদয় রে শান্ত হও, যাক সব দূরে—
যাক দূরে, যাক চলে মায়া-মরীচিকা।
এস এস অন্ধকার, প্রলয়সমুদ্রে
তপ্ত দীপ্ত দগ্ধ প্রাণ দাও ডুবাইয়া।

ইতিমধ্যে বালিকা গুহা হইতে বাহির হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে সন্ন্যাসী সমীপে উপস্থিত হইল ; সন্ন্যাসী বলিল—

আয় বাছা বুকে আয়, ঢাল অশ্রুধারা‥
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহামাঝে।

সন্ন্যাসীর হৃদয় স্নেহার্দ্র হইয়াছে ; বালিকাকে লইয়া গুহার দ্বারে পুনরায় ফিরিল ; কিন্তু মনে শান্তি নাই—

যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হব বলে
আসন পাতিয়াছিনু বিশ্বের বাহিরে,
আরম্ভ না হতে হতে ভেঙে গেল বুঝি
তার মুখ জাগে মনে সমাধিতে বসে‥
ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়,
জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে উঠে।
গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন
কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে।

সন্ন্যাসী নিজের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত হইয়া ওঠে। বালিকাকে ত্যাগ করিয়া সবেগে গুহা হইতে বাহির

হইয়া গেল, বালিকা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে। অরণ্যে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে রাত্রি কাটে। কিন্তু বালিকার কথা সন্ন্যাসীর মনে পড়ে—

একটি কুটিরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হাতে তারে শুনাব কাহিনী।

অল্পকাল পরে বালিকার সন্ধানে ফিরিয়া যায় গুহাভিমুখে, পথে পথিককে বালিকার কথা শুধায়। গুহামুখে আসিয়া দেখে ধুলায় পতিত বালিকা, "হিম দেহ! না পড়ে নিশ্বাস—।" সন্ন্যাসী চিৎকার করিয়া বলিয়া ওঠে—

নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
. .
বাছা, বাছা, কোথা গেলি! কী করিলি রে—
হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ!

সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবিয়াছিল অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। কিন্তু সামান্য অস্পৃশ্য বালিকা স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে যখন তাহাকে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনিল, সন্ন্যাসী তখন দেখিল ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। "প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে এক দিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী— তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।"[১] রবীন্দ্রনাথের জীবনজিজ্ঞাসার সার কথা হইতেছে "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"— এই নাটকে তাহার আভাস দেন প্রথম। পরযুগে গানের সুরে বলিয়াছেন, "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"— সে-তত্ত্বটিও এই নাটকের মধ্যে নিহিত আছে। তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে, সাহিত্যের দিক হইতেও কাব্যখানি বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস[২] এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।[৩]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার পূর্বে কবি পূর্ণিমায়, যোগী, নিশীথচেতনা, নিশীথজগৎ কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' আলোচনাকালে জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম"— সে-কথার আভাস

১ জীবনস্মৃতি

২ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মধ্যে কয়েকটি প্রখ্যাত গান আছে, যেমন: ১. হেদে গো নন্দরাণী, ২. বুঝি, বেলা বয়ে যায়, ৩. বনে এমন ফুল ফুটেছে, ৪. মরি লো মরি, ৫. যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে, ৬. মেঘেরা চলে চলে যায়। এ ছাড়াও কয়েকটি গান আছে।

৩ সূচনা: প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

পাই 'নিশীথজগতে'র মধ্যে ; পাঠকগণ কবিতাটি পাঠ করিলে দেখিবেন এই নাটিকার একটা দিক ইহার মধ্যে নিতান্ত অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নাই। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া
করিতেছে ধ্যান,
অসীম আঁধার নিশা আপনার পানে চেয়ে
হারায়েছে জ্ঞান।
মাথার উপর দিয়া উড়িছে বাদুড়,
কাঁদিছে পেচক—
একেলা রয়েছি বসি, চেয়ে শূন্যপানে
না পড়ে পলক।

'নিশীথচেতনা'র সুর অন্যরূপ হইলেও ইহার মধ্যেও 'নিশীথজগতে'র দূরতর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'যোগী' কবিতার যোগী যেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীর পূর্বাভাস। 'পূর্ণিমায়' কবিতাটির পরিপ্রেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও ইহার সুরের সহিত সন্ন্যাসীর অনন্তের ধ্যানের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমাদের মূল প্রতিপাদ্য হইতেছে যে কবির মন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল, এবং তাহার চিহ্ন তিনি কবিতাগুলির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন।

ছবি ও গান

বর্ষার (১২৯০) শেষদিকে অথবা পূজার সময়ে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সকলে কারোয়ার ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন ; চৌরঙ্গির নিটকবর্তী সার্কুলার রোডের একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লওয়া হইল। এই বাসার দক্ষিণ দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই দোতলার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।" এই সময়ে লিখিতেছেন 'ছবি ও গান'-এর কবিতাগুলি এবং ভারতীর কাগিদে লিখিতেছেন গদ্যপ্রবন্ধ। ভালো করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে গদ্য-রচনাগুলি যেন কবিতাগুলির antithesis ; কবিতাগুলি অত্যন্ত গম্ভীর, গদ্যগুলি অত্যন্ত লঘু। জগতকে ছবির ন্যায় দেখিতেছেন, শিল্পীর ন্যায় আঁকিতেছেন— রেখা কোথাও গভীর নয়, কিন্তু লঘুতা কোথাও নাই। কিন্তু গদ্যপ্রবন্ধগুলির কোনোটিই গভীর নহে, সবই হালকা সুরে বলা, সেইজন্য বলিতেছিলাম— গদ্যরচনাগুলি কবিতার antithesis। কিন্তু ইহাকে অন্যভাবেও দেখা যাইতে পারে। কবি লিখিয়াছেন, "নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।" সে দৃষ্টি কেবল 'ছবি ও গান'-এর কবিতার মধ্যে সীমায়িত থাকে নাই, বিচিত্র বিষয়ের প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং তাহার ফলে প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়।

নিজের রচনাকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'ছবি ও গান' প্রকাশের সাত বৎসর পর জীবনের এই পর্ব সম্বন্ধে সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়া যে-পত্র তরুণ প্রমথনাথ চৌধুরীকে লেখেন[১] তাহা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃতব্য।

"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ

১ সবুজপত্র ১৩২৪ শ্রাবণ। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩২-১৩৪। শান্তিনিকেতন, বোলপুর। ১৮৯০ মে ২১, ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ৮।

বুঝতে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়তো অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন-সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে তো মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্চি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধ হয় এ রকম অবস্থা হয়।

উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হাসিত,
যৌবনমুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।

"সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আমার কোন পুরোনো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝতে পারি সে নেশা এখনো এক জায়গায় আছে— তবে কি না, সে নেশা

Hath been cooled a long age
In the deep delved heart.

"আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিকজাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে Shelly-র Skylark[১], আর-একটা হচ্ছে Wordsworth-এর Skylark। একজন অনন্তসুধা পান করছে, আর একজন অনন্তসুধা দান করছে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর-একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালোবাসে সে অভাবদুঃখ-পীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক— আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ততৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ— যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে (এইজন্যে তারা যা'কে তা'কে ভালোবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে)। পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে এইজন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল কিছুতেই তাদের আর অসন্তোষ ঘোচে না। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাকলেই ভালো হয়, কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না— ভালো কবি মাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে— নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal -এর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার

১ একটি ইংরেজি কাব্যসংগ্রহের Skylark-এর তর্জমা দেখিয়াছিলাম মনে হইতেছে।

centrifugal force Idealএর দিকে Realকে নিয়ে যায় এবং অনুরাগের centripetal force Realএর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে— কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি ঠিক বলেছ— 'আর্তস্বর' এবং 'রাহুর প্রেম' 'ছবি ও গানে'র মধ্যে অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর-এক রকমে অসঙ্গত— যথা 'পোড়ো বাড়ি'।"

জগতের নানা বস্তু ও বিষয়কে দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গি এই সময়ে যেন রবীন্দ্রনাথ লাভ করিয়াছিলেন। "চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা" ছিল প্রবল। তার মূলে ছিল এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। দুঃখ করিয়া জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু, কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রঙ ছড়াইয়া পড়িত।"

'ছবি ও গানে'র সকল কবিতা যে একই ধরণের নহে, তাহা স্বয়ং লেখকই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তবে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'রাহুর প্রেম'[১] কবিতাটি— অন্য সব কবিতা হইতে উহার সুর ভিন্ন, রূপ পৃথক। রাহুর তো প্রেম নহে, এ যেন প্রেমের অভিশাপ। প্রেমের এমন নির্দয় কল্পনা কবির অন্য কোনো কবিতার মধ্যে পাই না। নিষ্ফল প্রেমের নিষ্ঠুর বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার যে ইচ্ছা মানুষের খুবই স্বাভাবিক, তাহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া ভালোবাসা প্রণয়ীকে অনুসরণ করিতেছে— অভিশাপের ন্যায়, রাহুর ন্যায়, উপচ্ছায়ার ন্যায় সে সঙ্গেসঙ্গে ফিরিতেছে, মুক্তি পাইবার সকল পথ রুদ্ধ।

শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না
নাই-বা লাগিল তোর
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহশৃঙ্খলের ডোর।
তুই তো আমার বন্দী অভাগিনী বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে দেখি কে খুলিতে পারে।
জগৎ-মাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্ত শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধরে।
এক বার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে।

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ. ১৪০

চাও নাই চাও, ডাক নাই ডাক,
কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়
রব গায় গায় মিশি—
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্য-সম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি।
অনন্তকালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া—
কিবা সে রোদনে কিবা সে হাসিতে
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে,
কখনো সমুখে কখনো পশ্চাতে,
আমার আঁধার কায়া।

এ যেন আপনার রচিত কারাগার হইতে মুক্তি পাইবার ক্রন্দন। আশা করি, ইহা বাস্তবতাশূন্য উচ্ছ্বাসমাত্র কাব্যপ্রলাপ।

'ছবি ও গান'এর সুর যাহাতে ফুটে নাই সে রূপ কবিতা 'আর্তস্বর' ও 'পোড়ো বাড়ি'। এ ছাড়াও আছে 'পূর্ণিমায়' 'নিশীথজগৎ' ও 'নিশীথচেতনা'। এগুলির মধ্যে বহির্বিষয়ী জাগতিক চিত্র অপেক্ষা অন্তর্বিষয়ী সংগ্রামচিত্র ফুটিয়াছে বেশি। বোধ হয় সেই অন্তর্বিষয়তার জন্য সেগুলি সংগীত বা লিরিক-ধর্মী এবং সেইজন্যই 'ছবি ও গানে'র গান অংশ ইহারাই পূর্ণ করিয়াছে। 'ছবি ও গান' কবির বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব-যৌবন যখন সবে মিলিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধে কবির মন্তব্য হইতেছে—"ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ ব'কে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলোআঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না।· · 'ছবি ও গান' কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।"[১]

সাহিত্যের যে-দুটি দিক আছে— রূপ ও রস, তাহা ছবি ও গান শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি, গানই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। গীতিকবিরা তাঁহাদের রচনায় বিশেষভাবে রসের অনির্বচনীয়তা লইয়া কারবার করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন যে, রসের স্বাদ যুগে যুগে লোকের মুখে সমান থাকে না; আর রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। "তার আর-একটা দিক আছে, যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়। বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'; ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা

১ সূচনা: ছবি ও গান, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

অতিমাত্রায় গূঢ় নয়— তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর।· · ভাবের আকৃতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না।"[১]

সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বারে বারে রসসৃষ্টির সহিত রূপসৃষ্টি করিয়াছেন, গীতিকবিতা রচিয়া তৃপ্ত হন নাই— কাহিনী লিখিয়াছেন, গল্প লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।

'ছবি ও গান' মুদ্রিত হয় ১২৯০এর ফাল্গুন মাসে— তাঁহার বিবাহের তিন মাস পরে। কাব্যখানি উৎসর্গ করেন কাদম্বরী দেবী বউঠাকুরানীকে। উপহারে নাম বা কোনো নির্দেশ না থাকিলেও উহা যে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন, তাহা স্পষ্ট, "গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।"

ছবি ও গানের যুগের গদ্য

জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন "নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গানে আরম্ভ হইয়াছে।" এই উক্তি যে কেবল তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা নহে, এই যুগের তাঁহার সকল শ্রেণীর রচনার মধ্যেই উহা অত্যন্ত স্পষ্ট। যে-কোনো-একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটিকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া প্রকাশের চেষ্টা হইতেছে এই যুগের গদ্যরচনারও বৈশিষ্ট্য। বস্তুর তুচ্ছতা মোচন করিয়া তাহাকে মহৎ করিবার প্রয়াস যেমন দেখা যায় কবিতায়, তেমনি দেখা যায় সমসাময়িক গদ্যরচনায়— বিশেষভাবে 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলির মধ্যে। কিন্তু হৃদয়ের রসে সামান্য বিষয় বা বস্তু যেমন তুচ্ছতা হইতে মুক্ত হইয়া মহান হইতে পারে, তেমনি মহৎ ও গম্ভীর বিষয় হৃদয়ের অন্যতম রসের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া তুচ্ছতা প্রাপ্ত হইতে পারে। কারণ, বিষয় ও বস্তু -বিচারের মানসূচী যখন হৃদয়ের মধ্যে, তখন সে উহাকে sublime বা ridiculousএর যে-কোনো লোকে পরিচালনা করিতে পারে। এই যুগের গদ্যরচনাগুলি sublime হইতে পারে নাই।

তাই দেখি এ যুগের গদ্যরচনার মধ্যে অতিসামান্য জিনিসকে অত্যন্ত ফলাও করিয়া প্রকাশের চেষ্টা। এই যুগের কাব্যরচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রঙ ছড়াইয়া পড়িত।" গদ্যরচনার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে— স্পষ্ট করিয়া বলিবার ব্যর্থতায় কেবলই বাক্যচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িতেছে। এ বৎসরের প্রবন্ধগুলি সামান্য বিষয় ও বস্তু অবলম্বনে রচিত, অবান্তর বাক্যজালে পল্লবিত, তীব্র ব্যঙ্গে ও শ্লেষে কণ্টকিত; যে-সামান্য সত্যের আলোক আছে তাহা শব্দচ্ছটায় অস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সমালোচক, তাই এই যুগের প্রায় সমস্ত গদ্য-প্রবন্ধই অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে তাঁহার স্থায়ী গদ্যসংগ্রহ হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন।

তরুণ লেখকের সর্বব্যাপী চিত্তে বিচিত্র সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, সমাজ ও রাষ্ট্রসমস্যা জাগিতেছে; কিন্তু সবগুলিই লঘুভাবে আলোচিত। বালক প্রথম রঙের বাক্স উপহার পাইয়া যেমন-তেমন করিয়া নানা প্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় যেমন অস্থির হইয়া উঠে— রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভাষায় শক্তি পাইয়া আপনমনে রকম-বেরকম রচনা লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। সামান্য বিষয়কে বড় ও গম্ভীর বিষয়কে লঘু করিয়া কেবল লেখার জন্যই যেন লিখিতেছেন। সামান্য

১ সাহিত্যের মূল্য (শান্তিনিকেতন, ২৫ এপ্রিল ১৯৪১), সাহিত্যের স্বরূপ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১।

বিষয়কে বড় করিয়া দেখানোর চেষ্টাই যদি এ যুগের বৈশিষ্ট্য হয় তবে 'বাউলের গান'[১] শীর্ষক প্রবন্ধটাকে তাহারই অন্তর্গত করিতে হয়; কারণ অনেক কথা ও আলোচনার পর আসল প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সমসাময়িক বাংলা-দেশের আকাশ তখন রাজনৈতিক উত্তেজনায় ধূমাচ্ছন্ন, সাহিত্যক্ষেত্র অনুকরণে অনুবাদে কণ্টকাকীর্ণ। এই প্রবন্ধের আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনা সম্বন্ধে যে মন্তব্যটুকু করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই কাব্যজীবনের কথা। তিনি লিখিয়াছেন, "এমন কোনো কোনো কবির কথা শুনা গিয়াছে, যাহারা জীবনের প্রারম্ভভাগে পরের অনুকরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি শুনিলে মনে হয় যেন, তাহা কোনো একটি বাঁধা রাগিণীর গান— মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না।" অবশেষে সে একদিন নিজের মর্মস্থানে পৌঁছিয়া নিজেকে আবিষ্কার করিল। "যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই।" ব্যক্তিবিশেষের জীবনে ইহা যেমন সত্য, জাতির জীবনেও তাহা তেমনি সত্য। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে "বাঙালি জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে তাহা আমরা ভালো জানি না।· ·আধুনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না।· ·এখনো আমরা বাঙালির ঠিক ভাবটি ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই।· ·সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাংলা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাংলা নাই, বাংলা ভাষা বাঙালিদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।" "ভাবের ভাষায় অনুবাদ চলে না। ছাঁচে ঢালিয়া শুষ্ক জ্ঞানের ভাষায় প্রতিরূপ নির্মাণ করা যায়। কিন্তু ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্যপান করিয়া, হৃদয়ের সুখ দুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে। সুতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটা নির্জীব প্রতিমা নির্মাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না, ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণ-ভারের মত চাপিয়া পড়িয়া থাকে।"

বাউলের সংগীত-সংগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া তিনি খুবই বড় কথা আনিয়া ফেলিলেন। আধুনিক কবিরা প্রেমের কবিতা, বিরহের কবিতা লেখেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সে-আন্তরিকতা নাই, যাহা এই লোকসাহিত্য সংগ্রহের কবিতায় দেখা যায়। ইহার কারণ তখনো স্পষ্টভাবে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কিন্তু যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সারার্থ হইতেছে, লোকসাহিত্য সেই সাধারণ লোকেই সৃষ্টি করে যাহার ভাবধারার সহিত দেশের নাড়ীর বন্ধনযোগ ছিন্ন হয় নাই, যাহার ভাষা ইংরেজির অনুকরণে বিকৃত হয় নাই। "ইহাকে দেখিলেই এমনি আত্মীয় বলিয়া মনে হয় যে, কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিই।" এই প্রবন্ধে তিনি সর্বপ্রথম বাঙালিকে এই দেশীয় গান কবিতা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন ও প্রবন্ধশেষে নিজ সংগৃহীত তিনটি লোকসংগীত উদ্ধৃত করিয়া দেন। প্রবন্ধটির মধ্যে যথার্থত বাউলের গান সম্বন্ধে সামান্য তথ্যই আছে। এই বৎসরের প্রায় রচনাই যে সামান্য বিষয় লইয়াই লেখা, এইটি তাহারই অন্যতম উদাহরণ।

সাহিত্যের প্রশ্ন ওঠে— লিখিলেই যদি আনন্দ সমাপ্ত হইত তো কাব্য ছাপিবার কী প্রয়োজন। 'প্রভাত সংগীত' মুদ্রণের পর 'লেখাকুমারী ও ছাপাসুন্দরী'[২] নামে এক প্রবন্ধে এই তুচ্ছ সমস্যার বিচার হইয়াছে। এই প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "গুটিকতক কবিতা লেখা ছিল, অনেক দিন ধরিয়া খাতায় পড়িয়াছিল, · ·সম্প্রতি সেগুলি ছাপা হইয়া গেছে। ধারণা ছিল, নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে পড়িতে বুঝি বড়ই আনন্দ হইবে।"

১ বাউলের গান, ভারতী ১২৯০ বৈশাখ, পৃ ৩৪-৪১। দ্র. সমালোচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত ২, পৃ ১৩০-১৩৭।

২ লেখাকুমারী ও ছাপাসুন্দরী, ভারতী ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৭১-৭৪।

··কিন্তু যে মনোভাবগুলি কেবল নিজের ছিল যাহার যাচাই বা বিচারের অধিকার বা সুযোগ বাহিরের কাহারও ছিল না, তাহারা যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সকলের সমক্ষে উপস্থিত হইল তখন কবির আর ভালো লাগিতেছে না। "কবিতাগুলি যখন খাতায় ছিল তখন আমার সুখের কি অভাব ছিল! এখন··কেহ বলিবে ভালো, কেহ বলিবে মন্দ, কেহ সম্মান করিবে, কেহ অপমান করিবে, কিন্তু ইহার ত্রুটি তো কেহই মার্জনা করিবে না, ইহাকে আপনার লোক বলিয়া কেহ তো কোলে তুলিয়া লইবে না! আপনার ধন পরের সম্পত্তি হইয়া গেল,··যে যাহা বলে চুপ করিয়া সহিতেই হইবে।" 'গোঁফ এবং ডিম'[১] প্রবন্ধটি সমালোচকদের উদ্দেশেই লিখিত যাহারা নিজে কোনো উচ্চ ভাব বা কাব্য সৃষ্টি করিতে পারে না, কেবল অন্যকে আঘাত করিয়াই পরিতৃপ্ত। রচনাটি অত্যন্ত এলোমেলো, ব্যঙ্গ ও শ্লেষ উচ্চস্তরের নহে। 'তার্কিক'[২] রচনাটিরও বিষয় এই সমালোচকদের সমালোচনা-স্পৃহার সমালোচনা। লেখকের অভিযোগ তার্কিক বা নৈয়ায়িকরা রসিকতার কৈফিয়ত চাহেন, উপমার সহিত উপমেয়ের তুলনা করিতে বস্তুকে হাজির করেন। আসল কথা সংসারের আবশ্যকবাদী ও তার্কিকদের নিন্দায় প্রবন্ধটি পূর্ণ। সমালোচকগণের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার ঘোর আপত্তি; লেখকের ক্ষমতার অভাবে বা বুদ্ধির দোষে যেসব গ্রন্থ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, কঠোরভাবে সমালোচনা করিলে তাহাদের কি ভালো হয় তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। এই পর্যায়ে রচিত 'তৃতীয় পক্ষ' ও 'অনাবশ্যক' নামে প্রবন্ধ দুইটি বুঝিতে হইলে সমসাময়িক দুই-চারিটা সংবাদ রাখা প্রয়োজন, তাই সংক্ষেপে একটু ভূমিকা করিতেছি।

য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে দেশমধ্যে সমাজ সম্বন্ধে চিন্তাধারা নানা পথ বাহিয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রাগ্রসর সম্প্রদায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৮৭৮ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া যান[৩] ও ১৮৮১ সালের মে মাসে নিজ সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করেন। আমাদের আলোচ্য পর্বে এই সমাজ খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় বহুবিধ সমাজসংস্কারকর্মে ব্রতী ছিলেন। সমাজসংস্কার বিষয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ কখনো কোনোপ্রকার প্রচারকার্য করেন নাই এবং ঐ ধরণের কার্যকে দেশের পক্ষে সুফলপ্রসূ বলিয়া বিশ্বাসও করিতেন না। নূতন সমাজের উৎসাহী যুবকেরা ছিলেন ভাঙনপন্থী। যেসব অর্থহীন সংস্কার হিন্দুসমাজকে অতীতের সহিত নিগড়বদ্ধ করিয়া ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইবার বাধা সৃষ্টি করিতেছে, এবং যে বর্ণভেদ প্রথা সমাজদেহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মানুষে মানুষে দুরপনেয় ব্যবধান গড়িতেছে, তাহারই বিরুদ্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিক যেন জেহাদ ঘোষণা করিয়া চলিয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে এইসব যুক্তিজালের প্রতিবাদ করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। নব্য ব্রাহ্মের দল মহর্ষিকে তাঁহার ধর্মজীবনের পবিত্রতার জন্য শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু সমাজসংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার মতকে অচল জানিয়া কোনোদিন প্রত্যক্ষভাবে আঘাতও করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ 'অনাবশ্যক'[৪] ও 'তৃতীয় পক্ষ'[৫] প্রবন্ধ দুইটিতে এইসব প্রগতিশীল মতামতের মৃদু সমালোচনা করেন; তবে এইসব সমালোচনার মধ্যে না আছে আন্তরিকতা, না আছে গাম্ভীর্য, না আছে কঠোর যুক্তিবল; নিতান্তই রঙের বাক্স লইয়া বালকের খেলার মতন, এই রচনা দুইটিও লেখনীর রেখা দিয়া অস্পষ্ট বাক্য ও লঘু চিন্তার খেলামাত্র।

১ গোঁফ এবং ডিম, ভারতী ১২৯০ আষাঢ়, পৃ ১১৩-১৯।

২ তার্কিক, ভারতী ১২৯০ আশ্বিন, পৃ ২৪১-৪৬। দ্র. সমালোচনা (১২৯৪), রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত ২য় পৃ ৬১-৬৭।

৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এই সময়ে ৭০০০্ টাকা দান করেন।

৪ অনাবশ্যক, ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ, পৃ ১৪৫-৪৯। সমালোচনা (১২৯৪) পৃ ১, রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত ২য় খণ্ড, পৃ ৫৭-৬১।

৫ তৃতীয় পক্ষ, ভারতী ১২৯০ আশ্বিন, পৃ ২৬৯-৭৫।

এইসব রচনা ছাড়া কয়েকটি আছে অর্ধ-রাজনৈতিক প্রবন্ধ। সেগুলিও এই লঘুভাবেই লেখা; এইসব রচনার জন্য সমসাময়িক ঘটনার উত্তেজনা দায়ী। সমসাময়িক ঘটনার সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোনো যোগই ছিল না; কেবল ঘটনার সহিত রচনার যোগ হইত সমালোচনার জন্য। এইসকল প্রবন্ধ যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে তৎকালীন ঘটনাবলীর সহিত পাঠকদের সামান্য পরিচয় থাকা প্রয়োজন বোধেই আমরা নিম্নে তদ্‌বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থিত করিতেছি।

বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে যেসব ঘটনা রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টির জন্য মুখ্যত দায়ী তাহাদের অন্যতম হইতেছে ভারতীয়দের পক্ষে সিবিল সার্বিসে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট নিম্নতম বয়সকে আরও কমাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ব্যবস্থা রদ করিবার জন্য আন্দোলন চালাইতে-ছিলেন। ভারতীয়রা সিবিল সার্বিস পাস করিয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ্ হইয়াও ইংরেজ সিবিলিয়ানের সমতুল্য অধিকারসকল পাইতেন না: গর্হিত অপরাধে অপরাধী ইংরেজ আসামীর বিচারের অধিকার দেশীয় সিভিলিয়ানদের ছিল না। এই অদ্ভুত নিয়ম পরিবর্তন করিবার জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপনের অনুরোধে আইনসদস্য স্যর কুর্টনি ইলবার্ট এক বিল আইনসভায় উপস্থিত করেন। বিল কিভাবে ব্যর্থ হয় তাহা ভারত-ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ইলবার্ট বিলের খসড়া যেভাবে করা হইয়াছিল এবং যেভাবে উহা আইনে পরিণত হইল, উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য; সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আইন সংস্কারের উদ্দেশ্যই সংশোধিত প্রস্তাবরাশির দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল। ২৮শে জানুয়ারি (১৮৮৪) তারিখে বিল পাস হইয়া আইন হইল।

ইলবার্ট বিল রদ করিতে গিয়া বাঙালি সর্বপ্রথম বুঝিল, মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিক ও কর্মচারী সঙ্ঘবদ্ধভাবে বড়লাট তথা ইংলণ্ডেশ্বরীর মহামহিম প্রতিনিধির ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে কিভাবে বিপর্যস্ত করিতে সক্ষম হয়। 'অ্যাজিটেশন' বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন যে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি মহা অস্ত্র তাহা বাঙালিরা এইবার বুঝিল। এই আন্দোলন যখন দেশব্যাপী তখন একটি অবান্তর ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া সুরেন্দ্রনাথ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন (৫ই মে হইতে ৪ঠা জুলাই ১৮৮৩)। কলিকাতা হাইকোর্টের কোনো বিচারকের হুকুমে আদালতগৃহে হিন্দুদের শালগ্রাম শিলাকে তাহার প্রাচীনত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য হাজির করানো হয়। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে' এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় তাহার সমালোচনা করেন। বিচারাধীন কালে কোনো মোকদ্দমার সমালোচনা আইনের চোখে আদালতের অপমানসূচক এই অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথের জেল হয়। রাজনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহাই লিখুন না কেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণ সম্বন্ধে তাঁহাকে একটি ছত্র কোথায়ও লিখিতে না দেখিয়া মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে এতবড় একটা ঘটনা তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ কেন করিল না। রাজনৈতিক অপরাধের জন্য তখন পর্যন্ত কাহাকেও কারাবরণ করিতে হয় নাই; সেইজন্য সুরেন্দ্রনাথের ব্যাপার লইয়া দেশমধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব। রবীন্দ্রনাথের এই উপেক্ষার কারণ কি। আমাদের মনে হয় তখন তিনি কারোয়ারে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন, কলিকাতার ছাত্রজনতার উত্তেজনা তিনি দেখেন নাই, দেখিলে কবির স্পর্শচেতন মন নিশ্চয়ই সাড়া দিত।

৪ঠা জুলাই— যেদিন সুরেন্দ্রনাথের মুক্তি হয়, সেদিনটি আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার দিন। এই দিনে Indian Mirror কাগজে রাজনৈতিক আন্দোলনাদি ও দেশমাতৃকার সেবার জন্য একটি ধনভাণ্ডার— ন্যাশনল ফণ্ড— স্থাপনের প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। বাঙালি দেখিল যে মুষ্টিমেয় প্রবাসী ইংরেজ নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আত্মরক্ষাসমিতি গঠন করিয়া অল্পকালের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা তুলিয়া একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে;

বাঙালিদেরও রাজনৈতিক কার্য পরিচালনার জন্য ধনভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। ইহারই কয়েকমাস পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ যুবকদের প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনল কন্‌ফারেন্স আহূত হয় (১৮৮৩ ডিসেম্বর ২৮-৩০)— জাতীয় মহাসভা বা কন্‌গ্রেসের জন্ম তখনো হয় নাই।

এইসব সভাসমিতি স্থাপন ও ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দেশে ও বিদেশে অ্যাজিটেশন বা আন্দোলন সৃষ্টি অর্থাৎ ভারতের অভাব-অভিযোগ বিদেশী রাজপুরুষগণের নিকট গোচর করা, অথবা ইংরেজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইংরেজেরই নিকট হইতে প্রতিকারের জন্য আন্দোলন আবেদন ও আস্ফালন করা। এইসকল সভাসমিতিতে প্রায়ই কথার বাহুল্য, হৃদয়াবেগের আতিশয্য, ভাষার অসংযম প্রকাশ পাইত। দেশের ভাষায় দেশের লোকের কাছে কোনো বাণী পৌছাইয়া দিবার ইচ্ছা তখনো নেতাদের মধ্যে দেখা দেয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির যুবকেরা এই নূতন রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে দূরেই থাকিতেন। তাঁহাদের আদর্শ ছিল অন্যরূপ ; দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য দেশবাসীর সুপ্তচিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করাটাকেই তাঁহারা মনে করিতেন আসল কাজ ; সেকাজ ইংরেজি ভাষার মারফতে হইবে না এবং ইংরেজ রাজকর্মচারীর কাছে আবেদন করিয়াও সফল হইবে না। রবীন্দ্রনাথ এইসব আন্দোলন হইতে দূরে রহিয়া নীরব থাকিলেন না, সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও শ্লেষে সে সমালোচনার ভাষা পূর্ণ ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যুক্তিকে আঘাত করিতে গিয়া নিজেই সেই দোষে দুষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং সাহিত্য হিসাবে তাহাদের স্থান নগণ্য ; একটি নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি—

"দেশহিতৈষিতা, আলো জ্বালিবার গ্যাসের মত যতক্ষণ গুপ্তভাবে চোঙের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহা বিস্তর কাজে লাগে— কিন্তু যখন চোঙ ফুটা হইয়া ছাড়া পায় ও বাহির হইতে থাকে, তখন দেশছাড়া হইতে হয়।··এখন 'ভ্রাতাগণ' 'ভগ্নিগণ' 'ভারতমাতা' নামক কতকগুলা শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে— ও তারাবাজির মত উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উড়িতেছে। অনেক দূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিবিয়া যায়, ও ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আমার মতে আকাশে এরূপ দুশো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোনো সুবিধা হয় না, আর ঘরের কোণে মিট্‌মিট্ করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিলেও অনেক কাজে দেখে।"[১]

দেশের উন্নতি করিতে হইলে যে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করিতে হইবে, এ মত রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই পোষণ করেন নাই। সমগ্র জীবনের সহিত যে আন্দোলনের যোগ নাই, যাহা মানুষের সমগ্র সত্তাকে উদ্‌বোধিত করিতে পারে না, সেরূপ এক-ঝোঁকা সংস্কার-আন্দোলনকে তিনি চিরদিনই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 'জিহ্বা-আস্ফালন'[২] নামে সামান্য একটি প্রবন্ধের মধ্যে তিনি লিখিলেন যে এইসব আন্দোলনকারীরা চান সকলে "বঙ্গসাহিত্যে কেবলমাত্র দাঁত ও নখের চর্চা করিতে থাকুক, আর কিছু নয়।" ইহারা "বঙ্গসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে অত্যন্ত ভয় করেন।··সমাজের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তি চারিদিক হইতে বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে।"

"আমাদের সমাজের পদে পদে এত শত প্রকার কর্তব্য রহিয়াছে যে, কতকগুলা অস্পষ্ট বাঁধিবোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট করা উচিত হয় না।··এত সামাজিক শত্রু চারি দিকে রহিয়াছে তাহাদিগকে কে নাশ করিবে!" তিনি পরিষ্কার করিয়া কর্মপন্থা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "আগে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ কর, ভাবিতে আরম্ভ কর ও বলিতে শেখ, তাহা হইলে আর-সকলে শুনিতে আরম্ভ করিবে। বেশি করিয়া বলিলে কিছুই হয় না, ভালো

১ চেঁচিয়ে বলা, ভারতী ১২৮৯ চৈত্র, পৃ. ৫১১-১৬।

২ জিহ্বা-আস্ফালন, ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ, পৃ. ৭৯-৮৪।

করিয়া বলিলে কি না হয়! আতিশয্যের দিকে যাইয়ো না, কারণ যেখানেই যুক্তিহীন আতিশয্যপ্রিয় প্রজা, সেইখানেই স্বেচ্ছাচারী প্রভুতন্ত্র শাসনপ্রণালী।" এ কথা কবি পরেও বারে বারে বলিয়া দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

বিদেশীর শাসনের সহিত বিদেশী শব্দ, বিজাতীয় ভাবধারা ক্রমে ক্রমে বিজিতের জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তু হইয়া উঠে; প্রথম প্রথম সেগুলি নূতন ঠেকে, কিন্তু কালে সেগুলি কেবল সহিয়া যায় তাহা নহে, সেগুলি জাতীয় জীবনের একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া পড়ে, এবং কোনো কালে যে তাহারা বিজাতীয় শব্দ বা ভাব ছিল, সেই বোধ পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। নেশন, ন্যাশানলিজম্, কন্‌গ্রেস, লীগ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ ভারতীয়দের রাষ্ট্রিক জীবনের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, সেসব শব্দ ও প্রতিষ্ঠান যে বিদেশীয় তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের আলোচ্য পর্বে দেশের মধ্যে 'ন্যাশনল' শব্দটির প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের চোখে এই শব্দটির বহুলপ্রয়োগ অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকিতেছিল। "ন্যাশনল শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। ন্যাশনল থিয়েটর, ন্যাশনল মেলা, ন্যাশনল পেপর ইত্যাদি।· ·সম্প্রতি ন্যাশনল ফণ্ড্ আর-একটা কথা শুনা যাইতেছে।· ·একমাত্র political agitationই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।"[১] রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহেন যে political agitation পদার্থ টাই ন্যাশনল নহে। তার পর এই আন্দোলন চালাইবার ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জাতির বা নেশনের ভাষা অবহেলা করেন, ইংরেজি ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শনই তাঁহাদের জীবনের অন্যতম চরম উদ্দেশ্য। সেইজন্য জাতীয় ধনভাণ্ডারের নামটি পর্যন্ত হইয়াছে ন্যাশনল ফণ্ড্, ইহার কাণ্ডকারখানা সবই চলে ইংরেজিতে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই ধরণের কার্য দেশের মধ্যে ফলপ্রসূ হয় না। তিনি বলিলেন, "আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।· · ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।· · ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর-সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না।· · ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী।· ·যাহা আমরা নিজেই করিতে পারি, এবং যাহা-কিছু আমরা নিজে করিব তাহা সফল না হইলেও তাহার কিছু-না-কিছু শুভ ফল স্থায়ী হইয়া থাকিবে।· ·গভর্নমেণ্টকে চেতন করাইতে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর শুভফল হইত।" রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদের ইহাই হইতেছে মূলসূত্র এবং দেশসেবার এই আদর্শের কথাই তিনি বারে বারে নানা ভাবে বলিয়াছেন, "দেশকে জানো"। তিনি বলিলেন যে, যাহার কোনো বিষয়ে দাবি বা অধিকার নাই, সেই ভিক্ষা চায়। গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে আজ আমাদের ভিক্ষা চাহিতে হইতেছে কেন, এই প্রশ্নই তাঁহার মনে উঠিতেছে। ভারতবর্ষ বহু যাচ্ঞার পর স্বায়ত্তশাসন পাইয়াছে; সে-স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ কি তাহা আমাদের অজানা নাই। কিন্তু গভর্নমেণ্ট দিয়াছেন ভিক্ষার মত, অনুগ্রহের মত, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য; এ বিষয়ে যেন নানা সন্দেহ আছে, কাল যদি দেখা যায় এ প্রণালীতে ভারতবাসীরা ভালো করিয়া কাজ করিতে পারিতেছে না, তবে কালই হয়তো উহাকে বন্ধ করিতে হইবে।

ষাট বৎসর পরে ভারতশাসন-সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের যে কোনো চিত্তবিকার হইয়াছিল তাহার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়া যান নি। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষারই প্রচার সর্বাগ্রে প্রয়োজন; শিক্ষিতেরা ইংরেজিতে যেসব উচ্চভাব জানেন, দেশের মধ্যে বাংলাভাষার মাধ্যমে তাহা প্রচার করিতে হইবে। তিনি বলিলেন "বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই **সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক**। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই

১ ন্যাশনল ফণ্ড, ভারতী ১২৯০ কার্তিক, পৃ. ২৮৯-২৯৫।

দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।”[১] এই কথা তিনি বরাবরই প্রচার করিয়াছেন এবং প্রথম সুযোগেই কর্মে তাহাকে রূপদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজপুরুষদিগকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনের জন্য সভা-সমিতি করার ব্যর্থতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো মোহমুগ্ধ ধারণা ছিল না। এই স্বাদেশিকতার শিক্ষা তাঁহাদের পরিবারগত ধারা হইতে প্রাপ্ত। এই স্বাদেশিক আত্মসম্মান মাঝে মাঝে কী তীব্র আকার ধারণ করিত, তাহা আমরা ‘টৌন্‌হলের তামাশা’[২] প্রবন্ধে দেখিতে পাই। উহার ভাষার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ তীব্রতার চরমে উঠিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার আরম্ভ এইরূপ, “সেদিন টৌন হলে একটা মস্ত তামাশা হইয়া গিয়াছে। দুই-চারিজন ইংরাজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগডুগি বাজাইতেছিলেন ও দেশের কতকগুলি বড়লোক বড় বড় পাগড়ি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।” অত্যন্ত তিক্তভাবে এই শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, “যাহারা দেশকে অপমান করে দেশের কোনো সুপুত্র তাহাদের [ইংরেজদের] সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে না! একটুখানি সুযোগের প্রত্যাশায় যাহারা দাঁতের পাটি সমস্তটা বাহির করিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইতে পারে তাহাদিগকে দেখিলে নিতান্তই ঘৃণাবোধ হয়।” বলা বাহুল্য কবির এ-মনোভাব কখনো স্থায়ী হইতে পারে না; মনের উত্তেজিত অবস্থায় ইহা লিখিত।

সাবিত্রী[৩] লাইব্রেরীর এক সভার অধিবেশনে ‘অকাল কুষ্মাণ্ড’[৪] নামে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেন (১২৯০), তাহার ভাব ও ভাষা কোনোটিই সুন্দর নহে। লেখাটির অধিকাংশই রাজনীতি-আন্দোলনাদির সমালোচনা, অন্যান্য রচনার ন্যায় বিদ্রূপে ও শ্লেষে কণ্টকিত। এই অভাবাত্মক দিক বাদ দিলে দুই-চারিটা সত্য কথা রচনাটির মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তার জন্য পনেরো-ষোলো পৃষ্ঠার প্রবন্ধ নিষ্প্রয়োজন। ইহাও রঙের বাক্স লইয়া বালকের যেমন-তেমন খেলার মতই প্রচেষ্টা। কাজের কথার মধ্যে ছিল রাষ্ট্রনীতি ও সাহিত্যানুশীলনে আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজনের তাগিদ। অনুকরণের দ্বারা রাষ্ট্র সমাজ বা সাহিত্য গড়ে না বা টেঁকে না। “যাঁহারা খাঁটি হৃদয়ের কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মরিবে না।”

মুক্তজীবনের সহজ প্রবাহ পদে পদে ক্ষুণ্ন হইয়া অন্তরকে পীড়িত করিতেছে; নিশ্চেষ্টতার অবসাদ-জড়িমা হইতে বাহিরে আসিবার জন্য বেদনা মানুষের চিরন্তন, কবিচিত্তও তাহারই জন্য ব্যাকুল। অথচ তখনকার ‘যে-সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে-দেশানুরাগের মৃদু মাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে’ দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত কোনোদিন আকৃষ্ট হয় নাই। দেশ সম্বন্ধে সমস্যা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, দেশবাসী সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর রাষ্ট্রতত্ত্ব স্থাপিত নহে। ‘হাতে কলমে’[৫] নামক যে-প্রবন্ধটি কয়েকমাস পরে সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে পাঠ করেন, তাহাতে দেশসেবা সম্বন্ধে খুব মোটা কথা শক্ত ভাষায় দেশবাসীদের কর্ণগোচর করাইবার চেষ্টা করেন।

১ ন্যাশনল ফণ্ড, ভারতী ১২৯০ কার্তিক, পৃ. ২৯৩।

২ টৌন্‌হলের তামাশা, ভারতী ১২৯০ পৌষ, পৃ. ৪১৮-৪২১।

৩ কলিকাতার ওয়েলিংটন স্ট্রীটের নিকট অক্রূর দত্তের গলি আছে; এই অক্রূর দত্ত কোম্পানির আমলে কমিশেরিয়েট বিভাগে কার্য করিয়া ধনবান হন। এই দত্তপরিবারের বংশধরগণ ‘সাবিত্রী’ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। সাবিত্রী লাইব্রেরী ও ‘আলোচনা’ নামে পত্রিকার সম্পাদক লেখিকা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর দেবর গোবিন্দলাল দত্ত। ‘সাবিত্রী’ অর্থাৎ সাহিত্য লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীরচনা।...পিপেলস্ লাইব্রেরী, ৭৮ নং কলেজ স্ট্রীট। আশ্বিন ১২৯১। রবীন্দ্রনাথ সাবিত্রী লাইব্রেরীতে ১২৯০ সালের ১১ই চৈত্র ‘অকাল কুষ্মাণ্ড’, ১২৯১ সালের ১১ ভাদ্র ‘হাতে কলমে’ পাঠ করেন।

৪ অকাল কুষ্মাণ্ড, ভারতী ১২৯০ চৈত্র, পৃ. ৫২৯-৪৪।

৫ হাতে কলমে, ভারতী ১২৯১ আশ্বিন পৃ. ২২৮-৪১। সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৬ষ্ঠ অধিবেশনে ১২৯১ ভাদ্র ১১ (১৮৮৪ আগষ্ট ২৬) তারিখে পঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে দেশের কাজ বলিতে যে-একটা রাজনৈতিক ধুয়া উঠিয়াছে তাহা শূন্যগর্ভ কথামাত্র; কারণ দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য না করিলে দেশের উন্নতি হয় না, অথচ দেশবাসী যখন অত্যাচারে উৎপীড়িত, অপমানে লাঞ্ছিত, মারীভয়ে পীড়িত, অন্নবস্ত্রাভাবে ক্ষীণ, তখন রাজনৈতিক নেতারা ঐসব দুঃখ আধিব্যাধি নিরাকরণের জন্য ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হন। দেশবাসীদের প্রতি যে দেশবাসীর কোনো কর্তব্য আছে, তাহা উদ্‌বুদ্ধ করিবার কোনো প্রয়াস তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় না। ইহাকেই তিনি দেশের পরিচয়হীন, সেবাবিমুখ আন্দোলন বলিয়া নিন্দা করেন। 'হাতে কলমে' কাজের একটি উদাহরণ তিনি দেশবাসীর সম্মুখে পেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজ কর্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা-না-একটা শুনিতেই হয়।" এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার যে-শক্তি তাহাকেই তিনি যথার্থ দেশের জন্য 'হাতে কলমে' কাজ বলিলেন—সভা বা agitation নহে।

আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তখন প্রায়ই ইংরেজ কর্মচারী বণিক ও গোরারা ভারতবাসীর উপর কারণে-অকারণে উপদ্রব করিত, নিষ্ঠুর হত্যার কথাও সময়ে-সময়ে শোনা যাইত; কিন্তু তাহার প্রতিকার প্রায়ই হইত না। রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রশ্নটাই সেদিন বড় করিয়া দেখা দিয়াছিল। তাই স্বদেশী কাজ বলিতে কি বুঝায় তাহারই দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন, "যতবার মফস্বলে একজন ইংরেজ একজন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার সেই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক-পা এক পা করিয়া আরও নাবিতে থাকে। কেবল কতকগুলা মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্যাদা শিক্ষা দিবে কি করিয়া।··শিক্ষা দিতে চাও তো এক কাজ কর; একবার একজন ইংরাজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ কর, একবার সে বুঝিতে পারুক ইংরেজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে। ·তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্যাদাজ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে।·· ইংরাজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে কতকটা তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইবে, দাসত্বের থরথর-ভীতি দূর হইবে ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব। সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিনই বা কখন আসিবে? যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা, এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।"[১]

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, সমাজের প্রথম অবস্থায় মহাপুরুষ কাজ করেন, তাহার পরিণত অবস্থায় মহামণ্ডলী (community) সেই কার্য সুসম্পন্ন করে। এই মহামণ্ডলীই হইতেছে মহামানব; মহাপ্রয়াণের পূর্বে তিনি এই মহামানবের আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করিয়া গাহিয়াছিলেন 'ঐ মহামানব আসে'। দেশের কাজ বলিতে রবীন্দ্রনাথের মতে একটা দেশব্যাপী ভীষণাকার কাজের প্রোগ্রাম নহে। তিনি বলিলেন "ছোটো কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ডমূর্তি কাজের ভান ফাঁকি মাত্র! আমাদের চারি দিকে আমাদের আশে-পাশে আমাদের গৃহের মধ্যে আমাদের কার্যক্ষেত্র।" পরযুগে লিখিত 'স্বদেশী সমাজে'র ইহাই পূর্বাভাস এবং গঠনমূলক কার্যের ইহাই প্রথম খসড়া।

আমরা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদ আলোচনা করিতে গিয়া সমকালীন অন্যান্য রচনার কথা বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার কাব্যে ও অন্তর্জীবনে অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সমরেখায় কবির জটিল

১ হাতে কলমে, ভারতী ১২৯১ আশ্বিন, পৃ. ২৩১-৩৪।

চিত্তের সকল আন্দোলন ও অনুভূতিকে দেখানো অসম্ভব। 'প্রভাতসংগীত' ও 'ছবি ও গানে'র যুগে লিখিত গদ্যরচনা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, যদি 'আলোচনা'[১] নামে গ্রন্থের কথা এখানে না বলি। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যুগে লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও এই যুগে লেখা 'আলোচনা'; "এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে-প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।"—জীবনস্মৃতি। বাহিরের জগতের ছবি মনের দর্পণে পড়িয়া যে-সুরের প্রতিচ্ছবি আনে, ছন্দে তাহা রূপ পায় ছবি ও গানে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই কাব্যরচনাকে বালকের রঙের বাক্‌স লইয়া খেলার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; আমরা তাঁহার গদ্যরচনাকেও সেইরকম রঙিন বাক্য লইয়া খেলার কথা বলিয়াছি। কিন্তু চিন্তাশীল মানুষের মন কেবল বহির্বিষয়ী জগতের রঙিন খেলায় তৃপ্ত থাকে না; সে মনোজগতের অনন্ত লীলারাশিকে পর্যবেক্ষণ করিতে বিশ্লেষণ করিতে ভালোবাসে, নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া হয়, লিখিতে লিখিতে তত্ত্ব উদ্‌ভাসিত হয়, তর্ক করিতে করিতে সত্য প্রকাশ পায়। সেইজন্য এক শ্রেণীর মনীষীরা নিরন্তর লেখেন, কথা বলেন, লিখিতে লিখিতে ভাবেন ও ভাবিতে ভাবিতে লেখেন— এটা পরের জন্য নহে নিজের জন্যই মুখ্যত ইহার প্রয়োজন।

যৌবনের রচনা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'আলোচনা' গ্রন্থখানিকে তাঁহার গদ্যগ্রন্থসংগ্রহ হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু তরুণ কবি ও মনীষীর এই রচনার মধ্যে যে-গভীর মননশক্তির আভাস পাই, তাহাকে আমরা তাচ্ছিল্য করিতে পারি না। জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "আলোচনা নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির পরিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।" আলোচনার অন্তর্গত 'ডুব দেওয়া' প্রবন্ধটির মধ্যে যে-ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ আছে তাহাদের কয়েকটির মধ্যে প্রকৃতির পরিশোধের কথাই বহুবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'আলোচনা'য় সবশুদ্ধ ছয়টি প্রবন্ধ আছে। যথা— ডুব দেওয়া, ধর্ম, সৌন্দর্য ও প্রেম, কথাবার্তা, আত্মা ও বৈষ্ণব কবির গান। এই প্রবন্ধগুলি আবার ছোট ছোট উপপ্রবন্ধে বিভক্ত। এই বইয়ের লিখনভঙ্গি 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ন্যায় হইলেও সুরের পার্থক্য ইহাতে খুবই বিদ্যমান। 'আলোচনা'র রচনাগুলি 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র লেখার মত হালকা রচনা নয়, বয়স্ক চিন্তাশীল প্রায়-দার্শনিকের মত গভীর গম্ভীর ও জটিল। আমরা একটি উপপ্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এ জগতের সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ এই তিন প্রকারের আয়তন দেখা যায়। কিন্তু এইসকল আয়তনের অতীত আর-এক প্রকার আয়তন তাহাদের আছে, তাহাকে· ·বলিব· ·অসীমায়তনতা, বা আয়তনের অসীম অভাব। একটি বালুকণাকে জড়ভাবে দেখিলে তাহাকে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিরূপে জানা হয়; কিন্তু তাহাকে অনন্তজ্ঞানের ও অনন্তকালের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করিলে বালুকণার আকার আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, জানা যায় উহা অসীম।· · আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্ব বলি, তাহা কোনো কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষু যদি অণুবীক্ষণের

১ আলোচনা ১৮৮৫ অব্দে [১২৯২ বৈশাখ?] প্রকাশিত হয়। কালানুক্রমিক রচনাগুলি প্রদত্ত হইল। 'ধর্ম'— ভারতী ১২৯০ চৈত্র, পৃ. ৫৬৭-৫৭৩। 'ডুব দেওয়া'— ভারতী ১২৯১ বৈশাখ, পৃ. ১৮-২৯ [ছোটবড়, ডুবিবার স্থান, পুরাতনের নূতনত্ব, সাম্য, স্বদেশ, কেন, এককাঠা জমি, জগৎ মিথ্যা, তুলনায় অরুচি, জগৎ সত্য, প্রেমের শিক্ষা]

সৌন্দর্য ও প্রেম, ভারতী ১২৯১ আষাঢ়, পৃ. ৯৬ [সৌন্দর্যের কারণ, সৌন্দর্য বিশ্বপ্রেমী প্রভৃতি]

কথাবার্তা, ভারতী, ১২৯১ শ্রাবণ, পৃ. ১৩৭-১৪০।

আত্মা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০৬ (১২৯১) শ্রাবণ।

বৈষ্ণব কবির গান, নবজীবন ১২৯১, দ্বিতীয় বর্ষ. কার্তিক।

মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবীক্ষণতা-শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কি, পরমাণুর বিভাজ্যতার তো আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটি পর্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে, ছোট বড় আর কোথায় রহিল! একটি পর্বতও যা, পর্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই; কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্ঞেয়তায় অসীম, দেশে অসীম তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে তাহার অনন্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান একত্রে বিরাজ করিতেছে। তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না। অতএব একটি বালুকা অসীম দেশ অসীম কাল অসীম শক্তি, সুতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকামাত্র। চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিস সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়তো ছোট বড়র উপর অসীমতা কিছুমাত্র নির্ভর করে না। হয়তো ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে। হয়তো অসীমকে ছোটই বলো আর বড়ই বলো সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে!
বড় ছোট কিছু নাই সকলি মহৎ।[১]

'ডুব দেওয়া'র উপপ্রবন্ধগুলিতে আমাদের প্রত্যেক জ্ঞেয় জিনিসের পিছনে যে-অদৃশ্য অসীমতা আছে, লেখক তাহার মধ্যে মানুষকে ডুবিবার জন্য দার্শনিকের মত পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কিভাবে সেই ডুব দেওয়া সার্থক হইতে পারে তাহার উত্তর দিয়াছেন প্রেমিকের মত। তিনি বলিলেন, আমাদিগকে অনুরাগের সেই স্তরে পৌঁছাইতে হইবে, যেখান হইতে বিদ্যাপতির ভাষায় বলা যাইতে পারে 'জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'। দৃষ্টিভঙ্গিই বদলাইয়া গেল। 'স্বদেশ' 'কেন' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বদেশপ্রেমকে একটা নূতন আলোয় দেখার চেষ্টা হইয়াছে। 'ধর্মে'র প্রবন্ধগুলিতে তিনি মানুষের অপূর্ণতাকে এমন একটি বিশ্বজনীন সহানুভূতির স্তর হইতে দেখিয়াছেন যে উহা পাঠ করিলে আমাদের অপূর্ণতাকে দোষের বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় যেন উহা পূর্ণতারই উল্টা পিঠ, অর্থাৎ পূর্ণাপূর্ণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরের কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক সেই মনোভাবকেই ধর্ম বলিয়াছেন যাহার দ্বারা আমরা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যকে মানিয়া চলি।

'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধে তিনি সুন্দরের অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; আপনার মধ্যে যাহার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যবোধ আছে, তাহাই সুন্দর। সমস্তটাই ছন্দোবদ্ধ, বি-সম কিছুই নাই। "যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ, তাহার কোনোখানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই। যাহাতে মিল নাই, তাহা সুন্দর নহে। যাহা সুন্দর তাহার জগতের সাধারণের সহিত আশ্চর্য মিল আছে। আমাদের মনই সৌন্দর্যপিপাসু। এইজন্য সুন্দরকে আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি না। এখন যাহাদের মধ্যে এই সৌন্দর্যবোধ নাই, তাহাদের জন্য কে চেষ্টা করিবে— কবি। তাঁহার কাজই হইতেছে আমাদের মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া।" 'স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক' নামে উপপ্রবন্ধে তিনি কবিদের কাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

১ ভারতী ১২৯১ বৈশাখ। আলোচনা, পৃ. ২-৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত ২, পৃ. ৬-৭।

"কবিরা অমর, কেননা তাঁহাদের বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা গান গাহিয়াছেন। ফুল চিরকাল ফুটিবে, সমীরণ চিরকাল বহিবে, পাখী চিরকাল ডাকিবে, এবং এই ফুলের মধ্যে কবির স্মৃতি প্রবাহিত, এই পাখীর গানে কবির গান বাজিয়া উঠে।" এই সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীকলক্ষ্মী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-ক্ষুদ্র রচনাটি এই প্রবন্ধের শেষে যোজনা করেন, তাহাকে গদ্যকবিতা বলিলে ভুল হইবে না।

'কথাবার্তা' প্রবন্ধে লেখক 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের একটু জের টানিয়াছেন। আলোচনার 'সন্ধ্যাবেলায়' ও 'বিবিধ-প্রসঙ্গে'র 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' দুইটি সমধর্মী প্রবন্ধ হইলেও ইহাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' গভীর দর্শনসুলভ প্রবন্ধ। কিন্তু 'সন্ধ্যাবেলায়'-এর দৃষ্টিভঙ্গি জ্যোতির্বিদ্যার পটভূমিকায় দার্শনিকতা, অর্থাৎ যে-বাঁধানিয়মে প্রকৃতি চলিতেছে সেই নিয়মের উপলব্ধি ইহাতে আছে। 'আত্মা' প্রবন্ধসমষ্টিতে কবি আত্মার অসীমতার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়, এই আত্মবিসর্জন দিয়া আমরা অসীমতায় পৌঁছাইতে পারি। 'বৈষ্ণব কবির গান' পূর্বোল্লিখিত 'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যের পুনরুক্তি মাত্র।[১]

'আলোচনা' গ্রন্থখানি লেখক তাঁহার পিতৃদেবকে উৎসর্গ করেন।

শোক ও সান্ত্বনা

কারোয়ার হইতে ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হইল। জীবনস্মৃতিতে অতি সংক্ষেপে সংবাদটি দেওয়া আছে, "১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।" বিবাহের দিনে প্রিয়নাথ সেনকে নিমন্ত্রণ করিয়া যে-কৌতুকপূর্ণ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা উপভোগ্য।[২]

বিবাহের ব্যবস্থা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি তাঁহাকে সংসারের কর্মরজ্জুতে বাঁধিবারও ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহের দুই দিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট হইতে যে পত্র পাইলেন তাহাতে তিনি খুশি হইয়াছিলেন কি না বলা কঠিন, পিতার পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, "এইক্ষণে তুমি জমীদারির কার্য্য পর্যাবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে [কলিকাতায়] নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশীল বাকী ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্তমতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিব।"[৩] এইভাবে জমিদারি কার্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে-খড়ির সূত্রপাত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহে মহর্ষি উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তিনি তখন নদীপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বাঁকিপুর পৌঁছাইয়াছিলেন। সেখানে সংবাদ পাইলেন যে ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে শিলাইদহের জমিদারিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ দিনই কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের বিবাহ। সারদাপ্রসাদ মহর্ষির কাছে পুত্র অপেক্ষা কম প্রিয় ছিলেন না; যাবতীয় বৈষয়িক কর্মে তিনি ছিলেন তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ। জমিদারি কাজের অনেক হলাহল

১ জীবেন্দ্রকুমার গুহ, রবীন্দ্র-প্রবন্ধের আদিপর্ব, বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ. ৬৩৬-৩৯।

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ ১৩৫০ বৈশাখ (ব্লক করা পত্র) ও জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয়। বিবাহ হয়—১৮৮৩ ডিসেম্বর ৯॥ ১২৯০ অগ্রহায়ণ ২৪।

৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র, ২২ অগ্রহায়ণ, ৫৪ [ব্রাহ্ম অব্দ] বক্সার হইতে লিখিত। দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০, দ্বিতীয় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ. ২৯৬।

নিঃশব্দে পান করিয়া তিনি নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন; দেহমন দিয়া সকল কর্মের সকল গ্লানি বহন করিয়া প্রভুর কার্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর মহর্ষির এই প্রথম শোক। তিনি নৌকা ছাড়িয়া দিয়া পাটনা হইতে রেলপথে বোলপুর আসিলেন। সেখান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া মাত্র তিন দিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকেন ও তার পর সেই যে ঐ বাড়ি ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন, মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্ব ব্যতীত আর সেখানে আসিয়া কখনো বাস করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুপুরুষের উপযুক্ত বধূ সংগ্রহের জন্য বহু চেষ্টা হয়; কিন্তু সংকীর্ণ পিরালী ব্রাহ্মণ সমাজে সেরূপ কন্যা সুদুর্লভ। বহু সন্ধানেও যখন সর্ববাদীসম্মতিক্রমে কোনো বধূ মিলিল না তখন স্থির হইল ঠাকুর-এস্টেটের সামান্য কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর একাদশ বর্ষীয়া কন্যার সহিত রবির বিবাহ হইবে। এক পিরালীত্ব ছাড়া আর কোনো মিল ছিল না এই দুই পরিবারের মধ্যে। জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ এই বিবাহপ্রস্তাবে 'যৌতুক কি কৌতুক' নামে এক কাব্য রচনা করেন। উহার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে—

শর্বরী গিয়াছে চলি'! দ্বিজ-রাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
গন্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
সঁপিছে রবির শিরে বলি' এই 'আশিষি তোমারে
অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক্‌
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার! কুরূপার কবরে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।'[১]

খুলনা জিলার দক্ষিণডিহির শুকদেব রায়চৌধুরীর বংশের বেণীমাধব ছিলেন মহর্ষির এস্টেটের সাধারণ কর্মচারী— সামাজিক আর্থিক আধ্যাত্মিক কোনো দিক হইতেই অভিজাত ঠাকুর-পরিবারের সহিত ইঁহাদের তুলনা হইতে পারে না। তবুও বিবাহ সেইখানেই হইল। মহর্ষি যথারীতি কুল-গোত্রাদি দেখিয়াই বিবাহ দিতেন, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। অভিভাবকদের মতানুসারে গতানুগতিকের বাঁধাপথ ধরিয়াই সমস্ত নিষ্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহ হইল কলিকাতায়, মহর্ষির ব্যবস্থায় তাঁহাদেরই বাড়িতে। বিবাহের সময়ে বধূর বয়স এগারো বৎসর মাত্র। কুলপঞ্জী অনুসারে কন্যার নাম ছিল ভবতারিণী। ঠাকুরবাড়িতে নূতন বধূর ঐ পুরোনো ধরণের নাম একেবারে অচল, সুতরাং নূতন নামকরণ হইল মৃণালিনী এবং সেই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। মনে হয় এই মৃণালিনী নাম রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া, তাঁহার অতিপ্রিয় 'নলিনী' নামেরই প্রতিশব্দ। বিবাহের পর বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ একবার যশোহর গিয়াছিলেন; শ্বশুরবাড়ির সহিত এই প্রথম ও শেষ সম্বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথের মনে জীবনসঙ্গিনী সম্বন্ধে যেসব কল্পনা বা স্বপ্ন ছিল, এই বিবাহের দ্বারা সেগুলি কতদূর সফল হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। তাঁহাকে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহস্থের অল্পশিক্ষিত এগারো বৎসরের বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রধারায়, 'যথার্থ দোসর', 'গোলামচোর' প্রভৃতি রচনায় জীবনসঙ্গিনী সম্বন্ধে যেসব মনোরম মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা যে বাস্তব জগতে সম্ভব নহে তাহা প্রাচীনপন্থী পিতার শাসন-

১ কাব্যমালা, পৃ. ৫০।

ব্যবস্থায় প্রমাণিত হইল। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান যুবকের উপযুক্ত নারী জগতে অলভ্য না হইলেও বাংলার ক্ষুদ্রগণ্ডী পিরালীসমাজের ব্রাহ্মণশাখার মধ্যে যে দুর্লভ, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা জানিয়াই তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাদের মনোনীত বালিকাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে কবিকে বাধ্য করিলেন, কবিও ভবিতব্যের অমোঘ বিধান-জ্ঞানে তাহা মানিয়া লইলেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত নববধূকে গ্রহণ করিলেন। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁহার স্ত্রীকে লিখিত 'চিঠিপত্র' হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি সংসার-বিষয়ে কবি কী স্নেহশীল, কী কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন।

ঠাকুর-পরিবারে আনন্দ-উচ্ছ্বাস যেন কানায় কানায় উছলিয়া পড়িতেছে; পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল—পুত্রকন্যাগণের বিষয়ে মহর্ষির এই শেষ সামাজিক কর্তব্য অনুষ্ঠান। ছোটোবউ'কে তিনি শিক্ষায়-দীক্ষায় ঠাকুর-পরিবারের অন্যান্য বধূ ও কন্যাদের সমতুল্য করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চুঁচুড়া হইতে ৭ ফাল্গুন [১২৯০] দেবেন্দ্রনাথ লিখিলেন, "ইংরাজি শিক্ষার জন্য ছোটবৌকে লারেটো হৌসে পাঠাইয়া দিবে। ক্লাসে অন্যান্য ছাত্রীদিগের সহিত একত্র না পড়িয়া তাহার স্বতন্ত্র শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত উত্তম হইয়াছে। তাহার স্কুলে যাইবার কাপড় ও স্কুলের মাসিক বেতন ১৫ টাকা সরকারী হইতে খরচ পড়িবে।"[১]

পরিবারের সকলেই কলিকাতায়— কেহ জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসনে, কেহ সার্কুলার রোডের ভাড়াটে বাড়িতে। আনন্দ-উল্লাসকে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিবার জন্য একটি অভিনয় করিবার প্রস্তাব হইল; কিন্তু স্থির হইল এই নাটকের রচয়িতা হইবেন অভিনেতারা স্বয়ং। সেইজন্য মোটামুটিভাবে একটা প্লট খাড়া করিয়া অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল— একজন নিজ অংশ লিখিয়া দিলে অপরজন তাঁহার অংশ লিখিবেন, এইরূপে অভিনেতা-লেখকদের হাতে-হাতে ঘুরিয়া একটা জিনিস খাড়া হইল বটে, তবে তাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যায় না। নাটক রচনা এভাবে বারোয়ারী সমবায়-পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয় না। শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই সেই খসড়াকে ছাটিয়া কাটিয়া একটা চলনসই নাটক খাড়া করিতে হইল। নাটকখানির নাম রাখা হইল 'নলিনী', রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাম। ইহাই তাঁহার প্রথম গদ্য-নাটক। ইহার মধ্যে 'ভগ্নহৃদয়ে'র ছাপ এবং 'মায়ার খেলা'র পূর্বাভাস আছে। 'মায়ার খেলা'র ভূমিকায় কবি বলিয়াছিলেন তাঁহার "পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য-নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের সাদৃশ্য আছে।" সেই অকিঞ্চিৎকর গদ্য-নাটিকা হইতেছে 'নলিনী', যাহার নাম পর্যন্ত তিনি জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেন নাই। এই নাটকের গল্পাংশ অতি সামান্য।

যুবক নীরদ নলিনী নামে বালিকাকে ভালোবাসে। নবীনও নলিনীর কাছে আসে, কিন্তু সে নীরদের ন্যায় উচ্ছ্বাসী নহে। তবে সে কথায় পটু, গানে সুকণ্ঠ, বিদ্রূপে চটুল। নলিনী নীরদকে ভালোবাসে; কিন্তু সে-ভালোবাসায় চাঞ্চল্য ছিল না বলিয়া নীরদকে তৃপ্তি দান করিতে পারিত না। নিরাশায় নীরদ দেশত্যাগী হইল। নীরদ চলিয়া গেলে নলিনীর কাছে সমস্ত জগৎ শূন্য ঠেকিল; সে আপন মনে গাহিল— "মনে রয়ে গেল মনের কথা, শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা!" নলিনী ঘর হইতে বাহির হয় না, নবীন তাহাকে ডাকে, প্রতিবেশিনীরা অনুরোধ করে, সে কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না। এদিকে নীরদ বিদেশে নীরজা নামে এক যুবতীর প্রেমে আকৃষ্ট হইল; জোর করিয়া নলিনীকে সে ভুলিতে চায়, কিন্তু পারে না। অবশেষে নীরদ নীরজাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিল, সে নলিনীকে দেখাইতে চায় যে তাহাকে ভালোবাসিবার লোক জগতে দুর্লভ নহে। নলিনীর উদ্যানে বসন্ত-উৎসবে নীরদ-নীরজা আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। কিন্তু নীরজার শুশ্রূষায় সারিয়া

১ লরেটো হাউস রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত কন্যা বিদ্যালয়। মহর্ষির পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ ২য় বর্ষ, পৃ. ২৯৭

উঠিল। অল্পকাল মধ্যে নীরজাই স্বয়ং ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মৃত্যুর পূর্বে নীরজা নীরদ ও নলিনীর হাতে হাত সমর্পণ করিয়া বলিল, "তবে আমি চল্লেম বোন্।"

গ্রন্থ রচিত হইল, কিন্তু অভিনীত হইল না। তাঁহাদের পরিবারের উপর দিয়া মৃত্যুর প্রবল ঝড় চলিয়া গেল। প্রথমেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করিলেন,[১] এবং সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথও[২] অল্পবয়সে কয়েকদিন পরে মারা গেলেন। এই দুইটি ঘটনা মাসাধিককালের মধ্যেই ঘটিয়াছিল, কিন্তু জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার নূতন বউঠাকুরানীর মৃত্যুই তাঁহার কাছে মর্মান্তিক হইয়াছিল বলিয়া ঐ ঘটনা সম্বন্ধে বহু বিস্তারে বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই বউঠাকুরানীর প্রতি কী পরিমাণে অনুরক্ত ছিলেন তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকের নিকট অবিদিত নাই।[৩]

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সাত বৎসর তখন কাদম্বরী দেবী বালিকাবধূরূপে এই গৃহে প্রবেশ করেন। তার পর মাতা সারদা দেবীর মৃত্যুর পর তিনিই মাতৃহীন শিশুদের মাতৃস্থান, বন্ধুস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার সাহিত্যজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন সহায়তা করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী কনিষ্ঠ দেবরের সুকুমার চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম অনুভাবগুলিকে স্নেহের দ্বারা প্রেমের দ্বারা উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন তরুণ কবির নবীন সাহিত্যজীবনের নিত্যসহচর শ্রোতা সমালোচক বন্ধু।[৪] ইঁহাকে ঘিরিয়াই প্রথম যৌবনের সাহিত্যসৃষ্টির অভিযান চলিয়াছিল। তাই এই মৃত্যুর আঘাত তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য বিচলিত করিয়াছিল ; এবং এই মৃত্যুবিচ্ছেদ তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই বেদনায় প্রকাশ পায় বিচিত্র রচনা ; তাহাদের অন্যতম হইতেছে 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে গদ্যকবিতাগুচ্ছ। আমরা 'পুষ্পাঞ্জলি'[৫] হইতে নিম্নে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন। এসব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না! এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারও মনে থাকিবে না— কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না। যেসব লেখা তুমি এত ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গে যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই! এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর-এক দেশে আর-এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ।...

১ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু ১২৯১ বৈশাখ ৮ (১৮৮৪ এপ্রিল ১৯)।

২ হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ ২৪।

৩ কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে লোকে বহুরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। আমাদের যতদূর জানা আছে তাহা মহিলাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিণাম ; রবীন্দ্রনাথকে তিনি খুবই স্নেহ করিতেন। শুনিয়াছি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের জন্য কন্যার সন্ধানে যশোহর গিয়াছিলেন।

৪ "আমার যে-পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি।" পত্র ১৩২৪ আষাঢ় ৮ (১৯১৭ অক্টোবর ২৫)। শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকালবিয়োগে রবীন্দ্রনাথ বালক অমিয়চন্দ্রকে যে-সান্ত্বনাপত্র দেন তাহা হইতে উদ্ধৃত। দ্র. কবিতা পত্রিকা ১৩৪৮ কার্তিক পৃ. ৬।

৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৪৮৫-৯৫। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে ইহা সম্পাদিত। দ্র. ভারতী ১২৯২ বৈশাখ, ৪-১০।

"আমাকে যাহারা চেনে সকলেই তো আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে ডাকে না, এবং সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না। এক একজনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এইজন্য আমরা যাহাকে ভালোবাসি তাহার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই, কারণ সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত; আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে। কত বসন্তে, কত বর্ষায়, কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম। সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শতসহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে। যে-আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধূলা, সতেরো বৎসরের সুখদুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধূলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর-কেহ জানিত না, জানে না।··

"আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আরো সতেরো বৎসর যাইতে পারে!··কত শত দিনরাত্রি একে একে আসিবে। কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে।··যদি অনেক দিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা অজানা, আমার নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়ের নিতান্ত আপনার লোক!"

'পুষ্পাঞ্জলি'র মধ্যে কাদম্বরী দেবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ভক্তি ভালোবাসা সমস্তই সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রচনার মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে নিশ্চয়ই, কারণ তাহা আন্তরিক শোকাশ্রুতে পূর্ণ। শোকের অবস্থায় রচিত বলিয়া তাহা যথার্থ সাহিত্যধর্মী হইতে পারে নাই; সেইজন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ঐ রচনাকে কোনো গ্রন্থের মধ্যে স্থান দেন নাই।

এই ঘটনার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে জীবনস্মৃতি লিখিবার সময়েও তিনি এই বিচ্ছেদ-বেদনার কথা খুবই বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন। "জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন জানিতাম না;··এমনসময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন-কি দেহপ্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়া অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল, তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা রহিল এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া।" সেই সময়ে কিছুকালের জন্য তাঁহার "একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল।" কে তাঁহাকে কী মনে করিতেছে, কিছুদিন এ-দায় তাঁহার মনে একেবারেই ছিল না। "আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল।" পিতা চুঁচুড়া হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া পত্রযোগে তাঁহাকে লিখিলেন, "তোমার শরীর অসুস্থ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, মাথার মধ্যে একপ্রকার কষ্ট ও বুক ধড়ধড় করে। তুমি একেবারে পুষ্টিকর আহার ছাড়িয়া দিয়াছ। তাহার জন্যই তোমার এই দুর্বলতা ও পীড়া। মৎস্য মাংস আহার না করিলে তোমার শরীর পুষ্ট হইবে না।"[১]

'পুষ্পাঞ্জলি' রচনার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে লিখিত 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনার ভাষায় ও ভাবের সহিত আশ্চর্য মিল দেখা যায়; আমাদের মনে হয় পুষ্পাঞ্জলির পুরাতন পাণ্ডুলিপি হাতে পাইয়া কবি নূতন ভঙ্গিতে পুরাতন ভাবকে ব্যক্ত করিলেন। 'লিপিকা'র এই রচনা কয়টি হইতেছে সতেরো বছর, প্রথম শোক, সন্ধ্যা ও প্রভাত।

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩৫০ মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, পৃ. ২৯৮।

পুষ্পাঞ্জলির প্রথম পরিচ্ছেদ 'প্রভাত'। তাহাতে আছে, "সূর্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে? কোন্খানে সন্ধ্যা হইল? এদিকে তুমি জুঁইফুলগুলি ফুটাইলে, কোন্খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে? প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল লাবণ্যে গাছগুলির উপর পড়িয়াছে! এখানে আমাদিগকে জাগাইতে আসিয়াছ, সেখানে কাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে?" লিপিকার 'সন্ধ্যা ও প্রভাতে'তে আছে "এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।" পাঠক যদি লিপিকার কথিকাত্রয় পুনরায় এখন একবার পাঠ করেন তো দেখিবেন এই মহীয়সী নারীর প্রতি কবির কী গভীর প্রীতি ও ভক্তি ছিল, তাঁহার তিরোধানে মনে কী গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কবি জীবনে ইঁহাকে কোনোদিন বিস্মৃত হন নাই; জীবনের গোধূলিতে তিনি তাঁহার কাব্যজীবনের প্রথম আরাধ্যা দেবীকে নানাভাবে বারে বারে স্মরণ করিয়াছেন। 'আকাশপ্রদীপে'র শ্যামা, কাঁচা আম, 'নবজাতকে'র বধূ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে তাঁহারই কথা নানা সুরে ধ্বনিত হইয়াছে।

এই বউঠাকুরানীর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থ উৎসর্গ করেন, কতকগুলি তাঁহার জীবিতকালে, কতকগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে'র মধ্যে তাঁহারই কথা সব থেকে মনে হইত বলিয়া লেখা আছে। 'ভগ্নহৃদয়ে'র উৎসর্গ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া লেখা। সন্ধ্যাসংগীতের 'গান সমাপন' ও বিবিধ প্রসঙ্গের 'সমাপনে' তাঁহারই ইঙ্গিত। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' আছে "তোমাকে দিলাম", সে 'তুমি' ইনিই। 'ছবি ও গান' তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি উৎসর্গ করেন 'শৈশবসংগীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। ভানুসিংহের পদাবলীর উৎসর্গে আছে—"ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।" শৈশবসংগীতের উৎসর্গপত্রে আছে, "এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেইসমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক-না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।"—

যে-মৃত্যুর আঘাত এক মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমস্ত সজীবতা ও সরসতাকে সাময়িকভাবে শুষ্ক ও শীর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তাহা সাহিত্যসৃষ্টিকল্পে সার্থক হইয়াছিল। কবিতাগুলি শোকের মুহূর্তে যে রচিত নহে তাহা বুঝা যায় কবিতার উৎকর্ষ হইতে। এই বিষাদঘন মনোভাবকে তিনি ব্যক্ত করেন 'কোথায়'[১] কবিতাটিতে। অজানা মৃত্যুপথযাত্রীর উদ্দেশেই যে উহা রচিত, তাহা কবিতাটি একবার মাত্র পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। পুষ্পাঞ্জলির পাণ্ডুলিপির মধ্যে ইহার প্রথম খসড়া ছিল।—

হায়, কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে!··
কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে

১ কোথায়, ভারতী ১২৯১ পৌষ, পৃ. ৪০৮। দ্র. কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ, ৪৬-৪৭

কার মুখে চাবে।
হায়, কোথা যাবে! · ·
মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়;
মহা সে বিজন মাঝে হয়তো বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে!

ইহার সহিত 'শাস্তি' 'পাষাণী মা' ও 'আকুল আহ্বান'[১] কবিতাত্রয় পাঠ করিলে এই বিষাদমগ্ন ভাবেরই সন্ধান পাওয়া যাইবে। 'শাস্তি' কবিতা থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে—

থাক্ থাক্ চুপ কর তোরা, ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে।
হেসে কেঁদে আজ ঘুমাল, ওরে তোরা কাঁদাস্ নে আর। · ·
হেসে হেসে গলাগলি করে খেলেছিল যাহাদের নিয়ে,
আজো তারা ওই খেলা করে, ওর খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে· ·
শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।
চুপ করে চেয়ে দেখো ওরে, থামো থামো হেসো না কেঁদো না।

কিন্তু জীবনে কখনো কোনো ভাব— সে দুঃখই হউক আর সুখই হউক— দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। Pure and complete sorrow is as impossible as pure and complete joy— টলস্টয়ের এই উক্তি অতি সত্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কাল-ব্যবধানে সুখদুঃখের সকল অনুভূতি লোপ পায়, তাহারা শান্ত হইয়া মনের অবচেতনস্তরে তলাইয়া যায়; তার পর কোনো অনুকূল বায়ুহিল্লোলে তাহারা পল্লবিত কুসুমিত কণ্টকিত হইয়া উঠে এবং নব নব সাহিত্যসৃষ্টিতে সার্থক হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের কোনো অবস্থাকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাই মৃত্যুশোক তাঁহাকে কর্মবিমুখ জড়তার মধ্যে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই। তাঁহার বিবাহের মাত্র চারি মাস পরে নবীন জীবনের প্রথমে এই শোক। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখিয়াছেন, "ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ; এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল।" 'যোগিয়া'[২] ও 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমির'[৩] মধ্যে এই মুক্তিপ্রয়াসের ধ্বনি জাগিয়াছে। শেষোক্তটিতে বলিতেছেন—

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ-যুগান্তর।

অতীতের 'পুরাতন'[৪] বিষাদকে বিদায় দিবার জন্য বলিলেন—

হেথা হতে যাও, পুরাতন।
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।

১ বালক ১২৯২ আশ্বিন। বর্তমানে 'শিশু'র অন্তর্গত। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ. ৪৮।
২ যোগিয়া. ভারতী ১২৯১ কার্তিক, পৃ ৩২১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ ৩৭।
৩ ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ ৪২।
৪ পুরাতন, ভারতী ১২৯২ চৈত্র। দ্র. কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ ৩১-৩৩।

আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।· ·
কী দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন।
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
ঝড়ে-পড়া পাতার মতন।· ·
ঢাকো তবে ঢাকো মুখ নিয়ে যাও দুঃখ-সুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে,
হেথায় আলয় নাহি; অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

মনের মধ্যে পুরাতন স্মৃতি বার বার আসিয়া উঁকি মারিতেছে, তাই যেন কবি বলিতেছেন— 'তুমি কেন ঢাল আসি তারি মাঝে বিলাপ-উচ্ছ্বাস।'[১] কবি পুরাতনকে বিদায় দিয়া 'নূতন'কে[২] আহ্বান করিয়া ঘরে লইলেন— সত্যই তো তাঁহার ঘরে আজ নূতন লোক আসিয়াছে—

এই যে রে মরুস্থল, দাবদগ্ধ ধরাতল,
এইখানে ছিল 'পুরাতন'
একদিন ছিল তার শ্যামল যৌবনভার,
ছিল তার দক্ষিণ-পবন॥
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল।
· ·
নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয় রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।· ·
এ কি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।· ·

১ তু. মৃত্যুর পরে, ৫ বৈশাখ ১৩০১, চিত্রা।
২ নূতন, ভারতী ১২৯২ বৈশাখ, পৃ ২-৪। কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ. ৩৩-৩৫।

না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা।
সেও চলে যাবে কবে, গীতগান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দু-দিনের খেলা।

রবীন্দ্রনাথের সদাপ্রবহমান মনের যে-চিত্র তাঁহার কাব্যের মধ্যে দিয়া পাইলাম তাঁহার প্রায় সমকালীন একটি গদ্যরচনার মধ্যে মনের এই নিরাসক্ত ভাবের ব্যাখ্যা পাই। 'রুদ্ধগৃহ'[১] শীর্ষক প্রবন্ধটির মধ্যে কবির এই রুদ্ধ মনের সংগ্রামের চিত্র পাই। তিনি এই অস্বাভাবিক রুদ্ধতাকে জীবনে অতি স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন—"পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে, পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাইবোনের মতো খেলা করে।...পৃথিবীতে যাহা আসে, তাহাই যায়" এই অতি সত্য কথা তাঁহার কাছে সেদিন নূতনভাবে মহাসত্যরূপেই দেখা দিয়েছিল; তাই বলিলেন, "এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায়। মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন ?...ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও—জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।" এই দার্শনিকসুলভ নির্বিকার মনোভাব অচিরেই ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া তাঁহার সাহিত্যধারা যথারীতি ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর, বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর হইয়া সম্পদশালী হইতে লাগিল।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর একমাস পরে 'সরোজিনী প্রয়াণ'[২] রচিত; এই রচনার মধ্যে যে লঘুভাব, যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা, যে হাস্যোজ্জ্বল আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সহিত সেই যুগের 'কোথায়' 'পুরাতন' 'নূতন' প্রভৃতি কবিতার সুর বা জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত মনোভাবের বা পুষ্পাঞ্জলির উচ্ছ্বাসের সম্বন্ধ আবিষ্কার করা কঠিন।[৩] আসল কথা, তাঁহার শোক বা সুখ কোনোটিই মনে স্থায়ী রেখাপাত করিত না। তাঁহার ভাবাবেগের পূর্ণ প্রকাশের জন্য—তাহা শোকই হউক বা সুখই হউক—তাহাকে উদ্‌বোধিত করিবার জন্য যতটুকু আঘাত (stimuli) প্রয়োজন হইত, ততটুকু মাত্র তিনি সহ্য করিতেন, তদতিরিক্তকে আমল দিতেন না। এই নিরাসক্তি তাঁহার চরিত্রে যে-নৈর্ব্যক্তিকতা দান করিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি অন্যকে দুঃখ দিয়াছেন। আর নিজের দুঃখ sublimated হইয়া কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার দুঃখ intellectualised emotion-এর একটি রূপ মাত্র, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুমাত্র। তার পর সৃষ্টিসুখ সম্ভোগ হইয়া গেলে বিস্মৃতির চির-পাথারে স্মৃতি ডুবিয়া মরিত।

কিন্তু ইহা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পরিচয় নহে। তাঁহার কর্মহীন রুদ্ধজীবন আত্মপ্রকাশের জন্য উদগ্রীব, কিন্তু পথ পায় নাই। তাই সমগ্র সৃজনীশক্তিকে অন্যের সমালোচনায় ও ভর্ৎসনায় ক্ষয়িত করিতে ব্যাপৃত হন, সমসাময়িক গদ্যরচনা তাহারই সাক্ষ্য। কিন্তু কল্পনা ও কাব্য, ছবি ও গান যেখানে বহুমুখী শোভায় মূর্তি লইয়াছে—সেইখানেই তিনি সার্থক।

১ রুদ্ধগৃহ, বালক ১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক, পৃ. ৩৩৬-৩৯। দ্র. বিচিত্র প্রবন্ধ ১৩১৪।

২ সরোজিনী প্রয়াণ। রচিত ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ ১১ [১৮৮৪ মে ২৩] ভারতী ১২৯১ শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ। দ্র. বিচিত্র প্রবন্ধ ১৩১৪। সংক্ষিপ্তীকৃত রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ. ৪৮৬।

৩ সাবিত্রী লাইব্রেরীতে ১২৯১ ভাদ্র ১১ই 'হাতে কলমে' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সেখানে রাজনৈতিকদের তীব্র সমালোচনা করিতেছেন।

'কড়ি ও কোমলে'র কবিতা এই সময়ের অভিনব সৃষ্টি। কিন্তু স্রষ্টার পক্ষে চিত্র ফুটাইতে হইবে, মাঝে মাঝে গল্প বলা চাই, শুধু অন্তর্বিষয়ী কাব্য রচনায় সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। তাই লিখিলেন 'কাঙালিনী'[১] কবিতা; গল্পের আভাস দিলেন 'ঘাটের কথা'[২] ও 'রাজপথে কথা'[৩] রচনাদ্বয়ে। পর বৎসরে পূর্ণোদ্যমে গল্প উপন্যাস লিখিবেন এ যেন তাহারই উদ্বোধন।

ব্রাহ্মসমাজের সমর্থন

১২৯১ সালটা নানা কারণে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৮৮৪, ৮ জানুয়ারি (১২৯০ পৌষ ২৫) কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হয়; তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৬ বৎসর। এই ঘটনাটি স্মরণীয়। কারণ, তাঁহার তিরোধানের পর হইতে হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার দেখা দিল; আদি ব্রাহ্মসমাজও কর্মতৎপর হইবার জন্য সচেষ্ট হইল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এতকাল ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের যুগপৎ আক্রমণ হইতে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করিয়া নিজ সত্তা ও সত্যকে বজায় রাখিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সংস্কারের প্রতিক্রিয়ায় সংরক্ষণের স্পৃহা মানুষের মধ্যে স্বভাবতই জাগে। প্রাচীন সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংরক্ষণ ও তাহার মতবাদ সমর্থন করিয়া শিক্ষিত হিন্দুসমাজ নব জাতীয়তাকে সুদৃঢ় করিতে উদ্যত হইল। এই নব আন্দোলনের যাজ্ঞিক হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী চিন্তাশীল লেখক এই নূতন ভাবধারার কর্ণধার হওয়ায় সত্যই নব্যহিন্দুসমাজের জড়দেহে নবীন প্রাণ সঞ্চার হইল।

ব্রাহ্মসমাজে গত দশ বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। যে-শাখা দেবেন্দ্রনাথের সমাজসংস্কারবিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তথাকথিত গুরুবাদের আশঙ্কা দেখা দিল। তখন তরুণ সাম্যবাদীর দল কেশবকে ত্যাগ করিয়া নূতন যে 'সমাজ' গঠন করিলেন (১৮৭৮) তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল যুক্তিবাদ বা নিয়মতান্ত্রিকতার উপর—শাস্ত্র নয়, মহাপুরুষ নয়, সংঘ হইল নিয়ামক। এই সমাজের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করিলেন (১৮৮১); তাহার 'মটো' বা মন্ত্র ছিল, 'সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা'—ফরাসীবিপ্লবের বুলি। ইঁহারা ছিলেন উগ্র সমাজসংস্কারক, সংস্কারকের সকল দোষ এবং গুণ সমভাবে ইঁহাদের মধ্যে ছিল। প্রাচীনের কুসংস্কারকে ভাঙিবার উৎসাহ-আতিশয্যে ইঁহারা সংরক্ষণ ও পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে অবহেলা করিয়া এমনি ভাবে আগাইয়া চলিলেন যে, যাহাদের জন্য সংস্কার প্রয়োজন তাহারাই ক্রমে দূর হইতে দুরান্তরে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল, কেবল সংস্কারকের দলে আগাইয়া চলিবার নেশায় চলিতে চলিতে সকল কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ইহাই হইল ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও উদারনীতির মুখপত্ররূপে সঞ্জীবনী (১৮৮১) ও হিন্দুসমাজ সনাতনী নীতির মুখপত্ররূপে বঙ্গবাসী (১৮৮১) আবির্ভূত হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্র সেনের তিরোধানের পর হইতে হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে এই সংরক্ষণ ও সমর্থন নীতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামে দুইটি সাহিত্যিক পত্রিকা প্রায় যুগপৎ দেখা দিল (১২৯১)। এই

১ কাঙালিনী, প্রচার ১ম খণ্ড, ১২৯১ আশ্বিন, পৃ. ১২০-১২৩। কড়ি ও কোমল।

২ ঘাটের কথা, ভারতী ৮ম খণ্ড, ১২৯১ ভাদ্র, পৃ. ৩০০-৩০৯ প্রথম, গল্পসংগ্রহ 'ছোটগল্প' (১৩০০); গল্পগুচ্ছ ১।

৩ রাজপথের কথা, নবজীবন ১ম খণ্ড, ১২৯১ অগ্রহায়ণ পৃ. ২৯৭-৩০২। 'ছোটগল্প' (১৩০০)। বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩১৪) 'রাজপথ' নামে প্রকাশিত হয়। গল্পগুচ্ছ ১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪।

পত্রিকাদ্বয় হিন্দু সমাজের কল্যাণার্থে সনাতন পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া নূতনের পথে চলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থীরা সংস্কার হইতে ভাঙনের পথেই আকৃষ্ট হইলেন বেশি, হিন্দু সমাজের নূতন সংস্কারকের দল সংরক্ষণ ও সমর্থনপন্থী হইয়া প্রগতির পথকে সংকীর্ণ করিতে চলিলেন। ভাঙনপন্থীরা যেমন হিন্দুর সবকিছুকেই মন্দ বলিয়া বিসর্জন দিলেন, সংরক্ষণপন্থীরা তেমনি সবকিছুকেই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক এমনকি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। 'সঞ্জীবনী' ও 'বঙ্গবাসী'[১] এই দুই সাপ্তাহিক উল্টা পথের পথিক; এবার সেখানে আবির্ভূত হইল 'নবজীবন' ও 'প্রচার' এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইল 'তত্ত্বকৌমুদী'।

আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার কালাপাহাড়ী বা radical মত পোষণ করিতেন না; তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র বা তত্ত্ববিদ্যাদির আলোচনায় রত থাকিয়া মনে করিতেন তাঁহাদের ধর্মমতই হইতেছে মূল হিন্দুধর্মসম্মত, আদর্শ হিন্দুর অনুকরণীয়। সুতরাং হিন্দুর যাহা-কিছু গৌরবের তাহার রক্ষী তাঁহারাই, নূতন সংস্কারপন্থী ও নূতন সংরক্ষণপন্থী উভয়েই ভ্রান্ত। সেইজন্য হিন্দুসমাজবিরোধী কোনো অনুষ্ঠান তাঁহাদের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত না। কেশবচন্দ্রের অসবর্ণ বিবাহ আন্দোলন (১৮৭২) তাঁহাদের সমর্থন পায় নাই, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহও তাঁহারা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এতদ্ সত্ত্বেও বঙ্কিমপ্রমুখ নব্য-হিন্দু নেতারা আদি ব্রাহ্মসমাজের এই দাবি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না; রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' পুস্তিকা বঙ্গদর্শনে অভিনন্দিত হইলেও উহার বক্তব্য বিষয় হিন্দুদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইতে পারে না একথা লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব নিরাকার পরমেশ্বরের আরাধনা; নব্য হিন্দুরা এই তত্ত্বকেও পরম সত্য বলিয়া মানিতে একেবারে নারাজ। তাই অচিরেই নব্য হিন্দুসমাজের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ বাধিল। এই ইতিহাসটুকু বলা প্রয়োজন, কারণ অবশেষে এই বিবাদ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মসীযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল।

বঙ্কিমের মন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোনোদিনই প্রসন্ন ছিল না, এমনকি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের তিনি ছিলেন পরম বিরোধী। স্বরচিত প্রবন্ধে ও উপন্যাসে তিনি তাঁহার ব্রাহ্মবিদ্বেষ ও বিদ্যাসাগরের প্রাগসর মতের প্রতি কারণে-অকারণে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন।[২] কালে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রতিভার রাজ্যে নিজ শক্তিকে সংকুচিত করিয়া আর রাখিতে পারেন নাই। সমাজসংস্কার বিষয়ে সংরক্ষণ ও সমর্থননীতি প্রচার করিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না, ধর্মব্যাখ্যাতার ভূমিকায় বঙ্গসাহিত্যে অবতীর্ণ হইলেন, হিন্দুধর্মের বিশেষ ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিরোধ বাধিল এইখানে; এতদিন আদি ব্রহ্মসমাজ মনে করিতেন যে হিন্দুধর্মতত্ত্বের একমাত্র বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাত তাঁহারাই; এমন সময়ে বঙ্কিম কোম্‌ত-প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতের সহিত গীতার মতের একটা সমন্বয় খাড়া করিয়া বিশেষ একটি মতকে হিন্দুধর্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। 'নবজীবনে'র (১২৯১ শ্রাবণ) ও 'প্রচারে'র (১২৯১ শ্রাবণ) প্রথম সংখ্যাতে 'ধর্মজিজ্ঞাসা' ও 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে বঙ্কিমের নিজস্ব ধর্মমত ব্যাখ্যাত হইল।[৩]

১ বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক, ১২৮৮, অগ্র ২৬ [১৮৮১, ডিসেম্বর ১০] প্রথম প্রকাশিত হয়।

২ দ্র, বঙ্গদর্শন ১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ, বিষবৃক্ষ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। তারাচরণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এমনকি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেও ঐ উপন্যাস মধ্যে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাব সুপরিচিত।

৩ Dr. Brajendranath Seal, *New Essays in Criticism*, 1903 p. 88, 89, 92 : শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখিত 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ' পৃ. ১১১ পাদটীকা হইতে উদ্ধৃত : "One of the two branches of the Hindu Revival in Bengal headed by Pandit Sasadhar Tarkachudamani and Kumar Sree Krishnaprasanna Sen . . . . the other movement led by Babu Bankim Chandra Chatterjee as its theologian and Babu Chandranath Bose as its essayist and critic and Nabin Chandra Sen as its epic poet . . . . Nabajiban (The New Life) a journal was

'কড়ি ও কোমলে'র কবিতা এই সময়ের অভিনব সৃষ্টি। কিন্তু স্রষ্টার পক্ষে চিত্র ফুটাইতে হইবে, মাঝে মাঝে গল্প বলা চাই, শুধু অন্তর্বিষয়ী কাব্য রচনায় সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। তাই লিখিলেন 'কাঙালিনী'[১] কবিতা; গল্পের আভাস দিলেন 'ঘাটের কথা'[২] ও 'রাজপথে কথা'[৩] রচনাদ্বয়ে। পর বৎসরে পূর্ণোদ্যমে গল্প উপন্যাস লিখিবেন এ যেন তাহারই উদ্বোধন।

ব্রাহ্মসমাজের সমর্থন

১২৯১ সালটা নানা কারণে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৮৮৪, ৮ জানুয়ারি (১২৯০ পৌষ ২৫) কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হয়; তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৬ বৎসর। এই ঘটনাটি স্মরণীয়। কারণ, তাঁহার তিরোধানের পর হইতে হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার দেখা দিল; আদি ব্রাহ্মসমাজও কর্মতৎপর হইবার জন্য সচেষ্ট হইল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এতকাল ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের যুগপৎ আক্রমণ হইতে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করিয়া নিজ সত্তা ও সত্যকে বজায় রাখিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সংস্কারের প্রতিক্রিয়ায় সংরক্ষণের স্পৃহা মানুষের মধ্যে স্বভাবতই জাগে। প্রাচীন সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংরক্ষণ ও তাহার মতবাদ সমর্থন করিয়া শিক্ষিত হিন্দুসমাজ নব জাতীয়তাকে সুদৃঢ় করিতে উদ্যত হইল। এই নব আন্দোলনের যাজ্ঞিক হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী চিন্তাশীল লেখক এই নূতন ভাবধারার কর্ণধার হওয়ায় সত্যই নব্যহিন্দুসমাজের জড়দেহে নবীন প্রাণ সঞ্চার হইল।

ব্রাহ্মসমাজে গত দশ বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। যে-শাখা দেবেন্দ্রনাথের সমাজসংস্কারবিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তথাকথিত গুরুবাদের আশঙ্কা দেখা দিল। তখন তরুণ সাম্যবাদীর দল কেশবকে ত্যাগ করিয়া নূতন যে 'সমাজ' গঠন করিলেন (১৮৭৮) তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল যুক্তিবাদ বা নিয়মতান্ত্রিকতার উপর— শাস্ত্র নয়, মহাপুরুষ নয়, সংঘ হইল নিয়ামক। এই সমাজের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করিলেন (১৮৮১); তাহার 'মটো' বা মন্ত্র ছিল, 'সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা'— ফরাসীবিপ্লবের বুলি। ইঁহারা ছিলেন উগ্র সমাজসংস্কারক, সংস্কারকের সকল দোষ এবং গুণ সমভাবে ইঁহাদের মধ্যে ছিল। প্রাচীনের কুসংস্কারকে ভাঙিবার উৎসাহ-আতিশয্যে ইঁহারা সংরক্ষণ ও পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে অবহেলা করিয়া এমনি ভাবে আগাইয়া চলিলেন যে, যাহাদের জন্য সংস্কার প্রয়োজন তাহারাই ক্রমে দূর হইতে দূরান্তরে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল, কেবল সংস্কারকের দলে আগাইয়া চলিবার নেশায় চলিতে চলিতে সকল কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ইহাই হইল ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও উদারনীতির মুখপত্ররূপে সঞ্জীবনী (১৮৮১) ও হিন্দুসমাজ সনাতনী নীতির মুখপত্ররূপে বঙ্গবাসী (১৮৮১) আবির্ভূত হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্র সেনের তিরোধানের পর হইতে হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে এই সংরক্ষণ ও সমর্থন নীতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামে দুইটি সাহিত্যিক পত্রিকা প্রায় যুগপৎ দেখা দিল (১২৯১)। এই

১ কাঙালিনী, প্রচার ১ম খণ্ড, ১২৯১ আশ্বিন, পৃ. ১২০-১২৩। কড়ি ও কোমল।

২ ঘাটের কথা, ভারতী ৮ম খণ্ড, ১২৯১ ভাদ্র, পৃ. ৩০০-৩০৯ প্রথম, গল্পসঞ্চয় 'ছোটগল্প' (১৩০০); গল্পগুচ্ছ ১।

৩ রাজপথের কথা, নবজীবন ১ম খণ্ড, ১২৯১ অগ্রহায়ণ পৃ. ২৯৭-৩০২। 'ছোটগল্প' (১৩০০)। বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩১৪) 'রাজপথ' নামে প্রকাশিত হয়। গল্পগুচ্ছ ১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪।

পত্রিকাদ্বয় হিন্দু সমাজের কল্যাণার্থে সনাতন পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া নূতনের পথে চলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থীরা সংস্কার হইতে ভাঙনের পথেই আকৃষ্ট হইলেন বেশি, হিন্দু সমাজের নূতন সংস্কারকের দল সংরক্ষণ ও সমর্থনপন্থী হইয়া প্রগতির পথকে সংকীর্ণ করিতে চলিলেন। ভাঙনপন্থীরা যেমন হিন্দুর সবকিছুকেই মন্দ বলিয়া বিসর্জন দিলেন, সংরক্ষণপন্থীরা তেমনি সবকিছুকেই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক এমনকি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। 'সঞ্জীবনী' ও 'বঙ্গবাসী'[১] এই দুই সাপ্তাহিক উল্টা পথের পথিক; এবার সেখানে আবির্ভূত হইল 'নবজীবন' ও 'প্রচার' এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইল 'তত্ত্বকৌমুদী'।

আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার কালাপাহাড়ী বা radical মত পোষণ করিতেন না; তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র বা তত্ত্ববিদ্যাদির আলোচনায় রত থাকিয়া মনে করিতেন তাঁহাদের ধর্মমতই হইতেছে মূল হিন্দুধর্মসম্মত, আদর্শ হিন্দুর অনুকরণীয়। সুতরাং হিন্দুর যাহা-কিছু গৌরবের তাহার রক্ষী তাঁহারাই, নূতন সংস্কারপন্থী ও নূতন সংরক্ষণপন্থী উভয়েই ভ্রান্ত। সেইজন্য হিন্দুসমাজবিরোধী কোনো অনুষ্ঠান তাঁহাদের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত না। কেশবচন্দ্রের অসবর্ণ বিবাহ আন্দোলন (১৮৭২) তাঁহাদের সমর্থন পায় নাই, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহও তাঁহারা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এতদ্ সত্ত্বেও বঙ্কিমপ্রমুখ নব্য-হিন্দু নেতারা আদি ব্রাহ্মসমাজের এই দাবি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না; রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' পুস্তিকা বঙ্গদর্শনে অভিনন্দিত হইলেও উহার বক্তব্য বিষয় হিন্দুদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইতে পারে না একথা লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব নিরাকার পরমেশ্বরের আরাধনা; নব্য হিন্দুরা এই তত্ত্বকেও পরম সত্য বলিয়া মানিতে একেবারে নারাজ। তাই অচিরেই নব্য হিন্দুসমাজের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ বাধিল। এই ইতিহাসটুকু বলা প্রয়োজন, কারণ অবশেষে এই বিবাদ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মসীযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল।

বঙ্কিমের মন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোনোদিনই প্রসন্ন ছিল না, এমনকি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের তিনি ছিলেন পরম বিরোধী। স্বরচিত প্রবন্ধে ও উপন্যাসে তিনি তাঁহার ব্রাহ্মবিদ্বেষ ও বিদ্যাসাগরের প্রাগসর মতের প্রতি কারণে-অকারণে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন।[২] কালে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রতিভার রাজ্যে নিজ শক্তিকে সংকুচিত করিয়া আর রাখিতে পারেন নাই। সমাজসংস্কার বিষয়ে সংরক্ষণ ও সমর্থননীতি প্রচার করিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না, ধর্মব্যাখ্যাতার ভূমিকায় বঙ্গসাহিত্যে অবতীর্ণ হইলেন, হিন্দুধর্মের বিশেষ ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিরোধ বাধিল এইখানে; এতদিন আদি ব্রহ্মসমাজ মনে করিতেন যে হিন্দুধর্মতত্ত্বের একমাত্র বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাত তাঁহারাই; এমন সময়ে বঙ্কিম কোম্‌ত-প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতের সহিত গীতার মতের একটা সমন্বয় খাড়া করিয়া বিশেষ একটি মতকে হিন্দুধর্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। 'নবজীবনে'র (১২৯১ শ্রাবণ) ও 'প্রচারে'র (১২৯১ শ্রাবণ) প্রথম সংখ্যাতে 'ধর্মজিজ্ঞাসা' ও 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে বঙ্কিমের নিজস্ব ধর্মমত ব্যাখ্যাত হইল।[৩]

১ বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক, ১২৮৮, অগ্র ২৬ [১৮৮১, ডিসেম্বর ১০] প্রথম প্রকাশিত হয়।

২ দ্র, বঙ্গদর্শন ১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ, বিষবৃক্ষ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। তারাচরণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এমনকি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেও ঐ উপন্যাস মধ্যে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাব সুপরিচিত।

৩ Dr. Brajendranath Seal, *New Essays in Criticism*, 1903 p. 88, 89, 92 : গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখিত 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ' পৃ. ১১১ পাদটীকা হইতে উদ্ধৃত : "One of the two branches of the Hindu Revival in Bengal headed by Pandit Sasadhar Tarkachudamani and Kumar Sree Krishnaprasanna Sen . . . . the other movement led by Babu Bankim Chandra Chatterjee as its theologian and Babu Chandranath Bose as its essayist and critic and Nabin Chandra Sen as its epic poet . . . . Nabajiban (The New Life) a journal was

বঙ্কিমের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মতের পার্থক্য কোথায় এবং কিসের জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১২৯১ ভাদ্র) বন্ধুর অমন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্ট হইবে।

"সম্প্রতি কোনো কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একটি নূতন ধর্মমত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সে-মত এই যে কোম্‌তের মতই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। 'নবজীবন' নামক অভিনব সাময়িক পত্রিকায় এই মত সমর্থিত হইতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। লেখক এই মত সমর্থন করিয়াছেন যে চিরচমৎকৃতি ও সুখই ধর্ম এবং হিন্দুশাস্ত্রসকল এই মত প্রতিপাদন করিতেছেন। এই মত একটি অদ্ভুত মত বলিতে হইবে। আমরা যদি উক্ত প্রস্তাবের লেখক বঙ্কিমবাবুকে দিনরাত্রি চমৎকার ভাবে দেখি তাহা কি ধর্ম বলা যাইতে পারে?[১]

বিবাদটা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিল অন্য দিক দিয়া। 'নবজীবনে'র প্রথম সংখ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সামান্য সমালোচনা ছিল। ঐ প্রবন্ধের উত্তর ও 'নবজীবন'কে আক্রমণ করিয়া এক পত্র 'সঞ্জীবনী'তে (১২৯১ শ্রাবণ) বাহির হয়; লেখক বোধহয় ছিলেন কৈলাসচন্দ্র সিংহ। এই পত্রের উত্তর দেন 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকে চন্দ্রনাথ বসু এবং "গালাগালির রকমটা দেখিয়া 'ইতর' শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।" তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামী পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, পত্র শেষে ছিল 'র'। অনেকেই মনে করেন ঐ পত্রের লেখক রবীন্দ্রনাথ। লেখক 'ইতর' শব্দটাকে পাল্টাইয়া চন্দ্রনাথের উপর চতুরভাবে আরোপ করিলেন। মোট কথা কোনো পক্ষই হার মানিবার বা দমিবার পাত্র ছিলেন না।

আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহ দেখিয়া মহর্ষি বোধ হয় মনে মনে খুশি হইলেন; মৃতকল্প আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করা যায় ভাবিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নির্বাচিত করাইলেন (১২৯১ আশ্বিন)। যুবক রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক পদে অধিরূঢ় হইয়া নিজ কর্তব্য অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই উৎসাহ ও আগ্রহাতিশয্যের ফলেই বঙ্কিমের সহিত তাঁহার মসীযুদ্ধ হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম, যে-হিন্দুধর্ম তিনি খাড়া করিয়াছিলেন— তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যায় হিন্দুধর্ম নামক প্রবন্ধে দুইটি হিন্দুর তুলনা করেন। একজন আচারভ্রষ্ট কিন্তু যথার্থ ধর্ম বা সুনীতিপরায়ণ, আর-একজন আচারশালী হইয়াও যথার্থ ধর্মভ্রষ্ট। প্রথমটির উদাহরণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, ঐ ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলে না, তবে যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা প্রয়োজনীয়

started as the organ of Neo-Hinduism. Evidently the view on man and the Universe held by thinkers like Mill, Spencer and Darwin, have vitally affected Bankim Chandra's interpretation of Hindu religion and philosophy; but the profoundest influence of all has been that of Auguste Comte, whose Positive Polity and Religion unconsciously appear in almost everything that our author has to say on domestic, social and political ideals and institutions and the creation and conservation of national life specially in his novels Devi Chaudhurani and Ananda-Matha".

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী হইতে জানিতে পারি যে ১৮৮৪ সালে ৩০ জুলাই (১৬ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ ও বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠসিংহ মহর্ষির সহিত চুঁচড়ায় দেখা করিতে যান। আর জানা যায় যে ২ আগষ্ট তারিখে 'নূতন ধর্মমত' শীর্ষক প্রস্তাব সংশোধন করেন। এবং দুই দিন পরে ঐ প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রেরণ করেন। ইহা বঙ্কিমবাবু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিপক্ষে লিখিত। এই তথ্যগুলি রাজনারায়ণ বসুর ডায়ারী হইতে অজিতকুমার কর্তৃক উদ্ধৃত। 'নূতন ধর্মমত' শীর্ষক প্রবন্ধটির রচয়িতা কে তাহা স্পষ্ট নহে; মোট কথা এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্যহিন্দুসমাজের বিরোধের সূত্রপাত হয়।

অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক মিথ্যা কহেন। প্রবন্ধটি স্থিরভাবে পড়িলে তাহার মধ্যে অন্যায় কিছু আবিষ্কার করা যায় না। এই প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ 'প্রচার' ও 'নবজীবন' সম্বন্ধে কোনো বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ উভয় পত্রিকাতেই তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। আশ্বিন মাসে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদ গ্রহণ করার কিছুকাল পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম'[১] শীর্ষক প্রবন্ধের সমগ্র অর্থ গ্রহণ না করিয়াই এক দীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া ফেলিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এমন কিছুই লেখেন নাই, যাহাতে ধর্ম নিন্দিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির নাম দেন 'একটি পুরাতন কথা'[২] ; সিটি কলেজের[৩] হলে উহা পঠিত হয়। এই প্রবন্ধ লইয়া রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে-লেখনী-দ্বন্দ্ব হয় তাহা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সাময়িক সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এখনো তাহাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দুই মহৎ ব্যক্তি— একজন সাহিত্য সাম্রাজ্যের পীঠস্থানে অধিরূঢ় প্রবীণ লেখক, অপরজন সাহিত্যক্ষেত্রের দ্বারে উপনীত নবীন লেখক— ইঁহাদের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, তাহা বর্তমান যুগের বাঙালি পাঠকদের নিকট কৌতুকপ্রদ লাগিবে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন,...তাঁহারা এমন ভাব প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা খারাপ, কিন্তু political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ নাই।...উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে।..আমরা যদি সমস্ত জাতিকে কোনো উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে।..বৃহত্ত একটিমাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।" রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত ; তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিলেন, "কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না ; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের উত্তর দেন, 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দুসম্প্রদায়'[৪] শীর্ষক প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতি কোনো আক্রমণ হইলে প্রায়ই তাহার কোন জবাব দিতেন না। রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়াই জবাবে লিখিলেন, "রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত সুলেখক মহৎ-স্বভাব এবং বিশেষ প্রীতি যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দুই-একটি কথা বেশি বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য, তবে যে কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।" ছায়া অর্থে আদি ব্রাহ্মসমাজ। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন যে আদিব্রহ্মসমাজ ইতিপূর্বে তাঁহাকে তিনবার আক্রমণ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের আক্রমণ চতুর্থ। "গড়পড়তায় মাসে একটি। এইসকল আক্রমণের তীব্রতা পরদায় পরদায় উঠিতেছে।" বঙ্কিমের অভিযোগ যে, 'প্রচারে' ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকবারই তাঁহার কলুটোলার বাসায় সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই। তারপর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বক্তৃতার উৎস খুলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করাতে তিনি একটু আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তিনি লিখিলেন, "তাই মনে করি এ

১ 'হিন্দুধর্ম', প্রচার ১ম বর্ষ ১২৯১ শ্রাবণ পৃ. ১৩-২৩। বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ— বিবিধ পৃ. ১৮৭-১৯২।

২ একটি পুরাতন কথা, ভারতী ৮ম খণ্ড ১২৯১ অগ্রহায়ণ পৃ. ৩৪০-৩৫০। সমালোচনা ১২৯৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী অচ ২ পৃ. ১৫০-১৫৭।

৩ সিটি কলেজ ও সিটি কলেজিয়েট স্কুল তখন গোলদীঘির ধারে ১৩ নং মির্জাপুর স্ট্রীট ছিল। ১৯১৮ অব্দে কলেজ আমহার্স্ট স্ট্রীটের নূতন বাড়িতে উঠিয়া আসে।

৪ আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নবহিন্দুসম্প্রদায় প্রচার ১ম খণ্ড ১২৯১ অগ্রহায়ণ পৃ ১৬১-১৬৪। বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ—বিবিধ পৃ. ৩৯৪-৪০৪।

উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের জবাবে' কৈফিয়ৎ'-এ লেখেন[১] "আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখামুখী উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে, বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল তাই আমার কর্তব্যকার্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না ভরসাও হয় না।" বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।" জ্ঞানত তিনি তাহা না করিলেও অন্তরে অন্তরে তিনি বিশেষভাবেই আদি সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হইবার পরই তিনি এই দ্বৈরথ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন; তৎপূর্বে তিনি বঙ্কিমের প্রবন্ধের মধ্যে বিচার্য বিষয় যে কিছু আছে তাহা আবিষ্কার করেন নাই বা করিলেও তাহা দ্বন্দ্বনীয় মনে করেন নাই। সমাজের সম্পাদক হইয়া কর্তব্যজ্ঞানবোধেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস সমর্থনে প্রবন্ধাদি রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি নিজেকে ব্রাহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিতে কোনো সংকোচ করিতেন না।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রের এই তর্কযুদ্ধ এইখানে সমাপ্ত হয়, কারণ বঙ্কিম আর কোনো জবাব দেন নাই এবং বোধহয় রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। বহু বৎসর পরে জীবনস্মৃতিতে এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে— যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।" এই বিরোধের শেষ কণ্টোৎপাটনে বঙ্কিমের বিপুল মহত্ত্ব তো আছেই, রবীন্দ্রনাথও উহা যেভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারও মহত্ত্ব কম সূচিত হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা করিয়া গেলেও বাংলার সমালোচকবৃন্দ তাঁহাকে এই মসীযুদ্ধের জন্য তিরস্কৃত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। অথচ বঙ্কিম তাঁহার মন হইতে এই হালকা ব্যাপারটাকে একেবারেই মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন; তাহার প্রমাণ অনতিকাল পরে 'ভারতী'র লেখকশ্রেণীর মধ্যে বঙ্কিমের নাম বিজ্ঞাপিত দেখিতে পাই। মনের মধ্যে কোনো কণ্টক থাকিলে ভারতী পত্রিকায় তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবার সম্মতি দান কখনো করিতেন না—ভারতী ঠাকুরবাড়ির কাগজ।

রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হইয়া নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালনে ব্রতী হইলেন। প্রথমেই রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া তরুণ কবি ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসকে সমর্থন ও প্রচার করিলেন। সেদিন তাঁহার এ কথা লিখিতে কোনো সংকোচ হয় নাই "ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম"। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন "প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা-অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব? এইজন্যই বলি ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এ ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারিও না চাহিও না,···ব্রাহ্মধর্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষেরই নিকট ঋণী।"[২] ৫ই মাঘ সিটি কলেজ হলে উহা পঠিত হয়।

লেখক পরবর্তীযুগে 'চারিত্র পূজা'র মধ্যে (১৯০৭) মুদ্রিত করিবার সময় এই দীর্ঘ প্রবন্ধের অনেকখানি বাদ দিয়াছিলেন; তিনি যে এককালে বিশেষভাবে ব্রাহ্ম ছিলেন একথা সাহিত্যের বস্তু নহে বলিয়াই বোধহয় এইসব অংশ

১ কৈফিয়ৎ, ভারতী ১২৯১ পৌষ, পৃ ৪০০-৪০৮।

২ রামমোহন রায়, ভারতী ১২৯১ মাঘ, পৃ. ৪৫৮-৪৭০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৬ শক (১২৯১) চৈত্র। রামমোহন রায় (প্রবন্ধ) পৃ. ৩৪ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। রচনাবলীতে উক্ত পুস্তিকা হইতে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি সংকলিত হইয়াছে। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ, পৃ ৫১১-৫২৪

বাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনচরিতকার হিসাবে আমরা তেইশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রবাহ ও কর্মধারা জানিতে চাহি; পরবর্তীযুগে কিসব কারণে তিনি তাঁহার যৌবনের মতামতকে খণ্ডিত বা লুপ্ত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা যথাস্থানে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী সংস্থারূপে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে এইবার মাঘোৎসবের সময় (৯ই মাঘ) আদি, নববিধান, সাধারণ—তিনটি সমাজের এক সম্মেলনের ব্যবস্থা মহর্ষির নির্দেশে আহূত হয়। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথকে সভার প্রারম্ভে ও শেষে গান করা ছাড়া আর কোনো অংশ গ্রহণ করিতে দেখি না। সমাজের সম্পাদকপদ গ্রহণের পর হইতে মাঘোৎসবের মধ্যে চারি মাসে ৩২টি ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলেন—এটা খানিকটা সামাজিক কর্তব্য হিসাবেই করেন। এই সময়ের কয়েকটি গান অতীব জনপ্রিয়— যেমন 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে', 'সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে' ইত্যাদি।

'রামমোহন রায়ে'র পরিপূরক প্রবন্ধ 'সমস্যা'[১] এই সময়ে লিখিত। প্রথম প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন সত্য; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ব্রাহ্ম হইলেও কতকগুলি সংস্কারের দিক দিয়া তিনি বিশেষভাবেই হিন্দু। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে নবীন ব্রাহ্মেরা (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ) উদারনীতির নামে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্দোষ ও অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি নির্বিচারে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত; ধর্মসাধন হইতে ধর্মসংস্কারের উপর তাঁহাদের আকর্ষণ অধিক। প্রাচীন সংস্কারগুলি ভারতীয়দের সমগ্র সামাজিক জীবনের মধ্যে কী স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা তাঁহারা উৎসাহের আতিশয্যে অনুসন্ধান করিতে পরাঙ্মুখ। রবীন্দ্রনাথের লেখনী চিরদিনই অতিবাদ বা অতিব্যবহারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছে; এই প্রবন্ধে সংস্কারকদের মধ্যে অন্ধ গোঁড়ামির অভিযোগ করিয়া সামাজিক সমস্যাগুলিকে সকল দিক হইতে বিচারের জন্য পেশ করিলেন। আসলে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের মতবাদকে আদর্শ হিন্দুত্ব মনে করিয়া তাহারই সমর্থন করিলেন।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ যখনই কিছু লিখিয়া কোনো বিষয়ের সমর্থন করিয়াছেন, তখনই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে যে, যে-পক্ষকে তিনি সমর্থন করিলেন তাহার সহিত বুঝি-বা তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বা ঐ দলভুক্ত। এই সন্দেহ হইবামাত্র তিনি তাঁহার তথাকথিত সমর্থিত দলকে আঘাত করিয়াছেন। ইহা-যে কেবল সাহিত্যজীবনে হইয়াছে তাহা নহে, বাস্তবজীবনেও বারে বারে ঘটিয়াছে। যখনই কোনো বিষয়, বস্তু, এমন-কি ব্যক্তি, তাঁহার চিত্তের মধ্যে নিজের বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে তখনই কঠোর বৈরাগ্য উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের দ্বারা তাহাকে মন হইতে নির্বাসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে প্রশংসাবাদ করিয়াই উহার সমস্যাগুলি কবির মনশ্চক্ষে তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেইজন্যই 'সমস্যা' প্রবন্ধ লিখিত হয়।

সাহিত্যের সঙ্গী ও সমালোচক

সৃষ্টির সঙ্গে সম্ভোগের যোগ অচ্ছেদ্য। সাধনা হয় নির্জনে; কিন্তু 'সুন্দর ভুবনে' 'মানবের মাঝে' ব্যতীত সম্ভোগ সার্থক হয় না। ধর্মসাধনায় ধর্মবন্ধুসংঘ চাই, সাহিত্যসাধনায় রসিক সমঝদার সুহৃৎ-চক্র চাই। সেইজন্য ধর্মক্ষেত্রে সম্প্রদায় ও সাহিত্যক্ষেত্রে অ্যাকাডেমি বা ক্লাব বা সভা-সমিতির সৃষ্টি। ক্রিটিক বা সমঝদারের স্তুতি নিন্দা কবি জীবনের স্বাস্থ্যের

১ সমস্যা, ভারতী ১২৯১ ফাল্গুন পৃ. ৪৯৩-৫০০। সমালোচনা পৃ. ১৩৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত ২, পৃ. ১৩৭-১৪৪।

পক্ষে একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। জীবনে সেই সৌভাগ্য হইতে রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিত হন নাই। জীবন-প্রত্যুষে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, কাদম্বরী দেবী ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহৃদয় উৎসাহবাণী তাঁহার কাব্য-প্রতিভা বিকাশে যে কতখানি সহায়তা করিয়াছিল, তাহার আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছি। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ নিজের পয়সায় কবির বই ছাপাইয়াছিলেন। 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন; 'ভগ্নহৃদয়' বাহির হইলে ত্রিপুরার মহারাজা তাঁহাকে কিভাবে সম্মানিত করিয়াছিলেন, সেকথা কবি বহুস্থানে বলিয়াছেন। 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে রমেশচন্দ্রের গৃহে সমাদৃত করেন; 'প্রভাতসংগীত' মুদ্রিত হইলে ভূদেবচন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। 'বউঠাকুরানীর হাট' বাহির হইলেও বঙ্কিমের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত উৎসাহ বাণীপূর্ণ পত্র পাইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথের একজন বিশেষ সাহিত্যবন্ধু ও সমঝদার ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক বহু পত্রালাপ হইত; কয়েকখানি পত্র আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 'করুণা'র ন্যায় সামান্য একটা অসম্পূর্ণ উপন্যাস সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ যে-বিস্তৃত সমালোচনা-পত্র তাঁহাকে লেখেন তাহা দেখিয়া মনে হয় চন্দ্রনাথ সত্যই রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন।

এইরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিলে আরও পাওয়া যাইতে পারে। মোটকথা জীবনের আরম্ভ হইতেই সাহিত্যসৃষ্টির যে অনুকূলতা তিনি ঘরে ও বাইরে পাইয়াছিলেন, তাহা খুব কম সাহিত্যিকেরই ভাগ্যে জোটে। নির্দয় সমালোচনা যে তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই, তাহা নহে, তবে তাহা বাল্যে ও কৈশোরে নহে— যৌবন হইতেই উহার সূত্রপাত হয়। স্পর্শকাতর কবিচিত্তে এইসব আঘাতের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত শোচনীয় হইতে পারিত; কিন্তু আঘাতজাত বেদনা তাঁহার জীবনে নিষ্ফল হয় নাই। কারণ, বেদনা প্রকাশেও একটি তৃপ্তি আছে; উহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল মনস্তত্ত্বপূর্ণ প্রহেলিকা। সমবেদনা পাইলে মন খুশি হয় এবং সেই সমবেদনা দর্শাইবার মতো বন্ধু ও স্তাবকের অভাব তাঁহার দীর্ঘজীবনে কোনোদিন ঘটে নাই। ক্রিটিকদের শায়কগুলির দ্বারা বিদ্ধ হইয়া কাতর হইতেন; এবং পরবর্তী যুগে ইঁহাদের কথা বারে বারে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ভক্ত সমাজে বলিয়া একদল লোকের মনে যে ক্ষুব্ধ বিরুদ্ধতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন সাময়িক সাহিত্যে প্রচুর।

কবির যৌবনে কয়েকজন যথার্থ সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকের সহৃদয়তা লাভের যে-সৌভাগ্য হয়, তাহা তাঁহার সাহিত্যজীবনের ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না। বিলাত হইতে ফিরিবার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে, তাঁহার কাব্যপ্রতিভা, সংগীতকুশলতা, মনস্বিতা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন সাহিত্যিক তাঁহার মিত্রগোষ্ঠী চক্রে ধরা দেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-হইতেছেন— প্রিয়নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, আশুতোষ চৌধুরী ও লোকেন পালিত। প্রিয়নাথ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন, "সন্ধ্যাসংগীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। ··ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়ো রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন; তাঁহার ভালোলাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। এক দিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্য দিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস— এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।" আর-একটু কম বয়সে এই শ্রেণীরই সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন অক্ষয় চৌধুরীর নিকট হইতে।[১]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এই সময়ে; তিনি ছিলেন বৈষ্ণব কবি সাধক বলরামদাস ঠাকুরের বংশধর।[২] বৈষ্ণবকাব্যে তাঁহার প্রবেশ ছিল গভীর, তাঁহার নিকট হইতে কবি বৈষ্ণবসাহিত্যের রসবোধশিক্ষা বহুল পরিমাণে লাভ করেন; এঁরই সাহায্যে 'পদরত্নাবলী' সম্পাদিত হয় (১২৯২ বৈশাখ)।[৩] কবি লিখিতেছেন "সন্ধ্যার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিয়া জুটিতেন। গানে এবং সাহিত্যসমালোচনায় রাত হইয়া যাইত। কোনোকোনোদিন দিনও এমনি করিয়া কাটিত।"

আর আসেন যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র নামে উৎসাহী যুবক। যখন তিনি সিটি স্কুলের সামান্য শিক্ষক। পরে নিজ প্রতিভাবলে বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইয়াছিলেন। ইনি দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হইলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইঁহার আজীবন যোগ ছিল। যৌবন হইতে তিনি সাহিত্যামোদী। তিনি তরুণ কবির গানগুলি সংগ্রহ করিয়া 'রবিচ্ছায়া' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ 'প্রকাশকের বক্তব্য'তে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যসেবীদের একাংশের মত কিরূপ ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন "বিধাতা তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, অবকাশ দিয়াছেন, তিনি বিধাতার দানের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।...তাঁহার কবিতাগুলি সরল সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী।...তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি তান লয় স্বরযোগে যখন গীত হয় তখন মনে হয় বুঝি স্বর্গ হইতে সে-সকল সঙ্গীত আকাশ ভাসিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীতলে এ সংসারদাব-দাহে দগ্ধ মানবমণ্ডলীকে শান্তি দিবার জন্যই নামিয়া আসিতেছে। এ ঘোর সংসার কাননে 'তমন-ঘন-ঘোরা-গহন রজনীর' নাম শুনিয়া কোন পান্থ-হৃদয় না ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত হয়? বা সেই 'জীবনের ধ্রুবতারা'র উদ্দেশ পাইয়াই বা কোন অনুতপ্ত হৃদয় না আশ্বাস লাভ করে? বাস্তবিক সে সঙ্গীত শ্রবণে প্রাণ ইহলোকের অতীত হইয়া যায়, পাঠ করিলে অসাড় প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে, ঘোর সংসারমুগ্ধ প্রাণও ক্ষণকালের জন্য উদাসভাব ধারণ করে। তাঁহার স্বভাব-সঙ্গীত প্রকৃতিকে নব ভাবে সাজাইয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করে, প্রকৃতি যেন কোমল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চক্ষের সম্মুখে আগমন করে, তাঁহার প্রণয়-সঙ্গীতগুলি সুমধুর ভাবে হৃদয়-তন্ত্রী আঘাত করে, প্রাণে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করে।"

১ প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথ হইতে ৫।৬ বৎসর বয়সে বড়ো; উভয়ের মধ্যে যৌবনের আরম্ভকাল হইতেই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং সহোদরপ্রীতি দেখা গিয়াছিল। এই সম্বন্ধ প্রায় বিশ বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের দারুণ অর্থ কষ্টের সময় তিনি কিভাবে প্রিয়নাথের উপর নির্ভরশীল, তাহা কবির পত্রগুলি পাঠ করিলে জানা যায়। প্রিয়নাথের মৃত্যু হয় ১৩২৩ কার্তিক ৮ [১৯১৬ অক্টোবর ২৫]। দ্র. প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি।

২ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮): বর্ধমানের ন-পাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা প্রসন্নকুমার রাজসাহী জেলার পুটিয়ার জমিদারি এস্টেটে কাজ করিতেন; শ্রীশচন্দ্রের বাল্যকাল সেখানে কাটে। ১৮৮৫-এ সাব্‌ডেপুটি পদ পান এবং ১৩ বৎসর গয়া, সীতামঢ়ী, কাঁথি, বীরভূম, লোহারডাগা, পালামৌ, গিরিধি ও দুম্‌কায় কাজ করেন। দুম্‌কায় ২৩ কার্তিক ১৩১৫ (১৯০৮ নভেম্বর ৯) মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার— শান্তিনিকেতনের প্রথম ছাত্রবর্গের অন্যতম। দ্র. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৮ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃ. ৩৭-৪৪।

৩ বঙ্কিমচন্দ্র পদরত্নাবলী পাইয়া শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন।" ২৫ আশ্বিন [১২৯২]।— বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, পরিষৎ সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ. ৪১৩।

কড়ি ও কোমলের যুগে তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুচক্রে প্রবেশ করিলেন আশুতোষ চৌধুরী। কিভাবে তাঁহার সহিত পরিচয় হয়, এবং পরিচয় বন্ধুত্বে ও আত্মীয়তায় পরিণত হয়, সে-আলোচনা জীবনস্মৃতিতে আছে। তিনি লিখিয়াছেন "সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে-সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে· ·সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন্-একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।" আর লোকেন পালিত ছিলেন কবির আবাল্য বন্ধু। প্রথমবার বিলাতে তাঁহার সহিত যে-পরিচয় হয় তাহা লোকনের অকাল-মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভক্ত ও সমঝদার। ১৮৮৬ অব্দে তিনি সিবিল সার্বিস পাস করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন।

সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সকলেই যে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য ও সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রতিভাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারেন নাই। অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে অচেনা জনৈক সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে দেখিতেন তাহার একটি উদাহরণ আমরা এইখানে দিব। 'পাক্ষিক সমালোচকে'র (১২৯০ ফাল্গুন) সম্পাদক ছিলেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।[১] তিনি বলিয়াছেন যে, এই পত্রিকার কোনো সামান্য ত্রুটির জন্য সাংবাদিক সমালোচকগণকে রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনার পাত্র হইতে হইয়াছিল। সেই যুগের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুরদাস বহু বৎসর পরে লিখিয়াছিলেন, "প্রায় বঙ্কিমবাবুর লেখার মতো রবীন্দ্রবাবুর রচনা পড়িতে ভালবাসিতাম। কেবল তাঁহার কবিতা বলিয়া নয়, তাঁহার গদ্যপ্রবন্ধ ও সমালোচনা আমাকে সবিশেষ আমোদিত করিত। এজন্য তিনি তখন যেখানে যাহা কিছু লিখিতেন, তাহা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম। তাঁহার লেখায় আমার এত আমোদ ও ব্যগ্রতার কয়েকটি কারণ ছিল, এখনও অবশ্য আছে। প্রথমত তাহাতে আমার কেমন একটু অনির্ব্বচনীয় আরামের উদ্রেক হইত; দ্বিতীয়ত তাহাতে ভাবিবার বস্তু থাকিত; এবং সর্ব্বোপরি তাহাতে দু'কথা বলিবার বিষয় পাইতাম। মানসিক ব্যায়ামের একটা জীবন্ত বস্তু পাওয়া নিজেই এক অনির্ব্বচনীয় আমোদ।"[২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্য ও যৌবনের সুহৃদদের সম্বন্ধে জীবনস্মৃতির বাহিরে খুব কম স্থানেই বলিয়াছেন। প্রিয়নাথ ও শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কোনো পত্র বা প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, যিনি তাঁহার প্রথম সংগীতগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাঁহার নাম পর্যন্ত কখনো তাঁহার কাছে শুনি নাই। তাঁহার প্রথম কাব্য 'কবিকাহিনী' যিনি মুদ্রিত করিয়াছিলেন সেই প্রবোধচন্দ্র ঘোষের নাম জীবনস্মৃতিতে উল্লেখমাত্র করেন নাই; কেবল সেই অজ্ঞাতনামা বন্ধুটি মৃদু পরিহাসভাগী হইয়া বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া মরিয়াছে। এইরূপে সাহিত্যের বহু

১ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নিবাস খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা না পাইলেও, অধ্যবসায়গুণে তিনি সাহিত্যসমাজে নিজ নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী', 'বঙ্গনিবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কিছুকাল কার্য করেন। নবজীবন, সাধারণী, সাহিত্য, সাধনা, নব্যভারত, প্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি মালঞ্চ, সাহিত্যমঙ্গল, সাতনরী, বিজনবালা, উদ্ভটকাব্য, শারদীয়, সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১২৯০ ফাগুন মাসে তিনি 'পাক্ষিক সমালোচক' প্রকাশ করেন। ১৯০৩ (১৩১০ কার্তিক) সালে মৃত্যু হয়। দ্র. জীবনীকোষ পৃ. ৭৩৭। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৮ বৈশাখ-আষাঢ় পৃ. ২৬৯-৭৬। সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৮৪ সংখ্যা। কবিপ্রণাম ১৩৪৮ দ্রষ্টব্য।

২ সাহিত্য ১৩২৩ শ্রাবণ পৃ. ২৩৪।

জ্যোতিকণা কেন্দ্রানুগ শক্তিবলে রবিকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কালে সকলকেই কেন্দ্রাতিগ প্রবলতর শক্তিধর্মে কক্ষচ্যুত হইয়া অদৃশ্য জগতে প্রয়াণ করিতে হয়।[১]

মিত্রভাগ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু মিত্রত্ব স্থায়ী হইবার সৌভাগ্য ছিল না। বহু লোক তাঁহার প্রতিভা সৌন্দর্য সুকণ্ঠ বাকচাতুর্য মনস্বিতা প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানা ভাবে নানা সময়ে পাইয়াছিল; কিন্তু কেহই তাঁহার জীবনকাব্যে চিরদিনের স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর পর আদর্শায়িত (idealised) হইয়া কেহ কেহ কবির মনে বাস করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেখানে তাহারা আইডিয়া মাত্র, রক্তমাংসের মনুষ্য নহে। বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহারা বরাবর এই স্মরণের সৌভাগ্য-অধিকারী হইতেন কিনা সন্দেহ। অনেকেই কবির কাছে মরিয়া অমর হইয়াছেন; তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান। কেন তাহার যৌবনের মিত্ররা পরযুগে ঘনিষ্ঠতার চক্র হইতে বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার কারণ কবির একটি বাক্য হইতেই পরিষ্কার হয়; "মানুষের 'আমি' বলিয়া পদার্থটা যখন নানাদিক হইতে প্রবল ও পরিপুষ্ট হইয়া না ওঠে তখন যেমন তাহার জীবনটা বিনা ব্যাঘাতে শরতের মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়, আমার তখন সেইরূপ অবস্থা।"[২] অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে বলে self-conscious— সেই ভাবটা জাগিবার পর হইতেই ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন সুহৃদগণ ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মন হইতেও তাঁহাদের স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের তেজস্বী মনের অসাধারণ প্রগতির সহিত পদক্ষেপ রক্ষা করিয়া চলা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। তাই যাঁহারা বাল্যে কৈশোরে বা যৌবনে রবিচক্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারো এমন অসামান্য প্রতিভা ছিল না যাহাতে রবীন্দ্রনাথের সদাচলমান চিত্তের সহিত চলিতে সক্ষম হইতে পারেন। সুতরাং কালধর্মানুসারে তাঁহারা ঝরিয়া পড়িয়া যান। আমাদেরই ব্যক্তিগত জীবনে বাল্যের কয়জন সুহৃদকে এখন স্মরণ করি! কবি সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। দুঃখের বিষয়— অযোগ্য শিষ্য, নিকৃষ্ট অনুকারক ও অলস স্তাবকদল সকল রচনাকে সমপর্যায়ে ফেলিয়া সমস্তকেই অপরূপ জ্ঞান করিত। কিন্তু কবির সকল রচনাই যে সমালোচনার উর্ধ্বে এমন মত বুদ্ধিমান কবি স্বয়ং পোষণ করিতেন না। এই আতিশয্যের প্রতিক্রিয়ায় নিছক নিন্দাবাদের জন্ম হইল; ইহারই নাম হইল নিরপেক্ষ সমালোচনা! রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল সমালোচনা অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া হইত না— হইত তাঁহার স্তাবক অনুকারী শিষ্যবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া। কালে এই সমালোচকের দল সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্র-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই সমালোচকশ্রেণীর মধ্যে বাংলাসাহিত্যের অনেক মনীষীও ছিলেন এবং তাঁহাদের সকল মতামতই বিদ্বেষপ্রসূত বলিয়া উপেক্ষা করা সুস্থ দৃষ্টির চিহ্ন নহে।

কিন্তু এইখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে নিন্দাপ্রশংসা মাত্রই আপেক্ষিক; অর্থাৎ আর্টের বিষয়টিকে কে কিভাবে দেখিতে পারেন তাহারই উপর স্তুতিনিন্দা নির্ভর করে। আর্টের গুণাগুণ বিচারের অধিকার অর্জন করিতে যে-মার্জিত শিক্ষার প্রায়োজন, তাহা সকল শ্রেণীর সমালোচকের নিকট আশা করা যায় না। বিচারের একটি বড় অংশ দৃষ্টিভঙ্গি। পরিপ্রেক্ষণায় দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে চিত্রসৌন্দর্য বুঝা যেমন কঠিন, ভাষা রস স্বর অনুভাব বুঝিতে অপারক ব্যক্তির পক্ষে সাহিত্যবিচার করাও তেমনি কঠিন। বিশেষভাবে কাব্যাদি সমালোচনার জন্য মার্জিত রুচি সুশিক্ষা রসবোধাদি একান্ত প্রয়োজন।

১ প্রিয়নাথ ও শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কোনো পত্র বা প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যু হয় 'গোরা'র দ্বিতীয় বর্ষে (১৩১৫), প্রিয়নাথের মৃত্যু হয় সবুজপত্রের যুগে (১৩২৩)। ১৩৪০ সালে কবির বাহাত্তর বৎসর বয়স কালে 'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি' [প্রিয়নাথ সেনের কয়েকটি রচনা ও পত্রের সংগ্রহ] গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটি সামান্য ভূমিকা লিখিয়া দেন, কিন্তু সে লেখায় কোনো দীপ্তি নাই।

২ জীবনস্মৃতি।

'বালক' পত্রিকা

১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে ঠাকুরবাড়ি হইতে 'বালক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সম্পাদক হইলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী। ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য তিনি থাকেন কলিকাতায়; তাঁহার ইচ্ছা বাড়ির বালকবালিকাদের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু কেবল তাহাদের রচনার দ্বারা মাসিকপত্র চলিতে পারে না বুঝিয়া রবীন্দ্রনাথের উপর ইহার পরিচালনাভার অর্পিত হইল। নূতন পত্রিকার আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে নূতন প্রেরণা আনে।[১] বিচিত্র রচনাসম্ভারে উহাকে অপরূপ করিয়া তোলেন। সব্যসাচী সাহিত্যিক 'বালকে'র জন্য গল্প উপন্যাস নাটিকা কবিতা ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বালকদের জন্য লিখিতেছেন বলিয়া কোনো রচনার মধ্যে তরলতা বা লঘুতা নাই, তিনি সাহিত্যের সৌন্দর্যসৃষ্টিতে মন দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন যে বালক এককালে মানুষ হইয়া উঠিবে, সুতরাং তাহার মানসিক খাদ্য মনুষ্যোচিত হওয়া উচিত। মানুষের বিকৃতি শিশু নহে, শিশুর পরিণতি মানুষ— এ সহজ তত্ত্বটি তিনি মানিতেন। তাই সাহিত্য-সৃষ্টির নূতন প্রেরণায় শিশুদের জন্য যেসব কবিতা লিখিলেন, সেগুলি উপদেশমূলক নীতিকবিতা নহে, সেসব কবিতা শিশুচিত্তের কল্পনার উদ্বোধক, শিশুর ব্যক্তিত্ববোধ উন্মেষের সহায়ক। তাঁহার প্রথম 'শিশু' কবিতা বাংলার বর্ষামুখর দিনের আদি ছড়া— 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান'।[২] ইহার পরেও আরেকটি কবিতা ছড়া দিয়া শুরু— 'সাত ভাই চম্পা'![৩] অতঃপর হাসিরাশি, পুরানো বট, মা লক্ষ্মী, আকুল আহ্বান ও কাঙালিনী[৪] লেখেন— সবগুলিই শিশু মনের উপযুক্ত কবিতা। এই কবিতাগুলির মধ্যে ভাবেরও একটি আত্মীয়তা আছে। প্রভাতসংগীতের 'পুনর্মিলন' কবিতার সুর শোনা যায় 'পুরানো বটে'।—

> নিশিদিন দাঁড়ায়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
> ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট।
> মনে কি নেই সারাটা দিন বসিত বাতায়নে,
> তোমার পানে রইত চেয়ে অবাক দু নয়নে?

পাঠকদের কাছে মাসিকপত্রের প্রধান আকর্ষণ হইতেছে গল্প ও উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথকে মাসিকের সেই চাহিদা পূরণ করিতে হইল। প্রথমেই লিখিলেন নাতিদীর্ঘ গল্প 'মুকুট' ও তৎপরেই শুরু করিলেন ধারাবাহিক উপন্যাস 'রাজর্ষি'। উভয়েরই বিষয়বস্তু সংগৃহীত হইল ত্রিপুরা-রাজবংশের প্রাচীন কাহিনী হইতে। ত্রিপুরার ইতিহাস হইতেই দুইটি গল্পের আখ্যানভাগ গ্রহণের কোনো কারণ আছে কিনা, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিরর্থক নহে। স্বাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা'[৫] গ্রন্থের সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ (১২৫৮-১৩২১) এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক; তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' পত্রিকার প্রবন্ধে ইহাকে 'রবীন্দ্রবাবুর

১ তু. সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সবুজপত্র, বিচিত্রা, পরিচয় প্রভৃতির রচনা।

২ 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', বালক ১২৯২ বৈশাখ পৃ. ১-২ [১৮৮৫ এপ্রিল]; কড়ি ও কোমল। পরে শিশুর মধ্যে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ ৫৮।

৩ 'সাত ভাই চম্পা', বালক ১২৯২ আষাঢ় পৃ. ১০৭-১০৮। দ্র. শিশু। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ. ৬১।

৪ কাঙালিনী, প্রচার ১ম খণ্ড ১২৯১ আশ্বিন পৃ. ১২০-১২৩। কড়ি কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ. ৩৯।

৫ কৈলাসচন্দ্র সিংহ, রাজমালা ১৩০৩ (১৮৯৭) পৃ. ১৩+৬১+৫৯৬।

নায়েব' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কৈলাসচন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিপুরার আখ্যানগুলি সংগ্রহ করেন; কৈলাসচন্দ্র 'রাজমালা'র মালমসলা বোধ হয় তখনই কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কবি গল্প দুটির ঐতিহাসিক কাঠামো সংগ্রহ করেন এইভাবে। তবে রাজর্ষির প্রথমাংশের কাহিনীটুকু তাঁহার স্বপ্নলব্ধ, তাহা জীবনস্মৃতিতে কবি বিবৃত করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসুর সহিত দেওঘরে দেখা করিয়া ফিরিবার পথে— ট্রেনে ভীড়, একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় দেখিলেন কোনো-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর রক্তচিহ্ন; এই দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার পিতাকে প্রশ্ন করিতেছে, "এ কি, এ যে রক্ত।" এই স্বপ্নের সঙ্গে ত্রিপুররাজ গোবিন্দমাণিক্যের কাহিনী জুড়িয়া রাজর্ষি গল্পের শুরু হয়। 'বালকে' আষাঢ় মাস হইতে ফাল্গুন মাস (১২৯২) পর্যন্ত ধারাবাহিক ২৬টি অধ্যায় মুদ্রিত হয়, কিন্তু শেষ হয় নাই, পর বৎসর শেষ পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন। শেষাংশ লিখিবার জন্য উপাদান সংগ্রহার্থ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজকে এক পত্র দেন (১২৯৩ বৈশাখ ২৩)। ত্রিপুরাধিপতি ইতিপূর্বে ভগ্নহৃদয় কাব্য প্রকাশিত হইলে তরুণ কবিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, আজও তাঁহার পত্রের উত্তরে ত্রিপুরার ইতিহাস সম্বন্ধে বহু তথ্য সরবরাহ করিয়া পত্র দিলেন (১২৯৬ ত্রিপুরাব্দ, ১২৯৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮)।[১]

যে-বৈশাখ মাসে (১২৯২) 'বালক' পত্রিকায় বালকদের উপযোগী 'মুকুট' গল্প ও শিশুদের উপযোগী কবিতা বাহির হইল, সেই মাসেই ভারতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল 'পুষ্পাঞ্জলি' ও 'রসিকতার ফলাফল'। পুষ্পাঞ্জলি লিখিত হয় কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুস্মরণে। 'রসিকতার ফলাফল' একটি বিদ্রূপাত্মক রচনা। যাহাদের রসবোধ নাই তাহারা রসিকতার চেষ্টা করিলে পাঠকশ্রেণীর উপর কী ফল হইতে পারে, তাহারই রসালোচনা। পুষ্পাঞ্জলি ও রসিকতার ফলাফল সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের রচনা সে কথা বলাই বাহুল্য।

মুকুটের গল্পাংশ সামান্য; ত্রিপুরার তিন রাজকুমারদের মধ্যে বিরোধের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বা যুবরাজ সর্বসহা, স্নেহশীল; কনিষ্ঠ ভ্রাতার চক্রান্তের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গল্পের মধ্যে ইহারই চরিত্র আদর্শবাদীরূপে ফুটিয়াছে। আর ফুটিয়াছে কর্তব্যপরায়ণ সেনাপতি ইশা খাঁর চরিত্র, খাঁটি মুসলমান চরিত্র— জান্ ও জবান যাহার এক।[২]

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রাজর্ষির গল্পাংশ ত্রিপুরা-ইতিকাহিনী হইতে সংগৃহীত। রাজর্ষির গল্পের কিয়দংশ লইয়া কয়েক বৎসর পরে 'বিসর্জন' নাটক রচিত হয়। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একটি ক্ষুদ্র বালিকার কথায় মর্মাহত হইয়া ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে জীববলি নিষেধ করেন। মন্দিরের পুরোহিত বা চোন্তাই রঘুপতি পূজাদি ব্যাপারে

১ 'রবি' পত্রিকা। আগরতলা ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ চৈত্র, পৃ. ৩৭৭-৩৭৯। রাজর্ষি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ মাঘ [১৮৮৭ ফেব্রুয়ারি ১১] দ্র. জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ২৮২-২৮৪।

২ এই গল্পের অমরমাণিক্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কিম্বদন্তীমূলক ইতিহাস অনুসারে ইনি ১৫৭তম রাজা, রাজর্ষি উপন্যাসের গোবিন্দমাণিক্যের (১৬৩) চারিপুরুষ পূর্বে রাজত্ব করিতেন। অমরমাণিক্যের চারি পুত্র— রাজদুর্লভ, রাজধর, অমরদুর্লভ ও যুঝার সিংহ। জ্যেষ্ঠ গতায়ু হয়; তিন ভ্রাতার মধ্যে রাজধর যুবরাজ হন। রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ যুঝার সিংহের নাম দিয়েছেন রাজধর। ইনি অতিশয় ক্রোধী ও দাম্ভিক ছিলেন এবং ইঁহার স্বভাবদোষে রাজ্যের অনেক অনর্থ ঘটে। আরাকানরাজের ত্রিপুরা-আক্রমণ ঐতিহাসিক ঘটনা; উক্ত রাজা কর্তৃক প্রদত্ত মহামূল্যবান এক 'মুকুট' হইতে ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এই বিরোধের সুযোগ লইয়া আরাকানরাজ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন; এই যুদ্ধে কনিষ্ঠ যুঝার সিংহ নিহত ও যুবরাজ রাজধর আহত হওয়ায় ত্রিপুরার পরাভব হয়। রাজধরমাণিক্য ১৫০৮ শকে (১৫৮৬ খ্রীষ্ট) রাজ্যাভিষিক্ত হন। রাজধানী ছিল উদয়পুর। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. রাজমালা, তৃতীয় লহর।

রাজহস্তক্ষেপকে অনধিকার চর্চা মনে করিয়া রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। রঘুপতি রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে ত্রিপুরার রাজা করিবেন স্থির করিলেন ও তাহাকে রাজহত্যায় প্ররোচিত করিলেন। কিন্তু নক্ষত্র ভীরুস্বভাব; সে রাজহত্যা করিতে পারিল না। অবশেষে সে রঘুপতির প্ররোচনায় রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবকে দেবীর সমক্ষে বলি দিবার জন্য অপহরণ করিলে, গোবিন্দমাণিক্য উভয়কে মন্দিরে গিয়া গভীর রাত্রে ধরিয়া ফেলেন। উভয়েই রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইলেন। ইতিমধ্যে রঘুপতি মন্দিরের সেবক জয়সিংহকে রাজহত্যায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন। রঘুপতির নির্বাসনের পূর্বরাত্রে জয়সিংহ দেবী সমক্ষে আত্মহত্যা করিল। অতঃপর নির্বাসিত রঘুপতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য মুঘল সুবেদার শাহ সুজার সহিত রাজমহলে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন ও ত্রিপুরা আক্রমণে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। নির্বাসিত নক্ষত্ররায়কে দলভুক্ত করিয়া মুঘল বাহিনীর সঙ্গে রঘুপতি ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন। গোবিন্দমাণিক্য এই সংবাদ পাইয়া রাজ্য ছাড়িয়া সুদূর চট্টগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।[১] তিনি বলিলেন যে, ত্রিপুরার রাজকুমার পিতৃসিংহাসন লইতে আসিতেছে, তাহাকে বাধা দিয়া নররক্তপাত নিষ্প্রয়োজন। নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজা হইয়া অনতিকালের মধ্যেই শাসনব্যাপারে রঘুপতির হিতোপদেশ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন অপমানিত হইয়া অনুতপ্ত রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যর নিকট ফিরিয়া গিয়া আত্ম-অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। এবং তাঁহার নিকটেই রহিয়া গেলেন।[২]

রাজর্ষি উপন্যাসের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি দুই বিপরীত শক্তি বা ধর্মের প্রতীক। রাজা হইয়া ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিয়া, লোকহিতার্থ ধন জন মান মুহূর্তে বিসর্জন করিবার শক্তি রাজা গোবিন্দমাণিক্যর ছিল বলিয়া তিনি যথার্থ ই রাজর্ষি। কিন্তু রঘুপতি সর্বত্যাগী হইয়াও সংস্কারাবদ্ধ; সংস্কারকেই সে ধর্ম বলিয়া জানিত। ছাগহত্যা বন্ধ হওয়াতে সে নরহত্যা করিতেও প্রস্তুত। ধর্মীয়তা বা আচারকে সে ধর্ম বলিয়া জানে; বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম হইতে এই বুদ্ধিহীন হিংসাধর্মকে রবীন্দ্রনাথ পৃথক করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে গোবিন্দমাণিক্যর চরিত্র বারে বারে নানা নামে নানা সাজে প্রকাশ পাইয়াছে; ইনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম আদর্শ চরিত্র, যিনি ভোগের মধ্যেও ত্যাগকে বরণ করিয়াছেন, যিনি 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' এই ঋষিবাক্যকে জীবনে সার্থক করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রতি সাহিত্যিকদের যতটুকু মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল তাহা তাঁহারা দেন নাই। তাহার কারণ 'বিসর্জন' নাটক তাঁহাদের সকল মন হরণ করিয়া লয়। সেটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজর্ষির

১ গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতৃরক্তপাতরূপ পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্বেচ্ছায় রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া রসাঙ্গের রাজাশ্রয়ে সন্ন্যাসীর ন্যায় বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে শাহজাহান বাদশাহের পুত্র সুজা তথায় উপস্থিত হন। রসাঙ্গের রাজা পলাতক রাজকুমারকে আসন দেন নাই, গোবিন্দমাণিক্য তাঁহাকে সম্মান দেখান। তজ্জন্য সুজা গোবিন্দমাণিক্যকে মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী দান করেন। অতঃপর গোবিন্দমাণিক্যর ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের (রবীন্দ্রনাথের নক্ষত্রমাণিক্য) মৃত্যুর পর ত্রিপুরায় অরাজকতা আরম্ভ হয়, তখন প্রজাগণ গোবিন্দমাণিক্যকে আহ্বান করিয়া পুনর্প্রতিষ্ঠা করে। ইতিমধ্যে সুজার দুর্দশাপূর্ণ মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া গোবিন্দমাণিক্য হীরকাঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ দ্বারা গোমতী নদীতীরে কুমিল্লায় মসজিদ নির্মাণ করিয়া দেন।— মহিমচন্দ্র ঠাকুর, কুমিল্লার 'সুজা মসজিদ', প্রবাসী ১৩২৯ ফাল্গুন পৃ. ৬৫৯।... রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পে সুজার কাহিনী আছে।

২ গোবিন্দমাণিক্য 'রাজমালা'র প্রবাদগত ইতিহাস মতে ১৬৩তম বংশধর। ১৫৮২ শকে (১০৭০ ত্রিঃ অব্দ; ১৬৬০ খ্রীষ্ট অব্দ) কল্যাণমাণিক্যর রাজত্বের অবসান ও মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এক বৎসর রাজত্বের পর মহারাজ গোবিন্দ স্বদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্ররায় (ছত্রমাণিক্য) কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া কিয়ৎকাল চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। ছত্রমাণিক্যর মৃত্যুর পর পুনর্বার রাজ্যে আসিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন। 'রাজমালা' চতুর্থ লহরে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়; ইঁহার আদেশানুসারে রাজমালার তৃতীয় লহর রচিত হইয়াছিল। দ্র. রাজমালা, তৃতীয় লহর, পৃ. ৩৪১।

মধ্যে যে-জটিল মনস্তত্ত্ব, ঘটনার সমাবেশ আছে তাহাকে তুচ্ছ করা যায় না। বিসর্জনের বুনিয়াদ তো এইখানেই; বিচিত্র ও বিরুদ্ধ চরিত্রগুলি ইহারই মধ্যে প্রথম আবির্ভূত হয়। 'রাজর্ষির প্রথমাংশ হইতে বিসর্জনের আখ্যান অংশ সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া পাঠকদের সমস্ত চিত্ত সেইখানেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রন্থের অবশিষ্ট অধিকাংশকে আমরা তুচ্ছ করিতে পারি না।

রাজর্ষি উপন্যাসের শেষ কয়েক পরিচ্ছেদে তরুণ লেখক বিল্বন নামে এক মহাপুরুষের অবতারণা করিয়াছেন। "বিল্বন কোন্ দেশী লোক কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। বলিদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া একপ্রকার নূতন অনুষ্ঠানে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন—প্রথম প্রথম তাহাতে লোকেরা সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সমস্ত সহিয়া গিয়াছে। বিশেষত বিল্বনের কথায় সকলে বশ। বিল্বন সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সংবাদ লন, এবং রোগীকে যাহা ঔষধ দেন তাহা আশ্চর্য খাটিয়া যায়। বিপদে ও আপদে সকলেই তাঁহার পরামর্শমতে কাজ করে—তিনি মধ্যবর্তী হইয়া কাহারও বিবাদ মিটাইয়া দিলে বা কিছুর মীমাংসা করিয়া দিলে তাহার উপর আর কেহ কথা কহে না।"[১] এই চরিত্রের আর-একটি দিক হইতেছে তিনি শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন। "বিল্বন ঠাকুর এক-একদিন অপরাহ্ণে রাজ্যের ছেলে জড়ো করিয়া তাহাদিগকে সহজ ভাষায় রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক গল্প শুনাইতেন। মাঝে মাঝে দুই-একটি নীরস কথাও যথাসাধ্য রসসিক্ত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যখন দেখিতেন ছেলেদের মধ্যে হাই তোলা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে তখন তাহাদের মন্দিরের বাগানের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন।"[২]

বিল্বনের এই যেমন একটি দিক, আর-একটি দিক হইতেছে রাজ্যসেবা—রাজসেবা নহে। কোনো অযৌক্তিকতা ভীরুতা তাঁহাকে স্পর্শ করে না। নক্ষত্ররায় ত্রিপুরা আক্রমণ করিলে তিনিই রাজ্যময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্য সংগ্রহ করেন। গোবিন্দমাণিক্যের যুদ্ধ-না করিবার প্রবৃত্তিকে তিনি সমর্থন করিলেন না, তাঁহার মতে ধর্মযুদ্ধে পাপ নাই। সৈন্য সংগৃহীত হইল এবং কিভাবে দেশকে মোগল সৈন্যের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার যে-ব্যবস্থা করিলেন, তাহা বিচক্ষণ সেনাপতিরই যোগ্য কর্ম। যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব লইয়া তিনিই গেলেন নক্ষত্রের নিকট। রাজা যখন কিছুতেই যুদ্ধের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তখন বিল্বন বলিলেন, "অসহায় প্রজাদিগকে পরহস্তে ফেলিয়া দিয়া তুমি পলায়ন করিবে, ইহা স্মরণ করিয়া আমি কোনোমতেই প্রসন্ন মনে বিদায় দিতে পারি না।"[৩] রাজা ধ্রুবকে লইয়া বনে গিয়া বাস করিবেন শুনিয়া বিল্বন বলিলেন, "বনে কি কখনো মানুষ গড়া যায়। বনে কেবল একটা উদ্ভিদ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্যসমাজেই গঠিত হয়।"[৪] ইহার পর ত্রিপুরা ত্যাগ করিয়া বিল্বন নোয়াখালির নিজামৎপুরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে ভয়ংকর মড়কের প্রাদুর্ভব হইলে তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যেরূপ সেবা করিয়াছিলেন তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার বশ হইয়াছিল। পাঠক ৪১শ পরিচ্ছেদটি পাঠ করিলে দেখিবেন রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের মধ্য দিয়া দেশসেবার কী আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিল্বনের কর্মযোগী চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে-আদর্শ মানুষের স্বপ্ন ছিল তিনি তাঁহার বহু নাটক-উপন্যাসের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের শান্ত সর্বসহা

১ রাজর্ষি : ২৯শ পরিচ্ছেদ।

২ রাজর্ষি : ২৯শ পরিচ্ছেদ।

৩ রাজর্ষি : ৩৬শ পরিচ্ছেদ।

৪ রাজর্ষি : ৩৬শ পরিচ্ছেদ।

চরিত্র 'গোরা'র পরেশবাবু, 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ প্রভৃতির মধ্যে নানা ভাবে দেখা দিয়াছে। রঘুপতিও নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে প্রতিরোধের চরিত্রগুলিতে। বিল্বন হইতেছেন কর্মসাধকের মূর্তি; তিনি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়াও তাহার ঊর্ধ্বে বাস করেন। সব কিছু তিনি স্পর্শ করেন, কিন্তু কোনো কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 'শারদোৎসবে'র রাজা, 'রাজা'র ঠাকুর্দা, 'অচলায়তনে'র গুরু, এমন-কি 'চতুরঙ্গে'র জ্যেঠামশায় প্রভৃতি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এই তেইশ বৎসর বয়সের সৃষ্টি বিল্বনেরই রূপান্তর বলিলে দুঃসাহসিকতা হইবে না।

বিল্বনের চরিত্র বাংলাসাহিত্যে নূতন হইলেও সম্পূর্ণ নূতন নহে, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রায় উপন্যাসেই একটি করিয়া আদর্শ 'স্বামীজী' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অভিরাম স্বামী, 'চন্দ্রশেখরে' রামানন্দ স্বামী প্রভৃতি কর্মযোগী বীরগণ সাধারণত সন্ন্যাসী বলিলে যাহা বুঝায় সে-শ্রেণীর মানব ছিলেন না। তবে সনাতন হিন্দুধর্মমতের প্রতি বঙ্কিমের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকার জন্য তিনি তাঁহার সন্ন্যাসীদিগকে দৈবশক্তিসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কোম্‌ৎ-এর মতবাদ প্রচার করা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে বিশুদ্ধ যুক্তি-আশ্রয়ী কর্মযোগীরূপে সৃষ্টি করেন নাই, বরং রহস্যাশ্রয়ী করিয়াই গড়িয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ সম্মত হওয়ায় তিনি তাঁহার কোনো চরিত্রকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্র-সৃষ্টির প্রেরণা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন বলা কঠিন; তবে তাঁহার গদ্যপ্রবন্ধের মধ্যে যখনই তিনি কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইয়াছেন, তখনই মতের সঙ্গে কর্মের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সুষ্ঠু সমন্বয়ের কথা প্রচার করিয়াছেন। বিল্বন তাহারই রক্তমাংসে গঠিত মানবমূর্তি। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' হইতে কবি তাঁহার আদর্শ মানবের প্রেরণা পাইয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন। কারণ, ইতিপূর্বে 'প্রচারে' (১২৯১-৯২) 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়; ১২৯৩-এ গ্রন্থাকারে উহার প্রথমাংশ মুদ্রিত হয়। 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিম কৃষ্ণকে যেরূপভাবে আদর্শ মানব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উপন্যাসের মধ্যে সেইরূপ আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিল্বনের চরিত্রও সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারেন। এ কথা ভুলিলে চলিবে না তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র ও বঙ্কিম তখন সাহিত্য-সম্রাট। যাহাই হউক, 'রাজর্ষির' বিল্বন মহৎ চরিত্র হইলেও, অতিশয় মহৎ রূপে চিত্রিত হইয়াছেন; লেখক তাঁহাকে আদর্শ মহাপুরুষ করিতে গিয়া সাধারণ মানুষরূপে গড়িবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন সুতরাং আদর্শটা কৃত্রিম হইয়া গিয়াছে। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই দুর্বলতাকে আবিষ্কার করিয়া বিল্বনকে আর আসরে নামান নাই। রাজর্ষির মধ্যেই তাহার প্রথম ও শেষ কৃত্য সম্পন্ন করিয়া দেন।

মুকুট বা রাজর্ষি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের রচনা হইতেছে 'চিঠিপত্র'। 'রসিকতার ফলাফল' সত্যই নিষ্ফলই হইয়াছিল, কিন্তু ষষ্ঠিচরণ ও নবীনকিশোরের 'চিরঞ্জীবেষু' ও 'শ্রীচরণেষু'[১] নামে পত্রধারা বাংলা সাহিত্যে রচনার নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। পত্রগুলি কল্পিত ঠাকুর্দা ও নাতির মধ্যে সনাতন ও নূতনের সম্পর্ক লইয়া বিচার। ষষ্ঠিচরণ প্রাচীন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পক্ষ লইয়া নবীনকিশোরের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতেছেন। নবীনকিশোর স্ব-কালের ধর্ম কী তাহাই বৃদ্ধ পিতামহকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। যেখানে লেখক প্রাচীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে সেগুলি চিরন্তন সত্য, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি নাই; আবার নবীনকিশোরের পক্ষ লইয়া বর্তমান কালকে সমর্থন, বর্তমান প্রগতিকে অনুমোদন করিতে দেখিলে মনে হয় লেখক

১ বালক ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ; পৃ ৭৭-৮১ চিরঞ্জীবেষু।— আষাঢ় পৃ ১৩৬-১৪০ শ্রীচরণেষু।— শ্রাবণ পৃ ১৮৯-১৯১ চিরঞ্জীবেষু।— ভাদ্র পৃ ২৪৮-২৫১, শ্রীচরণেষু।— আশ্বিন-কার্তিক পৃ ৩০৭-৩১২, চিরঞ্জীবেষু।— পৌষ পৃ ৪৩৬-৪৪০, শ্রীচরণেষু।— মাঘ পৃ ৪৯৬-৪৯৮, চিরঞ্জীবেষু।— চৈত্র পৃ ৫৬৭-৫৬৯ শ্রীচরণেষু। দ্র. চিঠিপত্র ১৮৮৭ (১২৯৪)। সমাজ, গদ্যগ্রন্থাবলী ১৩শ খণ্ড (১৯০৮)। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় পৃ ৫০৫-৫৩৭।

ইহাদেরই অন্যতম। প্রাচীনেরা রবীন্দ্রনাথকে উগ্রপন্থী বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, এবং নবীনেরা তাঁহাকে সংস্কারপন্থী বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। রবীন্দ্রনাথ যে-মধ্যপথ বা সাম্যপথ অনুসরণ করিতেন, তাহা সুন্দরের পথ, তাহা উগ্রতার পথ নহে, তাহা ভীরুতার পথ নহে, তাহা সকলকে লইয়া চলিবার পথ। যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের এই পত্রধারার মধ্যে কোনো পক্ষের মতামতকে পরাভূত করিবার জন্য পূর্বাহ্নে কোনোপ্রকার হাস্যকর দুর্বল যুক্তিজাল বিস্তার করা নাই; প্রতিপক্ষের যুক্তির সুষ্ঠু সমালোচনার দ্বারা নিজপক্ষের মত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্র কয়খানি তাহারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কবি বালকদের উপযোগী গল্প-উপন্যাসও যেমন লিখিতেছেন, তেমনি তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য ক্ষুদ্র নাটিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যে' (১৮৭৪) বাঙালিকে নির্দোষ হাস্যরস উপভোগে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত হাস্যকৌতুক বা হেঁয়ালিনাট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হাস্যরসে রচিত। 'বালকে'র পৃষ্ঠায় এই নূতন ধরণের হাস্যকৌতুকময় নাট্যগুলি প্রকাশিত হইল।

ইংরেজিতে শারাড[1] (Charade) নামে একপ্রকার খেলা আছে—সান্ধ্য সভায় বিনোদনের জন্য তার অনুষ্ঠান করা হয়। সাধারণ নাট্য হইতে ইহার পার্থক্য হইতেছে এই যে, ইহার দৃশ্যের মধ্যে এমন কয়েকটি শব্দ লুক্কায়িত থাকে যাহা যোজিত করিয়া তৃতীয় একটি শব্দ গঠিত হয়। সেই পুরা শব্দটি অবলম্বন করিয়া নাটকটি রচিত। এই হেঁয়ালিনাট্য প্রবর্তনকালে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভালো করিয়া বাড়ে না, আমোদপ্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না।··বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষী জ্ঞান করি—বিজ্ঞলোকের কাজের লোকের পক্ষে সেগুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝি না যে যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে।"

ভ্রমণ করিতে রবীন্দ্রনাথের কোনোদিন ক্লান্তি ছিল না; এই বৎসরের গোড়ায় দিন-দশেকের জন্য হাজারিবাগ বেড়াইতে যান।[2] সঙ্গে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা ও আর-একজন ভদ্রলোক—বয়সে কবির থেকে বড়, হাস্যোজ্জ্বল, গোলগাল মানুষটি। এই চারিজনে যাত্রা করেন। মধুপুরে গাড়ি বদল করিয়া গিরিধি যান ও সেখান হইতে মানুষে-ঠেলা পুশ্‌পুশ্‌ গাড়ি করিয়া হাজারিবাগ গিয়াছিলেন। এই ছিল সে-যুগের পথ; তখনো গ্রাণ্ডকর্ড লাইনের হাজারিবাগ রোড-স্টেশনের পথ হয় নাই। এই ভ্রমণের একটি সরস বর্ণনা 'বালকে' (১২৯২ আষাঢ়) বাহির হয়; পরে সেটি অনেক কাটছাট হইয়া 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র মধ্যে স্থানলাভ করে।[3]

কিন্তু এবার পূজার সময়ে আরও দূরে যাত্রা করিলেন—মেজদাদার কাছে সোলাপুরে; সোলাপুর, বোম্বাই রাজ্যের জেলা ও সদর শহর, বোম্বাই-মাদ্রাজ রেলপথের উপর অবস্থিত (২৮৩ মাইল)। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জেলা

১ Charade is an amusement which consists in dividing a word into its component syllables or letters predicting something of each and of the whole and asking the reader or listner to guess the word. —*Chamber's Encyclopaedia*, III, 279.

২ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী লেখককে এই তথ্যটি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। "কেবল ভ্রমণস্পৃহা চরিতার্থ করবার জন্য কবি হাজারিবাগ যান নি। লোরেটো কন্‌ভেন্টের কোনো সাধিকার প্রতি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর বিশেষ পক্ষপাত ছিল, এবং সেই প্রিয় ভগিনীটি তখন হাজারিবাগ কনভেন্টে অবস্থান করছিলেন ব'লে বালিকা প্রশ্রয়দাতা খুড়াকে সেখানে নিয়ে গিয়ে দেবীদর্শন করাবার জন্য ধরে পড়েছিলেন, তিনিও তাঁদের দুই ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে সেই আবদার রক্ষা করেছিলেন।"

৩ 'ছোটনাগপুর', বিচিত্র প্রবন্ধ।

জজ। এই শরৎকালে (১২৯২) সোলাপুরে বাস পর্বটিকে তিনি অন্তরের সহিত উপভোগ করিয়াছিলেন "বাড়ির প্রান্তে একটি ছোট্ট ঘরে একটি ছোট্ট ডেস্কের সম্মুখে বাস করিতাম। আরো দু-একটি ছোট্ট আনন্দ আমার আশেপাশে আনাগোনা করিত। সে বৎসর যেন আমার সমস্ত জীবন ছুটি লইয়াছিল। আমি সেই সবটুকুর মধ্যে থাকিয়াই ঘরের ভিতরটুকুর মধ্যে যে-স্নেহ-প্রেমের বিন্দুটুকু ছিল তাহা একান্ত আগ্রহের সহিত উপভোগ করিতাম। আমি যেন একপ্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। মনের উপর হইতে সমস্ত ভার চলিয়া গিয়া আমি এক প্রকার লঘুভারে জগতের সমস্ত মধুরতার মধ্য দিয়া অতি সহজে সঞ্চরণ করিতাম। বোধ হয় সেই বৎসরই শরৎকালের সহিত আমার প্রথম বন্ধুভাবে পরিচয় হইয়াছিল।"[১] সোলাপুর হইতে 'বালক' পত্রিকার প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইতে হইতেছে। এই সকল রচনার মধ্যে একটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; সেটি হইতেছে 'রুদ্ধগৃহ'।[২] বৎসরাধিকাল পূর্বের মৃত্যুশোকেরই ব্যাখ্যা। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রজীবনদর্শনের একটি বড়ো কথা ধরা পড়িয়াছে। সেটি হইতেছে ভুলিয়া যাইবার অসীম ক্ষমতা বা বিস্মৃতি মানবের পক্ষে একটা পরম নিষ্কৃতি। অতীতের অনাবশ্যক আবর্জনা ভুলিয়া গিয়া নূতন সত্য গ্রহণ, নূতন তথ্যআবিষ্কার, নূতন প্রেমকে অভিনন্দনের জন্য উন্মুখীনতাই হইতেছে মানবের স্বাভাবিক ধর্ম।

তিনি লিখিতেছেন, "মৃত্যুকে আমরা যেমন ভয় করি বিস্মৃতিকেও আমরা তেমনি ভয় করি।··বিস্মৃতি মাঝে মাঝে আসিয়া স্মৃতির শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া যায়। আমাদিগকে কিছুক্ষণের মতো স্বাধীন করিয়া দেয়।··প্রতি মুহূর্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি জমিয়া জমিয়া অবশেষে আমাদের বাতাস আটক করিতে চাহে,··বিস্মৃতি আসিয়া এইসকল বেড়া ভাঙিয়া দেয়। বিস্মৃতি আমাদের জীবনগ্রন্থের ছেদ, দাঁড়ি ; মাঝে মাঝে আসিয়া উত্তরোত্তর আমাদের জীবনবিকাশের সহায়তা করে। একটি জীবনের মধ্যেও শতসহস্র বিস্মৃতি চাই তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে।[৩] এই বিস্মৃতিতত্ত্ব হইতেছে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতার একটি বড় কথা।

কয়েক বৎসর পরে এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করিয়া লেখেন, "শরতের প্রভাতে যেন আমার বহুকালের স্মৃতি হৃদয়ের মধ্যে জাগিয়া উঠে। তাহাকে বিস্মৃতি বলিলেই ঠিক হয়। কিন্তু যে-বিস্মৃতি বলিলে একটি অভাবাত্মক অবস্থা বোঝায় এ তাহা নয়, এ একপ্রকার ভাবাত্মক বিস্মৃতি, নহিলে 'বিস্মৃতি জাগিয়া উঠা।' কথাটা ব্যবহার হইতেই পারে না। এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট যে কিছু মনে পড়ে তাহা নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে পুরাতন কথা মনে পড়িলে যেমনতরো মনের ভাবটি হয়, অনেকটা সেইরূপ ভাবমাত্র অনুভব করা যায়। যেসকল স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদিগকে পৃথক করিয়া চিনিবার জো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতনারাজ্যের বহির্ভাগে যাহারা বিস্মৃতি মহাসাগররূপে স্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা যেন এক সময়ে চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে ; তখন আমাদের চেতনহৃদয় সেই বিস্মৃতিতরঙ্গের আঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যময় অগাধ বিপুলতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।"

বিস্মৃতি ও ব্যবধান দূরকে মধুর করে। 'কাছে আছে দেখিতে না পাও' এ পংক্তি রবীন্দ্রনাথেরই রচিত।

১ আশ্বিন সপ্তমী পূজা ১৮৮৫। দ্র. মানসী ৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ১৩২৩ আশ্বিন, পৃ ৬৯৮।

২ রুদ্ধগৃহ, বালক ১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক, পৃ ৩৩৬-৩৩৯। বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩১৪)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ ৪১৭-১৮। বালক ১২৯২ পৌষ সংখ্যায় শ্রীঅঃ স্বাক্ষরিত [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] একটি পত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সোলাপুর হইতে ২৬ আশ্বিন তারিখে উহার প্রত্যুত্তর লেখেন, পৃ ৪২৭-৫৩০। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, গ্রন্থপরিচয় পৃ ৫৬০-৫৬৪।

৩ উত্তর-প্রত্যুত্তর, বালক ১২৯২ পৌষ। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫।

তাই আজ বাংলাদেশ হইতে দূরে গিয়া বাংলাদেশের সমস্তকেই সুন্দর করিয়া দেখিতেছেন। তথাকার যে-রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁহার নিকট উপহাসের ও তীব্র সমালোচনার বিষয় ছিল, আজ তাহা মহীয়ান হইয়া উঠিল। তাই আজ নবীনকিশোর ষষ্ঠিচরণকে লিখিতেছেন, "আজি এই সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন,·· আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নব জাতির জন্মসংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পশ্চিমঘাটগিরির সীমান্তদেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এত দূর বঙ্গদেশের কেবল বর্তমান ভবিষ্যৎ—প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে, সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছি।"[১]

এই সময়ে কলিকাতায় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিতেছিল, ন্যাশনল কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে। প্রথমবারের সভায় বাংলার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান যোগদান করে নাই, এবার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, ন্যাশনল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সভার কার্যে যোগদান করিতেছেন; নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিও আসিবেন স্থির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এইসব সংবাদ পাইয়া বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবিজনোচিত আদর্শবাদের রঙে উজ্জ্বল করিয়া বাংলার রাজনীতিকে দেখিতেছেন।

অক্টোবর (১৮৮৫) মাঝামাঝি 'প্রবাসের পালা সাঙ্গ করিয়া' সোলাপুরের 'অগাধ আকাশ, অবাধ অবকাশ, উদার মাঠ, বিমল শান্তি পশ্চাতে' ফেলিয়া রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিলেন (১ কার্তিক ১২৯২)।

কলিকাতায় আসিয়াই সংবাদ পাইলেন যে মহর্ষি বোম্বাইএর নিকটবর্তী বন্দোরায় থাকিতে থাকিতে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন—কলিকাতা হইতে লোক যাওয়া প্রয়োজন। বোধ হয় সপ্তাহখানেকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ, জামাতা জানকী ঘোষাল ও কন্যা সৌদামিনী বন্দোরা রওনা হইয়া গেলেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি—তিনি ১৮৮৫ সালের গোড়ার দিকে বোম্বাইএর নিকটবর্তী সমুদ্রতীরস্থ বন্দোরায় আশ্রয় লন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে সমুদ্রের তীরেই তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইয়া দেন। কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার মাথা-ঘোরার ব্যারাম দেখা দিল; তখনই রবীন্দ্রনাথপ্রমুখের সেখানে যাইতে হয়। বন্দোরায় বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ দুই মাসের বেশি পিতার কাছে থাকিলেন; মাঘোৎসবের পূর্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে বন্দোরাবাস পর্বটি ব্যর্থ হয় নাই। বালিকা ইন্দিরাকে [১১] লিখিত তিনটি কবিতার পত্র 'কড়ি ও কোমলে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'আহ্বানসংগীত'ও বোধ হয় এইখানে রচিত। পত্র কবিতাত্রয়ের সহিত এই কবিতাটির ভাবসামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। নবীনকিশোর শেষপত্রেও লিখিয়াছিলেন 'সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিতেছে। আমি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিব না।' এই 'চরৈবতি'-ভাব 'আহ্বানসংগীতে'র মধ্য নিহিত। কয়েক মাস পূর্বে সোলাপুর বাসকালে সুদূর বাংলাদেশে বাঙালির কর্মপ্রচেষ্টা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল: কিন্তু আজ বোম্বাইএর নিকটবর্তী বন্দোরায় আসিয়া জীবনের বৃহত্তর কর্মবহুল পটভূমিতে বাঙালির জীবনপ্রবাহকে ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র মনে হইতেছে। বোম্বাইএর শিল্পসৃষ্টিতে গুজরাটি, পারসি, বোরাহ-মুসলমানদের কর্মতৎপরতার সহিত বাঙালির শিল্পশ্রীহীনতা তুলনা করিতেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও নিখিল ভারতীয় আন্দোলনে বাঙালির স্থান নগণ্য; তিনি লিখিতেছেন—

> পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ শুনিতে পেয়েছি ওই—
> সবাই এসেছে লইয়া নিশান, কই রে বাঙালি কই।

১ চিঠিপত্র, শ্রীচরণেষু, বালক ১২৯২ পৌষ, পৃ ৪৩৬-৪৪০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ ৫২৬।

কবির মনে কেন এই কথা জাগিতেছে— তাহার পটভূমি জানা দরকার।

১৮৮৫ সালে কন্‌গ্রেসের জন্ম হয়; বোম্বাইএ কন্‌গ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কর্মকর্তাদের মধ্যে গুজরাটি, পারসি আছে—নাই বাঙালি। সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerji) ছাড়া কোনো নাম-করা বাঙালি রাজনীতিক এ সভায় আহূত হন নাই। দুই বৎসর পূর্বে কলিকাতায় যে-জাতীয় সম্মেলন (ন্যাশনল কন্‌ফারেন্স) হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সভাপতি আনন্দমোহন বসু বলিয়াছিলেন This is the beginning of a Parliament। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বাংলাদেশের উদীয়মান নেতা। ইহারা সকলেই গবর্নমেণ্টের নীতির তীব্র সমালোচনায় রত। এইজন্যই সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহন প্রভৃতিদের এই বোম্বাই কন্‌গ্রেসে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে এই ঘটনাটি তীব্রভাবে আঘাত করে, তাহারই অভিঘাতে লেখেন 'কই রে বাঙালি কই'।

এই কবিতাটি পাঠক পুনরায় আদ্যন্ত পাঠ করিলে কবির তৎকালীন মনোভাবের নিখুঁত চিত্রটুকু পাইবেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালির অসম্মান হইয়াছে বটে, কিন্তু কবির ভরসা বাঙালি তাহার শ্রেষ্ঠ আসন পাইবে গানের মধ্য দিয়া, মাতৃভাষার মধ্য দিয়া—

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ,
জগতের লোক সুধার আশায় সে ভাষা করিবে গান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে, ভাকিবে নয়নজলে,
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে কাঁদিছ বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।
এক বার কবি মায়ের ভাষায় গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায় ঘুচে যায় অপমান।

কয়েকদিন পূর্বে সোলাপুর হইতে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত এক দীর্ঘ পত্রমধ্যে কবিমনের অস্থিরতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তিনি লিখিয়াছিলেন, "এখানে এই মাঠের মধ্যে এসে আমার মনের মধ্যে এক রকম অস্থিরতা জন্মেছে। একটা কি আমার কাজ বাকি আছে মনে হচ্চে।· ·কি করবো ঠিক সেইটে মনে করতে পারচি নে। কিন্তু বাঙ্গালির হয়ে একটা কিছু করবই এইটে আমার মনে হচ্চে· ·অপমানিত হয়ে জগৎ থেকে বিদায় নিতে ভারি কষ্ট হয়।"[১]

এবার বন্দোরায় বাসকালে রবীন্দ্রনাথের পিতা সম্বন্ধে নূতন অভিজ্ঞতা হইল; এত দীর্ঘকাল বোধ হয় পিতার সান্নিধ্যে বাস করেন নাই। কয়েক মাস পরে এক পত্রে লিখিতেছেন যে বন্দোরায় বাসকালে তিনি হৃদয়ে অত্যন্ত শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। "আমরা সমুদ্রতীরে থাকতুম এবং তাঁকে [পিতাকে] সেই সমুদ্রতীরের অস্তোন্মুখ সূর্যের মত বোধ হত— আমি কিছুদিন তাঁর বৃহৎ জীবনের তীর থেকে কতকটা যেন মহত্ত্ব সঞ্চয় করতে পেরেছি।"

এইখানে তিনি মহর্ষির আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া লিখিতেছেন, "সে বইখানি একটি পরিণত মহৎ জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।· ·বাঙ্গালা ভাষায় এই একটি রীতিমত বই লেখা হল।"[২]

১ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পরিশিষ্ট। পত্রখানি বোধ হয় লিখিত ১১ই অক্টোবর ১৮৮৫। ২৬শে আশ্বিন ১২৯২।

২ পত্রখানি নাসিক হইতে ১৮৮৬ জুলাই ১৩ (১২৯৩ আষাঢ় ৩০) প্রিয়নাথ সেনকে কলিকাতায় লিখিত। মহর্ষির আত্মজীবনী পুস্তকাকারে ১৮৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

নব্য হিন্দুসমাজ

বঙ্কিমের সহিত রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ অল্পতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর সহিত যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তাহা বহুকাল বাংলার সাময়িক সাহিত্য -আকাশকে কখনো ধূমে অন্ধকার, কখনো আলোকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। চন্দ্রনাথ 'নবজীবন' পত্রিকায় জাতিভেদের জয়গান করিয়া যে-প্রবন্ধ লেখেন এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত যে সংঘর্ষ চলে, তাহার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এবার বিরোধের কারণ আরও গভীরকে স্পর্শ করিল।

আমাদের আলোচ্য পর্বে বাংলার ধর্ম-আকাশে শশধর তর্কচূড়ামণির আবির্ভাব হইয়াছে ; তর্কচূড়ামণি দিগ্‌বিজয়ীর ন্যায় কলিকাতায় আসিয়া শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুসমাজে আসর জমাইয়া বসিলেন। বাংলার তরুণদের উপর চূড়ামণির ন্যায় পণ্ডিতের প্রভাব কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা ভাবিবার বিষয় ; যে-লোকের না ছিল পাণ্ডিত্য, না ছিল আধ্যাত্মিক বল, সে লোক কি জাদুবলে চন্দ্রনাথপ্রমুখ মনীষীদের মন হরণ করিল।

ইহার একটি কারণ ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিল চূড়ামণির অভিযান— তাহাতেই বোধ হয় অনেকে আকৃষ্ট হন। তাঁহার মতে ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয়, সেই দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের কাছে ব্রাহ্মরা যে-ধরণের প্রার্থনাদি করে তাহা অর্থহীন। তাঁহার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত— ঈশ্বর যখন দুর্জ্ঞেয় তখন হিন্দুসমাজে সেই দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার যেসব প্রচলিত পদ্ধতি আছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের প্রতীক-উপাসনা, সেই সবই ভালো, কেননা লোকেরা সেসব সহজেই অবলম্বন করিতে পারে।· ·ধর্ম তাঁহার মতে এক লৌকিক ব্যাপার।"[১] ইহার উপর হিন্দুদের আচারধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দান করিয়া সকলকে তিনি স্তম্ভিত করিয়া দিলেন ; হাঁচি, টিকটিকি, শিখাধারণ প্রভৃতি অসংখ্য লোকাচার বৈজ্ঞানিক সত্য। তর্কচূড়ামণির শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে বোধেরই সমতুল্য ছিল, অর্থাৎ তাঁহারা শাস্ত্র ও বিজ্ঞান দুইই সমান বা কিছুই বুঝিতেন না ; সেইজন্য নির্বিচারে সবই বিশ্বাস করিতে কোনো বাধা ছিল না। বিশ্বাস করিবার জন্য মানসিক মেহনত করিতে হয় না। সে যুগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-শিক্ষা প্রদত্ত হইত, সেখানে ভারতীয় দর্শন সাহিত্য ধর্ম ইতিহাস সম্বন্ধে ব্যাপক বা গভীর কোনো জ্ঞান লাভ হইত না ; পাশ্চাত্য দর্শন সাহিত্য ইতিহাস ছিল তাহাদের মানসিক উপজীব্য ; তখন বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রবর্তিত হয় নাই। এই অবস্থায় তর্কচূড়ামণির অদ্ভুত কথাবার্তা বিজ্ঞানের নামে প্রচারিত হইতে থাকিলে সকলেই সেগুলিকে অকাট্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিল। চন্দ্রনাথ বসু তাঁহাকে লইয়া সবচেয়ে বেশি মাতামাতি করেন। চন্দ্রনাথ এককালে বাংলাদেশের শৌখীন নাস্তিকতায় গা ভাসাইয়াছিলেন। এখন যখন পাল্টা হাওয়ায় ফিরিলেন, তখন তাঁহার যুক্তিবাদের অবসান হইয়াছে। এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় তিনি বলিলেন, "চূড়ামণি যেমন বলিলেন ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম, অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম, অমনি আমার সংশয় দূর হইল, বিশ্বের যাহা-কিছু আছে সকলই ধর্মের অন্তর্গত দেখিলাম।· · যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের মন ব্রাহ্মদের অনুকূলে ছিল না, কিন্তু তিনি তর্কচূড়ামণির আজগুবি ধর্ম-ব্যাখ্যানের বিরোধী ছিলেন। তিনি একস্থানে স্পষ্টই লিখিলেন, "পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে-হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত তাহা আমাদের মতে কখনো টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।"[৩]

১ কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃ ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

২ বাংলাভাষার লেখক, পৃ ৬৯১।

৩ প্রচার, ১২৯১ শ্রাবণ।

রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায়ই কলুটোলায় বঙ্কিমের গৃহে যাইতেন; এই সময়ে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রবাবু, আপনি শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিয়াছেন?" রবীন্দ্রনাথ শোনেন নাই জানাইলে বঙ্কিম বলিলেন, "শুনিবেন; তাহাতে জিনিস আছে। আপনি আমার বাড়িতে আসিবেন, এইখানেই তাঁহার কথাবার্তা শুনিবার সুবিধা আপনার হইতে পারিবে।" বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে 'সত্য সত্য' বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়—এ সকল কি হিন্দুধর্ম? মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন চাহি না।"[১]

ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের অনুরোধে একদিন অ্যালবার্ট হলে তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিতেও গিয়াছিলেন। এই সময়ের ঘটনা স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু শীঘ্রই এইখানে দেখিতে পাইলাম যে, বঙ্কিমবাবুর admiration বড়ো বেশিদিন স্থায়ী হইল না। কৃষ্ণচরিত্র-রচয়িতার সহিত তর্কচূড়ামণির মিলন স্থায়ী হইতে পারে না।"[২]

নব্য হিন্দুসমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব; কিন্তু কিসের উপর সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, তাহাই সে জানে না। এই সময় হইতে শিক্ষিত প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুসমাজ নিখিল হিন্দুর প্রাণবস্তু আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, এখন পর্যন্ত সেই মায়াকেন্দ্রের ব্যর্থ অনুসন্ধান চলিতেছে—অসংখ্য গুরু ও অবতার আসিয়াও সেই প্রাণকেন্দ্রে কেহ হিন্দুকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না। প্রগতিপন্থী হিন্দু বা আদিব্রাহ্মসমাজ উপনিষদের ব্রহ্মসাধনাকে সর্ববর্ণ সর্বসম্প্রদায়ের মিলনকেন্দ্র বলিয়া প্রচার করিলেন; হিন্দুসমাজ তাহা গ্রহণ না করিয়া নবতর সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা কখনো কোম্‌তের পজিটিভিজমের চিরচমৎকারিতাকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন; কখনো হিন্দুসমাজের যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত অন্ধ সংস্কারকে আজগুবি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা যুক্তিসিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; কখনো 'আর্য্যামি'র অভিনব অত্যন্ত ধোঁয়াটে উপসর্গ আনিয়া বাঙালির সহজউদ্দীপ্য ভাবোচ্ছ্বাসবহ্নিতে ইন্ধন দিতেছেন; কখনও বা সকল প্রকার মত ও বিশ্বাসের মধ্যে তথাকথিত 'সংশ্লেষণ' বা সিন্‌থিসিস কল্পনা করিয়া 'সমন্বয়'এর কথা বলিয়া গুরুবাদ তথা অবতারবাদ প্রচার করিয়া মনে করিতেছেন হিন্দুদের সকল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাকৃত হইল।

বাংলা সমাজের এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লেখনী চালনা দ্বারা এই সময়ে কিভাবে সকল শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত লড়িতেছেন— আমরা এখন তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, শশধর তর্কচূড়ামণি ও নব্য হিন্দুদল ব্রাহ্মসমাজের মূলভিত্তি নিরাকার উপাসনাতত্ত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন— রামকৃষ্ণ পরমহংসের নানা দেবদেবীর মূর্তিপূজার মধ্য দিয়া গভীর আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ-হেতু নিরাকারতত্ত্বের অসারত্ব যেন প্রমাণিত হইল। শিক্ষিত সমাজের মধ্য হইতে রব উঠিল 'নিরাকার উপাসনা হিন্দুধর্মের বিরোধী' এবং সাকার উপাসনাই হিন্দুত্বের লক্ষণ। এই মতবাদ লইয়া ব্রাহ্ম ও হিন্দুদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা চলিতেছিল; রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় যোগদান করিলেন। তিনি 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়া উহা ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রায় যুগপৎ প্রকাশ করিলেন (১২৯২ শ্রাবণ ও ভাদ্র)।

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, আধুনিক যুগে নিরাকার উপাসনাবিরোধীদের পক্ষে "প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের

১ প্রচার, ১২৯২ শ্রাবণ, দ্র. বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ বিবিধ।

২ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'ছিন্নপত্র' সমালোচনা। মানসী ১৩১৯ ফাল্গুন। দ্র. দেশ, ১৩৬০ বৈশাখ ২৬, পুনর্মুদ্রিত।

প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতে পরম হিন্দুত্বের অভিমানে" আঘাত লাগে না। "হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধ পক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।" এই মুখবন্ধ করিয়া রবীন্দ্রনাথ খুবই ব্যাপকভাবে দেখাইলেন যে মানুষের পক্ষে অসীম ও অনন্তকে পূজা করা স্বাভাবিক। "ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের সংকীর্ণতাবশত সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু পৌত্তলিকতায় তাঁহাকে বিশেষ একরূপ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ভাবিতেই হইবে। অন্য কোনো গতি নাই।··কল্পনা উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে যদি মূর্তি গড়া যায় ও সেই মূর্তির মধ্যেই যদি মনকে বদ্ধ করিয়া রাখি তবে কিছুদিন পরে সে-মূর্তি আর কল্পনা উদ্রেক করিতে পারে না। ক্রমে মূর্তিটাই সর্বেসর্বা হইয়া উঠে।··ক্রমে উপায়টাই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়।"

রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে এখন দুইটি কর্তব্য— একটি নব্য হিন্দুধর্মধ্বজীদিগকে আক্রমণ ও অপরটি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে উক্ত সমাজের মত ও বিশ্বাস স্থাপন।

বঙ্কিম প্রমুখ শক্তিমান লেখকদের ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ-পরিপন্থী মতবাদ প্রচারের ফলে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ঈশ্বরের নিরাকার চৈতন্যময় স্বরূপের সাধনার বিরুদ্ধে একটি কঠিন মত গড়িয়া উঠিতেছিল। এই মতকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য গত বৎসর হইতে ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখা মাঘোৎসব-পর্বে মিলিত হইতেছে। এই বৎসরের (১২৯২ মাঘ ৯) অনুষ্ঠানে আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ নববিধান সমাজ হইতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে শিবনাথ শাস্ত্রী ও উমেশচন্দ্র দত্ত বেদি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বেদিতে বসিতে দেখি নাই ; তবে এবারও ভাষণাদি দেন নাই, স্বাধ্যায় পাঠাদিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের জন্য নানা কথা ভাবিতেন, তাহার আর-একটি প্রমাণ পাই ১২৯৪ সালে। এই বৎসরের গোড়ায় তিনি সম্পাদকরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে বলেন যে যাঁহারা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহাদের লইয়া তিনি একটি 'ব্রাহ্মসমিতি' স্থাপনের ইচ্ছুক ; আমাদের মনে হয় রাজনারায়ণ বসুর 'মহাহিন্দুসমিতি'র পরিকল্পনা হইতে ইহা গৃহীত।

নব্য হিন্দুধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে নানা স্তর ও শ্রেণী। ইহাদের যুক্তিহীন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যে-তীব্র বিদ্রূপ ও গুরুবাদের প্রতি যে-কঠোর কষাঘাত তিনি করিতে লাগিলেন তাহা তাঁহার স্থায়ী সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করে না নিশ্চয়ই ; তবুও জীবনীকার হিসাবে সেসবের যাথার্থ্য প্রদর্শন করাই কর্তব্য। কবির বয়স এখন পঁচিশ বৎসর— সমস্ত বিষয়কেই অত্যন্ত একান্ত করিয়া দেখেন ; তাই তাঁহার পক্ষে অবাস্তব অলীক কথা সহ্য করা কঠিন— সুবিধা পাইলেই নব্য মতাবলম্বীদের আঘাত করেন।

পাঠকের স্মরণ আছে, বন্দোরা হইতে পৌষ (১২৯২) মাসের শেষ দিকে কবি কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন ; মাঘোৎসবের জন্য কুড়িটি ব্রহ্মসংগীত লিখিলেন এবং সেগুলি উৎসবে গীত হইবার জন্য শিখাইলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিলেও এ কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, তাঁহার আর্টিস্ট বা কবি-সত্তা সম্পূর্ণরূপে এই ধর্মীয়তার দ্বারা আচ্ছন্ন। সময়টা 'কড়ি ও কোমলে'র যুগ। ৮ই মাঘ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন, "আজ ৩৷৷ বেলায় রেমিনির বেহালা-বাদন হবে। যাঁরা রেমিনির বেহালা শুনেচেন তাঁরা বলেন একবার এই বেহালা শুনলে চিরজীবন সার্থক হয়।" আর জানাইতেছেন, "৯ই মাঘ অর্থাৎ কাল প্রাতে

অত্র ভবনে তিনসমাজের মহারথীরা একত্র হবেন।"[১] সুতরাং যুবক রবীন্দ্রনাথের জীবনে আর্টের শৌখীনতা ও ধর্মের সামাজিকতা দুইই সমভাবে যুক্ত।

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম ও আর্যামির উপর নূতন উপসর্গ দেখা দিল— কল্কি অবতার। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ১২৯০ সালে কৃষ্ণানন্দ নাম লইয়া নূতন তন্ত্রসাধনা শুরু করিয়াছিলেন; তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি কল্কি অবতার। 'অবতার' আসিলে চেলার অভাব হয় না, তাহা গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে খুবই স্পষ্ট হয়। কৃষ্ণানন্দের চেলারা শিক্ষিত (!) বাঙালি। এই কল্কি অবতারকেই বিদ্রূপ করিয়া প্রিয়নাথ সেনকে কবি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন 'আমি কল্কি', গাঁজার কল্কি হবে বুঝি!
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।[২]

Satireএ রবীন্দ্রনাথ যে কী ভয়ানক তীব্র হইয়া উঠিতে পারেন, তাহা এই কবিতা-পত্রখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। কিন্তু 'শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু' কবিতাটির তীব্র ব্যঙ্গ রূঢ়তায় অতুলনীয়। কালে জীবনের উগ্রতা হ্রাস পাইলে, সৌন্দর্যসাধক কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কবিতাটি সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে এবং তজ্জন্য উহা 'কড়ি ও কোমলে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় হইতে বাদ দিয়া দেন। এই দামু ও চামু কে, তদ্‌বিষয়ে সমসাময়িক সাহিত্যে বহু গবেষণা হইয়াছে। আমাদের সন্দেহ হয় চন্দ্রনাথ বসু ও যোগেশচন্দ্র বসু (১২৬১-১৩১২) ছিলেন এই কবিতার আক্রমণস্থল। চন্দ্রনাথের পরিচয় ও রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা এই গ্রন্থমধ্যে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। যোগেশচন্দ্র বসু 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকরূপে বাংলাদেশের সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। সকল প্রকার প্রগতির বিরোধীরূপে 'বঙ্গবাসী'র খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। যোগেশচন্দ্রের ব্রাহ্মবিদ্বেষ 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-৮৮) নামে উপন্যাসে অত্যন্ত নগ্নভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই গ্রন্থের কায়কটি সংস্করণ হওয়া তৎকালীন সাধারণ বাঙালি পাঠকের মতের ও রুচির পরিচায়ক। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম ও বিশেষভাবে শিক্ষিত নারীসমাজ এই কুৎসিত আক্রমণের লক্ষ্য। চন্দ্রনাথ বসুর প্রগতি-পরিপন্থী রচনা কিছু কিছু বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়। তবে চন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে কোথাও হীনতা প্রকাশ পাইত না; তিনি কখনো যুক্তি, কখনো উচ্ছ্বাস, কখনো নবহিন্দুত্বের দোহাই পাড়িয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। এই দুই 'বসু'ই উল্লিখিত কবিতার দামু বসু ও চামু বসু বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত কবিতাটি হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

রব উঠেছে ভারতভূমে হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েচেন ভয় নেইক আর।
(ওরে দামু, ওরে চামু!)
নাই বটে গোতম অত্রি যে যার গেছে স'রে,
হিঁদু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে করে।
(আহা দামু আহা চামু!)

১ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৭৩-২৭৪।

২ পত্র, কড়ি ও কোমল। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।

লিখচে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যে কথা, চামু দিচ্চে গাল।
(হায় দামু হায় চামু!)
এমন হিঁদু মিলবে না রে সকল হিঁদুর সেরা,
বোস্ বংশ আর্য বংশ সেই বংশের এঁরা!
(বোস্ দামু বোস্ চামু!)
কলির শেষে প্রজাপতি ভুলেছিলেন নাই,
সুড়সুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন আর্য দুটি ভাই,
(আর্য দামু আর্য চামু!)
দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলচে হিঁদুশাস্ত্রের মূল,
মেলাই কচুর আমদানিতে বাজার হুলুস্থুল।
(দামু চামু অবতার!)
মেড়ার মতো লড়াই করে লেজের দিকটা মোটা,
দাপে কাঁপে থরথর হিঁদুয়ানির খোঁটা।
(আমার হিঁদু দামু চামু!)
দামু চামু কেঁদে আকুল কোথায় হিঁদুয়ানি!
ট্যাকে আছে, গোঁজ যেথায় সিকি দুয়ানি!
(খোলের মধ্যে হিঁদুয়ানি!)
দামু চামু ফুলে উঠল হিঁদুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন বেড়ায় নেচে নেচে!
(ষেটের বাছা দামু চামু!)
পড়াশুনো কর, ছাড়' শাস্ত্র আষাঢ়ে,
মেজে-ঘষে তোল রে বাপু স্বভাব চাষাড়ে।
(ও দামু ও চামু!)
ভদ্রলোকের মান রেখে চল্ ভদ্র বলবে তোকে,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা জেনে ফেলবে লোকে।
(হায় দামু হায় চামু!)
পয়সা চাও তো পয়সা দেব থাক সাধুপথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ, কেউ যাবৎ ন ভাষতে!
(হে দামু হে চামু)!

সঞ্জীবনী সাপ্তাহিকে এই কবিতা প্রকাশিত হইলে কলিকাতার সাহিত্যিকমহলে বেশ একটু নাড়াচাড়া পড়ে। যুবকমহলে এই কবিতা যুগপৎ কৌতুক ও উষ্মা সৃষ্টি করে; বহু তরুণ যুবক কবিতাটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া প্রয়োজনে

অপ্রয়োজনে প্রতিপক্ষের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োগ করিতেন[১]। কবিতাটি পাঠ করিবার পর উহা যে কেন রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে প্রশ্ন উঠিবে না।

কেবল কবিতায় নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকায় এই অবাস্তব হিন্দুয়ানীকে রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে উপহাসাস্পদ করিলেন; 'আর্য ও অনার্য' নাটিকায় নূতন 'আর্যামি'কে বিদ্রূপ করিয়া লিখিতেছেন— ১ম। তুমি কে? ২য়। আমি আর্য, আমি হিন্দু। ১ম। নাম কি? ২য়। চিন্তামণি কুণ্ডু। ১ম। কি অভিপ্রায়? ২য়। মহাশয়ের কাগজে আমি লিখব। ১ম। কি লিখবেন? ২য়। আমি আর্য— আর্যধর্ম সম্বন্ধে লিখব। ১ম। আর্য জিনিসটা কি মহাশয়? ২য়। (বিস্মিত হইয়া) আজ্ঞে, আর্য কাকে বলে জানেন না? আমি আর্য, আমার বাবা নকুড় কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা ৺নফর কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা··। ২য়। য়ুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের তুলনায় তারা নিতান্ত মূর্খ আমি প্রমাণ করে দেব। এখনো আর্য-বংশীয়েরা তেল মাখবার পূর্বে অশ্বত্থামাকে শরণ করে ভূমিতে তিনবার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনি জানেন?·· ২য়। ম্যাগ্নেটিজম্‌। আর কিছু নয়। ইংরাজিতে যাকে বলে ম্যাগ্নেটিজম্‌। ১ম। আপনি ম্যাগ্নেটিজম্‌ সম্বন্ধে ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্র কিছু পড়েছেন? ২য়। কিছু না! দরকার নেই। বিজ্ঞানশিক্ষা কিম্বা কোনো শিক্ষার জন্য ইংরাজি পড়বার কিছু প্রয়োজন নেই। আমাদের আর্যেরা কি বলেন? প্রাণশক্তি, কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে। তার উপরে তৈলের সাধারণ শক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক কারণশক্তির উত্তেজনা হয়— এই ম্যাগ্নেটিজম্‌।

এইভাবে নাটিকায় শশধর তর্কচূড়ামণির আজগুবি বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মকে ও আর্যামিকে আক্রমণ করা হয়। নব্য হিন্দুদের সহিত এই বিরোধ বেশ কয়েক বৎসরই চলিতে থাকে; রবীন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে নাটিকায় নিরন্তরই তাহাদের আক্রমণ করিতেন। 'একান্নবর্তী পরিবার' 'সূক্ষ্ম বিচার' 'আশ্রম পীড়া' 'গুরুবাক্য' (হাস্যকৌতুক) এবং 'নূতন অবতার' (ব্যঙ্গকৌতুক) প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে ও নাট্যে আর্যামিকে যে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন; তাহার ইতিহাস আধুনিক বাঙালি পাঠকের নিকট অস্পষ্ট; কারণ এখনকার শিক্ষিত যুবকরা ইতিহাস সম্বন্ধে যেসব গ্রন্থ পাঠ করেন তাহা হইতে তাঁহারা জানেন যে, ভাষাতত্ত্বের দ্বারা জাতিতত্ত্বের সমস্যার সমাধান হয় না। অপরের ভাষা গ্রহণ করাটা নানা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মনৈতিক কারণের উপর নির্ভর করিতে পারে। কিন্তু উনবিংশ শতকের য়ুরোপীয় ভাষাবিদ্‌গণ সংস্কৃত ভাষার সহিত পারসিক ও য়ুরোপীয় ভাষাসমূহের কতকগুলি শব্দের মধ্যে ধাতুগত ঐক্য আবিষ্কার করিয়া ঐসকল ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে জাতিগত (racial) ঐক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সেই কল্পিত জাতির নাম দেওয়া হয় আর্য বা Aryan। ইংরেজ জার্মান রুশ ভারতীয় এমনকি বাঙালিরা সংস্কৃতজ ভাষা বলে; অতএব সকলেই 'আর্য' মহাজাতির শাখা। এই তত্ত্বকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিবার উপাদান তখনো য়ুরোপে আবিষ্কৃত হয় নাই, তাই য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতামতকে আমরা স্বল্প বিদ্যা ও প্রচুর কল্পনার রঙে রাঙাইয়া গ্রহণ করিলাম এবং আমরা যে 'আর্য' এই মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম— ইহাকেই বলে 'আর্যামি'। এই আর্যামিকে লক্ষ্য করিয়া কবি পরে লিখিয়াছিলেন—

মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য', সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য, আরামে পড়েছি শুয়ে।

১ দামু চামু প্রভৃতি রচনার প্রেরণায় কোনো লেখক একটি হেয়ালি নাট্য ভারতীতে (১২৯৩ মাঘ) লেখেন; তাহাতে দামু বোস্‌, চিন্তামণি কুণ্ডু প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুকে' চিন্তামণি কুণ্ডুর নাম আছে।

'ধর্মপ্রচার' কবিতায় (মানসী) আছে—

ওই শোনো, ভাই বিশু, পথে শুনি 'জয় যিশু'
কেমনে এ নাম করিব সহ্য আমরা আর্য শিশু।

ভারতে এই আর্য-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে আর্যসমাজ আর্যদর্শন আর্যমিশন প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি।

এই ধরণের মসীযুদ্ধের দৃষ্টান্ত কোনো সাহিত্যেই বিরল নহে; সুখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সৃজনী শক্তিকে এই ব্যর্থ সংস্কারপ্রচেষ্টায় অধিক দিন নিয়োগ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারক বা সমাজসংস্কারক নহেন—তিনি কবি, তাই কবি হিসাবে যেখানে তিনি সত্য ও সার্থক সেই সাধনার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন।

কড়ি ও কোমল

আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রবন্ধ রচনা, সাকার ও নিরাকার তত্ত্বের আলোচনা প্রভৃতি কার্য রবীন্দ্রনাথের আম-দরবারের কাজ; খাশদরবারে তিনি কবি, সুরস্রষ্টা; কাব্যরচনাই তাঁহার অন্তবিষয়ক জীবনধর্মের মূল প্রকাশ। নাট্যরচনা ও অভিনয় এই জীবন-আনন্দ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। কাব্যরচনায় ও সুরসৃষ্টিতে যে-আনন্দ তাহার ভোক্তা কবি স্বয়ং; কিন্তু নাট্য-অভিনয়ে যে-আনন্দ তাহা বহুজনকে লইয়া রসসম্ভোগের আনন্দ। অন্তরের মধ্যে উপলব্ধ সুরকে বাহিরে রূপের আলোকে দেখা শিল্পীর ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ কবি ও শিল্পী; তাই নাটক লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ কখনো তৃপ্ত হন নাই, তাহাকে অভিনয় করিয়া নূতনভাবে পাইতে চাহেন।

ঠাকুরবাড়িতে এখন অনেকগুলি বালক ও যুবক। ১২৯২ মাঘোৎসবের পর একটা-কিছু নাটক অভিনয় করিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব; 'রবিকা' 'রবিমামা' ছাড়া সকলকে আনন্দদান আর কে করিতে পারে। বন্দোরা হইতে রবীন্দ্রনাথ পৌষ মাসের শেষে ফিরিয়া মাঘোৎসবের জন্য গান-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনেকগুলি গান রচিত হয় উৎসবের জন্য। উৎসবের পরই নূতন নাটক-অভিনয়ের কথা, কিন্তু সময় অল্প, নূতন নাটক রচনা করিবার সময় নাই; তাই 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' গীতিনাটিকাদ্বয়কে ভাঙিয়া 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র নূতন রূপ দান করিলেন। কালমৃগয়া[১] হইতে ১০টি গান কোনোটি বিশুদ্ধ আকারে, কোনোটি কিছু পরিবর্তন করিয়া গৃহীত হইল। 'কালমৃগয়া'র প্রতি দশরথের আদেশ 'গহনে গহনে যা রে তোরা' গানটিকে বাল্মীকিপ্রতিভায় দস্যু সর্দার রত্নাকরের মুখে বসাইয়া দিলেন। কালমৃগয়ার রাজবিদূষক রূপান্তরিত হইল প্রথম দস্যুতে। বনদেবীর অংশগুলি কালমৃগয়া হইতে গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মুখেও একটি নূতন গান যোজনা করিয়া দিলেন, 'মরি ও কাহার বাছা'; আইরিশ সুরে গানটি বসানো হইল। এইরূপ পরিবর্তন ব্যতীত ২০টি নূতন গান রচিত হইয়াছিল।

অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় বলিয়াছেন যে, এই অভিনয় করিয়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য বহুশত টাকা ওঠে। যাহাই হউক, বাল্মীকিপ্রতিভা নূতন ভূষণে সজ্জিত হইয়া বাহির হইল। আমরা যে বাল্মীকিপ্রতিভার সহিত পরিচিত তাহা এই সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ (১২৯২ ফাল্গুন)।

এদিকে কবির পক্ষে 'বালক' পত্রিকা চালনা কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে; চৈত্র সংখ্যা বাহির করিয়া পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। উহা ভারতীর সহিত ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে মিলিত হইয়া 'ভারতী ও

১ কালমৃগয়া হইতে গৃহীত গান: ১। আঃ বেঁচেছি এখন ২। এনেছি মোরা ৩। রিমঝিম ঘন ঘন রে ৪। এই বেলা সবে মিলে চল হো ৫। গহনে গহনে যা রে তোরা ৬। চল্‌ চল্‌ ভাই ত্বরা করে মোরা আগে যাই ৭। কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে ৮। প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে। সর্দার মশায় দেরি না সয় ১০। কাজ কী খেয়ে তোফা আছি।

বালক' নামে প্রকাশিত হইতে থাকিল। 'বালক' যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই, কারণ "বালক নামেমাত্র বালক— প্রকৃতপক্ষে উহা বয়স্ক পাঠকদিগেরই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল।" পত্রিকা বন্ধ হইয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিতেছেন, "এতদিন মাথার উপরে 'বালক' কাগজের বোঝাটা থাকাতেই মাথা যেন রুদ্ধ হয়ে ছিল, নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছিল— এখন সমস্ত খোলসা— দক্ষিণে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা যেন চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।"[১] দায় নাই, দায়িত্ব নাই, পত্রিকার চাপ নাই, নিজ সংসারের ভাবনা ভাবিতে হয় না, যেখানে-সেখানে যাওয়া-আসার বাধা কম। সুতরাং ১২৯৩এর বর্ষাগমে বেড়াইতে[২] গেলেন নাসিকে— সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার অস্থায়ী জেলাজজ (১৮৮৬ জানু -অক্টোবর ৭) নাসিকে মেজবৌঠান ও বালিকা ইন্দিরা আছেন, সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায়। সেখান হইতে কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথকে কবি একখানি অতি কৌতুকপূর্ণ পত্র লিখিয়া পাঠান, পত্রখানি আধা-বাংলা আধা-হিন্দিতে লেখা। সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো বৎসর। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে স্থানলাভ করে নাই, পাঠকের জন্য সেটি উদ্ধৃত করিলাম—

কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেন বাবু মেরা,
সুরেন বাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা
মহিনাভর কুছ খবর মিলে না ইয়েত নহি আচ্ছা!
টপাল্,[৩] টপাল্ কঁহা টপাল্ রে, কপাল হমারা মন্দ,
সকাল্‌বেলাতে নাহি মিলতা টপাল্‌কো নাম গন্ধ!
ঘরকো যাকে কায়কো বাবা, তুমসে হম্‌সে ফরুখৎ।
দো-চার কলম লীখ্ দেওঙ্গে ইস্মে ক্যা হয় হরকৎ।
প্রবাসকো এক সীমা পর হম্ বৈঠকে আছি একলা—
সুরি বাবাকো বাস্তে আঁখসে বহুৎ পানি নেকলা।
সর্বদা মন কেমন কর্‌তা, কেঁদে উঠতা হির্দয়—
ভাত খাতা, ইস্কুল যাতা, সুরেন বাবু নির্দয়!
মন্‌কে দুঃখে হু হু করকে নিকলে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেক্‌তা কানে বাঙ্গালাকো জবানী।
মেরা উপর জুলুম করতা তেরি বহিন বাই,
কি করেঙ্গা কোথায় যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই!
বহুৎ জোরসে গাল টিপতা দোনো আঙ্গুলি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজনা বাজতা থেকে থেকে,
কভী কভী নিকট আকে ঠোটমে চিমটি কাটতা,
কাঁচি লে কর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো সব ছাটতা,

১ ছিন্নপত্র, ১৭ এপ্রিল ১৮৮৬ [১২৯৩ বৈশাখ ৫]।
২ প্রিয়নাথ সেনকে পত্র, ১৩ জুলাই ১৮৮৬।
৩ চিঠির ডাক

জজ সাহেব কুছ বোল্‌তা নহি রক্ষা করবে কেটা।
কঁহা গয়োরে কঁহা গয়োরে জজ সাহেবকি বেটা।
গাড়ি চড়কে লাঠিন পড়কে তুম্‌ত যাতা ইস্কিল্‌ !
ঠোঁটে নাকে চিমটি থাকে হমরা বহুৎ মুস্কিল !
এদিকে আবার Party হোতা খেলনে কোবি যাতা,
জিম্‌খানামে হিমঝিম এবং থোড়া বিস্কুট খাতা।
তুম ছাড়া কোই সমজে না ত হম্‌শ দুরবস্থা,
বহিন তেরি বহুৎ Merry খিল্‌ খিল্‌ কর্‌কে হাস্তা !
চিঠি লিখিও মাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।[১]

শ্রাবণের গোড়ায় নাসিক হইতে বোধ হয় কলিকাতায় ফেরেন, কারণ অগস্ট[২] (১৮৮৬) মাসেই হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীর সহিত আশুতোষ চৌধুরীর (বয়স ২৬) বিবাহ হয়।[৩]

আশুতোষ চৌধুরীরর সহিত রবীন্দ্রনাথের এই সময় হইতে যে ঘনিষ্ঠতা হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পাঠকের মনে আছে দ্বিতীয় বার বিলাতযাত্রার পথে জাহাজে রবীন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার পরিচয় ঘটে। ১৮৮৬ সালে তিনি বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন ও সেই বৎসরই তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের দ্বারা ঠাকুরবাড়ির যে একজন উচ্চশিক্ষিত জামাতা মাত্র লাভ হইল তাহা নহে, রবীন্দ্রনাথের এক অকৃত্রিম সাহিত্যিক বন্ধু লাভ হইল। ফরাসী কাব্যসাহিত্যের রসে আশুতোষের বিশেষ বিলাস ছিল এবং তিনি কবির সদ্যরচিত কবিতাগুলিতে কোনো কোনো ফরাসী কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই এই কবিতাগুচ্ছের ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইয়াছিল।

'ছবি ও গানে'র পরে রচিত কবিতা ও গানগুলি 'কড়ি ও কোমল' নামে কাব্যখণ্ডে প্রকাশিত হয় (১২৯৩ কার্তিক)। কয়েক বৎসরের রচিত কবিতা এই গ্রন্থ-মধ্যে সংগৃহীত হওয়ায় ইহা হইতে বিচিত্র সুরঝংকার শ্রুত হয়। অনেকগুলি কবিতার মধ্যে তাঁহার জীবনের প্রথম শোকাঘাতের ছায়া সুস্পষ্ট। কতকগুলি কবিতা যে স্বর্গতা কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যেই রচিত, তাহা সেগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। আমরা সে-কবিতা কয়টি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি ; যথার্থভাবে তাহারা এ গ্রন্থের অন্তর্গত হইবার মত কবিতা নহে। এই কাব্যের অবশিষ্ট গান ও কবিতা প্রথম কবিতাগুচ্ছের সুর ও ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এমনকি বিপরীতও বলা যাইতে পারে। মৃত্যুশোক-পর্বে জীবনের প্রতি যে-বৈরাগ্যভাব ঐ কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা যে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হৃদয়াবেগপ্রসূত, তাহা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। আসলে কড়ি ও কোমলের যুগ বলিয়া যদি কোনো যুগকে কল্পনা করা যায়, সে-সময়টা জীবনস্মৃতির মৃত্যুশোক-পরিচ্ছেদে বর্ণিত বৈরাগ্যের ও কৃচ্ছ্রতার সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধচ্ছিন্ন। কবি স্বয়ং এই পর্বটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটে বাঁধা ভোরবেলার তোলা একমুঠো বেলফুল, পায়ে একজোড়া চটি।" শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "এ সময়ে

১ নাসিক হইতে খুড়ার পত্র, ভারতী ১২৯৩ আশ্বিন, পৃ. ৩২৬-৯৭।

২ ১৮৮৬, ১৬ই অগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মৃত্যু ঘটে (১২৯৩ ১লা ভাদ্র)।

৩ আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯৩১) বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮১-১৮৮৫।

আমাকে যদি একটা বাগান দিতে পারতেন। নদীর তীর, গাছের ছায়া, মাঠের বাতাস, আমের বোল, কোকিলের কুহু, বসন্তী রঙের চাদর, বকুল ফুলের মালা, এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও চাচ্ছি।"[১] ইহা কবিকল্পনা নহে। সৌন্দর্য-সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ একটি চারুকলায় পরিণত করিয়াছিলেন; তাঁহার বিলাসশোভা, কেশবিন্যাস কলিকাতা যুব-সমাজের আকাঙ্ক্ষার ও অনুকরণের বিষয় ছিল।

সমসাময়িক এক উদীয়মান কবির লেখনী হইতে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিত্র পাওয়া যায়, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। কবি দীনেশচরণ বসু[২] বাংলা ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহার তরুণ বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিয়াছিলেন, "··বঙ্গসাহিত্যজগতের উঠন্ত রবি রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে··বিগতকল্য··গিয়াছিলাম। ঠাকুরবাড়ির প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া দোতালার সিঁড়ির মুখেই রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নয়ন মুগ্ধ, মন আনন্দসাগরে ডুবিল। কোনো ইংরাজি পুস্তকে অমর কবি মিল্টনের দেবমূর্তি দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলেই সেই মূর্তিতে রবিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে। দেহ-ছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা চক্ষু ভ্রূ সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ (curls) স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিধানে ধুতি। কেন বলিতে পারি না, রবিঠাকুরের অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন এই অঙ্গে গৈরিক বসন অধিক শোভা ধারণ করিত। উনবিংশ শতাব্দীর Albert ইত্যাদির কেশরক্ষার[৩] ফ্যাশনের মধ্যে দীর্ঘ কেশ দেখিবার জিনিস বটে এবং যে তাহা রক্ষা করে তাহাকেও সাহসী পুরুষ বলিতে হইবে। সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হইল। রবিঠাকুরের বয়স অতি অল্প, তেইশের অধিক হইবে না।[৪] কিন্তু স্বভাব স্থির। কলেজে থাকিতে মিল্টনকে তাঁহার সহপাঠিগণ 'Lady' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, রবিঠাকুরকেও সেই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। স্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট রমণীজনোচিত। রবিঠাকুরের গানের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু গান শুনি নাই। তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করা হইল। সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন। গানটি এই: 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না'।"··[৫]

আমরা কবিজীবনের সেই সন্ধিক্ষণে উপস্থিত যখন যৌবন তাহার প্রথম উচ্ছ্বাসের বিচিত্র আবেদন নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রয়াসী। কড়ি ও কোমলের কেন্দ্রগত কবিতাগুলি তাহারই প্রকাশ। গত বৎসরটি ছিল প্রধানত গদ্যরচনার যুগ, শেষদিকে সংগীত আসিয়া জীবনকে মধুময় করে বটে; তবে সে সংগীতে অন্তরের সুর ধ্বনিত হয় নাই। কতকগুলি মাঘোৎসবের জন্য রচিত ব্রহ্মসংগীত, আর কতকগুলি বাল্মীকিপ্রতিভার নাট্যসংগীত, অন্তরের অন্তস্থলের সহিত ইহাদের যোগ সামান্যই। মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা তরুণ কবির মনকে একান্ত করিয়া

১ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৩।

২ দীনেশচরণ বসু (জ. ১৮৫১, ফেব্রুয়ারি ২৩ ॥ ১২৫৭, ১২ই ফাল্গুন—মৃত্যু ১৮৯৮ অক্টোবর ১২ ॥ ১৩০৫, ২৭শে আশ্বিন)। দ্র. সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৪২, পৃ. ৩১-৫২। ১৩০৪ সালের 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রের কার্তিক সংখ্যায় ইঁহার জীবনী প্রকাশিত হয়।

৩ 'অ্যালবার্ট কাট্' কথা চলিত ছিল সে-যুগে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স কনসর্ট অ্যালবার্টের কেশ ও শ্মশ্রুরক্ষা রীতি ছিল অনুকরণীয়; যেমন আর-এক সময়ে ছিল ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি।

৪ কবির বয়স এই সময়ে পঁচিশ।

৫ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যৌবনে রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী ১৩৪৯ আষাঢ়, পৃ. ২৪৩। দ্র. প্রদীপ ১৩০৫ ফাল্গুন, দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত দীনেশচরণ বসু।

টানিতেছিল। "এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূলকথা।"[১]

কাব্য হিসাবে কড়ি ও কোমলকে রবীন্দ্রনাথ তেমন আমল দেন নাই। কবির নিজের মতে 'মানসী' (১৮৯০) তাঁহার প্রথম যথার্থ কাব্য, 'মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে'। কিন্তু জীবনস্মৃতিতে স্বীকার করিয়াছেন যে কড়ি ও কোমলে ছন্দ ও ভাষার নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে।[২] এই কাব্যখানির মধ্যে শিশুকবিতা, প্রেমসংগীত, নারীসৌন্দর্য, ব্রহ্মসংগীত, স্বদেশী সংগীত সবই আছে; সমস্তগুলিকে খণ্ডভাবে গ্রথিত করিয়া একটি সমষ্টিগত রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে, পঁচিশ বৎসর বয়সের পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে। সমগ্র মানবতার বিচিত্র সাধনরূপ কাব্যখানির মধ্যে দেখাইবার প্রয়াস হইয়াছে— সংসার, স্বদেশ, ও ঈশ্বর; এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্যকরণই হইতেছে মানবজীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ— এই কাব্যে সেই সমন্বয়ের অপূর্ণ আভাস পাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তথা রবীন্দ্র-জীবনে এই তিনটি হইতেছে মূল কথা— সংসার, স্বদেশ, ও ঈশ্বর; অর্থাৎ নিকটের মানুষ, দূরের মানুষ, এবং নিকট ও দূরকে যিনি মিলাইয়াছেন সেই পরমাত্মাকে বাদ দিয়া জীবনের সকল কর্ম নিরর্থক। কিন্তু এই কাব্যে নিকটের মানুষের সহিত আমাদের যে-বিচিত্র সম্বন্ধ, তাহাকেই কবি নানারূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্বদেশ ও ঈশ্বর গৌণ।

কড়ি ও কোমলের কেন্দ্রগত মূল কবিতাগুলি হইতেছে প্রায়ই সনেট-জাতীয় কবিতা। 'ছোটো ফুল' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চিরদিন' পর্যন্ত এই কবিতাগুলি কাব্যের অন্তরের বাণী বহন করিতেছে। এই গুচ্ছের বাহিরে আছে গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'প্রাণ' ও শেষ কবিতা 'শেষ কথা'। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কড়ি ও কোমলের এই কবিতাগুলি রচিত— যেমন রচিত চৈতালি ও নৈবেদ্যের কবিতা। সেইজন্য এই বিশেষ কবিতাগুলির একটি মিলিত অখণ্ড রূপ হইয়াছে, সমগ্র গ্রন্থের হয় নাই। ইহাকেই আমরা কড়ি ও কোমলের কেন্দ্রগত কবিতা বলিতেছি।

কবির পূর্ণযৌবনে এই কাব্যখণ্ড রচিত, তাই তিনি 'যৌবনস্বপ্ন' দেখিতে তন্ময়— 'আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ'। কে তাহারে 'করেছে পাগল'? কিন্তু উহা স্বপ্নই তো; কেননা প্রেমের সহিত মিলন হইয়াছে ক্ষণিকের তরে— দুইখানি মেঘের মত বাষ্পময়, 'দোঁহার পরশ লয়ে দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা'। সৌন্দর্যের পূজারী কবি নারীকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন, নানাভাবে নানা রূপে— 'গীতোচ্ছ্বাস'এ যেখানে 'নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার'। কিন্তু এখনো ব্যবধান ঘুচিল না—

> দৃষ্টি তার ফিরে এল— কোথা সে নয়ন?
> চুম্বন এসেছে তার— কোথা সে অধর।

নারীর বিকশিত যৌবনই তাহাকে প্রথম মর্যাদা দান করে। তাহার দেহের লাবণ্য ও সৌন্দর্য দুইটি মূর্তিতে প্রকাশিত— এক প্রেয়সীরূপে আর-এক মাতৃরূপে। তাহার মাতৃত্ব তাহাকে পরিপূর্ণ অধিকার দান করে। এই যুগ্ম-রূপের একটি হইতেছে প্রেয়সী নারী—

> নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
> বিকশিত যৌবনের বসন্ত-সমীরে

১ জীবনস্মৃতি

২ প্রবোধচন্দ্র সেন, কড়ি ও কোমলের ছন্দপরিচয়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ ১৩৫৫ কার্তিক-পৌষ, পৃ. ১১৭-১২১।

কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ-সুধায় করে পরান পাগল।[১]

যুগ্মরূপের অন্যটি হইতেছে মাতৃরূপী নারী—

চিরস্নেহ-উৎসধারে অমৃত নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।
জাগে সদা সুখসুপ্ত ধরণীর 'পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।[২]

নারীর সৌন্দর্যকে নানা রসে কবি বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাহাকে কুৎসিত বস্তুতান্ত্রিক করিতে পারেন নাই। 'বিবসনা'র 'শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ'কে 'লাজহীনা পবিত্রতা' বলিয়া আখ্যাত করিলেন; সেই তেজোময় জীবনের যৌবনের লাবণ্যের নিকট 'অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত'। এই প্রেম-সম্ভোগের সম্পূর্ণ কথাটি বলিলেন 'দেহের মিলন'এ—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।

প্রেম সার্থক হইল 'পূর্ণ মিলন'এ, যেখানে—

বিজন বিশ্বের মাঝে মিলনশ্মশানে
নির্বাপিত সূর্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।

কিন্তু বিজন বিশ্বের মিলনশ্মশানে সুখ আছে তৃপ্তি নাই, সম্ভোগ আছে আনন্দ নাই। সেই অনাদি প্রশ্ন জাগে তার পরে কী, তাহাতে আনন্দ হইল কী, ততঃ কিম্। কবির চিরবিরহী মন পূর্ণমিলনেও বলে 'সুখশ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয়'; কল্পনার অবাস্তব জগতের ন্যায়ই এই সৌন্দর্যসুখলিপ্ত সংসার।—

ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাস রুদ্ধ হয়—
পরান কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়—
কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছি তাই।[৩]

১ স্তন, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।
২ স্তন, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।
৩ শ্রান্তি, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।

সুতরাং এই 'বন্দী'জীবন হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা উঠিতেছে—

দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ—
চুম্বন-মদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।· ·
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়—
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব আর পায়॥[১]

নারীর জন্য 'কেন এই মোহ' এই প্রশ্নই কবির মনে বারে বারে আঘাত করে—

আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল—
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া।[২]

আর, 'এ মোহ ক'দিন থাকে এ মায়া মিলায়।'[৩]

তাই সত্য জগতকে, বাস্তব সত্যকে, পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা—

এস, ছেড়ে এস, সখী, কুসুমশয়ন!
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশকুসুমবনে স্বপন চয়ন।· ·
চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখদুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসারসংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।· ·[৪]

যৌবনের স্বপ্ন দেখিয়া কবি যাত্রা করিয়াছিলেন, সৌন্দর্যমদিরা নিঃশেষে পান করিয়া দেখিলেন 'কুসুমের কারাগারে' যেখানে জীবন রুদ্ধ সেখানে তৃপ্তি নাই, আনন্দ নাই। তাই কবির অন্তরের অন্তর হইতে এই আকুতি উঠিল—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।[৫]

কড়ি ও কোমলের এই কেন্দ্রীয় কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কবির সর্বগ্রাসী মনের সকল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হইলেও মনে হইতেছে যেন সব কথা নিঃশেষে বলা হয় নাই, কী যেন অব্যক্ত কথা, অনির্বচনীয় ভাবনা এখনো অন্তরের মধ্যে

১ বন্দী, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।
২ কেন, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।
৩ মোহ, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।
৪ মরীচিকা, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।
৫ প্রাণ, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।

রুদ্ধ—ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না। জটিল মানবমনের অতৃপ্ত আবেগ ও অসীম অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে পারে এমন ভাষা আজও মানুষের আয়ত্তাধীন হয় নাই, তাই কবি বলিতেছেন—

মনে হয় কি-একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।· ·
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরি,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে,
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।[১]

কবির বিশ্বাস ছিল যে, 'মানুষের কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনা-বেচার বিচিত্র লীলা চলে, এরি মধ্যে, এই মুখর কোলাহলের মধ্যেই তাঁর পূজার গীত উঠেচে— এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনই তাঁর উৎসব নয়।' একখানি পত্রে তাঁহার কাব্যের মানবপ্রীতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।· ·মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেইজন্যেই মোটা-মোটা নামওয়ালা ছোটো ছোটো গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারি নে। স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি ক'রে নিখিলমানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না— কেননা অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।" শ্রীশচীন সেন ঠিক বলিয়াছেন, "তাই 'কড়ি ও কোমল'এ 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' হইতে 'চৈতালি' কাব্যের মধ্য দিয়া কবি 'নৈবেদ্য'এর 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'— এই সুরে পৌঁছিলেন।"

কড়ি ও কোমলের কবিতাগুচ্ছ একটি কাব্য যুগের অবসান ও নূতন যুগের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে। এই নূতন যুগে কবি যাহাকে খুঁজিতেছেন সে হইতেছে তাঁহার মানসী, মানসসুন্দরী— বাক্যের অতীতে তাহার বাণী, সৌন্দর্যের অতীতে তাহার রূপ; সে কায়া নয়, সে ছায়াও নয়— সে মায়া। যৌবনের 'কুসুমের কারাগার' ভাঙিয়া 'মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা' কবির চিত্তকে পীড়ন করে; 'মানুষের মুক্তজীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগরযাত্রায় চলিয়াছে, তাহারই জলোচ্ছ্বাসের শব্দ' কবিকে চঞ্চল করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যৌবনের নূতন অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা হইতে যে-সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, জীবনস্মৃতিতে তাহারই কথা 'বর্ষা ও শরৎ' প্রভৃতি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। তার পর বহু বর্ষ পরে জীবনসন্ধ্যায় আসিয়া সেই যুগকে পুনরায় বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ মেলে; রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কড়ি ও কোমলের ভূমিকা লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া কবি লিখিয়াছিলেন, "যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম।· ·আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার

১ শেষ কথা, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।

কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক। তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্য-রীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলে ছিলুম। কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়োদাদার [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্যে ভালোলাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারে নি। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের কোনো মিশ্রণ যদি ঘটে থাকে তো সে গৌণভাবে।' [১]

কড়ি ও কোমল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালের কার্তিক মাসে— ছবি ও গান প্রকাশের প্রায় তিন বৎসর পরে। ছবি ও গানের সময় হইতে এই কবিতাগুলি অনেকটা সংহত আকার ধারণ করিলেও বাস্তব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এখনো হয় নাই। এই দুই কাব্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ছবি ও গানে কল্পনার ভাগটি প্রবল, কড়ি ও কোমলে হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য। ছবি ও গানের পর রচিত কবিতাগুলি সমস্তই কড়ি ও কোমলে সংগৃহীত। আশুতোষ চৌধুরী এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া প্রকাশ করেন। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' এই চতুর্দশপদ কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমে বসাইয়া দেন; তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।

সতেরো বৎসর পরে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ নূতনভাবে প্রকাশিত হইল (১৩১০)। এই সময়কার কবিতাগুলিকে 'যৌবনস্বপ্ন' নাম দেওয়া হয়। এই কাব্যখণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া দেন যৌবনের মর্মকথাটি—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। [২]

আশুতোষ চৌধুরী কড়ি ও কোমল পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে উহার কবিতার মধ্যে কোনো কোনো ফরাসী লেখকের প্রভাব দেখা যায়, সে কথাটি মুহূর্তমাত্র দাঁড়াইয়া চিন্তা করা প্রয়োজন। কড়ি ও কোমলের কেন্দ্রগত কবিতাগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় তাহার মধ্যে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রবল, তবে প্রচ্ছন্ন। কিছুকাল হইতে ফরাসী একদল লেখক ও তাঁহাদের অনুকারকগণ সাহিত্যে ও কলায় এক নূতন বচন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সেটি 'art for art's sake' অর্থাৎ আর্টেই আর্টের চরম সার্থকতা বা আর্টের খাতিরেই আর্ট। এই নূতন সম্প্রদায়ের মতে আর্টের প্রয়োজন অহেতুক অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য কোনো নীতি ইহার দ্বারা সফল বা সার্থক হয় না।

আর্টের খাতিরে আর্ট— এই কথার স্রষ্টা ফরাসী উপন্যাসিক গোতিএ (Theophile Gautier ১৮১১-৭২); তাঁহার উপন্যাস মাদ্‌মোয়াজল্‌ দ মপ্যাঁ (Mlle. de Maupin) লিখিত হয় ১৮৩৫ সালে। এতকাল পরে য়ুরোপে তাঁহার উপন্যাসের এই বুলিটি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। বাংলাদেশেও তার তরঙ্গ আসে;

১ কবির মন্তব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।
২ দ্র. উৎসর্গ।

বৎসর দুই পূর্বে বইখানির তর্জমা রবীন্দ্রনাথ পড়েন, প্রিয়নাথ সেনের নিকট হইতে সেটি পাইয়াছিলেন।[১] সুতরাং কড়ি ও কোমলের কবিতার মধ্যে ফরাসীপ্রভাব বা বিশেষভাবে এই আর্টসর্বস্বতার ভাব যে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমলের এ দুর্বলতা সম্বন্ধে পরে সজাগ হন বলিয়াই বোধ হয় লেখেন 'মানসী' হইতে তাঁহার স্বকীয় কাব্যধারার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের যৌবনারম্ভে দেহচর্চা ছিল একটি সুষ্ঠু কলা বা আর্ট, সৌন্দর্যচর্চা কাব্যজীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই অবস্থায় আর্টসর্বস্ব মতবাদ পোষণ করা কবির পক্ষে স্বাভাবিক। তাই দেখি কাব্যসৃষ্টির আদিপর্বে আর্টের প্রতি কবির অহেতুকী আকর্ষণ, আবার দেখিব কাব্যসৃষ্টির শেষপর্বেও আর্টের প্রতি অহেতুকী অনুরাগ।

মানুষের মন অনাদিকাল হইতে শব্দ ও রূপের মধ্য দিয়া সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। কেন যে প্রতিকূল তপ্ত বিষবাষ্পের বিরুদ্ধেও নূতন-কিছু সৃষ্টি করিবার জন্য মন এত ব্যাকুল, শব্দ ও রূপের নিগড়ে অসীমকে বাঁধিবার জন্য কেন তাহার এত প্রয়াস, সৃষ্টির জন্য কেন এত আকুতি, কেন এত বেদনা— এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মনে বারে বারে উঠিয়াছে ও তিনি নানাভাবে তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বহুবারই তিনি বলিয়াছেন নিজের ভালো লাগে বলিয়াই লিখি, সৃষ্টির আর-কোনো প্রেরণা নাই, উদ্দেশ্য নাই। অন্যকে সুখী করা অপেক্ষা আত্মপ্রকাশের দ্বারা নিজের আনন্দ হয় বলিয়াই মানুষ সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত হয়। সেই সৃষ্টির আনন্দ বা প্রেরণা (urge) কোনোপ্রকার নীতি বা দর্শনের দ্বারা অথবা প্রচলিত ধর্মাধর্মবোধ দ্বারা প্রভাবান্বিত বা সংকুচিত হয় না, সে আপন রসে স্বয়ং প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের প্রথমপর্বে আর্টের এই নৈর্ব্যক্তিক রূপটি স্বীকৃত হইয়াছিল।

কিন্তু আদর্শ পবিত্রতাবোধের সঙ্গে সুসংগত সৌন্দর্যবোধ অন্তরের মধ্যে ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা ছিল বলিয়া তাঁহার লেখনী আর্টকে কখনো মসীলিপ্ত করে নাই। অত্যন্ত স্থূল বিষয় ও বস্তু বর্ণনাকালে কবির ভাষা কখনো অসুন্দরের পথাশ্রয়ী হয় নাই। আর্টকে বা সুন্দরকে কাব্যে ও কলায় উচ্চ স্থান দিয়াও সত্য ও মঙ্গলকে জীবন হইতে বেদিচ্যুত হইতে দেন নাই। উপনিষদের শিক্ষা তাঁহার মজ্জাগত সংস্কার, তাই তিনি বলিয়াছেন আনন্দ হইতে রসের উদ্ভব।

আর্টের নামে বাস্তবতাকে নগ্নরূপে প্রকাশ করিতে রবীন্দ্রনাথের যে-স্বাভাবিক সংকোচ দেখা যায় তাহা সৌন্দর্যগত সংকোচ, নীতিগত বা পরম্পরাগত শিক্ষা বা বিশ্বাস -প্রসূত নহে। কবির এই অত্যন্ত স্বাভাবিক æstheticismকে আর্টসর্বস্ব বে-আব্রুবাদীরা ভীরুতা বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য সুন্দর ও মঙ্গল পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত বলিয়া বাস্তবকে আর্টের নামে অসুন্দর করিতে সত্যই তাঁহার সংকোচ ছিল।

এই কবিতাগুচ্ছের নামকরণ কবি কেন 'কড়ি ও কোমল' করিলেন। কড়ি ও কোমল সংগীতশাস্ত্রের শব্দ। এ যাবৎ তিনি যে-কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সবগুলিরই নামের সহিত গান যুক্ত: শৈশবসংগীত, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত-সংগীত, ছবি ও গান। 'কড়ি ও কোমল'ও সেই গানসংক্রান্ত শব্দ।[২]

১ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ. ২৭২।

২ ১২৯২ সালে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার গীতসূত্রসার গ্রন্থে 'কোমল ও কড়ি' সুরের বিবরণ দিয়াছিলেন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থখানি পাঠ করেন। এ গ্রন্থ হইতে কি কবি তাঁহার নূতন গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করেন 'কড়ি ও কোমল'?

কড়ি ও কোমলের পরে

'কানু ছাড়া গীত নাই' এই বাক্যটি যিনি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার অন্তরের কথা আমরা জানি না, তবে এ কথা সত্য যে বাংলাভাষায় গীতসাহিত্যের অনেকখানি প্রেরণা কৃষ্ণপ্রেমলীলাসম্ভূত। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-সাহিত্য কেন ও কিভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা করিয়াছি। কাব্যরত্নের সন্ধানে তিনি পদামৃতসাগরে অবতরণ করিয়াছিলেন ও পদকর্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করেন। আলোচ্য পর্বের বৎসরাধিক কাল পূর্বে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে 'পদরত্নাবলী' (১২৯২ বৈশাখ) নামে যে-চয়নগ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাও কবির বৈষ্ণব-সাহিত্যপ্রীতির পরিচায়ক। বাল্যকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট পদ-সাগরের তীরে তীরে কেবল উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে না, তিনি রসামৃতসাগরে অবগাহন করিয়া কাব্যরত্ন পাইয়াছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমবিরহাদির সংগীতের ভাষা ও রূপকল্পনা এমন আশ্চর্যরূপে বৈষ্ণবীয়। কড়ি ও কোমলের কতকগুলি গান বৈষ্ণবীয় বিরহ-বেদনাকে নূতন ভাবে ও নূতন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যপাঠকদের নিকট সেগুলি খুবই পরিচিত জানিয়াও উল্লেখ করিতেছি। 'মথুরায়' কবিতাটিতে আছে 'বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?' কবিতার ছত্রে ছত্রে পদাবলীর ভাব।

> এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্দ্রানন,
> ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শুনা যায়?
> একা আছি বনে বসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
> সোঙরি সে মুখশশী পরান মজিল সই।

'বাঁশি'তে আছে 'ওগো শোনো কে বাজায়· ·যমুনারি কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ।' 'বিরহ' কবিতাটি এই সুরেই বাঁধা। 'ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল দেখে তারে আমি মরিব' এ ভাব বৈষ্ণবপদকর্তাদেরই উপযুক্ত। 'বিলাপ' রাধার অন্তরের— 'আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার কত আর ঢেকে রাখি বল্।' 'ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে' গানে বৈষ্ণবীয় ভাব পরিপূর্ণ।

বৈষ্ণব গান ও কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি নানাভাবে প্রকাশ পায়। এই সময়ে তিনি 'বিদ্যাপতির পদাবলী' প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন।[১] 'সাবিত্রী'র বিজ্ঞাপনে বাহির হইয়াছিল, "প্রায় দশ বৎসর কাল রবীন্দ্রবাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" কিন্তু 'বিদ্যাপতির পদাবলী' বিজ্ঞাপিত হইয়াও প্রকাশিত হইল না। প্রকাশ না হইবার কারণ অনুসন্ধান অলস গবেষণা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

এই সময়ে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) নামে উদীয়মান সাহিত্যিক The Poets of Bengal নামে একটি গ্রন্থমালা সম্পাদন করিবার সংকল্প করেন। ১২৯১ সালে তিনি তাঁহার সংকল্প বড়লাট লর্ড রিপনকে জানাইয়া তাঁহার করকমলে উক্ত গ্রন্থমালা উৎসর্গ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয় অনুকূল অর্থ

১ অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "বঙ্গীয় শব্দকোষের নিমিত্ত মৈথিল শব্দ-সংকলনের সময়ে আমি Grierson সাহেবের সংগৃহীত বিদ্যাপতির মৈথিল উৎকৃষ্ট-পদাবলী সংগ্রহ (Maithil chrestomathy) ও পদাবলী ব্যবহৃত মৈথিল শব্দমালা (M. C. Vocabulary) পড়িয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ পূর্বে এ পদাবলী পড়িয়া পদাবলীর পাশে পাশে বাংলায় গদ্যে ও পদ্যে অনেকগুলি পদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ সকল স্থলে সম্পূর্ণ পদের নাই— কোনো পদের সম্পূর্ণ, কোনো পদের আংশিক অনুবাদ আছে।"· ·মোট ৫২টি পদের অনুবাদ আছে দ্র. প্রবাসী, ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা।

সাহায্য পান নাই বলিয়া সে গ্রন্থ আর ছাপা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সম্পাদিত বিদ্যাপতির খাতাখানি তাঁহাকে দিয়া দেন। কবে দেন জানি না। তবে তিনি বহুবার এ কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন তাঁহার সংকলিত 'বিদ্যাপতি' ১৩০১ সালের পূর্বে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৫) কাব্যবিশারদ লিখিয়াছিলেন, "শ্রীমতিলাল চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কয়েকটি পরামর্শ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত করিয়াছেন।" —ভূমিকা ১৩০৫ আশ্বিন ১। রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ঐ খাতা তিনি কখন পান তাহা তিনি বলেন নাই। তবে বোধ হয় কালীপ্রসন্নের সংকলিত গ্রন্থমালা প্রকাশের কথা জানিতে পারিয়া তিনি 'বিদ্যাপতির পদাবলী' সম্পাদন করিয়া এবং প্রকাশের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়াও প্রকাশ করিলেন না। কালীপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যে খাতাখানি পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনো ফেরত দেন নাই। সেটি পাওয়া গেলে রবীন্দ্র-প্রতিভার আর-একটি দিক আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হইত।[১]

এই শীতকালে কলিকাতায় খুবই উত্তেজনা। ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে কন্‌গ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৮৮৬ ডিসেম্বর) হইতেছে; এবার বিভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও জনসভাসমূহ নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন। বোম্বাইএর প্রথম অধিবেশনে সেরূপ সম্ভব হয় নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম পরিচালক ডক্টর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি; কন্‌গ্রেসের সভাপতি দাদাভাই নৌরজী। কলিকাতার মধ্যে এই শ্রেণীর জনসমাগমাদি কর্মোপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ হইত গানের জন্য; তাঁহার সুকণ্ঠ, তাঁহার নয়নমনমুগ্ধকর রূপ সকলের আকর্ষণের বিষয়। তিনি সভার উদ্‌বোধন সংগীত গাহিলেন 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। শুনিয়াছি গানটি এই সভা উপলক্ষ্যে রচিত হয়। তখনকার কন্‌গ্রেস অধিবেশনে আজিকার জনতা ছিল না; এবার মাত্র ৪০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মাঘোৎসবের সময়ে অনেক নূতন গান রচনা করিলেন। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি খুবই পরিচিত, যেমন 'অনেক দিয়েছ নাথ' 'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে' 'বসে আছি হে কবি শুনিব' 'সত্য মঙ্গল প্রেমময়' 'আমায় ছ-জনায় মিলে পথ দেখায় বলে' ইত্যাদি। এই গানগুলি শুনিলে আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এ কি 'কড়ি ও কোমলে'র রচয়িতা যুবক কবির রচনা, না, কোনো ধর্মসাধকের অন্তরের আকূতিভরা প্রার্থনা। ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসপরায়ণতা ও আত্মনির্ভরশীলতা রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসের একটি বিশেষ কথা, সেটি তাঁহার জীবন-আলোচনার কোনো অবস্থায় যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব এ পর্যন্ত চিৎপুর রোডস্থিত রাজা রামমোহন রায় নির্মিত ব্রহ্মমন্দিরে নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছিল। ১২৯৩এর মাঘোৎসব ব্রহ্মমন্দিরে না হইয়া ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় অনুষ্ঠিত হইল; রবীন্দ্রনাথ

১ "বিদ্যাপতির পদাবলী"। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত ও গোবিন্দলাল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। "প্রায় দশ বৎসর কাল রবীন্দ্রবাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলী যথাসম্ভব নির্দোষ ও নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইতিপূর্বে মুদ্রিত কয়েকটি সংস্করণে পদের বা টীকার যত ভুল আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত সংশোধিত হইল। ফল কথা, সেই প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে— এবং যাবতীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ভাষা বুঝিতে হইলে— রবীন্দ্রবাবু কর্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর, মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত।...১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত।" মূল্য আট আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখের [১২৯৩] মধ্যে প্রকাশিত হইবে। পিপল্‌স্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।" এই বিজ্ঞাপন 'সাবিত্রী'তে ১২৯৩ আশ্বিনে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকরূপে মহর্ষির নিকট হইতে এই কার্যের জন্য অনুমতি লইয়াছিলেন।[১] ইহার ফল ভাল হইল না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ ঠাকুর-পরিবারের মধ্যেই প্রায় নিবদ্ধ ছিল, এখন তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আপনাদের গৃহের আবদ্ধ করিলেন।

যাহা হউক একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মাঘোৎসবের জন্য কবি যেসব গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মহর্ষি শুনিতে চাহিলেন; তখন মহর্ষি থাকেন চুঁচুড়ায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হারমোনিয়াম বাজাইলেন, রবীন্দ্রনাথ গান গাহিলেন। 'কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।' গান গাওয়া শেষ হইলে মহর্ষি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক কবির হাতে দিলেন।[২]

সাময়িক একটি সামাজিক আহ্বানের কথা বলিব। বাংলা ১২৯৩-এর শেষ দিকে অধ্যাপক প্রসন্নকুমার রায় (Dr. P. K. Roy) কর্তৃক আহূত কলেজের ছাত্র-সম্মেলন উপলক্ষ্যে দুইটি গান রচনা করিয়া কবিকে গাহিতে হয়। গান দুইটি—'আগে চল্ আগে চল্ ভাই' ও 'তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ'।[৩]

বিশ বৎসর পরে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'দেশনায়ক'[৪] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় গানটির কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দেশবাসীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে যদি আমরা সত্যই আবেদন ও নিবেদনের থালা নামাইয়া হাত খোলসা করিয়া থাকি, তবে পরের 'পরে অভিমানটুকু কেন রাখি। অভিমানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দাবি থাকে এবং সে-দাবি বলিষ্ঠের দাবি নহে। এই গীতদ্বয় রচনাকালেও যুবক কবির মনে সেই ধিক্কারই জাগিয়াছিল। শেষোক্ত গানটির কয়েকটি পংক্তি—

> কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা, চোখে নাই কারো নীর।
> আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির।
> কাঁদিয়ে সোহাগ, ছি ছি এ কী লাজ! জগতের মাঝে ভিখারির সাজ—
> আপনি করি নে আপনার কাজ, পরের 'পরে অভিমান।

পত্রিকা-পরিচালনার দায়িত্ব না থাকিলেও ভারতীতে লেখা দেওয়ার দায় হইতে যে একেবারে মুক্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। গত বৎসরের মত অফুরন্ত রচনার প্রেরণা নাই, কিন্তু লেখনী বন্ধ নহে। ১২৯৩ সালের অন্যান্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'হেঁয়ালিনাট্য'[৫]; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা হইলেও তাহাদের ধার ছিল ক্ষুরেরই মত। নব্য হিন্দুদের সহিত বিরোধের অবসান এখনো হয় নাই, সময় ও সুযোগ পাইলেই রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেন, প্রতিপক্ষও তাহার জবাব দেন; উভয়পক্ষেই মসীবর্ষণ চলে। তবে এখন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সূক্ষ্ম পথ ধরিয়াছেন। হেঁয়ালি নাট্যগুলির মধ্য দিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ করিয়া প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতেছেন। গত বৎসরের 'বালকে' প্রকাশিত নাটক হইতে এবারকার রচনাগুলি অন্য ধরণের। এবারকার রচনার ব্যঙ্গাদি

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১২৯৩ অগ্রহায়ণ।

২ দ্র. জীবনস্মৃতি।

৩ ভারতী ১২৯৪ বৈশাখ। গীতবিতান।

৪ দেশনায়ক, সমূহ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬ পৃ, ৪৮৮।

৫ 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২) এই শারাদ (charade) শ্রেণীর হাস্যকৌতুক আরম্ভ হয়।

অত্যন্ত স্পষ্ট, উদ্দেশ্য প্রকট, কাহাকে আঘাত করিতেছেন তাহা বুঝা যায় সহজে; সেইজন্য সাহিত্যের দিক হইতে রচনাগুলি দুর্বল। এই সময়ের নাটক হইতেছে— অন্ত্যেষ্টি সংকার, আশ্রমপীড়া, রসিক, গুরুবাক্য, একান্নবর্তী পরিবার, সূক্ষ্মবিচার প্রভৃতি।[১]

যাহা হউক, সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে কবি একটি বড় কাজ এই বৎসর সমাধা করিলেন; গত বৎসর বালকে 'রাজর্ষি' উপন্যাসটির প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়— মাত্র ২৬টি অধ্যায় বাহির হয়। অবশিষ্ট ২৭শ হইতে ৪৪শ পরিচ্ছেদ লিখিয়া এবার গ্রন্থখানি শেষ করিলেন। ১২৯৩ সালের আশ্বিন (?) মাসে উহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীকে উৎসর্গ করেন।[২]

কাব্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশের নূতন রীতি দেখা দিলে সাহিত্য-জগতের সনাতনী স্বাস্থ্যরক্ষীর দল আগন্তুকদের আবির্ভাবকে চিরকালই অবজ্ঞার দ্বারা, রূঢ় সমালোচনার দ্বারা বিলোপ করিতে প্রয়াসী হন। 'কড়ি ও কোমলে'র আবির্ভাব বাংলাসাহিত্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার কবিতাগুলি বাংলাদেশের চিরাচরিত সৌন্দর্যবোধের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে নাই; নরনারীর প্রেমের গতানুগতিক বর্ণনা-পাঠে-অভ্যস্ত পাঠকদের কাছে ইহা কাব্যে বিপ্লবের ন্যায় প্রতিভাত হইল। অভ্যাসগত পরিচিত রীতি রুচি ও রস হইতে এই কবিতা সম্পূর্ণ পৃথক। তজ্জন্য 'নবজীবনে'র সুবিজ্ঞ সম্পাদক এই কাব্যকে 'কাব্যি' বলিয়া ব্যঙ্গ করিলেন। দেড় বৎসর পরে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'মিঠে কড়া' লিখিয়া 'কড়ি ও কোমলে'র ব্যঙ্গ অনুকৃতি প্রকাশ করেন।

আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নবজীবনের সমালোচনা পাঠ করিয়া কড়ি ও কোমলের নূতন কাব্যরীতির সমর্থনে পরোক্ষভাবে জবাব দেন 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট'[৩] শীর্ষক প্রবন্ধে। নিজের রচনার সমর্থনে কৈফিয়ত বা সাফাই তিনি পরে কয়েকবার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বিশুদ্ধ রস ও রীতির মাপকাঠিতে তিনি সাহিত্যকে বিচার করিতে চেষ্টা করিলেন, ধর্মনীতি বা প্রাচীন রীতির দিক দিয়া নহে। কবি লিখিলেন যে সাধারণত দেখা যায় একদল লোক অত্যন্ত স্পষ্ট কবিতা না পাইলে কবির কবিত্ব স্বীকার করেন না। স্পষ্টকাব্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এক সমালোচক কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হইতে নিম্নপংক্তিদ্বয় দুঃখবর্ণনার চরম প্রকাশজ্ঞানে উদ্‌ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ কাব্যের অস্পষ্টতাবাদীদের সম্মুখে কাব্যসৌন্দর্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন।—

দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥

এই পংক্তিদ্বয় সম্বন্ধে উক্ত লেখক বলিয়াছিলেন, 'সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা; সার্থক প্রতিভা।' রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টকাব্যবাদীর এই উচ্ছ্বাস উদ্‌ধৃত করিয়া বলিলেন— "কোনো দুঃখ অতিশয় স্পষ্ট হইলেই কবিতা হয় না, তাহা হইলে

১ অন্ত্যেষ্টিসংকার, ভারতী ও বালক ১১৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন পৃ. ৩১৬-২০। ২। আশ্রমপীড়া, ভারতী ও বালক কার্তিক পৃ. ৪২১-৩১। ৩। রসিক, ভারতী ও বালক ফাল্গুন পৃ. ৬৮০-৮৩। ৪। গুরুবাক্য, ভারতী ও বালক চৈত্র পৃ. ৭১৮-২২। ৫। দৌলতচন্দ্র ও কানাই. একান্নবর্তী পরিবার, ভারতী ও বালক ১২৯৪ বৈশাখ পৃ. ৪৯-৫৬।—রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬।

২ রাজর্ষি, বালক ১২৯২ আষাঢ় (১-৩ পরিচ্ছেদ)। শ্রাবণ (৪-৬)। ভাদ্র (৭-৯)। আশ্বিন-কার্তিক (১০-১৮)। অগ্রহায়ণ (১৯-২২)। পৌষ (২৩-২৪)। মাঘ (২৫-২৬)। ১২৯৩ আশ্বিন মাসে ৪৪শ পরিচ্ছেদ ২৪২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ আকারে 'রাজর্ষি' প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরীতে লিপিবদ্ধ হয় ১৮৮৭ ফেব্রুয়ারি ১১ [১২৯৩ মাঘ ৩০] দ্র. রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়।

৩ কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, ভারতী ১২৯৩ চৈত্র, পৃ ৭১৩-৭১৭। দ্র. সাহিত্য, ১৩৬১ সং পৃ. ১৬৭-১৭২।

'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে' ইত্যাদিও কবিতা হইত। প্রকৃতির নিয়ম-অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই।"· ·যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে, বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত; যাহা বুঝা যায় না, অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মত অনুভব করি, অথচ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য কাব্যে যখন কোনো কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে।" বলা বাহুল্য, এ যুক্তি কবির নিজের রচনার সমর্থনে রচিত। বৈষ্ণব-কবিতা কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে অনেক সমালোচকের কর্ণে হয়তো এগুলি ধুঁয়া এবং ছায়া এবং 'কাব্যি' বলিয়া ঠেকিবে। নবজীবনের লেখক কড়ি ও কোমলকে 'কাব্যি' বলিয়াছিলেন, এইটি তাহার জবাব।

সাহিত্যের মধ্যে 'কাব্য: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' লইয়া আলোচনার সূত্র ধরিয়া ব্যাপকতর অনেকগুলি প্রশ্ন উঠিল— সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী, সাহিত্যের সহিত মানব-সভ্যতার সম্বন্ধ কী, সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা কোথায়? এইসমস্ত আলোচনার গৌণ উদ্দেশ্য অপরকে বুঝানো— নিজের সঙ্গে নিজের বুঝাপড়াই রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আবেগের জোয়ারে সুন্দর আসিয়াছিল, আবেগের অন্তে ভাঁটার দিনে তাহার নগ্ন কঙ্কাল-মূর্তি যেন প্রকাশ না পায়। তাই নিজের সৃষ্টিকে কবি নিজেই বিচার করেন, সৌন্দর্যের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখেন যে তাঁহার সৃষ্টি বশিষ্ঠের জগৎ-সৃষ্টির ন্যায় অলীক কি না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী— এই হইতেছে শাশ্বত প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান সাহিত্য-সৃষ্টির কোনোই উদ্দেশ্য নাই; স্রষ্টার আনন্দই সাহিত্যসৃষ্টির কারণ ও উদ্দেশ্য— অনেকটা art for art's sake মতবাদের সমর্থন বলিয়া মনে হয়। "লিখিতে হইলে যে বিষয় চাইই এমন কোনো কথা নাই।· ·বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে।···বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী।"[১] কবি এই প্রবন্ধেই লিখিতেছেন, "সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে; কিন্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী;· ·সৃষ্টির ন্যায়, সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।" সাহিত্য সম্বন্ধে এই মত যে তিনি বরাবর পোষণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, এবং উহা যে অভ্রান্ত তাহাও বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কবি এই সময়ে কিভাবে নিজ মতকে সমর্থন করিতেছেন তাহাই দেখানো আমাদের কর্তব্য।

সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায় কোথায় এবং কোন্ অনুকূলতার মধ্যে উহা পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে, এ প্রশ্ন প্রসঙ্গত উঠাই স্বাভাবিক। সভ্যতার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ এই যে, বর্তমান মানুষের জীবন ও মন বহির্মুখীন উত্তেজনা ও অনবসরের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তাহার জীবন কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতির সমস্যা সমাধান চেষ্টায় বিপর্যস্ত; তাহার না আছে অবসর, না আছে শান্তি। ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে ক্রমেই যে-বিশুদ্ধ সাহিত্যরসের অভাব দেখা দিতেছে, তাহার কারণ ইংরেজের এই অস্বাভাবিক জীবন-যাপন। তাই সেখানে

১ সাহিত্যের উদ্দেশ্য, ভারতী ১২৯৪ বৈশাখ। দ্র. সাহিত্য ১৩৬১ পৃ. ১৭৩-১৭৬।

সাহিত্যরসধারা পদে পদে বাধাগ্রস্ত। "অসীম সৃষ্টিকার্য অসীম অবসরের মধ্যে নিমগ্ন" এই সহজ কথাটি ইংরেজ ভুলিয়া আছে; তাহার জীবনে অবসর তো নাইই, অবসরের প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে না।[১]

অবসরহীন জীবন সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায়— এই তত্ত্বটি বহু বৎসর পরে কানাডায় (১৯২৯ এপ্রিল) The Philosophy of Leisure নামে বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করেন। আলোচ্যযুগের প্রবন্ধে সেই কথাটিই অস্পষ্টভাবে বলিলেন। সাধারণ লোকে অবসর ও আলস্যকে প্রায় প্রতিশব্দ মনে করে। কবি এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, "সাহিত্য মানবসমাজের জীবন স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়। সুশৃঙ্খল অবসর সে তো প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল, আর উচ্ছৃঙ্খল জড়ত্ব অলসের অনায়াসলব্ধ অধিকার। উন্নত সাহিত্য উদ্যমপূর্ণ সজীব সভ্যতার সহিত সংলগ্ন স্বাস্থ্যময়, সৌন্দর্যময়, আনন্দময় অবসর।"[২]

বহুকাল পরে শিলাইদহের পদ্মাতীরে বাসকালে এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে কবি একখানি পত্রমধ্যে লেখেন, "কোনো জিনিস যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়— তাকে বেশ অনেকখানি মিলিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে তবে তাকে ষোল আনা আয়ত্ত করা যায়।"

এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সত্য উক্তি, কারণ তাঁহার ন্যায় নিরলস জীবন খুব কম ধনীর পুত্র যাপন করিয়াছেন। 'সুশৃঙ্খল অবসর সে তো প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল'— এ কথা তাঁহারই লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া উদগ্র কর্মপ্রচেষ্টাকেও জীবনের চরম লক্ষ বলিয়া কখনো স্বীকার করেন নাই। কর্ম ও অবসর দিবা ও রাত্রির ন্যায় পরস্পরের পরিপূরকরূপে তাঁহার জীবনকে একটি সুষ্ঠু সমগ্রতা দান করিয়াছিল। সুসংগত জীবনযাপন ছিল তাঁহার আর্টিস্ট জীবনের কাম্য।

১২৯৪ সালে (১৮৮৮ মার্চ ২৬) রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'সমালোচনা' গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহাতে যে প্রবন্ধগুলি সন্নিবিষ্ট সেগুলি ভারতীতে ১২৮৭ হইতে ১২৯১এর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল, অর্থাৎ রচনাগুলি কবির ১৯ হইতে ২৩ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত। সকল প্রবন্ধই সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনা।[৩]

মানসীর প্রথম যুগ। 'হিন্দুবিবাহ'

'জীবন আছিল লঘু প্রথমবয়সে'— কবি আছেন পার্ক স্ট্রীটের বাসায়। দুই-চারিটা কবিতা, বন্ধুবান্ধবকে দুই-একখানি পত্র, সাহিত্য সম্বন্ধে দুটো-একটা প্রবন্ধ ব্যতীত বিশেষ কিছু রচনা চোখে পড়ে না। যেসব কবিতা পরে 'মানসী' কাব্যখণ্ডে সংগৃহীত হয়, তার কয়েকটি ১২৯৪-এর গোড়ায় রচিত হয়, যেমন 'ভুলে' 'ভুলভাঙা' ও শ্রীশচন্দ্রকে লিখিত 'পত্র'— সবগুলিই বৈশাখ মাসে লেখা। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বিরহানন্দ' ছাড়া কবিতা নাই ও আষাঢ়ে লেখেন 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা' ও 'সিন্ধুতরঙ্গ'। শেষ কবিতাটি পৃথক ধরণের রচনা, সম্পূর্ণ বিভিন্ন অভিঘাতে রচিত। অল্পকালের ব্যবধানে কবিতাগুলি রচিত বলিয়া এগুলিকে একই ভূমিকায় দেখিতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিচিত্ররূপী কবির সকল জীবনকথা বাহিরের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা থাকিয়া যায় সত্য, আবার অন্তর্জগতের অনুভূতিলোকে যে-সূক্ষ্ম ঘাতপ্রতিঘাত চলে তাহার সন্ধান দেওয়াও সুকঠিন। কিন্তু বাহিরের অভিঘাত

১ সাহিত্য ও সভ্যতা, ভারতী ১২৯৪ বৈশাখ। সাহিত্য ১৩৬১ সং পৃ. ১৭৮৭-১৮২।

২ আলস্য ও সাহিত্য, ভারতী ১২৯৫ শ্রাবণ পৃ. ২০৫। সাহিত্য ১৩৬১ সং পৃ. ১৮৩-১৯৩।

৩ ছিন্নপত্র, শিলাইদহ ১৮৯৩ জুলাই ২। [১৩০০ আষাঢ় ১৯]।

বা প্রেরণা যে লিরিক সৃষ্টির অন্যতম কারণ তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সেইরূপ কারণ ছিল কি না তাহা আবিষ্কার করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু কারণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বহু বৎসর পরে 'মানসী' কাব্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, মানসীর প্রথম পাঁচ-ছয়টি কবিতা বেদনার কবিতা।[১] এই কাব্য দুঃখের কথায় শুরু হইল কেন কবি বহুবিস্তারে তার বিচার করিয়াছেন বটে, তবে সে-বিচার হইয়াছে কাব্যপ্রেরণার মুহূর্ত হইতে অর্ধশতাব্দীর পরে; সুতরাং স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ হইতে ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান সত্যকার ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথের মতে "কবির চিত্তের দুটি পর্ব বা অধ্যায় থাকে। এক অধ্যায়ে সে তার জীবনের গভীর বেদনাকে প্রকাশ করে বলতে চায়, সেই বলার জন্যে তাঁর মন অস্থির হয়ে পড়ে। এই-যে তার বেদনা-প্রকাশের ব্যাকুলতা, এটা তাকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করে তোলে। তার জীবনের আর-একটা দিকও আছে; সে-অধ্যায়ে সে বেদনার উৎস হইতে প্রাপ্ত ভাবকে জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণময় রসের সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই-যে সৃষ্টির আবেগ এটা তাকে এমন-একটা রসোপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায় যেটা প্রকৃতপক্ষে দুঃখ নয়, বেদনাও নয়, তা হচ্ছে দুঃখবেদনার অতীত এমন-একটা বস্তু যা বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করে, চিরন্তনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা চায়। কবি তাঁর কাব্যে, রচনায়, জীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখের মধ্যে যা পান সেইটেকেই দৈনন্দিন গণ্ডির থেকে পার করে নিয়ে চিরন্তনের সুরে তাঁকে দেন বেঁধে। এই চিরন্তনের মধ্যে নিজের জীবনের অনুভূতিকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম।"[২]

'মানসী'র কবিতাগুলির মধ্যে যে-স্তরভেদ আছে, তা কবি স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম পর্বের সহিত দ্বিতীয় পর্বের তফাতটা কবি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রথম পর্বে কবি নিজেকে ঘোষণা করেন অর্থাৎ কারও কাছে দরদ আদায় করবার ইচ্ছেটাই তাঁর তখন প্রবল। দ্বিতীয় পর্বে কবি বেদনাকে অবিকল ব্যক্ত করেন না, তখন তিনি সৃষ্টি করবার জন্য সুখদুঃখের সীমাকে অতিক্রম করে যান। প্রথম পর্বের মতন অন্যের কাছে নিজের বেদনার জন্য দরদ প্রার্থনা করেন না।"[৩]

মানসীর প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে "কবির হৃদয়ের আবেগ রয়েছে। কিন্তু কবিতার শেষ কথা তো তা নয়। হৃদয়ের আবেগ কবিতার উপকরণ বা মসলার মতন, সেইসব উপকরণ থেকে সৃষ্টি হয় সৌন্দর্যের, সেই সৌন্দর্যসৃষ্টি সুচারুরূপে সম্পন্ন করলে কবি তখন ভুলে যান তুচ্ছ দিকের কথা। তখন সেই আবেগকে উপলক্ষ্য করে মনের বেদনার ভিত্তিভূমিতে সৃষ্টি করতে চান শিল্পকুশলতায় সুন্দরকে। অর্থাৎ তিনি শিল্পরচনা করেন যাতে তাঁর সুখদুঃখ সাময়িক আবিলতামুক্ত হয়ে চিরন্তনের বুকে গেঁথে যায় নির্মাল্যে। এই শিল্পসৃষ্টিকে গৌণভাবে বলতে পারা যায় অটোবায়গ্রাফি, কিন্তু মুখ্যভাবে তা হচ্ছে আপনার রচনাকে আপনার সৃষ্টিকে চিরস্থায়ী করবার আগ্রহ।"[৪]

মানসীর প্রথমস্তরের কবিতাগুলির মধ্যে যে-একটি বিষাদমাখা ভাবনা চাপা রহিয়াছে, তাহা অস্পষ্ট নহে। 'কড়ি ও কোমলে' কবি বলিয়াছিলেন 'কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা' কিন্তু আজ প্রেমের ভুল কি ভাঙিয়াছে। তাই কি কবি 'ভুল-ভাঙা' কবিতায় লিখিলেন—

১ সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ধারা, দেশ ১৩৬১, ২৫ বৈশাখ। পৃ. ৯৭-১০৮।

২ 'মানসী' কাব্যপাঠের ভূমিকা : শান্তিনিকেতনে মানসী-অধ্যাপনাকালে কথিত। 'দেশ' পত্রিকা হইতে প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৩ 'মানসী' কাব্যপাঠের ভূমিকা : শান্তিনিকেতনে মানসী-অধ্যাপনাকালে কথিত। 'দেশ' পত্রিকা হইতে প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৪ 'মানসী' কাব্যপাঠের ভূমিকা : শান্তিনিকেতনে মানসী-অধ্যাপনাকালে কথিত। 'দেশ' পত্রিকা হইতে প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।· ·

বা
স্বর শুনে আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,

কিংবা
বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মতো,
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা
জীবনাহত।

কবির কাছে প্রেমের বিরহটাই আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে, যেমন বৈষ্ণব কাব্যও বিরহের বর্ণনায় পূর্ণ। 'বিরহানন্দে' কবি লিখিতেছেন—

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে ?
মিলনদাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।

কিন্তু ইহাও কবিচিত্তের সত্যরূপ নহে। কবির হৃদয় শূন্য থাকিতে পারে না; শূন্য হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাই তিনি বলিলেন—

আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে ?· ·

এবং
তাহার বাণী দিবে গো আনি
সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া।[১]

লঘুভাবে রচিত 'পত্র' মধ্যেও কবির অজ্ঞাতে, অকারণে এই বিরহের কথাটাই ঘনাইয়া উঠিয়াছে। 'মানসী'র কবিতাগুচ্ছ যেন 'কড়ি ও কোমলে'র সম্ভোগ ও শান্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, ছন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

'কড়ি ও কোমলে'র কেন্দ্রীয় কবিতাগুলি প্রায়ই চতুর্দশপদী। চোদ্দটি পংক্তির মধ্যে বিশেষ এক ছন্দে ভাবরাশিকে সংযত সংহত এমনকি খর্ব করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। 'মানসী'র নূতন কবিতা কবির সেই বন্ধনমুক্ত আনন্দের সৃষ্টি। প্রথমতঃ, কবিতাগুলি পরিমিত স্থানের মধ্যে আবদ্ধ নহে; দ্বিতীয়তঃ, ছন্দে স্বাধীনতা আসাতে রচনারীতিতে নূতন শক্তি আসিল।

এ-বৎসরের গোড়ার দিকে কবিতা খুবই কম। আষাঢ়-শ্রাবণে মাত্র তিনটি কবিতা—'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা' 'সিন্ধুতরঙ্গ' ও শ্রীশচন্দ্রকে লিখিত 'শ্রাবণের পত্র'। (১২৯৪ শ্রাবণ ১২) 'সিন্ধুতরঙ্গ' পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষ্যে রচিত।[২]

১ 'মানসী' কাব্যপাঠের ভূমিকা: শান্তিনিকেতনে মানসী-অধ্যাপনাকালে কথিত। 'দেশ' পত্রিকা হইতে প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।
২ Retriever ও Sir John Lawrence নামে দুইখানি স্টীমার বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ে পড়িয়া ডুবিয়া যায় (১৮৮৭ মে ২৫) [১২৯৪ জ্যৈষ্ঠ ১২]। প্রায় সাড়ে সাতশত লোকের প্রাণনাশ হয়। মন্বন্তরী, ভারতী, ও বালক ১১শ খণ্ড ১২৯৪, পৃ. ২৩০-২৩২। সিন্ধুতরঙ্গ, মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য়, পৃ. ১৫৭-১৬১।

কবি তখন ৪৯ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে থাকেন। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছে—

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা
না জানে আপন।· ·
এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব।

কবিতা লিখিবার সময় কবিরা যে-তীব্র আবেগ অনুভব করেন তাহা যদি স্থায়ী হইত, তবে তাঁহারা কখনোই জীবনের শেষ পর্যন্ত সহজ ও প্রকৃতিস্থ মানুষ থাকিতে পারিতেন না। 'মগ্নতরী' লিখিবার কালে যে-তীব্র বেদনা অনুভব করিয়া আবেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কবিতা রচনার সঙ্গেসঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। তার পর অত্যন্ত হালকা মনে আছেন। হঠাৎ শ্রাবণ মাসে মনে পড়িল জন্মদিনের কথা—দু-বছর আগে ছিলেন পঁচিশ, এইবার হইয়াছেন সাতাশ। ঘটনাটি যেন অত্যন্ত অভাবনীয় বলিয়া তাঁহাকে হঠাৎ আঘাত করিতেছে। শ্রীশচন্দ্রকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কথা। কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। ত্রিশ অর্থাৎ ঝুনো অবস্থা! অর্থাৎ যে-অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে— কিন্তু শস্যের সম্ভাবনা কই।· ·পাকা কথা কিছুতেই বেরোয় না শ্রীশবাবু। যাতে পাঁচ জনের কিছু লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত করতে পারছি নে। দুটো গান বা গুজোব, হাসি বা তামাশা, এর চেয়ে বেশি আর কিছু হয়ে উঠল না।· ·পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত কোনো লোককে সম্পূর্ণ জানা যায় না· ·। কিন্তু সাতাশ-বৎসরে মানুষকে এক রকম ঠাহর করা যায়— বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েছে· ·এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর-কোনো কারণ রইল না।· ·নূতন প্রেমের আশাও রইল না, নূতন বিরহের আশঙ্কাও গেল। অতএব এ একরকম মন্দ নয়। জীবনের আরামজনক স্থায়িত্ব লাভ করা গেল।"[১] 'জীবন আছিল লঘু'— তাই ঐ দীর্ঘ পত্র বন্ধুকে লিখিয়া, আবার উহারই কিয়দংশ কবিতায় রচনা করিলেন— এত অবসর কয়জনের থাকে। বৃদ্ধবয়সে এ পরীক্ষা অনেক করেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বড়রকম এক কাজের আহ্বান আসিয়া হাজির। পার্ক স্ট্রীটের বাসায় আছেন; বাংলার উদীয়মান লেখক ও বাগ্মী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম যুবক কর্মী ও নেতা বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন, প্রতিক্রিয়াপন্থী নব্যহিন্দুদের সামাজিক মতামত যে-ভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করিতেছে, তাহার যথোপযুক্ত প্রতিরোধ করা হইতেছে না। এইসব সামাজিক মতবাদ কেবল সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমে বিশিষ্ট খ্রীষ্টান, হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল জয়গোবিন্দ সোমের[২] ন্যায় ব্যক্তিকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে; সুতরাং প্রতিবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সময়ে চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুপত্নীর আদর্শ, হিন্দু বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (সাবিত্রী ১২৯৩)। এইসব প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথকে লেখনী ধারণ করিবার জন্য বিপিনচন্দ্র অনুরোধ আনিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুবিবাহ'[৩] নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন ও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন হলে ডাঃ মহেন্দ্রলাল

১ ছিন্নপত্র, ২৭ জুলাই ১৮৮৭ [১২৯৪ শ্রাবণ ১২]।

২ জয়গোবিন্দ সোম শ্রীহট্টের লোক; পাঠ্যাবস্থাতেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ এম.এ; ১৮৬৬ বি.এল পাস। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে তিনিই রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত একযোগে 'আর্যদর্শন' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মৃত্যু ১৯০০ অব্দ।

৩ হিন্দুবিবাহ, ভারতী ১২৯৪ আশ্বিন, পৃ. ৩১৪-৪৮। দ্র. সমাজ, বিশ্বভারতী সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ. ৪১৩-১৯।

সরকারের[১] সভাপতিত্বে উহা পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাস্থ অনেকেই রচনার গুণাগুণ লইয়া আলোচনা করেন; পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১৮৩৬-১৯০৬) উঠিয়া বলিলেন, "আমি মহেশ, আমি চারি হস্তে লেখককে আশীর্বাদ করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক সীলি[২]-র (Seeley) *Natural Religion* (১৮৮২) নামক গ্রন্থ হইতে একটি অংশ ও তাহার অনুবাদ ভূমিকারূপে উদ্ধৃত করিয়া 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধটি শুরু করেন। সীলির মত এই যে, যাহারা কারো পুরাতন ধর্মপ্রণালী অথবা সমাজব্যবস্থার জীর্ণ দশায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন সংস্কারের সহিত নূতন শিক্ষার বিরোধবশত বিশ্বাস ও বল হারাইয়া নৈতিক পঙ্গু অবস্থা প্রাপ্ত হন। য়ুরোপের নূতন শিক্ষার প্রভাবে বাংলায় অনেকগুলি নূতন কর্তব্য আসিয়াছে সত্য, কিন্তু আলস্যের দায়ে, সংস্কারের মোহে, সমাজের ভয়ে সেগুলি পালন করিতে না পারিয়া এই নূতনের উপর তাঁহাদের অবজ্ঞা আসিয়াছে।

চন্দ্রনাথবাবু সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুবিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতির খুবই নিন্দা করিয়া বলেন যে, প্রয়োজন হইলে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অত্যন্ত কুৎসিত কথা নারীদের সম্বন্ধে চয়ন করা অসম্ভব নহে। সুতরাং বচন উদ্ধৃত করিলেই হিন্দুবিবাহ বা পত্নীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ সপ্রমাণ করা যায় না। চন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে, হিন্দুবিবাহের প্রধান লক্ষ্য দম্পতির একীভবন। ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, ইহাই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পুরুষদের পক্ষে বহুদারপরিগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না; কৌলিন্য-বিবাহও সমাজে কোনোমতে স্থান পায় না। "বিবাহের যত-কিছু আদর্শের উচ্চতা সে কেবলমাত্র পত্নীর বেলায়, পতিকে সে আদর্শ স্পর্শ করিতেছে না।" হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ ও অক্ষয় সরকার খুবই উচ্ছ্বসিত। চন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছিলেন, "ইংরেজ আত্মপ্রিয় বলিয়া তাহার বিবাহের প্রকৃতপক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য নাই। মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই তাহার বিবাহ বিবাহই নহে।" রবীন্দ্রনাথ লেখকের এই দাম্ভিক উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি এই সম্পর্কে লিখিলেন, "শ্বশুর শ্বাশুড়ি ননদ দেবর প্রভৃতির যথাবিহিত সেবা, এবং পুরপ্রচলিত দেবকার্যের যথাবিধি সহায়তা করিয়া স্ত্রী মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিলেই যে সকল স্বামীর সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে তাহা নহে। স্বামী চায় মনের মতো· ·তাহারই বিশেষ প্রীতিকর রূপগুণসম্পন্ন স্ত্রী।· ·এইজন্য রুচি-অনুসারে স্বভাবতই মানুষ সৌন্দর্য সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা এবং· ·কতকগুলি মানসিক ও নৈতিক গুণ স্ত্রীর নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া থাকে।"

বাল্যবিবাহ[৩] সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে দুইটি মত ছিল, চন্দ্রনাথ বোধ হয় মনুর স্মৃতি মনে রাখিয়া যুবক ও

১ মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে সগৌরবে M.D. পাস করেন (১৮৬৩)। কিন্তু অল্পকাল পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহে ও উপদেশে এলোপ্যাথি চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি পদ্ধতি শুরু করেন এবং ঐ চিকিৎসা-বিদ্যায় অতুল যশ ও বিপুল ধন লাভ করেন। বাংলাদেশে তিনি সর্বপ্রথম হাতে-কলমে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। সমাজ সংস্কারাদি ব্যাপারে ইনি আধুনিক মতামত পোষণ করিতেন; বাল্যবিবাহের ইনি বিরোধী ছিলেন।

২ Sir John Robert Seeley (1834-95)। *Expansion of England* (১৮৮৩) গ্রন্থ এককালে খ্যাতিলাভ করে।

৩ ১৮৫০ অব্দের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি নামহীন লেখায় আছে: "অষ্টমবর্ষীয় কন্যাদান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফললাভ হয়, আর দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোক প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ফল মৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনাপরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্যমাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন· ·।" দ্র. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ পৃ. ৬৭ হইতে উদ্ধৃত।

শিশু-বালিকা বিবাহের পোষক ছিলেন। বালিকার পক্ষে পরিবারের সহিত সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইয়া যাইবার পক্ষে এই বয়সই অনুকূল। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী; তবে তিনি ছিলেন বালক-বালিকার বিবাহের পক্ষে। সেইজন্য বাল্যবিবাহের সহিত একান্নবর্তী সংসার অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। একান্নবর্তী পরিবারেই বাল্যবিবাহ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, নানা অনিবার্য কারণে এই প্রাচীন প্রথা ভাঙিতেছে। প্রথমে ভাঙিতেছে আর্থিক সমস্যার জন্য, বৃহৎ পরিবার পালন করা আর্থিক কারণে অসম্ভব; দ্বিতীয়ত ভাঙিতেছে আদর্শের পার্থক্য হেতু। দুইটি কারণই প্রবল বেগে সমাজে ভাঙন ধরাইয়াছে।

স্বাধীন চিন্তা ইংরেজি শিক্ষার ফল। "স্বাধীন চিন্তা যেখানে আছে সেখানে বুদ্ধির ভিন্নতা-অনুসারে উদ্দেশ্যের ভিন্নতা জন্মিয়াই থাকে।" একান্নবর্তী পরিবারের মূল হইতেছে এক-কর্তৃত্ব। কিন্তু বর্তমানে সে কর্তৃত্ব নাই, সে ভক্তি ও নিষ্ঠা নাই। ইহার কারণ শিক্ষার বৈষম্য। পূর্বে বিদ্বান ও মূর্খের মধ্যে একজন বেশি জানিত, আর একজন কম জানিত এইমাত্র প্রভেদ ছিল। এখন একজন একরূপ জানে, আরেকজন অন্যরূপ জানে। ইহা ইংরেজি শিক্ষার ফল। শিক্ষার বৈষম্যহেতু মতের অমিল হয়। সুতরাং একান্নবর্তী পরিবারে যে পূর্বের সুখশান্তি থাকিতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া বাল্যবিবাহও টিঁকিতে পারে না। যেখানে স্বতন্ত্র গৃহ করিতে হইবে সেখানে স্বামী-স্ত্রীর বয়স অল্প হইলে চলিবে না।

রবীন্দ্রনাথ আরও দেখাইলেন যে, কন্যার বিবাহের বয়স ধীরে ধীরে বাড়িয়া যাইতেছে; আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতা ইহার প্রধান কারণ। এ-ছাড়া অনেক যুবক বিবাহকার্য চট্‌পট্ সারিয়া ফেলিতে চান না। বাঙালি যে কোনো কাজে সাহস করিয়া হাত দিতে পারে না, বহুশ্রমসাপেক্ষ পরীক্ষাদির মধ্যে যাইবার অবকাশ পায় না, তাহার কারণ অল্প বয়সে তাহার স্কন্ধে বৃহৎ পরিবারের দুঃসহ বোঝা চাপানো হয়। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ অন্য কোনো কোনো প্রবন্ধেও জোর দিয়া বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহ-উচ্ছেদের পক্ষপাতী; কিন্তু তিনি ইহাকে আইন দ্বারা উঠাইবার পক্ষে মত দিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "বাল্যবিবাহকে বলপূর্বক উৎপাটন করিলে সমাজে সমূহ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইবে। অল্পে অল্পে নূতন অবস্থার প্রভাবে সমাজের সমস্ত নিয়ম নূতন আকার ধারণ করিয়া সমাজের বর্তমান অবস্থার সহিত আপন উপযোগিতাসূত্র বন্ধন করিতেছে। অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী তাঁহাদিগকে অকারণ ব্যস্ত হইতে হইবে না।"[১]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যে কত সত্য তাহা গত শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। বিধবাবিবাহ আইন দ্বারা সিদ্ধ হইলেও দেশমধ্যে প্রচার লাভ করে নাই। সারদা-আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ রদের চেষ্টা যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই। অথচ আইন-নিরপেক্ষভাবেই দেশ ধীরে ধীরে এইসব পুরাতন সংস্কার ভাঙিতেছে; রবীন্দ্রনাথের বিচার যে কী সত্যদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আজ আর প্রমাণসাপেক্ষ নহে।

চন্দ্রনাথ বসুকে সে যুগের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের একমাত্র প্রতীক বলিলে ভুল করা হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা[২]

১ হিন্দুবিবাহ, সমাজ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

২ ১৮৯৪ আগস্ট ২৭ তারিখে বরোদায় অরবিন্দ ঘোষ Indupakash নামে পত্রিকায় Our Hope in the Future নামে যে-প্রবন্ধ লেখেন শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাহার ভাবটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "অরবিন্দ বলেন, বঙ্কিম-সাহিত্য একটা বিদ্রোহের যুগ আনয়ন করিয়াছে। এই বিদ্রোহের চিহ্ন সবদিকেই দেখা যাইতেছে। যেমন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে, লোকের মন আবার হিন্দুধর্মের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে এবং তরুণীদের মধ্যে অতি উগ্র রকমের জাতীয়তাভাবের উন্মেষ দেখা

ও প্রতিভার প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন না করিয়া এ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বঙ্গের বহু সামাজিক সংস্কার তাঁহাদের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষদিগকে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াপন্থী হইতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ আঘাত লাগে, কারণ উভয়কেই তিনি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাদের স্নেহ হইতেও তিনি কোনোদিন বঞ্চিত হন নাই। এক্ষেত্রে ইঁহাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক। নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই চন্দ্রনাথের অযৌক্তিক তর্কজালকে বারে বারে আঘাত করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছিল। ইঁহারা এককালে বাংলার যুবমনকে প্রগতির পথে পরিচালনা করিয়াছিলেন, বিপ্লবের বাণী তাঁহারাই শুনাইয়াছিলেন; কিন্তু কালে তাঁহারাই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া প্রগতির খরস্রোতধারায় শাস্ত্রের আবর্জনা পুঞ্জীভূত করিয়া বাঙালির সহজ গতিবেগকে প্রতিহত করিলেন, তাঁহাদের জীবনে আদর্শের এমন জীবন্ত সমাধি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বড়ই দুঃখে বলিয়াছিলেন[১]—

মনে আছে সেই প্রথম বয়স,
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।· ·
কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা!
আজিকে বন্ধু, তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা!· ·
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলিছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি!

মানসীর দ্বিতীয় স্তর। দার্জিলিঙে

১২৯৪ সালের শরৎকালে (১৮৮৭ অক্টোবর) রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে দার্জিলিং গেলেন। সপরিবার বলিতে তখন বুঝায় স্ত্রী— বয়স চৌদ্দ বৎসর ও এক বৎসরের শিশু একমাত্র কন্যা বেলা। তবে সঙ্গে ছিলেন সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী ও স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা হিরন্ময়ী (১৯) ও সরলা (১৫)। তখনকার দিনে দার্জিলিং যাইতে হইলে দামুকদিয়া

দিয়াছে। কেশব সেন ও কৃষ্ণদাস পাল ধর্ম ও রাজনীতিতে বাঙ্গালার যে-তরুণ সম্প্রদায়কে মাতাইয়াছিলেন, দাসহুলভ ইংরাজের অনুকরণকারী সেই তরুণের দল আর নাই। তাহাদের স্থানে যে-তরুণের দল আসিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিমের দ্বারা অনুপ্রাণিত।"—শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ, পৃ. ৯৮।

১ মানসী। পরিত্যক্ত, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮ [১২৯৫] (গাজিপুর) রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ. ২২৬-২৩০।

নামে একটি স্টেশনে নামিয়া স্টীমারযোগে পদ্মা পার হইতে হইত। পরপারে সারাঘাট; সেখান হইতে মিটার গেজের ছোটোলাইন শিলিগুড়ি ও তথা হইতে আরো ছোটো এবং প্রায়-খোলা রেলগাড়ি চড়িয়া হিমালয়ের চড়াইপথে চলিতে হইত।

দার্জিলিং পৌছাইয়া রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে (১৫) এক পত্রে লিখিতেছেন— "সারাঘাটে স্টীমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা, জিনিসপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়েমানুষ পাঁচটা এবং পুরুষমানুষ একটিমাত্র।·· ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয় নি, তবু ন [দিদি] বলেন আমি কিছুই করি নি, অর্থাৎ একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম খেপ্‌লে যে-রকমটা হয় সেইপ্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষমানুষের উপযুক্ত হত। কিন্তু এই দুর্দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি, এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায় নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্রসন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটে নি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে; বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁত লাগে।··গাড়ি চলতে লাগল। ক্রমে ঠাণ্ডা, তার পরে মেঘ, তার পরে সর্দি, তার পরে হাঁচি, তার পরে শাল কম্বল বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্‌ কন্‌, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার এবং ঠিক তার পরেই দার্জিলিং। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি, মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিসপত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রসিদ দেখানো, সাহেবের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, জিনিস খুঁজে না পাওয়া এবং সেই হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করা, এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল।"[১]

পর বৎসর ভারতীতে (১২৯৫) স্বর্ণকুমারী দেবী এই দার্জিলিং-ভ্রমণের একটি বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি তাঁহাদের পুরুষ অভিভাবক অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আনাড়িপনা সম্বন্ধে অনেক কথা সরসভাবে বলিয়াছিলেন। দার্জিলিঙে তাঁহারা যে-বাড়ি ভাড়া করেন তার নাম ছিল কাসলটন্‌ হাউস। স্বর্ণকুমারী লিখিয়াছেন, "লেফটেনেণ্ট গবর্নরের বাড়ি ছাড়া দার্জিলিঙে শুনতে পাই এত বড় বাড়ি আর নেই।" এই প্রবাসে তাঁহাদের এই সুখী পরিবারের সন্ধ্যাগুলি কিভাবে কাটিত তাহার একটি চিত্রও লেখিকা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "বাড়ির··হলটা বড়। সেই মস্ত হলে··সন্ধ্যাবেলা সমস্ত চৌকি একখানা কৌচের কাছে জড় হয়, আর মধ্যে একটা ছোটো টিপয়ে আলো জ্বলে তার চারদিকে কেহ চৌকিতে কেহ কৌচে সুবিধামত বসে শুয়ে নিলে আমাদের সঙ্গী অভিভাবকটি [রবীন্দ্রনাথ] টেনিসন থেকে ব্রাউনিং থেকে··কবিতা পড়ে শোনান। বাস্তবিক তিনি কি সুন্দর করে পড়েন·· ব্রাউনিঙের লেখা কি জোরালো।··ব্রাউনিং পড়তে পড়তে যে কান্না পায়— সে যেন জমাট বরফ গলতে আরম্ভ হয়, সে কান্না হঠাৎ থামানো যায় না।[২] তাঁর Blot in the 'scutcheon[৩] একবার পড়ে দেখ। এমন সুন্দর কাব্যনাট্য

১ ছিন্নপত্র, দার্জিলিং ১৮৮৭।

২ Robert Browning (b. 1812 May 7, d. 1889 Dec. 12). A Blot in 'scutcheon (Part V of *Bell and Pomegranates*, 1843). A tragedy. এই নাটক সম্বন্ধে চার্লস ডিকেন্স লিখিয়াছেন, "It is full of genius natural and great thoughts. I know nothing that is so affecting—nothing in any book I have ever read."

৩ ভারতী ১২৯৫ বৈশাখ পৃ. ২৪।

আর পড়েছি মনে হয় না।"[১] তবে এই সান্ধ্য পাঠচর্চা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই ; স্বর্ণকুমারী দ্বিতীয় পত্রে লিখিতেছেন, "আমাদের সে পড়াশুনার মজলিস অনেকদিন বন্ধ হইয়াছে।"

প্রায় একমাস কাল দার্জিলিঙে কাটাইয়া রবীন্দ্রনাথ একাই কলিকাতায় ফিরিলেন। শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "স্ত্রী কন্যা দার্জিলিঙে, আমি কলকাতায় ঘরে বসে বিরহ ভোগ করছি— কিন্তু বিরহের চেয়ে কোমরের বাতটা বেশি গুরুতর বোধ হচ্ছে।" পত্রখানি কবিতা ও বাত লইয়া কৌতুকে পূর্ণ। পত্রশেষে লিখিতেছেন, "বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আপনি প্রশ্ন করেছেন সে বিষয় পরে উত্থাপন করা যাবে ; আপাতত এই বলে রাখছি, বাল্যবিবাহ যে ইচ্ছে করুক— কিন্তু কোমরে বাত যেন কারো না হয়।"[২]

দার্জিলিংবাস-পর্বটা সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। সখিসমিতির তরফ হইতে সরলা রায় রবীন্দ্রনাথকে কেবল মেয়েদের অভিনয়োপযোগী একটি গীতি-নাট্য রচনা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সরলা রায় হইতেছেন ডক্টর পি. কে. রায়ের (প্রসন্নকুমার) স্ত্রী— সে-যুগের বাঙালি আধুনিকাদের অন্যতম অগ্রণী। সেই উপলক্ষ্যেই দার্জিলিংবাসকালে 'মায়ার খেলা'র গান রচনা শুরু করেন ; কিন্তু নাটিকাটি লিখিয়াছলেন কিনা সন্দেহ। ঠাণ্ডা লাগিয়া কোমরে ব্যথা, উঠিতে পারেন না, শুইয়া শুইয়া গান লেখেন ও সরলা দেবীকে শেখান।

কার্তিকের শেষদিকে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। পার্ক স্ট্রীটের বাসায় আছেন। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে কবিকে নূতন কবিতার মধ্যে নূতনরূপে পাই। এই মাসে রচিত কবিতাগুলির তালিকা পাদটীকায় দিলাম।[৩]

মুদ্রিত 'মানসী'র মধ্যে তাহারা এলোমেলোভাবে সাজানো এবং সেরূপভাবে সাজানোর কোনো সংগত কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। এই কবিতাগুলি মানসী কাব্যগুচ্ছের অন্তর্গত দ্বিতীয় স্তর। ইহাদের মধ্যে একটি গভীর বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, ক্রমিক পাঠ করিলেই তাহা বোঝা যায়। কিন্তু তৎসঙ্গে নূতন সুরও যে বাজিয়াছে একটু মন দিয়া পড়িলেই তাহা ধরা পড়ে। প্রেমের মধ্যে কী একটি গভীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিকে যেন পীড়িত করিতেছে ; প্রেমকে বাস্তবের মধ্যে খুঁজিয়া তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। 'জীবন্ত মানব' মাঝেমাঝে নিজেকে পাইবার দুরাশা তাঁহার চিত্তকে একদা দোলাইয়াছিল ; কিন্তু এখন দেখিতেছেন 'বৃথা এ ক্রন্দন'। "যে জন আপনি ভীত, কাতর দুর্বল,· · সে কাহারে পেতে চায় চিরদিনতরে ? ক্ষুধা মিটাইবার খাদ্য নহে যে মানব, কেহ নহে তোমার আমার।" কবি ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছেন বাসনা দগ্ধ না হইলে যথার্থ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না, তাই বলিতেছেন—

বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?

১ ভারতী ১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ পৃ. ৯৬। দ্র. শ্রীসরলা দেবী, রবীমামা না রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ ১৩৪৮ কার্তিক, পৃ. ৫৬৯-৭৪।

২ ছিন্নপত্র, অক্টোবর ১৮৮৭।

৩ ১২৯৪ অগ্রহায়ণ

১৩.	নিষ্ফল কামনা	১৯.	হৃদয়ের ধন
১৪.	বিচ্ছেদের শান্তি	২০.	নিভৃত আশ্রম
১৫.	সংশয়ের আবেগ	২১.	নারীর উক্তি
১৬.	তবু	২৩.	পুরুষের উক্তি
১৮.	নিষ্ফল প্রয়াস	২৫.	মানসী

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের॰ ॰
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে,
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

কবি প্রেমকে যেন ধরিয়া ছুঁইয়া পাইতেছেন না। তাই 'বিচ্ছেদের শান্তি' কামনা করিতেছেন—

দেখেছি অনেক দিন বন্ধন হয়েছে ক্ষীণ
ছেঁড় নাই করুণার বশে।
গানে লাগিত না সুর, কাছে থেকে ছিলে দূর
যাও নাই কেবল আলসে।
পরান ধরিয়া তবু পারিতাম না তো কভু
তোমা ছেড়ে করিতে গমন।
প্রাণপণে কাছে থাকি দেখিতাম মেলি আঁখি
পলে পলে প্রেমের মরণ।
তুমি তো আপনা হতে এসেছ বিদায় ল'তে
সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।॰ ॰
মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও,
নূতন আশ্রয়-ঠাঁই, দেখি পাই কি না পাই,
সেই ভালো তবে তুমি যাও।

কিন্তু প্রেমকে জোর করিয়া বিদায় করিয়া দিয়াও অন্তরে বেদনা পাইতেছেন ; তাই অতি করুণ সুরে বলিতেছেন,

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি॰ ॰
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন। —তবু

মনে রাখিবার জন্য আকূতি নিবেদন করিয়াও 'সংশয়ের আবেগে' চিত্ত আকুলিত—

ভালোবাস কি, না বাস বুঝিতে পারি নে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি
সর্বগ্রাসী আঁখি।

প্রেমকে লইয়া অনেক কল্পনা হইতেছে ; প্রেমের অনেক মধুর চিত্র লেখনীর তুলিতে আঁকিতেছেন, কিন্তু সংশয় যায় না—

কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি,
প্রেম দাও দ'লে।

কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে— প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

সৌন্দর্য বা সুন্দরকে দেহের মধ্যে ধরিবার প্রয়াস ব্যর্থ— 'নিষ্ফল প্রয়াস' মাত্র, 'রূপে নাহি ধরা দেয়— বৃথা সে প্রয়াস'। সৌন্দর্যকে 'হৃদয়ের ধন'-রূপে পাইবার চেষ্টা সফল হয় না—

নাই, নাই, কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ—
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে— শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিনমুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

কবিচিত্ত সংযত হইয়া আসিতেছে— দেহের মধ্যে রূপকে অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্যাকুলতা ম্লান হইয়া আসিতেছে; এখন কবি 'নিভৃত-আশ্রম' রচিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাহা

অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরীমুরতি
স্থাপনা করিব যত্নে
হৃদয়-আসনে।
লোকালয়-মাঝে থাকি রব তপোবনে,
একেলা থেকেও তবু
রব সাথী-সনে।

'নিষ্ফল প্রয়াস' 'হৃদয়ের ধন' 'নিভৃত আশ্রম'— এই তিনটি কবিতা চতুর্দশপদী, একই দিনে রচিত। এই কবিতাগুলির সহিত 'কড়ি ও কোমলে'র চতুর্দশপদী কবিতার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, এক বৎসরের মধ্যে কবির কাব্যের রূপে কতখানি নূতনত্ব এবং সুরেও কতখানি অভিনবত্ব আসিয়াছে।

মানসীর দ্বিতীয় স্তরের শেষ দুইটি কবিতা— 'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি' পরস্পরের পরিপূরক। প্রথম কবিতাটি পড়িলে ইহাই আশ্চর্য লাগে যে নারী-হৃদয়ের এ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পুরুষের লেখনীতে কেমন করিয়া আসিল। নারী স্বভাবতঃ একনিষ্ঠ; সে চায় একনিষ্ঠ প্রেম। তাই সে বলিতেছে—

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে।

পুরুষ নারীকে তাহার পুরানো প্রেমের কথা শুনায়, কী নেশায় রঙিন হইয়া সে প্রেমকে দেখিয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করে। কিন্তু নারীর চক্ষে কেন অশ্রু তাহা সে বুঝিতে পারে না। এই অহেতুকী অশ্রু পুরুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, সে তাহার উদ্‌ঘাটন করিতে অসমর্থ। সে বলে—

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে—
কেন হেরি অশ্রুজল হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে।

কাব্যজীবনের পরে এইখানে একটি ছেদ পড়িল। ইহার পর প্রায় চারিমাস আর-কোনো কবিতা নাই।

মনের সম্পূর্ণ নূতন অবস্থায় কবিকে পাই মাসখানেক পরে— লিরিক্যাল মনোভাবের ভারকেন্দ্র পরিবর্তিত হইয়াছে। মানসী বা মানবী-প্রেমকে দেখি সাময়িকভাবে ঈশ্বর-প্রেমে রূপান্তরিত। মাঘোৎসরের জন্য এবার ১৮টি নূতন গান রচনা করেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি খুবই পরিচিত— 'তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ', 'নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও' ইত্যাদি।[১] এইসব ব্রহ্মসংগীত পাঠ করিলে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এই সংগীতের মধ্যে সত্যই কি কোনো আধ্যাত্মিক আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে, না, সাময়িক প্রয়োজনের প্রেরণায় রচিত। অথবা অন্তরের মধ্যে যে-বিষাদপূর্ণ বেদনার সংগ্রাম চলিতেছে— এইসব সংগীত তাহারই sublimated রূপ?

মানসীর তৃতীয় স্তর। গাজিপুরে

কাব্যময় জীবনকে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বাহিরের কোনো বাধা ছিল না। মহর্ষি পুত্রদের মতামত চলাফেরা সম্বন্ধে বিশেষ বাধা দান করিতেন না। জীবনের কোনো বৃহৎ দায়িত্ব বা কর্তব্যভার গ্রহণ না করিয়া রবীন্দ্রনাথ বেশ সুখেই দিনাতিপাত করিতেছেন। এইবার ইচ্ছা হইল 'পশ্চিমের কোনো রমণীয় স্থানে তিনি একটি নিভৃত কবিকুঞ্জ রচনা করিয়া জীবনটিকে সৌন্দর্যের স্রোতে ভরা কবিত্বের হাওয়ার মধ্যে ভাসাইয়া দেন।'[২]

এই উদ্দেশ্যে ১২৯৪ সালের শেষদিকে তিনি সপরিবারে গাজিপুরে গিয়া বাস করিতে মনস্থ করিলেন। এত জায়গা থাকিতে গাজিপুর কেন তাঁহার পছন্দ হইল, সে-সম্বন্ধে কবি স্বয়ং কৈফিয়ত দিয়েছেন। "বাল্যকাল থেকে পশ্চিম-ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল।· ·অনেক দিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম-ভারতের কোনো এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে।· ·শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত।· ·তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের পরিবার বলিতে এখনো বুঝায় পত্নী মৃণালিনী দেবী ও শিশুকন্যা বেলা। এই 'সংসার' লইয়া কবি চলিলেন উত্তরপ্রদেশের রোম্যান্টিক শহরে কবি-জীবনযাপন অভিলাষে। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের দিলদারনগরে বেলা প্রায় দেড়টায় সময় নামিতে হয়; খর রোদে ভাজা ভাজা হইয়া তপ্ত বালি পার হইয়া অল্পবয়স্কা স্ত্রী ও শিশুকে লইয়া তাড়িঘাটের ট্রেনে উঠিলেন। তাড়িঘাটে গঙ্গা পার হইতে হইল স্টীমারযোগে। গাজিপুরঘাট শহরের ধারে। ঘোড়ার গাড়ি বিহারের প্রাচীন শহরের গলিখুঁজি ছাড়াইয়া সাহেবপাড়ায় একটি ভাড়া-করা বাংলা-বাড়িতে পৌছাইয়া দিল। রোম্যান্টিক পশ্চিমভারতের শহরে আসিলেন এইভাবে।

গাজিপুরে যাওয়ার যোগাযোগ ঘটান গাজিপুরের উকিল দেবেন্দ্রনাথ সেন— ইনি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক;

১ দ্র. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৯ শক (১২৯৪) ফাল্গুন।

২ রবীন্দ্রনাথ: অজিতকুমার চক্রবর্তী।

৩ সূচনা, মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।

বোধ হয় সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়া থাকিবে। পরে আরও ঘনিষ্ঠতা হয় এবং 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ কবি-ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। দেবেন্দ্রনাথের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের গাজিপুরে তুলা ও চিনির বিস্তৃত কারবার ছিল। এইসব সূত্র ধরিয়াই রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে আসিয়াছিলেন।

যে-স্বপ্ন লইয়া পশ্চিম-ভারতের প্রাচীন শহরে বাস করিতে গিয়াছিলেন, সে-স্বপ্ন ভাঙিতে বেশিক্ষণ লাগে নাই। "সেখানে গিয়ে দেখলুম ব্যাবসাদারের গোলাপের খেত, এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই ; হারিয়ে গেল সেই ছবি। তবু গাজিপুরেই রয়ে গেলুম, তার একটা কারণ এখানে ছিলেন আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়, আফিম-বিভাগের একজন বড়ো কর্মচারী। এখানে আমার সমস্ত ব্যবস্থা সহজ হল তাঁরই সাহায্যে। একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চড় পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের খেত ; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো চলেছে মন্থরগতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি-অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিমগাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার চাল-ওয়ালা পল্লী।"[১] মানসীর কতকগুলি কবিতার মধ্যে এই স্থানিক শোভার বর্ণনা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। কলিকাতার বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে নববর্ষের দিন পত্র[২] লিখিয়া গাজিপুর আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন : "এখানে বই, বিজনতা এবং বন্ধু আছে· ·।" কিন্তু প্রিয়নাথকে তাঁহার মথুর সেনের গলির বাড়ি থেকে শহরের বাহিরে টানিবার বহু চেষ্টা করিয়া রবীন্দ্রনাথ কখনো কৃতকার্য হন নাই।

সপরিবারে এই গাজিপুরে বাসটা রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি বিশেষ পর্ব ও ঘটনা বলিয়া আমরা মনে করি। এতকাল জোড়াসাঁকোর বিশাল পুরীতে স্ত্রী ও কন্যা লইয়া বৃহৎ ঠাকুর-পরিবারের ক্ষুদ্র অংশরূপে বাস করিয়াছেন, অথবা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর শাসনাধীন সুব্যবস্থিত গৃহশৃঙ্খলার মধ্যে আদরে যত্নে লালিত হইয়াছেন। কিন্তু স্বামীকে আপনার সংসারে, নিজের মত করিয়া, কেবল নিজের করিয়া পাইবার যে-আকাঙ্ক্ষা নারীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহা পত্নী মৃণালিনী দেবীর সংসারজীবনে এই প্রথম ঘটিল ; রবীন্দ্রনাথও যৌবনের পরিপূর্ণতার মধ্যে স্ত্রীকে পাইলেন সঙ্গিনীরূপে প্রেয়সীরূপে—'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলি মানস-প্রতিমা'।

গাজিপুরের অক্ষুণ্ণ অবসরের মধ্যে কবির মন নিমগ্ন হইল। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবা মাত্র মুক্তি মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।· ·নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"[৩]

জীবনের এই নব অভিজ্ঞতায় সৃষ্টির বিচিত্র রহস্যকে সম্ভোগ করিবার সুযোগ ও অবসর মিলিল। নৈর্ব্যক্তিক রসের সাধনা প্রেমের লীলা বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ হয় না। দৈনন্দিন জীবনের প্রেম দৈনন্দিন সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে

১ সূচনা, মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।

২ সুবর্ণবণিক সমাচার, ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৩৩৯ ফাল্গুন, পৃ ১৯১।

৩ সূচনা : মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।

ম্লান হয় না। নারীহৃদয়ে কত বিচিত্রসাধ, কত ইন্দ্রধনুর লীলাখেলা উঠে, অস্ত যায়। কবি দার্শনিকের ন্যায় অনুভব করেন, শিল্পীর চোখে দেখেন, প্রকাশ করেন কবির ভাষায়।

গাজিপুরে বাসকালে কবি ২৮টি কবিতা লেখেন ১২৯৫এর ১১ বৈশাখ হইতে ২৩ আষাঢ়ের মধ্যে। এইগুলিকেই আমরা মানসীর কেন্দ্রগত কবিতা বলিব, কারণ রবীন্দ্রনাথ যখনই মানসীর কথা বলিয়াছেন তখনই গাজিপুর বাসকালে রচিত কবিতার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে কবির মানসলোকের যথার্থ সন্ধান পাওয়া যায়— ইহাতে কাল্পনিকতা কম, বৃহতের নিকট অমোঘের কাছে আত্মসমর্পণের একটি ভাব সুস্পষ্ট। মাঘোৎসবের সময়ে যে রচনা 'নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও'— সেই সুর দেখা যায় কয়েকটি কবিতায়— আত্মনিবেদন ও আত্মনির্ভরের ভাব সেখানে খুব স্পষ্ট; তাহার দ্বারা কাব্যের রসধারা ব্যাহত হইয়াছে কি না তাহা গভীরভাবে বিচার্য। দুঃসাহসিক কল্পনা তীব্র আবেগের অভাবে কবিতাকে দুর্বল করিয়া দেয়। 'জীবন-মধ্যাহ্নে'র 'তাই আজ বার বার ধাই তব পানে, ওহে তুমি নিখিলনির্ভর' প্রভৃতি কথা বিশুদ্ধ কাব্যের বিষয় নহে। 'শূন্য গৃহে' 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতাতেও এই অসহায় আত্মনিবেদনের ভাব বেশ স্পষ্ট। বিশ বৎসরের যুবক প্রথম চৌধুরী ঠিকই ধরিয়াছিলেন যে, despair ও resignation কবিতাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য।

মানসীর কবিতাগুলি এমন এলোমেলো ভাবে সাজানো কেন তাহা জানি না। গাজিপুরে রচিত কবিতাগুলিকেও আমরা তিনটি স্তরে ভাগ করিতে পারি। প্রথমগুলি তথায় পৌঁছিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে রচিত; সেগুলি হইতেছে শূন্যগৃহে (১১ই বৈশাখ), নিষ্ঠুর সৃষ্টি (১৩ই), জীবন-মধ্যাহ্ন (১৪ই), প্রকৃতির প্রতি (১৫ই), শ্রান্তি (১৬ই), মরণস্বপ্ন (১৭ই), বিচ্ছেদ (১৯শে), মানসিক অভিসার (২১শে), কুহুধ্বনি (২২শে), পত্রের প্রত্যাশা (২৩শে)। ইহার পর পনেরো দিন কোনো কবিতা নাই। তার পর যে-কবিতাগুলি জ্যৈষ্ঠের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে পুনরায় শুরু হইল, তাহাদের সুর ও রূপ বৈশাখী-গুচ্ছ হইতে বেশ তফাত। 'বধূ' (১১ই জ্যৈষ্ঠ) এই কবিতাগুচ্ছের প্রথম। এ যেন কোনো বালিকা-বধূর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতাকে নিখিল গ্রাম্য-বালিকার অন্তরের বেদনারূপে প্রকাশ। 'ব্যক্ত প্রেম' (১২ই জ্যৈষ্ঠ), 'গুপ্ত প্রেম' (১৩ই জ্যৈষ্ঠ) ও 'অপেক্ষা' (১৪ই জ্যৈষ্ঠ) কবিতাত্রয়ে নারীপ্রেমের নূতন রূপ কবির লেখনীতে মূর্তি লইয়াছে। এ নারী কুলত্যাগিনী নহে— এ চিরন্তন নারী, যাহার কাছে প্রেমহীন ভালোবাসা 'আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো'। পুরুষ তাহার বিদ্যা বিত্ত বীর্য লইয়া দৃপ্ততেজে নারীর নিকট আসে, তাহার সুপ্ত যৌবনের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে উতলা করে। কিন্তু পুরুষের অনুরাগ নানাপথচারী— তাই চিরন্তন নারী হয় অপমানিত, লজ্জিত, ক্ষুব্ধ। পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেমের অন্ত হইলেই নারীর কলঙ্ক, তাহাতেই তাহার পরাভবের গ্লানি। 'গুপ্ত প্রেমে' কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে প্রেমই নারীর ধর্ম। সে-নারী সুরূপাই হউক আর কুরূপাই হউক অন্তর তাহার প্রেমের জন্য লালায়িত; "আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে প্রেমের রূপ সে তো সুমধুর" বা "আমি আমার অপমান সহিতে পারি, প্রেমের সহে না তো অপমান।" এই হইতেছে যথার্থ প্রেমিকার সর্বোত্তম আদর্শ। চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে কবি কুরূপা চিত্রাঙ্গদার প্রেমনিবেদনের ব্যর্থতা দেখান। সেই পর্যন্ত 'গুপ্ত প্রেমে'র সহিত তাহার মিল আছে, কিন্তু নাট্যখানিতে কবি আরও আগাইয়া গিয়াছেন; সেখানে নারী এ কথা বলে নাই—

> তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
> আপন মনো-আশা দলে যাই,
> পাছে সে মোরে দেখে থমকি বলে 'এ কে!'
> দু হাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী—
পাছে সে মনে ভানে 'এও কি প্রেম জানে!
আমি তো এর পানে চাহি নি!'

চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে এই পরাহত মনোভাব নাই। সেখানে নারী বিজয়িনী। 'অপেক্ষা' কবিতা এই কবিতাত্রয়ের পরিপূরক; সমাপ্তি হইল পরিপূর্ণ মিলনে। 'দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে আলোর ব্যবধান'।

আঁধারে যেন দুজনে আর
দুজন নাহি থাকে।··

এবং

হৃদয় দেহ আঁধারে যেন
হয়েছে একাকার।··
মৌন এক মিলনরাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে
দোঁহার অবসান।

বাস্তবতার এমন অপরূপ কাব্য-আবরণ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুদক্ষ আর্টিস্টের লেখনীরই উপযুক্ত।

এই পর্যায়ের প্রেমের শেষ কবিতা 'সুরদাসের প্রার্থনা', প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) ইহার নামকরণ করেন 'আঁখির অপরাধ'। ইহাকে 'গুরুগোবিন্দ' 'নিষ্ফল উপহার' প্রভৃতির সহিত কাহিনী-কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত করা যাইতে পারে; কিন্তু কাহিনী ইহার প্রধান বিষয়বস্তু নহে। সৌন্দর্যের প্রতি আঁখির যে-স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহারই সমর্থন বা তাহারই জয়গান ছিল কবিতার অন্যতম উদ্দেশ্য। 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউল বলিতেছে—"আমি কেন ভয় করি নে বলি। একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম, ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের উদয় হল। সূর্য যখন অস্ত গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো।" সুরদাসও অন্ধ হইবার পর বলিতেছে—

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।

সমস্ত কবিতাটিতে নূতন সুর ও রূপ সংযোজিত হইল, যাহা ছিল sensuous লালসার সামগ্রী, তাহা হইয়া গেল দেহোত্তর আধ্যাত্মিক ধ্যানের ধন।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সন্ন্যাসী জগতের রূপ-রসকে দূরে নির্বাসিত করিয়াছিল, প্রকৃতির পীড়নের কথা সে জানিত না; আর, সুরদাস সুন্দরকে রূপের মধ্যে দেখিয়াছে, এই তাহার আঁখির অপরাধ। তাই আজ তাহার প্রার্থনা—

যাক, তাই যাক, পারি নে ভাসিতে কেবলই মুরতিস্রোতে,
লহ মোরে তুলি আলোকমগন মুরতিভুবন হতে।
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে— একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।

আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে আমার বিজন বাস,
প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া রব আমি বারোমাস।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের পূজারী বটে, কিন্তু সৌন্দর্যোত্তরের সাধক।

'বধূ' প্রভৃতি চারিটি কবিতার মধ্যে কবি প্রেমের যে-বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেছে নারীর অন্তরের বেদনা— তাঁহার লেখনীতে ভাষা পাইয়াছে। ইহা একপ্রকার কাব্যিয় সুখসম্ভোগ, ইহাতে বীর্যবান যৌবনের পরিপূর্ণ আনন্দ পাই। তাই দেখি 'অপেক্ষা' রচিত হইবার চারিদিন ব্যবধানে লিখিত 'দুরন্ত আশা' প্রমুখ কবিতাত্রয়ের পরিপ্রেক্ষণা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'দুরন্ত আশা' (১৮ জ্যৈষ্ঠ) 'দেশের উন্নতি' (১৯ জ্যৈষ্ঠ) 'বঙ্গবীর' (২১ জ্যৈষ্ঠ) কবিতাত্রয় পৃথক অভিঘাতে সৃষ্ট, ইহারা লিরিক-ধর্মী নহে। এখান হইতে গাজিপুর-বাসকালে রচিত কবিতার দ্বিতীয় স্তরের শুরু। এই নূতন অভিঘাতে সাময়িকভাবে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেন 'সর্পসম ফোঁসে'। তাই অত্যন্ত উচ্ছ্বাসভরে লিখিলেন, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'। 'দেশের উন্নতি' ও 'ব্যঙ্গবীর' ব্যঙ্গ শ্লেষে কণ্টকিত হইলেও দেশের জন্য কবির যে-সুগভীর প্রেম তাহা কবিতাগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। এই ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া 'উল্টা করে বলি আমি সহজ কথাটাই! ব্যর্থ তুমি কর পাছে ব্যর্থ করি তাই— আপন ব্যথাটাই'।—ভীরুতা, ক্ষণিকা।

রাজনীতির 'পলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন', নব্য হিন্দুদের 'আর্যামি' প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লিখিলেন বটে, কিন্তু নিজের নিন্দা শুনিয়া যাহা লিখিলেন, তাহার মধ্যে রণং দেহি ভাব তো নাইই, বরং অত্যন্ত দুর্বল পরাজিত মনের কাতরতায় তাহা পূর্ণ। 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' বোধ হয় লেখেন 'কড়ি ও কোমলে'র প্রতি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের আক্রমণের উত্তরে। ইহার পর দিন লেখেন 'কবির প্রতি নিবেদন' এইটিতে নিজের কাছে নিজের সান্ত্বনা খুঁজিতেছেন; এই কবিতাটি প্রথমটির পরিপূরক হিসাবে পঠনীয়। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি কোমল' ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ (১৮৮৬ নভেম্বর) মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার প্রায় দেড় বৎসর পর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই কাব্যের ব্যঙ্গ করিয়া রাহু-রচিত মিঠে-কড়া বা 'ইহা কড়িও নহে কোমলও নহে, পুরো সুরে মিঠে কড়া' এই নামে ক্ষুদ্র একখানি কাব্য লেখেন (২৪ পৃ); উহা প্রকাশিত হয় ১২৯৫ বৈশাখ (১৮৮৮ এপ্রিল ১৭)।[১]

দুর্বল মোরা, কত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ।
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে যা পারি তাও করিব না? নিষ্ফল হব ভবে?
প্রেমফুল ফোটে, ছোটো হল বলে দিব না কি তাহা সবে?
যদি ভুল হয়, ক'দিনের ভুল! দু দিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন সেই কি অমর হবে?[২]

'গুরুগোবিন্দ' ও 'নিষ্ফল উপহার' উপাখ্যানমূলক কবিতা হইলেও তত্ত্বই সেখানে আসল। উভয় কবিতা শিখগুরুর কাহিনী। গুরুর নির্জন সাধনার কাল উদ্‌যাপিত হয় নাই—

এখনো কেবল নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা আপন মর্মবাণী।[৩]

১ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৮।

২ নিন্দুকের প্রতি নিবেদন, মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২।

৩ গুরুগোবিন্দ, কথা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭।

তাই এখনো তাঁহার বিজনবাস চলিবে। গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার একই দিনে লেখা (২৭ জ্যেষ্ঠ ১২৯৫)। প্রায় পাঁচ বৎসর পরে লিখিত 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধের উপসংহারে গুরুগোবিন্দের নির্জন সাধনার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিতে পর দিনে রচিত 'পরিত্যক্ত' কবিতাটি। বাংলাদেশের মধ্যে সকল প্রকার প্রগতি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যে-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, এই কবিতাটি তাহারই ভর্ৎসনায় রচিত— কিন্তু এ ভর্ৎসনাও বেদনায় কাতর। আজ বঙ্কিম প্রমুখ লেখকগণ, বাংলাভাষার অরুণযুগে যাঁহারা ছিলেন পূর্বগগনের শুকতারা, তাঁহারা হইয়াছেন প্রতিক্রিয়া-পন্থী, তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে কবি যাহা লিখিলেন, তাহা পূর্বে আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের চিরপ্রাগ্রসর মন সমসাময়িকদের আগে চলিত। তাই শিক্ষিত সমাজের এই চিত্তবিকৃতি, এই প্রতিক্রিয়ামূলক মনোবৃত্তি তাঁহাকে আঘাত দেয়; কিন্তু তাঁহার আদর্শ ধ্রুবতারকার ন্যায় চিত্তমাঝে বিরাজিত, তাই তিনি নির্ভীক—

ভয় নাই যার কী করিবে তার এই প্রতিকূল স্রোতে।
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা তোমারি বাক্য হতে।

'ভৈরবী গান' 'পরিত্যক্ত' কবিতার পরিপূর্তিরূপেও দেখা যাইতে পারে। প্রাচীনেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বা ত্যাগ করিতে উদ্যত, কারণ তাঁহাদের মতে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীলতার সহিত প্রাচীন ভারতের যোগ সামান্যই। রবীন্দ্রনাথের মতে এই ভৈরবী গান গাওয়া বৃথা; মন উদাস করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তৃপ্ত করিবার উপাদান উহাতে কম—

ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাসমূরতি বিষাদশান্ত শোভাতে।
ওই ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই প্রভাতে· ·
ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ তারে আর ফিরে চেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ নয়নবাষ্পে ছেয়ো না।· ·
তারা অলস বেদন করিবে যাপন অলস রাগিণী গাহিয়া,
রবে দূর আলো-পানে আবিষ্ট প্রাণে চাহিয়া
ওই মধুর রোদনে ভেসে যাবে তারা দিবসরজনী বাহিয়া।
সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া আপনারে তারা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর, বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন ঘুমের দোলায় দুলাবে।
ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন, নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ, সুখ আছে সেই মরণে।

'পরিত্যক্ত' কবিতায় কবি যে-অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহাই এই কবিতাটিতে বলিলেন অন্যভাবে। দেশবাসী অতীতের মোহে, অথবা ভবিষ্যতের স্বপ্নে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় থাকিতে চায়, বাস্তবের সহিত মুখোমুখী হইতে তাহাদের ভয়। বর্তমানের দৈনন্দিন সংগ্রাম কঠিন-ভিত্তি আদর্শবাদের অভাবে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইতেছে না। কবি

এই পরাভবকে জাতির নৈতিক পরাজয় বলিয়া মনে করিতেন, তাই কবির যাহা করণীয় তাহাই তিনি করিতেন— ভাষার সুরে আশাহীন জীবনে প্রাণের স্পন্দন আনিবার চেষ্টা এই কবিতার অন্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও হইতে পারে।

গাজিপুর বাসকালে মানসীর দ্বিতীয় কবিতাগুচ্ছের শেষ কবিতা 'ধর্মপ্রচার' (৩২ জ্যৈষ্ঠ)। সম্পূর্ণ পৃথক আদর্শে রচিত হইলেও পূর্বোক্ত কবিতারাজির মধ্যে যে-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে— এখানে তাহার অন্যপ্রকার আবেদন। সাময়িক সংবাদপত্রে কবিতার ঘটনাটি বর্ণিত হয়। এই কবিতায় sublime and ludicrous সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মুক্তি-ফৌজের গেরুয়াপরা সাহেব সন্ন্যাসীদের উপর নব্য হিন্দুয়ানীর স্বেচ্ছাব্রতীর দল হিন্দুধর্ম রক্ষার উৎসাহে যে-কাণ্ডটা করিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সুন্দর নহে:—

> ওই শোনো ভাই বিশু, পথে শুনি 'জয় যিশু'!
> কেমনে এ নাম করিব সহ্য আমরা আর্যশিশু।. .
> আগে দিব দুয়ো তালি, তার পরে দেব গালি।
> কিছু না বলিলে পড়িব তখন বিশ-পঁচিশ বাঙালি।
> তুমি আগে যেয়ো তেড়ে, আমি নেব টুপি কেড়ে।
> গোলেমালে শেষে পাঁচজনে প'ড়ে মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে।

এই ludicrous চিত্রের পর যখন মুক্তি-ফৌজ[১] বীরদের দ্বারা আহত হইয়া রুধিরাক্ত দেহে যীশুর জয়গান করিতেছে, তখন কবিতাটি কেবল sublime হয় নাই, নাটকীয় সৌন্দর্যে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে।

এই কবিতা রচনার তেইশ দিন পরে লেখা 'নব-বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' (২৩ আষাঢ়)। কবিতাটির মধ্যে যে ব্যঙ্গ ও শ্লেষ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নব্য হিন্দুদের বাল্যবিবাহ সমর্থনের জবাব।

আমরা এতক্ষণ কবি রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের বিচিত্র অনুভূতির সন্ধানে তাঁহার কাব্য-বলাকার ছায়াহীন পথ বাহিয়া চলিয়াছিলাম। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকেও দেখা দরকার, যাহার ভিতর দিয়া কাব্য-বলাকার অশ্রুত কাকলি অরূপের বাণী রূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের জীবনে গাজিপুর-বাস পর্বটা একটি বিশেষ ঘটনা; তাহার কারণও বলিয়াছি। গাজিপুরে যে বরাবর ছিলেন তাহা নহে, বোধ হয় বার-দুই কলিকাতায় যান। একবার গিয়া সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীকে আনেন, আষাঢ়ের শেষাশেষি (৭ই জুলাই ১৮৮৮) তাহাদের পুনরায় রাখিয়া আসেন ও শ্রাবণ মাসে ন-দিদি স্বর্ণকুমারীকে লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসেন। স্বর্ণকুমারীর 'গাজিপুর পত্র' ভারতীতে প্রকাশিত হয় (১২৯৬)। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা স্নেহের সহিত, কৌতুকের সঙ্গে লেখা। এখান হইতে ইঁহারা কয়েকদিনের জন্য কাশী বেড়াইতে যান, তাহার বর্ণনাও উক্ত প্রবন্ধে আছে। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ-রচিত গাজিপুরের এক উদ্ভট ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। বলা বাহুল্য ইতিহাসটি রবীন্দ্রনাথের স্বকপোলকল্পিত, হাস্যরসসৃষ্টি তাহার উদ্দেশ্য।[২]

১ মুক্তি-ফৌজ Salvation Army খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠান। উইলিয়াম বুথ (W. Booth 1829-?) ইংলণ্ডে ১৮৬৫ অব্দে স্থাপন করেন। ইনি লণ্ডনের অন্ত্যজপল্লীতে (slum) জনসেবা ও ধর্মপ্রচার প্রবর্তন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সৈনিক-বিভাগের ন্যায় সংযত ও নিয়মনিষ্ঠ। সেবা-আর্তত্রাণ ও বিশেষভাবে দরিদ্র ও দুস্থ ও দুর্ধর্ষদের মধ্যে কাজের জন্য ইহাদের খ্যাতি। ভারতে ১৮৮২ অব্দে স্যালভেশন আর্মির কাজ শুরু হয়। কর্মীরা গেরুয়াধারী। ইহারা ঠিক মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সাধু সন্ন্যাসীদের মত নহে। আমার মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্থাপনের idea তিনি মুক্তি-ফৌজদের নিকট পাইয়াছিলেন।

২ ভারতী ও বালক, ১২৯৬ শ্রাবণ, পৃ ১৯৮-৯৯।

গাজিপুরে কবির বাসার নিকটে বাস করিতেন সিভিল সার্জেন ; তিনি ছিলেন মিলিটারী বিভাগের লোক। কবির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং কবি কী লেখেন তাহা জানিতে তাঁহার কৌতূহল হয়। কবি আমাদের বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার কবিতা তর্জমা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। অধুনা আবিষ্কৃত 'নিষ্ফল কামনা'র অনুবাদ বোধ হয় এই সময়েই প্রথম করেন। সম্ভবত ইহাই কবির ইংরেজি অনুবাদের প্রথম প্রয়াস।[১]

সখীসমিতিতে মায়ার খেলা

গাজিপুর হইতে বোধ হয় বর্ষার শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিলেন। কখনো থাকেন জোড়াসাঁকোর বাটিতে, কখনো জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সহিত উড্ স্ট্রীট বা পার্ক স্ট্রীটের বাসায়। সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে জমে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সাহিত্যিকদের মজলিস। 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে এক খাতায় সাহিত্যিকরা লেখেন নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ও মন্তব্য। একই বিষয়ে বহুজনের বহু মত হইতে পারে— পক্ষে ও বিপক্ষে; বিপরীত মত পোষণেও আপত্তি নাই, অদ্ভুত ঘটনাও লিপিবদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই লেখকদের মধ্যে প্রধান— তাঁহার হাতে কোনো সাময়িক পত্রিকা নাই। নানা কথা নানা ভাবে মনে জাগে, এই খাতায় লিখিয়া যান আপন মনে; কেহ বা তার মধ্যে খুঁত ধরে, টিপ্পনী করে— তাহাতে বাদ-প্রতিবাদ হয়, লেখার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আছেন জ্যেষ্ঠদের মধ্যে; তা ছাড়া আসেন আশুতোষ চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র, কবি অক্ষয় চৌধুরী, সিভিলিয়ান লোকেন পালিত; ছোটদের মধ্যে আছেন সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ। এই পাণ্ডুলিপিখানি ভালো করিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' নামে যে-গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা মুখ্যত এই পাণ্ডুলিপির উপাদান ও আইডিয়া হইতে গৃহীত। ১২৯৫ কার্তিক ২২ তারিখ হইতে পৌষের ৫ তারিখ পর্যন্ত প্রায় দিনই রবীন্দ্রনাথের লেখা[২]

১ আমরা এই ইংরেজি কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (দ্র. *Poems* : Rabindranath Tagore, Visva-Bharati)

All fruitless is the cry,
All vain this burning fire of desire.
The Sun goes down to his rest.
There is gloom in the forest and glamour
in the sky.
With downcast look and lingering steps
The evening star comes in the wake
of departing day
And the breath of the twilight is deep with
the fulness of a
farewell feeling.

২ আমরা এই লেখাগুলির নাম ও তারিখ এইখানে দিতেছি—

৯। বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র [২২ কার্তিক ১২৯৫] দ্র. ভারতী, ১৩১২ বৈশাখ পৃ ৯০-৯৩।
২৩। হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা [দীর্ঘ প্রবন্ধ] [৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]
২৬। স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব [৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]
২৮। আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিক অসামঞ্জস্য [৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]
২৯। কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery) [৬ অগ্রহায়ণ]
৩০। সৌন্দর্য ও বল [৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

চোখে পড়ে।[১] ইতিমধ্যে কার্তিক মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথকে বোলপুরে যাইতে হয়। কয়েক মাস পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরে ট্রস্ট ডীড সম্পন্ন করিয়া নিকটের এক প্রান্তরে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৮৮৮ মার্চ ৮); এইবার ৪ কার্তিক (১২৯৫ ॥ ১৮৮৮ অক্টোবর) আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।[২]

আশ্রম-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা ও সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় উপাসনায় আচার্যের কার্য করিতেন, মোহিনীমোহনের বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান পাঠে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী সংগীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল।[৩]

পারিবারিক স্মৃতি পুস্তকের রচনাগুলি শখের লেখা, পত্রিকার তাগিদে লেখা নয়। তবে কিছুকাল পূর্বে সখী-সমিতির তরফ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী শ্রীমতী সরলা রায়ের (Mrs. P. K. Roy) অনুরোধে যে একটি গীতনাটিকা লিখিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা এবার পূরণ করিতে হইতেছে। পাঠকের স্মরণ আছে, গত বৎসর পূজার সময়ে দার্জিলিং বাসকালে 'মায়ার খেলা'র[৪] গান রচনা শুরু করিয়াছিলেন, এবার সেটিকে শেষ করিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে ছাপা শেষ করিতে হইল, কারণ পৌষের মাঝামাঝি মহিলা শিল্প-মেলায় উহার অভিনয় হয়। এই গীতিনাটিকার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন সখীসমিতি, কিন্তু গান শেখানো প্রভৃতি কাজে রবীন্দ্রনাথকেই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হয়, যদিও প্রতিভা দেবী যথেষ্ট সাহায্য করেন।

'জীবনস্মৃতি'তে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের সহিত তুলনা করিয়া এই নাটিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য হইলেও "ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম, তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।"

এই নাটিকার সমস্তই গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প। ইহার তিনটি গান কবির অন্য কাব্যে ইতিপূর্বে

৩১। আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব [৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]।

৩৫। ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি [৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

৩৯। সমাজে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের প্রভাব [১০ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

৪১। আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রীপুরুষ প্রেমের অভাব [১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

৪২। Chivalry [অগ্রহায়ণ ১২৯৫]।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান বা জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১২৯৫ সনের ১৩ অগ্রহায়ণ [১৮৮৮ নভেম্বর ২৭]।

৫২। [সঙ্গীত সম্বন্ধে কিয়দংশ ছিন্ন] জোড়াসাঁকো ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৯৫।

৫৫। সৌন্দর্য [৫ পৌষ]

১ সমসাময়িক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশিত হয় (১২৯৫। ১৮১০ শক অগ্রহায়ণ)।
রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান বা জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১২৯৫ সনের ১৩ অগ্রহায়ণ (১৮৮৮ নভেম্বর ৭)

২ শান্তিনিকেতন আশ্রম : অঘোরনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, থ্যাকার স্পিঙ্ক, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ ৫৮।

৩ ১২৯৫ ও ১২৯৬ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কোনো গান চোখে পড়ে না।

৪ 'মায়ার খেলার' প্রথম সংস্করণে কবি স্বয়ং গীতিনাট্যখানির গল্পাংশ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে সেটি পরিত্যক্ত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (১ম খণ্ড) গল্পাংশ পুনর্যোজিত হইয়াছে। 'মায়ার খেলা'র স্বরলিপি শ্রীইন্দিরা দেবী-কৃত, ১৩৩২ আষাঢ়।

প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন, "ইহার আখ্যানভাগ কোনো সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে। সংগীতের কল্পরাজ্যে সমাজনিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।" লেখকের ভরসা ইহাতে "সাধারণ মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু নাই।"[১] গল্পাংশের মধ্যেও নূতনত্ব কিছু নাই, পূর্ব প্রকাশিত গদ্য-নাটক 'নলিনী'র ছায়াবলম্বনে ইহা রচিত।

সরলা রায়ের অনুরোধক্রমে নাটিকাটি রচনা করেন বলিয়া গ্রন্থখানি তাঁহাকে উপহার দেন; আর উহার উপসত্বও সখীসমিতিকে দান করা হয়। কেবল মেয়েরাই শিল্পমেলায় অভিনয় করিবে বলিয়া বোধ হয় ইহার অধিকাংশ ভূমিকা মেয়েদেরই। আর যে-কয়েকটি পুরুষচরিত্র আছে, তাহারা এমনি নিরীহ যে মেয়েরা সে-অংশ গ্রহণ করিলেও বেমানান হয় না।

সখীসমিতির[২] উদ্‌যোগে 'মহিলা শিল্পমেলা' খোলা হয়; ১৫ই পৌষ (১২৯৫) কলিকাতা বেথুন স্কুল বাটিতে তদানীন্তন ছোটলাট বেলীর (Bailley) পত্নী লেডি বেলী মেলার দ্বার-উন্মোচন করিবার পর তৎকালীন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের পত্নী তথায় আগমন করেন। "মেলার পর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার খেলা নামে একখানি গীতিনাট্য বালিকাগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয়দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[৩]

বাংলাদেশের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে মায়ার খেলার অভিনয় বিশেষ ঘটনারূপেই স্মরণীয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যারা বোধ হয় এই সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধভাবে অভিনয়ে নামেন, অবশ্য তখন দর্শকেরা সবই ছিলেন মহিলা। সমসাময়িকের চোখে এই ঘটনাটি বিপ্লবেরই সমতুল্য। বহু বৎসর পরে শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এই দিনের কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "বেথুন কলেজে প্রথম উদ্‌ঘাটিত শিল্পমেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্তৃক 'মায়ার খেলা' অভিনয় হয়, এবং মেয়েরা পুরুষদের মতো সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে-অভিনয় দর্শন করে, সে কি এক নূতন আমোদ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন।"[৪]

মায়ার খেলা

'মায়ার খেলা'য় কবি এই কথাটিই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, আত্মসুখ ও প্রেম প্রতিশব্দবাচক নহে। দুরাশায় মানুষ যথার্থ প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে পারে না, 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না'। কিন্তু শান্তা অপেক্ষা করিয়া আছে—প্রেমের প্রতীক্ষায় সেই জয়ী হইল। "মায়াকুমারীগণ কুহকশক্তিপ্রভাবে মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়া

১ প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

২ ১২৯৩-এ স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখীসমিতি' নামে একটি মহিলাসভা স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র সম্মিলনে পরস্পর সদ্ভাব বর্ধন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান। ইহা ছাড়া অক্ষম পিতার কন্যাদের শিক্ষা, অসহায় বিধবাদিগকে অর্থ সাহায্য ও আশ্রয়দান প্রভৃতি কার্যও ইহাদের কর্মপদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। 'মহিলা শিল্পমেলা' এই সখীসমিতির অন্তর্গত অনুষ্ঠান। এই মেলা হইতে যে-অর্থ লাভ হইত, তাহা 'সখীসমিতি'র ভাণ্ডারে যাইত। ভারতী ১২৯৮ পৌষ সংখ্যায় এই সমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। সখীসমিতি ও শিল্পমেলার স্ত্রী-সভার সখীগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীমৃণালিনী দেবীর নাম Mrs. R. N. Tagore দেখিতে পাই। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন সম্পাদিকা।

৩ ভারতী ১২৯৫ পৌষ, পৃ ৫৩২-৩৩। দ্র. মহিলা শিল্পমেলা, ভারতী জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৪৯-৫১।

৪ ভারতী ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ২৪৪।

সৃজন করে। হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এ-সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা। একদিন নব-বসন্তের রাত্রে তাহারা স্থির করিল, প্রমোদপুরের যুবক-যুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া তাহারা মায়ার খেলা খেলিবে।"[১]

গ্রন্থের নায়ক অমর শান্তাকে ভালোবাসে, শান্তার প্রেমে উচ্ছ্বাস নাই, সে প্রেম শান্ত সমাহিত। সে অন্তর দিয়া অমরকে ভালোবাসে। কিন্তু তাহার প্রেমে মত্ততা আনে না, সে বর্ষা, সে বসন্ত নহে। "নবযৌবনবিকাশে··অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছে। সে উদাসভাবে জগতে আপন মানসীমূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে।··চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে শান্তার প্রতি অমরের প্রেম জন্মিতে অবসর পায় নাই। অমর শান্তার হৃদয়ের ভাব না বুঝিয়া চলিয়া গেল।"[২]

সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায় কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!

অমর চলিয়া গেল; মায়াকুমারীগণ বড়ো সত্য কথা পরিহাসচ্ছলে গাহিল—

কাছে আছে দেখিতে না পাও তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

শান্তার প্রেম এত গভীর যে সে তাহার প্রেমাস্পদকে বদ্ধ রাখিল না; সে বলিতেছে—

তুমি, সুখ যদি নাহি পাও যাও, সুখের সন্ধানে যাও

আর-একটি নারী-চরিত্র হইতেছে প্রমদা— শান্তার বিপরীত, উভয়ের স্বভাব নামের অনুরূপ। "প্রমদার কুমারীহৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই। সে কেবল মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সখীরা ভালোবাসার কথা বলিলে সে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়।"[৩] সে বলে 'মিছে কথা ভালোবাসা'। তাহার ধারণা, প্রেম জীবনের সুখ নষ্ট করে। য়ুরোমেরিকার একশ্রেণীর কুমারীর জীবনাদর্শ সে। অশোক ও কুমার তাহার নিকট আপন প্রেম ব্যক্ত করে, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। মায়াকুমারীগণ হাসিয়া বলিল, তোমার এ গর্ব চিরদিন থাকিবে না।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।

"অমর পৃথিবী খুঁজিয়া কাহারও সন্ধান পাইল না। অবশেষে প্রমদার ক্রীড়াকাননে আসিয়া দেখিল, প্রমদার প্রেমলাভে অকৃতার্থ হইয়া অশোক আপন মর্মব্যথা পোষণ করিতেছে।"[৪] অমর বলিল—

ভালোবেসে যদি সুখ নাই তবে কেন, তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

"কেন-যে লোকে সাধ করিয়া ভালোবাসে অমর বুঝিতেই পারিল না। এমন সময় সখীদের লইয়া প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। প্রমদাকে দেখিয়া অমরের মনে সহসা এক নূতন আনন্দ নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল।"[৫] প্রমদা দেখিল

১ প্রথম দৃশ্য, মায়ার খেলা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।
২ দ্বিতীয় দৃশ্য, মায়ার খেলা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।
৩ তৃতীয় দৃশ্য, মায়ার খেলা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।
৪ চতুর্থ দৃশ্য, মায়ার খেলা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।
৫ চতুর্থ দৃশ্য, মায়ার খেলা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

আর-সকলেই তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় তাহার চারি দিকে ফিরিতেছে, কেবল অমর দূরে দাঁড়াইয়া আছে। সে আকৃষ্ট হৃদয়ে সখীদিগকে বলিল—

ওলো যা তোরা, যা সখি, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

সখীদের প্রশ্নের উত্তরে অমরের অপরিস্ফুট হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইল না। সখীরা কিছু বুঝিল না। কেবল মায়াকুমারীগণ বুঝিল এবং গাহিল—

প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে, দেখো দেখো সখি, চাহিয়া।
দুটি ফুল খসে গেল ওই, প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

"অমরের মনে ক্রমে প্রমদার প্রতি প্রেম প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমদারও হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, বাহিরের চঞ্চলতা দূর হইয়া গেল। সখীরা প্রমদার অবস্থা বুঝিতে পারিল।· ·অমরের প্রতি সখীদের বিশ্বাস নাই। এবং সখীদের নিকট হইতে সখীর হৃদয় হরণ করিয়া লইতেছে জানিয়া অমরের প্রতি হয়তো অলক্ষ্যে তাহাদের ঈষৎ মৃদু বিদ্বেষের ভাবও জন্মিয়াছে। আর, যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করিল প্রমদা কিছু বলিতে না বলিতে"[১] সখীরা বলিল—

তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!
কে জানিতে চায়, তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না!

"সরলহৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা কিছু না বুঝিয়া হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া গেল। ব্যাকুল-হৃদয় প্রমদা লজ্জায় বাধা দিবার অবসর পাইল না।" মায়াকুমারীগণ গাহিল—

নিমেষের তরে মরমে বাধিল, মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরম বেদনা।"[২]

"অমরের অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয় সহজেই শান্তার প্রতি ফিরিল। এই দীর্ঘ বিরহে এবং অন্য সকলের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমর শান্তার প্রতি নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব করিবার অবসর পাইল।" শান্তা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল; সে উদ্বেগহীন ভাষায় বলিল—

দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না!
আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না।

"এ দিকে প্রমদার সখীরা দেখিল অমর আর ফিরে না, তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল বাধা পাইয়া অমরের প্রেমানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। তাহাতে নিরাশ হইয়া তাহারা নানা কথার ছলে অমরকে আহ্বান করিতে লাগিল—অমর ফিরিল না; সখীদের ইঙ্গিত বুঝিতেই পারিল না। ভগ্নহৃদয়া প্রমদা অমরের প্রেমের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিল।" মায়াকুমারীগণ গাহিল—

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।[৩]

১ পঞ্চম দৃশ্য, মায়ার খেলা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।
২ পঞ্চম দৃশ্য, মায়ার খেলা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।
৩ ষষ্ঠ দৃশ্য, মায়ার খেলা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

"শান্তা ও অমরের মিলনোৎসবে পুরনারীগণ কাননে সমাগত হইয়া আনন্দগান গাহিতেছে। *অমর যখন পুষ্পমালা* লইয়া শান্তার গলে আরোপণ করিতে যাইতেছে এমন সময় ম্লান ছায়ার ন্যায় প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। সহসা অনপেক্ষিত ভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদ-প্রতিমা প্রমদার নিতান্ত করুণ দীন ভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিস্মৃত অমরের হস্ত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শান্তা ও আর সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শান্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হইল।" প্রমদা কহিল—

আর কেন, আর কেন !
দলিত কুসুমে বহে বসন্তসমীরণ।
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা—
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ।

এই বলিয়া প্রমদা মালা তাহাদিগকেই পরাইয়া দিল। অমর শান্তার প্রতি লক্ষ করিয়া কহিল, 'আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি, এখন আমার এই ভগ্ন সুখ এই ম্লান মালা কাহাকে দিব, কে লইবে ?'[১] শান্তা ধীরে ধীরে বলিল—

যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব,
আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন—
তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।

"অমর ও শান্তার এইরূপে মিলন হইল। প্রমদা শূন্য হৃদয় লইয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল।" মায়াকুমারীগণ গাহিল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না।
শুধু সুখ চলে যায়— এমনি মায়ার ছলনা।[২]

ইহাই 'মায়ার খেলা'র আখ্যানবস্তু। প্রেমের এই দ্বন্দ্ব কবি এই গীতনাট্যে প্রকাশ করিলেন। স্পষ্টতর করিলেন 'রাজা ও রানী'তে। অখণ্ড প্রেমের রূপ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পাইল 'বিসর্জনে'। যথাসময়ে সে-আলোচনা হইবে। মানসী প্রেম মানুষী প্রেম নহে। দুরাশায় মানুষ বাস্তব প্রেমকে অবজ্ঞা করিয়া বেদনা পাইয়াছে। 'মানসী'র একটি কবিতায় আছে—

নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে,
চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

অমর ও তাহার বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে নিবাইয়া ঘরে ফিরিয়া শান্তাকেই গ্রহণ করিল।

বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যের প্রথম রচনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', দ্বিতীয় রচনা 'মায়ার খেলা'। এই গীতনাট্য লিখিত হইল মানসী-যুগে। 'কড়ি ও কোমলে'র যৌবনসৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ ও 'মানসী'র মানস-

১ সপ্তম দৃশ্য, মায়ার খেলা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।
২ সপ্তম দৃশ্য, মায়ার খেলা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

সুন্দরীর জন্য অন্বেষণজনিত দুঃখবাদ— এই দুই-এর মাঝে যখন কবির মন দোল খাইতেছে, তখনই 'মায়ার খেলা' রচিত হয়। তাহার লিখিবার কারণ যাহাই হউক-না কেন— লিখিবার সময় সে-যুগের মনের প্রধানতম সুরটি কবি না প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

মানসীর যুগ। রাজা ও রানী

১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে চলিলেন; সপরিবার বলিতে বুঝায় স্ত্রী, আড়াই বৎসরের কন্যা ও চারি মাসের খোকা রথীন্দ্রনাথ। সোলাপুরে মাসখানেক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে জায়গাটা খুব মনোরম নয়; কারণ, "জমিতে ঘাস নেই, গাছে পাতা নেই, জলাশয়ে জল নেই— লোকালয়েও অধিক লোক নেই— চারি দিক মরুভূমির মতো ধূ ধূ করছে।· ·দেখতে দেখতে দোয়াতের কালি শুকিয়ে জমে আসে· ·রচনা করবার সময় আমার কাব্য শুকিয়ে আসে কি না জানিনে· ·।"

সোলাপুরে মাস কয়েক থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়াতেই[১] পুণার নিকট খিড়কি শহরতলীতে গিয়া কিছুকাল বাস করেন; বাড়িটি ছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বন্ধু অধ্যাপক গোবিন্দ বিঠ্‌ঠল কড়কড়ের; এই কড়কড়ে সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার 'বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন (পৃ ১৮৮-১৯২)। 'খিড়কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই আকের খেত, গাছের সার, টেনিস-খেত, কাঁচের জানালা-মোড়া বাড়ি'র কথা ছিন্নপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

এবার এই বৈশাখ মাসে সোলাপুরে বাসকালে লিখিলেন 'রাজা ও রানী', তাঁহার প্রথম নাটক।[২] মানসী কবিতাগুচ্ছের একটি মাত্র কবিতা 'প্রকাশবেদনা' (৬ বৈশাখ, ১২৯৬) তথায় রচিত। এই কবিতাটির মধ্যে যে-অস্ফুট হৃদয়-বেদনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যেন 'রাজা ও রানী'র অন্তর্গত লিরিকধর্মী রূপটিরই কথা, এ যেন বিক্রমদেবের অন্তরের অনন্ত প্রেমতৃষ্ণার ভাষা।

> আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে ক্রন্দনহারা দুখে—
> শিরায় শিরায় হাহাকার কেন ধ্বনিয়া উঠে না বুকে ?· ·
> তীরের মতন পিপাসিত বেগে ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া
> হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত, মর্মে রহিত ফুটিয়া।
> আজ মিছে এ কথার মালা মিছে এ অশ্রু ঢালা!
> কিছু নেই পোড়া ধরণী মাঝারে বোঝাতে মর্মজ্বালা।

এই তীব্র আকাঙ্ক্ষারই একটি রূপ বিক্রমের মধ্যে ফুটিয়াছে। 'রাজা ও রানী' রচনা শেষ করিয়া খিড়কিতে যখন বাস করিতেছিলেন তখনও দেখি এই দুঃখবাদ কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; যে-অকারণ বেদনা রাজা

১ মায়া (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬), বর্ষার দিনে (৩ জ্যৈষ্ঠ), মেঘের খেলা (৭ জ্যৈষ্ঠ), খিড়কি-পুণা বাসকালে এই তিনটি কবিতা রচিত হয়। ফরমায়েসি গান কবিতা চিরদিনই কবিদের লিখিতে হয়। বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা স্নেহলতার বিবাহোৎসব (১৮৮৯ মে), তজ্জন্য একটি গান লিখিয়া পাঠাইলেন। গানটি— "সুখে থাকো আর সুখী করো সবে" (গীতবিতান ৬০৮)। বিবাহ হয় পাটনা-প্রবাসী গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র কুমুদপ্রসাদ সেনের সহিত। কুমুদপ্রসাদ ও স্নেহলতার পুত্র প্রদ্যোৎকুমার, কুলপ্রসাদ ও মালতী চৌধুরী (উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীর পত্নী)।

২ ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ১৩০২ অগ্রহায়ণ ৯। সোলাপুর হইতে একখানি পত্রে প্রিয়নাথ সেনকে জানাইতেছেন যে তিনি একখানি নাটক লিখিয়াছেন, তাহার নামকরণ তখনো হয় নাই। দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫২ শারদীয়া সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথের চিঠি নং ৬।

বিক্রমদেবকে, যে দুর্জয় অভিমান সুমিত্রাকে, যে ব্যর্থ প্রেম কুমার ও ইলাকে শান্তি দান করিতে পারে নাই, সেই মায়ামরীচিকা দুঃখের রূপ 'মায়া' কবিতায় ভাষা পাইয়াছে—

বৃথা এ বিড়ম্বনা!
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ,
কেন এত যন্ত্রণা
ছায়ার মতন ভেসে চলে যায়
দরশন পরশন—
এই যদি পাই এই ভুলে যাই,
তৃপ্তি না মানে মন।·
এই ছায়া লাগি কত নিশি জাগি
কাঁদায়েছে কাঁদিয়াছে
মহাসুখ মানি' প্রিয়তনুখানি
বাহুপাশে বাঁধিয়াছে।· ·
এত সুখ দুখ তীব্র কামনা
জাগরণ হাহুতাশ
যে রূপজ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে
কোথা তার ইতিহাস?

'মায়া'র বিষাদসুর বিক্রমের উক্তিতে 'রাজা ও রানী'র মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে— 'হায় প্রিয়ে, আজ কেন মনে হয় সে সুখের দিন'। অপর দুটি কবিতার মধ্যেও এই হতাশভাবের প্রতিধ্বনি বর্ষার দিনের বিরহীচঞ্চল মনের ব্যথায় নিবিড়। মানসী কাব্যের শুরুতে যে বিষাদ-সুর আরম্ভ হয়, তাহা এখানে সমে আসিয়া স্তব্ধ হয়।

পুণা-বাসকালে (১২৯৬ জ্যৈষ্ঠ) কবির জীবনে একটি নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। তিনি একদিন বিখ্যাত বিদুষী রমাবাইয়ের[১] বক্তৃতা শুনিতে যান। একদিন পত্রে লিখিতেছেন, "অনেকগুলি মহারাষ্ট্রী ললনার মধ্যে গৌরী নিরাভরণা শ্বেতাম্বরী ক্ষীণতনু উজ্জ্বলমূর্তি রমাবাইয়ের প্রতি দৃষ্টি আপনি আকৃষ্ট হল।"[২]

রমাবাই কে এবং কেনই বা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ এই পত্রে তিনি এই মহিলার মতামত সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতা রমাবাইকে ভারতীয় নারীপ্রগতির একটি উল্কা বলিলে ভুল হইবে না। কোঙ্কনস্থ মঙ্গলুর জিলার ক্ষুদ্র এক গ্রামে ১৮৫৮ ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যে মরাঠি ও সংস্কৃত ভাষাদ্বয় উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পিতৃমাতৃহীন হইয়া মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে একমাত্র ভাইকে সঙ্গে লইয়া ভারতভ্রমণে বাহির হন। কলিকাতায় তাঁহার সংস্কৃত-বাগ্মিতা দেখিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধি দেন। শ্রীহট্ট ভ্রমণকালে তথাকার এক তরুণ বাঙালি উকিলের সহিত প্রণয় ও পরিণয় হয়। কিন্তু ১৮৮২ সালে বিবাহের ষোলমাস পরে বিধবা হইয়া দেশে ফিরিয়া যান এবং 'আর্য মহিলা সমিতি'

১ রমাবাই, দ্র. বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৯৬। ভারতী ১২৯৬ শ্রাবণ পৃ ২৪১-৪৬। রবীন্দ্রনাথ, রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে পত্র, ১২৯৬ জ্যৈষ্ঠ ১, পুণা। ভারতী ১২৯৬ আষাঢ়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। সমাজ, পরিশিষ্ট, পৃ ৪৫০-৫৫।

২ রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

স্থাপন করেন। পর বৎসর ইংলণ্ডে গিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ও য়ুরোমেরিকার নানা স্থান ঘুরিয়া দেশে ফিরিয়া হিন্দু বিধবাদের জন্য ১২৯৫ সালের ২৯শে ফাল্গুন 'সারদা সদন' স্থাপন করেন। (১৮৮৯ মার্চ ১১)। ইহার কয়েক মাস পরেই এই ঘটনাটি ঘটিল।

মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণশ্রেণী এই প্রগতিপরায়ণা তেজস্বিনী নারীর কার্যাবলী আদৌ পছন্দ করিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ যে-বক্তৃতাসভায় উপস্থিত ছিলেন সে-সভাও শেষ পর্যন্ত ভাঙিয়া যায়; রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "রমাবাইয়ের বক্তৃতাও খুব দীর্ঘ হতে পারত, কিন্তু এখানকার বর্গির উৎপাতে তা আর হয়ে উঠল না। রমাবাই বলতে আরম্ভ করতেই তারা ভারি গোল করতে লাগল। শেষকালে বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রেখে রমাবাইকে বসে পড়তে হল।

"স্ত্রীলোকের পরাক্রম সম্বন্ধে রমণীকে বক্তৃতা করতে শুনে বীরপুরুষেরা আর থাকতে পারলেন না, তাঁরা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন; তর্জনগর্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত করে জয়গর্বে বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি মনে মনে আশা করতে লাগলুম, আমাদের বঙ্গভূমিতে যদিও সম্প্রতি অনেক বীরপুরুষের অভ্যুদয় হয়েছে কিন্তু ভদ্ররমণীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে, এতটা প্রতাপ এখনও কারও জন্মায় নি।"

রবীন্দ্রনাথ সভার শ্রোতাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া যেমন লিখিলেন, তেমনি রমাবাইয়ের অসম্পূর্ণ বক্তৃতার অংশবিশেষ লইয়া দীর্ঘ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি বক্তা বা শ্রোতা কাহাকেও ছাড়িলেন না। রমাবাই বক্তৃতায় বলেন যে মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ, কেবল মদ্যপানে নয়। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ পত্রপ্রবন্ধ নরনারীর সমকক্ষতার বিচার। তাঁহার মতে পুরুষ বল ও বুদ্ধিতে নারী অপেক্ষা যেমন শ্রেষ্ঠ, নারী তেমনি সৌন্দর্যে ও হৃদয়াবেগে পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কে কাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে প্রশ্ন উঠে না। জাগতিক বিধানে Law of compensation আছে— যাহা একের নাই, তাহা অন্যের আছে। সেইজন্যই "স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে।" রবীন্দ্রনাথের মতে নারীদের মধ্যে বড় কবি ও সংগীতাচার্য এ পর্যন্ত জন্মায় নাই। বিশুদ্ধ আর্টেও তাহাদের শক্তি প্রকাশ পায় নাই। সৃষ্টিব্যাপারে তাহাদের শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁহার মতে মেয়েরা সংসারের বাহিরে কাজের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। তাহারা মাতৃজাতি; "যতদিন মানবজাতি থাকবে,··ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন করতেই হবে। এ-কাজটা এমন কাজ যে, এতে অনেক দিন ও অনেক ক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাকতে হয়, নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।" লেখকের মতে "এইরকম সন্তানকে উপলক্ষ করে ঘরের মধ্যে থেকে পরিবার-সেবা মেয়েদের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে; এ পুরুষদের অত্যাচার নয়, প্রকৃতির বিধান।" এইজন্যই পুরুষদের উপর তাহাদের নির্ভরশীল হইতে হয়। সেই নির্ভরশীলতাকে "যদি অধীনতা হীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি তা হলেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারে সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম মনে করি তা হলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।" রবীন্দ্রনাথের এ যুক্তির সদুত্তর এখনো পাওয়া যায় নাই।

বর্ষা পড়িলে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে পুনা হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। ছিন্নপত্রে (জুন ১৮৮৯) পথের বর্ণনা আছে। সংসারী রবীন্দ্রনাথের জীবনচিত্র এই বর্ণনার মধ্যে লেখকের অজ্ঞাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া কবি 'রাজা ও রানী' প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। গ্রন্থখানি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন (১২৯৬ শ্রাবণ ২৫)।

মানসী-পর্বের দুঃখবাদ সকল কবিতার মধ্যেই যেমন নিহিত রহিয়াছে, এই যুগে রচিত নাটকের মধ্যেই সেই অন্তর্বেদনা, সেই দ্বন্দ্বও অপ্রকট নহে। 'রাজা ও রানী'র আলোচনায় সেই তত্ত্বটি আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইবে।

রাজা ও রানী

জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেব তাঁহার সদস্য বন্ধু দেবদত্তের সহিত নারীর প্রেমরহস্য লইয়া আলোচনায় রত। রানী সুমিত্রা কাশ্মীর-রাজদুহিতা। রাজা রূপসী যুবতী রানীর প্রেমসম্ভোগ-মানসে উন্মত্তপ্রায়; রাজকার্য পর্যন্ত অবহেলিত। মন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া বলিতেছেন— "হেরো ওই আসিছেন মন্ত্রী, স্তূপাকার রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে। পলায়ন করি।" মন্ত্রী আসিয়া দেবদত্তকে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

> রানীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
> দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ
> ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
> বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ-সম
> বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর
> কাঁদে রাজ্য। অরাজক রাজসভামাঝে
> মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
> বসে বসে হাসে।

ইহাই আখ্যানবস্তুর জটিলতা-সৃষ্টির কারণ। রাজকর্মচারী-শোষকদের অত্যাচারে চারি দিকে প্রজাবিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, রাজা সেসবে কর্ণপাত করেন না। তিনি চান অন্তঃপুরের প্রমোদ-কাননে রানীর সহিত প্রেমলীলা। তিনি রানীকে বলেন— "থাক্ গৃহ, গৃহকাজ। সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি। অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই— বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ।" কিন্তু নারী এই নিরবচ্ছিন্ন প্রেমলীলাকে যথার্থ প্রেমের দ্যোতক বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। "জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়। তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।" বিক্রমের এই কথা শুনিয়া রানীর নারীত্ব অপমানিত হয়, সে বলে— "শুনিয়া লজ্জায় মরি।· ·এ কি ভালোবাসা?· · আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।" যথার্থ রানীর উক্তি, নারীর উক্তি। রাজা সৌন্দর্যসাগরে আকণ্ঠ ডুবিয়া প্রেমসুধা পান করিতে চান— এমন সময়ে রাজমন্ত্রী দর্শনপ্রার্থী, রাজা বলিলেন, "ধিক্ রাজকার্য। রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে।" কিন্তু সুমিত্রা কেবল রাজার প্রেয়সী নহেন, তিনি রাজমহিষী; এই তাঁহার গর্ব, এই তাঁহার পরিচয়। তিনি দেবদত্তকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও রাজ্যের অরাজক অবস্থার কথা সমস্তই অবগত হইলেন। রানী রাজাকে উৎপীড়কদের হাত হইতে প্রজাদের রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন— "আমার প্রজারে যারা করেছে পীড়ন রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের।"

কিন্তু এই উৎপীড়কের দল রানীরই আত্মীয়— সকলেই শক্তিশালী সামন্ত— বিনাযুদ্ধে তাহাদের কবল হইতে জালন্ধর উদ্ধার করা যাইবে না। রানী মন্ত্রীকে বলিলেন, "বিদেশী নায়ক এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহ্বান· · কালভৈরবের পূজোৎসবে করো নিমন্ত্রণ। সেদিন বিচার হবে।" কিন্তু রাজা সে কথা শুনিবেন না, কোনো বিরোধ অশান্তি তিনি চান না। রাজ্য যাক প্রজা যাক তাঁহার চিরতৃষিত অন্তর চায় প্রেয়সীর প্রেম— নিরবচ্ছিন্ন প্রেমরসলীলা। সুমিত্রা রাজার প্রেমবাহুর বন্ধন ছিন্ন করিলেন রাজ্যশ্রীর সম্মানের জন্য— তিনি যে রানী। তাই ছদ্মবেশে চলিলেন কাশ্মীরে পিত্রালয়ে; সেখান হইতে সাহায্য আনিয়া দুষ্কৃতকারীদিগকে দূর করিবেন। বিক্রমদেব এই সংবাদে স্তম্ভিত। তিনি বলিতেছেন, "পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন! এ রাজ্যেতে সব দিয়ে পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

এই আঘাতে রাজার মোহ ছিন্ন হইল, স্বপ্ন ভাঙিল, অন্ধ প্রেমের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিহিংসার বিষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর—
রাজধর্ম ফিরে দাও, পুরুষহৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গমাঝে।
কোথা কর্মক্ষেত্র! কোথা জনস্রোত! কোথা
জীবনমরণ! · ·স্বপ্ন ছুটে গেছে,· ·
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত। যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ।

সুমিত্রা কাশ্মীরে পৌঁছিয়া ভ্রাতা কুমারসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। কুমারসেনের পিতৃব্য চন্দ্রসেন অভিভাবকরূপে রাজ্যশাসন করিতেছেন। তাঁহার পত্নী রেবতী অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতির নারী। কুমারসেন জালন্ধরের কথা পিতৃব্যকে জানাইলে রেবতী তাহাকে সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রায় প্ররোচিত করিলেন। রেবতীর অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। প্রথম ত্রিচূড়ের রাজকন্যা ইলার সহিত কুমারসেনের বিবাহ পণ্ড করা; ইহা ব্যতীত কুমারকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য নানা প্রকার কূট অভিসন্ধি তাঁহার অন্তরে চলিতেছে। ত্রিচূড়ে গিয়া কুমার ইলার নিকট বিদায় হইল—ইলার মন যেন বলিল— "আমার এ জীবনের সুখ আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে।"

এদিকে বিক্রমদেব রণোন্মত্ত; বিদ্রোহী বিদেশীরা বন্দীকৃত; কিন্তু যুদ্ধের নিবৃত্তি নাই। আজ ক্ষাত্রতেজেরও সেই ব্যভিচার, প্রেমে যাহা দেখা দিয়াছিল একদিন। বিক্রমদেব বলিতেছেন—

এ কি মুক্তি! এ কি পরিত্রাণ! কী আনন্দ
হৃদয়মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহু
কী প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবর মাঝে!· ·আমি ছিনু অন্তঃপুরে
পড়ে,· ·কোথা ছিল লোকলাজ,
কোথা ছিল বীরপরাক্রম!· ·কে বলিবে
অন্তঃপুরচারী!· ·
এ প্রবল হিংসা ভালো ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে।
প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ।
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধনমুক্তির
সুখ। হিংসা জাগরণ। হিংসা স্বাধীনতা।

প্রেম যেমন মোহাচ্ছন্ন হইয়া বিকৃত ছিল, আজ রাজধর্ম ক্ষাত্রধর্মও তেমনি হিংসায় কুৎসিত হইয়াছে, অসত্য জীবন হইতে অসত্য জীবনেরই জন্ম হয়।

এমন সময়ে সংবাদ আসিল রানী সুমিত্রা বিদ্রোহী যুধাজিৎকে বন্দী করিয়া রাজশিবিরে উপস্থিত। বিক্রমদেব হঠাৎ রানীর আগমনের কথা শুনিয়া—

সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারানী, সেই

পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে ?

বিদ্রোহী হইয়া উঠিল ক্ষত্রিয়ের মন। নারী শত্রুকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আনিয়াছে! অসহ্য এ নারীর দম্ভ! রাজা ঘোষণা করিলেন, "রমণীর সনে সাক্ষাতের এ নহে সময়।··এ শিবিরে শিবিকার প্রবেশ নিষেধ।"

রাজা বিক্রমের সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল সুমিত্রা ও কুমারের উপর। সুমিত্রা ও কুমারসেন অপমানিত হইয়া কাশ্মীরে ফিরিয়া গেল। বিক্রমদেব প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য কাশ্মীর আক্রমণ করিবেন মনস্থ করিলেন। কুমারসেন পিতৃব্যের নিকট হইতে সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে চাহিলে রেবতী আপত্তি জানাইলেন। বলিলেন—

তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধীভাবে
জালন্ধর-রাজকরে করিব অর্পণ।
মার্জনা করেন ভালো, নতুবা যেমন
বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

কুমার বুঝিতে পারিল কাশ্মীররাজ্য বিক্রমদেবের হিংস্র প্রতিহিংসা হইতে রক্ষা পাইবে না। ত্রিচূড় গিয়া কুমার ইলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে বিক্রমদেবের ভয়ে অমরুরাজ বলিয়া উঠিলেন—

পালাও, পালাও। এসো না আমার রাজ্যে
আপনি মজিবে তুমি আমারে মজাবে।

কুমার তথায় আশ্রয়প্রার্থী হইয়া যায় নাই, সে কেবল অনির্দিষ্ট জগতে বাহির হইবার পূর্বে ইলার সহিত দেখা করিতে চায়; তাহার সে-প্রার্থনা পূরণ হইল না।

এদিকে কাশ্মীরে শিবিরে বিক্রমদেব জয়সেন ও যুধাজিৎ প্রভৃতি যোদ্ধারা কুমারকে ধরিয়া আনিবার ষড়যন্ত্রে রত। "ধরিবারে তারে পুরস্কার করেছি ঘোষণা।" বিক্রমদেব বলিতেছেন— "এ কী দৃঢ়পাশে আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক।··শীঘ্র আনো তারে জীবিত কি মৃত।" এমন সময়ে চন্দ্রসেন ও রেবতী বিক্রম সমীপে উপস্থিত হইলেন। হিংস্র সর্পিনীর মূর্তি রেবতী; সে বলিল, "প্রজাগণ লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জ্বালাও ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো ছারখার। ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সঁপি দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির।" বিক্রমদেবের অকস্মাৎ চমক ভাঙিল এই নারীর কথা শুনিয়া—

ওরে হিংস্র নারী! ওরে নরকাগ্নিশিখা!
বন্ধুত্ব আমার সনে! এতদিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্তিখানা
দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে।··
একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি
তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই
গুপ্ত লোভ, বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা।
দেখিব কেমন করে আপনার বিষে
আপনি জ্বলিয়া মরে নর-বিষধর।

কুমারসেন অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিতেছে, সঙ্গে সুমিত্রা। অরণ্যবাসীরা ইহাদের সহায়। কুমার ইলার ধ্যানে মগ্ন। কিন্তু এ দিকে ত্রিচূড়ে বিক্রমদেবের করে ইলাকে সমর্পণ করিবার জন্য অমরুরাজ প্রস্তুত। বিক্রম কুমারসেনের দুর্ভাগ্যের কথা ইলাকে শুনাইয়া বলিলেন, "তাহার সৌভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে, ছাড়ো তার আশা।· ·বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে সদা সন্ধানে তাহার।" ইলার উৎকণ্ঠা, তাহার কাতরতা বিক্রমদেবের অন্তরে নূতন সুর ধ্বনিয়া তুলিল।

কী প্রবল প্রেম! ভালোবাসো ভালোবাসো
এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালোবাসো।
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই! দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম।· ·
চলো মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব,
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে, তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী।· ·
যুদ্ধ নাহি
ভালো লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ।
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টি-সম ;· ·আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে, স্কন্ধে বহে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ!
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্র প্রেম শিশিরশীতল।
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ী পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।

এদিকে বনমধ্যে কুমারসেন ও সুমিত্রার পক্ষে এ ভাবে জীবনধারণ করা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে; তাহাদের জন্য কত পল্লী ছারেখারে গেল, কত লোক প্রাণ দিল! অবশেষে কুমার স্থির করিল, সুমিত্রা তাহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া রাজাকে উপঢৌকন দিবে। তাহাই হইল। কাশ্মীর-রাজসভায় বিক্রমদেব চন্দ্রসেন প্রভৃতি সকলে সমবেত; সংবাদ আসিল 'শিবিকার দ্বার রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ'। সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। এমন সময়ে শিবিকা হইতে স্বর্ণথালে কুমারের ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রা বাহিরে আসিলে, সহসা রাজসভার সমস্ত বাদ্য নীরব হইয়া গেল। সুমিত্রা বলিল, "আতিথ্যের উপহার আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব মনস্কাম এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক। এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্নিরাশি, সুখী হও তুমি!" সুমিত্রার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। ছুটিয়া আসিয়া ইলা এই দৃশ্য দেখিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। বিক্রমদেব নতজানু হইয়া কহিলেন, "দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের, তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে গেলে চির অপরাধী করে? ইহজন্ম নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা

মাগি ক্ষমা তব; তাহারও দিলে না অবকাশ? দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর, অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান?"

এইখানে নাটিকার যবনিকা।

'রাজা ও রানী'র দ্বিতীয় সংস্করণে কবি বিস্তর পরিবর্তন করেন, আয়তনে অর্ধেক হয়; অর্থাৎ প্রথম সংস্করণে বহু অবান্তর বিষয় ছিল, সেগুলি কাটিয়া ছাটিয়া ছোট করেন; আমরা সেই পরিবর্তিত সংস্করণই গ্রন্থাবলীতে পাই।

'রাজা ও রানী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক বলা যাইতে পারে; ইতিপূর্বে যাহা নাটকাকারে লিখিয়াছিলেন, তাহাকে যথার্থ নাটক আখ্যা দান করা যায় না। বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা গীতিনাট্য, নলিনী অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটক। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে নাটক বলা চলে না, উহা নাট্যকাব্যের প্রথম পরীক্ষা, উহাতে তত্ত্ব আছে, নাট্যিক বিষয় কমই। 'রাজা ও রানী'তে হৃদয়াবেগ প্রবল হইলেও কল্পনার ক্ষেত্র বেশ প্রশস্তই, আখ্যানাংশে বিষয়বস্তু প্রচুর ও ঘটনাবৈচিত্র্য যথেষ্ট, বরং একখানি নাটকের পক্ষে বিষয়বস্তু বেশি বলিয়া মনে হয়। ইহাতে সৃষ্টি-স্থাপত্য দৃঢ়তর হইয়াছে; সংসারের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আভাস পাই।

রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধবয়সে এই নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, ইহার "নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ওই লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুদান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"[১]

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সঙ্গে 'রাজা ও রানী'র এক জায়গায় মিল কবি স্বয়ং দেখাইয়া দিয়াছেন। "অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকে যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়। এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্য স্বতঃ উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে। এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, শুধু সুখ চলে যায় এমনি মায়ার ছলন।।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের মূল কথা হইতেছে সংযম। প্রেমে সংযমের অভাব হইলে উহা কী নিষ্ঠুর কী কুৎসিত হয় তাহা এই নাট্যে বিক্রমের মুগ্ধ ভালোবাসায় প্রকাশ পাইয়াছে। মোহবশে রাজা বিক্রম তাঁহার মানসপ্রেমকে দেহের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছেন; সুতরাং তাহা পদে পদে পরাভূত হইতেছে, এবং যতই সে প্রতিহত হইতেছে ততই তাহাকে পাইবার জন্য তাহার জিদ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহারই পাশাপাশি কবি ফুটাইয়াছেন সুমিত্রাকে। যথার্থ প্রেমের মর্যাদা রক্ষার জন্য নারী কতদূর আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ করিতে পারে, তাহাই দেখি এই মহীয়সী নারীর চরিত্রে। প্রেমকে কেবল আপনার ভোগের সামগ্রী করিব বলিয়া চাপিয়া ধরিলে সে-প্রেম নিবিয়া যায়। 'রূপ নাহি ধরা দেয় বৃথা সে প্রয়াস'— এ বাণী মানসী যুগেরই। 'কড়ি ও কোমলে'ও সেই সুর শুনিয়াছিলাম 'পবিত্র প্রেম' ও 'পবিত্র জীবন' কবিতাদ্বয়ে; মানসীর মধ্যেও সেই সুরটি বারে বারে নানা ছন্দে ঝংকৃত হইতেছে।

চল্লিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' ভাঙিয়া গদ্যনাটক 'তপতী' রচনা করেন। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি স্বয়ং 'রাজা ও রানী' সম্বন্ধে যে-সমালোচনা করিয়াছিলেন (১৯ ভাদ্র ১৩৩৬) তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

১ সূচনা : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

"সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূলকথা।

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে-অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু-দ্বারা চমৎকার-উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।"

১২৯৬ সনের শ্রাবণ মাসের শেষদিকে ও ভাদ্রের গোড়ায় রচিত কবিতা কয়টি 'মানসী' কবিতাগুচ্ছের পৃথক একটি স্তরে, বিশেষ পরিপ্রেক্ষণায় বিচার্য— ধ্যান (২৬শে শ্রাবণ), পূর্বকালে (২রা ভাদ্র), অনন্ত প্রেম (২রা ভাদ্র), ক্ষণিক মিলন (৯ই ভাদ্র), আত্মসমর্পণ (১১ই ভাদ্র) ও আশঙ্কা (১৪ই ভাদ্র)। কবি জোড়াসাঁকোয় আছেন— মন যেন বেশ তৃপ্ত, এমন শান্ত মন বহুদিন দেখা যায় নাই ; মানসীর পূর্বেকার কবিতাগুচ্ছ হইতে ইহাদের সুর কত পৃথক্‌ !

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি,
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ
হরণ করি ; —ধ্যান

এ মনোভাব পূর্বের অস্থির আক্ষেপ ও হতাশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ অন্য রূপের— 'যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে তুমি আমি একাকার।' কাব্যের মধ্যে কবি যাহাকে খুঁজিতেছেন সে কে ! সে কি তাঁহার মানসী, মানসসুন্দরী, জীবনদেবতা অথবা জীবনের ধ্রুবতারা— অন্ধকারে অদৃশ্য, ভাবলোকে দেখা দেয় ক্ষণিক ?

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
. .
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,

চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে। —অনন্ত প্রেম

এই শান্ত মনোভাব, এই তৃপ্তি সম্বন্ধে 'আশঙ্কা' জাগে। প্রশ্ন উঠে—

কে জানে এ কি ভালো?
আকাশ-ভরা কিরণধারা
আছিল মোর তপন-তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো—
কে জানে এ কি ভালো?

বিচিত্র প্রেম, বিচিত্র সুখ সব আজ নিশ্চিহ্ন—

কোথায় তারা, সকলে আজি
তোমাতেই লুকালো।
কে জানে এ কি ভালো?

'মানসী'র গোড়ার দিকের মনোভাব হইতে ইহার কত পার্থক্য—

সকল গান, সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান—
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।

'রাজা ও রানী' প্রকাশের পর এই কবিতা কয়টি রচিত হয়। গদ্য রচনা খুব কম, একটিমাত্র প্রবন্ধ 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন'[১] চোখে পড়ে। প্রবন্ধ হিসাবে ইহাতে নূতন কিছু নাই। রাজনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে মামুলি সমালোচনা যাহা এতদিন অস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন তাহাকেই আর-একটু স্পষ্ট করিবার চেষ্টামাত্র দেখা যায়। তখনকার রাজনীতিতে Representative Government ছিল আলোচনার প্রধান বিষয়। রাজনীতিকদের এইসব বিষয় লইয়া আন্দোলনকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যরচনা হিসাবে সুন্দর নহে সত্য, কিন্তু তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে তাহাদের মূল্য না দিয়া পারা যাইবে না। ১৮৮৯ সালে লিখিত এই প্রবন্ধের পটভূমি আজ আমাদের কল্পনার মধ্যে আনাও কঠিন। কংগ্রেস মাত্র ছয় বৎসর রাজনীতি লইয়া আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়াছে, আন্দোলন এখনো অনেক দূরে। ১৯৫৭ সাল হইতে সে কাল অনেক দূরে, তথাচ ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূচনাকালে লিখিত এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য— সর্ববিষয়ে সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া দেশবাসীর আত্মশক্তি ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার চর্চার দ্বারা দেশকে গড়িবার কাজ শেষ হয় নাই। বারে বারে দেখা গিয়াছে প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কবির দৃষ্টি আবিল হয় নাই; তিক্ত মন্তব্য ও সমালোচনার দ্বারা তাঁহার শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই।

১ নব্যবঙ্গের আন্দোলন, ভারতী ১২৯৬ আশ্বিন, ১৮৮৯ অক্টোবর। ইহাই একমাত্র প্রবন্ধ ১২৯৫ ও ১২৯৬এর মধ্যে রচিত, যাহা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। দ্র. দেশ, ২৭শে বৈশাখ ১৩৫৯। পৃষ্ঠা ৭২-৭৮।

মানসীর যুগ। 'বিসর্জন'

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনো রবীন্দ্রনাথের 'জীবন আছিল লঘু', যদিও প্রথমবয়স কাটিয়া গিয়াছে। সংসারের কোনো দায়ে বা দায়িত্বে তেমনভাবে বাঁধা পড়েন নাই। অকারণ ঘুরিয়া বেড়ানো সহজ ছিল। মহর্ষি জমিদারির 'কাজের ডোরে' কবিকে বাঁধিবার চেষ্টা অল্পস্বল্প করেন, কিন্তু তেমনভাবে ধরা তিনি দেন না; দুই-এক মাস জমিদারিতে গিয়া বাস করেন। সমসাময়িক একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর— ধূ ধূ করছে— কোথাও শেষ দেখা যায় না··। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই— বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল-ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুকনো সাদা বালি।··এমনতরো desolation কোথাও দেখা যায় না।··পৃথিবী বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়।" নূতন অভিজ্ঞতা বটে।

"সন্ধ্যাবেলা এই বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে অনুচরসমেত ছেলেরা এক দিকে যায়, বলু এক দিকে যায়, আমি এক দিকে যাই, দুটি রমণী [তাহার মধ্যে একজন মৃণালিনী দেবী] আর-এক দিকে যায়।··গতকল্য এই মায়া-উপকূলে অনেকক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের কেউ ফেরেন নি— আমি একখানি কেদারায় স্থির হয়ে বসলুম, *Animal Magnetism*[১] নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subjectএর বই একটা বাতির ঝাপসা আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম," কিন্তু মেয়েরা সময় মত ফেরেন না; কবি উদ্‌বিগ্ন হইয়া খোঁজ শুরু করিলেন; সেই খোঁজাখুঁজির সময়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের মানুষটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছিন্নপত্রের[২] সেই বর্ণনাটি উপভোগ্য।

মাঘোৎসবের সময়ে কলিকাতায় আসিয়া দেখেন বাড়ির ছেলেরা নূতন একটা অভিনয় করিবার জন্য ব্যস্ত।[৩] রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে তাহাদের আবদার সহজে পূরণ করিতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের হাতে বাঁধানো একখানি খাতা 'রবিকা'র হাতে দিয়া বোধ হয় নাটক লিখিবার 'বায়না' করিলেন। উৎসবের পর কবি একাই সাহাজাদপুরের জমিদারিতে চলিয়া গেলেন; এইখানে তিনি তাঁহার অমর নাট্যকাব্য 'বিসর্জন' রচনা করেন। আশ্চর্যের বিষয়, ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য রচনা প্রায় চোখে পড়ে না; 'মানসী'র মধ্যেও এখানে মস্ত ফাঁক। মাঘোৎসবে একটিও নূতন গান রচনা করিতে দেখি না, অন্য গান লিখিয়াছিলেন কি না বলা কঠিন। মনে হয় একটা বৃহৎ সৃষ্টির পূর্বে এ যেন শিল্পীর নীরব সাধনা সংযম ও প্রতীক্ষা। আবার ইহাও হইতে পারে— সংসার ও জমিদারির উভয়বিধ চাহিদা পূরণ করিতে মন এতই ব্যাপৃত যে, কাব্য কোনো রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই। মোটকথা রচনার দুর্ভিক্ষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নাটকের জন্য নূতন আখ্যানবস্তু সন্ধানের সময় নাই; তাই বোধ হয় 'রাজর্ষি' উপন্যাসের গল্পাংশ লইয়া নাটক

১ *Animel Magnetism* হিপ্‌নটিজম্‌ বা সম্মোহন বিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ। গ্রন্থকার W. Gregory। প্রকাশক E. W. Allen। এই গ্রন্থের ৩য় সংস্করণ ১৮৯৬এ মুদ্রিত হয়। ১৮৮৯ পূর্বের সংস্করণ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিয়াছিলেন।

২ ছিন্নপত্রের তারিখটি ভুল। উহা হইবে ১৮৮৯। পারিবারিক স্মৃতি পুস্তকে বলেন্দ্রনাথের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৬ (১৮৮৯ নভেম্বর ২৭) ঘটনাটি ঘটে। ১৮৮৮ সালের ২৭শে নভেম্বর রথীন্দ্রনাথের জন্মের তারিখ।

৩ ঘরোয়া, পৃ ৭-৮।

রচনা শুরু করিলেন। নাটক রচনা হইয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথকে উহা উৎসর্গ করিয়া যে-কবিতা লেখেন তাহা 'বিসর্জন' নাটিকার পুরোভাগে মুদ্রিত আছে। তাহাতে আছে—

তোরি হাতে বাঁধা খাতা তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।· ·
সম্মুখে দাঁড়াব যবে 'কী এনেছ' বলি সবে
যদ্যপি শুধাস হাসিমুখ,
খাতাখানি বের করে বলিব, 'এ পাতা ভরে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ'।· ·
তার পরে দিনকত কেটে যায় এইমত
তার পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাপালা!
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে।
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি
কেহ বলে, "ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি'।"· ·
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে,
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে,
ভালো যার লাগে তার লাগে।

'বালকে' প্রকাশিত রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথম ১৮টি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গল্পাংশ 'বিসর্জনে'র বিষয়বস্তু। নক্ষত্ররায়ের বিদ্রোহ-কাহিনী সংযোজিত অংশের (৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭ পরিচ্ছেদ) অন্তর্গত। রঘুপতি কর্তৃক কালী প্রতিমার বিসর্জন ঘটিয়াছে ৪০শ পরিচ্ছেদে। রাজর্ষির অন্যান্য অংশের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই। উহার অন্তর্গত হাসি, হাসির কাকা কেদারেশ্বর, ভিখারিনী অপর্ণার অন্ধ পিতা প্রভৃতি বিসর্জনের প্রথম সংস্করণে ছিল। ১৩০৩এর সংস্করণে তাহারা পরিত্যক্ত হয়। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে গুণবতী অপর্ণা নয়নরায় চাঁদপাল প্রভৃতি বিসর্জনের নূতন সৃষ্টি, রাজর্ষিতে ইহারা নাই। বিসর্জনের পাঠে বহু পরিবর্তন হইয়াছে; ১৩০৩এর কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পাদনকালেই উহার যথার্থ পরিবর্তন

সাধিত হয়। অনেকগুলি দৃশ্য সংক্ষিপ্ত হয়, নূতন লিখিত কোনো কোনো অংশ যোজিত হয়, কোনো কোনো অংশ পরিবর্তিত হয় ও কয়েকটি দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্জিত হয়।[১]

'বিসর্জন'

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী গুণবতী নিঃসন্তান। কালীর মন্দিরে দেবীসমক্ষে পুত্রকামনা করিয়া অন্তর্বেদনা জানাইতেছেন, "ব'সে আছি তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ লালসিয়া"। মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ বৎসর পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।" মহাদেবীসমক্ষে পশুবলিকে কেন্দ্র করিয়া বিসর্জন' নাটকের আখ্যানটি জটিল হইয়াছে।

অপর্ণা ভিখারিনী বালিকা, সে রাজার কাছে একদিন আসিয়া সাশ্রুনয়নে অভিযোগ করিল যে, তাহার পালিত ছাগশিশু রাজ-অনুচরগণ কাড়িয়া আনিয়া দেবীর কাছে বলি দিয়াছে। রাজা মন্দিরের সেবক রঘুপতির পুত্রস্থানীয় অনুচর জয়সিংহকে ডাকাইয়া এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকার মাতৃহৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ছিল এই ছাগশিশু। মহাকালীর মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে এই অশিক্ষিতা বালিকার সরল হৃদয়ে প্রথম সন্দেহ প্রবেশ করিল। সে প্রশ্ন করিল, "কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর শিশু চিনিবে না তারে।··আমি তার মাতা।" এক দিকে চিরবন্ধ্যা নারীর ক্রন্দন; অজাত শিশুকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা। আর, অন্য দিকে মূঢ় বালিকার হৃদয়ে মাতৃস্নেহ উদ্‌বেলিত হইতেছে মূক ছাগশিশুর জন্য। একজন একটি মানবশিশুর লোভে দেবীসমক্ষে শত শত মহিষ ও ছাগশিশু বলি দিবার জন্য প্রস্তুত, অপরজন একটিমাত্র ছাগশিশু হত্যার জন্য দেবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। সে বলে, "মা তাহারে নিয়েছেন? মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!" এইখানে দুইটি নারীহৃদয়ের বিপরীত আবেদন ও আকাঙ্ক্ষা। আখ্যায়িকার শেষ পর্যন্ত এই বিপরীত সংগ্রাম চলিয়াছে দুই নারীর মধ্যে। এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে জয়সিংহ ও অপর্ণার প্রথম পরিচয় হইল; প্রথম অস্পষ্ট প্রেম উভয়ের হৃদয়ে দেখা দিল। অপর্ণা বলে, "তুমি চলে এসো জয়সিংহ, এ মন্দির ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই।" জয়সিংহ বলে, "কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে! এসো তুমি আমার কুটীরে।" এ যেন খাঁচার পাখি ও বনের পাখির মিলন। কেহই নিজ সংস্কার ছাড়িতে পারিতেছে না।

ছাগশিশু হত্যার এই সামান্য বিষয়টি রাজার মনে যে-বিপ্লব সৃষ্টি করিল, তাহাতেই আখ্যানটি নাটকীয় রূপ লইয়াছে। রাজা রাজসভায় ঘোষণা করিলেন, "মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে হইল নিষেধ।··বালিকার মূর্তি ধরে স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন, জীবরক্ত সহে না তাঁহার।" সামান্য ঘটনা মানুষের চিরন্তন ধর্মবিশ্বাসে কী বিপ্লব সাধন করিতে পারে এইটি তাহারই নিদর্শন। বিসর্জনের প্রথম সংস্করণে কারণটি আরও বস্তুতান্ত্রিক ছিল। 'রাজর্ষি'তে বর্ণিত হাসি ও তাতা উহাতে ছিল এবং হাসির মৃত্যুকালে বারে বারে 'এত রক্ত কেন' এই কথাটি রাজার অন্তরে শেলের মত বিঁধিয়া যায়। হাসির মৃত্যুর পর তাতাকে তিনি রাজসংসারে গ্রহণ করেন ও পুত্রের ন্যায় পালন করেন, বিসর্জনে তাতা হইতেছে ধ্রুব। রবীন্দ্রনাথ বিসর্জনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়নকালে হাসি ও তাতার আখ্যানটি বর্জন করেন, এবং হাসির মৃত্যুর দ্বারা রাজার অন্তরের পরিবর্তনটাকে না ঘটাইয়া আরও সূক্ষ্ম কারণ

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, গ্রন্থপরিচয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ হইতে একবার প্রথম সংস্করণের অংশ ও চরিত্রগুলি দিয়া একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরে উহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

দেখাইলেন ; রাজার মনের পরিবর্তনটা বহির্বিষয়ী ঘটনার উপর না রাখিয়া অন্তর্বিষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিলেন। বলিবন্ধের প্রেরণাটা তাতার মৃত্যুর ন্যায় নাটকীয় অভিঘাতে উদ্‌বুদ্ধ না হইয়া, আরও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বমূলক করিলেন।

দেবপূজাদি ব্যাপারে রাজশক্তির হস্তক্ষেপ রঘুপতির বিবেচনায় অনধিকার চর্চা। তাহার যুক্তি—"বাহুবল রাহুসম ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়— সিংহাসন তোলে শির যজ্ঞবেদী-'পরে।" Church ও Stateএর বিবাদ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের চিরন্তন কলহ।

জয়সিংহ ও অপর্ণা মন্দিরপ্রাঙ্গণে অস্পষ্ট প্রেমবিনিময়ে মগ্ন, এমন সময়ে ক্রুদ্ধ অপমানিত ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিল। জয়সিংহ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিল ; গোবিন্দমাণিক্যকে সে আদর্শ মানব বলিয়া অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করে, গুরুকে সে সমস্ত বিশ্বাস দিয়া ভক্তি করে। সত্য ও সংস্কার— এই দুইএর দ্বন্দ্ব চলে জয়সিংহের অন্তরে ; তাই সে বলে "এ প্রাণ থাকিতে অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।" এবং তাহার এই বাক্যই সে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিল।

গোবিন্দমাণিক্যের আদেশে মন্দিরে বলি নিষেধ, "মন্দিরের দুয়ার হইতে রানীর পূজার বলি" ফিরিয়া আসিল। রাজার যে-সংগ্রাম এতক্ষণ রঘুপতি ও সভাসদদের সহিত বাহিরে চলিতেছিল, এখন তাহা দেখা দিল অন্দরে রানীর সহিত মতানৈক্যে। অন্ধসংস্কারমোহাচ্ছন্ন নারীর দৃষ্টি স্বভাবতই ক্ষীণ ; তাই সে বলে, "মন্দিরের বাহিরে তোমার রাজ্য। যেথা তব আজ্ঞা নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো।" সভাসদাদি প্রাকৃতজনেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি যেন রানীরও মুখে শোনা গেল। রাজা ও রানীর মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রঘুপতির অভিশাপের ভয়, দেবীকে প্রতিশ্রুত বলি উৎসর্গ করিতে না পারায় পাপসঞ্চয়ের ভয়— রানীকে সত্য ধর্ম হইতে ক্রমেই বিচ্যুত করিতেছে। রানীর সকল সাধ্য-সাধনা ব্যর্থ হইল— রাজা যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন তাহাই পালন করিবেন। তিনি দেবীর আজ্ঞা শুনিয়াছেন ; "দেবী-আজ্ঞা নিত্য কাল ধ্বনিছে জগতে। সেই তো বধিরতম যে জন সে বাণী শুনেও শুনে না।" গুণবতীর নারীত্বের, মহিষীত্বের অভিমান ক্ষুণ্ন হইল ; এইবার নারীর হিংস্রমূর্তি প্রকাশ পাইল— "আর নহে প্রেমখেলা, সোহাগক্রন্দন। বুঝিয়াছি আপনার স্থান— হয় ধূলিতলে নতশির, নয় ঊর্ধ্বফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।"

সংসারের জটিলতা বাড়িয়া চলিল। রঘুপতি প্রজাদের মধ্যে, সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। মহারানীও রাজার আদেশ অমান্য করিয়া মন্দিরে বলি পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উহা ফিরাইয়া দিলেন। রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিবার জন্য দেবী-প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া দিলেন— ঘোষণা করিলেন, দেবী বিমুখ। জয়সিংহের মনে সন্দেহ হইল ; সে প্রশ্ন করিল, "সমস্তই কি বিশ্বাস করব?" রঘুপতি বলিলেন, "হাঁ"। অপর্ণা আসিয়া দূর হইতে বলিল, "শীঘ্র এসো এ মন্দির ছেড়ে।" নারীর সরল হৃদয় বুঝিতেছে রঘুপতি অসত্যের পথে অধর্মের পথে জয়সিংহকে টানিতেছেন। তাই যেন সে আতঙ্কিত হইয়া জয়সিংহকে মন্দির ত্যাগ করিবার জন্য আবেগভরে অনুরোধ জানায়।

অপর্ণা আসিয়া দেবী-প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া প্রজাদের দেখাইল যে সত্যই দেবী বিমুখ হইতে পারে না। সংস্কারহীন ভিখারিনীর পক্ষে সত্য সহজবোধ্য। গুরুর এই শঠতায় জয়সিংহের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার দুর্বল অন্তঃকরণ সংস্কারে আবদ্ধ বলিয়া শৃঙ্খল ভাঙিতে পারিল না।

এদিকে রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে রাজহত্যার জন্য প্ররোচিত করিতেছে। দেবতার নামে রাজহত্যা ভ্রাতৃহত্যার প্ররোচনা জয়সিংহের নিকট অত্যন্ত বীভৎস বলিয়া মনে হয়। ধর্মের নামে এই হীন ষড়যন্ত্রের সে প্রতিবাদ করিল। রঘুপতি বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ; তাহার পক্ষে হত্যার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করা কঠিন নহে। হত্যা সম্বন্ধে এই দার্শনিক

ব্যাখ্যা বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একটি অপরূপ সম্পদ ; কিন্তু রঘুপতির এই কূট ব্যবহারে, ধর্মের এই অসৎ ব্যাখ্যা-প্রদানে জয়সিংহের চিত্ত গুরুর নিকট হইতে আরও সরিয়া গেল।

রাজা অল্পকালের মধ্যে জানিতে পারিলেন নক্ষত্ররায় তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। রাজা সে-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং নক্ষত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমারে মারিবে। বুকে ছুরি দেবে ?· ·এই বন্ধ করে দিনু দ্বার· ·, এই নে আমার তরবারি, মার্ অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম !" নক্ষত্র ভাঙিয়া পড়িল, রাজা ক্ষমা করিলেন। কিন্তু পুনরায় গুণবতী নক্ষত্ররায়কে ধরিয়া বুঝাইলেন যে ধ্রুবকেই রাজা ভবিষ্যতে ত্রিপুরার রাজা করিবেন, তাহার রাজা হইবার আশা নাই ; অতএব ধ্রুবকে ধ্বংস করাই তাহার স্বার্থ। রানী পরামর্শ দিলেন যে "অর্ধরাত্রে আজি গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে মোর নামে কোরো নিবেদন। তার রক্তে নিবে যাবে দেবরোষানল।"· ·নির্বোধ নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি শিশুকে হরণ করিয়া দেবীর সমক্ষে বলির ব্যবস্থা করিল। কিন্তু রাজা সংবাদ পাইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উভয়কে বন্দী করিলেন। বিচারে উভয়ে নির্বাসিত হইল। এইবার রঘুপতির চাতুরী চরমে আত্মপ্রকাশ করিল। "জোড়করে নতজানু আজ আমি প্রার্থনা করিব তোমা কাছে— দুই দিন দাও অবসর শ্রাবণের শেষ দুই দিন।" এই দুই দিন ভিক্ষা চাহিবার কারণ ছিল ; জয়সিংহ দেবীর চরণ ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সে 'রাজরক্ত শ্রাবণের শেষরাত্রে দেবীর চরণে' আনিয়া দিবে। রঘুপতি জানিত, ক্ষত্রিয়কুমার জয়সিংহ প্রতিজ্ঞা পালন করিবেই, সে রাজরক্ত আনিবেই, গোবিন্দমাণিক্যকে সে হত্যা করিবে ; তাই তাহার এই কপট বিনয়।

এদিকে মোগলসৈন্য আসাম আক্রমণ করিতে যাইতেছে। পথিমধ্যে তাহারা নির্বাসিত নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইল এবং ত্রিপুরা অধিকারমানসে গোবিন্দমাণিক্যকে পত্র পাঠাইল। পত্র লিখিয়াছিলেন নক্ষত্র ; তিনিই গোবিন্দ-মাণিক্যকে নির্বাসন-আদেশ দিয়াছেন, "নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে সোনার ত্রিপুরা— দগ্ধ করে দিবে দেশ, বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুরতরে ত্রিপুররমণী ?" গোবিন্দমাণিক্য স্থির করিলেন, "ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হতে করিয়াছে সাধ, তার তরে যুদ্ধ কেন ?" রাজা যুদ্ধ করিবেন না ঘোষণা করিলেন, নিজেই নির্বাসনে চলিলেন।

নাটকের শেষ পরিণতি হইল জয়সিংহের আত্মবিসর্জনে। দেবমন্দিরে রঘুপতি অপেক্ষা করিতেছেন, আজ শ্রাবণের শেষরাত্রি, জয়সিংহ রাজহত্যা করিয়া রক্ত আনিবে। জয়সিংহ ঝড়ের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "রাজরক্ত চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী মাতা ? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না তৃষা ? আমি রাজপুত, রাজরক্ত আছে দেহে। এই রক্ত দিব।" এই কথা বলিয়া জয়সিংহ আত্মঘাতী হইল, তাহার শেষ নিবেদন "এই যেন শেষ রক্ত হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন অনন্ত পিপাসা তোর রক্তভৃষাতুরা।"

এতদিনে রঘুপতির চৈতন্যোদয় হইল— যে-হত্যাকে সে এতদিন নানাভাবে সমর্থন করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার বিকটমূর্তি প্রকাশ পাইল, যে-দেবীকে সে অন্ধভাবে এতকাল সেবা করিয়াছিল, আজ তাহা-যে কী মিথ্যা, তাহা প্রতিভাত হইল। দেবীকে গোমতী নদীতে বিসর্জন দিয়া বলিল— "দেবী নাই।···কোথাও সে নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে নাই কোথাও সে ছিল না কখনো।· ·এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী, তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু সহ্য কি করিত দেবী ? মহত্ত্ব কি তবে ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি মূঢ় পাষাণের পদে ? দেবী বল তারে ? পুণ্যরক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী ফেটে মরে গেছে।"

গোবিন্দমাণিক্য দেবীর নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়া দেখিলেন, "জয়সিংহ নিবায়েছে নিজরক্ত দিয়ে হিংসারক্তশিখা।" তিনি তাহার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। গুণবতী বলিলেন, "আজ দেবী নাই— তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।" উভয়ে নির্বাসনে চলিয়া গেলেন। অপর্ণা আসিয়া রঘুপতিকে ডাকিল, "পিতা চলে

এসো!" রঘুপতি বলিল, "পাষাণ ভাঙিয়া গেল— জননী আমার এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা! জননী অমৃতময়ী।"

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলিতেছেন, "বিসর্জন আমাদের ধর্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ প্রথম দেখা দিয়াছে একটি বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে এবং সেই প্রতিবাদকে ভাষা দিয়াছেন গোবিন্দমাণিক্য। নাটকটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে এই সংগ্রাম সর্বত্র মুখর হইয়া আছে। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাহার বিরাম নাই।"[1] বিসর্জনের মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের দ্বন্দ্বচিত্র এমনভাবে ফুটিয়াছে যাহা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই। গোবিন্দমাণিক্য আদর্শবাদী; আদর্শরক্ষার জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করিল। তাহার সংগ্রাম অন্তরে ও বাহিরে, গৃহে ও রাজসভায়। বাহির হইতে দেখিলে রাজার জীবন একটা প্রকাণ্ড ট্র্যাজেডি; কিন্তু নির্মল সত্যের জ্যোতি তাঁহার অন্তরকে এমন স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল, এমনি শক্তিশালী করিয়াছে যে, বাহিরের দ্বন্দ্ব কঠিন বেদনাময় হইলেও তিনি তাহার উপর জয়ী হইয়াছেন। রাজার সর্বাপেক্ষা বড় সংগ্রাম রানীর সহিত; এইখানে 'রাজা ও রানী'র সহিত মেলে এবং মেলে নাও বটে। সুমিত্রা ও গুণবতী দুইটি পৃথক আইডিয়ার বাহন। সুমিত্রা রানীর মর্যাদা রক্ষার জন্য, রাজ্যশ্রীর সম্মানের জন্য আত্মত্যাগ করিল; গুণবতী নারীর অন্ধ instinctকে চরিতার্থ করিবার জন্য প্রলয়ংকরী মূর্তি ধারণ করিতে পরাঙ্মুখ হইল না। গোবিন্দ-মাণিক্য ও গুণবতীর প্রেম গভীর। অথচ যে-অহিংসাকে রাজা সত্যধর্ম বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার জন্য রানীর প্রেম তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, সেখানে সে অচল অটল, যা অসত্যের সহিত কোনোপ্রকার আপোস দরকষাকষি করিতে নারাজ। রানীর সংস্কারমূলক ধর্মবোধ প্রেমের মর্যাদা রাখে নাই, কারণ মিথ্যা ধর্মবোধ মানুষকে অসত্যের পথে, অন্যায়ের মধ্যে টানে। সেইজন্যই রানী শিশুধ্রুবকে দেবীর সম্মুখে বলিদান দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ধর্মান্ধতা সত্যের আলোক দেখিতে পায় না। সংসার-জীবনে রানী গুণবতীর প্রেমের কোনো পরীক্ষা হয় নাই; সত্যের সঙ্গে মতের, ধর্মের সঙ্গে সংস্কারের যখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, তখনই রানীর প্রেমের মধ্যে যে-স্বার্থান্ধতা ছিল, তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু রানীর এত বিরুদ্ধতার মধ্যে রাজার মনে তিলমাত্র ক্ষোভ জাগে নাই, কারণ যথার্থ প্রেম সর্বসহা, তাহা ব্যথা পায়, ব্যথা দেয় না— দেহের অতীতে তাহার ধ্যানযোগ, সংস্কারের বাহিরে তাহার সম্ভোগ।

জয়সিংহ ও অপর্ণার প্রেমের মধ্যেও বিরোধ। জয়সিংহ সংস্কার-আবদ্ধ, ধর্মান্ধ; আচারসর্বস্ব গুরুর নিকট হইতে আনুষ্ঠানিক ধর্মে অভ্যস্ত। আর অপর্ণা ভিখারিনী; কোনোপ্রকার সংস্কার তাহার চিরবহমান জীবনকে বাঁধিতে পারে নাই। সে তাহার বালিকা-হৃদয় দিয়া, তাহার নারীসুলভ স্বাভাবিক প্রেরণা হইতে জয়সিংহকে ভালোবাসে। জয়সিংহ কঠোর কর্তব্যবোধ ও আনুষ্ঠানিক ধর্মভাব হইতে সেই প্রেমকে কিছুতে নিজস্ব করিতে পারিতেছে না; যাহা নিত্য প্রেম তাহাকে সে অন্তরে পাইয়াছে। কিন্তু পিতৃস্নেহের ঋণশোধের জন্য সে সেই প্রেমকে দলিত করিল, নিজেকেও সেই সঙ্গে বিসর্জন দিল। জয়সিংহের প্রেম এত গভীর, এমনি নিষ্ঠুর সংযমের দ্বারা তাহা অবরুদ্ধ যে উহা পাঠককে পীড়িত করে। এই নিষ্ঠুর সংযম— যাহা প্রায় অস্বাভাবিকত্বের কোঠায় গিয়া পড়ে, তাহা কবির বহু গল্প-উপন্যাসের মধ্যে বারে বারে দেখা দিয়াছে। একদল আধুনিকদের মতে এটা কবির বাস্তবের সঙ্গে অপরিচয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম; তাঁহার ব্রাহ্মশুচিতা। যেন অশুচি ঘটনার বর্ণনা সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে রবীন্দ্রনাথ ইহাতে কৃতকার্য হন নাই।

১ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা ১, পৃ ৩১৫।

বিসর্জনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাই। যথার্থ প্রতিভাবান লেখক স্বরচিত নাট্যে বা উপন্যাসে তাঁহার নায়ককে যেমন বড় করেন নানা দিক হইতে, তেমনি নায়কের প্রতিপক্ষকে বড় করিয়া সৃষ্টি করেন। প্যারাডাইস লস্টের শয়তান ও বিয়ালজিবাব ঈশ্বরের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়া লেখকরা নিজেদেরই দুর্বলতা প্রকাশ করেন; প্রতিপক্ষ যুক্তিতে শক্তিতে যত বড়, সংগ্রাম যত তীব্র ও তীক্ষ্ণ, নায়ক ততই মহান হন। রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের ধৈর্যের সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠার মাহাত্ম্য স্বীকার করেন, তাঁহার মতকে বিশ্বাস করেন; অথবা বলিতে পারি তাঁহার অন্তরের আদর্শে রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বিসর্জনের অন্যতম নায়ক রঘুপতিকে দুর্বল করিয়া গড়েন নাই। রঘুপতি জটিল মানবমনের একটি অপরূপ সৃষ্টি।

মন্ত্রি অভিষেক

বিসর্জনের প্রকাশ ও মুদ্রণ লইয়া মন বেশ মশগুল, হঠাৎ কোথা হইতে রাষ্ট্রনীতির কালবৈশাখী আসিয়া তাঁহার কাব্য গান রসরচনাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। আবার দমকা চলিয়া গেলে আকাশ তেমনি শুভ্র, তেমনি শান্ত। এই উত্তেজনার মুহূর্তে লেখেন 'মন্ত্রি অভিষেক'[১]। সেটি পাঠ করেন কলিকাতার এমারেল্ড থিয়েটারে। কি রাষ্ট্রনৈতিক কারণসমূহ রবীন্দ্রনাথকে এই বক্তৃতা পাঠ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৮৬১ সালে গঠিত হইয়াছিল। তার পর ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, রাষ্ট্রকাঠামোতে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। এতকাল পরে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যবস্থাপক সভাকে বৃহত্তর ও কথঞ্চিৎ প্রতিনিধিমূলক করিবার শুভসংকল্প প্রকাশ করিলেন। সে যুগে সদস্যরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন, প্রতিনিধিমূলক নির্বাচনের কথা কেহ কল্পনাতে আনিতেন না। এ ছাড়া ভারতীয়দিগকে রাজকার্যে অধিকতর নিযুক্ত করা যায় কি না, তদ্‌বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে পাবলিক সার্বিস কমিশন (১৮৮৬ অক্টোবর) বসিয়াছিল। পাবলিক সার্বিস কমিশনের সভাপতি হন সার্ চর্লস এটকিনসন্। ভারতীয়দিগকে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতর রাজকর্মে নিয়োগ করা যায় কি না তাহাও ছিল কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৮৮৮ জানুয়ারি মাসে উক্ত তদন্তকমিটির প্রতিবেদন ও অক্টোবর মাসে তদুপরি ভারত গবর্নমেন্টের মন্তব্যলিপি প্রকাশিত হইল। পর-বৎসরে (১৮৮৯ সেপ্টেম্বর) এইসব প্রতিবেদন ও মন্তব্যের উপর ভারতসচিবের মহামূল্য মতামত বাহির হইল। আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখন ভারতসচিব ছিলেন লর্ড ক্রস[২] (১৮৮৬-৯১)। লর্ড ক্রস ছিলেন বিলাতের প্রতিক্রিয়াপন্থী দলের লোক; ভারতীয়দের পক্ষে রাজপদে প্রবেশের ও উচ্চতর পদে উন্নীত হইবার পরিপন্থী বহু নিয়ম নিষেধ অত্যন্ত চাতুরীর সহিত তিনি সৃষ্টি করেন। তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে একত্রে বলা হইত বঙ্গদেশ; এই দেশের ছয়টি জেলার জজের পদ ও চারিটি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রভিন্সিয়াল সার্বিসের যোগ্যতম দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য খোলা ছিল। উচ্চপদস্থ ভারতীয় রাজকর্মচারীদের হস্তে যথার্থ দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য সমর্পণ করা বৃটিশ রাজনীতির যে অভিপ্রেত নহে, তাহা এই তদন্ত বৈঠকের প্রতিবেদনে ঢাকিয়া রাখা যায় নাই।

১ ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ২ [১৮৯০ মে ১৫] পঠিত। দ্র. ভারতী, ১২৯৭ বৈশাখ। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২।

২ Sir Richard Assheton Cross [1823-1914] পার্লামেন্টের নির্বাচনে গ্লাডস্টোনকে ১৮৬৮ সালে পরাজিত করেন। ১৮৭৪এ ডিসরেলির মন্ত্রী-মণ্ডলে হোম্ সেক্রেটারি। ১৮৮৬ হইতে ১৮৯১ পর্যন্ত ভারতসচিব। তখন প্রধানমন্ত্রী লর্ড সলস্‌বেরি (১৮৮৬-১৮৯২)।

'মন্ত্রি অভিষেক' লর্ড ক্রসের মন্তব্যলিপির প্রতিবাদে রচিত প্রবন্ধ। এ ছাড়াও এই সময়ে (১৮৯০) কথা ওঠে যে, বড়লাটের "মন্ত্রীসভায় [Executive Council] আরো গুটিকতক ভারতবর্ষীয় লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এখন কথাটা কেবল এই দাঁড়াইতেছে, নির্বাচন কে করিবে? গবর্নমেণ্ট করিবেন, না, আমরা করিব?" রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলিতে চাহিয়াছিলেন "গবর্নমেণ্টের দ্বারা মন্ত্রিনিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রি অভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকট প্রার্থনীয় মনে হয়। · ·মীমাংসা করিবার পূর্বে সহজ বুদ্ধিতে এই প্রশ্ন উদয় হয়, কাহার সুবিধার জন্য এই নির্বাচনের আবশ্যক হইয়াছে? আমাদের সুবিধার জন্য। · ·অতএব সকলেই বলিবেন ভারত-শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি। আমাদেরই সুবিধা, আমাদেরই কাজ। সেই আমাদের কাজের জন্য আমাদের লোকের সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। সহজেই মনে হয় আমরা বাছিয়া দিলে কাজটাও ভাল হইবে, আমাদের মনেরও সন্তোষ হইবে।" কিন্তু আজও যেমন তখনও তেমন অবস্থা— বদল হইয়াছে নামকরণে। ইংরেজ পত্রিকাওয়ালারা "অতিরিক্ত বুদ্ধিপ্রভাবে বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা প্রাচ্যজাতীয়, অতএব তাহাদের হস্তে মন্ত্রি অভিষেকের ভার দিলে তাহারা নিজেরাই অসন্তুষ্ট হইবে।" তাহারা আরও বলেন, "যুদ্ধপ্রিয় জাতিরা এই মন্ত্রি অভিষেক -প্রথায় ক্ষুব্ধ হইবেন।" ইংরেজ সম্পাদকের এই অদ্ভুত উক্তির দীর্ঘ সমালোচনা এই প্রবন্ধে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পূর্ব এবং পশ্চিম যদিও বিপরীত দিক, তথাপি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মানবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরোধী ধর্মাবলম্বী নহে। · ·আমাদের মানবপ্রকৃতির এতদূর পর্যন্ত বিকার হয় নাই যে, তোমরা যখন মহৎ অধিকার আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবে তখন আমরা অসন্তুষ্ট হইব! · ·

"আর-কিছু না হউক, তোমাদের নিকটে আমাদের বেদনা, আমাদের অভাব জানাইবার অধিকার আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে অধিকতর সুখ-সন্তোগের কারণ হইবে এটুকু আমরা পূর্বদিকে বাস করিয়াও এক রকম বুঝিতে পারি। অপেক্ষাকৃত পশ্চিমবাসী যোদ্ধজাতীয়দের মানসিক প্রকৃতি যে এ বিষয়ে আমাদের হইতে কিছুমাত্র পৃথক তাহাও মনে করিতে পারি না। অতএব দুঃখনিবেদনের স্বাধীন অধিকার পাইলে ভারতবর্ষ যে অসন্তুষ্ট হইবে— ইংলণ্ডবাসী ভারত-হিতৈষীগণকে এরূপ গুরুতর দুশ্চিন্তা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় ইংরেজদিগের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের বহু উপকারের কথা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাজকার্যে আমাদের যোগ্যতা প্রদর্শনের অবসর ইংরেজ দিয়াছে, রাজশক্তির নিকট প্রার্থনা করিবার উপায়মাত্র যখন জানিতাম না তখনও ইংরেজ স্বেচ্ছায় আমাদের উন্নত-অধিকারের ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাহারা ইচ্ছাপূর্বক আমাদিগকে বৃহৎ অধিকার দিতে স্বীকার করিয়াছে এবং কিছু কিছু দিয়াছে। "কিন্তু তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের আশ্বাস-অনুসারিণী অধিকার প্রার্থনাকে তোমরা রাজভক্তির অভাব বলিয়া অত্যন্ত উষ্ণতা প্রকাশ কর।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, যখনই ভারতীয়রা ইংরেজদের নিকট হইতে অধিকার প্রত্যাশা করে, তখনই ইংরেজের মহৎ মনুষ্যত্বের প্রতি আমাদের গভীর আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। আসল কথা সমস্ত বক্তৃতাটি ইংরেজকে সম্মুখে রাখিয়াই কথা বলা; অর্থাৎ কন্‌গ্রেসের প্রথম যুগের রাজনীতিক আদর্শ-অনুযায়ী মত এই বক্তৃতায় ব্যক্ত হইয়াছিল। ভারতের অভাব-অভিযোগ ইংরেজকে বুঝাইবার দিকেই রাষ্ট্রনীতির সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইত। "ইংরাজেরই মহৎ উজ্জ্বল অপূর্ব নিঃস্বার্থ প্রীতি কন্‌গ্রেসের মর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া তাহাকে অলৌকিক বলে বলীয়ান করিতেছে।" এই ছিল তখনকার রাজনীতিকদের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বলিতেছেন, "তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব হইয়া থাকিতাম।" এই বক্তৃতায় কন্‌গ্রেসের তৎকালোচিত মনোভাব ও

রবীন্দ্রনাথের কন্‌গ্রেস-প্রীতির কথাই স্পষ্ট হইয়াছে; তিনি বলিলেন, "কন্‌গ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না।"[১] কন্‌গ্রেসের তখন পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে।

এই প্রবন্ধ লিখিবার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "যখন 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধটি লিখেছিলুম তার পরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে, তাই এ লেখাটি এখনকার মনের মাপে মিলবে না। দুই কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচাতুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চি কয়েক লম্বা করে দেবার জন্যে। আজ বলচি দাঁড়ও নয় শিকলও নয় পাখা মেলব অবাধ স্বারাজ্যে। তখন সেই ইঞ্চি-দুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে।"[২]

কিন্তু এই রাজনীতিক উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস কোথায় গেল? কয়েকদিনের মধ্যে কবিকে দেখি শান্তিনিকেতনে। ১২৯৭এ শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেটি হয় ১২৯৮, ৭ই পৌষ। নিকটে কোনো ঘরবাড়ি ছিল না, এখনকার গাছপালাগুলির শিশু অবস্থা। কবি একলা দোতলার বাড়িতে আছেন, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক, নূতন পটভূমে কল্পনাবিলাসী মনের নবতর বিচরণভূমি। বহুকাল পরে লিখিলেন কয়েকটি লিরিক্, 'ভালো করে বলে যাও' (৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭), মেঘদূত[৩] (৮ই জ্যৈষ্ঠ), অহল্যার প্রতি (১২ই জ্যৈষ্ঠ)।

শান্তিনিকেতনে এই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রীষ্মযাপন। জ্যৈষ্ঠ মাসেও কালবৈশাখীর ঝোড়ো খেলার শেষ হয় নাই, কবির নূতন অভিজ্ঞতা। তিনি প্রমথ চৌধুরীকে চুয়োডাঙাতে লিখিতেছেন, "এখানে আজকাল ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এ জায়গাটা ঠিক ঝড়বৃষ্টিরই উপযুক্ত। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখতে পাওয়া যায়, ঝড় সমস্ত মাঠটাকে আপনার হাতে পায়— বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়।· ·মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি— সুতরাং চতুর্দিকের ঝড় এরই উপরে এসে পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে,· ·বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখি নি। এখানকার লাইব্রেরিতে[৪] একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্লে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে— কেবল পড়া নয়— সেটার উপর ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি।"[৫] ·

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার

১ ১২৯৭ পৌষ (১৮৯০ ডিসেম্বর) কলিকাতা কন্‌গ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি ফিরোজ শাহ মেহতা, রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিদের যুক্ত ফোটো আছে।

২ পত্র। ১৯৪০ জানুয়ারি ৫। শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ মাঘ, পৃ ৪৭৫।

৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ (১৮৯০ মে ২১) শান্তিনিকেতন। মেঘদূত (প্রবন্ধ) সাহিত্য ২য় বর্ষ ১২৯৮ অগ্রহায়ণ, পৃ ৩৬৪-৩৬৮। দ্র. প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫।

৪ লাইব্রেরি—মহর্ষি শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া অতিথিশালায় একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার পত্তন করেন। এখানে সেই লাইব্রেরির কথা বলা হইতেছে। সেই আশ্রম-লাইব্রেরির ছাপ দেওয়া বই এখনো বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে আছে।

৫ পত্র। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, [১৮৯০ মে ২৪ (১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ১১)]। সবুজপত্র ১৩২৪ শ্রাবণ। চিঠিপত্র ৫। দ্র. মানসী, মেঘদূত।

খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।
অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত · ·

বোলপুর হইতে শিলাইদহ যান— কলিকাতায় বেশিদিন থাকেন নাই। ৩রা জুন (১৮৯০) শিলাইদহ হইতে প্রমথ চৌধুরীকে একখানি পত্রে তিনি জানাইতেছেন তিনি জর্মান ভাষায় মূল ফাউস্ট (*Faust*) পড়িতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখ করিয়া লিখিতেছেন, "পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ত প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্মান্ ভাষা বুঝে ওঠা কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।"[১] জমিদারিতে বাসকালে সাহিত্যসাধনা করিবার জন্য তাঁহাকে ফুরসতের জন্য কি পরিমাণ সংগ্রাম করিতে হয়। তাহার একটু আভাস পাই আর-একখানি পত্রে। "ক্ষণিক অবসরে একরকম শ্রান্ত মুহ্যমান মস্তিষ্কে বিছানায় পড়ে পড়ে নিতান্ত অলসভাবে লিখে যাই।"[২] এই পত্র হইতে জানিতে পাবা যায় 'অনঙ্গ-আশ্রম' নামে কি একটা লেখা লিখিবেন। নাম দেখিয়া বোঝা যায় না, তবে 'চিত্রাঙ্গদা'রই খসড়া মনে হয়। ঐ নাটকের প্রথম দৃশ্যের নাম অনঙ্গ-আশ্রম।

এইবার বোলপুর থেকে কলিকাতায় ফিরিবার সময় তাঁহার মনের মধ্যে যে-ভাবনা আসিয়াছিল, তাহাই 'চিত্রাঙ্গদা'য় রূপ পাইল। রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে চিত্রাঙ্গদার সূচনায় কবি লিখিতেছেন, "রেললাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে— তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে· ·তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়· ·।

"এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী।"· ·এই কাহিনী "মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল," সেটা 'অনঙ্গ আশ্রম' নামে খসড়া করলেন। কয়েক মাস পরে উড়িষ্যায় তার প্রথম রূপ দেন (১২৯৮ ভাদ্র ২৮)।

বিলাতে দ্বিতীয় বার। মানসীর শেষপালা

১২৯৭ শ্রাবণের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথকে আবার সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট যাইতে দেখি। সেবার সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ ছুটি লইয়া বিলাত যাইতেছেন; রবীন্দ্রনাথ তখন ঠিক করিলেন তাঁহার সঙ্গে তিনিও বিলাত যাইবেন। সোলাপুরে যে-কয়দিন ছিলেন, তিনটি কবিতা লেখেন— গোধূলি (১ ভাদ্র), উচ্ছৃঙ্খল (৫ই) ও আগন্তুক (৬ই)। শেষ কবিতা দুটি লিখিবার দুইদিনের মধ্যে বোম্বাই হইতে বিলাত যাত্রা করেন (১৮৯০ অগস্ট ১২)।

১ চিঠিপত্র ৫। ৩ জুন ১৮৯০।

২ চিঠিপত্র ৫। শিলাইদা ২১ জুন ১৮৯০ (৮ আষাঢ় ১২৯৭)।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিতারাজির মধ্যে যে-বিষাদসুরের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি তাহার রেশ এখনো মিটে নাই; তাঁহার চঞ্চল মন কোথাও যেন তৃপ্তি পাইতেছে না। কিসের শ্রান্তি, কিসের ক্লান্তি, কিসের বিষাদ— তাহা বাহির হইতে আবিষ্কার করা যায় না। 'গোধূলি'তে কবি চাহিতেছেন 'আয়, নিদ্রা, আয় ঘনাইয়ে শ্রান্ত এই আঁখির পাতায়।'· ·

হৃদয়ের হত আশা যত
অন্ধকারে কাঁদিয়া বেড়ায়।
আয় শ্রান্তি, আয় রে নির্বাণ,
আয় নিদ্রা, শ্রান্ত প্রাণে আয়!
এত হতাশ্বাস কেন।

'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতায় আকুলভাবে বলিতেছেন—

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ
কেন গো অমন করে?
তুমি চিনিতে নারিবে, বুঝিতে নারিবে মোরে।
কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরান মম
বিধাতার এক অর্থবিহীন
প্রলাপবচন সম।· ·
জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ,
অনিয়ম শুধু আমি।
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে,
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধ'রে দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী—
শুধু আমি নিজ বেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী।

এই কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, ইহা যে কেবল কাব্য নহে, ইহা যে কবির অন্তরের কথা তাহা তাঁহার চঞ্চল জীবনপ্রবাহের দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়। 'আগন্তুক' কবিতার মধ্যেও সেই অভিমান, সেই অভিযোগ; ইহা "উচ্ছৃঙ্খল'এর পরিপূরক কবিতা। প্রথমটিতে আছে—

কোথাকার এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া
সৃষ্টিছাড়া এ ব্যথা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
অজানা আঁধার-সাগর বাহিয়া

মিশায়ে যাইবে কোথা!
এক রজনীর প্রহরের মাঝে
ফুরাবে সকল কথা।

দ্বিতীয়টিতে আছে—

কী বলিতে গিয়ে বলিল না আর,
দাঁড়িয়ে রহিল দ্বারে—
দীপালোক হতে বাহিরিয়া গেল
বাহির-অন্ধকারে।
তার পরে কেহ জান কি তোমরা
কী হইল তার শেষে?
কোন্ দেশ হতে এসে চলে গেল
কোন্ গৃহহীন দেশে।

উভয় কবিতাই সোলাপুরে রচিত। দুই দিন পরে কবি 'অকূল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া'। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন লোকেন পালিত।[১] লোকেন পালিত রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু, যৌবনের সুহৃৎ, সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচক; কিন্তু চরিত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথের বিপরীত লোকে ছিল তাঁহার বাস। বোম্বাই হইতে 'শ্যাম' (Siam) জাহাজে রওনা হইলেন। স্বল্পপরিসর জলযানের মধ্যে মানুষের সর্ববিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যদানের জন্য কী অপরিসীম চেষ্টা চলিতেছে, কী নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত সমস্ত কাজকর্ম সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে— এই ঘটনাগুলি জাহাজে উঠিলেই কবির মনে হয়। এবারও একটা কথা মনে হইতেছে, "অভাব যত অধিক, জীবিকাসংগ্রাম যত দুরূহ, সভ্যতা যত জটিল, মানবমনের বিচিত্র বৃত্তির আলোড়ন ততই বেশি।" এর পরে তিনি লিখিতেছেন, "দুর্বলের জন্য সুখ নয়— সুখ বলসাধ্য, সুখ দুঃখসাধ্য।— মানসিক জীবনে সুখ· ·আমাদের দাহ করে।"[২] কথাগুলি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার পশ্চাতে একটি বিরাট ঐতিহাসিক তত্ত্ব রহিয়াছে। বহুকাল হইতে মানুষ জানিয়া আসিয়াছে যে নদীমাতৃক দেশই আদিমানবসভ্যতার উৎসকেন্দ্র; কিন্তু এখন পণ্ডিতেরা বলিতেছেন the beautiful is difficult— সুন্দরের সাধনা কঠিন; high quality involves hard work—কঠিন শ্রমদান না করিলে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায় না।

জাহাজে সী-সিকনেস প্রভৃতিতে যেভাবে কষ্ট পান, তাহার যে-রসবর্ণনা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে লিখিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে যাহাই লিখুন, মানুষ রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে যেটি লিখিতেছেন, সেইটি মনের কথা। সমুদ্র-পীড়ার সময়ে বাড়ির কথা খুবই মনে হইতেছিল; স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হল আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যোড়াসাঁকোয় গেছে।· ·যখন ব্যামো নিয়ে পড়েছিলুম তোমরা আমাকে মনে করতে কি? তোমাদের কাছে ফেরবার জন্যে ভারি মন ছটফট্ করত। আজকাল কেবল মনে হয়

১ লোকেন পালিত ত্রিপুরায় অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, ২৩ জুলাই ১৮৯০ ফার্লো গ্রহণ করেন। ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় ত্রিপুরায় যান।

২ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৬ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃ. ১১।

বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই— এবার বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়ব না।"[১] দেশ হইতে বাহির হইবার জন্য যেমন ব্যস্ততা, বাহির হইয়াই ঘরে ফিরিবার জন্য তেমনি ব্যাকুলতা।

এডেনে পৌছাইলেন। "জ্যোৎস্না রাত্রি।··নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্য-বিজড়িত অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন-মরীচিকার মতো লাগচে। এমন সময়ে শোনা গেল এখনই নূতন জাহাজে চড়তে হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। ক্যাবিনের মধ্যে স্তূপাকার বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র যেমন তেমন করে চর্মপেটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে তার উপরে তিন-চার জনে দাঁড়িয়ে নির্দয়ভাবে নৃত্য করে বহুকষ্টে চাবি বন্ধ করা গেল।"[২] কল্পনায় দৃশ্যটি উপভোগ্য! অস্ট্রেলিয়ান যাত্রী-জাহাজ 'ম্যাসীলিয়া'তে সকলে গিয়া উঠিলেন। জাহাজখানি খুবই বড়ো এবং ভিড়ও বেশি। জাহাজের জনতা তাঁহাকে বিব্রত করে। তিনি একখানি পত্রে লিখিতেছেন—"নীচেকার ডেকে বিদ্যুতের প্রখর আলোক, আমোদপ্রমোদের উচ্ছ্বাস, মেলা-মেশার ধুম, গান-বাজনা এবং কখনো ঘূর্ণীনৃত্যের উৎকট উন্মত্ততা। এদিকে আকাশের পূর্বপ্রান্তে ধীরে ধীরে চন্দ্র উঠছে, তারাগুলি ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে, সমুদ্র প্রশান্ত ও বাতাস মৃদু হয়ে এসেছে; অপার সমুদ্রতল থেকে অসীম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা, এক অনির্বচনীয় শান্তি নীরব উপাসনার মতো ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আমার মনে হতে লাগল, যথার্থ সুখ কাকে বলে এরা ঠিক জানে না। সুখকে চাবকে চাবকে যতক্ষণ মত্ততার সীমায় না নিয়ে যেতে পারে ততক্ষণ এদের যথেষ্ট হয় না। প্রচণ্ড জীবন ওদের যেন অভিশাপের মতো নিশিদিন তাড়া করছে; ওরা একটা মস্ত লোহার রেলগাড়ির মতো চোখ রাঙিয়ে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, হাঁপিয়ে, ধুঁইয়ে, জ্বলে, ছুটে প্রকৃতির দুইধারের সৌন্দর্যের মাঝখান দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে চলে যায়। কর্ম বলে একটা জিনিস আছে বটে কিন্তু তারই কাছে আমাদের মানবজীবনের সমস্ত স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার জন্যেই আমরা জন্মগ্রহণ করি নি— সৌন্দর্য আছে, আমাদের অন্তঃকরণ আছে, সে দুটো খুব উঁচু জিনিস।"[৩]

জাহাজখানি য়ুরোপের মধ্যধরণী-সাগরে প্রবেশ করিয়া আইওনিয়া দ্বীপাবলির ভিতর দিয়া গেল। ব্রিন্দিসিতে নামিয়া পূর্ববারের ন্যায়ই ইতালির মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ও বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে করিতে অবশেষে প্যারিসে পৌছাইলেন। প্যারিসে একদিন থাকা হয়, ইহারই মধ্যে সদ্যনির্মিত (১৮৮৯) বিখ্যাত ঈফেল তোরণের উপর উঠিয়া (৯৮৪ ফুট) মহানগরীর উপর চোখ বুলাইয়া লইবার অবকাশ করিয়া লইলেন।

লণ্ডনে পৌছাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোরের পরিচিত লণ্ডনকে খুঁজিতে গেলেন। এ যেন 'খুঁজিতে গেছিনু কবে· ·মোর পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে'; পূর্বে যে-বাড়িতে স্কট-পরিবার থাকিত, বোধ হয় সেই বাড়িতে যান, কিন্তু সে-বাড়িতে তখন অন্য ভাড়াটিয়ারা থাকে। "মনে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেচি।··আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-সুদ্ধ আর-সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেছে। তবে তো সেই সমস্ত জানা লোকেরা আর কেহ কারো ঠিকানা খুঁজে পাবে না! জগতের কোথাও তাদের আর নির্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না!··একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি; আমার সেই গাছগুলো কত বড় হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই আর একটা ঘর।[৪]··পুরাতনের স্মৃতি কল্পনার

১ [২৯ আগষ্ট, ১৮৯০] চিঠিপত্র, প্রথম খণ্ড।

২ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

৩ গঙ্গাতীর, গ্রন্থপরিচয় জীবনস্মৃতি ১৩৬১ সংস্করণ।

৪ য়ুরোপ-যাত্রী, বিচিত্র প্রবন্ধ প্রথম সংস্করণ।

রঙে রঙিন হইয়া তাঁহার অন্তরে বাস করিতেছিল; কিন্তু বাহিরের জগতে আজ যেমন পরিবর্তন অন্তরের জগতেও পরিবর্তন কম হয় নাই; কবি সেই দীর্ঘ বারো বৎসরের ব্যবধানকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রথমজীবনের রঙিন জীবনকে খুঁজিতেছিলেন!

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি, আর্টিস্ট; তিনি জীবনকে দেখেন সৌন্দর্যের চোখে, নীতির শুষ্কতার মধ্যে নহে। তাই তাঁহাকে একদিন ডায়ারিতে লিখিতে দেখি "এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই।··এবং শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত চিন্তিত হবেন, প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন। কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে— সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। তাই যদি না লাগত বিধাতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে হাসা মানুষের যেন একটি পরমাশ্চর্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ওই হাসিটা এদেশে কিছু বাহুল্য পরিমাণে পেয়ে থাকি।"[১] ইহার কারণ ছিল; রবীন্দ্রনাথ এবার যখন বিলাতে যান ইংরেজি-পোশাক পরেন নাই, অর্থাৎ কলার নেকটাই টুপি ব্যবহার করেন নাই, গলাবন্ধ কোট ও মাথায় পিরালি টুপি। ইহার উপর ছিল সামান্য লম্বা চুল ও অল্প অল্প দাড়ি। সমস্তটা মিলিয়া লণ্ডনবাসী আধুনিকাদের কাছে একটা অদ্ভুত মনে হইত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন তাঁহার নিজস্ব পোশাক ত্যাগ করিয়া বিলাতী পোশাক পরেন নাই। ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য ও বিলাস দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের অভিজাত মন যেমন মুগ্ধ, তেমনই ঐ সকল রাজসিকতার পশ্চাতে যে-গভীর দুঃখ লোকচক্ষুর আপাত-অন্তরালে অদৃশ্য, তাহা তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিতেছে না। তিনি একদিনের ডায়ারিতে লিখিতেছেন (১৮৯০ সেপ্টেম্বর ১৯), "ভেবে দেখলে এর একটা অন্ধকার দিক আছে— Song of the Shirt[২] পড়লে তা টের পাওয়া যায়— এই সুখ-সমৃদ্ধির অন্তরালে কি অসহ্য দারিদ্র্য আপনার জীবনপাত করছে— সেটা আমাদের চোখে পড়ে না— কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসেব জমা হচ্চে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই।··আমাদের ভারতবর্ষে অনাদৃত দুর্বল অজ্ঞান বহু যত্নলব্ধ জ্ঞানকে বিনাশ করেছে। যদি সভ্যতা আপনাকে রক্ষা করতে চায় তো প্রতিবেশীকে আপনার সমান করে তুলুক। দুটো শক্তি যত এক সঙ্গে সাম্যরক্ষা করে কাজ করে ততই মঙ্গল— যেমন আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ— স্বার্থ এবং পরার্থ— আপনার উন্নতি ও চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি— নইলে চতুষ্পার্শ্বে তার প্রতিশোধ তোলে— বর্বরতা সভ্যতাকে ধ্বংস করে। আমার ত সেইজন্যে মনে হয়— আশ্চর্য নেই যে ভবিষ্যতে কাফ্রিরাই য়ুরোপ জয় করবে— কৃষ্ণ অমাবস্যা দিনের আলোকে গ্রাস করবে— আফ্রিকা থেকে রাত্রি এসে য়ুরোপের শুভ্র দিনকে আচ্ছন্ন করবে।··আলোকের মধ্যে ভয় নেই, কেননা তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে আছে— কিন্তু যেখানে অন্ধকার জমা হচ্চে, বিপদ সেইখানেই গোপনে বল সঞ্চয় করছে— সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি!"[৩] রবীন্দ্রনাথ এ কথাগুলি যখন লেখেন তখন সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের বুলি পথে-ঘাটে শোনা যাইত না। আর কালো আফ্রিকাও যে একদিন জাগিবে সে কথা তখন কেহ কল্পনা করে নাই; তিনি উহার আভাস স্পষ্ট ভাবেই দিয়াছিলেন। সেই কালো আফ্রিকার ভয়ে আজ দক্ষিণ-আফ্রিকায় শ্বেতকায় বুয়রদের এত আইন, পূর্ব-আফ্রিকায় মাউ-মাউদের উচ্ছেদের জন্য এত চেষ্টা।

প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখিতেছেন (৬ অক্টোবর ১৮৯০), "আমি আর এখানে পেরে উঠছি নে··আমার এখানে ভালো লাগছে না। অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।··এখন আমি

১ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১।

২ Song of the Shirt— লেখক ইংরেজ কবি টমাস হুড্ (Thomas Hood, ১৭৯৯-১৮৪৫)। Punch পত্রিকায় এই কবিতাটি ১৮৪৩-এ খ্রীষ্টমাস সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় দরিদ্রের ক্রন্দন যেন আর্তনাদে ফাটিয়া পড়িতেছে।

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র, পৃ. ১৫৮।

বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই।”

৭ই অক্টোবর ‘টেমস্’ জাহাজে ফিরিবার জন্য ক্যাবিন ঠিক করিয়া ৯ই রওনা হইলেন। এই দিনই একখানি পত্রে ইন্দিরা দেবীকে যাহা লিখিতেছেন, তাহা নিজের এই খামখেয়ালির সমর্থন মাত্র “মানুষ কি লোহার কল যে ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে। মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা, তার এত দিকে গতি এবং এত রকমের অধিকার যে এ দিকে ও দিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই তো আমাদের জীবনের গতিশক্তি— সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ-পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে।”—ছিন্নপত্র। লণ্ডন। ১০ই অক্টোবর ১৮৯০।

অকস্মাৎ বিলাত যাইবার কারণও যাহা, অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিবার কারণও তাহাই; সেটি হইতেছে নিজ মনের অস্থিরতা। দেশ হইতে বাহির হইবার সময় মনে হইয়াছিল দূরে সুদূরে— বহুদূরে যাইতে পারিলেই বুঝি মনে শান্তি আসিবে! কিন্তু বহুদূরও নিকটে আসে, ভবিষ্যৎও বর্তমানে উপনীত হয়; বাস্তবের রূঢ় আঘাতে স্বপ্নলোক ভাঙিয়া যায়। বিলাতযাত্রা সেই উদ্দেশ্যহীন আশাহীন কর্মহীন জীবনের একটি উপসর্গ মাত্র।

ফিরিবার সময় মলটাদ্বীপ ও তথাকার বিখ্যাত catacombগুলি দেখিলেন। লণ্ডনে জাহাজে চড়িবার এক মাস পরে বোম্বাই পৌঁছাইয়া দুই দিন পরে কলিকাতায় ফিরিলেন। রবীন্দ্রনাথ ২২ অগস্ট বোম্বাই হইতে যাত্রা করেন; ১০ সেপ্টেম্বর লণ্ডন পৌছান; ৯ অক্টোবর লণ্ডন ছাড়েন ও ৩ নভেম্বর রাত্রে বোম্বাইএ জাহাজ পৌছায়।

বিলাত বাসকালে ‘বিদায়’ নামে একটি মাত্র কবিতা লেখেন; তবে ফিরিবার সময় রেড্ সীতে চারিটি কবিতা রচনা করেন— সন্ধ্যায় (৭ কার্তিক ১২৯৭) শেষ উপহার (৯ কার্তিক) মৌনভাষা (১০ কার্তিক) আমার সুখ (১১ কার্তিক)। ইহার মধ্যে ‘শেষ উপহার’ কবিতাটি লোকেন পালিতের কোনো ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ।

মানসী কাব্যগুচ্ছের এই কয়টিই শেষ কবিতা। সকল কবিতার মধ্যে সেই একই বেদনা, সেই একই অভিযোগ যে তিনি নিঃসঙ্গ, তিনি ভরা মনে দিতে চান, নিতে কেহ নাই। কবি কাহার উদ্দেশে ‘আমার সুখ’ কবিতায় বলিতেছেন—

দেখিতে পাও নি যদি, দেখিতে পাবে না আর,
মিছে মরি বকে।
আমি যা পেয়েছি তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনোখানে সীমা নাই ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি,
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই,
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা কই!

বিলাত হইতে ফিরিবার অল্পকালের মধ্যেই 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল (১২৯৭ পৌষ ১০)। ১২৯৭ সালের গোড়ার দিকে বোধ হয় কবিতাগুলি ছাপিবার উদ্দেশ্যে 'উপহার' কবিতাটি লেখেন (১২৯৭ বৈশাখ ৩০)। উপহারটি কাহার উদ্দেশে লিখিত তাহা জানা যায় না; অনুমানের আশ্রয় লইয়া বলিতে ইচ্ছা হয় এই 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'উপহার' কবিতাটি তাঁহার পত্নীর উদ্দেশে রচিত। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন যথার্থ মূর্তি লইতে আরম্ভ করে এই সময়ে। মানবী ও মানসীর মধ্যে প্রভেদ সামান্যই। বাহিরের দৈনন্দিন জীবনে যে-নারীকে পাওয়া যায়, তাহাকে দেখা যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দিয়া; সংসারজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে, তুচ্ছতায় এই প্রেমের জীবন ম্লান হইয়া যায়; প্রতিদিনের মানবী ক্রমে সাধারণ মানুষের কাছে হয় দানবী, না-হয় দেবী হয়। কিন্তু কবির কাছে সে হয় মানসী, নৈর্ব্যক্তিক নারীর পরিশুদ্ধ প্রেম অভিসারে সার্থক হয়। 'মানসী' কবিতাগুচ্ছ মানবী প্রেমকে sublimate করিয়া প্রেমের নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মানবীর ভালোবাসা মানসীর প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে; তাই আমাদের মনে হয় এই কাব্যখানি কবি তাঁহার স্ত্রীকেই উপহার দেন।

> সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর,—
> ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা।
> বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
> জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
> এ চির-জীবন তাই আর-কিছু কাজ নাই
> রচি শুধু অসীমের সীমা;
> আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
> গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে আমরা বিশেষ কোনো যুগের বিশেষ মনোভাবাঙ্কিত রূপে পাই না; মোটামুটি ভাবে বলা হয় ইহাদের মধ্যে একটা বিষাদমাখা নৈরাশ্য ফুটিয়াছে। গ্রন্থের আরম্ভ হয় ১২৯৪এর বৈশাখে, ১২৯৭এর বৈশাখে 'উপহার' লিখিয়া বইখানি ছাপাইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু তখন ছাপানো হয় নাই। বিলাত হইতে ফিরিবার পর ১২৯৭এর মধ্যে রচিত কবিতাগুলি সংযোজন করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। এই দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে কবির জীবনের ও মনের ইতিহাস প্রভূত পরিবর্তিত হইয়াছিল। মনে হয় তজ্জন্যই এই কাব্যের মধ্যে বিচিত্র ছন্দ ও বিবিধ রসের সমাবেশ ঘটিয়াছে। সেইজন্য মোহিতচন্দ্র সেন 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) মানসীর কবিতাগুলিকে নানা ভাবানুসারে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাজাইয়াছিলেন; অবশ্য কবির অনুমোদনেই তাহা সম্পন্ন হয়। মানসীর যুগের মধ্যে মায়ার খেলা, রাজা ও রানী এবং বিসর্জন রচিত হয়।

মানসী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে উহা যে বাংলা সাহিত্যে একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য এ কথা সর্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল। এই কাব্যখানি যে কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে নূতন পন্থার প্রবর্তক তাহা নহে— উহা সমসাময়িক বাংলা কাব্যের পক্ষেও রীতির দিক দিয়া নূতন আদর্শ স্থাপন করিল।[১] এ কথা নিশ্চিত যে বাংলা ছন্দের নূতন মুক্তির পথ মানসীই সর্বপ্রথম বাঙালি কবিদের কাছে ধরিয়াছিল। তাঁহার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে

১ প্রিয়নাথ সেন, মানসীর সমালোচনা। দ্র. প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি (১৩৪০), পৃ. ১৮-৪৭।

পূর্ণ মূল্য দিয়া ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। মানসীতে কবির ছন্দেরও নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করে।[১]

সে যুগের কবিদের মধ্যে নামডাক ছিল অনেকেরই, যেমন দেবেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, সরোজকুমারী দেবী, বনোয়ারিলাল গোস্বামী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের নাম করিলাম না, কারণ তাঁহাদের স্থান সাহিত্যে সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আজ বাঙালি এইসব কবিদের সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন হইয়াছে। কিন্তু সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে কেহই সাহসী হন নাই। সমসাময়িকের চোখে রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যগুচ্ছ কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা গিরীন্দ্রমোহিনীর 'মানসী এবং রাজা ও রানী'-প্রবন্ধ পাঠেই বুঝা যায়। লেখিকা মানসী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "মানসী পাঠ করিতে করিতে চোখের সম্মুখে যে একখানি স্বপ্নরাজ্য ভাসিয়া আসে··ইহাতে যেন আধ-আলো আধ-ছায়া, আধ-স্বর্গ আধ-মর্ত্য দেখিতেছি।" মানসী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে সমস্ত কবিতাগুলিকে একত্র দেখিতে পাইয়া উহাদের যথার্থ একটা রূপ ও সুর যেন কবিও দেখিতে পাইলেন ; তাই এখন কবিতাগুলিকে সমালোচকের চোখে দেখিতেছেন।

এই সময়ে তাঁহার তরুণ বন্ধু প্রমথ চৌধুরী[২] তাঁহাকে এক পত্রে জানান যে মানসী কবিতাগুচ্ছের মধ্যে despair ও resignation-এর ভাবটাই প্রবল হইয়া ফুটিয়াছে। সেই পত্রের উত্তরে[৩] রবীন্দ্রনাথ যাহা লেখেন তাহা মানসীর একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা হিসাবে পঠনীয়। "মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছ যে, তার মধ্যে একটা despair এবং resignation -এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। প্রতিদিনই আমি দেখতে পাচ্চি নিজের রচনা এবং নিজের মন সম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমি বের করতে চেষ্টা করছিলুম এই despair এবং resignation-এর মূলটা কোন্‌খানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল— হতেও পারে, আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন এক-একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলচে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর-একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করচে— সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা আর একদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি তার উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার

১ দ্র. কবি-লিখিত মানসীর ভূমিকা। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে দু-চারটি কথা, পরিচয় ১৩৪২ শ্রাবণ। আবদুল কাদের, বাংলা ছন্দ ও ভারতচন্দ্র—দেশ, ৯ম বর্ষ ১৩৪৮, ২৮ চৈত্র, পৃ. ৪১৭-১৯।

২ প্রমথ চৌধুরী হইতেছেন আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা। আশুতোষের সহিত যখন ঠাকুরবাড়ির বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় (১৮৮৬) তখন প্রমথনাথ কলেজের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের সহিত বাক্যালাপের সাহস ও শক্তি তখন হয় নাই। ১৮৯০ সালে তিনি এম. এ. পাস করেন, তাহার পূর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ হয় ; কলিকাতায় আসিলেই উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ হইত। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ এই তরুণ যুবকের মধ্যে সাহিত্যের প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং প্রমথবাবুর সমালোচনাশক্তিকে তখন শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং সদ্যপ্রকাশিত 'মানসী' কাব্যখণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা-পত্র পাইয়া কবি তাহার যথাযথ উত্তর দান করিলেন। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৩ সবুজপত্র, ৫ম বর্ষ, ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড ১৮৯১ জানুয়ারি ২৯ (১২৯৭ মাঘ ১৭)।

প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য। এটা তোমার কি রকম মনে হয়? তুমি কিভাবে দেখ সেটা আমাকে একটু পরিষ্কার করে লিখো— তোমাদের দ্বারা আমার নিজেকে দেখতে চেষ্টা করা দুরাশা — কারণ আমার প্রতি মুহূর্তই আমার নিজের কাছে এমনি জীবন্ত এবং বলবান যে, মোটের উপরে আমি যে কী তা দেখতে পাই নে, আমি যখন আমার কাব্য সমালোচনা করতে চেষ্টা করি তখন বর্তমান মুহূর্তটাই ক্রিটিক হয়ে বসেন, কিন্তু তার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়; তোমরা যখন সমালোচনা কর তখন আমার পূর্বের সঙ্গে পর এবং একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখতে পার।" আর একখানি পত্রে লিখিলেন, "ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে মানসীর ভালোবাসার অংশটুকুই কাব্য-কথা— বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র— ওর আসল সত্যিকথাটুকু হচ্ছে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিচ্ছু জানে না। মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মতো অসীম ক্ষমতা নেই। তাই আকাঙ্ক্ষারাজ্যে বসেই অর্ধ-নিরাশ্বাসভাবেই কল্পনাপুত্তলী গড়িয়ে তাকে পুজো করছে। একেই বল ভালোবাসা? আমার ভালোবাসার লোক কই। আমি ভালোবাসি অনেককে— কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেচি সে মানসেই আছে— সে artist-এর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?" — চিঠিপত্র ৫ম।

এই বৎসর গদ্য রচনা খুব কমই চোখে পড়ে। যা-কিছু লেখেন তা সব ছাপাও হয় নাই। য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি[১] ১২৯৮ সাধনায় প্রকাশিত হয়। পারিবারিক স্মৃতিপুস্তকে[২] যে-গুটিচার লেখা চোখে পড়ে, সেগুলি ভাঙিয়া-চুরিয়া পরে "পঞ্চভূত" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি— ভূমিকা

বিলাত হইতে ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারির কার্যভার গ্রহণ করিয়া উত্তরবঙ্গে যাত্রা করিতে হইল। গত কয়েক বৎসর হইতে মাঝে মাঝে জমিদারি পরিদর্শনের জন্য স্থানে স্থানে যাইতে হইতেছিল বটে, কিন্তু পরিচালনার ভার তখনো তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় নাই। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর পর জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে রাজ-কার্যোপলক্ষে ব্যাপৃত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী-বিয়োগের পর সাংসারিক কাজকর্মে বীতস্পৃহ; হেমেন্দ্রনাথ মৃত; বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ বায়ুরোগগ্রস্ত। সুতরাং জমিদারির কাজকর্ম হয় জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ, নাহয় কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের উপর বর্তাইতে বাধ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক ও কবি; তাঁহার পক্ষে বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশুনা করা অসম্ভব ছিল; সুতরাং পরিচালনাভার তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর গিয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার হাতে এস্টেটের কাজকর্ম অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায়। জমিদারির তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার অবশেষে রবীন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়িল; তখন ঠাকুর-এস্টেট সমস্তই এজমালিতে ছিল, সুতরাং খুবই বড় জমিদারি।

১ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি সাধনায় খুবই কাটাকাটি করিয়া মুদ্রিত হয়। বহু বৎসর পরে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (১৩৫৬) ইহার মূল পাঠটি প্রকাশিত হয়। ৮ম বর্ষ ১৩৫৬ পৃ. ১-১৮; পৃ. ১৫৬-১৬৭; পৃ. ২২৩-২২৮। ৯ম বর্ষ ১৩৫৭ পৃ. ৫-১৫; পৃ. ৭৩-৮৫।

২ পারিবারিক স্মৃতিলিপির যে-কয়টি রচনা এই সময়ের তাহার তালিকা—১ "কাব্যের আসল জিনিস…" (দীর্ঘ প্রবন্ধ) বির্জিতলাও। ১২ই জানুয়ারি ১৮৯১ (২৯ পৌষ ১২৯৭) ২ "Natural Selectionএর নিয়ম……"বির্জিতলাও। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ (১৪ ফাল্গুন ১২৯৭) ৩ "ঘানির বলদ যদি মনে করে…"বির্জিতলাও। ৬ এপ্রিল ১৮৯১ (১৪ চৈত্র ১২৯৭) ৪ "মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময় মনে হয়" ৬ই এপ্রিল ১৮৯১। দ্র. পারিবারিক স্মৃতিলিপি, আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা ১৩৬২, পৃ. ৯-১৬, শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে জীবনের কোনো কঠিন দায় বা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। সাহিত্যজীবনের বিচিত্র মাধুর্যের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিপুল জমিদারি তদারকের কাজ। কিন্তু কবি হইলেও তাঁহার সহজ বুদ্ধি এত প্রখর ছিল যে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার সহিত নূতন কর্তব্যকে মানাইয়া লইলেন; শুধু এই কাজকেও মানাইয়া লইলেন না, যেমন নিজের পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি ছোটোখাটো খুঁটিনাটি কাজকর্ম পালন করিতেছিলেন তেমনি নিপুণভাবেই সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বিষয় ছিল, কিন্তু বৈষয়িকতা ছিল না; তাই বলিয়া বিষয়-বুদ্ধির অভাবও ছিল না। বিষয়বুদ্ধি না থাকিলে— বিদেশে পিতা দ্বারকানাথের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুর পর যুবক দেবেন্দ্রনাথ যে-ভাবে উত্তমর্ণদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রায় হৃতসর্বস্ব হইয়াছিলেন তাহা উদ্ধার করিয়া পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। পিতায় সমস্ত ঋণ, এমন কি পিতার প্রতিশ্রুত দানের টাকা সুদ সমেত পরিশোধ করিয়াছেন; তার পর ধীরে ধীরে আবার সম্পত্তি গড়িয়া তোলেন। দেবেন্দ্রনাথের আদেশে রবীন্দ্রনাথকেও বাইশ বৎসর বয়স হইতে কলিকাতার সেরেস্তায় বসিয়া জমিদারির কাজকর্ম শিখিতে হইয়াছিল; সামান্য কেরানী হইতে উচ্চতম নায়েবদের কাজ সমস্তই তাঁহাকে শিখিতে হয়। বুদ্ধিমান যুবক কবি হইলেও জানিতেন যে প্রজার অন্নে তাঁহারা লালিত-পালিত হইতেছেন, সুতরাং সেখানে অনবধানতা আসিলে জীবিকায় টান পড়িবে; তাই অতি নিষ্ঠার সহিত সমস্ত কাজ শিক্ষা করিয়া লন। পূর্ববঙ্গের কোনো জমিদারের মুখে শুনিলাম যে, জমিদারি বিদ্যায় ও বিষয়বুদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য জমিদার সে যুগে ছিল না।

জীবনের দিক হইতে এই ঘটনাটি খুবই বড়। বাস্তবকে প্রকৃতির সহিত জীবনে মিশাইয়া এমন নিবিড়ভাবে পাইবার সুযোগ ইতিপূর্বে হয় নাই। প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া বিশ্বের সৃষ্টিসৌন্দর্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছিলেন, মানুষকে তেমন নিবিড়ভাবে পাইবার সুযোগ লাভ করেন নাই। জমিদারি পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া তিনি হাসিকান্না সুখদুঃখ-ভরা মানুষকে তাহার যথার্থস্থানে দেখিতে পাইলেন। উত্তরবঙ্গে বাস করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল— মানুষকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে হৃদয়াবেগের আতিশয্য এ যুগে বহুল পরিমাণে মৃদু হইয়া আসিল; পদ্মা তাঁহার কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় নূতন রস, নূতন শক্তি, নূতন সৌন্দর্য দান করিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বিলাত হইতে আসিবার কয়েকমাসের মধ্যে কবিকে উত্তরবঙ্গে যাইতে হয়। তথায় তিনটি পরগণা— বিরাহিমপুর, ইহার কাছারি শিলাইদহে; কালিগ্রাম, ইহার কাছারি পতিসরে; সাহাজাদপুর গ্রামের নামেই পরগণা। এবার শীতকালেই তাঁহাকে কালিগ্রামে যাইতে হয়; পতিসর কাছারি চলন বিলের অনতিদূরে নাগর নদীর উপর। এই জায়গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়; তাই নূতন পারিপার্শ্বিকের সহিত মনের খাপ খাওয়াইতেই কষ্ট হইতেছে। স্ত্রীকে লিখিত একখানি পত্রে মনের এই ভাব গোপন করিতে পারিতেছেন না। চলন বিলটা তাঁহার মোটেই ভালো লাগে নাই। পতিসরে পৌঁছাইতে নদীপথে তিন দিন কাটে; আবার সেই পথে বিরাহিমপুর পরগণায় যাইতে হইবে। সেটা তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না। "এখানকার নদীতে একেবারে স্রোত নেই। শেওলা ভাস্‌ছে, মাঝে মাঝে জঙ্গল হয়েছে— পাড়াগেঁয়ে পুকুরের যে একরকম গন্ধ পাওয়া যায়, সেইরকম গন্ধ— তা ছাড়া রাত্তিরে বোধ হয় যথেষ্ট মশা পাওয়া যাবে। নিতান্ত অসহ্য হলে এইখান থেকেই কলকাতায় পালাব।"[১] কলিকাতায় যাবার জন্য মন কেমন করে 'মিষ্টি বেলুরাণু'র জন্য; খোকাকে স্বপ্নে দেখিয়া মন আরও ব্যাকুল হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহশীল

১ [কালিগ্রাম, ডিসেম্বর ১৮৯০], চিঠিপত্র প্রথম।

পিতা ছিলেন, তাই সন্তানদের জন্য এত উৎকণ্ঠা। রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার ছিল।

পতিসরের বর্ণনা পাই 'ছিন্নপত্রে'। সে-বর্ণনায় বাহিরের প্রকৃতিকথা যেমন আছে, তেমনি আছে কবির অন্তরের কথা। জমিদারি কাজের দস্তুরে এখনো তেমন অভিজ্ঞতা হয় নাই বলিয়া বাহিরের আদর আপ্যায়ন সম্মান অসংকোচে গ্রহণ করিতে বাধো-বাধো ঠেকে। মানুষ রবীন্দ্রনাথের দরদী মন মানুষের নিকট হইতে কাতর কৃত্রিম স্তুতিবাদ শুনিতে তখনো তেমন অভ্যস্ত হয় নাই, তাই একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "সকালে উঠে· ·লিখছিলুম· ·এমৎকালে · ·রাজকার্য উপস্থিত হল— প্রধানমন্ত্রী মৃদুস্বরে বল্লেন, একবার রাজসভায় আসতে হচ্চে। কি করা যায়— লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল— সেখানে ঘণ্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসচি। আমার মনে মনে হাসি পায়— আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপর বসে বসে ভান করচি যেন এইসমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মত দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্ম্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এইসমস্ত ছেলেপিলে-গরুলাঙ্গল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করাবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। · ·কি জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! Prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্ব্বদা মুখোষ পরে থাকতে হয়।"[১]

এই পত্রখানি মানুষ রবীন্দ্রনাথের লেখা, জমিদার রবীন্দ্রনাথের নয়। এমন-কি কবি রবীন্দ্রনাথেরও নয়। কয়েকদিন পূর্বে যখন তাঁহার নৌকা দেখিয়া কোনো গ্রামবৃদ্ধা প্রশ্ন করিয়াছিল যে, জমিদারবাবুর নৌকা এখানে বাঁধা কেন, মাল্লারা উত্তর দেয় 'হাওয়া খাওয়ার জন্য'। এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরো ঢের বেশি কঠিন জিনিসের জন্যে।"[২] এ উক্তিটির মধ্যে নিজের প্রতি শ্লেষ আছে। মোট কথা ছিন্নপত্রের লেখাগুলিকে পত্র না বলে বলা উচিত ডায়ারি, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।

এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগিতেছে। য়ুরোপ ভ্রমণকালে যে-ডায়ারি লিখিয়াছিলেন তাহারই এক বিরাট ভূমিকায় এইসব আলোচনা করেন; বোধ হয় উত্তরবঙ্গ ভ্রমণকালে উহা রচিত হয়। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের প্রথম ভাগ বা ভূমিকা-অংশ ছাপা হয় আসল ডায়ারি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আড়াই বৎসর পূর্বে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলী প্রকাশকালে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-অংশ 'বিচিত্র

১ ছিন্নপত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৭৪-৭৫।

২ ছিন্নপত্র। পতিসর। ৭ই মাঘ ১২৯৭ [১৯ জানুয়ারি ১৮৯১]।

প্রবন্ধে'র অন্তর্গত করা হয়, এবং ভূমিকাটাকে দুটি অংশে ভাগ করিয়া একাংশ 'নূতন ও পুরাতন' নামে 'স্বদেশ'[১] খণ্ডে, এবং অপরাংশ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে 'সমাজ'[২] খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণ অপ্রচলিত হওয়ায় গদ্যগ্রন্থাবলীর পাঠকগণের নিকট এই প্রবন্ধদ্বয়ের পটভূমি নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। অথচ প্রবন্ধ দুইটি স্থিরভাবে পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, য়ুরোপ হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিবার পর রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন উঠিয়াছে। য়ুরোপের অন্ধ গতি ও ভারতের অন্ধ স্থিতির মধ্যে সত্য কোথায়। রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসর বয়সে যে-প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্তী যুগে অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া বারে বারে তাহা আলোচনার জন্য তুলিয়াছেন এবং যথাসাধ্য সমাধানের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া চৈতন্য লাইব্রেরির এক বিশেষ অধিবেশনে প্রবন্ধটি পাঠ করেন।[৩] গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

'নূতন ও পুরাতন' এই রচনাটি নূতনপন্থী ও পুরাতনপন্থী, গতিপন্থী ও স্থিতিপন্থী সমাজসংস্থানের একটি সুষ্ঠু সমালোচনা। কোনো পক্ষের আতিশয্য নীতি বা গোঁড়ামিকেই লেখক এই প্রবন্ধে সমর্থন করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও শান্ত জীবনযাত্রার মধ্যে নূতনের আবির্ভাব হওয়াতে হঠাৎ ভারতীয়গণকে 'বিশাল কর্মক্ষেত্রে'র মধ্যে কে বা কিসে যেন ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ভারতের সমাজ কালস্রোত বন্ধ করিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে কে যেন "পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে।" কালস্রোতকে রোধ করিতে আমরা পারি নাই, পরিবর্তনকে মানিয়া লইতেই হইতেছে। স্বীকার করি আর না-করি মানবস্রোত চলিয়াছে, ও সেই সঙ্গে 'বিচিত্র কল্লোল, উদ্দাম বেগ, প্রবল গতি, অবিশ্রাম কর্ম' আমাদের মনকে মাতাইয়া তুলিতেছে। ইচ্ছা করে বহুযুগের সংস্কারবন্ধন ছিন্ন করিয়া আমরাও বাহির হইয়া পড়ি, 'কিন্তু তার পরেই রিক্তহস্তের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি পাথেয় কোথায়' নূতনের সহিত সন্ধি করিতে গিয়া নূতনকে অনুকরণ করাই কি উদ্দেশ্য। য়ুরোপীয়তাকে গ্রহণ করাই কি কাম্য। এই প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলিতেছেন, "ভারতবর্ষ সুখ চায় নি, সন্তোষ চেয়েছিল, তা পেয়েওছে এবং সর্বতোভাবে তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে।" কিন্তু য়ুরোপের 'উন্মাদ জীবন-উপপ্লব' দেখিয়া তাহাদের সভ্যতার চরম সফলতা সম্বন্ধে ভারতীয়দের মনে সংশয় জাগে। য়ুরোপের সভ্যতা কি কোনো দিন একটি শান্তি ও মাধুর্যের মধ্যে সমাপ্তিলাভ করিবে এই প্রশ্ন কবির মনে উঠিয়াছে। অথবা, "কল যে-রকম হঠাৎ বিগড়ে যায় উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় করে এঞ্জিন যে-রকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ী পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হয়, সেই রকম প্রবল বেগে একটা নিদারুণ অপঘাত সমাপ্তি প্রাপ্ত হবে?" য়ুরোপের সভ্যতা যে আজ কোথায় আসিয়া নিজেকে দাঁড় করাইয়াছে, তাহা আজ এত প্রকট ও স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের এই ঋষিবাক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা যতই মন্দ হউক, সে সুনিশ্চিতভাবে আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং প্রাচীনকে কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু ব্যাপারটা হইয়াছে এই যে, আমরা প্রাচীনকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্য হইতে বিদায় দিয়াছি, কিন্তু মনের ভাবের পরিবর্তন করিতে পারি নাই, মন বাঁধা আছে প্রাচীনের নিগড়ে। আমরা মহোৎসাহে প্রাচ্য প্রাচীনের জয়গান করিব, তাহাকে অনুসরণ করিব না; পাশ্চাত্য নবীনের নিন্দা করিব,

১ স্বদেশ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১।

২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, সমাজ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

৩ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ভূমিকা, প্রথম খণ্ড। ১৩ বৈশাখ ১২৯৮। পৃ. ৭৮।

কিন্তু তাহাকে অনুকরণ করিব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, "তোমার আমার মতো লোক যারা তপস্যাও করি নে, হবিষ্যও খাই নে, জুতো মোজা পরে ট্র্যামে চড়ে পান চিবোতে চিবোতে নিয়মিত আপিসে ইস্কুলে যাই, যাদের আদ্যোপান্ত তন্নতন্ন করে দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ গৌতম জরৎকারু বৈশম্পায়ন কিংবা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন; ছাত্রবৃন্দ, যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে এ-পর্যন্ত কারও ভ্রম হয় নি; এক দিন তিন সন্ধ্যা স্নান করে একটা হরিতকী মুখে দিলে যাদের তার পরে একাদিক্রমে কিছুকাল আপিস কিংবা কলেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে এ রকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাড়ম্বর করা, পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্‌যোগপরায়ণ মানুষজাতীয়ের প্রতি খর্ব নাসিকা সীটকার করা, কেবলমাত্র যে অদ্ভুত অসংগত হাস্যকর তা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।" লেখকের মতে প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য নবীনের সহিত যোগ দিতেই হইবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিচার লইয়া খুঁতখুঁত করা নিরর্থক। আধ্যাত্মিক পবিত্রতার জন্য আমাদের এই ব্যবহারকে, কবি নাম দিয়াছেন, 'আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা'— other-worldlinessএর অনুবাদ। "অতিরিক্ত বাহ্যসুখপ্রিয়তাকেই বিলাসিতা বলে, আর অতিরিক্ত বাহ্যপবিত্রতা-প্রিয়তাকে আধ্যাত্মিক বিলাসিতা বলে।" লেখকের মতে সমাজজীবনে 'সংকীর্ণতা এবং নির্জীবতা অনেকটা পরিমাণে নিরাপদ'; কারণ, "যে-সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক্ স্ফূর্তি এবং জীবনের প্রবাহ আছে, সে সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সইতে হয়।· ·যেখানে জীবন অধিক সেখানে স্বাধীনতা অধিক এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক। সেখানে ভালো মন্দ দুই প্রবল।· ·সমাজ যতই উন্নতি লাভ করে ততই তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জটিলতা স্বভাবতই বেড়ে উঠতে থাকে।· · সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে তা হলে· ·কৌশলসাধ্য ব্যাখ্যা দ্বারা আপনাকে ভুলিয়ে কতকগুলো সংকীর্ণ বাহ্য সংস্কারের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করার প্রবৃত্তিই হয় না।" লেখকের আসল কথা এই যে প্রগতিধর্মে বাধা বিস্তর, মেহন্নতও দুস্তর; তাই বলিয়া পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিলে নূতনকে পাওয়া যাইবে না। নূতনকে নবীনভাবে গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। প্রাচীনের প্রতি যদি সত্যই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অচলা থাকে, তবে তাহাকে যথাসাধ্য অনুসরণ করাই উচিত; কিন্তু দেখা যায় লোকের সে শ্রদ্ধা নিষ্ঠার একান্ত অভাব— অথচ তাহাদের ভানের ও ভণিতার অন্ত নাই। ফলে সমাজজীবন দুর্বল, তাহার আদর্শ নিষ্প্রভ, এবং মানবচরিত্র চাতুরীপূর্ণ হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিলেন, নির্জীবতাকে সাধুতা ও অক্ষমতাকে সর্বশ্রেষ্ঠতার ভান করা নিরর্থক; সময় আসিয়াছে যখন নবীনকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করিয়া সবল ও সুস্থ মনোভাব পোষণ করাই প্রয়োজন।

কিন্তু নবীন বলিতে বুঝায় পাশ্চাত্য ও য়ুরোপীয় জগৎ। এবার বিলাত হইতে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া আসিয়াছিলেন। বিলাতকে মুগ্ধ নেত্রে দেখিবার বয়স এখন নাই; বারো বৎসর পূর্বে বিলাত-বাসকালে লিখিত পত্রধারার মধ্যে সমাজকে যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে। বিলাতী সমাজের উপরিতলের মুষ্টিমেয় নরনারীর সুখের ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চরম চেষ্টাচালিত সভ্যতা-যন্ত্র কী নিদারুণভাবে বহুকে পেষণ করিতেছে, এই কথাটি কবির মনে এবার বিশেষভাবে লাগিয়াছে। কিন্তু "প্রকৃতির আইন অনুসারে, উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই" (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, সমাজ) বলিয়া যে-ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, তাহা কালের ইতিহাসে পূর্ণ হইয়াছে। ডায়ারির ভূমিকার শেষাংশে (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য) প্রধানত য়ুরোপীয় ও ভারতীয় নরনারীর সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। তিনি লক্ষ করিয়াছেন বিলাতে নারীদের জীবনে পুরুষের সহধর্মিতা ও সহযোগিতা হইতে সমকক্ষতা ও প্রতিযোগিতা-স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। উহা যে সমগ্র সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না, ইহা এই প্রবন্ধাংশে বহুবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের নারীদের জীবনাদর্শের সহিত তুলনা মনে স্বভাবতই জাগিতেছে। য়ুরোপীয় আদর্শে এতদ্দেশীয় নারীদের জীবন সংসারপিঞ্জরে

আবদ্ধ, নিরানন্দময়। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন পাশ্চাত্য দেশের "যে-সকল মেয়ে প্রমোদের আবর্তে অহর্নিশি ঘূর্ণামান কিংবা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত, কিংবা দুটো-একটা কুকুরশাবক এবং চারটে পাঁচটা সভা কোলে করে একাকিনী কৌমার্য কিংবা বৈধব্য যাপনে নিরত, তাঁদের চেয়ে যে আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা অসুখী এ কথা আমার মনে হয় না। ভালোবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক।" কবি এ কথাটি নীতির দিক হইতে আলোচনা করেন নাই, তিনি জীবনের আদর্শ ও অভিপ্রায়ের দিক হইতেই কথাটা তুলিয়াছিলেন।

তবে পরিবর্তনটা যে কেবল প্রতীচ্য জগতে ঘটিতেছে তাহা নহে; প্রাচ্য সমাজেও ঘটিতেছে। "দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতই ভিন্ন আকার ধারণ করছে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মতো বোধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে ক্রমশ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা-পরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে। অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরেজি যে জানে এবং ইংরেজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্ছে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর-এক জনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন।" এইসব যুক্তি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ দেখাইলেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না এবং ইংরেজি শিক্ষাও শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে। আমরা দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে দোদুল্যমান, উভয় শক্তিকেই স্বীকার করিয়া তাহাদের যথাযথ স্থান নির্দেশ করিতে হইবে।

'হিতবাদী' ও পরে

বোধ হয় ১২৯৭ সনের চৈত্র মাসের কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। তখন সাহিত্যিক মহলে 'হিতবাদী' নামে এক সাপ্তাহিক প্রকাশের জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। আমরা যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক ছিল 'বঙ্গবাসী' (১২৮৮) ও 'সঞ্জীবনী' (১২৮৮)। প্রথমখানি যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত সনাতনীদের কাগজ— বাংলার হিন্দু গোঁড়ামির প্রশ্রয়দাতা ও প্রচারক, দ্বিতীয়খানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কাগজ— যাহা-কিছু পুরাতন তাহাকেই উহা ভাঙিবার জন্য উদ্যত। মোট কথা উভয় কাগজেই সর্ববিষয়ে আতিশয্য প্রকাশ পাইত। বাংলাদেশে যথার্থ সাহিত্যিক সাপ্তাহিক ছিল না; সেই অভাব মোচন করিবার জন্য 'হিতবাদী' প্রকাশিত হয়; উদ্‌যোগীরা কেবল সংবাদসাহিত্য প্রকাশ করিবেন না, তাঁহারা সংবাদ ও সাহিত্য সরবরাহ করিবেন।

১৮৯১ সালের গোড়ার দিকে 'হিতবাদী' প্রচারের জন্য একটি যৌথ কারবার গঠিত হয়। নবীনচন্দ্র বড়াল, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ৫০০৲ টাকা করিয়া দেন; ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল প্রভৃতি ১৫ জন ২৫০৲ টাকা করিয়া দিলেন; কয়জন ১০০৲ টাকা দেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামকরণ করেন ও motto দেন 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ'। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন "আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে। একটি বড় রকমের কম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্চে। ২৫,০০০৲ টাকা মূলধন। ২৫০৲ টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্দ্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমল

বাবুকে (ভট্টাচার্য) প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে (চট্টোপাধ্যায়) রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েচেন।"[১]

কর্তব্য ঘাড়ে পড়িলে রবীন্দ্রনাথ সে-কার্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত করেন। হিতবাদীর সাহিত্য-সম্পাদক হইয়া তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া ছোটগল্প লিখিয়া দিতে লাগিলেন; বোধ হয় ছয় সপ্তাহে ছয়টি লেখেন। ছোটগল্প রচনায় হিতবাদীতেই রবীন্দ্রনাথের হাতে-খড়ি; ইহার পূর্বে যে-দুইটি ছোটগল্প লেখেন—'ঘাটের কথা'[২] ও 'রাজপথের কথা', তাহাদিগকে গল্প বলা যায় না, গল্পের আভাস মাত্র বলা যাইতে পারে। সেইজন্য এই রচনা দুটিকে ১৩১৪ সালে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত করা হয়। ১৩৩৩ সালে 'গল্পগুচ্ছে' সর্বপ্রথম এ-দুটি গল্প বলিয়া স্বীকৃত হয়। 'মুকুট' 'বৌঠাকুরানীর হাট' 'রাজর্ষি'র মানুষগুলি কবিকল্পনার মানুষ অথবা ইতিহাসের মানুষ, তাঁহার চোখে দেখা মানুষ তাহারা নয়, তাহারা কল্পনার সৃষ্ট জীব বাস্তবের সহিত পরিচয় হইয়াছে এতদিনে। পদ্মাতীরে বাসকালে মানুষের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। জমিদারি পরিচালনা করিতে আসিয়া তিনি বাস্তব জগতকে স্বচক্ষে দেখিলেন।[৩] অসীম কল্পনাশ্রয়ী মনে বাস্তবের যেটুকু ছায়াপাত হইয়াছিল তাহারই প্রতিক্রিয়ায় ছোটগল্পের সৃষ্টি। হিতবাদীতে ছয়টি গল্প বাহির হয়— দেনাপাওনা, গিন্নী, পোস্টমাস্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, ব্যবধান এবং রামকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা। প্রত্যেকটি গল্পের উপাদান পরিচিত জগৎ হইতে সংগৃহীত। 'পোস্টমাস্টারে'র কথা ছিন্নপত্রে আছে (১৮৯১ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯২ জুন ২৯)। 'গিন্নী' গল্পের কথা তিনি জীবনস্মৃতির প্রথম খসড়ায় বিবৃত করিয়াছিলেন; নর্মাল স্কুলে যে-শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিতেন না, সেই হরনাথ পণ্ডিত ক্লাসের ছেলেদের অদ্ভুত নামকরণ করেন। 'গিন্নী' নামক গল্পে তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। কালে পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে, তাঁহার ছোটগল্পের প্রকৃতিরই বদল হইয়া যায়, তাহা তাঁহার গল্প-সমালোচকগণ অবশ্যই লক্ষ করিয়া থাকিবেন। শেষজীবনেই 'তিনসঙ্গী' গল্প লেখা সম্ভব হয়। তখন 'ছুটি' 'কাবুলিওয়ালা'-যুগের পটপরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল।

হিতবাদীর সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ মাস-তিনেকের বেশি ছিল না; কর্মকর্তাগণের ফরমাশ হইয়াছিল যে গল্পগুলি আরও লঘুভাবে লিখিলে ভালো হয়। তাঁহারা সাপ্তাহিকের জন্য বোধ হয় হালকা গল্প চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আর্টিস্টের পক্ষে ফরমাইশি গল্প লেখা অসম্ভব, অল্পদিনের মধ্যে হিতবাদীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইল।

হিতবাদীর জন্য গল্প রচনা ছাড়া প্রবন্ধাদিও লেখেন। একটি প্রবন্ধের নাম ছিল 'অকালবিবাহ'। য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির ভূমিকারূপে যাহা তিনি চৈতন্য লাইব্রেরীতে[৪] পাঠ করেন তাহাতে বহু সামাজিক প্রশ্ন— বিশেষভাবে প্রাচ্য

১ পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ, পৃ. ৩০।

২ দ্র. 'শোক ও সান্ত্বনা' অধ্যায়ের শেষাংশ

৩ কবি বলিয়াছেন, "জমিদারি দেখা উপলক্ষে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয় এবং এই থেকেই আমার গল্প লেখারও শুরু হয়।" (২ মে ১৯০৯) রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ,' সুপ্রভাত, ১৩১৬ ভাদ্র। দ্র. পুলিনবিহারী সেন-কৃত প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থের তথ্যপঞ্জী।

৪ চৈতন্য লাইব্রেরী। গৌরহরি সেন ১৮৮৯, ৫ই ফেব্রুয়ারি, ৮৩ বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে গ্রন্থাগার আরম্ভ করেন। এখন ৪।১ বীডন স্ট্রীটে অবস্থিত। ...১৯৪৮ সালে ইহার হীরক-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়।.. এই লাইব্রেরীতে ১৮৯০এ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আর্য্যাশ্রম ও সাহেবিআনা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।... ১৮৯১এ রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন। সেদিনের সভায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। দ্র. Chaitanya Library—Diamond Jubilee year— Report for 1937-1948।

ও প্রতীচ্য নারীসমাজের তুলনামূলক আলোচনা ছিল। নারীসমাজের আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হইতেছে বিবাহ। হিতবাদীতে 'অকালবিবাহ' প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা ছিল। মেয়েদের অল্পবয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে বহু আলোচনা ইতিপূর্বে 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে হইয়া গিয়াছিল। অকালবিবাহ বলিতে যে কেবল মেয়েদের অসময়ে বিবাহ বুঝায় তাহা নহে, পুরুষদের পক্ষেও অকালবিবাহ সম্ভব; সেটা কেবল বালকবয়সে বিবাহ নহে— আর্থিক স্বাধীনতা লাভ না করিয়া বা উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়াকেও অকালবিবাহ বলা যাইতে পারে। একান্নবর্তী পরিবারে উপার্জন-অক্ষম কোনো-কোনো ব্যক্তির বিবাহ করা দূষণীয় নহে। কিন্তু যেখানে নানা আর্থিক ও মানসিক কারণে একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা প্রায় উচ্ছেদ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে বৃত্তিহীন যুবকের পক্ষে বিবাহ যুক্তিসংগত নহে, কারণ পরিবার-পোষণের সামর্থ্য তাহার তখনো হয় নাই। এই অকালবিবাহের ফলে যুবকদের পক্ষে সকলপ্রকার নূতন দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়; এককথায় তাহাদের সকলপ্রকার উদ্যোগ নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহের যে নানা দিক আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ সম্যক প্রকারে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে পারেন নাই। বহু বৎসর পরে 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে এই কঠিন বিষয়টির সম্যক আলোচনা করেন।

আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পূর্বে চন্দ্রনাথ বসুকে বিবাহ সম্বন্ধে কোনো পত্র দেন; তাহারই উত্তরে চন্দ্রনাথ তাঁহাকে লেখেন, "হিতবাদীতে এই বিষয়টার আলোচনা কর-না কেন? তোমার সমালোচনাগুলির পারিপাট্য দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি। তোমার সকল কথা আমি অনুমোদন করি না সত্য।"[১] ইহার পরই বোধ হয় শ্রাবণের গোড়ার দিকে 'অকালবিবাহ' প্রবন্ধ হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়। চন্দ্রনাথ আলোচনা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। উভয়ের মধ্যে এই লইয়া পত্রবিনিময় হয়।[২] এক খানিপত্রে চন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি' দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ পত্রোত্তরে বলেন যে, এ বিষয়ে "নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই। কারণ, আজকাল আমরা যেন একটি যুগপরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান আছি। প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র বল্লালসেন হইয়া উঠিয়া নিজ নিজ ঘরগড়া আদর্শ অনুসারে হিন্দু অহিন্দু শ্রেণী নির্ণয়-পূর্ব্বক তাহাই কেবল গলার জোরে দেশের লোকের উপর জারি করিবার চেষ্টা করিতেছি। আশ্চর্য্য নাই কালক্রমে পরিবর্ত্তনবিপ্লব শান্ত হইয়া বুদ্ধি স্থির হইলে দেখা যাইবে যথার্থ হিন্দুপ্রকৃতির সহিত য়ুরোপীয় প্রকৃতির তেমন বিরোধ নাই, কেবল বর্ত্তমানকালের হীনদশাগ্রস্ত ভারতের নির্জ্জীব গোঁড়ামি ও কিম্ভূতকিমাকার বিকৃত হিন্দুয়ানীই যথার্থ অহিন্দু।"

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে চন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ আংশিকভাবে সত্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছুদিন পূর্বে প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করচে— সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস।"[৩]

হিতবাদীতে গল্প লেখার পালা কিভাবে ও কেন শেষ হইয়াছিল, তাহার কারণ আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি; ফরমাইশি গল্প বা উদ্দেশ্য ও উপদেশমূলক কাহিনী রচনাকে কবি সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাই তরুণ

১ পত্র। ১৭ আষাঢ় ১২৯৮। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৫১, পৃ. ৪২৬।

২ চিঠিপত্র। ২১ শ্রাবণ ১২৯৮। পারিবারিক স্মৃতিপুস্তকে পত্রখানির অনুলিপি ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৫২।

৩ পত্র ৬। চিঠিপত্র ৫। ১৭ মাঘ ১২৯৭ [২৯ জানুয়ারী ১৮৯১]।

সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার নূতন মাসিকপত্র 'সাহিত্য'র জন্য রচনা চাহিলে রবীন্দ্রনাথ যে-দুইটি ব্যঙ্গ-কৌতুক লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তাহা হিতবাদীর পরিচালকগণের মনোভাবের প্রত্যুত্তর বলিয়া মনে হয়; 'লেখার নমুনা' 'প্রত্নতত্ত্ব'[১] 'সারবান সাহিত্য' ও 'মীমাংসা' প্রভৃতি পাঠ করিলে পাঠকগণ দেখিবেন এই ব্যঙ্গ ও শ্লেষ কাহাদের উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল। 'প্রত্নতত্ত্ব' রচনাটি বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মবাদীদের ব্যঙ্গ সমালোচনা।

১২৯৮এর গ্রীষ্মের কয়টা মাস কলিকাতায় কাটাইয়া বর্ষারম্ভে কবি পুনরায় উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে আসেন; আষাঢ় মাসটা নদীতে নদীতে ও সাহাজাদপুরের কুঠির সামনে নৌকায় কাটিত। নৌকায় থাকেন, সেখান হইতে কাজকর্ম করিতে কুঠিতে যান। জমিদারির কাজ-দেখা বলিতে বুঝায় নানা ব্যাপার— কখনো অত্যাচারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রজাদের অভিযোগ, কখনো-বা উদ্ধত প্রজার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের অভিযোগ। এইসব শোনা ও মীমাংসা করা ছিল প্রধান কাজ; এ-ছাড়া সেরেস্তার কাজকর্মও দস্তুরমত দেখিতে হয়; রবীন্দ্রনাথের কোনোটাতেই ক্লান্তি নাই। নূতন অভিজ্ঞতা অর্জনে তাঁহার আনন্দ।

সাহিত্যসৃষ্টি নাই বলিলেই চলে। এখন কোনো পত্রিকার চাহিদা নাই, সম্পাদকের তাগিদ নাই— হিতবাদীর সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে। জমিদারির কাজকর্ম করিয়া যে সময় পান, পড়াশুনা করেন; আর তার পর পত্র লেখেন। এইসব পত্র 'ছিন্নপত্রে' সংশোধিত আকারে সম্পাদিত হয় বহু বৎসর পরে। যাহা দেখেন, যাহা ভাবেন, তাহাই লেখেন,[২] অনেকটা ডায়ারির মত— পত্র লেখাটা উপলক্ষ্য মাত্র। নির্জনে চরের মধ্যে নৌকাবাসকালে প্রকৃতিকে অন্তর দিয়া দেখিবার ও দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়া মানুষকে গভীরভাবে বুঝিবার যে-অবসর লাভ করেন তাহা জীবনে বা সাহিত্যে ব্যর্থ হয় নাই। দৃশ্যমান জগতের ক্ষুদ্র ঘটনারাজি একজন স্পর্শচেতন কবির চিত্তমাঝে কতভাবে ছায়া ও মায়া সৃষ্টি করিতে পারে তাহা 'ছিন্নপত্র' পড়িলেই জানা যায়; কিন্তু চলন্ত দৃশ্যের অনেকখানিই অবচেতনের গভীরে তলাইয়া যায়; বাহিরের আঘাতে-অভিঘাতে তাহারা কবির চিত্তপটে উদ্‌ভাসিত হইয়া সাহিত্যের রূপরেখায় প্রাণ পায়। এই নদীপথের ও গ্রাম্য সংসারের বহু দৃশ্য ও ঘটনা 'সাধনা'র যুগে গল্পমধ্যে রূপ লইয়াছিল।

উত্তরবঙ্গ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া অনতিকালের মধ্যে অকস্মাৎ তাঁহাকে জমিদারি-তদারককার্যে উড়িষ্যায় যাইতে হইল। উড়িষ্যায় দেবেন্দ্রনাথের জমিদারি ছিল। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখনো ঠাকুরবাড়ির এস্টেট অখণ্ড; অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের মৃতভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র গগনেন্দ্রনাথদের এবং তাঁহার মৃতপুত্র হেমেন্দ্রনাথের সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্তই এজমালিতে ছিল। সেই এজমালি সম্পত্তির কিয়দংশ ছিল পাণ্ডুয়ায়, উড়িষ্যা প্রদেশে কটকের কাছে। প্রসঙ্গত জানাইতেছি, উড়িষ্যা তখন বঙ্গদেশের অন্তর্গত।

সে-যুগে উড়িষ্যা যাইবার রেলপথ নির্মিত হয় নাই; কলিকাতা হইতে খালে খালে নদীতে নদীতে যাইবার পথ। অগস্টের শেষ দিকে বা ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি (১২৯৮) সময়ে কটক চলিয়াছেন; স্টীমারে তাঁহাকে যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা[৩] ছিন্নপত্রের মধ্যে আছে। কিন্তু কেন তাঁহাকে এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার কারণ কিছুই বলেন নাই। কটকে হঠাৎ এইভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য বীরেন্দ্রনাথের

১ সাহিত্য, ২য় বর্ষ ১২৯৮ কার্তিক, পৃ. ৩০৯-৩১১। সাহিত্য ২য় বর্ষ ১২৯৮ পৌষ পৃ. ৪১৭-৪২১। ব্যঙ্গ-কৌতুক রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭ পৃ. ৫০৬-৫১২।

২ লিখিত পত্রগুলি— চুহালি জলপথে; ১৬ই জুলাই ১৮৯১ (১২৯৮ আষাঢ় ৩)। ঐ ১৯ জুন, ১৮৯১ (১২৯৮ আষাঢ় ৬)। সাজাদপুর। জলপথে ২০ জুন (আষাঢ় ৭)। ঐ ২২ জুন (আষাঢ় ৯), ২৩ জুন (আষাঢ় ১০)। সাজাদপুর (তারিখ নাই। ছুটি গল্পের ঘটনা)। সাজাদপুর, জুন ১৮৯১ (১২৯৮ আষাঢ়। অদ্ভুত স্বপ্নের কথা)। সাজাদপুর ৪ জুলাই ১৮৯১ (১২৯৮ আষাঢ় ২১)।

৩ পত্র ৩১, ছিন্নপত্র। অগস্ট ১৮৯১।

সহপাঠী 'মোটাসোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার লোকটি'র নিকট কবি তিরস্কৃত হন। "কারও পরামর্শের অপেক্ষা না রেখে, অকস্মাৎ অসময়ে এখানে আসা সম্বন্ধে আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখ করলেন।"[১] যাহা হউক পরদিনই নৌকাযোগে তিরন রওনা হইয়া গেলেন। "বালিয়ার ঘাটটি বেশ দেখতে। দুই ধারে বেশ বড়ো বড়ো গাছ; সবসুদ্ধ খালটা দেখে সেই পুনার ছোটো নদীটি মনে পড়ে।··এই খালটাকে যদি নদী ব'লে জানতুম তা হলে ঢের বেশি ভালো লাগত।" বেলা চারটের সময় তারপুরে পৌঁছাইয়া পালকি চড়িয়া অর্ধরাত্রে পাণ্ডুয়ার কুঠিতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ছিন্নপত্রে অতি বিস্তৃতভাবেই এই যাত্রাপথের বর্ণনা আছে।[২]

এই পাণ্ডুয়ার কুঠিতে কবি সপ্তাহখানেক ছিলেন। পৌঁছবার দুই দিন পরে লিখিতেছেন, "অনেকদিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্দুর আছে সে কথা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; হঠাৎ যখন কাল··রোদ্দুর ভেঙে পড়ল তখন যেন একটা জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। দিনটি বড়ো চমৎকার হয়েছিল।··খুব একটা নিঃঝুম নিস্তব্ধ নিরালা ভাব।[৩] এই নিরালায় বসিয়া কবি তাঁহার অমর নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রথম খসড়া প্রস্তুত করিলেন (২৮ ভাদ্র ১২৯৮)। "এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটা নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।"[৪] পূর্ববৎসর 'অনঙ্গ আশ্রমে'র পরিকল্পনা আসে (১২৯৭ আষাঢ় ৮)।

বাহিরে চলাফেরাতে সাধারণ লোককে যে-পরিমাণে চঞ্চল করে, রবীন্দ্রনাথের মন সে-পরিমাণ উদ্‌বেলিত হয় না। তাঁহার মন সুন্দরের পিয়াসী— নিত্যনব শোভা, নিত্যনূতন পরিচয় তাঁহাকে নব নব সৃষ্টিতে উদ্‌বোধিত করে। ঝড়ে ঝঞ্ঝায় নদীবক্ষে রেলপথের কর্মকোলাহলের মধ্যে তাঁহার চিত্ত একটি শান্তপদকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই শান্তির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিকার্য সকলের অগোচরে চলিতে থাকে; বরং নূতন পারিপার্শ্বিকের রূঢ় অভিঘাতে অন্তরের শতদলকোরক প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ পায়। ছিন্নপত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, একটি গম্ভীর সৌন্দর্যতৃপ্তি তাঁহার মনকে শুদ্ধ মুক্ত শান্ত আনন্দে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আবার উত্তরবঙ্গে আসিয়াছেন— এবার নৌকায় শিলাইদহের ঘাটে। বিচিত্র চিন্তাধারা পদ্মার জলধারার ন্যায় মনের উপর প্রবহমান। অন্তরে-বাহিরে বিচিত্রের পুলকিত অনুভূতি। তিনি লিখিতেছেন, "পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী-একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ!··কেবল মৌলবিটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক্‌ বক্‌ করে আমাকে ব্যথিত করে তোলে।"[৫] আর এক দিন লিখিতেছেন,[৬] "পৃথিবীতে জানলার ধারে একলা বসে চোখ মেলে দেখলেই মনে নতুন সাধ জন্মায়— নতুন সাধ ঠিক নয়, পুরোনো সাধ

১ পত্র ৩২, ছিন্নপত্র। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

২ পত্র ৩৩, ছিন্নপত্র। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

৩ পত্র ৩৪, ছিন্নপত্র, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

৪ সূচনা, চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

৫ পত্র ৩৫, ছিন্নপত্র। শিলাইদহ, ১লা অক্টোবর ১৮৯১ [১২৯৮ আশ্বিন ১৫]।

৬ পত্র ৩৬, ছিন্নপত্র পৃ. ১০৪। শিলাইদহ। ১৮৯১ অক্টোবর।

নানা নতুন মূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করে।" একটি মাঝিকে একখানি জেলেডিঙিতে একলা দাঁড় বাহিয়া গান করিয়া যাইতে দেখিয়া ছেলেবেলায় পদ্মার একটি স্মৃতি মনে পড়িল, সেই প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, "হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেই দিন থেকে ফিরে পাই! আর-একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়— এবার তাকে আর শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে— কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্যটা কবির মতো কাটাই। ··উপবাস ক'রে, আকাশের দিকে তাকিয়ে অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক ক'রে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যহৃদয়কে কথায় কথায় বঞ্চিত ক'রে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাই নে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ, তা না মনে ক'রে একে বিশ্বাস করে ভালোবেসে, ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট— দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।" রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল; তিনি 'মানবের মাঝে'ই পরিপূর্ণভাবে বাঁচিয়াছিলেন।

কার্তিক মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিলেন; বাড়িতে নূতন পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইতেছে, সুতরাং তাঁহাকে চাই।

সাধনা পত্রিকা ১২৯৮

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' নামে মাসিকপত্র ঠাকুরবাড়ি হইতে প্রকাশিত হইল। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র। ১৮৯০ সালে ইনি বি. এ. পাস করিয়াছেন; সাহিত্যিক প্রতিভা ও রসগ্রাহিতা অসামান্য না থাকিলেও, যথেষ্ট। এখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর, নবীন উৎসাহে পত্রিকা-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সম্পাদক ও উৎসাহদাতারা সকলেই জানিতেন যে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা ব্যতীত মাসিকপত্র চলিতে পারে না। শিলাইদহ হইতে কার্তিকের গোড়ায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া 'সাধনা'র জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। নূতন পত্রিকা নূতন প্রেমের ন্যায়ই তাঁহাকে টানে, এবং তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা এই নূতন আকর্ষণে শতদল পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া ওঠে। সাধনার প্রথম সংখ্যা হইতে ছোটগল্প, প্রবন্ধ, সাময়িক সারসংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও সাময়িক সাহিত্য-আলোচনা প্রভৃতি বিচিত্র রচনাসম্ভারে উহা পূর্ণ হইল।

রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা কাগজখানিকে সর্বতোভাবে মাসিকপত্রের আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিবেন। একখানি পত্রে তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিতেছেন, "অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক, অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব, এবং তাঁদের মধ্যেও দুই একজন নতুন নতুন বুলি বের করচেন। একে তো বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুব যে পরিষ্কার তা নয় তার পরে সম্প্রতি হঠাৎ একটা আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারি দিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে— সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েচে। দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েচে।"[১]

সাধনার প্রথম সংখ্যা হইতে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে থাকিল। সেই-যে আড়াই

১ পত্রাবলী [শিলাইদহ ১২৯৮ অগ্রহায়ণ], বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৩৪৯ শ্রাবণ, পৃ. ৩১।

মাসের জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন, তাহারই বিস্তৃত কাহিনী দিনপঞ্জী বা রোজনামচা হিসাবে লেখা। প্রথমবারের বিলাতের পত্রধারা হইতে এ-রচনা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। কবি যাহা দেখিতেছেন, যাহা ভাবিতেছেন এই দিনপঞ্জীতে তাহা লেখনীর রেখায় আঁকিয়া যাইতেছেন, ইহার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই, অন্যকে তাক্ লাগাইবার কোনোই প্রচেষ্টা নাই, কেবল কথার রঙে ছবি আঁকাই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ডায়ারির ভূমিকা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র ভূমিকা নামে এই বৎসরের (১২৯৮) বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

পত্রিকা পরিচালনা তো জীবনের অন্যতম কাজ ; লেখক-সত্ত্বা ছাড়াও কবির অন্য সত্ত্বা আছে, প্রত্যেকটিরই চাহিদা তাঁহাকে পূরণ করিতে হয়। জমিদারির কথা তো বলিয়াছি। এ ছাড়া তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, সে-সত্ত্বারও কাজ বা কর্তব্য পালন করিতে হয়। আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত, সেটা দশবার্ষিকী আদমশুমারের উদ্যোগপর্ব (১৮৯০)। সকল বর্ণ বা 'জাত'ই জাতি-শুমারের ফর্দে নিজ বর্ণের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে আন্দোলনে বদ্ধপরিকর। হিন্দুসমাজের মধ্যে আত্মশক্তি ও আত্মসম্মান অর্জনের ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। কিন্তু তাহা সমগ্রের জন্য মূর্তি পরিগ্রহ না করিয়া কেবল শ্রেণীচেতনায় আত্মপ্রকাশ করিল। এই শ্রেণীচেতনার প্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজও সেদিন হিন্দুজাতির নানা বর্ণ-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে আপনাকে পৃথকভাবে নির্ণীত হইবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

ব্রাহ্মসমাজ পৃথক ধর্ম না হিন্দুধর্মের একটি শাখা বা সম্প্রদায় মাত্র, এ তর্কের মীমাংসা এখনো হয় নাই ; কারণ 'হিন্দু কে' এবং 'হিন্দুধর্ম কী' তাহার সংজ্ঞা এখনো পর্যন্ত সর্ববাদীভাবে স্বীকৃত হয় নাই। এই সংজ্ঞা বা পরিচয়ের অভাবে একদল লোক ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের অন্যতম সম্প্রদায় এবং উক্ত সমাজকে হিন্দু জাতির অসংখ্য বর্ণের অন্যতম 'জাত' হিসাবে দেখিতে চান। কিন্তু নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোকেদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্ম ও হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক ধর্ম রূপে দেখিতে ও দেখাইতে উৎসুক। যে-সংজ্ঞানুসারে লোককে সাধারণভাবে 'হিন্দু' বলা হয়, তাহার দ্বারা বিচার করিলে ব্রাহ্মগণকে হিন্দু বলা যায় না। কারণ, যদি বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য হইতে কেবল বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করা, মনুষ্যজাতির মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও দেবত্ব মানা, এবং অসংখ্য জীবজন্তুর মধ্য হইতে গো-জাতির প্রতি বিশেষ ভক্তিপ্রদর্শন ও তাহার পবিত্রতা স্বীকার করাই হিন্দুত্বের পরখ হয়— যদি বর্ণভেদ, ভোজ্যাভোজ্য উচ্ছিষ্ট-অনুচ্ছিষ্ট, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য প্রভৃতি আচার রক্ষাই হিন্দুত্বের আবশ্যিক শর্ত হয়, তবে ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই 'হিন্দু' আখ্যা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজ বিবাহাদি বিষয়ে বর্ণবিচার করিতেন, উপনয়নাদি বিষয়ে কুলাচার পালন করিতেন ; এতদ্‌ব্যতীত অপৌত্তলিক, নির্দোষ আচার-বিচার সম্বন্ধে নবীনসমাজীদের ন্যায় কোনো গোঁড়ামি পোষণ করিতেন না। এইসব কারণে তাঁহারা আপনাদিগকে 'হিন্দু' বলিতে কুণ্ঠিত তো হইতেনই না, বরং মনে করিতেন হিন্দুর শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাঁহারাই প্রচার করিতেছেন।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে ১৮৭১ অব্দে কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মরা এই মতের ঘোর বিরোধিতা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখিতেছেন, "নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভা ঐ বক্তৃতা দেওয়াইবার জন্য প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্ম-বিবাহ-আইনের আন্দোলন উপস্থিত হওয়াতে এবং কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ— তদুপলক্ষে তাঁহারা নিজে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী নহেন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণবাবুর বক্তৃতা সেই বিবাদের

প্রতিধ্বনি মাত্র।· ·রাজনারায়ণবাবু বঙ্গবাসীর চিত্তে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিলেন।· ·কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ অহিন্দু বলিয়া হিন্দুসমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন।"[১] পৃ. ৩২২।

বিশ বৎসরে এই মত উভয় পক্ষ হইতেই তীব্র হইয়াছে; দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের ধারায় হিন্দু-সমাজে যেমন আত্মচেতনা আসিয়াছে, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র শিবনাথ প্রভৃতির ধারায় ব্রাহ্মগণও নিজ মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। আদি ব্রাহ্মসমাজ দোটানায় পড়িয়া আগাইল না, পিছাইল না— সে মরিয়া গেল।

১৮৯১ সালের আদমসুমার-গ্রহণের সময়ে ব্রাহ্মরা সেন্সাসে পৃথকভাবে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ও গণিত হইবার দাবি জ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ সেন্সাসের সর্বাধ্যক্ষকে জানাইয়া দেন যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে 'হিন্দু-ব্রাহ্ম' বলিয়া যেন অভিহিত করা হয়, এবং সাধারণভাবেই সকল ব্রাহ্মের উদ্দেশেই এই অনুরোধ পত্রিকাদিতে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

বিশ বৎসর পরে পুনরায় যখন আর-একবার ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না প্রশ্ন উঠে, তখনো রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেন যে ব্রাহ্মরা হিন্দুজাতির অন্তর্গত শাখা। কিন্তু তিনি নিজেকে 'হিন্দু' বলিতেন বলিয়া কেহ যেন তাঁহাকে সামান্যভাবে হিন্দু মনে না করেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' কথিকাসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার ধর্মমত অতি স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে তিনি যে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম ছিলেন তদ্‌বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না; নিজের ধর্মমত বিষয়ে অন্যের সহিত সহজে কখনো তিনি আপোস করিতে পারিতেন না। এ তো গেল মতামতের বা তর্কবিতর্কের ব্যাপার; তবে এই বৎসরের একটি ঘটনা তাঁহার পরবর্তী জীবনেতিহাসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বলিয়া এইখানে উল্লেখ করিতেছি। ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ (১৮৯১ ডিসেম্বর ২২) শান্তিনিকেতনের মন্দির বা মঠের প্রতিষ্ঠা হয়; সেদিন কলিকাতা হইতে বহু লোক উপস্থিত হন, রবীন্দ্রনাথ 'সঙ্গীতকার্যে যোগদান করিয়া উপাসকমণ্ডলী'কে পরিতৃপ্তি দান করেন।[২] বোলপুরের সহিত কিভাবে মহর্ষির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সে-বিষয়ের ইতিহাস-আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি। মন্দির-প্রতিষ্ঠার চারি বৎসর পূর্বে (১২৯৪) ট্রাস্ট ডিড করিয়া মহর্ষি শান্তিনিকেতনের বাড়ি জমি সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ ও নিজ জমিদারির কিয়দংশ দেবত্র করিয়া দেন; দেবত্রের আয় হইতে শান্তিনিকেতনের অতিথিসেবা ব্রহ্মোপাসনা ও পৌষ-উৎসবাদির ব্যয় নির্বাহ হইত। ট্রাস্ট ডিড অনুসারে তথায় কোনো মূর্তি বা প্রতিমা বা প্রতীকের পূজা হইতে পারে না; ধর্মের নিন্দা, মদ্য মৎস্য মাংস-সেবন ও আহার, নিন্দনীয় আমোদ-আহ্লাদ প্রভৃতি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে রবীন্দ্রনাথ কল্পনাও করেন নাই যে এইখানে তাঁহার ধর্মসাধনার ও কর্মজীবনের কেন্দ্র হইবে; অর্ধশতাব্দীর মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হইবে।

শান্তিনিকেতনের উৎসবের পর রবীন্দ্রনাথকে জমিদারিতে ফিরিতে হয়, সম্পূর্ণ পৃথক জগতে। সেখান হইতে শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "আমাদের এই বিরাহিমপুরের সেরেস্তা আজ সবচেয়ে বিশৃঙ্খল— আমি মাস দুয়ের অধিককাল এটাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টায় আছি। এখনো পেরে উঠলুম না। এককালে এই পরগণা নীলকরদের ইজারাধীন ছিল, সেই সময়ে তারা অনাদরে কাগজপত্র সমস্ত নষ্ট করে বসে আছে। সেই অবধি এ পর্যন্ত এখানে গোলমাল চলেই আসছে।"[৩] এই পত্রেই তিনিই 'সাধনা' মাসিকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে "দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েছে। কারণ, আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।" এই আধ্যাত্মিক

১ দ্র. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশীযুগ পৃ. ১৪ পাদটীকা।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮১৩ শক (১২৯৮) মাঘ, পৃ. ১৯২।

৩ পত্রাবলী। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ, পৃ. ৩১।

কুয়াশার স্রষ্টা চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নব্যহিন্দুর দল। এই সময়ে 'সাহিত্য'[১] পত্রিকায় চন্দ্রনাথ 'আহারতত্ত্ব' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র (১২৯৮) পৌষ সংখ্যায় 'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর মত' শীর্ষক প্রবন্ধে এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত এইখানে বলিয়া রাখি, চন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ বহুবার পত্রিকার মাধ্যমে আক্রমণ করিলেও উভয়ের মধ্যে পত্র ও প্রীতির বিনিময় চিরদিন সমভাবেই ছিল। সাধনার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্প পড়িয়া চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে যে-পত্র লেখেন (২৫ পৌষ ১২৯৮) তাহাতে এই প্রবন্ধের কোনো উল্লেখ নাই।

'আহারতত্ত্ব' প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছিলেন যে, আহারের দুই উদ্দেশ্য, দেহের পুষ্টিসাধন ও আত্মার শক্তিবর্ধন। তিনি বলেন, আহারে দেহের পুষ্টি হয় এ কথা সকল দেশের লোকই জানে, কিন্তু আত্মার শক্তিবর্ধনও যে উহার একটা কার্যের মধ্যে এ-রহস্য কেবল ভারতবর্ষেই বিদিত। কেবল ইংরেজি শিখিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্ব ভুলিয়া ইংরেজি-শিক্ষিতগণ লোভের তাড়নায় পাশব আহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং ধর্মশীলতা, শ্রমশীলতা, ব্যাধিহীনতা, দীর্ঘজীবিতা, হৃদয়ের কমনীয়তা, চরিত্রের নির্মলতা, সাত্ত্বিকতা, আধ্যাত্মিকতা সমস্ত হারাইতে বসিয়াছেন। তিনি আরও বলেন 'নিরামিষ আহারে দেহমন উভয়েরই যেরূপ পুষ্টি হয়, আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় না।'

চন্দ্রনাথবাবুর মত ও রবীন্দ্রনাথের মত উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি সত্য—সে আলোচনা আমাদের কর্তব্য নহে; কিন্তু এই লইয়া একদিন সাহিত্যের কুঞ্জবনে যে-মাতামাতি হইয়াছিল এবং এইসব বিষয় লইয়া যে একদিন সাহিত্যিকরা মসীযুদ্ধ করিতেন, তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথবাবুর জবাবে লিখিলেন, "এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কোন সমাজ রচিত হইতে পারে না।· ·প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্যানশীল ব্রাহ্মণও ছিল এবং কর্মশীল ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রও ছিল, মগজও ছিল, মাংসপেশীও ছিল; সুতরাং স্বাভাবিক আবশ্যকতা অনুসারে আমিষও ছিল, নিরামিষও ছিল; আচারে সংযমও ছিল, আচারে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ছিল। যখন সমাজে ক্ষত্রিয়তেজ ছিল, তখনই ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইত· ·। অবশেষে সমাজ যখন আপনার যৌবনতেজ হারাইয়া আগাগোড়া সকলে মিলিয়া সাত্ত্বিক সাজিতে বসিল, কর্মনিষ্ঠ সকল বর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল, এই বৃহৎ ভূভাগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের পদানুবর্তী একটা ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখনি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিনাশ হইল। তখন নিস্তেজতাই আধ্যাত্মিকতার অনুকরণ করিয়া অতি সহজে যন্ত্রাচারী এবং কর্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিল। ভীরুর ধৈর্য আপনাকে মহত্তের ধৈর্য বলিয়া পরিচয় দিল, নিশ্চেষ্টতা বৈরাগ্যের ভেক ধারণ করিল।"

খাদ্যরসের সহিত আত্মার যোগ কোথায়, এই প্রশ্ন তুলিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "আহারের অন্তর্গত কোন কোন উপাদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞানে তাহা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই।· ·এ কথা সত্য বটে স্বল্পাহার এবং অনাহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়। সকল প্রকার নিবৃত্তির এমন সরল পথ আর নাই। কিন্তু প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার নামই যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন তাহা নহে।· ·প্রবৃত্তিকে যদি রিপু জ্ঞান করিয়া থাক তবে শত্রুহীন হইতে গেলে আত্মহত্যা করা আবশ্যক, কিন্তু তদ্দ্বারা শক্তি বাড়ে কি না তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য।· ·কর্মেই মনুষ্যের কর্তৃশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়। কর্মেই মনুষ্যের সমুদয় প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয় এবং সংযত করিতেও হয়। কর্ম যতই বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল, আত্মনিয়োগ এবং আত্মসংযমের চর্চা ততই অধিক।· ·প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের

১ এই 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অতি তরুণ সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (জন্ম ১২৭৬-মৃত্যু ১৩২৭); তখন তাঁহার বয়স মাত্র একুশ বৎসর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র কর্তৃক সাহিত্য পত্রিকা ১২৯৭ বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হয়।

সাধন এবং কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তির দমনই সর্বোৎকৃষ্ট।[১] প্রবন্ধের মধ্যে যেসব অবান্তর কথা-কাটাকাটি ছিল সেসব অংশ উদ্ধৃত করিয়া কোনো লাভ নাই।

চন্দ্রনাথবাবুর আহারতত্ত্বের জবাবে রবীন্দ্রনাথ কর্ম সম্বন্ধে যে-কথাগুলি প্রসঙ্গত উত্থাপন করেন তাহাই বোধ হয় 'কর্মের উমেদার' নামক একটি প্রবন্ধে বিশদ করিবার চেষ্টা করেন। য়ুরোপীয় সংসারযাত্রায় স্তূপীকৃত বস্তুভার ক্রমশই "কিভাবে দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে ইহা লইয়া আলোচনা শুরু হয়। সেখানে শোওয়া-বসা চলাফেরা অশন বসন ভূষণ সকল দিকেই তাহাদের এত সহস্র সরঞ্জামের সৃষ্টি হইয়াছে যে, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে অবাক্ হইতে হয়।" রবীন্দ্রনাথের মতে বস্তুভারের চাপে মানুষের হৃদয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত অকর্মণ্য হইবার উপক্রম হইতেছে। "সভ্যতার অসংখ্য আসবাব যোগাইয়া ওঠা দিন দিন অসামান্য চেষ্টাসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কল বাড়িতেছে এবং মানুষও কলের মতো খাটিতেছে।· ·লোহার কলের সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষকে সমান খাটিতে হইতেছে। কেবল বণিক সম্প্রদায় লাভ করিতেছেন ও ধনী সম্প্রদায় আরামে আছেন।" লেখক বলিলেন যে য়ুরোপের মানুষকে এরূপভাবে বেশিদিন পিষিয়া মারা যাইবে না। "য়ুরোপের মনুষ্যত্ব এইরূপ জীবন্ত এবং প্রবল থাকাতেই সহজে কোনো বিকারের আশঙ্কা হয় না। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ঘটিলেই আপনিই তাহার সংশোধনের চেষ্টা জাগিয়া উঠে।· ·মানুষ যেখানে স্বাধীন এবং স্বাধীনতাপ্রিয়, সেখানে সত্বরই হৌক বিলম্বেই হৌক সংশোধনের পথ মুক্ত আছে।"

ইহারই সহিত তুলনা করিলেন ভারতবর্ষের স্থিতিশীল জড়তামূর্তি। এ দেশের লোক সম্বন্ধে লিখিলেন, "যাহারা আপনার ধর্মবুদ্ধি এবং সংসারবুদ্ধি, দেহ এবং মনের প্রত্যেক স্বাধীনতাই বহুদিন হইতে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া আছে, গ্রন্থবৎ আচার পালন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনো-একটা নূতন বিপৎপাত হইলে স্বাধীন প্রতিকারচেষ্টা প্রবল হইয়া উঠে না, উত্তরোত্তর তাহার চরম ফল ফলিতে থাকে।· ·আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি।" আমাদের ধর্মকার্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এমনি বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিতেছে যে মন হইতে স্বাধীনতার অঙ্কুর পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে— স্বাধীনভাবে চিন্তাও করিতে পারে না, স্বাধীনভাবে কার্যও করিতে পারে না। নব্য হিন্দুসমাজকে সর্বপ্রকার গতিশীলতার বিমুখী -জ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে তাঁহাদিগকে মৃদু তিরস্কার ও শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।—সাধনা, ১২৯৮ মাঘ।

মাঘ-সংখ্যায় 'স্ত্রী-মজুর' নামে সংকলন-প্রবন্ধ ও 'দালিয়া' নামে ছোটগল্প বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই দেশী ও বিদেশী সাময়িকপত্র প্রচুর পাঠ করিতেন ; বিলাতী বহু শ্রেষ্ঠ পত্রিকার তিনি গ্রাহক এবং নিয়মিত পাঠক ছিলেন। এই সময়কার কোনো বিলাতী কাগজে য়ুরোপের কল ও মজুরদের সম্বন্ধে আলোচনা পাঠ করিয়া তিনি 'স্ত্রী-মজুর'দের সমস্যা লইয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন ; ইতিপূর্বে বাংলায় 'স্ত্রী-মজুরে'র সমস্যা সম্বন্ধে আর কেহ আলোচনা করিয়াছিলেন কি না আমরা জানি না।

---

১ সাধনা, ১২৯৮ পৌষ পৃ. ১৭১

সোনার তরী

বসন্তের অকালবোধন শরতে ; 'ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো আশ্বিনের আঙিনায়'। আর ফাল্গুনদিনে 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' হইতেই বাধা কিসের ? 'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রবাহপথে একটা বড় রকমের বাঁকে তাঁহাকে উত্তীর্ণ করিল। কাব্যলক্ষ্মীর নূতন বীথি মানসলোকে প্রকাশিত হইল। মানসী কাব্যগুচ্ছের শেষ কবিতা রচনার প্রায় পনেরো মাস পরে শিলাইদহ বাসকালে লিখিলেন সোনার তরী (১২৯৮ ফাল্গুন)— যদিও ইহা লোকচক্ষুর গোচর হয় প্রায় দেড় বৎসর পরে সাধনা পত্রিকায় (১৩০০ আষাঢ়)।[১]

কী কুক্ষণে রবীন্দ্রনাথ যে এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাগ্যবিধাতাই জানেন। নহিলে এই কবিতা প্রকাশিত হইবার চৌদ্দ বৎসর পরে (১৩১৪ সালে) ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার সাময়িক সাহিত্যে যে পরিমাণ অমৃত ও গরল যুগপত মথিত হইয়া উঠিয়াছিল— তাহা কবির কোনো একটি কবিতা সম্বন্ধে পূর্বে বা পরে কখনো ঘটে নাই। সে কি কবিতার দোষ, না কবিতা-লেখকের ভাগ্য !

'সোনার তরী' কবিতাটিকে যদি আমরা কেবল একখানি চিত্র হিসাবে দেখিতাম, তবে তাহাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু লোকে শুধু রসে তৃপ্ত হয় না— ভোজনের সহিত দক্ষিণার দাবী করে— অর্থাৎ কবিতার রসের সঙ্গে অর্থ চায়। তরী কখনো সোনার হয় না এবং সোনার নৌকায় চড়িয়া চড়িয়া কোনো চাষী ধান কাটিতে যায় না। সুতরাং কবিতার চিত্র ও নামকরণ দুইই অবাস্তব পরী-কল্পনা সদৃশ ; সুতরাং চিত্রহিসাবে দেখিলে কোনোই দোষ ছিল না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এমন একদিন আসিল, যখন এই কবিতার অর্থ আবিষ্কারের জন্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক সকলেই লেখনী লইয়া মসীসিঞ্চনে লাগিয়া গেলেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজ কাব্যের মল্লিনাথ হইয়া ব্যাখ্যাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তবে তাহা কবিতা রচনার সতেরো বৎসর পরে।

'সোনার তরী' কবিতার বিরুদ্ধে প্রথম জেহাদ ঘোষণা করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (প্রবাসী ১৩১৩ কার্তিক)। তিনি লেখেন, "রবিবাবুর ভক্তগণ রবিবাবুর 'সোনার তরী'কে তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষ স্থান দেন। সভায় সভায় ইহার আবৃত্তি হইয়াছে। একজন সমালোচক এইটি পড়িয়া লিখিয়াছিলেন যে, 'তাঁহার লেখনী অক্ষয় হউক'।" দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত কুৎসিতভাবে আক্রমণ করেন, ইহার পর হইতে বাংলা সাময়িক সাহিত্যে 'সোনার তরী'র উপর প্রবন্ধ রচনা শুরু হয়।

'সোনার তরী' লিখিবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কবিতার মাধ্যমে কোনো দার্শনিক অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। পরিপূর্ণ যৌবনে যে কবিতা রচিত, প্রৌঢ়ত্বের অন্তে উপনীত হইয়া উহাকে কবি কীভাবে দেখিতেছেন, তাহা আমরা পাঠকদের সম্মুখে পেশ করিতে পারি মাত্র, কিন্তু ফাগুন দিনে কবির মনে একটি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ দিনের সুর কেমন করিয়া ধ্বনিল, তাহার সমকালীন ইতিহাস অব্যক্তই রহিয়া যাইবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সোনার তরীর সমালোচনায় বলিয়াছিলেন, "'একখানি ছোটো ক্ষেত' হইতে 'রাশি রাশি ভারা ভারা ধান' হইয়াছে। ক্ষেত্রখানি বড়ই উর্বর ! ক্ষেতের 'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা'। ক্ষেতখানি তবে একটি দ্বীপ।

১ সাধনা, ২য় বর্ষ, ১৩০০ আষাঢ় পৃ. ১২৭-২৮। দ্র. সোনার তরী ১৩০০ [পৌষ] ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

তবে এ চরজমি। এরূপ জমিতে ধান করে না।” ইত্যাদি। এইটি রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই পড়িয়াছিলেন এবং সোনার তরী লইয়া যখন সাহিত্যিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, সেই পর্বে ‘তরীবোঝাই’[1] নামে ভাষণ দেন শান্তিনিকেতনে (৪ চৈত্র ১৩১৫)। স্পষ্টত এই ভাষণে কবি ‘সোনার তরী’ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হন। “মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত— ওই একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে···যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারি দিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার এই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই ক’রে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না— কিন্তু যখন মানুষ বলে ওই সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকেও রাখ,— তখন সংসার বলে, ‘তোমার জন্য জায়গা কোথায়? তোমাকে আমার নিয়ে হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।’

“প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না,— কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকে চিরন্তন ক’রে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনা স্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে— ওটা কোনো মতেই জমাবার জিনিস নয়।”

সোনার তরীর এই সম্যক ব্যাখ্যালোচনার কয়েকমাস পূর্বে ‘পূর্ব ও পশ্চিম’[2] (১৩১৫ ভাদ্র) প্রবন্ধে কবি মহাকালকেই সোনার তরীর ‘নেয়ে’ বলিয়াছিলেন। “গ্রীস ও রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্ত বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব হইয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।” ইহাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী সম্বন্ধে ব্যাখ্যানের প্রথম প্রয়াস।

তবে এখানে একটা কথা আমরা বলিতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাই যে এই কবিতার একমাত্র সংগত অর্থ, তাহা মানিবার কোনোই কারণ নাই। ‘পঞ্চভূত’ গ্রন্থে কাব্যের তাৎপর্য অধ্যায়ে ‘বিদায় অভিশাপ’ আলোচনা উপলক্ষে কবি এই তত্ত্বটি বিশদভাবেই আলোচনা করিয়া বলেন যে, কাব্যের অর্থ বহু ও বিচিত্র হইতে কোনো বাধা নাই। আমরা আজও দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচীন মহাকবিদের কাব্যের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য এখনো পর্যন্ত নিঃশেষিত হয় নাই। সুতরাং এ যুগের কবির কাব্যেরও বিচিত্র ব্যাখ্যা হইতে বাধা থাকিতে পারে না। ভিন্ন কালের ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পাত্রমধ্যে একই কাব্যের বিবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে। যে-কাব্য সেই বিচিত্রের দৃষ্টিসম্পাতে নানারূপে নানাভাবে সাড়া না দেয়, সে-কাব্য সাময়িক, সে-কাব্য স্থানিক, সে-কাব্য সাম্প্রদায়িক ও গ্রাম্য। তাই বলিয়াছিলাম ‘সোনার তরী’র বহু ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে— রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যাখ্যাতাদের অন্যতম।

বৃদ্ধ বয়সে অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ‘রবি-রশ্মি’ রচনাকালে কবির নিকট সোনার তরী সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করিয়া পাঠান, তার মধ্যে রচনার সময় সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল; কারণ রচনার সময় দেওয়া আছে, ‘ফাল্গুন’— রচনার বিষয় শ্রাবণের। কবি লিখিতেছেন (১৩৩৯) “যেদিন বর্ষার অপরাহ্ণে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙিনৌকা বোঝাই করে

১ তরীবোঝাই, শান্তিনিকেতন উপদেশমালা ৭ম খণ্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪।

২ পূর্ব ও পশ্চিম, প্রবাসী ১৩১৫ ভাদ্র পৃ. ২৮৮-২৯৬ দ্র. সমাজ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে সেই দিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজো আমার মনে আছে। সেই দিনই সোনার তরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনে নেই।· ·আমার দলিলের তারিখ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে, 'শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে।"

অবচেতন মনে এই চিত্রখানি ছিল, তার পর একদিন ফাল্গুনের উতলা হাওয়ার মৃদু স্পর্শে স্মৃতিপটের পর্দা অপসারিত হইলে 'সোনার তরী' লেখনীমুখে উৎসারিত হইল।

কর্মসম্বন্ধে কবির এমন নির্বিকারভাব হইবার কি কোনো কারণ আছে! 'কর্মের উমেদার' প্রবন্ধে ও 'স্ত্রী-মজুর' সম্বন্ধে প্রসঙ্গকথায় কবি কর্ম সম্বন্ধে বহু তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন; কর্মশীলতার পরিণাম কোথায় সেই প্রশ্নই কি মনে জাগিতেছিল, যাহার উত্তরে এই সোনার তরী কবিতা লিখিলেন? ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে না।

কবির মনে জাগিতেছে কোনো 'শ্রাবণগগনের' স্মৃতি। কিন্তু আজ এই আত্মীয়শূন্য আবেষ্টনীতে আরও সুদূর অতীতের ছবিও মনে হইতেছে, 'শৈশবসন্ধ্যা'র কথা

আখের খেতের পারে কদলী সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম, হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে যায়
কোন্ রাখালের ছেলে; নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু॥
দেখেশুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
শৈশবের; কত গল্প, কত বাল্যখেলা,
এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন—
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন।

ইহার সঙ্গে কল্পনায় জাগিতেছে—

কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংস্যঘণ্টা-মুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,
কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক॥

—শৈশবসন্ধ্যা, সোনার তরী

শৈশবসন্ধ্যার কথা মনে পড়ে, 'এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন'। এই সময়ে লিখিতেছেন, "আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে-ঘরে শয়ন করিতাম, তাহার পাশের ঘরের দেওয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্ খট্ শব্দ করিয়া নড়িত।" এই স্মৃতি[১] অবলম্বন করিয়া কঙ্কাল গল্পের কাহিনীটির সূত্রপাত হয়— বাস্তবে-অবাস্তবে মিশিয়া অপরূপ লিরিসিজিমের রসে রচিত ছোটগল্প। সেখানেও অপূর্ব কল্পনা, অমূলক আশা, অশেষ কামনার ব্যর্থ পরিণতি। 'কঙ্কাল' গল্পটি ফাল্গুন মাসের (১২৯৮) সাধনায় বাহির হয়— 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটি রচিত এই মাসেই।

এই কবিতাটির একটি ভাবব্যাখ্যা কবি স্বয়ং পত্রধারায় প্রকাশ করেন। "আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী; অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে— নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, সবসুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতান-শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়— তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।"[২]

বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, দারুণ গ্রীষ্ম। শিলাইদহের সম্মুখে বোটে আছেন। সেখান হইতে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন,[৩] "এখানে এসে আমি এত এলিমেন্টস্ অব পলিটিক্স[৪] এবং প্রব্লেমস্ অফ দি ফ্যূচার[৫] পড়ছি শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে।" আমাদের আশ্চর্য লাগে না, কারণ রবীন্দ্রনাথকে ত্রিশ বৎসরের উপর লক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং তিনি যে কতবড়ো পড়ুয়া ছিলেন, দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত থাকায় তাহা ভালো করিয়া জানিবার সুযোগও মিলিয়াছিল। ঐ পত্রমধ্যে কবি লিখিতেছেন, "ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে।" ইংরেজি নভেলের উগ্রতা পদ্মাচরের স্নিগ্ধ শোভাকে চারি দিকের নিস্তব্ধতাকে নষ্ট করে। "এখানে পড়বার উপযোগী রচনা· ·এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ· ·।" ইহারই সঙ্গে মনে হইতেছে "বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর ক'রে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত।" এই সময়েই বোধ হয় লেখেন মেয়েলি রূপকথা 'বিম্ববতী' (১২৯৮ ফাল্গুন) ও 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' (চৈত্র)। 'বিম্ববতী' সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ভাইঝি অভিজ্ঞার নিকট হইতে গল্পটি সংগৃহীত। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা অভিজ্ঞা কবির খুব প্রিয় ছিল; যখন-তখন সে ছোটকাকার ঘরে ঢুকিয়া অনেক উপদ্রব করিত; তাহার কণ্ঠও ছিল খুব মিষ্ট। কৈশোরেই তাহার মৃত্যু হয়; তাহার স্মৃতিবহন করিয়া চৈতালিতে কয়েকটি কবিতা আছে।

দারুণ গ্রীষ্মে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে বোলপুর আসিলেন। এ সময় কবির বয়স একত্রিশ; মৃণালিনী দেবী এখন তিনটি সন্তানের জননী— মাধুরীলতা (৬) রথীন্দ্র (৪) ও রেণুকা (২)। তাঁহারা থাকেন 'শান্তিনিকেতন' নামে দ্বিতল বাটীতে—

১ দ্র. সীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ. ৪০০-৪০১।

২ সাহাজাদপুরের পথ, জুলাই ১৮৯৪ (১৩০১ আষাঢ়), ছিন্নপত্র।

৩ পত্র ৪৪, ছিন্নপত্র। ৮ এপ্রিল ১৮৯২।

৪ *The Elements of Politics* (1883): By Henry Sidgwick (1838-1900), English and Social Philosopher. Samuel Laing (1812-1897), a British Author, Politician and Railway administrator, Financial Minister in India, 1960.

৫ *Problems of the Future*, Chapman, London.

আর কোনো গৃহ তখনো এই তেপান্তরের মাঠে নির্মিত হয় নাই— চারি দিকে সীমাশূন্য প্রান্তর। এই সময়কার কতকগুলি পত্রে যুবক রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যজীবনের ও সন্তানাদি সম্বন্ধে তাঁহার বাৎসল্য ও স্নেহ অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।[১] শান্তিনিকেতনের বৈশাখী ঝড়ের মাঝে পড়িয়া কবির একদিন কী দুর্গতি হইয়াছিল তাহার অতি সরল বর্ণনা আছে যাহা আজও উপভোগ্য। পত্রে লিখিতেছেন, "বাড়িতে ফিরে ভাবলুম বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিষ্টি কবিতা লিখেছেন; কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি, এরকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চুলগুলোর অবস্থা যে কিরকম হত সে তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। বেশবিন্যাসেরই বা কিরকম দশা? ধুলোতে লিপ্ত হয়ে তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে, কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্তি ক'রে গিয়েই দাঁড়াতেন!"[২]

সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক গদ্য লেখা প্রচুর লিখিতে হয় সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এবার শান্তিনিকেতনে বাসকালে যে-কয়েকটি কবিতা লিখিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি রূপকথারই অনুক্রমণ। 'নিদ্রিতা' (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) ও 'সুপ্তোত্থিতা' (১৫) কবিতাদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক এবং 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতার সহিত একত্র পঠনীয়। রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে রাজার ঘরে জন্মাইলেও তাহারা চিরন্তন পুরুষ ও চিরন্তন নারী— পুরুষের ভাষায় 'আমরা ও তোমরা'। কিছুকাল হইতে কবির নানা লেখার মধ্যে নরনারীর চারিত্রগত বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণের ও সমাজে নরনারীর যথাযথ স্থান-নির্দেশের চেষ্টা চলিতেছে। সে-বিশ্লেষণ 'কখনো জীবতত্ত্ব, কখনো অর্থতত্ত্ব, কখনো সৌন্দর্যতত্ত্ব'কে আশ্রয় করিয়া হইয়াছে; 'তোমরা এবং আমরা' (১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯০) কবিতায় আছে—

> তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
> কুলুকুলু কল নদীর স্রোতের মতো
> আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
> মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।

এ বিশ্লেষণ পূর্বোল্লিখিত কোনো তত্ত্বের অন্তর্গত নহে— ইহার নামকরণ করা যাক সুখতত্ত্ব। কিছুদিন পূর্বে শিলাইদহে নৌকাবাসকালে কবি নদীতীরে নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের জললীলামাধুরী লক্ষ্য করিবার সুযোগ পান; সেইসঙ্গে তাহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যও তাঁহার চোখে পড়ে। "মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব— পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে। জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল্ ছল্ জল্ জল্ করতে থাকে— একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ· · আমি দেখেছি, মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজপ্রবাহ এবং কলধ্বনি, জল এবং মেয়ে ছাড়া আর-কারও নেই।"[৩]

সুতরাং 'তোমরা এবং আমরা' কবিতা লিখিবার পূর্ব হইতেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য সম্বন্ধে তুলনা মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু 'তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া' যাবে— বলিলে নারীকে ক্ষুণ্ণ করা হয়; কারণ সে শুধু চলে না, সে বাঁধে ও বাঁধনে ধরা দেয়। যে-নারী ভালোবাসে সেই তো 'সোনার বাঁধন' পরে। তাই আমাদের মনে হয় 'সোনার বাঁধন' কবিতাটি যেন পূর্বোক্ত কবিতাটির উত্তর বা সমাধান।

---

১ ছিন্নপত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

২ ছিন্নপত্র, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ [২৮ মে ১৮৯২]।

৩ ছিন্নপত্র। ৭ এপ্রিল ১৮৯২ [১২৯৮ চৈত্র ২৬]।

তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে—
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।

দুইটি কবিতা পরস্পরের পরিপূরক, 'তোমরা এবং আমরা'য় আছে নারীচরিত্রের নেতির দিক, 'সোনার বাঁধন'এ আছে তাহার পরিণতি ও সার্থকতার দিক।

'তোমরা ও আমরা' কবিতাটি লিখিবার পর একখানি পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয়, হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে ক'রে তুলে দেবার মতো।··রোজ রোজ যদি একটি ক'রে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ একরকম আনন্দে কেটে যায়। কিন্তু এত দিন ধরে সাধনা করে আসছি, ও জিনিসটা এখনও তেমন পোষ মানে নি।"[১] কবিতা লিখিলে আনন্দ পান সত্য, নাটকেরও প্লট মাথায় ঘুরিতেছে। বোধ হয় এই নাটক হইতেছে— 'গোড়ায় গলদ'। এই নাটকের কল্পনা হইতেই কি রসিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন মনে জাগিতেছে? বোলপুর থাকিতেই আটদিন-পূর্বে-লিখিত পত্রমধ্যে রসিকতা সম্বন্ধে যে কথা-কয়টি বলেন তাহা নিজের সহিত নিজের বুঝাপড়ার মত। তিনি লিখিয়াছিলেন, রসিকতা জিনিসটা বড়ো বিপদের জিনিস। ও যদি প্রসন্ন সহাস্য-মুখে আপনি ধরা দিলে তো অতি উত্তম··। মেয়েরা রসিকতা করতে গিয়ে যদি মুখরা হয়ে পড়ে তবে সেটা ভারি অশোভন দেখতে হয়।···'কমিক' হতে চেষ্টা ক'রে সফল হলেও মেয়েদের সাজে না, নিস্ফল হলেও মেয়েদের সাজে না।···সৌন্দর্যের সঙ্গে বরঞ্চ প্রখরতা শোভা পায়, যেমন ফুলের সঙ্গে কাঁটা। তেমনি শাণিত কথা মেয়েদের মুখে বড্ড বাজে বটে, তেমনি সাজেও বটে। কিন্তু যে-সকল বিদ্রূপে কোনোরকম স্থূলত্বের আভাসমাত্র দেয়, তার দিক দিয়েও মেয়েদের যাওয়া উচিত হয় না।"

'বর্ষযাপনে' লিখিতেছেন—

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।

কবির বিচিত্রসাধ শিশুমনের ন্যায়ই নূতনের জন্য আবেগময় ও লালায়িত। পরদিন লিখিলেন 'হিং টিং ছট্'[২] ও তৎপরদিবসে 'পরশপাথর'[৩]— সম্পূর্ণ বিপরীত রসের দুইটি কবিতা। 'হিং টিং ছট্' রসাত্মক কবিতা বটে, তবে তাহা তীব্র ব্যঙ্গরস, পাঠকের উপভোগ্য হইলেও যাহাকে বা যাহাদের লক্ষ করিয়া উহা রচিত হইয়াছিল, তাহাদের পক্ষে আদৌ শ্রুতিসুখকর হয় নাই। কবির মনে অকস্মাৎ এই তীব্র ব্যঙ্গের উদ্ভব কেন হইল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এই ব্যঙ্গকবিতাটির লক্ষস্থল কে, তাহা লইয়া সমসাময়িক পত্রে এককালে বহু গবেষণা হইয়াছিল। তৎকালীন লেখকদের ধারণা হইয়াছিল যে কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসুকে লক্ষ্য করিয়া রচিত; কারণ যে-মাসের সাধনায় 'হিং টিং ছট্' বাহির হয়, সেই

১ ছিন্নপত্র, পৃ. ১৩৪। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২, [১২৯৯]।
২ হিং টিং ছট্, ১৮ জ্যৈষ্ঠ। শান্তিনিকেতন।
৩ পরশপাথর, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। সাধনা ১২৯৯ আষাঢ়।

সংখ্যায় 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' নামে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। আমাদের মনে হয় এই প্রবন্ধটি 'সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক' লেখার অন্যতম। চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্ব' প্রবন্ধ যে তাঁহার অবচেতন মনে কাজ করিতেছিল না, তাহা বলা সুকঠিন। কিন্তু ইহা যে চন্দ্রনাথ বসুকে লক্ষ্য[১] করিয়া লিখিত তাহা একখানি পত্রযোগে কবি অস্বীকার করেন। কিন্তু পরেও আমরা কয়েকবার দেখিয়াছি যে একটা বেফাঁস উক্তি বা মন্তব্য করিয়া কবি পরে প্রবলপক্ষের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও তাহা যে হয় নাই তাহা বলা যায় না।

এই সময়ে রূপকথার কবিতা লিখিতেছেন ; 'হিং টিং ছটে'র মধ্যে সেই রূপকথার পটভূমি আছে। কিন্তু অবচেতন মনে শশধর ও চন্দ্রনাথের আজগুবি ধর্মমতের কথাগুলি ছিল, কবিতায় তাহা স্পষ্ট হইয়া পড়িল।

আসলে চন্দ্রনাথই কবির মনে ছিলেন ; কারণ চন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে "শশধর তর্কচূড়ামণি যেমন বলিলেন ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম— তেমনি আমার সংশয় দূর হইল, বিশ্বের যাহা কিছু আছে সকলই ধর্মের অন্তর্গত দেখিলাম। যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম।" —(বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ৬৯১)। এই শ্রেণীর যুক্তিরই উপযুক্ত উত্তর 'হিং টিং ছটে'র স্বপ্নকথা—

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া
'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।'

'হিং টিং ছটে'র পরদিন লিখিলেন 'পরশপাথর' ; ইহা যে কবির শ্রেষ্ঠ কবিতারাজির অন্যতম, তাহা প্রায় সর্ববাদী-সম্মত। শান্তিনিকেতনে বাসকালে ইহাই এবারকার মত শেষ কবিতা রচনা। ইহার পরে প্রায় একমাস তাঁহার সহিত কাব্যলক্ষ্মীর আর দেখাশুনা হয় নাই। শান্তিনিকেতন-বাসের 'ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি' ঘিরিয়া 'পরশপাথর' কবিতাটির কল্পনা উদয় হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাঁহাদের আশ্রিত এক প্রাক্তন ফরাসি সৈনিক 'একটা ছোটো হাতুড়ি নিয়ে আর-একটা থলি কোমরে ঝুলিয়ে···খোয়াইয়ে দুর্লভ পাথর সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বড়ো গোছের স্ফটিক সে পেয়েছিল।· ·আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জনের লোভে নয় পাথর উপার্জন করতেই।'[২] শান্তিনিকেতনের পুরানো স্মৃতি, ভোরের পাখির অকারণ ডাক, সব কবির মনের অবচেতন স্তরে ছিল। 'পরশপাথরে'র মধ্যে উপমাচ্ছলে যে লিখিয়াছিলেন,—

বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারা নিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা।
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন,
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।

এই চিত্রটি সেদিনের পত্রধারার মধ্যে[৩] প্রকাশ পাইয়াছে। পরশপাথর সন্ধানের মধ্যে যে-ব্যর্থতা পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যেন পাখির ডাকের অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে রূপ লইয়াছে।

---

১ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তর্কবৈচিত্র্য, সাহিত্য ১২৯৯ ফাল্গুন। কবিতার লক্ষ্যস্থল চন্দ্রনাথ বসু। তিনি রবীন্দ্রনাথকেই এই বিরোধের জন্য দায়ী করেন। নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন' পুস্তকে চন্দ্রনাথ বসুর কথা উল্লেখ যেখানেই করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাকে 'হিং টিং ছট্' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। দ্র. রবিরশ্মি, পূর্বভাগে।

২ আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৫০-৫১।

৩ ছিন্নপত্র। বোলপুর, ৩১ মে ১৮৯২ (১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ), পৃ. ১৯১।

মানুষ খ্যাপার মত জীবনের দুর্লভ ক্ষণের অনুসন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে ; সে সর্বদা ভাবিতেছে স্পর্শমণি পাইলে জীবন সার্থক হইবে। অর্থাৎ জীবনকে পাইতে হইলে বিশেষ সময়ে বিশেষ কোনো পদার্থের স্পর্শ প্রয়োজন ; কিন্তু কর্মপ্রবাহের মধ্যেই যে তাহার জীবন পরিপূর্ণ হইয়া চলিয়াছে, তাহা সে জানে না। দৈনন্দিন কর্ম-অভ্যাসের ফলে জীবনের পরম সুন্দর মুহূর্তগুলিকে সে উপেক্ষা করিয়া চলে, তাহাদের দিকে ফিরিয়া তাকায় না। অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করে তাহার অন্তহীন কর্মশৃঙ্খলের মধ্য দিয়া জীবনের চরম সার্থকতাকে সে কোনো দুর্লভ ক্ষণে লাভ করিয়া গিয়াছে। সে জানে না কেমনভাবে তাহা সাধিত হইল। সে জানিতে পারে নাই, কখন তাহার লৌহকঠিন জীবন স্বর্ণময় হইয়াছে। জীবন-প্রবাহে কিসের আঘাতে কখন সে জীবন সার্থক হয় তাহা বলা বড় কঠিন। প্রতিদিনের অভ্যস্ত কর্মের ব্যস্ততায় তাহা সে লক্ষ করে নাই। যে স্পর্শমণির সন্ধানে সে জীবন ব্যাপিয়া কর্মসাগরকে মন্থন করিয়া বেড়াইয়াছিল, সেই পরশপাথরকে সে পাইয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞানতঃ নহে। তাই সে এক সময়ে জানিতে চায় কোন্ মুহূর্তে কিসের স্পর্শে জীবন তাহার স্বর্ণময় সুন্দর ও সার্থক হইয়াছে। খ্যাপা বুঝে না যে, সে যাহার সন্ধানে ফিরিতেছে তাহা কোনো বিশেষ বস্তু নহে— সেটি জীবনধারার সমগ্র সাধনা, বিশেষের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান নিরর্থক।

বর্ষাকালে পদ্মায় : ১২৯৯

বোলপুর হইতে জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগে (১২৯৯) চলিলেন উত্তরবঙ্গে। স্ত্রী পরিবার কলিকাতায় রহিয়া গেলেন। নৌকায় আছেন শিলাইদহের ঘাটে, আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহটা কাটিয়া গেল সেখানে। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘদূতের কথা মনে পড়ে ; নানা চিন্তার উদয় হয় বর্ষণমুখর দিনে ; আপনার সহিত আপনি কথা কহিয়া যান দীর্ঘপত্র মধ্যে। মনে পড়িতেছে, হাজার বৎসর পূর্বের কালিদাসের কথা, "সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করছিলেন"— কবি লিখিতেছেন, "আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশজোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়· ·। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন ব'লে অবজ্ঞা করে। কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত।"[১]

কিন্তু মনের মধ্যে কিসের একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কলিকাতায় বোধ হয় একটা-কিছু আঘাত পাইয়াছিলেন ; তাহা না হইলে শিলাইদহে আসিয়া এ কথা কেন লিখিবেন, "এসব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না।· ·'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'। বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা। ইচ্ছা করে, দিনরাত্রি বিচার-আচার বিবেকবুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর-মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না করে, একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি।· ·একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছাড়া দিতে পারতুম· ·একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম! কিন্তু আমি বেদুইন নই, বাঙালী।[২] আষাঢ়ের প্রথম দিবস লইয়া কবিত্ব ও উচ্ছ্বাস-আবেগ প্রকাশ করিয়াও পূর্বোল্লিখিত পত্রে লিখিতেছেন, "আমি অন্তরে অসভ্য, অভদ্র— আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারি সুন্দর অরাজকতা নেই? ইত্যাদি। প্রথার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কর্মের যে-দ্বন্দ্ব, তাহা হইতে মুক্তি খুঁজিতেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁহার অন্তরের গভীর সৌন্দর্যবোধ হইতে তাঁহার পক্ষে অরাজক অনিয়ন্ত্রিত অসুন্দর জীবন-যাপন

১ পত্র ৫৩, ছিন্নপত্র। ২ আষাঢ় ১২৯৯।

২ ছিন্নপত্র, ৩১ জ্যৈষ্ঠ

করা অসম্ভব। বলা বাহুল্য, এগুলি সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র— কন্‌ভেন্‌শনালিটির উপর স্বগতোক্তি। সত্য বাণী বাহির হইল এই পত্রধারায়, "সহজ ভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর-কিছু হতে পারে না।"[১] "বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করেই রাখি!"[২]

ইতিমধ্যে সাজাদপুর আসিয়াছেন; সেখান হইতে স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "ঢুলতে ঢুলতে গড়াতে গড়াতে সাধনার কাজ" করিতে হইতেছে। সঙ্গে আছে জমিদারীর কাজ, গ্রাম্য-স্কুলের ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব, পুণ্যাহ প্রভৃতি লৌকিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন।[৩] পুণ্যাহ জিনিসটা আজকালকার লোকের জানার কথা নয়; পুণ্যাহ অর্থে জমিদারি বৎসরের আরম্ভ-দিন। 'পঞ্চভূতে' কবি লিখিতেছেন, "আজ প্রজারা যাহার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর-পরা বরবেশধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে। সে টাকা সেদিন গণনা করিবার নিয়ম নাই। অর্থাৎ খাজনার দেনা-পাওনা যেন কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত একটা আনন্দের কাজ। ইহার মধ্যে একদিকে নীচ লোভ, অপরদিকে হীন ভয় নাই।" পূর্বরাত্রে কোথা হইতে লোকে একটা ব্র্যাসব্যাণ্ড আনিয়াছে। বাজনাবাদ্যের মধ্যে কবির ভাষায় "খাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাদ্য বাজিতেছে।" স্ত্রীকে লিখিত সমসাময়িক এক পত্রে জমিদারি পরিচালনা করিতে হইলে যেসব উপদ্রব করিতে হয়, তাহার সহিত কবিত্বের যে কোনো যোগ নাই, তাহা প্রায় স্পষ্ট করিয়াই কবুল করিতেছেন।[৪] "কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে বনিবনাও আর কিছুতে হয়ে উঠল না দেখচি।" জমিদারী-উপসত্ত্ব-ভোগ সম্বন্ধে কবির অন্তরে দ্বিধা বরাবরই নানা স্থানে রচনার মধ্যে, পত্রধারায় প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু আদর্শে-বাস্তবে সম্পূর্ণ যোগ স্থাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া শেষ পর্যন্ত দুঃখও রহিয়া গিয়াছিল।

ইহার মধ্যে মানুষ ও গৃহী রবীন্দ্রনাথের রূপটি প্রকাশ পায়, যখন কলিকাতা হইতে স্ত্রীর পত্র পান না; মৃণালিনী দেবীকে লিখিতেছেন, "তোমাদের মত এত অকৃতজ্ঞ আমি দেখিনি।··চিঠি লিখে লিখে কেবল তোমাদের অভ্যাস খারাপ করে দেওয়া হয়।··তুমি যদি হপ্তায় নিয়মিত দু খানা করে চিঠিও লিখতে তা হলেও আমি যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করতুম।··· আমি মূর্খ কেন যে মনে করি তোমাকে রোজ চিঠি লিখলে তুমি হয়তো একটুখানি খুশি হবে এবং না লিখলে হয়ত চিন্তিত হতে পার, তা ভগবান জানেন।" পত্রখানি পড়িলে রবীন্দ্রনাথের ভিতরের মানুষটিকে দেখা যায়।

এইবার উত্তরবঙ্গ-ভ্রমণকালে রচিত তিনটি কবিতা সোনার তরীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে— বৈষ্ণব কবিতা (১৮ আষাঢ় ১২৯৯), দুই পাখি (১৯শে) ও আকাশের চাঁদ (২২শে)।

ধর্মশাস্ত্রে বলে দেবতার ছাঁচে মানুষ তৈয়ারী হইয়াছে— মানুষকে বলা হয় ইমেজ অব গড। কবি দেখিতেছেন সম্পূর্ণ বিপরীত ভঙ্গিতে; তিনি বলিতে চান মানুষের রূপে দেবতারা সৃষ্ট। অন্তরের মধ্যে যে প্রেমলীলা চলিতেছে তাহার আধার মানুষ যেমন দেবতাও তেমন—

সত্য করে কহ মোরে, হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,

১ ছিন্নপত্র, ১৬ জুন

২ ছিন্নপত্র, ২৮ জুন

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১, পৃ. ৮০।

৪ চিঠিপত্র ১ম, পৃ. ২২-২৩

কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
· ·এই প্রেমগীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে— প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।[১]

এই কথাই 'চৈতালি'তে বলেন 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা'। —পুণ্যের হিসাব। পঞ্চভূতের মধ্যে 'মনুষ্য' প্রবন্ধে (সাধনা ১৩০০ বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমতত্ত্ব অন্যভাবে আলোচনা করিয়াছেন, "যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। জীবের জন্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।· ·সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।"

'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা' -বাক্যের মধ্যে বেশ একটু দ্বৈতবোধ, এমনকি দ্বন্দ্বও আছে বলিয়া মনে হয়। একদিকে দেবতা অপরদিকে মানব, একদিকে বিশ্ব অপরদিকে পরিবার। এই অসীম ও সীমা এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি, এই শাশ্বত সত্য ও লৌকিক আচার, এই বিশ্বমানবতা ও সাংসারিক বাস্তবতা— সবের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ; একদিকটা অন্যদিকের বিকৃতি বা antithesis মনে হইলেও তাহারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত।

এই দ্বন্দ্ব বনের পাখি ও খাঁচার পাখির মধ্যেও—

দু জনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা
কাতরে কহে— কাছে আয়।
বনের পাখি বলে— না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখি বলে— হায়
মোর শকতি নাহি উড়িবার।[২]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চিরকালের এই দ্বন্দ্ব, এই ক্রন্দন, এই আত্মখণ্ডন— ইহাকে নিরাকৃত করিতে গিয়া যত বিপ্লবের জন্ম।

"আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন জগতের সমস্ত নূতন নূতন দেশ ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমরশক্তিকে বিচিত্র বিপুল ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর-একজন শতসহস্র

১ বৈষ্ণবকবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।
২ দুই পাখি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

অভ্যাসে বন্ধনপ্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর-একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর-একজন খাঁচার পাখি। এই বনের পাখিটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে ও বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"[১]

মানুষের চিরন্তন দ্বন্দ্বের সমাধান এ নয় যে প্রকৃতি বা বাস্তবকে নিশ্চিহ্ন করিয়া অবিচ্ছিন্ন সমাধির মধ্যে আত্মবিসর্জন— যদিও সাধারণতঃ ধর্মপ্রচারকগণ এই প্রকৃতির সংসর্গ ত্যাগের জন্য মানুষকে বৃথাই উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। মুমুক্ষু ক্রন্দন করিয়া বলে—

'তোমাদের আমি চাহি না কারেও,
শশী চাই করতলে।'· ·
হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ—
এই হল তার বুলি।
দিবসরজনী যেতেছে বহিয়া,
কাঁদে সে দু-হাত তুলি।· ·
অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশি বাকি নাই,
এমন সময়ে সহসা কী ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে,
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধুতীরে।· ·
দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ
সুন্দর লোকালয়
প্রতিদিবসের হরষে বিষাদে
চির-কল্লোলময়· ·
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহে নি কখনো ফিরে,
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা
স্মৃতি-সাগরের তীরে।· ·
দু-বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায়
ওই জীবনের মাঝে।· ·
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়
তার বেশি কিছু নহে।· ·[২]

১ বিহারীলাল: আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯।

২ আকাশের চাঁদ, সোনার তরী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

কয়েকদিন পূর্বে কবি শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন, "এইসমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠছে, এর পরে এমন-একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে, যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তা হলে আর কিছু অসাধ্য সাধন করতে চাই নে, কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই।"[১]

পদ্মার জীবন কেবল কবিতার ছন্দরচনা ও জমিদারি যন্ত্রচালনা নহে। জমিদারি যন্ত্রের মধ্যে হাজার রকমের ঝঞ্ঝাট আছে— ফটিক মজুমদারের মকদ্দমায় প্রতিবাদীর পক্ষের উকিল বক্তৃতায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে কি কি কথা বলিয়াছে, তাহাও মন দিয়া শুনিতে ও তারপর যথাযোগ্য ব্যবস্থা দিতে হয়। "সাবেক ইজারাদারদের নামে বাকি-খাজনার ডিক্রি করা হয়েছে— তারা সুদ মাপ নিয়ে কিস্তিবন্দী করে টাকা দিতে চায় এবং তাদের দেনার মধ্যে যেসমস্ত ওজর আছে তারও একটা সদ্বিচার" করিতে হয়। এই শ্রেণীর কাজ অগণিত!

জমিদারি উপসত্বভোগী হিসাবে সবটাই মধু নয়, হুলও আছে। বর্ষার পদ্মায় এবার দুইবার কবির জীবন সংকট হয়, ২০ জুলাই স্ত্রীকে ও ইন্দিরা দেবীকে যে পত্র দেন, তাহাতে একটি দুর্ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "আজ আর-একটু হলেই আমার দফা নিকেশ হয়েছিল। তরীর সঙ্গে দেহতরী আর-একটু হলেই ডুবেছিল।"

রবীন্দ্রনাথ যৌবনে খুবই শক্তিমান ছিলেন; পদ্মায় সাঁতার দিতে বা দীর্ঘ সময় নৌকা বাহিতে তাঁহার সমপর্যায়ের কোনো ব্যক্তি ছিলেন না।

এইসব দুর্ঘটনা ঘটিবার পর মনে হইল তাঁহার কোষ্ঠী দেখাইবেন। প্রিয়নাথ সেন ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে ভালোরকম পড়াশুনা করিতেন; প্রশ্ন উঠে কবি কি হাত দেখা, কোষ্ঠী করা প্রভৃতিতে বিশ্বাসবান ছিলেন? হয়তো ছিলেন— কারণ তিনি বলিতেন বিশ্বাস করা যেমন গোঁড়ামি, বিশ্বাস করিব না তাহাও আর-এক শ্রেণীর গোঁড়ামি; মনকে খুলিয়া রাখো— পরীক্ষা করো— সত্যাসত্য নির্ণীত হইবে।

সাধনার ছোটগল্প

সাধনা যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি হইতেছে ছোটগল্প। 'হিতবাদী'তে (১২৯৮ বৈশাখ) ছোটগল্পের যে-নূতন ধারা রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করিয়াছিলেন কী কারণে তাহা কয়েক মাসের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়, সেকথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সাধনার টানে ছোটগল্প পুনরায় দেখা দিল[২]; প্রথম বৎসরে প্রতি মাসে একটি করিয়া গল্প লেখেন।

১ পত্র ৫৮, ছিন্নপত্র ২৮ জুন ১৮৯২।

২ সাধনার প্রথম বর্ষের গল্পের তালিকা—

১। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, ১২৯৮ অগ্রহায়ণ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬।
২। সম্পত্তি-সমর্পণ, ১২৯৮ পৌষ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬।
৩। দালিয়া, ১২৯৮ মাঘ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬।
৪। কঙ্কাল, ১২৯৮ ফাল্গুন। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬।
৫। মুক্তির উপায়, ১২৯৮ চৈত্র। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬।
৬। ত্যাগ, ১২৯৯ বৈশাখ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭।
৭। এক রাত্রি, ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭।

এই সব গল্পের নায়ক নায়িকা— যদি তাহাদের সে আখ্যা দেওয়া যায়— কবির চোখে-দেখা মানুষ, কানে-শোনা তাহাদের কাহিনী। উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে বাসকালে ও নদীপথে বেড়াইবার সময়ে বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শে তাঁহাকে আসিতে হয় ; যে-সব সমস্যা লইয়া গল্পের সৃষ্টি, তাহার অনেকখানিই সেইসব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম-কাহিনী, দুঃখের ইতিহাস। কিছুটা দেখিয়া কিছুটা শুনিয়া— অবশিষ্টটা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝিয়া অপরূপ কল্পনার রঙে রাঙাইয়া, অতুলনীয় ভাষার সাহায্যে যাহা প্রকাশ করিলেন, তাহাই হইতেছে ছোটগল্প। এখানে বলা আবশ্যক গল্প ছোট হইলেই ছোটগল্প হয় না ; ছোটগল্পের একটি বিশেষ রীতি আছে। 'ছোটগল্প' ও উপন্যাসের মধ্যে যে-প্রভেদ, তাহা কেবল আকারগত নহে, অনেকটা প্রকৃতিগত। তা ছাড়া আমাদের দেশে উপন্যাস হইতে ছোটগল্পেরই উপাদান পাওয়া যায় বেশি। রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক প্রতিভা আবিষ্কার করিয়াছিল যে, আমাদের সমাজের "জীবনযাত্রা যেরূপ সংকীর্ণপরিসর ও বৈচিত্র্যহীন, তাহাতে ছোটগল্পের সহিতই ইহার একটা স্বাভাবিক সংগতি ও সামঞ্জস্য আছে।" শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "আমাদের জীবন যেসমস্ত ক্ষুদ্র বিক্ষোভের দ্বারা আন্দোলিত হয়, তাহা ছোটগল্পের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সহজেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে ; যতটুকু মাধুর্য ও ভাবগভীরতা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক কার্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালার মধ্যে সহজেই ধরিয়া রাখা যায়। তাহার জন্য উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের প্রয়োজন নাই।" [১]

এই যুগের প্রথম গল্প হইতেছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। পদ্মার রাক্ষুসে ছবি দিয়া গল্পের আরম্ভ ও মানুষের ব্যর্থ জীবনের হাহাকারে পরিসমাপ্তি। বিশ্বপ্রকৃতির অতুলনীয় শোভা ও জড়ের নির্বিকার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মানব-প্রকৃতির স্নেহ প্রেম বাৎসল্য এবং তাহার মূঢ় হৃদয়হীনতার এমন অদ্ভুত সমাবেশ খুব কম গল্পেই দেখা যায়। পর মাসে লিখিত 'সম্পত্তি-সমর্পণ'ও নিষ্ঠুর ট্রাজেডি, সেখানে কাহারো বিন্দুমাত্র সুখ বা আনন্দ নাই। উভয় গল্পের মধ্যে ঘটনা সমাবেশের বৈপরীত্যে যেন মিল আছে। রাইচরণ নিজ কর্তব্য পালনের অনবধনতার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জানিয়া শুনিয়া শান্তচিত্তে দুঃখকে বরণ করিয়া লইল ; নিজ পুত্রকে অনুকূলের হস্তে সমর্পণ করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। অপর দিকে অনুকূল পরের ছেলেকে নিজের আত্মজ বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত ঘরসংসার করিতে লাগিলেন— এইখানে নিদারুণ ট্রাজেডির মধ্যে একটু বিদ্রূপ চাপা থাকিয়া গেল। দ্বিতীয় গল্পে যজ্ঞনাথ নিজ পুত্রকে না চিনিতে পারিয়া ক্ষিপ্ত অবস্থায় তাহাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিল ; উন্মত্তের সান্ত্বনার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বৃন্দাবন ওরফে দামোদর পালের জন্য লেখক কোনো সান্ত্বনা, এমন কি মিথ্যা সান্ত্বনারও ব্যবস্থা না করিয়া হাহাকারের মধ্যে গল্পটিকে সমাপ্ত করিলেন।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি প্রকাশিত হইলে চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, "গল্পটি আমাকে বড়ো সুন্দর বোধ হইয়াছে।· পরিমাণে যৎকিঞ্চিৎ, গুণে অপূর্ব।···এ ছবিটা মনে এমনি বসিয়া গিয়াছে,· ·যে কখনই মুছিয়া

৮। একটি আষাঢ়ে গল্প, ১২৯৯ আষাঢ়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭।

৯। জীবিত ও মৃত, ১২৯৯ শ্রাবণ-ভাদ্র। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭।

১০। রীতিমতো নভেল, ১২৯৯ আশ্বিন। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭।

১১। স্বর্ণমৃগ, ১২৯৯ আশ্বিন। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭।

১২। জয় পরাজয়, ১২৯৯ কার্তিক। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭।

১ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প : অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি-পরিচিতি, পৃ. ৮৬।

যাইবে না। এটা প্রতিভার তুলিতে আঁকা। তোমার তুলিতেও বোধ হয় আর এমন ছবি উঠে নাই।"[১] সমসাময়িকদের মত হিসাবে যে এইটি কেবল উদ্ধৃত হইল তাহা নহে, চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে কী স্নেহ করিতেন, ইহা তাহারও নিদর্শন।

সাধনার গল্পগুলি অধিকাংশই ট্রাজেডি। কতকগুলির পরিসমাপ্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর— যেমন সম্পত্তি-সমর্পণ, কঙ্কাল, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ ও জয়পরাজয়। বিধবা যুবতীর প্রেমের শেষ পরিণতি যাহা সংসারে প্রায়ই ঘটে, সাহিত্যস্রষ্টার হাতে পড়িয়া কী অপরূপ সৌন্দর্যে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে, তাহারই নিদর্শন হইতেছে 'কঙ্কাল' গল্পটি। ছোটবেলাকার পড়ার ঘরে টাঙানো নরকঙ্কালের স্মৃতি হইতে 'কঙ্কাল' গল্পের উদ্ভব।[২]

'জীবিত ও মৃত' গল্পটি কিভাবে তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন; একদা বাড়িতে বহু কুটুম্বিনীর ভিড় হওয়ায় তাঁহাকে গভীর রাত্রে বাহিরের ঘরে শুইতে যাইতে হয়। অন্ধকারে অন্দর হইতে বাহির মহলে আসিতে আসিতে তাঁহার মনের মধ্যে এই অদ্ভুত কল্পনা জাগে, তিনি যেন ফিরিয়া গিয়া বলিতেছেন, 'ছোটবউ, আমি যাই নাই।'[৩] এই কল্পনার সূত্র ধরিয়া গল্পটির সৃষ্টি। 'কঙ্কাল' এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পদ্বয়ই মৃত্যুবনিকাতে শেষ হইয়াছে।

দুইটি গল্পেই নারীহৃদয়ের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে; কঙ্কালের নারী দলিতা ফণিনীর ন্যায় নিষ্ঠুরা, সে নারী সহজে মরে নাই, যাহাকে ভালোবাসিয়াছিল তাহাকে মারিয়া সে মরিল। 'মুক্তির উপায়' ও 'স্বর্ণমৃগ' গল্পদ্বয়েও নারী-চরিত্রগুলি বড় মনোহারিণী নহে; তাহারা সুরাপাত্রে গোপনে বিষ প্রয়োগ করে নাই সত্য কিন্তু প্রতিদিনের বাক্যরসে হতভাগ্য পুরুষদের জীবনকে এমনি জর্জরিত করিয়াছিল যে উভয়কেই গৃহছাড়া করিয়া তবে তাহারা শান্তি পাইয়াছিল।

'দালিয়া'[৪] গল্পটি ইতিহাসের ক্ষীণধারা অবলম্বনে আরম্ভ; ভীষণ ট্র্যাজেডিতে পরিসমাপ্তির মুখেই তাহাকে অনির্বচনীয় মিলনোৎসবের প্রারম্ভে শেষ করিলেন। কোনো চরিত্রই আতিশয্যদোষে দুষ্ট হয় নাই, কোনো চরিত্র ফোটেও নাই। 'ত্যাগ' গল্পেও বহু দুঃখবেদনাপূর্ণ ঘটনা আছে; হিংসা প্রতিহিংসা স্বল্পপরিসর গল্পে অত্যন্ত ঠাসা। গল্পের ধারা যেভাবে শুরু ও ঘটনাপরম্পরা যেভাবে চলিয়াছিল, তাহাতে শেষ পর্যন্ত আশঙ্কা ছিল বুঝি প্রেমেরই পরাজয় হইবে; কিন্তু লেখক অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে হেমন্তের মুখ দিয়া বলাইলেন, "আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না· ·আমি জাত মানি না।" 'সাহসের সঙ্গে' ইচ্ছা করিয়া ব্যবহার করিয়াছি। কারণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ও বড়গল্পে যেসব প্রণয়ীরা পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহারা সকলেই স্বজাতীয়। অর্থাৎ জাত ভাঙিয়া কাহাকেও বিবাহ করিতে হয় নাই; জাত বাঁচাইয়া সকলে প্রেম করিয়া চলিয়াছিল, তাই হেমন্তের মুখে 'আমি জাত মানি না'

১ চিঠিপত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ১৩৫১, পৃ. ৪২৭।

২ "ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।" (নানাবিদ্যার আয়োজন, জীবনস্মৃতি)

৩ সীতাদেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ. ৪০১-৪০২ ; মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৮২।

৪ চল্লিশ বৎসর পরে এই গল্পটি অবলম্বন করিয়া *The Maharani of Arakan* নামে একখানি নাটক ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯১২), Calderon তাহার রচয়িতা; কেদারনাথ দাশগুপ্তের উদ্যোগে উহা অনূদিত, প্রকাশিত, ও অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে; এই নাটকটির জন্য ইংরেজি একটি মূল গান রচনা করিয়া দেন— বোধ হয় ইহাই তাঁহার একমাত্র rhymed ইংরেজি কবিতা। শাহ্ সুজার কন্যারা কিভাবে তাহাদের পিতার সহিত আরাকানে পৌঁছায় সে-কাহিনী রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ইতিপূর্বে বলিয়াছিলেন।

কথাটায় খুবই সৎসাহসের সমর্থন হইয়াছে। তা ছাড়া ট্র্যাজেডি বা মেলোড্রামাটিক করিবার লোভ যে সংবরণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। 'মুক্তির উপায়' গল্পটি পড়িলে ফকিরচাঁদের উপরে করুণা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটিকে পরে অভিনয়োপযোগী নাটকে পরিবর্তন করেন।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের গল্প হইতেছে 'একটি আষাঢ়ে গল্প'। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে 'সুপ্তোত্থিতা', 'নিদ্রিতা', 'হিং টিং ছট্', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', প্রভৃতি রূপকথা-ঘেঁষা কবিতা লিখিতেছিলেন, এই গল্পটি সেই সময়ের রচনা (সাধনা ১২৯৮ আষাঢ়)। এই গল্পের মধ্যে একদিকে আছে রূপকথার আমেজ, আর-একদিকে আছে রূপকের আভাস। সমাজজীবনের গতানুগতিকের বিদ্রূপটাই রূপক-রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই রূপক কথায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ পরযুগে লিখিত 'অচলায়তন'এ প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব সুন্দর নাটকীয় ঘটনারাজির মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন; এই আষাঢ়ে গল্পের মধ্যে তাসের দেশের মানুষদের যে-বিদ্রূপ রহিয়াছে, তাহা যথার্থভাবে গতিহীন সমাজের নিয়মদেবতার পূজারই সমালোচনা। বহু বৎসর পরে (১৩৪০ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটিকে অবলম্বন করিয়া 'তাসের দেশ' নাটিকা রচনা করেন। গল্পটির মধ্যে রচনার উদ্দেশ্যটা এতই প্রকট যে উহা সমসাময়িক সাহিত্যিক বা সমালোচকের দৃষ্টিই আকর্ষণ করে নাই। কিন্তু 'তাসের দেশ' একটা নূতন সৃষ্টি। যথাস্থানে সে-বিষয়ে আলোচনা হইবে।

সাধনায় সমালোচনা

'সাধনা' প্রকাশিত হইবার সঙ্গেসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে গদ্য রচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। সাহিত্যের ধর্ম বা লক্ষণ কি, বিশুদ্ধ সাহিত্য-বিচারের মানসূচী কি প্রভৃতি বিষয় পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যে নূতন কোনো রূপসৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকেন, তখন সেই রীতি বা পদ্ধতিকে কেবল শিল্পীর চোখে দেখেন না, দার্শনিক বা ক্রিটিকের দৃষ্টিতে তাহাকে যাচাই করিতে ভালোবাসেন, নিজের সৃষ্টিকেই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে চেষ্টা করেন। 'সাধনা' প্রকাশের মাস তিনেকের মধ্যে তিনি ও তাঁহার বন্ধু লোকেন পালিত[১] এই শ্রেণীর সাহিত্যের রসবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধনার পৃষ্ঠায় স্রষ্টার ও রসজ্ঞের যুগ্ম সাহিত্যবিচার এখনো উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লোকেনকে এক পত্রে লিখিতেছেন, "লেখা সম্বন্ধে তুমি যে-প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিকপত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা অনেক সহজ।· · কাজটা দু রকমে নিষ্পন্ন হতে পারে। এক কোনো-একটা বিশেষ বিষয় স্থির করে দু জনে বাদপ্রতিবাদ করা।· · আর-এক, কেবল চিঠি লেখা— অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য না রেখে লেখা, কেবল লেখার জন্যেই লেখা।· · দস্তরমত রাস্তায় চলতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবার জো থাকে না। কিন্তু প্রাপ্য জিনিসের চেয়ে ফাউ যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় বেশি আমোদ পাওয়া যায়।· · অবশ্য, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কথা বললে একেবারে পাগলামি করা হয়; কিন্তু তাই বলে নিজের নাসাগ্রভাগের সমসূত্র ধরে ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত একেবারে সোজা লাইনে চললে নিতান্ত কলে তৈরি প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়, মানুষের হাতের কাজের মতো হয় না।"[২] এই ধরণের আঁটাআটির রচনায় লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু তাহা সাধারণ পাঠকের মনে স্থায়ী ফলপ্রদ হয় কিনা সন্দেহ। এইজন্য সত্যকে মানবের জীবনাংশের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিলে সেটা লোকের ভালো লাগে।

১ লোকেন পালিত এই সময়ে (৫ অগস্ট ১৮৯১— ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯২) ঢাকা মানিকগঞ্জ মহকুমার জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

২ পত্রালাপ, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮।

গল্প, উপন্যাস, মহাকাব্যের মধ্য দিয়া মানবের জীবনাংশরূপে যে সত্য প্রকাশিত হয়, তাহাই মানুষ মনে রাখে। রবীন্দ্রনাথ এখন গল্প লিখিতেছেন, তাই আমাদের মনে হয় এইসব গল্পের মধ্য দিয়া যে-বিচিত্র সত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহারই সমর্থনে এই যুক্তি প্রযুক্ত হয়।

এই পত্রের একস্থানে তিনি বলিতেছেন যে ইংরেজি কাগজ এবং বইগুলোর মধ্যে বক্তব্য-বিষয়কে বাড়াইয়া তুলিয়া কোনো-একটা কথাকে একটা প্রবন্ধে এবং একটা প্রবন্ধের বিষয়কে একটা গ্রন্থে পরিণত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। সহজ কথাকে অত্যন্ত ঘোরালো-প্যাঁচালো করিয়া তোলা হয়; ফলে সত্যটুকুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ছোটগল্পের মধ্যে অনেক কথা গল্পের মধ্যে বলা যাইতে পারে, ইহা যেন তাহারই সমর্থনে লেখা। ইংরেজি নভেল সম্বন্ধে লেখকের এই মতের সহিত 'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্গত সমসাময়িক একখানি পত্র তুলনীয় (১৮৯২ এপ্রিল ৮); এই পত্রে আছে, "যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম, ইংরিজি সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম, এবং যত রকম হিজিবিজি হাঙ্গাম।· ·কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস; কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা।"

লোকেন পালিতকে যে-পত্র লেখেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমার তো মনে হয়, বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যত বড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরেজি নভেলিস্টের অনুকরণে বাংলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেন নি, তা হলে বড় অসহ্য হয়ে উঠত।· ·এক-একটা ইংরেজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক যে, আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্বরতা।· ·এমন-কি জর্জ্ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভালো লাগে তবু এটা আমার বরাবর মনে হয়, জিনিসগুলো বড়ো বেশি বড়ো— এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হত।· ·ক্ষমতা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য দেখে মানুষ খুশি হয়। স্থায়িত্বের পক্ষে সহজতা সরলতা সৌন্দর্য যে প্রধান উপকরণ তার আর সন্দেহ নেই।"[১]

এই পত্রে সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলিলেন, তাহা লইয়া অনেক সমালোচনা সাহিত্যক্ষেত্রে হইয়াছে— "সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা যাক যাতে লোকে অবিলম্বে জানতে পারে যে, সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে। আমার ভালো লাগা, আমার মন্দ লাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্তমান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক্; তা হলেই সত্যকে নিতান্ত জড়পিণ্ডের মতো দেখাবে না।" রবীন্দ্রনাথের মূল কথা ছিল সাহিত্য হইতেছে লেখকের আত্মপ্রকাশ।[২] কিন্তু কথাটা তিনি যেভাবে বলিলেন, তাহা পরিষ্কার হয় নাই— লেখকের খামখেয়ালী বা তাহার ভালোলাগা মন্দলাগাই সত্যের একমাত্র মাপকাঠি এ তত্ত্ব সকলে মানিতে নাও পারে। সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বটি আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি 'সাহিত্য' নামে এক পত্র-প্রবন্ধ লেখেন (সাধনা ১২৯৯ বৈশাখ)। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন, "সাহিত্যের কার্যকে· ·দুই অংশে ভাগ করা যেতে পারে। আত্মপ্রকাশ এবং বংশপ্রকাশ। গীতিকাব্যকে আত্মপ্রকাশ এবং নাট্যকাব্যকে বংশপ্রকাশ নাম দেওয়া যাক।· ·লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং লেখকের বাহিরের সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতা বলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়; এই

১ পত্রালাপ, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮।

২ "আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে, স্বাধীনতার আনন্দ।" পত্র ৪৯, ছিন্নপত্র।

সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেইসকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না।” তিনি বলিলেন যে কালিদাসের শকুন্তলা ও মহাভারতের শকুন্তলা এক নহে, “তার প্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নন, উভয়ের অন্তরপ্রকৃতি ঠিক এক ছাঁচের গঠিত নয়।” সেইজন্য তাঁহারা বাহিরের মানবপ্রকৃতি হইতে যে-দুষ্মন্ত-শকুন্তলা গঠিত করিয়াছেন তাহাদের আকার-প্রকার ভিন্ন রকমের হইয়াছে। তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এ কথা স্বীকার করিতে রাজি নহেন যে “কালিদাসের দুষ্মন্ত অবিকল কালিদাসের প্রতিকৃতি”; কিন্তু এটুকু তাঁহাকে মানিতে হইল “তার মধ্যে কালিদাসের অংশ আছে নইলে সে অন্যরূপ হত।” তিনি লিখিলেন, “ভালো নাট্যকাব্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা করে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য।” রবীন্দ্রনাথের মতে যেখানে বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিতভাবে কাজ করে বা এক কথায় যেখানে আদত মানুষ আপনাকে প্রকাশ করে সেখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। “পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে, এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।”

মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করিল; কিন্তু সে-সাহিত্যের স্বরূপ কি, সাহিত্যের সত্য পদার্থ কি, ইহাও বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ তাহাও স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন— “লেখাপড়া দেখাশোনা কথাবার্তা ভাবনাচিন্তা সবসুদ্ধ জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে· ·একটা মোট সত্য পাই। সেইটেই আমাদের জীবনের মূল সুর। সমস্ত জগতের বিচিত্র সুরকে আমরা সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নেই,· ·সেই মূলতত্ত্ব অনুসারে। আমরা সংসারে বিরক্ত অথবা অনুরক্ত, স্বদেশবদ্ধ অথবা সার্বভৌমিক, পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক, কর্মপ্রিয় অথবা চিন্তাপ্রিয়।· ·আমার জীবনের মধ্যে সেই-যে একটি জীবন্ত ব্যক্তিগত পরিণতি লাভ করেছে, সেইটি আমার রচনার মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা অলক্ষিতভাবে আত্মা-স্বরূপে বিরাজ করবেই। আমি গীতি-কাব্যই লিখি আর যাই লিখি কেবল তাতে যে আমার ক্ষণিক মনোভাবের প্রকাশ হয় তা নয়, আমার মর্মসত্যটিও তার মধ্যে আপনার ছাপ দেয়। মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূলসত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে; এইজন্যে একেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে, জ্যামিতির সত্য কখনো সাহিত্যের সত্য হতে পারে না। এই সত্যটি বৃহৎ হলে পাঠকের স্থায়ী এবং গভীর তৃপ্তি হয়, এই সত্যটি সংকীর্ণ হলে পাঠকের বিরক্তি জন্মে।”[১]

লোকেন্দ্রনাথ ‘সাহিত্যের উপাদান’ কি এ বিষয়ে এক পত্র-প্রবন্ধ লেখেন; তাহারই জবাবে রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্যের প্রাণ’ কি এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তিনি এক স্থানে লিখিলেন, “যতই আলোচনা করছি ততই অধিক অনুভব করছি যে সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।· ·মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে· ·তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর-কোথাও থাকবে না— কেবল সাহিত্যে থাকবে। সংগীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এইজন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার।”[২] আরও কিছুদিন পরে তিনি এই প্রসঙ্গেই লিখিলেন, “নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক, আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হোক— মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আর-সমস্ত উপলক্ষ্য।

১ পত্রালাপ ২, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮।

২ পত্রালাপ ৩, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮।

"প্রকৃতি-বর্ণনাও উপলক্ষ্য, কারণ, প্রকৃতি ঠিকটি কিরূপ তা নিয়ে সাহিত্যের কোনো মাথাব্যথা নেইই, কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারি দিকে কিরকম ভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্যে তাই দেখায়।.. সৌন্দর্যপ্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।" পত্রের শেষে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আমার বলা উচিত ছিল, লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব-প্রকাশ সাহিত্যের উদ্দেশ্য। কখনো নিজত্বদ্বারা, কখনো পরত্বদ্বারা কখনো স্বনামে, কখনো বেনামে। কিন্তু একটা মনুষ্য-আকারে। লেখক উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য।"

লোকেন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিষয় লইয়া আলোচনার ফলে তাঁহার নিজের কাছেই সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইল— এ কথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। পাঠকের স্মরণ আছে, কিশোরবয়সে তিনি 'ভারতী'তে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন ; এবার হইল 'সাধনা'র পৃষ্ঠায়।[১] প্রৌঢ়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষদে বক্তৃতাকালে যে-আলোচনা করেন তাহা 'সাহিত্য' গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। বার্ধক্যে এ বিষয়ে বিচার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতারাজিতে পুনরায় পাওয়া যাইতেছে।

সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনাটি আমরা একস্থানেই বিচার করিলাম ; সুতরাং কালানুক্রমিক ইতিহাস বলিতে গেলে আমাদিগকে পুনরায় একটু পিছাইয়া যাইতে হইবে।

সাহিত্যসম্বন্ধীয় আলোচনা ব্যতীত 'সাধনা'য় অন্যান্য গদ্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্ব'র সমালোচনা। ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছে 'আহারতত্ত্ব' লইয়া। সাহিত্য পত্রিকায় (১২৯৮ মাঘ) চন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জবাব 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব'— সাধনায় পাঁচ মাস পরে বাহির হয় (১২৯৯ আষাঢ়), ও তাহার পর পুনরায় লেখেন 'সাহিত্যে নব্য লয়তত্ত্ব'। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাসকালে এই 'নিত্যনৈমিত্তিক' লেখাটি রচনা করেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতেই হিং টিং ছটের মধ্যে লয়তত্ত্বের ব্যঙ্গ প্রকাশ হইয়া পড়ে ; সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছিলেন, 'হিন্দুর লয়তত্ত্বের আদর্শ সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এই নির্গুণ অবস্থা হইতে গেলে যে একেবারেই সংসারে বিমুখ হইতে হইবে তাহা নহে, বরঞ্চ সংসারধর্ম পালন সেই অবস্থা প্রাপ্তির একটি মুখ্য সোপান। কারণ, যাঁহারা মনে করেন নির্গুণ অবস্থা লাভের অর্থ আত্মনাশ "তাঁহারা বড়ো ভুল বুঝেন— তাঁহারা বোধ হয় তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সংকীর্ণতা বা বিকৃতিবশত আমাদের লয়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ।" তাঁহার মতে নির্গুণতা-প্রাপ্তির অর্থ 'আত্মসম্প্রসারণ'। স্বার্থপরতা হইতে পরার্থপরতা এবং পরার্থপরতা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে ক্রমশ নির্গুণতারূপ আত্মসম্প্রসারণ, ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় মাত্র। অতএব পরার্থপরতার সম্যক্ অভ্যাসের জন্য সংসারধর্ম পালন অত্যাবশ্যক। আবার যাঁহারা বলেন লয়তত্ত্ব মানিয়া চলিতে গেলে বিজ্ঞানশিক্ষা সৌন্দর্যচর্চা দূর করিতে হয় তাঁহারাও ভ্রান্ত। কারণ, "পদার্থবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাখ্যাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয়, সেসকলই লয়প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিস। বিশ্বের সৌন্দর্য... ব্রহ্মভক্ত... যেমন অনুভব করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না। প্রকৃত সৌন্দর্যে মানুষকে ব্রহ্মেই মজাইয়া দেয়।"[২]

১ রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিতের মধ্যে পত্র বিনিময়— রবীন্দ্রনাথ— আলোচনা. সাধনা ১২৯৮ ফাল্গুন। সাহিত্য. ১২৯৯ বৈশাখ। লোকেন্দ্রনাথ— সাহিত্যের উপাদান. ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের প্রাণ. ১২৯৯ আষাঢ়। লোকেন্দ্রনাথ—সাহিত্যের নিত্য লক্ষণ. ১২৯৯ শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথ— মানবপ্রকাশ. ১২৯৯ ভাদ্র-আশ্বিন। সাহিত্য, বিশ্বভারতী ১৩৬১ সংস্করণে সাধনার প্রবন্ধগুলি আছে। আলোচনা, সাহিত্য, সাহিত্যের প্রাণ ও মানবপ্রকাশ।

২ সাধনা, ১২৯৯ আষাঢ়।

রবীন্দ্রনাথ ইহার জবাবে প্রথমেই লিখিলেন যে চন্দ্রনাথবাবু 'সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া' তুলিয়াছেন যাহা অভূতপূর্ব। "প্রথম কথা। ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ বুঝিতে পারি, কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের মধ্যে ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না।· ·দ্বিতীয় কথা। 'সৃষ্টিকৌশলে'র মধ্যে 'বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কি করিয়া যে ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলা' কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? 'লীলা' কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা-শক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? 'সৃষ্টিকৌশল' জিনিসটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোনো যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে? সৌন্দর্যের একমাত্র কার্য চিত্তহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেমস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন সৃষ্টির সৌন্দর্য তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালোবাসেন এই সৌন্দর্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অনেক নিয়মপাশে বাঁধিয়া আমাদিগকে বলপূর্বক কাজ করাইয়া লইতে চান তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশ্বের সৌন্দর্যে তিনি আমাদিগকে বংশিস্বরে আহ্বান করিতেছেন— তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণরাধার রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্যে ও প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।· ·সৌন্দর্য বিরাট লয় প্রার্থীদিগকে যে কি করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে 'মজাইতে' পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।· ·

"যাঁহারা যথার্থ লয়তত্ত্ববাদী তাঁহারা লয়কে লয়ই বলেন, ইংরাজি শিখিয়া তাহাকে আত্মসম্প্রসারণ বলেন না। তাঁহাদের কাছে সৌন্দর্য কদর্য কিছুই নাই, এইজন্য তাঁহারা অতি কুৎসিত বস্তু ও চন্দনকে সমান জ্ঞান করেন। জগৎ তাঁহাদের কাছে যথার্থই অসৎ, মায়া, বিশ্বনাথের কৌশল ও লীলা নহে।"

নব্য সম্প্রদায়ের নিকট অদ্বৈতবাদ ও বৈষ্ণব আরাধনা, ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও প্রতিমাপূজা প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য আছে তাহা গভীরভাবে চিন্তার বিষয় ছিল না। সমস্তকে সমভাবে গ্রহণ করার নাম ছিল সমন্বয় বা synthesis। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর একীকরণতাকে কখনো শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই।

এই সময়ে নব্য আন্দোলনের ভিতরে গুরুবাদ, শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, বেদের অভ্রান্তবাদ প্রভৃতি এমন কতকগুলি মত প্রচারিত হইতেছিল, যেগুলি কোনো বুদ্ধিমান স্বাধীনচিন্তাপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা কঠিন, চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ শিক্ষিত সাহিত্যিকগণ ও বঙ্গবাসীর লেখকগণ বাংলা দেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের প্রবর্তক না হইয়া তাহার বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন, এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথকে তীব্রভাবেই বিঁধিতেছিল। দেশের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথবাবু উপলক্ষ্য মাত্র।

তিনি একটি প্রবন্ধে[১] বলিলেন, "যে-জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে, তাহার বিশ্বাসের বল থাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলো অমূলক বিশ্বাস কিম্বা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি।" গুরুই হউন আর অবতারই হউন— কেহ জোর করিয়া কিছু করাইতেছেন, এই ভাবনাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসহ্য। তাঁহার মতে "আর-একজনের কর্তৃত্ব যে সহ্য করিতে পারে সে আদিম মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে।" এই প্রবন্ধে তিনি বলিলেন— মানুষের যুক্তির পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাকে কলের মত চালাইয়া নিবিরোধে কাজ আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের চরম সম্পদ মনুষ্যত্ব সেখানে লুপ্ত হইয়াছে। "সেখানে চিন্তা যুক্তি আত্মকর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভ্রম বিরোধ সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম লোপ পাইয়া

১ আদিম সম্বল, সাধনা প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৯৯ আষাঢ়, পৃ ১৭৮-১৮২।

যাইবে, কেবল কলের ধর্ম কাজ করা তাহাই চলিতে থাকিবে। কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয়, তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয় কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।" তবে কি তিনি কোনো কাজেই কর্তৃত্বকে বিশ্বাস করেন না? তাহা নহে। তিনি মানুষকে অপরিসীম স্বাধীনতা দানে বিশ্বাস করিয়া তাহার ভিতরের যথার্থ মানুষকে জাগ্রত করিয়া সেই মানুষের কাছ হইতে কাজ চান— দাসের কাছ হইতে নয়; সেইজন্য তিনি যুক্তির উপর জোর দিয়াছেন— গুরুবাদের উপর নহে। রবীন্দ্রনাথের এই মতের চরম দৃষ্টান্ত হইতেছে তাঁহার শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী। উহা নির্ভুল কলের সাহায্যে গঠিত নহে, ভ্রমস্বভাবী মানুষকে লইয়া গঠিত। সেইজন্য শান্তিনিকেতনে আসিয়া লোকে নিয়মের ত্রুটি ধরিতে পারেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুভব করেন যে উহা দোষগুণসম্পন্ন মানবহৃদয়ের জীবন্ত সামগ্রী, ছাঁচে ঢালা জিনিস নহে। regimentation-এর দ্বারা আশু ফললাভ করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে শান্তম্ শিবম্ ও সুন্দরম্‌কে হারাইতে হয়।

সাধনার বিচিত্র রচনাসম্ভারের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যে কেবল সমৃদ্ধ করিতেছেন তাহা নহে, ভাবের বাহন ভাষা, ভাষার ঐশ্বর্য শব্দ, সেই শব্দসাগর মন্থন করিয়া যথাযথ অর্থনির্ণয়, নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি ও প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারেও তিনি সর্বদা নিবদ্ধ দৃষ্টি। 'সাধনা'য় এক বৎসরের মধ্যে তিনি শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আটটি আলোচনা করেন।[১]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার 'শব্দকথা' (১৩২৪) গ্রন্থের মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিকট ধ্বন্যাত্মক শব্দ আলোচনার জন্য তিনি কি পরিমাণে ঋণী তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ লিখিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আবিষ্কার করেন।" তিনি আরও বলেন যে স্বরসাম্যের নিয়মও তাঁহার আবিষ্কার।[২]

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথকে এই যুগে আলোচনা করিতে দেখি। 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধটি সাধনায় (১২৯৯ শ্রাবণ) প্রকাশিত হয়। তিনি পরযুগে বহু প্রবন্ধে ও পত্রে ছন্দের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাই বোধ হয় ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ। ১২৯০ সালের ভারতীতে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত 'সিন্ধুদূতের সমালোচনায় প্রসঙ্গতঃ বাংলা ছন্দের আলোচনা ছিল; এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া কাহারো কাহারো বিশ্বাস।[৩] আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে কবি লিখিলেন, "বাংলা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই, অথবা যদি থাকে সে এত সামান্য যে তাহাকে নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এইজন্যই আমাদের ছন্দে অক্ষর গণিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়াছে। কথার প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা সমান। কারণ, কোনো স্থানে বিশেষ ঝোঁক না থাকাতে অক্ষরের বড় ছোট প্রায় নাই সংস্কৃত উচ্চারণে যে দীর্ঘ-হ্রস্বের নিয়ম আছে তাহাও বাংলায় লোপ পাইয়াছে। এই কারণে উচ্চারণ হিসাবে বাংলা ভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তরভূমির মতো সর্বত্র সমান।··শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সংগীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণত বাংলা ভাষায় অসম্ভব।··বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথার যে-অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়।··যতক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে, ততক্ষণ সংগীত ছাড়ে না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া আর কবিতা নাই বলিলে হয়।"

১ সাধনা ১২৯৮ চৈত্র, "নিছনি" (১)। ১২৯৯ বৈশাখ, 'নিছনি' (২)। জ্যৈষ্ঠ, 'পঁহু'। আষাঢ়, 'স্বরবর্ণ-অ'। শ্রাবণ, [পঁহু] প্রত্যুত্তর (১)। কার্তিক, 'স্বরবর্ণ-এ'। অগ্রহায়ণ, টা টে টো চৈত্র [পঁহু] প্রত্যুত্তর (২)। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯; শব্দতত্ত্বের পরিশিষ্ট।

২ বাংলার বাণী ১৩১৮। ভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১০৩-৫।

৩ প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২০— রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ— বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ শ্রাবণ।

সংস্কৃত সম্বন্ধে ঠিক বিপরীত কথা খাটে ; সংস্কৃতে সংগীত নাই, কারণ, "সংস্কৃত শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ, সুতরাং সংস্কৃত কাব্যে রচনার সাধ গানে মিটাইতে হয় নাই, বরং গানের সাধ কাব্যে মিটিয়াছে। মেঘদূত সুরে বসানো বাহুল্য।"

হিন্দি সম্বন্ধে বলিলেন, "কথাকে সামান্য উপলক্ষ মাত্র করিয়া সুর শুনানই হিন্দি গানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাংলা গানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুরসংযোগ গৌণ। এইসকল কারণে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।"

সংস্কৃত হিন্দি ও বাংলা ভাষা ও কাব্যের বৈশিষ্ট্য এমন সুন্দরভাবে তিনি আর কোথাও বলিয়াছেন বলিয়া জানি না। দুঃখের বিষয়, তাঁহার গদ্য গ্রন্থাবলীতে এই প্রবন্ধটি নাই।

চিত্রাঙ্গদা

সাধনার বিচিত্র রচনাসম্ভার সরবরাহের মধ্যে শীর্ণ অবসরের ফাঁকে দুইখানি বিপরীত প্রকৃতির নাটক যুগপৎ ভাদ্র মাসে (১২৯৯) প্রকাশিত হইল—"চিত্রাঙ্গদা" নাট্যকাব্য ও "গোড়ায় গলদ" প্রহসন। চিত্রাঙ্গদা রচিত হয় এক বৎসর পূর্বে (১২৯৮ ভাদ্র ২৮)। উড়িষ্যার জমিদারি তদারককার্যে নিযুক্তিকালে পাণ্ডুয়ার কুঠিতে। বৎসরকাল গ্রন্থখানি না ছাপাইয়া ফেলিয়া রাখা হয় কেন তাহা আমরা জানি না ; বোধ হয় খসড়ার পরে অনেকখানি মাজাঘসা করেন। তা ছাড়া তরুণ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ কাব্যখানির জন্য ছবি আঁকিতেছিলেন বলিয়াও এই বিলম্ব হইতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন কুড়ি কি একুশ বৎসর মাত্র ; পড়া ছাড়িয়া কলিকাতা গবর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল গিল্‌হাডির কাছে বিলাতী রীতিতে ছবি আঁকা শিখিতেছেন। সুতরাং 'চিত্রাঙ্গদা'র ছবির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের কোনো বৈশিষ্ট্য আশা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও উপদেশে তিনি এই কাব্যের জন্য ছবি আঁকেন। তজ্জন্য তিনি এই গ্রন্থ তাঁহাকেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন, "বৎস, তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহ-আশীর্বাদ দিলাম। ১৫ শ্রাবণ ১২৯৯।"

মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের যে-সামান্য কাহিনী আছে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই অপরূপ কাব্যনাট্য লিখিত হয়। নরনারীর যৌন-অনুরাগে পরস্পরকে পাইবার শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা এই কাব্যে ভাষা পাইয়াছে। মানব-বুভুক্ষার আদিম প্রেরণাকে কবি স্থূল হস্তে স্পর্শ করেন নাই—যদিও তাহার অবসর ছিল যথেষ্ট ; উহাকে লইয়া সৌন্দর্যলোকের একটি নূতন স্বর্গ, নারীচিত্তের একটি অপরূপ মহিমা সৃষ্টি করিলেন। ভাষার মধ্য দিয়া শব্দের 'কুহকজাল' প্রধানতঃ নিন্দার্থক দীপ্তিতে কী অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে, তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইতেছে 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য।

রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার কাহিনীটি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহাই অনুসরণ করিব। অনঙ্গ-আশ্রমে মদন ও বসন্ত আছেন ; চিত্রাঙ্গদা উপস্থিত হইয়া তাহার ইতিহাস বলিতেছে—

আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুর-রাজকন্যা
মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি

তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতা বাক্য
মাতৃগর্ভে পশি দুর্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।· ·

তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে ; নাহি জানি লজ্জা, ভয়,
অন্তঃপুরবাস, নাহি জানি হাবভাব,
বিলাস-চাতুরী ; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে· ·

একদিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে একাকিনী

দেখিনু সহসা
রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে· ·

· ·সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার,· ·
শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে,· ·
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।· ·

পরদিন প্রাতে— দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি।· ·

গোপনে গেলাম সেই বনে
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে।—· ·

মনে নাই ভালো,
তার পরে কী কহিনু আমি, কী উত্তর

শুনিলাম।· ·শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল—
'ব্রহ্মচারিব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।'

নারীর আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল, 'পুরুষের ব্রহ্মচর্য!' তাই চিত্রাঙ্গদা মদনের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে—

শুধু এক দিবসের তরে ঘুচাইয়া দাও,
জন্মদাতা বিধাতার
বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ
করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী।

চিত্রাঙ্গদার পুরুষ-কঠিন নারী রূপ অর্জুনকে মুগ্ধ করে নাই ; তাই সে আজ মদন ও বসন্তের আশীর্বাদে বর্ষকালব্যাপি নারীর অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হইল। কুরূপ পরিবর্তিত হইয়া গেল। চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে, 'হায়, আমারে করিল অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা, মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ 'ক্ষণস্থায়ী।'

অর্জুন একদা তাহাকে দেখিলেন 'সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে।' অর্জুন অরণ্যের শিবালয়ে আছেন, সহসা চিত্রাঙ্গদা সেখানে উপস্থিত হইল। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের পরিচয় গ্রহণ করিল, কিন্তু নিজের পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইল না, অর্জুন তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন—'তোমার হৃদয়দ্বারে প্রেমার্ত অতিথি'। চিত্রাঙ্গদা বিস্মিত, এ কী পরিবর্তন! সেদিন যে-পুরুষ তাহার নারীত্বকে তাচ্ছিল্য করিয়াছিল আজ রূপের কাছে আত্মাহুতি দিতে সে-ই প্রস্তুত। তাই সে কহিল,

ধিক্, পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে। কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত।

পুরুষের ব্রহ্মচর্য! ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মচর্য! সত্যই আজ রূপের মোহে অর্জুন সমস্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত! চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে ভালোবাসিয়াছে বলিয়াই সে চাহে না যে অর্জুন কামনার বহ্নিতে সমস্ত সাধনা দগ্ধ করেন ; তাই সে বলিতেছে—

মিথ্যারে করো না উপাসনা।
শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও।

চিত্রাঙ্গদা জানে তাহার এই রূপ ক্ষণকালের। কিন্তু অনতিকাল পরেই মদন ও বসন্তের কৃপায় চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে স্বামীরূপে লাভ করিল। কিন্তু ইহাতে তাহার অন্তরের বেদনা ঘুচিল না। সে জানে অর্জুন যাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, সে তাহার সৌন্দর্যকে, তাহার বহিরাবরণকে একটি রূপসী নারীকে, তাহার ছদ্মরূপকে। সে যখন কেবল সাধারণ নারীরূপে অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল তখন তিনি ব্রহ্মচর্যের অছিলায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আজ তাহাকেই গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু তিনি জানেন না যে এই সেই উপেক্ষিতা কুরূপা নারী। আজ চিত্রাঙ্গদা বসন্তের সহায়তায় অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্য চিরস্থায়ী নহে। তাই সে মদনকে

বলিতেছে— 'এই ছদ্মরূপিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে'। মানুষ প্রেমকে বহু বন্ধনে বাঁধিতে চায়, মানব লোকালয়ে প্রেয়সীকে পাইতে চায়। তাই চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে—

যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নামধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়।
তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।· ·
· ·যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানেনি। সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

সত্যই তো সৌন্দর্যের কোনো নাম নাই— বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্য তো নাই। অর্জুন সাধারণ নারী চিত্রাঙ্গদাকে একদা পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাহার কৃত্রিম সুন্দর রূপকে সম্ভোগের জন্য বীরের হৃদয় তাহার আজন্মের অর্জিত পুণ্যকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হইল না। অর্জুন তো চাহেন নাই সামান্য নারীকে, তিনি চাহিয়াছিলেন নারীর বিশ্বমোহন রূপকে— অনঙ্গ বসন্তের কৃপায় ক্ষণকালের জন্য যাহার উদ্‌ভব। কিন্তু 'রূপ নাহি ধরা দেয়, বৃথা এ প্রয়াস'।

এমন সময়ে বনচরগণের নিকট হইতে চিত্রাঙ্গদার নাম ও তাহার যথার্থ পরিচয় লাভ করিয়া অর্জুনের বীর হৃদয় সেই বীরাঙ্গনাকে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। ছদ্মরূপী চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে—

কুৎসিত, কুরূপ। এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার— এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে।· ·
· ·যামিনীর নর্ম সহচরী,
যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী
সতত প্রস্তুত থাকে বাম হস্তসম
দক্ষিণ হস্তের অনুচর, সে কি ভালো
লাগিবে বীরের প্রাণে?

পুরুষের হৃদয় নারীকে চায় নারীরূপে, দেবীরূপে নহে, মায়ারূপে নহে। অতৃপ্ত থাকে তাহার অন্তর, অসম্পূর্ণ হয় তাহার জীবন।

বর্ষশেষে চিত্রাঙ্গদা নিজ মানবী রূপ ফিরাইয়া পাইল। সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন আজ তাহার নাই, আজ সে চিত্রাঙ্গদা, রাজকুমারী, মণিপুররাজদুহিতা। অর্জুনকে বিদায়ের ক্ষণে বলিতেছে—

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।
কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।
আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ বিস্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সংসার-জীবনের চরম সার্থকতা প্রকাশ পাইয়াছে এই কয়টি পংক্তির মধ্যে। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশিত[১] হইবার প্রায় সতেরো বৎসর পরে (১৩২৬), এই নাট্যকাব্যের মধ্যে কতখানি অশ্লীলতা আছে, নায়িকার

১ চিত্রাঙ্গদা (নাট্য) সচিত্র। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৯৯ ভাদ্র ২৮ [১৮৯২ সেপ্টেম্বর ২]। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩। এমারেল্ড থিয়েটারে (১৮৯২ ডিসেম্বর ১৭) কৃষ্ণকান্তের উইল অভিনয়ের পর 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনীত হয়। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ। ১৯১৩ সালে চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি অনুবাদ *Chitra* নামে বিলাতে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে (১৩৪২ ফাল্গুন) কবি এই নাটিকাটিকে নৃত্যনাট্যে পরিণত করেন। যথাস্থানে এইসব গ্রন্থের আলোচনা হইবে।

মধ্যে উপযাচিকার প্রেম নিবেদন কতখানি আছে, তাহা লইয়া সাময়িক সাহিত্যে গভীর আলোচনা উত্থাপিত হয়। কিন্তু এই কাব্যখানি পাঠ করিবার পর কোনো সাহিত্যরসিক লোকের মনে কোনো কুৎসিত কল্পনা কী করিয়া আসে তাহা সহজবুদ্ধিতে আবিষ্কার করা কঠিন। যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ যদি সাহিত্যধর্মের রুচি-অসঙ্গত হয়, তবে অভিজ্ঞান শকুন্তলাকে দুর্নীতিমূলক গ্রন্থ বলিয়া অপাংক্তেয় করা প্রয়োজন; সে হিসাবে দুনিয়ার অনেক সেরা কাব্য ও উপন্যাস আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত ছিল। রসজ্ঞ সমালোচক ও পাঠক দেখে নারীর সমগ্র রূপ কী ভাবে ফুটিয়াছে। সেদিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে এই কাব্যনাট্যখানি সৌন্দর্যে অতুলনীয়। নারী যথার্থভাবে পুরুষের সহধর্মিণী, প্রয়োজনবোধে সমধর্মিণী, 'স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ'। অর্ধনারীশ্বরের আদর্শ এই ভারতের।

সংগীতসমাজ ও গোড়ায় গলদ

আমরা যে সময়ের (১২৯৯) কথা আলোচনা করিতেছি, তখন কলিকাতায় 'ভারতীয় সংগীত-সমাজ' লইয়া খুবই মাতামাতি চলিতেছে। এতকাল বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীতের কদর ও আদর ছিল ধনীর বৈঠকখানায়; আর লৌকিক সংগীত আশ্রয় পাইয়াছিল বাউল বৈষ্ণবের আখড়ায়। তাহারও নিচের স্তরে ছিল 'কবি' তরজা, খেউড়, লেটো, খেমটা, ঝুমুর গান। আসল কথা পাশ্চাত্য নব্য শিক্ষায় দীক্ষিত মধ্যবিত্তদের পক্ষে বিশুদ্ধ সংগীতের রসগ্রহণের স্থান ছিল যেমন রুদ্ধ, লৌকিক সংগীত সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পৃহা ও জ্ঞান ছিল তেমনি সংকীর্ণ। তদুপরি রুচির প্রশ্নও ছিল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংগীতকে ধনীর প্রমোদশালা হইতে বাহির করিয়া ও বাউল-বৈষ্ণব-কীর্তনিয়াদের আখড়া হইতে শোধন করিয়া আনিয়া সাধারণের মধ্যে নির্বিচারে পরিবেশন করিতে শুরু করেন। বাংলাদেশে ধর্মসংগীতকে সর্বসাধারণের জন্য মুক্তিদান করিল ব্রাহ্মসমাজ। কারণ ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার সকলেরই জন্য মুক্ত। নগরকীর্তন আধুনিক যুগে ভদ্রসমাজে প্রবর্তন করেন কেশবচন্দ্র সেন; গ্রামাঞ্চলে অষ্টপ্রহর হরিসংকীর্তন প্রচলিত ছিল— কিন্তু এসবের সহিত কলিকাতার অভিজাত ধনী, উচ্চশিক্ষিত যুবক এবং বিলাতফেরত 'সাহেব'দের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। অপর দিকে ধনীর বৈঠকখানায় বা ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বা বাউল-বৈষ্ণবের আখড়ায় গিয়া শিক্ষাভিমানী ও বিলাতফেরত নব্যদের পক্ষে সংগীত রসতৃষ্ণা মিটানো সম্ভব ছিল না। ধনীর গৃহে যাইতে তাঁহাদের আপত্তি, কারণ বর্তমান যুগের ডিমোক্রেটিক আইডিয়ার উহা পরিপন্থী; ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের গান বিশেষ কোনো অভিপ্রায় লইয়া রচিত, তাহা সর্বদা আর্টিস্ট চিত্তকে তৃপ্তি দিতে পারে না। বাউল-কীর্তনিয়ার আখড়ায় যাইতে মর্যাদায় বাধে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের উপযোগী মিলনক্ষেত্র ছিল না।

এতকাল ধনীর গৃহে মোঘলাই দরবারের কায়দায় নৃত্যগীতের পোষণ ছিল বংশাভিজাত্যের অন্যতম অঙ্গ। কলিকাতার নূতন-ধনীরাও নবলব্ধ ধনাভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে কলিকাতার সাহেবী থিয়েটারের অনুকরণে নিজ নিজ গৃহে শখের থিয়েটার শুরু করিলেন। সংগীতের ন্যায় ইহাও হইল exclusive, অর্থাৎ এইসব স্থানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না; ধনী, ধনীদের বন্ধুবান্ধব, আশ্রিত ও চাটুকাররাই নিমন্ত্রিত হইত।

বাংলা থিয়েটারের প্রথম বিশ বৎসর এইভাবে ধনীদের গৃহে আবদ্ধ থাকিল। কিন্তু যে ডিমোক্রাটিক আইডিয়া বা সাম্যবাদ যুগধর্মের ন্যায় দেশের সব প্রতিষ্ঠানে-অনুষ্ঠানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা সাহিত্যে শিল্পে সংস্কৃতিচর্চাতেও দেখা দিল। পাবলিক রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইল; 'ন্যাশানাল থিয়েটার'[১] (১৮৭২ ডিসেম্বর ৭। ১২৭৯ অগ্রহায়ণ ২৩)

১ ১২৭৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক 'সুলভ-সমাচার' সংবাদপত্র, ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। ন্যাশানাল থিয়েটারও এই বৎসরে স্থাপিত হইল। বাংলার ইতিহাসে তিনটি ঘটনাই স্মরণীয়।

সর্বসাধারণকে টিকিট বিক্রয় করিয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইল। ন্যাশানাল থিয়েটার বাঙালির সাধারণ নাট্যশালা হইল। ক্রমে বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশানাল প্রভৃতি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে তথাকথিত পতিতা নারীদের মধ্যে যাহাদের অভিনয়ে ও সংগীতে শক্তি ছিল, তাহারা নাট্যমঞ্চে অচিরে নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইল, তাহাদের জীবিকার নূতন পথ খুলিল। এখন হইতে তাহাদের পক্ষে অনন্যকর্মা হইয়া সংগীতসাধনা, নাট্যকলাচর্চা ও রূপপ্রসাধনাদি সম্ভব হইল। শখের থিয়েটারে অভিনেতাদের নাট্যসাধনার অবসর অল্পই মিলিত; নাট্যকলা 'অ্যামেচার'দের হাত হইতে ক্রমেই 'প্রোফেশ্যনাল' নট-নটীদের হাতে গেল। উপরন্তু নাট্যব্যবসায়ীরাও শ্রোতা-দর্শকের মনোরঞ্জনার্থে নানাভাবে রঙ্গালয়কে আকর্ষণীয় করিতে সচেষ্ট হইলেন, নূতন নূতন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

থিয়েটারের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন স্টেজ রঙ্গালয় প্রভৃতির অভাবে সাধারণভাবে অভিনয় করিতে গিয়া 'যাত্রাপালা' নূতন রূপ গ্রহণ করিল। অনেক সময়ে তাহাদিগকে 'অপেরা' বলা হইত। থিয়েটারে সিন স্টেজ প্রভৃতির সাহায্যে দর্শকের মনে যেসব ভাব সহজে উদ্রেক করা যায়, যাত্রায় তদভাবে, বাক্যের দ্বারা সেসব ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইল। ফলে থিয়েটার ও যাত্রার নাটক ও পালাগানের 'টেকনিক' বা রচনারীতি পৃথক হইয়া গেল, যেমন আজ 'টকি'র নাটক, রঙ্গমঞ্চে অভিনেয় পুরাতন নাটক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক টেকনিকে রচিত হইতেছে।

বাংলা নাট্যশালা ও নাটকের ইতিহাস বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনায় ও নাটকাভিনয়ের যে-ধারায় পারম্পর্যসূত্রে উত্তরাধিকারী হন, তাহার কথা বলা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শখের থিয়েটারে ফরমাইশি নাটক, অনূদিত নাটক প্রভৃতি অভিনীত হইত। কখনো কখনো ধনীদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান ও প্রতিভাবান তাঁহারা নিজেরাই নাটক রচনা করিয়া নিজগৃহে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আশ্রিতদের লইয়া অভিনয় করিতেন। স্বগৃহে অভিনয় ব্যাপারে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই পরিবারের অনেকেই নাটক-রচনায় সংগীত-প্রণয়নে ও নাট্য-অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়, কারণ তিনি যে-পথ উন্মোচন করিয়া দেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাই প্রশস্ততর করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ সাল হইতে প্রায় ষাট বৎসর কাল এই নাট্যধারাকে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলাদেশে নাটক রচনার ও অভিনয়ের ইতিহাস খুব দীর্ঘকালের নহে, মাত্র ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস। মধুসূদনকে যে বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক বলা হয়, এ কথা একাধিকভাবে সত্য। তিনি যে কেবল য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে পাশ্চাত্য রীতিতে বাংলা এপিক লিরিক সনেট প্রভৃতি কাব্যরীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি পাশ্চাত্য আদর্শে নাটকও রচনা করিয়াছিলেন; 'কৃষ্ণকুমারী' 'পদ্মাবতী' (১৮৬· এপ্রিল), নাটককে বাংলাভাষার প্রথম তথাকথিত ঐতিহাসিক, 'শর্মিষ্ঠা'কে পৌরাণিক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো' শালিকের ঘাড়ে রোঁ'কে প্রথম যুগের সামাজিক প্রহসন বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নামও এই সঙ্গে স্মরণীয়।

ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপন ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যমঞ্চে আবির্ভাব প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। গিরিশচন্দ্র আসিয়া দেখেন বাংলাসাহিত্যে অভিনেয় নাটক নাই। হয় মাইকেল দীনবন্ধুর নাটক অভিনয় করিতে হয়, না-হয় বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়া থিয়েটার করিতে হয়। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে যথার্থ নাটকীয় রসসৃষ্টি করা কঠিন। তখন তিনি স্বয়ং নাটকরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পেশাদারী থিয়েটারগৃহ স্থাপিত হইলেও শখের থিয়েটার নষ্ট হইল না। কলিকাতার রঙ্গালয় বহুকাল পর্যন্ত তেমন

আকর্ষণের স্থান হয় নাই। রঙ্গমঞ্চ, গৃহসজ্জা, সিন, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে বিলাতী থিয়েটারের নিকৃষ্ট অনুকরণ ছাড়া বৈশিষ্ট্য ছিল সামান্যই। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের চারিত্রিক আদর্শ তখনকার শিক্ষিত সমাজের নিকট আদৌ বরণীয় ছিল না। তাই দেখি, ঠাকুরবাড়িতে শখের থিয়েটার বন্ধ হইল না। রবীন্দ্রনাথের বিলাত হইতে আসিবার পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর গীতনাট্য ও নাটিকা তাঁহাদের বাড়িতে অভিনীত হইয়াছিল। মূলকথা পেশাদারী থিয়েটার বা প্রাইভেট থিয়েটার মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের আর্টিস্ট চিত্তের চাহিদা পূরণ করিতে পারিতেছিল না। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের সান্ধ্য বিনোদনের জন্যই 'সংগীতসমাজে'র প্রতিষ্ঠা।[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্‌যোগেই ইহা স্থাপিত হয়। কিছুকাল পূর্বে পুণা নগরীতে বাসকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রদের 'গায়েন-সমাজ' দেখিয়াছিলেন ; তখনই তাঁহার সংগীত সমাজ স্থাপনের পরিকল্পনা আসে।

সংগীতসমাজ হইল বিলাতী ক্লাব ও বাবুদের বৈঠকখানার সহমিশ্রণ ; ফরাশ, তাকিয়া, জাজিম, গড়গড়া, তাস, পাশার সঙ্গে থাকিল পিয়ানো, টেবিল অর্গান, বিলিয়ার্ড টেবিল প্রভৃতি। জমিদার ও ধনীরা আসিলেন, বিলাতফেরত ব্যারিস্টার, ডাক্তার আসিলেন। কণ্ঠসংগীতে ওস্তাদ কেহ কলিকাতায় আসিলে যেমন তাঁহাকে সমাজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার কৃতিত্ব উপভোগ করিবার সুযোগ সভ্যদের দেওয়া হইত, তেমনি আনন্দ ও শিক্ষার জন্য সুসংস্কৃত প্রণালীতে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সংগীতসমাজের প্রথম সম্পাদক ; পরে অন্যতম সভাপতি হন। এই সংগীতসমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী, অলীকবাবু প্রভৃতি বহু নাট্য ও গীতনাট্যের অভিনয় হয়। সমাজের সভ্যদিগকে লইয়া অভিনয়ের আয়োজন হইত। কোনো মহিলা সভ্য না থাকায় স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করিবার জন্য কয়েকজন বেতনভোগী কিশোর স্থায়ীরূপে প্রতিপালিত হইয়া সমাজের বিশিষ্ট অভিনয়ভঙ্গিতে দীক্ষিত হইত। সংগীতসমাজের সৃষ্টি হইতে রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে, যখন তিনি কোনো বিষয়কে ধরিতেন, তাহাকে পরিপূর্ণভাবে, সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতেন। সংগীতসমাজের অভিনয় উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ পরিশ্রম করিতেন তাহার সামান্য আভাস আমরা পাই তাঁহার স্ত্রীকে লিখিত পত্র হইতে। সভ্যশ্রেণীভুক্ত বিলাতফেরতাদের মধ্যে অনেকে বাংলা ভাষা সহজভাবে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না ; রবীন্দ্রনাথ দ্বিপ্রহরে কখনো-বা তাঁহাদের বাটিতে গিয়া কখনো-বা সমাজভবনে আসিয়া তাঁহাদের উচ্চারণ সংশোধন করিতেন ; আবার, সন্ধ্যার পর মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভূমিকাপাঠের আবৃত্তি গ্রহণ করিতেন, সঙ্গেসঙ্গে অঙ্গভঙ্গি-আদি শিক্ষা দিতেন। এক এক দিন রিহার্সেলে রাত্রি দেড়টা-দুইটা বাজিয়া যাইত, তখন সংকীর্ণ গলিপথ ধরিয়া হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেন।

সংগীতসমাজে অভিনয়ের জন্যই তিনি 'গোড়ায় গলদ'[২] রচনা করেন। শান্তিনিকেতন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে লিখিত একখানি পত্রে আছে, "দুটো-তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সেগুলোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না।"[৩] কিন্তু শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না ; বোধ হয় সংগীতসমাজের উৎসাহী সদস্যদের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে অভিনয়ের জন্য প্রহসনটি খাড়া করিয়া তুলিতে হইল।

১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের (২০৯ নং) বাড়িতে এই সংগীতসমাজ উঠিয়া আসিবার পূর্বে পর্যন্ত ইহার মধ্যে অনেক গণ্ডগোল ছিল, এমনকি মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত হইয়া যায়। সে সমস্ত অপ্রিয় আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

২ গোড়ায় গলদ প্রকাশিত ১২৯৯ ভাদ্র। প্রিয়নাথ সেনকে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

৩ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২, ছিন্নপত্র।

নটরাজ অমৃতলাল বসু মনে করিয়াছিলেন যে 'গোড়ায় গলদে'র লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।[১] সংগীতসমাজে শরৎকালে বোধ হয় অভিনয় হয়।

পালা খাড়া করিয়া দেখা গেল যে নাটকীয় রস তেমন জমিতেছে না। তখন রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব অধ্যবসায় ও ক্ষিপ্রতার সহিত উহার আমূল সংশোধন করিলেন। 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়কে সর্বাঙ্গসুন্দর ও অত্যন্ত স্বাভাবিক করিবার জন্য অটলকুমার সেন, যিনি শিবু ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি, নাকি সামনের গোটা-দুই দাঁত তুলিয়া কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। অভিনেতারা যাহাতে দর্শকের মন হইতে সকলপ্রকার কৃত্রিমতার আভাস বিলুপ্ত করিতে পারেন, ও কথাবার্তায় হাবভাবে চালচলনে গলার স্বরে ও শব্দের উচ্চারণে অভিনয়ে সহজ ঘরোয়া ভাবভঙ্গি ফুটাইতে পারেন, ইহাই ছিল সংগীতসমাজের অভিনয়ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানের বিশেষ লক্ষ্য। পটলডাঙ্গার হেমচন্দ্র বসুমল্লিক[২] নিবারণ; ব্যারিস্টার ভুবনমোহন চাটুজ্জে ললিত চাটুজ্জে ও শ্রীশচন্দ্র বসু চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় নামেন। শ্রীশবাবু গান করিতে পারিতেন না, তাই রবিবাবু নিজ নামেই স্টেজে বাহির হইয়া উহা গাহিয়া দিলেন। তাঁহার অবতারণার জন্য নাটকীয় কথোপকথনে কিছু যোগ করিয়া দেওয়া হয়। চন্দ্রবাবু তাঁহার বন্ধুদের রবিবাবুর গান শুনিবার জন্য একটু বসিতে বলেন, কারণ সেইদিনই তাঁহার দেখা করিতে আসিবার কথা আছে। পরে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলে সকলের সহিত তাঁহার আলাপপরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল; তিনিই শেষ গানটি গাহিলেন, 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো'।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের সহিত রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিলে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের জন্য— সে রঙ্গমঞ্চ প্রাইভেটই হউক আর পাবলিকই হউক— বহু লেখক গীতনাট্য, কাব্যনাট্য, প্রহসন, গদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই অসংখ্য গীতকার-নাট্যকারদের অন্যতম হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা নাটকের অতীত বা তৎসাময়িক ইতিহাস হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যাইবে না। এমনকি সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে না দেখিলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের যথাযথ স্থান নির্দেশও হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার এক বৎসর পরে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৮১ ফেব্রুয়ারি) তাঁহাদের বাড়িতে অভিনীত হইল। প্রায় দুই বৎসর পরে 'কালমৃগয়া'র (১৮৮২ ডিসেম্বর) অভিনয় হয়। উভয় নাটকই বিদ্বজ্জনসমাগম সভার সম্বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হয়; পাবলিকের চিত্তবিনোদনের জন্যই লিখিত, তবে সে-পাবলিক নিমন্ত্রিত ভদ্রসমাজ।

কয়েক বৎসর পরে বাল্মীকিপ্রতিভা নূতন করিয়া লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উহার অভিনয় করাইলেন।[৩] অতঃপর আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য টাকা তুলিবার প্রয়োজন হইলে স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা হয়; আমাদের মনে হয় পাবলিক রঙ্গমঞ্চে কবির অভিনয়ও এই প্রথম এবং টিকিট বেচিয়া অর্থসংগ্রহও এই প্রথম।[৪]

১ অমৃত মন্দিরা। গোড়ায় গলদ ও সংগীতসমাজ সম্বন্ধে তথ্যগুলি খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্র-কথা' হইতে গৃহীত।

২ সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইলে কাউন্সিলকে এক লক্ষ টাকা দেন; সেই টাকার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হয়, ইতিহাসের জন্য 'হেমচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপক' ও দর্শনাদির জন্য 'প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপক'-পদ সৃষ্টি হয়।

৩ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত (১২৯২ ফাল্গুন ১৩) ১৮৮৬ ফেব্রুয়ারী ২৪।

৪ গিরিশ-প্রতিভা, পৃ. ৫৮৭। অবনীন্দ্রনাথ, ঘরোয়া।

ইহার তিন বৎসর পরে পুনরায় তাঁহাকে ফরমাইশি গীতিনাট্য লিখিয়া দিতে হইল, সখিসমিতির মহিলামেলায় অভিনয়ের উপযোগী গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'। বেথুন স্কুলে গৃহস্থঘরের কন্যারা কেবল মহিলা দর্শকের সম্মুখে সর্বপ্রথম ইহার অভিনয় করেন। আসল কথা, পাবলিকের সম্মুখে অভিনয় করিবার জন্যই 'মায়ার খেলা' সৃষ্টি (১২৯৫ পৌষ)।

প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল না সত্য, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটকের উপর তাঁহার পরোক্ষ প্রভাবের কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পাঠকের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট' ১২৮৯ সালের পৌষ মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পরে এই উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্তরায়' নামে পাবলিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইল।[১]

কাব্যনাট্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তাহা বিচার্য। এতাবৎকাল পৌরাণিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক কাহিনীই ছিল নাটক রচনার উপাদান। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি নাট্যকারগণ প্রায়শই রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি হইতে নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিতেন। অর্থাৎ বাংলার পারম্পর্যগত যাত্রাপালা-গানের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার প্রথম দুই গীতিনাট্যের বিষয়-বস্তু রামায়ণ হইতেই সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি অচিরেই এই মধ্যযুগীয়তাকে অতিক্রম করিয়া নূতন ধরণের কাব্যনাট্য রচনায় মন দিলেন, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'মায়ার খেলা' 'রাজা ও রানী' 'বিসর্জন' নূতন ধরণের নাটক, তাহারা পৌরাণিকও নহে, ঐতিহাসিকও নহে, তাহারা কেবলমাত্র নাট্যকাব্য। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ কাব্যনাটক হইতেছে 'রাজা ও রানী', ১২৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে সোলাপুরে রচিত। বই ছাপা হয় শ্রাবণ মাসে (১৮৮৯ অগস্ট ১০)। বোধ হয় পূজার ছুটিতে সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের বির্জিতলার বাড়িতে উহার অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ বিক্রমদেবের, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সুমিত্রার এবং মৃণালিনী দেবী নারায়ণীর ভূমিকায় নামেন। মৃণালিনী দেবী ইতিপূর্বে বা অতঃপরে কখনো অভিনয় করেন নাই; নারায়ণীর ভূমিকা তিনি নাকি অপূর্ব সফলতার সহিত করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরোয়া'য় (পৃ. ১২৩-৪) বলিয়াছেন যে থিয়েটারের পেশাদার অভিনেত্রীরা কোনোক্রমে বির্জিতলার বাড়ির অভিনয় দেখিয়া যায় এবং কয়েকদিন পরে এমারেল্ডে যে অভিনয় হয় (১৮৮৯ নভেম্বর ৩০) তাহাতে অভিনেত্রীরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের অভিনয়ের ঢং আশ্চর্যরূপে অনুকরণ করিয়াছিল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পোশাক-পরিচ্ছদ, গলার স্বর, বলিবার ভঙ্গি প্রভৃতি যে-ভাবে অনুকৃত হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। পেশাদার থিয়েটার সম্বন্ধে ইঁহাদের কোনো উন্নাসিকতা বা নীতিগত বিরোধীভাব ছিল না।

'রাজা ও রানী' যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হইয়াছিল, তখন বাংলা কাব্যনাটকে গৈরিশ ছন্দের যুগ চলিতেছে। আট বৎসর পূর্বে (১২৮৮) রবীন্দ্রনাথ যখন 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতায় ছন্দের মুক্তিসাধনায় নিরত, সেই সময়ে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাট্য 'রাবণবধ' 'সীতার বনবাস' 'অভিমন্যু বধ' প্রভৃতি রচনা করিতেছিলেন। এই নূতন ছন্দে নাটক প্রকাশিত হইলে ভারতীতে[২] (১২৮৮ মাঘ) যে-সমালোচনা বাহির হয় তাহাতে ছিল, 'ইহাই যথার্থ

১ ১৮৮৬ জুলাই ৩। ১২৯৩ আষাঢ় ২০। দ্র. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, পৃ. ৩৯। বসন্তরায়— রাধামাধব কর; প্রতাপাদিত্য— মতি সুর; উদয়াদিত্য— মহেন্দ্র বসু; বিভা— সুকুমারী (পরে হরি, বিভাহরি), রামচন্দ্র— নীলমাধব; বাণী— ভবতারিণী; মোহন— পূর্ণ ঘোষ; মঙ্গলা— ক্ষেত্রমণি। ১৯০১ এপ্রিল ৬— মিনার্ভা থিয়েটারে রাজা বসন্তরায় পুনরায় অভিনীত হয়। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, পৃ. ৫৭।

২ ভারতী, ১২৮৮ মাঘ, পৃ. ৪৮২।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণস্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকারশাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ-বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম'। এই সমালোচনার লেখক কে আমরা জানি না।[১]

রবীন্দ্রনাথ মুক্তছন্দের পক্ষপাতী, লিরিকে তিনি তাহা পরীক্ষা করিলেন, নাট্যকাব্যে নহে। আমাদের মনে হয় বাংলা-সাহিত্যের নাট্যকাব্যে যখন গৈরিশ ছন্দে রচনা একপ্রকার mannerism হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখনই রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাব্যে মধুসূদনের ও গিরিশের রীতির মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন যথার্থ বলিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথের ছন্দে প্রবহমানতার দিকে ঝোঁক বেশি এবং গৈরিশ ছন্দ অপেক্ষাকৃত কম প্রবহমান, এই পার্থক্যের কারণও সুস্পষ্ট; পঠিতব্য কবিতা ও অভিনয়যোগ্য নাট্যের প্রয়োজনেই এই ছন্দ দুজনের হাতে দুই রূপ ধারণ করেছে।"[২] আমাদের মতে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' নাটকে এই ছন্দের পরীক্ষা করিলেন। এ-ছাড়া অভিনয়মঞ্চে পৌরাণিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক নাটক ব্যতীত অন্য শ্রেণীর রোম্যান্টিক নাটক চালানো যায় কি না তাহার পরীক্ষাও করিলেন 'রাজা ও রানী' এবং পরে 'বিসর্জন' লিখিয়া।

'বিসর্জন' রচিত হয় বাড়ির ছেলেদের তাগিদে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি; উহা অভিনীত হয় সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে (১৮৯০ অক্টোবর)। কিন্তু পাবলিক থিয়েটারে সে যুগে উহার অভিনয় হয় নাই। না হইবার কারণ বেশ বুঝা যায়, কালীমূর্তিকে দূরে নিক্ষেপ করা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে সম্ভব নহে। কিন্তু দুই বৎসর পরে 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২ সেপ্টেম্বর ২২) প্রকাশিত হইলে তাহা এমারেল্ড থিয়েটারে[৩] 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অভিনয়ের পর অভিনীত হইয়াছিল (১৮৯২ ডিসেম্বর ১৭)। সেদিন উহাকে অশ্লীল বা দুর্নীতিমূলক বলিয়া কেহ নিন্দা করিয়াছিলেন কি না আমরা জানি না।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় ভারতীয় সংগীতসমাজ স্থাপিত হইল। গানবাজনা আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে নাট্য-অভিনয়ের আয়োজন হইল। রবীন্দ্রনাথ এই সমাজের প্রতিষ্ঠামুখে মহোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শুরু হইতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনকাল পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩০৮ সালের পর তাঁহার সম্বন্ধ ক্ষীণ হইয়া আসে। এই সংগীতসমাজের যুবক বন্ধুদের উৎসাহে অভিনয়ের জন্য তিনি 'গোড়ায় গলদ' প্রহসন লিখিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বাংলা সাহিত্যে প্রহসন রচনার ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে; মধুসূদন ও দীনবন্ধুকে ইহার প্রধান আচার্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে তাঁহাদের পরবর্তী অনেক নাট্যকারের নাটকের মধ্যে হাস্যরস wit ও humour প্রচুর থাকিলেও satire বা বিদ্রূপ ছিল রচনার উদ্দেশ্য। রঙ্গমঞ্চে হাস্যরস সৃষ্টি করিবার জন্য কাহাকেও-না-কাহাকে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করাটাই ছিল রীতি। নাট্যকারদের আক্রমণের কয়েকটি প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল শিক্ষিত মেয়েদের লইয়া বিদ্রূপ এবং ব্রাহ্মদের আচার-ব্যবহার ও ধর্মবিশ্বাস লইয়া ব্যঙ্গ। গোঁড়া হিন্দু এবং নব্য বিলাতফেরতদেরও প্রচুর পরিমাণে লাঞ্ছনা হইত। গিরিশচন্দ্রের নাট্যমঞ্চে আবির্ভাবের পর হইতে পনেরো বৎসরের মধ্যে (১৮৭৭-১৮৯২) বাংলাদেশের সাধারণ অভিনয়ের বিষয় ও রুচির

১ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেন, "বলার ভঙ্গি এবং বিশেষভাবে 'ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি' এই উক্তি থেকে মনে হয় অভিমতটি সম্ভবতঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই।"—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ।

২ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ।

৩ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, পৃ. ৪৬।

যুগান্তর হইয়াছিল। কিন্তু প্রহসন বিষয়ে এখনো বিশুদ্ধ হাস্যরসসৃষ্টির চেষ্টা তেমনভাবে দেখা যায় নাই, সুরুচিসংগত হাস্যসৃষ্টির প্রয়াসেই 'গোড়ায় গলদে'র জন্ম। এ কথা বলাই বাহুল্য যে সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকাদির সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল ; নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার অজ্ঞতা কল্পনা করার কোনো কারণ নাই। সমসাময়িক প্রহসনাদি পাঠ করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষকে বিদ্রূপ না করিয়াও রঙ্গমঞ্চে হাস্যরসের অনাবিল আনন্দস্রোত বহানো যায় ; বিদ্রূপের কশাঘাতে কাহাকে বিপন্ন না করিয়া যে-সহজ আনন্দ রঙ্গমঞ্চে সৃষ্টি করা যায় তাহারই মধ্যে যথেষ্ট আর্টিস্ট-মনের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য রচনাকালে নিজ আর্টিস্ট-সত্তাকে কখনো খর্ব হইতে দিতেন না। নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মধ্যে যে-প্রচ্ছন্ন কুরুচি আছে, তাহা কবিচিত্তকে আঘাত করিত বলিয়া তাঁহার পক্ষে জনপ্রিয় satire লেখা সম্ভব হয় নাই। বিশেষ এক শ্রেণীর দর্শক-শ্রোতার মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যগ্রাহী মনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রবীন্দ্রনাথের এই প্রহসন রচিত হইয়াছিল, ইহার কোথাও গ্রাম্যতা (vulgarity) অথবা বিদ্রূপের রূঢ়তা নাই ; উহা বিশুদ্ধ হাস্যরসের নির্ঝর।

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে হেঁয়ালিনাট্য ও নানা ব্যঙ্গকৌতুকে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলেন ; কিন্তু হেঁয়ালিনাট্যগুলি সাধারণত বালকদের অভিনয়ের জন্য রচিত ; স্বল্পপরিসর নাট্যের মধ্যে হাস্যমুখর রসিকতার স্থান খুবই সংকীর্ণ। কতকগুলি ব্যঙ্গনাটক বিদ্রূপের বাণে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টতার জন্য অসুন্দর। যাহাই হউক, এইসব রচনাকেই প্রহসনের আদি প্রয়াস বলা যাইতে পারে।

এই হাস্যদ্যোতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকাগুলি ব্যতীত তাঁহার গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্যের মধ্যে হাস্যরসের যথেষ্ট খোরাক আছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রানী, বিসর্জনের জনতার মধ্যে এমনকি বাল্মীকিপ্রতিভার দস্যুদল ও কালমৃগয়ার বিদূষক ও শিকারীদের মধ্যে কবি যথেষ্ট হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। কোনোপ্রকার হাসির আমেজ নাই, এমন গীতিনাট্য হইতেছে 'মায়ার খেলা'। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে জনতার হাস্যচটুল রসিকতা কোনো কোনো স্থলে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। এক-এক সময়ে মনে হয় মূল রচনার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ক্ষীণ, অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়। মাঝে শারদোৎসব নাটিকার মধ্যে 'গেছোবাবা'র আখ্যানটা জনতার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া শান্তিনিকেতনে অভিনয় হইয়াছিল ; ইহাতে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর অংশ গ্রহণ করেন। অভিনয় করিয়াই বুঝিলেন এ-শ্রেণীর রসিকতা শারদোৎসবে অচল, ঐ অংশ আর নাটিকার মধ্যে মুদ্রিত হয় নাই। তবে আবার মনে হয় নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডির বেদনা হইতে শ্রোতা-দর্শকের চিত্তকে কিয়দ্‌পরিমাণে মুক্তি দিবার জন্য কবি যেন এইসব জনতার অবতারণা করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে এইসব ট্র্যাজেডি পড়া ও দেখা খুবই বেদনাদায়ক, তবে উচ্চাঙ্গ কাব্য-নাট্যের বা নাটকের মধ্যে সাধারণ দর্শকের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা না করিলে কবির যশোসৌরভ ম্লান হইত না। এইসব জনতা যেখানে কবির লেখনীর নিকট প্রশ্রয় পাইয়াছে, সেইখানেই তাহারা কলহে ও কোলাহলে নাটকটিকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি যে বাংলা নাট্যসাহিত্যে জনতার স্থান সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি ; রচনার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির স্বল্পমাত্র আমেজ না থাকাতে উহা কালকে অতিক্রম করিয়া এখন পর্যন্ত দর্শক ও শ্রোতাকে আনন্দ দিতেছে ; এরূপ সৌভাগ্য খুব কম প্রহসনেরই হয়।

'গোড়ায় গলদ' দোষশূন্য নহে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ইহার মধ্যেও অবান্তর দৃশ্য আছে, সংলাপে বহুস্থানে সংক্ষিপ্ত করিবার অবকাশও ছিল। তাহা ছাড়া কতকগুলি ঘটনা বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের পক্ষে

কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মেয়ে অপরিচিত ও অনাত্মীয় যুবকদের সহিত হরদম 'সোসাইটি'তে মিশিতে অভ্যস্ত নহে, তাহার পক্ষে একটি ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় উপবিষ্ট কোনো সুবেশ সুদর্শন যুবককে গৃহকর্তার ভৃত্যরূপে সম্বোধন করা ও পাল্‌কির খোঁজ করিতে বলা খুব স্বাভাবিক নহে। এমনকি বাঙালি ঘরের কুমারী-যুবতীর মুখে তাহা বাচালতার মত শোনায়। বিলাতি সমাজে এটি মানানসই। এতদ্‌সত্ত্বেও এ কথা অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে যে বাংলাসাহিত্যে এরূপ হাস্যোজ্জ্বল সুরুচিসম্পন্ন রসিকতাপূর্ণ নাটক ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই। এতবড়ো নাটকে সর্বশেষে মাত্র একটি গান থাকায়, ইহা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। গান না থাকিবার কারণ ছিল; এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মী বা গীতশ্রী অন্তর্হিতা ছিলেন; 'সাধনা' খুঁজিয়া কবিতা পাওয়া যায় না, গানও দুর্লভ।

এই নাটক রচনার ছত্রিশ বৎসর পর (১৩৩৫) সাতষট্টি বৎসর বয়সে কবি পাবলিক থিয়েটারে নাটকখানি অভিনয়ের উপযুক্ত করিবার জন্য নূতন করিয়া লিখিয়া দেন। আখ্যানের গোড়ার দিকে নায়ক-নায়িকারা সকলেই গলদ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শেষের দিকে সকলেই সামলাইয়া রক্ষা পাইলেন, তাই ইহার নূতন নামকরণ করিলেন, 'শেষ রক্ষা'। ইহাতে আটটি নূতন গান সংযোজিত করেন। 'গোড়ায় গলদ' নাটকের গল্পাংশ সংক্ষেপে বিবৃত হইল—

যুবক উকিল চন্দ্রকান্তের বাসায় রবিবার দিন সকালে বিনোদবিহারী ও নলিনাক্ষ বসিয়া বিবাহাদি বিষয়ে গল্প হাসি ঠাট্টা করিতেছে। চন্দ্রকান্ত বিবাহিত, তাঁহার স্ত্রীর নাম ক্ষান্তমণি। শিবচরণ ডাক্তারের ছেলে নিমাই ইহাদের বন্ধু, সেও আসিয়া জুটিল। নিমাই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র; সে প্রেমকে একটা রোগ বলিয়া জানে। সে বলে অসুস্থ শরীরেই প্রেমব্যাধি দেখা দেয়। কোনোদিন এই ব্যাধি সারাইবার ঔষধ আবিষ্কৃত হইবে। পাশের বাড়িতে থাকেন নিবারণবাবু ও তাঁহার কন্যা ইন্দুমতী; আর সেখানে থাকে কমলমুখী,—নিবারণবাবুর বন্ধু আদিত্যবাবুর কন্যা। আদিত্যবাবু মারা গেলে কমলমুখী ইন্দুমতীর সহিত একত্র নিবারণবাবুর কাছে লালিত হয়। নিবারণবাবু খানিকটা আধুনিক ভাবাপন্ন লোক; মেয়ে দুইটিকে লেখাপড়া শেখান; অল্পবয়সে বিবাহও দেন নাই। সেদিন প্রাতে কমলমুখীর গান শুনিয়া বিনোদবিহারী ঠিক করিল, তাহাকেই বিবাহ করিবে। বিনোদ এম. এ. বি. এল. পাস, ওকালতি শুরু করিয়াছে বটে, তবে পসার জমে নাই বলিয়া পটলডাঙার মেসেই থাকে। চন্দ্রকান্ত বিবাহবিষয়ে কথাবার্তা বলিবার জন্য নিবারণবাবুর বাসায় গেল। চন্দ্রকান্তর সঙ্গে ছিল বিনোদ ও নিমাই। নিবারণবাবু বিনোদের তত্ত্ব লইতে এত ব্যস্ত হইলেন যে নিমাইএর পরিচয় পর্যন্ত লইতে ভুলিয়া গেলেন। নিমাই সুপুরুষ। আড়াল হইতে দেখিয়া ইন্দুমতীর তাহাকে ভালো লাগিল, পরিচয় জানিবার জন্য সে গেল ক্ষান্তমণির বাড়ি। বর্ণনা শুনিয়া ক্ষান্ত বলিলেন, সে ভদ্রলোক নিশ্চয় ললিতবাবু। গলদ শুরু হইল এখান থেকেই। ইন্দুমতী আমুদে মেয়ে, ক্ষান্তমণির সহিত রহস্য করিবার জন্য চন্দ্রকান্তের চোগা চাপকান পাগ্‌ড়ি পরিয়া হৈচৈ করিতেছে। হঠাৎ বাহির হইতে চন্দ্রকান্তর আহ্বান শুনিয়া ইন্দুমতী পলায়নপর হইল। ক্ষান্তমণিকে বলিয়া গেল চন্দ্রকান্ত আসিলে যেন বলে বাগবাজারের চৌধুরীবাড়ির কাদম্বিনী আসিয়াছিল, তাহার পরিচয় যেন না দেয়। বাহিরের ঘর দিয়া পলাইতে গিয়া দেখে সেখানে বসিয়া নিমাই (বা ললিত)। ইন্দুমতী তাড়াতাড়ি চোগা চাপকান তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'তোমার বাবুর জিনিস; যথাস্থানে রাখিয়া দিয়ো। চট্ করিয়া দেখিয়া আইস বাগবাজারের চৌধুরীবাড়ি থেকে পাল্‌কি আসিয়াছে কি না।' ইন্দু কোনোমতে পলায়ন করিল, কিন্তু নিমাই তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং মনে মনে ঠিক করিল, 'বিবাহ যদি করিতে হয় তবে চৌধুরীবাড়ির এই বুদ্ধিমতী মেয়েটিকেই বিবাহ করিব।'

এদিকে শিবচরণ বন্ধু নিবারণের কন্যা ইন্দুমতীর সহিতই নিমাইএর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু নিমাই বিবাহ সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি তুলিল এবং অবশেষে বলিল, 'বাগবাজারের চৌধুরীবাড়ির মেয়ে' ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। শিবচরণ খুব রাগারাগি করিলেন ও অবশেষে বহু সন্ধানে ও চেষ্টায় সেই ব্যবস্থাই করিলেন।

এদিকে বিবাহের পর বিনোদবিহারীর মোহ কাটিয়া গিয়াছে। পসারহীন উকিলের পক্ষে কলিকাতায় বাসা চালানো কঠিন। সে কমলমুখীকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিল। কমলমুখীর পিতা আদিত্যবাবু কন্যার জন্য বিপুল ঐশ্বর্য রাখিয়া গিয়াছিলেন; সে কথা নিবারণবাবু এতদিন বলেন নাই। বিবাহ বা প্রাপ্তবয়স্কা না হইলে সে অর্থ কমলের হাতে দেওয়া ছিল নিষেধ। নিবারণ এতদিন পরে তাহা কমলমুখীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। কমল এইবার স্বামীকে বশ করিবার এক ফন্দি আঁটিল। সে এক বাড়ি ভাড়া করিয়া উত্তমরূপে সাজাইয়া লইল। তাহার পরে বিনোদবিহারীকে তাহার এস্টেট প্রভৃতি দেখিবার জন্য উকিল নিয়োগ করিল। কমলমুখী অন্তরাল হইতে বিনোদের সহিত কথাবার্তা বলে বটে, কিন্তু মুখ দেখায় না, আত্মপরিচয়ও দেয় না। অবশেষে একদিন কমলমুখী বিনোদের স্ত্রীকে তথায় আনিবার জন্য অনুরোধ করিল। বিনোদ মহা মুশকিলে পড়িল; কী করিয়া নিবারণবাবুর কাছে মুখ দেখাইবে এবং স্ত্রীকে আনিবার প্রস্তাব করিবে!

এদিকে ইন্দুমতীকে বিবাহের জন্য ললিতকে অনুরোধ করা হইল। বিবাহের প্রস্তাবে ললিত বিনোদকে খুবই অপমান করিল। সে পুরা সাহেব, তাহার আকাঙ্ক্ষা উচ্চ। সে বলিল, 'তুমি wife select করবে আর আমি marry করব। I admire your cheek বিনু।' ইন্দুমতীর ধারণা ছিল ললিতবাবু কাদম্বিনীর নাম শুনিলেই বিবাহ করিবে। তিনি তো 'কদম্বে'র নামে কবিতা পর্যন্ত লিখিয়াছেন! কিন্তু ললিতের সহিত তো তাহার দেখা হয় নাই, হইয়াছিল নিমাইএর সঙ্গে; সেই ভুলই চলিতেছে। অবশেষে বহু সাধ্যসাধনার পর ইন্দুমতীকে নিমাই-এর সম্মুখে আনা গেল। ইন্দু জানে উনি ললিতবাবু। কথাবার্তার মধ্যে উভয়ের ভুল ভাঙিয়া গেল। নিমাই ইন্দুমতীকে বিবাহ করিতে রাজি হইল। কিন্তু কাদম্বিনীর দশা কী হয়। শিবচরণের মুখ রক্ষা হয় কী করিয়া। চন্দ্রকান্ত সে সমস্যা পূরণ করিয়া দিল। ললিত কাদম্বিনীকে বিবাহ করিতে রাজি হইল। কাদম্বিনী অত্যন্ত কুরূপা ছিল বটে কিন্তু তাহার অভিভাবকের রূপার জোর ছিল। সেই গুণে ললিত বিবাহে রাজি হইল; সে টাকা লইয়া বিলাত যাইবে।

এদিকে কমলমুখী বিনোদকে বেশ নাকাল করিয়া আত্মপরিচয় দিল; ইন্দুমতীও নিমাইকে বিবাহ করিয়া সুখী হইল। গোড়ায় গলদ থাকিলেও শেষ রক্ষা হইল।

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষ

কাব্যলক্ষ্মী বা গীতশ্রী কবিহৃদয়ে বহুকাল আবির্ভূতা হন নাই। পত্রিকা-পরিচালনার খাতিরে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য করিতে হয়; গদ্য প্রবন্ধ, গদ্য গল্প, ব্যাকরণের বিশ্লেষণ, দেশবিদেশের পত্রিকার সারসংগ্রহ, সাময়িকপত্রের সমালোচনা লিখিতে হয়; ছন্দোময়ী ভাষা কোনো রন্ধ্রপথে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। শতকর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ যে কবি, এই সামান্য কথাটি তাঁহার অন্তর্দেবতা ভুলিতে পারেন না; তাই তাঁহার গদ্য গল্পগুলিই অন্তর্বিষয়ী লিরিকধর্মী হইয়া ফুটিয়া ওঠে।

মানুষ যখন এইরূপ কর্মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, তখন মনে হয় জগতে ব্যবহারিকতারই জয়; তখন বাস্তবতাকে লোকে

সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, পাণ্ডিত্যকে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম করে। তখন তাহার মনে হয় কাব্য মিথ্যা, ছন্দ নিরর্থক, সুর অলীক— সত্য কেবল তথ্য, তত্ত্ব, শব্দ, অলংকার, ব্যাকরণ, সংখ্যা প্রভৃতি। কিন্তু যথার্থ কবির অন্তর তাহাতে সাড়া দিতে পারে না, জ্ঞানগর্ভ বাক্য অন্তরে সম্ভ্রম সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু রসপূর্ণ বাক্য চিত্তে প্রেমস্বপ্ন জাগায়। রসই প্রাণ, রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এবং সেই কাব্যই বিরহে তৃপ্তি, বেদনায় শান্তি আনিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মনে যখন এই সংগ্রামই চলিতেছিল, তখন তিনি 'জয়পরাজয়' (সাধনা ১২৯৯ কার্তিক) লেখেন। এই গল্পে তিনি Defence of Poetry করিলেন। বৈয়াকরণরা শব্দ সৃষ্টি করেন; কিন্তু মানুষ যে-ভাষা অন্তর দিয়া অনুভব করে তাহা কেবল শব্দ নহে, সেই বাক্যে প্রাণসঞ্চার করেন কবিরা। শব্দের কোলাহলে মানুষ ত্রস্ত হয়, রসাত্মক বাক্য তাহাকে তৃপ্তি দান করে। তাই দিঙ্‌নাগদের দল চিরদিনই কালিদাসদের লাঞ্ছনা করিয়াছে। পুণ্ডরীক পণ্ডিতের হাতে শেখর কবির পরাজয় হইল; সেইজন্যেই রাজাও তাহাকে কোনো আশ্রয়দান করিলেন না। রাজসভায় পাণ্ডিত্যের বিচার হইতে পারে; কিন্তু কাব্যবিচারের মানদণ্ড তো বাহিরে নাই, কারণ কাব্য বিচার্যবস্তু নহে, উহা বোধের ও সম্ভোগের বিষয়। তাই দেখি শেখর কবি পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া পরদিন রাজসভায় প্রবেশ করিয়া "গান আরম্ভ করিয়া দিলেন— বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনো গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না, কোথায় বাজিতেছে।· ·বাঁশি কী বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কী বলিতে চাহে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ-প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ-অপযশ জয়পরাজয় উত্তরপ্রত্যুত্তর সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন।" লোকে ক্ষণিকের জন্য সব ভুলিয়া ছিল; কিন্তু পুণ্ডরীক রাধা শব্দের ব্যাখ্যায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন; তাঁহার অদ্ভুত শব্দচাতুরী বাগাড়ম্বর দেখিয়া সভাস্থ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না। রাজা নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন, কবির পরাজয় হইল। কুটিরে ফিরিয়া শেখর তাঁহার সমস্ত পুঁথিগুলি পড়িলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়। কতকগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল।" অতঃপর গ্রন্থগুলি অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া মধুর সহিত একটা উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্ত মুখে পান করিলেন। এমন সময়ে রাজকন্যা অপরাজিতা আসিয়া মৃত্যুপথযাত্রীর উদ্দেশে বলিলেন, 'তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি' বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যাদর্শকে কাব্যসরস্বতীর হস্তে জয়টীকা পরাইয়া লইলেন। কিন্তু যথার্থ এই রোমান্টিক গল্পটির মধ্যে বিশুদ্ধ আর্টের উদ্দেশে যে-জয়মাল্য উৎসর্গ করিলেন তাহা কিছুকাল পরে 'পুরস্কার' কবিতার মধ্যে আরও পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়; সেখানে কবিই জিতিয়াছিল রাজকণ্ঠের পুষ্পমালা পাইয়া। যথাস্থানের জন্য সে-আলোচনা স্থগিত থাকিল।

১২৯৯ সালের ভাদ্র মাসে 'গোড়ায় গলদ' নাটক মুদ্রিত ও বোধ হয় আশ্বিন মাসে উহার অভিনয় হয় সংগীত সমাজের উদ্যোগে। রবীন্দ্রনাথ শরৎকালটা কলিকাতায় থাকিয়া যান। এই সময়ে স্থির হয় মৃণালিনী দেবী সন্তানদের লইয়া অগ্রহায়ণ মাসে সোলাপুরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে যাইবেন; তাঁহার সন্তানসম্ভাবনা। বোধ হয় সেইজন্য সেখানে পাঠাইতেছিলেন এবং তদ্রূপ স্থির করিয়া কার্তিক মাসে শিলাইদহে ফিরিয়াছিলেন। এই যাওয়ার কথাবার্তার সময় বোধ হয় পুত্রকন্যারা পিতাকে 'যেতে দিব না' বলে। খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কবির স্পর্শ-

চেতন মনে সেই অভিঘাতে যে ভাবোদয় হয়, তাহাই ব্যক্ত হয় 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় ; উহা লিখিত হয় ১৪ কার্তিক ১২৯৯ (২৯ অক্টোবর ১৮৯২)। কবিতার মধ্যে আছে 'কন্যা মোর চারি বৎসরের'। তখন জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স ৬ বৎসর, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ৪ বৎসর, কনিষ্ঠা কন্যা রেণুকা ২ বৎসরের শিশু।

'যেতে নাহি দিব' কবিতা ও 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি ১২৯৯ সালের কার্তিক মাসে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পের মধ্যে 'খোঁকি'র বিবাহ দিনে শরৎ-আকাশের মধ্যেও এই কবিতার বেদনাই যেন প্রকাশ পাইয়াছে। খোঁকির প্রতি দুর্ধর্ষ আফগান রহমত খানের স্নেহ ও তাহার বুকের মধ্যে মেয়ের হাতের ছাপ-দেওয়া লুকানো মলিন কাগজটুকরা এবং চারি বৎসরের কন্যাটির প্রতি কবির স্নেহ, উভয়ের পক্ষে ভাবের একটা মিল আছে। 'কাবুলিওয়ালা' দরদী পাঠকের চক্ষুকে অকারণে অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে— জীবনের মধ্যে কোথায় একটা ট্র্যাজেডি প্রচ্ছন্ন আছে, তাকে যেন অমোঘ ও অনিবার্য বলিয়া মনে হয়— তেমনই 'যেতে নাহি দিব'র মধ্যে।

চারি বৎসরের কন্যার তুচ্ছ একটি কথা, কবির মনে কী অপরূপ চিন্তাধারা আনিতে পারে, এই কবিতাটি তাহারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই কবিতাটিতে বাঙালি সাংসারিক জীবনের যে-চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যেমন সত্য, মানবজীবনের যে-তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও তেমনি গভীর। প্রকাশভঙ্গির অনবদ্যতা কবিতাটির কোথাও ম্লান হয় নাই— তত্ত্ব ও বাস্তবতা আশ্চর্যভাবে ভাষা ও ছন্দে মিশিয়া অপরূপ হইয়াছে। মানুষের চিরন্তন ক্রন্দনধ্বনি 'যেতে নাহি দিব'— চলমান জগতের ঘর্ঘর শব্দের নিকট বৃথায় আছড়াইয়া মরে—

> এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
> সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
> গভীর ক্রন্দন— 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
> তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।. .

বোধ হয় এই মনোভাব লইয়া স্ত্রী-পুত্রদের কলিকাতায় রাখিয়া শিলাইদহে চলিয়া যান। সেখান হইতে চলিলেন রাজশাহী (রামপুর-বোয়ালিয়া); লোকেন পালিত সেখানে জেলাজজ হইয়া আসিয়াছেন অক্টোবর মাসে। বহুদিন পরে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজশাহীতে দিন পনেরো ছিলেন।[১] সেইখানে শেষদিনে লেখেন 'প্রতীক্ষা'[২] কবিতাটি।

'যেতে নাহি দিব' কবিতার মধ্যে জীবনের যে-ট্র্যাজেডিটুকু প্রচ্ছন্ন, নীরব অশ্রুতে যাহার প্রকাশ, সেই কথাটিই আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইল 'প্রতীক্ষা'র মধ্যে—

> ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
> বেঁধেছিস বাসা।
> যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
> স্নেহ-ভালোবাসা

১ [? ১৩ই নভেম্বর হইতে ৩০ নভেম্বর ১৮৯২] ২৯ কার্তিক হইতে ১৫ই অগ্রহায়ণ ১২৯৯ পর্যন্ত।

১ প্রতীক্ষা, প্রথম খসড়া ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৯ [৩০ নভেম্বর ১৮৯২], রাজশাহী। পুনর্লিখিত ২০ অগ্রহায়ণ নাটোর ; শেষ রূপদান ২১ অগ্রহায়ণ শিলাইদহ। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ-সুখ,
মর্মের বেদনা,
চির-দিবসের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন-আঁকা
বাসনা-সাধনা ;
যেখানে নন্দন-ছায়ে নিঃশঙ্কে করিছে খেলা
অন্তরের ধন,
স্নেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের স্নেহস্মৃতি,
আনন্দ-কিরণ,
কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গের
গীতিময়ী ভাষা,
ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে
বেঁধেছিস বাসা।

সংসারের ঘটনা আপন ধারায় চলিতেছে। ১৭ নভেম্বর (৩ অগ্রহায়ণ) মৃণালিনী সন্তানদের লইয়া এবং ইন্দিরা দেবী সোলাপুরে পিতার নিকট চলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী হইতে এক পত্রে লিখিতেছেন, "এতক্ষণ রেলগাড়ি না জানি কোথায় গিয়ে পৌঁছল। এই সময়টা সকালবেলায় নওয়াডির[১] কাছে· ·সূর্যোদয় হয়।"[২] পথের দৃশ্য কল্পনা করিয়া লিখিয়া যান, মন যেন সন্তানদের সঙ্গ লাভ করে।

শিক্ষার হেরফের

১৮৯২ সালের নভেম্বর মাসের শেষার্ধ রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে লোকেন পালিতের অতিথি হইয়া বাস করেন ; স্ত্রী-পরিবার কলিকাতায় রাখিয়া আসেন ; ব্যবস্থামতে তাঁহারা সোলাপুর যাইতেছেন। লোকেন রাজশাহীতে জেলা-জজ হইয়া আসিয়াছেন মাত্র একমাস (১১ অক্টোবর) ; কবি তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের কয়েকদিন বন্ধুর নিকট কাটাইবার জন্য আসিলেন। সঙ্গে আসিয়াছেন প্রমথ চৌধুরী।

রাজশাহীতে সে সময়ে কয়েকজন সাহিত্যিক-মনীষী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে আসাতে লোকেনের বাসায় বেশ একটা সাহিত্যমজলিশ জমিয়া উঠে। ইঁহাদের মধ্যে আছেন স্থানীয় উকিল অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,· দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি তরুণের দল। সান্ধ্য সভায় নানা বিষয়ের আলোচনা চলে। প্রমথ চৌধুরী বলেন এই সময় হইতে কবির মাথায় পঞ্চভূতের ডায়ারির আইডিয়াটা ঘুরিতেছে, এবং হয়তো এইখানেই তাহা শুরু করেন, কারণ মাঘ মাসের (১২৯৯) সাধনায় পঞ্চভূতের ভূমিকা-অংশ বাহির হয়।[৩]

১ নওয়াডি নামে কোনো স্টেশন এখন নাই ; বর্তমান ঝাঁঝাঁ (সাঁওতাল পরগণা) স্টেশনের পূর্ব নাম ছিল নওয়াডি।

২ ছিন্নপত্র। ইন্দিরা দেবী ১৮৯২-এ বি.এ পাস করিয়াছেন ; কলিকাতা হইতে সোলাপুর যাইতেছেন, মৃণালিনী দেবী স-সন্তান তাঁহাদের সঙ্গে সেখানে যাইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮ নভেম্বর পত্র লিখিতেছেন।

৩ রাজশাহী (বা রামপুর বোয়ালিয়া)-তে রবীন্দ্রনাথ লোকেনের বাসায় দিন পনেরো ছিলেন (? ১৩ নভেম্বর—৩০ নভেম্বর ১৮৯২)। এখান হইতে ইন্দিরা দেবীকে (১৯) লিখিত এক পত্র ছিন্নপত্রে আছে।

রাজশাহীতে বাসকালে তথাকার এসোসিয়েশন হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য তাঁহার আহ্বান আসিল এবং তদনুসারে কবি 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিলেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিবার পর বাংলাদেশের লোকে এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইলে বিদেশের লোকে রবীন্দ্রনাথকে একজন শিক্ষাশাস্ত্রী বলিয়া জানিতে পারে। তাহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একত্রিশ বৎসর বয়সে শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার অর্জন করেন নাই। কিন্তু মনীষীর লেখনী যাহা-কিছুই স্পর্শ করুক না কেন তাহাকে নূতন রূপ দান করিতে পারে। আজ অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানেও দেখা যাইতেছে 'শিক্ষার হেরফের' সম্বন্ধে কবির রচনার সত্যতা ও ঔজ্জ্বল্য কণামাত্র ম্লান হয় নাই। যেসব কার্যকারণের ফলে বাংলার শিক্ষা পঙ্গু ও বাঙালির চিত্ত তমসাচ্ছন্ন, তাহার মূল কারণগুলি পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধানে এখনো অপরিবর্তিত। তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কালধর্মানুসারে শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষণীয় বিষয়ের অনেকখানি পরিবর্তন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শিক্ষার যে-সমালোচনা করিলেন তাহাতে স্পষ্ট বলিলেন যে, দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ব্যতীত শিক্ষা সর্বব্যাপী হইতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথ কখনো বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার বিরোধী নহেন। কিন্তু ইংরেজি না শিখিলে কাহারো জ্ঞান বিকাশ হইবে না, এই অদ্ভুত অবস্থার যে অবসান হওয়া প্রয়োজন, এই কথাটাই জোর দিয়া বলিয়াছিলেন।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে শিক্ষার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু কথারই আলোচনা ছিল। তিনি বলেন যে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষ সর্বদাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু চায়; যতটুকু অত্যাবশ্যক তাহারই পরিমাণে মাপিয়া যদি আমাদের খাদ্য পরিধেয় বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত, তবে কখনো দেহ ও মন তৃপ্ত হইত না। অত্যাবশ্যকের উপরে অনাবশ্যকটাকে প্রয়োজন বেশি; এবং সেই বেশিটাই মানুষকে মনুষ্যপদবাচ্য করিয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। "অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না।" দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালি ছেলের হাতে স্বাধীন পাঠের সময় নাই, কারণ বিদেশী ভাষায় সকল জ্ঞান সমাধিস্থ— জ্ঞানে তাহার অধিকার নাই। এ ছাড়া আমাদের দেশে শিক্ষা নিরানন্দময়। "আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে।" বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনা এই দুই বৃত্তির চর্চা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই কল্পনাশক্তির উদ্‌বোধনের কথা তিনি পূর্বে অন্যান্য প্রবন্ধেও বলিয়াছেন। কারণ সমস্ত বৃহৎ কর্মের পশ্চাতে অনেকখানি কল্পনার জোর থাকে; সাহসিক কল্পনা ও আন্তরিক মনন ব্যতীত জগতে কোনো বৃহৎ কর্ম সফল হয় নাই।

বাংলাভাষা শিক্ষার সমর্থনে লেখক বলিলেন যে, যাহারা সামান্য বাংলা শেখে তাহারা রামায়ণাদিও পাঠ করিতে পারে; কিন্তু যাহারা এদেশে সামান্য ইংরেজি শেখে তাহারা তো কিছুই আয়ত্ত করিতে পারে না। বিশ-বাইশ বছর ধরিয়া আমরা যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা পাই, তাহা আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জীবনের সহিত যে-সংযোগ হয় তাহা আদৌ রাসায়নিক সংযোগ নহে, উহা একেবারে বাহিরের অলংকার থাকিয়া যায়। সেইজন্যই দেখা যায় ছাত্রদিগের জীবনে "গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে, আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্য প্রান্তে।" ফলে তাহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না। আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য কিভাবে হইতে পারে তাহার আলোচনা করিয়া বলিলেন, এ মিলন সাধন হইতে পারে কেবল বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেসব মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা দেশের ও দশের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী না হইলেও, তাহা-যে সে যুগের পক্ষে নির্ভীক সমালোচনা তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বাংলার তৎকালীন মনীষীরা একবাক্যে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিলেন। কারণ এযাবৎ এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে ক্রিটিসিজম্ তেমনভাবে হয় নাই। শিক্ষার গলদ কোন্‌খানে তিনি ঠিক সেই স্থানটিই নির্দেশ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে লিখিলেন যে তিনি প্রবন্ধটি দুইবার পাঠ করিয়াছেন, 'প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।' জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচানসেলর (১৮৯০-৯২), তিনি লেখকের মতামত অনুমোদন করিয়া পত্র দেন; ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসুও কবির মত সমর্থন করিলেন।

এই প্রবন্ধের অনুবৃত্তিরূপে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিলেন তাহাও অমোঘ সত্য; তিনি বলিলেন, "দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর-কোনো গতি নাই এ কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। রাজা কত আসিতেছে কত যাইতেছে; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে, কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে; ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায়, তবে পরশ্ব ঐ বড়ো বড়ো বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্বুদের মতো প্রতীয়মান হইবে।"[১]

বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষার ফলে আমাদের মন যেমন যথার্থভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানান্বেষণের ঔৎসুক্য বোধ করিতে পারিতেছে না, তেমনি স্বজাতীয় শাস্ত্রের শিক্ষায়, আচারের অত্যাচারেও আমাদের মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। নূতনের অন্ধ অনুকরণ ও প্রাচীনের মূঢ় অনুসরণ যুগপৎ বাঙালির চিত্তকে চাপিয়া মারিতেছে। যুববঙ্গে সেই শাস্ত্রীয় অনুশাসন নবভাবে নবনামে নবপরিচ্ছদে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য একদল শিক্ষিত লোক সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই তাহাদিগকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন নাই, আজও দেখিলেন না। চন্দ্রনাথ বসুর 'কড়াক্রান্তি'[২] নামক এক প্রবন্ধের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন 'কড়ায়-কড়া কাহনে-কানা'[৩]। 'শিক্ষার হেরফের' যে-মাসে সাধনায় প্রকাশিত হইল এই প্রবন্ধটিও সেই মাসে বাহির হয়। সাধারণত লোকে ইংরেজি শিক্ষার কুফলের জন্য বিদেশীয়কেই দায়ী করে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় আচারে মানুষের মন যে কী পরিমাণ পঙ্গু, তাহার বুদ্ধি যে কী পরিমাণ জড় হয় তাহার জন্য কাহাকে দায়ী করা হইবে? মন্দ বিদেশ হইতে আসিলেও নিন্দনীয়, মন্দ দেশজ শাস্ত্রসম্ভূত লোকাচারপ্রসূত হইলেও অশ্রদ্ধেয়। আমরা সমাজব্যবহারে 'কড়ায়-কড়া, কাহনে-কানা'। অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিল দেওয়া। ইংরেজিতে যাহাকে বলে পেনি ওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ অর্থাৎ 'বজ্র আঁটন ফস্কা গিরো'— "প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই, কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল। আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা-আচারবিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।" হিন্দু বিপুল অথচ দুর্বল— এ কথাও কবি একাধিকবার বলিয়া হিন্দুকে সতর্ক করিয়াছেন। মোটকথা শিক্ষার সহিত বিশ্বাসের, মতের সহিত ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষা না করায় আমাদের নৈতিক আদর্শ কখনো লজ্জিত হয় না।

'বাংলা লেখক' (সাধনা ১২৯৯ মাঘ) নামে এক প্রবন্ধে এইসব কথা অন্যভাবে আলোচনা করিলেন; তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে যে লেখক ও পাঠকের মনের ও মতের কোনো যোগ নাই। লেখকের কোনো সুযুক্তি শুনিয়া

১ প্রসঙ্গ কথা, সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

২ সাহিত্য, ১২৯৯, কার্তিক।

৩ কড়ায়-কড়া কাহনে-কানা, সাধনা, ১২৯৯ পৌষ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। 'সমাজ' গ্রন্থে 'আচারের অত্যাচার' নামে পরিচিত।

কেহ আপন জীবনযাত্রার লেশমাত্র পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন এমন ঘটনা সুদুর্লভ। ফলে, "লেখকরা কিছুমাত্র দায়িত্ব অনুভব করেন না। সত্য কথা বলা অপেক্ষা চতুর কথা বলিতে ভালোবাসেন।" ইহার কারণ আমাদের দেশে ভাবের প্রতি আন্তরিক আস্থা নাই। এই প্রসঙ্গটাই রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বহু উদাহরণ ও উপমার দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সাহিত্যে ও জীবনে সমালোচনার অভাবে যে যেমন ভাবে চিন্তা করিতেছে, বিশ্বাস করিতেছে, রচনা করিতেছে; কারণ লেখক ও পাঠক কেহই কাহারও মতামতের জন্য দায়ী নহে। তাই বলিলেন, "এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।"[১]

কিন্তু সুখের বিষয় কবির এই মনোভাব স্থায়ী হয় নাই; তিনি সংস্কারকের রুদ্রবেশ অচিরে ত্যাগ করিয়া সাহিত্যিকের শুভ্রবেশ পরিয়া যখন কাব্যলক্ষ্মীর উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখনই তাঁহাকে সুন্দর দেখাইল।

মানসসুন্দরী

রাজশাহীতে লোকেন পালিতের অতিথিরূপে দিন পনেরো থাকিয়া মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে লোকেন ও রবীন্দ্রনাথ নাটোর যাত্রা করিলেন। ঘোড়ার গাড়িতে আটাশ মাইল পথ। গাড়ির মধ্যে লোকেন বই পড়েন, কবি গান ধরেন 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি'। বৈষ্ণব কবিদের লইয়া তর্ক চলে দুই বন্ধুতে। কিয়দ্দূর হাঁটিয়া চলিলেন। ইন্দিরা দেবীকে নাটোর হইতে এই পথের বর্ণনা দিয়া এক পত্র লেখেন (১ ডিসেম্বর ১৮৯২)।

নাটোরে দারুণ দন্তশূলে কয়দিন বেশ কষ্ট পাইলেন। মহারাজার কর্মচারী যদুনাথ লাহিড়ীর[১] সেবাযত্নে সুস্থ হইয়া সাত দিন পরে শিলাইদহে ফিরিলেন। সেখান হইতে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "হতভাগ্য কপালে চপেটাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করচে, তোরা এমন দুর্লভ বেদনাটা যদুবাবুর উপর দিয়েই কাটালি।· ·ব্যামো করে আজকাল কোন ফল নেই, তাই আজকাল শরীর ভাল রাখবার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি আছে।"[২]

এইটুকু লিখিবার তাৎপর্য ছিল—এ সময়ে মৃণালিনী দেবী সন্তানদের লইয়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে সোলাপুর আছেন। কবি একা আছেন। একমাস হইল তাঁহারা সকলে সোলাপুর গিয়াছেন।

সাত দিন নাটোরে থাকিয়া শিলাইদহে ফিরিয়াছেন; প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "আমরা জ্বলন্ত বাষ্পরাশির মত অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে পুনর্বার সংহত পিণ্ডের আকারে আপনার নির্জন কক্ষপথে ছিট্‌কে পড়েছি।· ·আমি কতক জমিদারির কাজ দেখচি, কতক সাধনার জন্যে লিখচি এবং চেষ্টা করচি এরই মধ্যে একটুখানি অবসর করে নিয়ে [কবিতা] লিখতে। কিন্তু হয়ে উঠচে না"।[৩] কবিত্বের অনবসর সম্বন্ধে দুঃখ না করিয়া 'দুঃখমোচনের চেষ্টা করা ভাল' ভাবিয়া লিখিয়া ফেলিলেন 'মানসসুন্দরী' কবিতাটি (৪ পৌষ ১২৯৯)। কবিতাটি লেখা হইয়া গেলে পত্রে লিখিতেছেন, "কবিতা লেখাটা নিতান্ত আমার আজন্মকালের নেশা—মাঝে মাঝে যখন মৌতাতের সময় আসে তখন না লিখতে পারলে সমস্ত মনটা যেন বিকল হয়ে যায় এবং জীবনটা দুর্ভর বোধ হয়।"[৪]

১ প্রমথ চৌধুরী : আত্মকথা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯, পৃ ৫১৩।

২ ছিন্নপত্র ১৮ ডিসেম্বর [১৮৯২], বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ ১৩৫১, পৃ ৮১।

৩ [১৪ই ডিসেম্বর ১৮৯২], চিঠিপত্র ৫।

৪ শিলাইদহ, ১৯ ডিসেম্বর ১৮৯২, চিঠিপত্র ৫।

আর এক পত্রে লেখেন, "কবিতাই আমার সব প্রথম প্রেয়সী তার সঙ্গে বেশি দিন বিচ্ছেদ সহ্য হয় না।"[১]

কিন্তু মনটা তো ত্রিধা কেন বহুধা হইতে বাধ্য। জমিদারির কাজ, সাধনার লেখা তো আছেই, ইহার উপর আছে স্ত্রীপুত্র পরিবারের জন্য ভাবনা। তবে এ সবের উর্দ্ধে উঠিবার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চলে, এবং সফলকামও হন; সমসাময়িক পত্রে লিখিতেছেন, "আমার জীবনের আইডিয়াল হচ্ছে, যখন যে কর্তব্যটা স্কন্ধে এসে পড়ে তাকে ফেলে না দিয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা।· ·তাই আমি প্রতি মাসে নত শিরে সাধনার লেখা লিখে যাচ্ছি এবং প্রতিদিন জমিদারির সমস্ত খুচরো কাজ মনোযোগপূর্ব্বক করচি। তুমি কি মনে কর এতে আমি কোন সুখ পাই?· ·অনেক সময় কষ্ট বোধ হয়—কিন্তু আমার মনে হয় মোটের উপর আমার পক্ষে এই সবচেয়ে ভাল। কল্পনা নামক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো আমার মনের পক্ষে ভাল এক্সাসাইজ নয়।"[২] এ-কথা অতি সত্য; বৈচিত্র্য ও সংগ্রামহীন বিরামহীন অলস জীবন বা আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ কর্মজীবন যাপন করিলে কবিতাও হইত তদ্রূপ।

মানসসুন্দরী দীর্ঘ কবিতা। ইহা পাঠের পর এই কথাই বারবার মনে হয় যে আমাদের জীবনে কোথায় একটা বেসুর সর্বদা বাজিতেছে; সেই বেসুরের বেদনা বাজে স্পর্শচেতন কবিচিত্তে। মানুষের শুষ্ক কর্মময় জীবনে কাব্যশ্রী ব্যতীত আর কেহই যথার্থ সুর ধ্বনিয়া তুলিতে পারে না। সৌন্দর্যের যে-অনির্বচনীয়তা শিল্পীর মানসপটে আঁকা থাকে তাহার নামকরণ করা কঠিন; আর-কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া যেন কবি তাহাকে মানসসুন্দরী বলিলেন। আরও কত নামে ইনি আখ্যাত হইয়াছেন। ইংরেজি সাহিত্যে শেলীর alastor-এর সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। উভয় কবির কাছে আদর্শ সৌন্দর্য হইতেছে দৈহিক মানসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয়; সেই সংশ্লিষ্ট সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি রমণী মূর্তিতে উদ্‌ভাসিত। একটি নারীমূর্তিতে সমগ্র জীবনের সৌন্দর্য-অনুভূতিকে স্তরে স্তরে কল্পিত হইয়াছে। নারী জীবনের সকল অবস্থায় সে কবিচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে; 'প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির এক বালকের সাথে কী খেলা' সে খেলিত; তারপর 'যৌবনবসন্তে' 'খেলাক্ষেত্র হতে কখন অন্তরলক্ষ্মী' এসেছিল 'অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে' 'মহিষীর মতো'। 'ছিলে খেলার সঙ্গিনী, এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী'।

এইখানেই কবির আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই—

মানসরূপিণী ওগো, বাসনাবাসিনী
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী?· ·
সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা?· ·
তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে? আমাদের দুই জনে
হবে কি মিলন?· ·

১ চিঠিপত্র ৫।
২ ১৯ ডিসেম্বর ১৮৯২, চিঠিপত্র ৫।

কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি'
প্রণয়ে বিকশি। মিলনে আছিলে বাধা
শুধু একঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কল্পনা ও মনন-শক্তি প্রেমকে অনির্বচনীয় বিশ্বানুভূতির মধ্যে লইয়া গিয়াছে; সকলের মধ্যে তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা। মানসসুন্দরী কবিতার এই ভাবরাজি কবির বহু রচনায় বারে বারে নবতর বেশে দেখা দিয়াছে। এই মানসসুন্দরী এই ধরিত্রীর বুকে থাকিয়া সার্থক; অসংখ্য প্রেমবন্ধনে সে আবদ্ধ।

কিন্তু 'উর্বশী' কবিতায় কবি প্রেমকে সকল বন্ধন হইতে মুক্তরূপে অবচ্ছিন্নভাবে কল্পনা করিয়াছেন। সেখানে সবই 'নেতি' 'নেতি'— 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ।' কোনো মানবীয় সম্বন্ধের বন্ধনে তাহাকে বাঁধা যায় না। তাই বলিতে ইচ্ছা করে 'উর্বশী' কবিতাটি যেন মানসসুন্দরীর antithesis বৈপরীত্যের পরিপূরক। সৌন্দর্যের শেষ কথা হইয়াছে 'বিজয়িনী' কবিতায়। যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে।

মানসসুন্দরীর মধ্যে কবি এক অনির্বচনীয় সত্তাকে মূর্তিমতী করিয়া আহ্বান করিলেন— এ যেন জীবনদেবতার অস্পষ্ট অগ্রবাণী। মানসসুন্দরীর বা 'প্রেয়সী' কবিতার স্তব কেন লিখিতেছেন 'সে কথাটাই এই সময়ের পত্রমধ্যে বারে বারে আসিতেছে; নাটক ও উপন্যাস লিখিয়া যেমন নানা ভাবে কৈফিয়ত ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানে কবিতা লিখিবার প্রেরণা সম্বন্ধে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। কয়েকমাস পরে প্রেয়সী কবিতা সম্বন্ধে দীর্ঘ এক পত্রে লিখিতেছেন, "কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী— বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স [৫-৬] ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাগ্‌দত্তা হয়েছিল। তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়িভিতরের বাগান, বাড়িভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ, এক দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়া জগৎ তৈরি করেছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত, কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি, কবিকল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয়, তা স্বীকার করতে হয়; আর যাই হোক্, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারিনে; কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি স্থাপন ক'রে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি— আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনোও মিথ্যা কথা বলিনে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"[১]

১ ছিন্নপত্র ৮ই মে ১৮৯৩ [২৬ বৈশাখ ১৩০০]।

কাব্যের তুরীয় লোক হইতে রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে অকস্মাৎ আসিয়া পড়িলেন; সোলাপুর হইতে মৃণালিনী দেবী লিখিতেছেন যে সেখানে তাঁহার আর ভাল লাগিতেছে না। যথাসত্বর কলিকাতায় ফিরিবেন। তাঁহারা নভেম্বর মাসে সোলাপুর গিয়াছিলেন। কবি পত্র পাইয়া স্ত্রীকে লিখিতেছেন (বোধ হয় ডিসেম্বরের শেষ দিকে) "আজ শিলাইদহ ছাড়বার আগেই তোমার চিঠিটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। তোমরা আসচ এক হিসাবে আমার ভালই হয়েচে, নইলে কলকাতায় ফিরতে আমার মন যেত না, এবং কলকাতায় ফিরেও আমার অসহ্য বোধ হত।··আমি বেশ জানি যতদিন তোমরা সোলাপুরে থাক্‌বে ততদিন তোমাদের পক্ষে ভাল হবে। ছেলেরা অনেকটা শুধ্‌রে এবং শিখে এবং ভাল হয়ে আসবে এই রকম আমি খুব আশা করেছিলুম। যাই হোক সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়। যে অবস্থার মধ্যে অগত্যা থাকতেই হবে তার মধ্যে যতটা পারা যায় প্রাণপণে নিজের কর্তব্য করে যেতে হবে—তারই মধ্যে যতটা ভাল করা যায় তা ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে বল। অসন্তোষকে মনের মধ্যে পালন কোরো না, ছোট বউ—ওতে মন্দ বই ভাল হয় না।"[১]

সাংসারিক অশান্তি মনকে নানা দিক হইতে ক্লান্ত করে, তবুও তাহার ঊর্ধ্বে উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন; স্ত্রীকে উল্লিখিত পত্রে সান্ত্বনা দিয়াই বোধ হয় লিখিলেন যে উড়িষ্যা ভ্রমণ কালে তাঁহাকে ভ্রমণ-সঙ্গিনী করিবেন। এবিষয়ে পিতার কাছে দরবার করিয়া বলিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

উড়িষ্যা-ভ্রমণ

উত্তরবঙ্গ হইতে কলিকাতায় সময় মতো ফিরিলে কবিকে নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনের মঠপ্রতিষ্ঠা-উৎসবের প্রথম সাম্বৎসরিকে (১২৯৯ পৌষ ৭) উপস্থিত হইতে হইত; কিন্তু সেখানে তাঁহাকে দেখি না। আমাদের মনে হয় তখন রবীন্দ্রনাথ নিজ পরিবার সংসার লইয়া খুবই ব্যস্ত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সোলাপুরে— জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁহার পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন এমন স্বজনের অভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। মাঘোৎসবের জন্য পাঁচটি নূতন গান[২] লিখিয়াছিলেন বটে, তবে সে-গানে উজ্জ্বলতা নাই, অন্তরের উচ্ছ্বসিত বাণীর সুর নাই।

মাঘোৎসবের অল্পকাল পরে (১৮৯৩) ফেব্রুয়ারির গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ জমিদারি তদারক করিবার জন্য উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন। নৌকা করিয়া খালে খালে কটক পৌঁছিলেন।

কটকে গিয়া তাঁহারা উঠিয়াছিলেন বিহারীলাল গুপ্তের বাসায়। বিহারীলাল (B. L. Gupta) তখন কটকের ডিস্ট্রিক্ট জজ। বাঙালি সিভিলিয়ানদের দ্বিতীয় দলে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, ও বিহারীলাল গুপ্ত। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে বিহারীলাল হাওড়ার জজ থাকার সময়ে যে-মন্তব্যলিপি বঙ্গীয় গবর্নমেণ্টকে লিখিয়া পাঠান তাহারই ফলে ইলবার্ট বিলের জন্ম ও তদানীন্তন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বিহারীলালের সহিত ঠাকুরপরিবারের পূর্ব হইতেই ঘনিষ্ঠতা ও রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ

১ চিঠিপত্র ১।

২ গানগুলি— জয় রাজরাজেশ্বর; চিরবন্ধু, চিরনির্ভর; একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ; হৃদয়মন্দিরে, প্রাণাধিক; আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর। —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৪ শকাব্দ (১২৯৯) ফাল্গুন পৃ ২১৫—১৭।

বিহারীলালকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। এই শ্রদ্ধার নিদর্শন ও কটকভ্রমণের স্মৃতিকে অক্ষয় করিবার জন্য তাঁহার ছোটগল্পের প্রথম সংগ্রহ-গ্রন্থ 'ছোটগল্প'[১] এক বৎসর পরে পূজনীয় জ্যেষ্ঠ বিহারীলালকে উৎসর্গ করেন।

কটক হইতে রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবীকে যে-পত্র লেখেন তাহাতে বিহারীবাবুর একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, "বিহারীবাবুর অনেকটা আমার মত ধাত আছে দেখলুম। তিনি সকল বিষয়েই ভারি ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন। ··কেবল তিনি আমার মত খুঁৎখুঁৎ খিটখিট করেন না— সেটা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটা মহা সুবিধে। সমস্ত খুব চুপচাপ প্রশান্ত ভাবে সহ্য করতে পারেন। এ রকম স্বামী আমার বোধ হয় পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। বিহারীবাবু ভারি গৃহস্থ প্রকৃতির লোক— ছেলেপুলেদের খুব ভালোবাসেন, আমার দেখতে বেশ লাগে। আমাদের এমন যত্ন করেন— ঠিক যেন ঘরের লোকের মত— খুব যে বেশি আদর দেখিয়ে ব্যস্ত করে তোলা তা নয়— আমরা আমাদের ঘরে সমস্ত দিন যা-খুশি তাই করতে সময় পাই। যে যত্নটুকু করেন বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবে। কিচ্ছু বাড়াবাড়ি নেই।"[২]

কটকে বাসকালে রবীন্দ্রনাথের এমন একটি নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হয় যাহার কথা তিনি জীবনে কখনো ভুলেন নাই ও কয়েকবারই সেই স্মৃতি তাঁহার গদ্য রচনায় স্থান পাইয়াছে। বিহারীবাবুর বাড়িতে এক ভোজসভায় স্থানীয় সরকারী কলেজের (র‍্যাভেনশ কলেজের) ইংরেজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় যে ঘটনাটি ঘটে সে-সম্বন্ধে তিনি ইন্দিরা দেবীকে যে একখানি পত্র লেখেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,[৩] "জানিস বোধ হয় গবর্মেণ্ট আমাদের দেশের জুরিপ্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চারিদিকে ভারি একটা আপত্তি উঠেচে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে· · তর্ক করতে লাগল। বললে এদেশের moral standard low— এখানকার lifeএর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়। আমার যে কি রকম করছিল সে তোকে কি বলব! আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না।· ·একজন বাঙ্গালীর নিমন্ত্রণে এসে বাঙ্গালীর মধ্যে বসে যারা এ রকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কি চক্ষে দেখে!" এই পত্রখানিতে কবির অত্যন্ত উত্তেজিত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবদের প্রতি কবির অবজ্ঞা পত্রের প্রতি ছত্রে। বলা বাহুল্য পত্রলেখার সময় এই মনোভাব ছিল; এক সপ্তাহ পরে-লেখা আর-একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "তোকে কি লিখেছিলুম কিচ্ছু মনে নেই, হয়তো মনের আক্ষেপে কিছু বেশি মাত্রায় বলে থাকব। কিন্তু আমার মতে হচ্চে এই যে, এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস বিজনবাস আবশ্যক। এখন আমাদের প্রস্তুত হবার সময়।" ভোজসভায় যে-জুরিপ্রথা লইয়া তর্কটা উঠিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে এতটা তিক্ততা কেন হইয়াছিল সে বিষয়ে দুই-একটা কথা বলা প্রয়োজন।

১৮৬২ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসামসমন্বিত বঙ্গদেশের সাতটি জেলায় জুরিপ্রথা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জুরিপ্রথার ক্ষেত্র অন্য জেলায় প্রসারিত হয় নাই। ১৮৯০ সালে ভারত গবর্নমেণ্ট এই প্রথার সফলতা তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন পাঠাইবার জন্য প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট ও হাইকোর্টের নিকট অনুরোধ পাঠান। বাংলার তদানীন্তন লেফটেনেণ্ট গভর্নর সার্ চার্লস আলফ্রেড ইলিয়ট (১৮৯০-৯৫) বিভাগীয় কমিশনর ও পুলিস বিভাগ হইতে জুরিপ্রথার ফলাফল সম্বন্ধে যেসব রিপোর্ট পাইলেন, তাহা মোটেই ঐ প্রথার অনুকূল নহে; হাইকোর্টও এই প্রথা যেভাবে চলিতেছে, তাহার ঘোর নিন্দা করিলেন। ছোটলাট বাহাদুর ভারত গবর্নমেণ্টের নিকট যে-রিপোর্ট পাঠাইলেন

১ ছোটগল্প। ১৫ই ফাল্গুন ১৩০০ [১৮৯৪ ফেব্রুয়ারি ২৬]।

২ চিঠিপত্র ১।

৩ ছিন্নপত্র। ১০ই ফেব্রুয়ারি [১৮৯৩] বিশ্বভারতী পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ১৪৪।

তাহাতে তিনি বলিলেন যে, যেভাবে জুরির কাজ মফস্বলের আদালতে চলিতেছে তাহা আদৌ শুভ ফলপ্রদ নহে, তাহাকে সমর্থন করা কঠিন। তবে রাজনীতিক দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে উঠাইয়া দেওয়া যায় না। প্রাদেশিক গবর্নমেন্টসমূহ ও কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের মধ্যে পত্রাদি ব্যবহারের পর যাহা স্থির হইল তাহা 'received by an influential section of the public with much dissatisfaction'। সাতটি জেলার বাহিরে অন্যত্র জুরি-প্রথা প্রসারিত হইল বটে, কিন্তু হত্যাদি জটিল মামলার বিচার জুরিদের হস্তে অর্পিত হইল না।[১]

এইসব আলোচনায় যখন সাধারণে খুবই মত্ত, তখনই কটকে পূর্বোক্ত বিসদৃশ ঘটনাটি ঘটে। সেই দিনের ঘটনা তাঁহার মনে এমনি বিঁধিয়াছিল যে এই ঘটনার বিবৃতি দ্বারা দেড় বৎসর পরে 'অপমানের প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ শুরু করেন।[২]

'পূর্ণ পরিণত জনবৃষ' ইংরেজ অধ্যক্ষ সম্বন্ধে মন্তব্যপূর্ণ পত্রখানি লিখিবার পরদিনই (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩) রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল পুরী যাত্রা করেন। তখন রেলপথ হয় নাই। ফিটন গাড়িতে কাঠযুড়ি পর্যন্ত গিয়া পালকিতে চড়িতে হইল। কটক হইতে পুরী পর্যন্ত পথটি খুব ভালো। 'ছিন্নপত্রে' এই পথের সুন্দর বর্ণনা আছে। কবি লিখিতেছেন, "যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গোরুর গাড়ি সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে, গাছের তলায়, পুকুরের পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধছে, জটলা করে রয়েছে।··হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল।"··"পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অহর্নিশি সমুদ্র দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করছে।"[৩]

পুরীর সমুদ্র ও ভুবনেশ্বর মন্দির প্রভৃতি দর্শন কবিজীবনে সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার স্পর্শচেতন মনে এই নূতনের দৃশ্য সাড়া দিয়াছিল। এই মন্দিরাদির কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম তখন মনে হইল, একটা যেন কী নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে। সে কথা বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মূক বলিয়া, হৃদয়ে আরও যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ কি কোনার্ক মন্দির দেখিয়াছিলেন? স্পষ্টতঃ তাহার উল্লেখ না থাকিলেও তিনি 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' (১৩০১ চৈত্র) প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছিলেন, "যখন ভুবনেশ্বর ও কণারক মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া যায় তখন মনে হয়, এই আশ্চর্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোনো আকস্মিক আন্দোলনে কতকগুলি প্রস্তরময় বুদ্‌বুদের মতো হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল? সেই শিল্পীদের সহিত আমাদের যোগ কোনখানে?[৫]

পুরীতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সিভিলিয়ানদের সম্বন্ধে কবির আর-একটি অভিজ্ঞতা হইল। একদিন বিহারীবাবু, তাঁহার স্ত্রী, এবং রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ওয়াল্‌স্‌-এর সঙ্গে সামাজিক শিষ্টতা রক্ষার জন্য দেখা করিতে যান।

১ Buckland, *Bengal under the Lieutenant-Governors*, Vol. I. p, 322 ; II. p, 797, 945-48.

২ সাধনা ১৩০১ ভাদ্র। দ্র. রাজা ও প্রজা (১৩১৫), রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

৩ ছিন্নপত্র। পুরী ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

৪ মন্দিরের কথা, ভারতবর্ষ ১৩১২। মন্দির, বিচিত্র প্রবন্ধ প্রথম সংস্করণ, পৃ ৭৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪।

৫ সাহিত্য।

"মিনিট পাঁচেক পরে খবর এল— তার পরদিন সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ হবে। বিহারীবাবু মিসেস গুপ্ত অবাক হয়ে গেলেন। আমরাও সুড় সুড় করে ম্যাজিস্ট্রেটের দরজা থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম।" পরে জজ সাহেব আসিয়াছিলেন জানিতে পারিয়া সাহেব ও মেম ভারি দুঃখিত হইয়া পত্র দেন বটে। কিন্তু কবি ইহার থেকে অনেকখানি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। "আমাদেরই দেশের লোকের দোষ— তারা পেটের দায়ে মানের দায়ে উমেদারি করতে সেলাম করতে যায়, সাহেবের আদিষ্ট সময়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করে থাকে— সুতরাং আমি বঙ্গনামধারী এক ব্যক্তি যে আস্ফালন করে ম্যাজিস্ট্রেট এবং ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নীর উপর সামাজিক কর্ত্তব্যরক্ষাস্বরূপ 'কল' করতে যাব এ তাদের মনেও উদয় হয় নি।· ·পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট পরদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করলে আমি কি তাতে ভারি খুসি হয়েছিলুম?· ·নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড় বেশি স্পষ্টরূপ অভিমান প্রকাশ করা হয় এবং তাতে যথার্থ অভিমানের খর্ব্বতা হয়— তা ছাড়া বিহারীবাবুদের বিশেষ ক্ষুণ্ণ করা হয়।" নিমন্ত্রণ সভার বর্ণনাটুকু 'ছিন্নপত্রে' প্রকাশিত হইয়াছে (কটক, মার্চ ১৮৯৩), "তার পরে সাহেবের গান শুনলুম, সাহেবকে গান শোনালুম, তালি দিলুম এবং তালি পেলুম।" এই কৃত্রিম দস্তুরহাস্য সভ্যতার সহিত ভারতের হীন অবস্থার তুলনা করিয়া মন অত্যন্ত ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই পত্র শেষে লিখিলেন, "হে মৃৎপাত্র; ঐ কাংস্যপাত্রের কাছ থেকে দূরে থেকো; ও যদি রাগ ক'রে তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে, আর ও যদি সোহাগ ক'রে তোমার পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে— অতএব বৃদ্ধ ঈসপের উপদেশ শোনো, তফাত থাকাই সার কথা।"[১]

কবি পুরী হইতে কটকে ফিরিয়াছেন। বিহারীবাবুদের বাড়িতে আছেন, 'সাধনা'র লেখা 'হুহু করে এগিয়ে' যাইতেছে। একখানি পত্রে সাময়িক ও ভাবী জীবনের কথা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ও সার্থক হইয়াছে বলিয়া পত্রখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।[২]

"যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মত বোধ হয়। মন ভাল থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক এক সময়ে আমি নিজের খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই— আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্ত্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেচে, গোধূলির আলোকে দুই একজনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্চে! আমি নিশ্চয় জানি, 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব— নিদেন আমার দু চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতে কুঠারের মত, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না— একে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরো আমার সহায়কারী পাই ত ভালই, না পাই ত কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।"

সামাজিক কর্তব্যপালনের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় যেমন যাইতে হয়, আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বলিয়া

১ ছিন্নপত্র, [মার্চ ১৮৯৩]। বিশ্বভারতী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৫১, পৃ ১৪৭।

২ ছিন্নপত্র, কটক, ২১ ফেব্রুয়ারি [১৮৯৩]। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ। ১৩৫১, পৃ ৮২।

স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরেও হাজিরা দিতে হয়। ২৬ ফাল্গুন রবিবার কটকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে গিয়া আচার্যের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া কিরূপ মন বিরক্ত হইয়াছিল, তাহা একখানি পত্রে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। "লোকে মনে করে ধর্মের কথা কানে উঠলেই যেন একটা পুণ্য আছে· ·। এইজন্যে ধর্মবক্তা সম্বন্ধে আর যোগ্যতা বিচার হয় না। আমার ত মনে হয়, এ নিতান্ত অন্যায়।· ·যাদের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে তারা যে ভাবহীন রসহীন অনর্গল পুরোনো বাজে কথা কি রকম করে সহ্য করে আমি ত ভেবে পাইনে।· ·নিয়মিত বেসুরো গান শোনা মানুষের পক্ষে যেমন অশিক্ষা, নিয়মিত অনুপযুক্ত ধর্মবক্তৃতা শোনা মানুষের পক্ষে তেমনি একটা ক্ষতিজনক কাজ।"[১]

কটক হইতে বালিয়া যান ফেব্রুয়ারির শেষে। পাণ্ডুয়ার কুঠিতে দিন তিন-চারির বেশি ছিলেন না। বাড়ি হইতে প্রায় একমাস বাহির হইয়াছেন, ঘুরিয়াছেনও বিস্তর। একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে না। ভারি ইচ্ছা করছে একটি কোণের মধ্যে আড্ডা করে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি।· ·ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে।· ·থাকবার জন্যে যেমন ছোট্টো নীড়টি ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ। আমি যে কোণটি ভালোবাসি সে কেবল মনকে শান্ত করবার জন্যে।"[২]

মফস্বলে যখনই যান, কবির সঙ্গে অনেকগুলি ও অনেক রকমের বই যায়। এবার ফাল্গুন মাসে বর্ষা দেখা দিলে কটক হইতে একখানি 'মেঘদূত' সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডুয়ায় লইয়া যান। তিনি লিখিতেছেন, "অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়; তার সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়; কিন্তু কখন কোনটা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়।· ·সেই জন্যে আমার সঙ্গে নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর থেকে আরম্ভ করে শেক্সপীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই ছোঁব না, কিন্তু কখন কী আবশ্যক হবে বলা যায় না। অন্যবার আমার সঙ্গে বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি, এবার আনিনি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশি অনুভব হচ্ছে। যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারি সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না তার বদলে Caird's[৩] *Philosophical Essays* ছিল।" রবীন্দ্রনাথের মনীষা, বিচিত্র রসের সৃষ্টিসম্ভোগ ও বিচারশক্তি কেবল intuition বা প্রতিভাপ্রসূত নহে, তাহার পশ্চাতে গভীর অধ্যয়ন রহিয়াছে।

পাণ্ডুয়ার কুঠি হইতে ফিরিবার সময় পথে বেশ ঝড়বৃষ্টি পান। লিখিতেছেন, "ছোট্ট বোটখানি। আমার মতো লম্বা লোকের দৈর্ঘ্যগর্ব খর্ব করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি। ভ্রমক্রমে মাথা একটুখানি তুলতে গেলেই অমনি কাষ্ঠফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মাথার উপর এসে পড়ে— হঠাৎ একেবারে দমে যেতে হয়; সেইজন্যে কাল থেকে নতশিরে যাপন করছি।"[৪]

পাণ্ডুয়া হইতে কটক ফিরিবার পথে রবীন্দ্রনাথকে বহুকাল পরে তিনটি কবিতা লিখিতে দেখি, 'অনাদৃত' (২২শে ফাল্গুন ১২৯৯), 'নদীপথে' ও 'দেউল' (২৩শে)। কটকে ফিরিলেন ৬ই মার্চ এবং তার পরদিনই বোধ হয় 'উড়িষ্যা' স্টীমারযোগে কলিকাতা রওনা হইলেন। স্টীমারে বসিয়া 'বিশ্বনৃত্য' (২৬শে ফাল্গুন) কবিতাটি রচনা করেন।

১ ছিন্নপত্র। কটক, ২৭শে ফেব্রুয়ারি [১৮৯৩] বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১, পৃ. ৮৩।

২ ছিন্নপত্র, বালিয়া, মঙ্গলবার। ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

৩ Edward Caird (1835-1908)।

৪ ছিন্নপত্র। তীরন, মার্চ ১৮৯৩।

উড়িষ্যা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া বেশি দিন থাকা হয় নাই। উড়িষ্যায় বৃষ্টি-বাদল কলিকাতায় আসিয়াও পাইলেন। চৈত্র মাস, তবুও এবার গরম পড়ে নাই। ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "দিনের বেলায় মোটা চাপকান জোব্বা পরে থাকি এবং রাত্রিকালে শাল-কম্বল মুড়ি দিই।"[১]

ইহার কয় দিন পরে কটকে (১১ চৈত্র) 'মিনো' স্টীমারে করিয়া রাজশাহী অভিমুখে লোকেন পালিতের নিকট যাইতে দেখি। 'দুর্বোধ' কবিতাটি স্টীমারে বসিয়া লেখা। রাজশাহীতে গিয়া 'ঝুলন' (১৫ চৈত্র) ও 'সমুদ্রের প্রতি' (১৭ চৈত্র) লেখেন। এইখানে পুনরায় বহুদিনের জন্য কাব্যরচনায় ছেদ পড়িল।

উড়িষ্যায় রচিত কবিতা

পাণ্ডুয়া হইতে কটকে ফিরিবার পথে তালদণ্ডা খালে নৌকায় যে-তিনটি কবিতা লেখেন, তাহাদের মধ্যে 'অনাদৃত' কবিতাটি সম্বন্ধে কবি বহুবিস্তারে 'ছিন্নপত্রে' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বোধ হয় জলের ধারে কোনো জেলের জালফেলা দেখিয়া মনের মধ্যে এই ভাবটির উদয় হয় এবং সেই জন্য কবিতাটির নাম দেন 'জালফেলা'। কবি জীবন ভরিয়া কথার জালে যেসব সুর ও রূপ বাঁধিলেন, তাহা কাহার জন্য। যাহাকে সমর্পণ করিলেন সে তাঁহার প্রেয়সী হইতে পারে স্বদেশও হইতে পারে। তাহার এই সুর ও রূপকে দেখিয়া কহিল 'চিনিনে কিছু।' জেলেও ভাবে, সত্যই তো জালে যেসব জিনিস উঠাইয়াছে, তাঁহার তো কিছুই নহে। "এক কথায় এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়; এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাবমাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম, কী বিবরণ তারও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না।" তখন সে সেই আহৃত সামগ্রীগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, পথিকেরা সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে লইয়া যায়। কেহ জানিল না কে এইগুলি সংগ্রহ করিয়া পথের উপর ছড়াইয়া দিয়াছে। অতীতের ইতিহাসের দিকে তাকাইলে কি এই কথাই মনে হয় না? এই যে অজস্র জ্ঞানরত্ন আজ আমরা সহজ আনন্দে ভোগ করিতেছি, কোথায় তাহার উদ্‌ভব, কে তাহার স্রষ্টা দ্রষ্টা— তাহা কি আমরা জানি। না, জানিবার জন্য কখনো কৌতূহলী হই? দেশ বিদেশ হইতে এইসব জ্ঞানরত্ন আসিয়াছে, যুগে যুগে সেসব সঞ্চিত হইয়াছে। আজও জ্ঞানী গুণীরা জ্ঞানের জালে যেসব মনিমুক্তা উঠাইতেছেন, তাহাদেরও দশা সেইরূপ হইতে পারে। 'সোনার তরী'র ব্যর্থ ক্রন্দন এখানেও। জগৎপ্রবাহে 'সোনার তরী'তে সোনার ধান বোঝাই করিয়া মহাকাল অন্ধবেগে চলিয়া যায়, বিস্মৃতির অতলে পড়িয়া থাকে মানুষ। সে বঞ্চিত হয়, ভবিষ্যৎ ভোগ তাহারই সঞ্চিত ফসল, কিন্তু তাহাকে কি কেহ স্মরণ করে?

পূর্বোল্লিখিত পত্রখানির মধ্যে কবিরও একটু অভিমান প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখছেন, তিনি মনে করছেন তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না; তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়; অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে— তোমারাও অবহেলা করো, আমিও অবহেলা করি, কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে?"

১ ছিন্নপত্র। ১১ মার্চ ১৮৯৩।

২ ছিন্নপত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫১, পৃ. ১৫০। ১৬ই মার্চ [১৮৯৩]।

৩ ছিন্নপত্র। সাজাদপুর ৩০শে আষাঢ় ১৮৯৩ [১৩০০]।

পরদিন খালপথে ঝড়বৃষ্টি পান ভালো রকমেই। পত্রধারায় লিখিতেছেন, "এই মেঘবৃষ্টি পাকা কোঠার মধ্যে অতি ভালো, কিন্তু ছোটো বোটটির মধ্যে দুটি রুদ্ধ প্রাণীর পক্ষে মনোরম নয়। একে তো উঠতে-বসতে মাথা ঠেকে, তার উপরে আবার যদি মাথায় জল পড়তে থাকে, তা হলে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হতেও পারে, কিন্তু আমার 'দুর্দশার পেয়ালা' একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠে।"[১] এই সময়ে 'নদীপথে' (২৩ ফাল্গুন ১২৯৯) কবিতাটি রচিত—

বসিয়া তরণীর কোণে একেলা ভাবি মনে মনে
মেঝেতে শেজ পাতি সে আজি জাগে রাতি
নিদ্রা নাহি দু নয়নে বসিয়া ভাবি মনে মনে
চকিত আঁখি দুটি তার মনে আসিছে বার বার।
বাহিরে মহা ঝড়, বজ্র কড়মড়,
আকাশ করে হাহাকার। মনে পড়িছে আঁখি তার।

কবিতাটিকে অত্যন্ত বাস্তবভাবে দেখিতে কোনো দোষ নাই। রবীন্দ্রনাথ যে-প্রকার স্নেহশীল তাঁহার মনে এরূপ উদ্‌বেগ ও ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক; সুতরাং কবিতাটিকে তাহার বাচ্যার্থেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের কবিতা হইতেছে 'দেউল', সেই দিনই রচিত। কয়েক দিন আগে ভুবনেশ্বর মন্দির দেখিয়া কবির মনে যেসব ভাবের উদয় হয় তাহারাই প্রকাশ পায় 'দেউল' কবিতায়। মানুষ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে দেবতার পূজায় রত। প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্যকে মন্দির-বাহিরে রাখিয়া, মনগড়া রূপ সৃষ্টি করে মন্দির-ভিতরে—

নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে কোথাও নাহি উপমা তা'র
চিত্র কত এঁকেছি চারিভিতে কত বরন, কত আকার
স্বপ্নসম চমৎকার, কে পারে বরণিতে
চিত্র যত এঁকেছি চারিভিতে।[২]

মানুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া 'শব্দহীন গৃহের মাঝখানে' ধ্যানরত। পুরীর মন্দিরের বাহিরে অনন্ত সমুদ্র অসীম আকাশ, ও লীলাময় প্রকৃতির প্রকাশ; সেই সৌন্দর্যকে মানুষ জ্ঞানত উপভোগ করিতে অসমর্থ। বিশ্বকে দূরে ঠেলিয়া বিশ্বনাথের পূজা অসম্পূর্ণ। সৌন্দর্যকে নির্বাসিত করিয়া অন্ধকার মন্দিরে পরমসুন্দরের ধ্যান অর্থশূন্য। এই নিষ্ঠানিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় সত্য দৃষ্টি খোলে। কিন্তু তাহা আসে বিধাতার বজ্ররূপে। মিথ্যার আবরণ ছিন্ন হয় রুদ্রের আঘাতে।

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।

১ ছিন্নপত্র। তীরন। মার্চ ১৮৯৩।

২ 'মন্দির' প্রবন্ধে আছে, "দেখিলাম, মন্দিরভিত্তির সর্বাঙ্গে ছবি খোদা। কোথাও অবকাশমাত্র নাই। যেথানে চোখ পড়ে এবং যেথানে চোখ পড়ে না, সর্বত্রই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা কাজ করিয়াছে। ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়; মানুষের ছোটবড়ো ভালোমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা· ·বিচিত্র আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে।··চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিস চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।" বঙ্গদর্শন ১৩১০ পৌষ। বিচিত্র প্রবন্ধ প্রথম সংস্করণ (১৩১৪)।

ফলে, পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি
তখন দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি—
ভিতর আর বাহিরে কোলাকুলি।

রবীন্দ্রনাথ ইহার ব্যাখ্যা লিখিতেছেন, "যখন কোণে ব'সে ব'সে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে, এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে, সেই-সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র-ধূপধুনার স্থান অধিকার করে— এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।"[১]

দেউল যখন ভাঙিল, 'বিশ্বজনের কল্লোলগান' তখন ছন্দে ধরা পড়িল; নিখিল বিশ্ব নৃত্যদোলায় স্পন্দিত হইয়া উঠিল কবির ছন্দে। 'বিশ্বনৃত্য' কবিতাটির মধ্যে কবি যে-অনুভূতির আবেগ সঞ্চারিত করিয়াছেন তাহা অশান্ত সাগরের কলকল্লোল— কবির ভাষায় ছন্দোবদ্ধ কবিতারূপে মুক্তি লাভ করিল। কটক হইতে কলিকাতার পথে বৈতরণী নদী 'পরে 'উড়িষ্যা' জাহাজে বসিয়া কবিতাটি লেখেন (২৬ ফাল্গুন ১২৯৯)। কিন্তু এই কবিতাটির মধ্যে কবির অন্তরের যে-বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কতকগুলি বস্তুতান্ত্রিক কারণ[২] আছে বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। বাংলার সমাজের প্রাণহীন রসহীন অবস্থা তাঁহাকে বহুকাল হইতে পীড়িত করিতেছিল। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস দেখিয়া বাঙালি জীবনের দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা কবিচিত্তকে ক্ষুব্ধ ও কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া তাহারই উদ্দেশে যেন ইহা রচনা করিয়াছিলেন। রুদ্ধ জীবনকে মুক্তিমন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করিবার এই সংগীত—

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে সবে নীরবে?
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পূরবে।
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধিসমান
গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরান
রয়েছে অটল গরবে।· ·

১ ছিন্নপত্র, সাজাদপুর, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩। রবীন্দ্রনাথ পুরী মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই, আর সেখানে প্রবেশ করেন নাই মহাত্মা গান্ধী।

২ ১২৯৯ সালে ফাল্গুন মাসের সাহিত্য পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনামে 'তর্কবৈচিত্র্য' নামে প্রবন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত রবীন্দ্রনাথের বিরোধের জন্য কবিকেই দায়ী করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং হিং টিং ছটের লক্ষ্যস্থল যে নিঃসন্দেহে চন্দ্রনাথবাবু এই কথাও স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক মহলের সমালোচনার আঁচ পাইয়া পুরী হইতে (৬ ফাল্গুন ১২৯৯) 'সাহিত্য' সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইলেন যে চন্দ্রনাথবাবু অকারণ যেন ক্রোধ না করেন।—সাহিত্য ১৩০০ বৈশাখ, পৃ ৮১-৮৪। এ ছাড়া 'সাধনা'য় অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিলেন যে হিং টিং ছট্‌ ব্যঙ্গ কবিতার লক্ষ্যস্থল চন্দ্রনাথ বসু নহেন। কিন্তু কাহার বা কাহাদের উদ্দেশে রচিত তাহা স্পষ্ট না করায়, সাহিত্যিক মহলে গবেষণার যবনিকা পড়িল না। —সাধনা ১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৪৫৪।

জগৎ-মাতানো সংগীততানে
কে দিবে এদের নাচায়ে!
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে?
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ।

জীবনের জড়ত্ব হইতে জাগ্রত সত্তার মধ্যে সুপ্ত চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিবার জন্য এ যেন কবির প্রার্থনা!—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা!
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

উড়িষ্যা হইতে কবি কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন ফাল্গুনের (১২৯৯) শেষাশেষি। কয়েকদিন পরেই তাঁহাকে দেখি রাজশাহীতে। পথে 'মিনো' স্টীমারে বসিয়া লিখিলেন 'দুর্বোধ' কবিতাটি (১২৯৯ চৈত্র ১১)। 'কাব্যের তাৎপর্যে' পঞ্চভূতে মিলিয়া 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যের অর্থোদ্‌ঘাটনে যেরূপ মেহন্নত করিয়াছিলেন, সেরূপ মানসিক শ্রমস্বীকার করিতে পারিলে এই কবিতাটিকে সত্যই দুর্বোধ করিয়া তোলা সহজ হইত। কিন্তু সহজভাবে গ্রহণ করিলে ইহার অর্থ আবিষ্কার করা কঠিন নহে।

প্রেম বা ভালোবাসা কোনো বস্তু নয়; বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রেমের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না; উহা সুখ বা দুঃখের ন্যায় মনোভাবও নহে যে হাসি বা কান্নার ন্যায় মুখাবয়বের বাহ্যিক বিকৃতির দ্বারা তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে। সাধারণত নারী এই অস্পষ্টতাকে বোঝে না; নারীর মন বস্তুবিলাসী, ভাববিলাসী নহে।—

তুমি মোরে পার না বুঝিতে?
প্রশান্ত বিষাদভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে· ·

নারী পুরুষের প্রেমের গভীরতা, ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য, ঔজ্জ্বল্য বুঝিতে পারে না। তাই কবি তাহাকে বলিতে চাহেন, 'এ যদি হইত শুধু মণি,· ·পরাতেম গলায় তোমার।' 'এ যদি হইত শুধু ফুল· ·পরায়ে দিতেম কালো চুলে'। কিন্তু 'এ যে সখী সমস্ত হৃদয়'। ইহাকে কে বুঝাইবে। 'এ যদি হইত শুধু সুখ· ·বলিতে হত না কোনো কথা'। 'এ যদি হইত শুধু দুখ,· ·প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা'। কিন্তু

এ যে সখী হৃদয়ের প্রেম,
সুখদুঃখবেদনার
আদি-অন্ত নাহি যার,
চিরদৈন্য— চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে,
তাই আমি না পারি বুঝাতে।

প্রেম একটা attitude, ইহার রস অনুভব করা যায় কিন্তু অন্যকে বুঝানো যায় না। নারী চায় স্পষ্টতা। অস্পষ্টতা যাহার ধর্ম, তাহাকে স্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া পাওয়া যায় কেমন করিয়া? তাই নারীর এত দুঃখ। কিন্তু কবির মনে বেশ একটি গভীর শান্তি নামিয়াছে, এবং তাহারই আলোকে জগৎকে দেখিয়া মনে হইতেছে 'সুখ অতি সহজ সরল'।[১]

রাজশাহীতে লোকেনের সহিত সাহিত্য ছন্দ দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়, লঘুগুরু সকলভাবেরই কথা কাটাকাটি চলে। কবির চিত্তকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার অসাধারণ শক্তি ছিল লোকেনের। এইসব আলাপ-আলোচনার ঘাতপ্রতিঘাতে দুইটি কবিতা সেখানে রচিত হয়— ঝুলন (১৫ চৈত্র ১২৯৯) ও সমুদ্রের প্রতি (১৭ চৈত্র)।

মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাপন করিয়া নিজের ক্ষুদ্র প্রাণটুকুকে অতি যত্নে পোষণ করিয়া থাকে—

এতকাল আমি রেখেছিনু তারে
যতনভরে
শয়নপরে।

সেই অভ্যস্ত জীবনকে

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি
নয়নপাতে
স্নেহের সাথে।

জীবনের সমস্ত অভ্যাসকে, মতবাদকে, আচারকে, প্রথাকে—

যা-কিছু মধুর দিয়েছিনু তার
দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে।

কিন্তু কালে এমনি হয় যে, অভ্যাসে, আলস্যে, গতানুগতিকের অনুবর্তনে এ প্রাণ আর জাগে না; নূতন ভাবনায়, নূতন উৎসাহে প্রাণ সাড়া দেয় না, 'পরশ করিলে জাগে না সে আর'। তখন প্রাণের অর্ধমৃত অবস্থা বা দেহের অর্ধজাগ্রত অবস্থা—

ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশিদিবসে।

১ সুখ ১৩ চৈত্র ১২৯৯। চিত্রা রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪। এই কবিতাটি 'সোনার তরী'র যুগে রচিত। তারিখ দৃষ্টে উহা রাজশাহীতে রচিত। ১১ চৈত্র (১২৯৯) 'দুর্বোধ' রচিত হয়। ১৫ই চৈত্র লেখেন 'ঝুলন'। ১৭ চৈত্র লিখিলেন 'সমুদ্রের প্রতি'।

বেদনাবিহীন অসাড় বিরাম
মরমে পশে আবেশবশে।

কিন্তু কবি-মন চায় এই না-মরিয়া বাঁচিয়া-থাকার অবস্থা হইতে মুক্তি; অসম্ভবকে বরণ করিয়া মহাসাগরের তুফানের মাঝে সে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। তখন সে বলে—

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।

তখন সে 'মরণদোলায় ধরি রশিগাছি' কর্মসাগরে নামিয়া পড়ে। তখন সে আপনাকে উপলব্ধি করে, জাগ্রত প্রাণকে দেখিতে পায়— তাহার পরানবধূর স্পর্শ পায়— 'বধূরে আমার পেয়েছি আবার— ভরেছে কোল'। তখন 'প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি' হইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হয়। ইনি সেই 'মানসসুন্দরী' যাঁর সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন, "ও মেয়েটি পয়মন্ত নয়, তা স্বীকার করতে হয়; আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন।"[১] 'ঝুলনে'র মধ্যে সেই প্রচণ্ড আবেগ।

'সমুদ্রের প্রতি' এই পর্বের শেষ কবিতা; পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া যে এই লেখার প্রেরণা তাহা তো কবি স্বয়ং বলিয়াছেন। এই কবিতাটির মধ্যে ইংরেজী কোনো কবিতার ছায়া থাকিলেও তাহা এত দূরগত যে তাহাকে অনুকরণ বলিলে ভুল বলা হইবে। এই কবিতার মধ্যে শুধু কাব্যসৌন্দর্য আছে বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না; বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাব্যকলার সহিত গ্রথিত হইয়া ইহা অপরূপ হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোনো কবিতার মধ্যে কাব্য তত্ত্ব ও শিল্প এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তবে কবি যে-তত্ত্বটি এইখানে বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা পত্রের মধ্যে ইতিপূর্বে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে পত্র ১৩১৪ সালের পূর্বে অবশ্য গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত হয় নাই; সেইজন্য 'সমুদ্রের প্রতি' সাধনায় (১৩০০ বৈশাখ) যখন প্রকাশিত হইয়াছিল তখন পর্যন্ত ইহার অন্তর্নিহিত ভাবনাগুলি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ছিল।

গত অগ্রহায়ণ মাসে (১২৯৯) কবি শিলাইদহে পদ্মার বোটে ছিলেন; সেই সময়ে একদিন তাঁহার পত্র লিখিয়াছিলেন —"এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নূতন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে

১ ছিন্নপত্র, ৮ মে ১৮৯৩।

আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"[১]

বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদকে কবিকে সর্বপ্রাণবাদের তত্ত্বে পরিণত করিতে দেখিতেছি; ইহাই কালে গভীর আধ্যাত্মিক সর্বেশ্বরবাদে তাঁহাকে উপনীত করিয়াছিল।

শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি ইন্দিরা দেবীকে পাঠাইয়া যে-পত্রখানি লেখেন[২] তাহাতেও সমুদ্রের কথা আছে। "এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জন প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়? পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত, সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়।"[৩]

পদ্মার ধারে

আমরা পূর্বে বলিয়াছি উড়িষ্যা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হইয়া রাজশাহী গিয়াছিলেন। সেখান হইতে বর্ষশেষের কয়েকদিন পূর্বেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৪ঠা বৈশাখ (১৩০০) ইন্দিরা দেবীকে আগ্রায় পত্র লিখিয়া 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি (লিখিত ১৭ চৈত্র ১২৯৯) পাঠাইয়াছেন।

কলিকাতায় থাকিলে বন্ধুমহলে যান-আসেন। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হয়। মনস্বী লোক বা ইনটেলেকচুয়ালদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য মন অনুক্ষণ তৃষিত থাকে। দুঃখ করিয়া এক পত্রে লিখিতেছেন, "এই হতভাগ্য জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিশিদিন উপবাসী হয়ে আছে— কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করচে। কে বা জীবনধারণ করে, কে বা ভাবে, কে বা কথা কয়— কেই বা প্রতিবাদ করে, কেই বা উৎসাহ দেয়, কেই বা তোমার কথা শোনে, কেই বা তোমার ভাব বোঝে— কেই বা অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের জীবনে অধিকাংশ সময় কাটে কলিকাতার বাহিরে; তাই এবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরিয়া সেখানকার অতীত জীবনের কথা কয়েক মাস পরে শিলাইদহে ফিরিয়া গিয়া ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন— অবশ্য অন্য পটভূমি। লিউইসের লিখিত (Lewis) গেটের জীবনী পড়িতে দিয়া লিখিতেছেন, "গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংস্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল··। আমরা হতভাগ্য বাঙ্গালী লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি··। আমাদের মত লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কি করে বোঝাব।"[৫] তাঁহার চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে এ শ্রেণীর নরনারীর অভাব তাঁহার জীবনে কোনোদিনই হয় নাই।

১ ছিন্নপত্র, শিলাইদহ ৯ই ডিসেম্বর ১৮৯২, বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩১৪) গ্রন্থে এইটি পুনর্লিখিতভাবে পাওয়া যায়।

২ ছিন্নপত্র, কলিকাতা ১৬ই এপ্রিল ১৮৯৩ [বৈশাখ ৪]।

৩ এ সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ ফার্লো পাইয়া সিমলা পাহাড়ে যাইতেছেন। দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ, আমার বোম্বাই প্রবাস।

৪ ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ মাঘ-চৈত্র। পত্রখানির তারিখ ৬ই এপ্রিল [১৮৯৩] ২৫ চৈত্র ১২৯৯।

৫ ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫২ বৈশাখ-আষাঢ়।

অতীত জীবনের স্মৃতি মনকে বিষাদে মধুর করিয়া তুলিতেছে। পত্রধারায় একটি কথা লিখিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পরবর্তী জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়। তিনি লেখেন, "পুরানো স্মৃতিগুলো মদের মতো; যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে।· ·বুড়ো বয়সে যখন স্বভাবতই আমরা কাজে অক্ষম, শরীরের যৌবনের অতিরিক্ত তেজ আমাদের কোনোরকম তাড়না করছে না, তখন স্মৃতি বোধ হয় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।"[১]

শোনা যায় স্থলের মানুষ সমুদ্রের নাবিক হইলে, স্থলের কাজে আর তাহার মন বসে না। জলের আহ্বান কঠিন মৃত্তিকার দৃঢ় আকর্ষণকে শিথিল করিয়া দেয়, জলের ডাকে তাহার 'ঘরে থাকাই দায়' রবীন্দ্রনাথকে পদ্মা বারে বারে ডাকে; ১৩০০ সনের বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে কলিকাতার খস্‌খস্‌ টানা পাখার মায়া কাটাইয়া কালবৈশাখীর ঝড়ঝঞ্ঝার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বোটে গিয়া বাস করিতেছেন। বৈশাখ মাসে একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা।· ·বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা— আমার যথার্থ বাহন— খুব বেশি পোষ-মানা নয়, কিছু বুনোরকম; কিন্তু· ·ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে।· ·আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো।"[২]

এই নদীর স্রোত, ও আকাশের নীল স্তব্ধতা কবি-জীবনের আনন্দের, উপভোগের অন্যতম প্রধান সহায়। তিনি লিখিতেছেন, "আমি বিকেলবেলা চরের· ·উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তার পর আমাদের নূতন জলি-বোটটাকে নদীর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটি পেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চিৎ হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি।· ·আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব?"

পদ্মা সম্বন্ধে বহুবার বহুভাবে কবি তাঁহার ভাবরাশি প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্মা বা সাধারণভাবে বাংলার নদী সাহিত্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথকে কতখানি সাহায্য করিয়াছে তাহা বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়।

জড়প্রকৃতির প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথের যেমন আকর্ষণ, মূঢ় প্রজাদের প্রতি মানুষ রবীন্দ্রনাথের মায়া কিছু কম নয়। গত কয়েক বৎসর প্রকৃতির মধ্যে বিচরণ ও মানুষের মধ্যে ঘোরাঘুরি করিয়া জীবনের নানাদিক খুলিয়া গিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন আমার এই দরিদ্র চাষী "প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে। এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়।"[৩]

এইসব লোকদের মহত্ত্ব ও হীনতা, পৌরুষ ও দুর্বলতা, ঐশ্বর্য ও অভাব প্রভৃতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিবার অবসর পাইয়াছেন। চাষী-জীবনের চিরস্থায়ী দারিদ্র্যসমস্যার জন্য দায়ী কে, সে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহস পাইতেছেন না; সোশিয়ালিস্টদের মনে পৃথিবীময় ধনবণ্টন সম্বন্ধে যেসব বিতর্ক ওঠে, সংসার-জীবনে তাহা সম্ভব কিনা তদ্‌বিষয়ে কবির সন্দেহ হয়। অসম ধনবণ্টননীতিকে সমর্থন না করিয়াও থাকিতে পারেন না। তিনি পূর্বোল্লিখিত পত্রের শেষে লিখিতেছেন, "বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীর্ণ বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে— দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রীসৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।" সুতরাং ধনবিভাগ সম্বন্ধে কবি দু-মনা। পরবর্তীযুগে এই মতের পরিবর্তন হইয়াছিল—

১ ছিন্নপত্র, কলিকাতা ৩০ এপ্রিল ১৮৯৩।

২ ছিন্নপত্র, ১৬ মে ১৮৯৩।

৩ ছিন্নপত্র, ২০ মে ১৮৯৩।

'রাশিয়ার চিঠি' পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায় ; শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের ভাষণগুলিও সেই সঙ্গে আলোচ্য। যাহাই হউক, এই শ্রেণীর মতামত চিরদিন কবি ও সাহিত্যিকদের আন্তরিক শুভ-ইচ্ছার সুরেই থাকিয়া যায়, জীবনের ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ কবি ও আর্টিস্ট, তাই তিনি ধনাভিজাত্যের দুর্বলতা আর্টের খাতিরে কখনো ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অভ্যাসের সহিত আদর্শের চির-বিচ্ছেদকে ঘুচাইতে পারেন নাই। তবুও তিনি যে ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সমশ্রেণীর কোনো জমিদার বা সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

বাংলার চাষী রায়তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া আজ তাহাদের কিসে সুখ কোথায় দুঃখ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ইন্দিরা দেবীকে পূর্বোক্ত পত্রে বলিতেছেন, "এখানে এই মেঘ-রৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর· ·সিমলার[১] সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তা ঠিকটি কল্পনা করা শক্ত হবে।" প্রজাদের মঙ্গলের জন্য রবীন্দ্রনাথ এখন যথেষ্ট ভাবেন, পরযুগে তাহাদের কল্যাণের জন্য যেসব অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান করেন তাহার কথা যথাস্থানে আলোচনা করিব। প্রজাদের উপর অত্যাচার করিলে তিনি কাহাকেও ক্ষমা করিতেন না, উৎপীড়ক প্রাচীনতম কর্মচারী হইলেও নহে। এ জন্য সাধারণ প্রজা ও বিশেষভাবে মুসলমান প্রজারা তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিল। এক-এক সময়ে তাঁহার কাছে এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসিত, যাহার অকৃত্রিম ভক্তি যুবক কবিকে মুগ্ধ করিত।[২] কিন্তু যখন সম্বন্ধটা কাব্যলোক হইতে বস্তুলোকে দেনাপাওনার মধ্যে আসিয়া পড়িত, তখন কবিও কল্পলোকের অলীকতা হইতে নামিয়া সাধারণ মানুষের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। কারণ কেবল লেখনী চালনা করিলে জমিদারি পরিচালনা করা চলে না। এবং সংসার অচল হইয়া যায়।

কিন্তু হায় পদ্মার শোভা, ধনবণ্টন, প্রজার জন্য দরদ। বই ছাপানোর কাগজের দাম বাবদ জন্ ডিকিসনদের আপিস হইতে টাকার তাগিদ আসিয়াছে। ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য মাসহারা আড়াই শত টাকা ছাড়া আর-কোনো আয়ের পথ রবীন্দ্রনাথের নাই। অতিরিক্ত কোনো ব্যয় করিতে হইলে পিতার কাছে হাত পাতিতে হয় অথবা অন্যের নিকট কর্জ করিতে হয়, এবং মাসহারার টাকা হইতে শোধ করিতে হয়।

কিন্তু উড়িষ্যাতেই যান আর রাজশাহীতে যান বা কলিকাতাতে থাকুন, অথবা পদ্মার উপর বোটের মধ্যে বাস করুন— 'সাধনা'র জন্য নিত্যনৈমিত্তিক লেখা যথানিয়ম সরবরাহ করিতে হইতেছে ; সে যেন রাহুর প্রেমের আলিঙ্গন। সুতরাং তাহার চাহিদা পূরণের জন্য লেখনী সদাই ব্যস্ত। সাধনার দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হইলে রবীন্দ্রনাথ নূতন ধরণে এক 'ডায়ারি' লিখিতে আরম্ভ করেন। "পাঠকেরা যদি ডায়ারি শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন।"[৩] লেখক বলিতেছেন, "শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ। মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটা মানুষ মিলিয়া। ভিতরেও পাঁচটা, বাহিরেও পাঁচটা।· ·কোনো মানুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে।· ·কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে গুটিকতক বিশেষ মানুষ বিশেষরূপে সংলগ্ন হইয়া একটি বিশেষ ঐক্য নির্মাণ করে। তাহার অসংখ্য আলাপী আত্মীয়দের মধ্যে সেই কয়েকটি লোকই যেন তাহার সীমানা নির্দেশ করিয়া দেয়।· ·রচনার সুবিধার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে কেবল পাঁচজনকে লওয়া যাক। এবং তাঁহাদের পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।"

১ গ্রীষ্মকালে ফার্লো লইয়া সত্যেন্দ্রনাথ সপরিবারে সিমলা পাহাড়ে আছেন।

২ ছিন্নপত্র, ১১ মে ১৮৯৩।

৩ সাধনা, ১২৯৯ মাঘ।

এই ভূমিকা করিয়া লেখক ‘পঞ্চভূতের’ কথোপকথন শুরু করিয়াছেন, সঙ্গে অবশ্য ‘আমি’ও আছেন, সুতরাং বলা যাইতে পারে ছয়টি ব্যক্তির কথোপকথন। সাধনার ১২৯৯এর মাঘ হইতে ১৩০২এর ভাদ্র পর্যন্ত প্রথম দিকে নিয়মিত ও পরে অনিয়মিত ভাবে ষোলোটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[১] মাঝে বৎসর-অধিক এই প্রবন্ধধারা বন্ধ ছিল। পাদটীকায় প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম আটটি প্রবন্ধ সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে ও শেষ আটটি সাধনার চতুর্থ বর্ষে প্রকাশিত হয়, মাঝে এক বৎসর প্রবন্ধ নাই।

পঞ্চভূতের ডায়ারি রচনার প্রেরণা কী? ঠাকুরবাড়িতে চিরদিন সাহিত্যিকদের মজলিস বসিত, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই ধারা বরাবর চলিয়া আসিয়াছিল; সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে একটি সাহিত্যচক্র প্রায়ই বসিত। ‘পারিবারিক স্মৃতিলিপি’ নামে একখানি হাতেলেখা খাতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাড়ির লোকেরা ও বাড়ির বন্ধুরা ঐ খাতায় নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী, যোগেন চৌধুরী প্রভৃতির বিচিত্র মন্তব্য উহাতে আছে। কোনো কোনো স্থলে একটা বিষয় লইয়া পাঁচজনের মত আছে। সাহিত্য-বিষয়ক কয়েকটি রচনা এবং পঞ্চভূতের কয়েকটি প্রবন্ধের খসড়া এখানে খুঁজিলে পাওয়া যায়।

পঞ্চভূত কে কে, তাহা লইয়া অল্পস্বল্প গবেষণা হইয়াছে। রাজশাহীর রায় শরৎকুমার রায় লিখিয়াছেন, “অক্ষয়-

১ সাধনায় পঞ্চভূতের প্রবন্ধ। পঞ্চভূত গ্রন্থমধ্যে ‘সাধনা’য় প্রকাশনের ক্রম অনুসৃত হয় নাই। পঞ্চভূতের ডায়ারি বা পঞ্চভূত ১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৯৭) পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। বইখানি উৎসর্গ করেন নাটোরের জমিদার “মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সুহৃদ্বর করকমলেষু”। অতঃপর ১৩১৪ বৈশাখে গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ মধ্যে পঞ্চভূত স্থান লাভ করে। কিন্তু স্থানে স্থানে পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল। ১৩১৪ হইতে ১৩৪২ পর্যন্ত ইহার পৃথক গ্রন্থসত্তা ছিল না। ১৩৪২ সালে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় গ্রন্থখানি ভালো করিয়া দেখিয়া দেন; সেই সময়ে ‘সাধনা’ হইতে প্রায় সবই এই নবতর সংস্করণে যথাযথস্থানে যোজিত হয়। এ ছাড়া কোনো কোনো অংশ এই সময়ে নূতন করিয়া লিখিয়া দেন। দ্র সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা।

১২৯৯ মাঘ ডায়ারি। পরিচয়
ফাল্গুন পঞ্চভূতের ডায়ারি। গদ্য ও পদ্য
চৈত্র ডায়ারি। নরনারী
১৩০০ বৈশাখ ডায়ারি। মনুষ্য
জ্যৈষ্ঠ ডায়ারি। মন
শ্রাবণ পঞ্চভৌতিক ডায়ারি। অখণ্ডতা
ভাদ্র পঞ্চভৌতিক ডায়ারি। সৌন্দর্যের সম্বন্ধ
আশ্বিন কার্তিক ডায়ারি। পল্লিগ্রামে
১৩০১ অগ্রহায়ণ কাব্যের তাৎপর্য
পৌষ কৌতুক হাস্য
মাঘ সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ
ফাল্গুন কৌতুকহাস্যের মাত্রা
চৈত্র সরলতা। প্রাঞ্জলতা
১৩০২ শ্রাবণ ভদ্রতার আদর্শ
ভাদ্র বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। অপূর্ব রামায়ণ

বাবুর (মৈত্রেয়) মুখে শুনিয়াছি, তিনি এবং নাটোরের মহারাজ (জগদিন্দ্রনাথ রায়) নাকি রবিবাবুর 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'র দুইটি ভূত ছিলেন।"[১]

এ সম্বন্ধে আমাদের অন্যরকম শোনা আছে। 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'র সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে ছোটগল্প প্রবন্ধ ও প্রসঙ্গকথা সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক খোরাক ও কবিতা। প্রথম বৎসরের ন্যায় এবারও সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে (১৮৯৩) এগারোটি ছোটগল্প[২] প্রকাশিত হয়।

এই পর্বের গল্পগুলি বাঙালি পাঠকের নিকট খুবই পরিচিত।

দারুণ গ্রীষ্মে বৈশাখ মাসটা শিলাইদহে কাটাইয়া জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় কলিকাতায় ফিরিয়া যান— স্ত্রী-পরিবার সেখানেই ; কিন্তু পুনরায় বর্ষারম্ভে আষাঢ় মাসে তাঁহাকে পদ্মার উপর নৌকায় দেখা যাইতেছে।

রাজশাহীতে থাকার সময় 'ঝুলন' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা দুইটি লিখিবার পর প্রায় তিন মাস গত হইয়াছে— কাব্যলক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এবার আষাঢ় মাসে পাঁচটি[৩] কবিতা লিখিলেন, এক পত্রে বলিতেছেন, "আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে। আগামী মাসের 'সাধনা'র জন্যে একটি লাইন লেখা হয় নি। ওদিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে।··আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি।"[৪]

এই আষাঢ় (১৩০০) মাসে কবির 'সোনার তরী' কবিতাটি সাধনায় প্রকাশিত হয়— যদিও আনুমানিক লিখিবার কাল ১২৯৮ ফাল্গুন। এতকাল লেখাটি অপ্রকাশিত থাকিবার কারণ অজ্ঞাত ; আমাদের কিন্তু মনে হয় ইহা এই সময়েরই রচনা, ভুলক্রমেই '১২৯৮ ফাল্গুন' তারিখ লিখিত হইয়াছিল। যাক, এটি তর্কের ও গবেষণার বিষয় বলিয়া আমরা ১২৯৮-ই মানিয়া লইলাম।

সোনার তরী নদীবক্ষ দিয়া সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বহন করিয়া লইয়া যায় ; জীবনের হাহাকার ছাড়া নদীতীরে আর-কিছুই থাকে না। কিন্তু জলধারার বিচিত্র রূপ ; সে দৈনন্দিন ব্যবহারিক কার্য সমাধান করে— অবগাহনের তৃপ্তি দান করে ; আবার সৌন্দর্যশোভায় চিত্তকে ভরিয়া তোলে। এমনকি মরণেচ্ছুদের জীবনে চরমশান্তিও আনিতে পারে। 'হৃদয়যমুনা' কবিতার মধ্যে প্রেমের সকল রূপকে আমাদের সম্মুখে কবি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। ক্ষণিকের রসতৃপ্তির জন্য কুম্ভ ভরিয়া লইলেই অনেকের চলে। তাহাদের প্রেম প্রয়োজনের 'ভালোবাসা'। কিন্তু যে প্রেমনদীতে অবগাহন করিতে চাহে তাহার পথ অবরুদ্ধ নহে ; আবার যে নিরাসক্তচিত্তে প্রেমের ক্রীড়াকৌতুক দেখিয়া তৃপ্ত হয়, আত্মসমর্পণে যাহার আন্তরিক বাধা— সে-ও তীরে বসিয়া থাকিতে পারে— কোনো বাধা নাই সেই সুখসম্ভোগের। কিন্তু প্রেমে আত্মসর্জনও করা যাইতে পারে— 'যদি মরণ লভিতে চাও— এসো তবে ঝাঁপ দাও সলিল-মাঝে।' খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রেম না দেখিয়া সমগ্রভাবে আত্মোৎসর্গ করাতেই যে প্রেমের সার্থকতা, সেই কথাই যেন বলা

১ শ্রীশরৎকুমার রায় (দয়ারামপুর) এম.এ, রবীন্দ্রস্মৃতি। রাজশাহী সাধারণ পুস্তকালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজয়ন্তী সভার সভাপতি কর্তৃক পঠিত। রাজশাহী ১৩৩৮ সাল ৪ঠা মাঘ।

২ কাবুলিওয়ালা ১২৯৯ অগ্রহায়ণ ; ছুটি ১২৯৯ পৌষ ; সুভা ১২৯৯ মাঘ ; মহামায়া ১২৯৯ ফাল্গুন ; দানপ্রতিদান ১২৯৯ চৈত্র— এগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭ খণ্ডের অন্তর্গত। সম্পাদক ১৩০০ বৈশাখ ; মধ্যবর্তিনী ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ ; অসম্ভব কথা ১৩০০ আষাঢ় ; শাস্তি ১৩০০ শ্রাবণ; একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প ১৩০০ ভাদ্র ; সমাপ্তি ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক—এগুলি রবীন্দ্ররচনাবলী ১৮ খণ্ডের অন্তর্গত।

৩ ছিন্নপত্র, সাজাদপুর (৩০ আষাঢ় ১৮৯৩)।

৪ হৃদয় যমুনা (১৩০০ আষাঢ় ১২) ; ব্যর্থ যৌবন (১৬ই) ; ভরা ভাদরে (২৭এ) ; প্রত্যাখ্যান (২৭এ)।— সোনার তরী।

হইয়াছে 'হৃদয়যমুনা' কবিতাটিতে। আমাদের মনে হয় এই কবিতাটির একটি ব্যাখ্যা হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের অগোচরে একখানি পত্রের মধ্যে একবার লিখিয়া ফেলেন। তিনি বলিয়াছেন, "পাওয়াটা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভুল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্ছে আসল কথা। যা হাতের কাছে আসে তাকেই পুরোপুরি হস্তগত ক'রে নেওয়া অনেক শিক্ষা সাধনা এবং সংযমের দ্বারা হয়।··ইতি সুখতত্ত্বশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়।"[১] হৃদয়যমুনায় প্রেম যে অবস্থাতেই আসুক, তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই সুখতত্ত্বশাস্ত্রের শিক্ষা।

'ব্যর্থ যৌবন' কবিতাটি গান— 'আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে'। সাজাদপুর[২] হইতে লিখিত পত্রে কবি বলিয়াছেন (১০ই জুলাই ১৮৯৩), "ও গানটা আমি আবার ঘরে অনেকদিন একটু একটু ক'রে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম।· ·· ·এ গানটা এখনো সর্বদা গেয়ে থাকি. .এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই।"

'হৃদয়যমুনা'ও 'ব্যর্থ যৌবন' কবিতা দুইটির মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের প্রভাব প্রবল, একটিতে হইয়াছে 'হৃদয়যমুনা'তে প্রেমলীলা, অপরটিতে 'বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে এসেছি'। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের বহু চিত্র ও পদাবলীর বহু শব্দ প্রায়শই দেখা যায় ; বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বহুদিনকার। কিন্তু এ আকর্ষণ তত্ত্বমূলক না রসমূলক, তাহার সুবিচার হওয়া প্রয়োজন। 'বৈষ্ণব কবিতা' হইতে এই বৈষ্ণবধর্মীয়-পরিভাষায় ব্যবহৃত কবিতার আরম্ভ হইয়াছে— অবশ্য ইতিপূর্বে এমনকি ভানুসিংহের পদাবলীর পর্ব হইতে এই ধরণের কবিতা ও গান বহু লিখিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষার যথার্থ কবিতা বৈষ্ণবীয় প্রেমলীলাকে আশ্রয় করিয়া কুসুমিত হয়; বৈষ্ণবপদাবলীর বিশেষ কতকগুলি শব্দ মানুষের চিরন্তন প্রেম-বিরহ-মিলনের প্রতীক রূপে কাব্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় এই বৈষ্ণবীয় শব্দের ব্যবহার স্বাভাবিক।[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বৈষ্ণবপক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং যে-কথা বলিয়াছেন তাহাই বোধ হয় এতদ্‌সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার যমুনা-বর্ণনা মনে পড়ে। প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ এই, প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়, এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে ; এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন। বৈষ্ণবপদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"[৪]

বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব ধর্মের মূলগত কথা রবীন্দ্রনাথ ভালোরূপেই জানিতেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত একখানি পত্রে[৫] এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। আলোচ্য পর্বে তরুণ সাহিত্যিক ও ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্বটি সংক্ষেপে

১ ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ২ জুলাই ১৮৯৩।

২ সাজাদপুর, সাহাজাদপুর, সাহজাদপুর, শাহাজাদপুর, চার রকম বানান পাই।

৩ তু. বৈষ্ণব কবির গান, আলোচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ২ ।

৪ ছিন্নপত্র। কুষ্টিয়ার পথে ২৪শে অগস্ট ১৮৯৪।

৫ পত্র। বোলপুর, ২০ আষাঢ় ১৩১৭। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৪ পৌষ।

ব্যাখ্যা করেন ; এই পত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের রূপক ব্যাখ্যা দেন নাই, তিনি সাধারণ দ্বৈতাদ্বৈত মতকে বৈষ্ণব ধর্মমত বলিয়া প্রকাশ করেন।[১]

পঞ্চভূত গ্রন্থে 'মনুষ্য' প্রবন্ধে কবি বলিয়াছেন, "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা ; প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।" বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। মোহিতলাল মজুমদার মাইকেল মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তিনি লিখিতেছেন, "ব্রজাঙ্গনা যে বৈষ্ণবপদাবলীর পর্যায়ভুক্ত নয়, অর্থাৎ রাধাবিষয়ক হইলেও এ-কাব্য যে নিছক কাব্যমাত্র তাহা কবিতাগুলির বিষয় দেখিলেই বুঝা যায়। ব্রজাঙ্গনার রাধা বৃন্দাবনের রাধা নয়, তাহার শ্যামবিরহও বৈষ্ণবীয় কৃষ্ণবিরহ নহে। রাধার ভূমিকা মাত্র গ্রহণ করিয়া কবি এই কাব্যে আধ্যাত্মিকতাবর্জিত প্রকৃতিপ্রেমের রস সৃষ্টি করিয়াছেন।"

আষাঢ় মাস শেষ হইতে চলিল, অথচ 'আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয় নি', অনতিদূরে আশ্বিন-কার্তিকের যুগল 'সাধনা' বাহির হইবে। কবির মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছে— তাঁহার জীবনে কোন্‌টা আসল কাজ। কখনো মনে হয় গল্প লেখায় পরম সুখ, কখনো মনে হয় যে-কথাগুলি ঠিক প্রবন্ধ বা কবিতায় প্রকাশ করা যায় না সেগুলি 'ডায়ারি' আকারে লিখিয়া ফেলিলে ভালো হয়। এক-এক সময়ে সামাজিক বিষয় লইয়া দেশের লোকের সঙ্গে বিবাদ করিবার প্রয়োজনও বোধ করেন ; সমস্ত দ্বন্দ্বের শেষে মনে আসে কবিতাতেই যেন 'সকলের চেয়ে বেশি অধিকার'। তাই একখানি পত্রে লিখিতেছেন, তাঁহার "ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়।— যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না ; আবার যখন একটা-কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কি এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয়, এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ।· ·চিত্রবিদ্যা· ·তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে।"[২]

কিন্তু চিত্রবিদ্যা-সাধনার সময়-যে চলিয়া যায় নাই তাহা কবি সত্তর বৎসর বয়সে প্রমাণ করিয়াছিলেন। ছবি সম্বন্ধে তাঁহার একটা স্বাভাবিক কৌতুক ও অনুরাগ বরাবরই প্রবল ; 'কড়ি ও কোমল' রচনার যুগে চিত্রবিদ্যা লইয়া যে আলোচনা করিতেন তাহার আভাস 'জীবনস্মৃতি'তে কবি দিয়াছেন। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশের সময় তরুণ অবনীন্দ্রনাথকে তিনিই ছবি আঁকিবার জন্য উৎসাহিত করেন। উনচল্লিশ বৎসর বয়সে জগদীশচন্দ্র বসুকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরি করচিনে, এবং কোন দেশের ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে।"[৩] চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে কবি যাহাই লিখুন শেষজীবনে তাঁহার এই 'কুৎসিত' সন্তানটির উপর টান একটু অতিমাত্রায় হইয়াছিল এবং তিনি এই পত্রে যাহা হইবে না বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন, তাহাই জীবনে ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ তিনি য়ুরোমেরিকার নগরে নগরে

১ ১৩০২ অগ্রহায়ণ। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

২ ছিন্নপত্র, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩।

৩ চিঠিপত্র ৬, ১ আশ্বিন [১৩০৭]।

তাঁহার অঙ্কিত ছবির একজিবিশন করিয়াছিলেন আর প্রায় প্রত্যেক দেশের আর্ট গ্যালারিতে কবির আঁকা ছবি সযত্নে রক্ষিতও হইতেছে।

পূর্বোল্লিখিত পত্র মধ্যে আছে, 'মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়াছেন, 'কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার'। 'মিল ক'রে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক।' মিল করিয়া ছন্দ বাঁধিয়া কবিতা লিখিলেন বটে, তবে সেটি ছোটো হইল না, হইল অত্যন্ত দীর্ঘ কবিতা— তাঁহার ছেলেবেলাকার, 'বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী' কবিতামিউজের জয়গান। কবিতাটির নাম 'পুরস্কার' (১৩ শ্রাবণ ১৩০০)। 'পুরস্কার'-কাহিনীতে সকলভোলা আদর্শ আর্টিস্টের একখানি নিখুঁত চিত্র কবির লেখনীর তুলিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবির স্ত্রীর অভিযোগ—

রাশি রাশি মিল করিতেছ জড়ো,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো,
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি !

কিন্তু এ-অভিযোগ স্নেহের অভিযোগ ; স্ত্রী জানে স্বামীর মহত্ত্ব কোথায়, শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়। কবি তাহার মিউজকে আবাহন করিয়া বলিতেছেন—

তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।

সংসার সম্বন্ধে উদাসীন আনমনা থাকিলে চালের খড় জোটে না ; তবে কবিতা লিখিয়া লাভ কি, এই প্রশ্নই সাধারণ লোকের মনে জাগে। কবির কাব্য পৃথিবীর কোন্ কাজে লাগে ! রাজা মহেন্দ্র রায় গুণীর পালক ; তাই কবির স্ত্রীর ভরসা তাহার স্বামীর গুণের সমাদর তিনি করিবেন। সুতরাং স্নেহশীলা স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে নিরুপায় কবিকে একদিন সাজসজ্জা করিয়া রাজসভায় যাইতে হইল। যাইবার পূর্বে দৃশ্যটি অতি সুন্দর, অতি মানবীয়— কবিজীবনে দুর্লভ দাম্পত্যের পরম আকাঙ্ক্ষিত চিত্র। কবি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তথাকার কৃত্রিমতা আড়ম্বর ভেদাভেদ প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত, মর্মাহত ; এমন ট্রাজেডি তিনি তাঁহার শান্ত সমাহিত নিভৃত জীবনে দেখেন নাই।

মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি আছে হেন যমের মুরতি,
তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি
দমি যায় তার বুক।

রাজসভা হইতে 'পাত্র মিত্র অমাত্য আদি, অর্থী প্রার্থী বাদী-প্রতিবাদী' সকলে চলিয়া গেলে 'রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে বিপন্নমুখছবি।' রাজা পরিচয় শুধাইলে ভীত ত্রস্ত কবি কহিয়া উঠিল, 'আমি কেহ নই, আমি শুধু এক কবি'। ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয় যে সে শুধু কবি।

চলি গেল যবে সভ্যসুজন,
মুখোমুখি করি বসিলা দুজন,
রাজা বলে 'এবে কাব্যকুজন
আরম্ভ করো কবি।'

কবি মহানন্দে কবিতা রচনা করিলেন— কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্তবকগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে—

পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল,
আসন ছাড়িয়া নামিয়া ভূতল
দু বাহু বাড়ায়ে পরান উতল
কবিরে লইলা বুকে
কহিলা, 'ধন্য, কবি গো, ধন্য—
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্য,
চিরদিন থাকো সুখে।'

রাজা ভাবিয়া পান না কবিকে কী দিয়া পুরস্কৃত করিবেন, 'যাহা কিছু আছে রাজ ভাণ্ডারে সব দিতে পারি আনি।' কবিও জানে না কী চাহিতে হইবে, তাই শুধু বলিল— 'কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে ওই ফুলমালাখানি।' 'মালা বাঁধি কেশে কবি' ঘরে ফিরেন; কোথায় ধনরত্ন আনিতে গিয়াছিল, আনিল একখানি মালা। কবিপত্নী তাহাতেই সুখী; 'মালাখানি লয়ে আপন গলায় আদরে পরিলা সতী'।

ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—
বাঁধা প'লো এক মাল্য-বাঁধনে
লক্ষ্মী-সরস্বতী।

জাগতিক ব্যাপারে কবিদের কোনো স্থান নাই, তাই তাহারা ভাগ্যবানদের নিকট কৃপার পাত্র, উপহাসের লক্ষ্যস্থল; এমনকি গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁহার 'আদর্শ রিপাব্লিক' হইতে কবিদের নির্বাসন দিবার পরামর্শ দিয়াছেন, কারণ তাঁহারা অবাস্তবকে লইয়া আলোচনা করেন। কিন্তু জীবনকে অর্থপূর্ণ বা সার্থক করে কিসে, এই প্রশ্নের উত্তর, ও একমাত্র উত্তর হইতেছে 'রস'। রস নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইয়া সমস্ত জীবনকে তেজে স্পন্দিত, আনন্দে নিমজ্জিত করে। কবিরা সেই রস পরিবেশন করিয়া দগ্ধ পৃথিবীর উপর শ্যামলিমার শোভা ফুটাইয়া তোলেন। বাস্তব জগতে সৌন্দর্যের অভাবে কদর্যতা ও বৈভবের অভাবে দারিদ্র্য মানবজীবনে যেসব বড় বড় রন্ধ্র সৃষ্টি করে, তাহা একমাত্র কবির সুর ছাড়া আর কিসে ভরিয়া উঠিবে। কবির মনের চরম সাধ কাব্যরসধারা সিঞ্চন করিয়া ধরিত্রীকে আর-একটু অধিক সুন্দর করেন। পৃথিবীর নিকট হইতে কবির একমাত্র যাচ্ঞা— শুধু মনে রেখো; সে চায় ভালোবাসা, একটি ফুলের মালা— 'ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা'। তাহার আকাঙ্ক্ষা 'আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙীন করিয়া দিব'।

'সংসারমাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,

দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।'

কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'জয়পরাজয়' গল্পে কবিজীবনের যে-ব্যর্থতার চিত্র আঁকিয়াছিলেন তাহা-যে কবির পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ নহে, তাহাই এই কবিতাটি লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিলেন। কবির স্থান রাজসভা নহে, রাজা ও রাজপারিষদের চিত্তবিনোদন কবির ধর্ম নহে। অরসিকের নিকট রসের নিবেদনের ন্যায় ট্রাজেডি কবিজীবনে আর কিছুই নাই। শেখর কবির জীবন কেন ব্যর্থ হইয়াছিল তাহার উত্তর পাওয়া যায় 'পুরস্কার' কবিতায়। শেখরের মনে রাজসভায় 'জয়ী' হইবার বাসনা ছিল। 'পুরস্কারে'র কবি কিছুই আশা করে নাই, সে অহেতুকী আনন্দে বিভোর হইয়া মিউজের উদ্দেশে গান গাহিয়া গেল, কোনো বাতায়নবাসিনীর উদ্দেশ্যেও নহে, কাহাকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়েও নহে— 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'-এর ন্যায় অহেতুকী তাহার প্রার্থনা।

সোনার তরীর শেষ পর্ব

আমাদের আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গেই আছেন। নৌকায় চলিতে চলিতে ঘাটের বিচিত্র শোভা চোখে পড়ে; মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিশেষ করিয়া মনকে ভরিয়া তোলে। তাহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন ছিন্নপত্রে। শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "আমি অনেক দিন থেকে ভেবে দেখেছি, পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ।· পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উঁচুনীচু; তারা যে নানা কার্যে, নানা শক্তি, নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে, তাদের অঙ্গে এবং স্বভাবে তার যেন চিহ্ন রয়ে গেছে।· প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিস যেমন সুসম্বদ্ধ সুসম্পূর্ণ সুসংহত সুসংযত মেয়েরাও সেইরকম; তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা, কোনো চিন্তা, কোনো মন এসে তাদের ছন্দোভঙ্গ করে দিচ্ছে না; কোনো তর্ক এসে তাদের মিল নষ্ট করে দিচ্ছে না।"[১] সেই দিনই 'বিদায়-অভিশাপ' কাব্যনাট্যখানি শেষ করিয়াছেন। পুরুষ যদি নিতান্তই খাপছাড়া না হইবে, তবে আদর্শের অজুহাতে যুবতী উপযাচিকার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে! মেয়েদের কাছে পুরুষের এই ব্যবহারটা অত্যন্ত অসংগত ও অদ্ভুত! কারণ পুরুষের মধ্যে মন আছে, তর্ক আছে, আদর্শ আছে, কিন্তু মন নারীর ছন্দোভঙ্গ করে না, আদর্শ লইয়া তর্ক করিয়া তাহার জীবনকাব্যের মিল নষ্ট হয় না।

কিছুকাল পূর্বে লিখিত 'নরনারী' প্রবন্ধে[২] রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির স্তব[৩] করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষকালে ক্ষিতির মুখ দিয়া যে-টিপ্পনী প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করেন, তাহা হইতেছে বৃশ্চিকের লেজে বিষের মতন, the sting is at the tail। সেখানে আমাদের দেশের পুরুষের অকৃতার্থতার জন্য মেয়েকেই দায়ী করা হইয়াছে; তাহাদের অন্ধ সংস্কার, তাহাদের আসক্তি, তাহাদের ঈর্ষ্যা, তাহাদের কৃপণতা দেশের বক্ষে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে। ইহার কারণ কেবল অশিক্ষা নহে, অতিমাত্রায় হৃদয়ালুতা (sentimentality)[৪]।

'বিদায়-অভিশাপ' কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এই তথ্যটাই তত্ত্বাকারে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পঞ্চভূতের

১ ছিন্নপত্র, ২৬ শ্রাবণ ১৮৯৩।

২ সাধনা ১২৯৯ চৈত্র। পঞ্চভূত, পৃ ৩৯-৬৩।

৩ ছিন্নপত্র, কলিকাতা ২১ জুন ১৮৯৩ [১৩০০ আষাঢ় ৮]।

৪ পঞ্চভূত, পৃ ৬২-৬৩।

অন্তর্গত কাব্যের তাৎপর্যের মধ্যে ব্যোমের জবানীতে 'বিদায়-অভিশাপে'র গল্পাংশ কবি যে-ভাবে বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্র বর্ষ নৃত্যগীতবাদ্যদ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আসক্তি সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।" বলা বাহুল্য, পুরুষ যে বৃহত্তর আদর্শের জন্য, শ্রেয়ের জন্য প্রেয়কে ত্যাগ করিতে পারে সেই তত্ত্বটি এখানে সমর্থিত হইয়াছে। দেবযানীর প্রেম-নিবেদন ব্যর্থ হইল দেখিয়া সে কচকে অভিশাপ দিল। রবীন্দ্রনাথের এই নারী 'বিসর্জনে'র গুণবতীরই ন্যায় হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণা (vindictive)। নিজ কামনা সিদ্ধ না হওয়ায় সে ঈর্ষী মার্জারীর ন্যায় কুশ্রী হইয়া উঠিল। কচ শান্ত, সংযত; তাহার প্রেম এত গভীর যে অভিশপ্ত হইয়াও সে বলিল, 'আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে। ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে'। কচের শুভেচ্ছা সার্থক হইয়াছিল। 'কাব্যের তাৎপর্যে' রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যনাট্যটি সম্বন্ধে বহুবিস্তারে নানাদিক হইতে আলোচনা করিয়াছেন, কুতূহলী পাঠক সেটি পাঠ করিতে পারেন।

ইতিপূর্বে 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যে কবি নারীকেই আদর্শ-রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; 'বিদায়-অভিশাপে' পুরুষকে সেই শ্লাঘার স্থান দান করিলেন। নারীর সৌন্দর্য সুসম্পূর্ণতায়; চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে তাহা সফল হইয়াছে। আর পুরুষের সৌন্দর্য বলিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণতায়; কচের চরিত্রে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতির মধ্যে কালীগ্রাম হইতে ভাদ্রের গোড়ায় কলিকাতায় ফিরিলেন। কলিকাতায় তখন শিক্ষিতমহলে রাজনীতি লইয়া প্রচণ্ড আলোচনা চলিতেছে। তিন বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'মন্ত্রি অভিষেক' (১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ) নামে যে-প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি সাহিত্যিক বা রাজনীতিক কাহারও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। তাই আজ রাজনীতির মধ্যে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া সকলেই যুবক কবির দিকে তাকাইলেন। চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক গৌরহরি সেনের অবিশ্রাম উত্তেজনায় রবীন্দ্রনাথকে অবশেষে রাজনীতি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। এবার বক্তৃতার বিষয় 'ইংরেজ ও ভারতবাসী'। চৈতন্য লাইব্রেরিতে সভা— সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র। 'রাজনীতি'র সমালোচনা বলিয়া বঙ্কিমকে প্রবন্ধটি পূর্বাহ্ণে 'শোনাতে হয়েছিল'। পূর্বাহ্ণে শোনাইবার কারণ অনুমান করা যায়, যুবক রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির সমালোচনা সিডিশনের পর্যায়ে পড়ে কিনা তাহা জানা দরকার। এ ছাড়া যিনি কয়েকদিন পরেই সভাপতি হইবেন, তাঁহার পক্ষে সে-প্রবন্ধ পূর্বাহ্ণে শুনিবার আর-কোনো সংগত কারণ থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে শুনাইয়া নিরুদ্‌বিগ্ন হইয়াছিলেন।[১]

কলিকাতায় প্রবন্ধ পড়িবার পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করেন, তার একটি হইতেছে কর্মাটার, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয় বিশ্রামভূমি। কর্মাটার হইতে আশ্বিনের গোড়ার দিকে কলিকাতায় ফেরেন— তখন প্রমথ চৌধুরী ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলাত যাইতেছেন (১৮৯৩ অক্টোবর)।

২৬ কার্তিক হইতে ২৭ অগ্রহায়ণের মধ্যে কবিকে সোনার তরীর শেষ কয়টি কবিতা লিখিতে দেখি। অগ্রহায়ণ

১ "তাহার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনা ১৩০১ বৈশাখ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯। দ্র. চিঠিপত্র ৫।

মাসে বোধ হয় মেজদাদার কাছে সিমলায় কয়েকদিনের জন্য যান ; উডফিল্ড[১] অবস্থান কালে কয়েকটি কবিতা লেখেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কবিতার কথাই যখন বলিতেছি তখন সেই আলোচনাটা শেষ করিয়াই তাঁহার গদ্য রচনার কথা উল্লেখ করা যাইবে। ঐতিহাসিক অনুক্রমণতা একটুখানি মুলতুবি থাকিল। 'পুরস্কার' কবিতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে পৃথিবীর সৌন্দর্যে আর-একটু সৌন্দর্য দান করিবেন ; সেই কথাটি মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া রহিয়াছে, সেই অনুভূতিকে ব্যাপক করিয়া প্রকাশ করিলেন 'বসুন্ধরা'য় (২৬ কার্তিক ১৩০০)।

ধরিত্রী তাঁহার প্রিয় ; বহুভাবে তাঁহার সেই ভালোবাসার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কেমনভাবে পাইলে কবির আধ্যাত্মিক তৃপ্তি হইবে, তাহা যেন প্রকাশের ভাষা পাইতেছে না। জড়ে জীবে, দিকে বিদিকে, সাগরে জঙ্গমে, অতীতে ভবিষ্যতে, সুখে দুঃখে, সভ্যতায় বর্বরতায় সকল ভাবে, সকল রসে, সকল দেশে, সকল কালে, সকল দেশ-কালের বাহিরে— অণুতে, পরমাণুতে নিজেকে সম্প্রসারিত করিয়া— সকল রূপরস অনুভব ও সম্ভোগ করিয়াও যেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা হইল না। সে কী বেদনা! একবার বলিলেন, 'ওগো মা মৃন্ময়ী, তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই।' যথেষ্ট বলা হইল না ; পুনরায় বলিতেছেন— 'দিগ্বিদিকে আপনাকে দিই বিস্তারিয়া বসন্তের আনন্দের মতো', এখনো যথেষ্ট হইল না, তাই পুনরায় বলিতেছেন— 'বিদারিয়া এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ অন্ধকারাগারে, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া, শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে', মনের এই সর্বগ্রাসী আকুলতায় বলিতেছেন—

> হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
> কত বার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
> প্রকাণ্ড উল্লাসভরে· ·
> আমার পৃথিবী তুমি
> বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
> আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
> অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
> সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
> যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
> উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
> ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
> পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

১ দ্র. অচলস্মৃতি, Woodfield, সিমলা। ১১ অগ্রহায়ণ, ১৩০০ সোনার তরী ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩। খেয়াল খাতা হইতে উদ্ধৃত পত্র-কবিতা 'সৃষ্টি প্রলয়ের তত্ত্ব' মুদ্রিত হয়। বনক্ষেত্র [Woodfield] সিমলা শৈল। শনিবার ১৮৯৮। ভারতী ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৭০। আমাদের মনে হয় সনটি ১৮৯৩ হইবে। পূরবীতে (প্রথম সংস্করণ) জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ করা হইয়াছিল।

এই রচনার মধ্যে বিশ্বানুভূতি যেন কাব্যে রূপ পাইয়াছে। অন্তরের দীর্ঘ আকূতির শেষ নিবেদন হইল—

জননী, লহ গো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধরে—
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের—
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও— রাখিয়ো না দূরে।

কবির এই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা এখনো প্রার্থনা ও আবেদন -স্তরে রহিয়াছে— যেমন তাঁহার সমসাময়িক ব্রহ্ম-সংগীতগুলি— ইহা এখনো গভীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মহারা হয় নাই। এখন তিনি দরদী বটে, মরমী নহেন। 'বসুন্ধরা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতারাজির অন্যতম ; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় একদিন যেমন তরুণ হৃদয়ে বিশ্ব আসিয়া কোলাকুলি করিয়াছিল, আজ বসুন্ধরার দিকে তাকাইয়া সবল যৌবন হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বের সৌন্দর্যকে নূতন কাব্যীয় আনন্দে কবি উপলব্ধি করিতেছেন। বসুন্ধরার পর যে আটটি চতুর্দশপদী কবিতা আছে, তাহারা একই কবিতার যেন আটটি স্তবক— বসুন্ধরা কবিতারই পরিপূরক। বসুন্ধরায় যে-কথাগুলি বলা হয় নাই, তাহাই যেন এগুলির মধ্যে বলা হইয়াছে। বসুন্ধরা তাঁহার নিকট অত্যন্ত সত্য, নিবিড়ভাবে প্রাণময়, তাহাকে মায়া বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি অক্ষম। মায়াবাদীকে বলিতেছেন—

ভাবিতেছ মনে—
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।· ·
তুমি·বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস।
লক্ষকোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে, সব ছেলেখেলা। —মায়াবাদ
হোক্ খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে· ·
বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি
বর্ণগন্ধগীতময় যে মহা-খেলনা
তোমারে দিয়েছে মাতা ; হয় যদি ধূলি
হোক্ ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা ! —খেলা

অকালবৃদ্ধেরা বলেন, জগৎ মায়া, সংসার ছেলেখেলা, চারিদিকে বন্ধন। কিন্তু কবি জগতের এই বন্ধনকে স্বীকার করিতেছেন, 'সকলি বন্ধন স্নেহ প্রেম সুখতৃষা', কিন্তু 'মাতৃবন্ধপাশ ছিন্ন করিবারে চাস কোন্ মুক্তিভ্রমে।' —বন্ধন

জীবনের এই গতিকে কবি মানেন, তাই

পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনমরহস্য জানিবারে।
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী-সাথে এক গতি মোর। —গতি

সুন্দরী বসুন্ধরাকে নিবিড়ভাবে পাইবার জন্য কবির ঐ আত্মহারা আকুতি ; তিনি 'চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি, মুক্তি-আশে' কোথায় যাইবেন ?

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে ?

তাই অক্ষমা দরিদ্রা ধরিত্রীর মধ্যে তাহারই ধূলার সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে চান— 'তা বলে কি ছেড়ে যাবো তোর তপ্ত বুক' ! —অক্ষমা। তাই ধরিত্রীর কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন—

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দু-একটি প্রীতিসুমধুর
অন্তরের ছন্দো গাথা ;· ·
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্যকোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গে আর মুক্তি খুঁজিবারে। —আত্মসমর্পণ

'পুরস্কার' কবিতায় কবি ধরার প্রতি প্রেমের যে-সুর রাজসভাগৃহে শুনাইয়াছিলেন, 'বসুন্ধরায়' যাহা অনুভূতির চরম আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন চক্রপূর্ণ করিয়া শেষ কবিতায় 'আত্মসমর্পণ' করিল। এই ভাবধারা চৈতালির পূর্বাভাস, নৈবেদ্যের পূর্বরাগ, পরিপূর্ণ জীবনরসসম্ভোগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু এত বড়ো বসুন্ধরার এত বৈচিত্র্য, এত সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় একটি 'ক্ষুদ্র আমি' আছে কণ্টকের মত—

কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে তুলিয়া শির
বিঁধিয়া রয়েছি অন্তর-মাঝে এ পৃথিবীর। —কণ্টকের কথা

পৃথিবীর সমস্ত বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব ম্লান হইয়া যায় সকল বর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়, সকল গন্ধ লোপ পায়, সকল রস বিস্বাদ হয়— এই ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র অহংএর কাছে। সেই 'ক্ষুদ্র আমি' গর্ব করিয়া বলে—

হই না ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র ভীষণ ভয়—
আমার দৈন্য সে মোর সৈন্য তাহারি জয়।

কবি অন্তরের গভীরের দিকে তাকাইয়া সেই 'অহং'কে দেখিতে পান ; তাহার দম্ভ, তাহার স্পর্ধাকে কিছুতেই যেন পরাজিত করিতে পারিতেছেন না, সে যেন সমস্ত সৌন্দর্য, সকল আদর্শকে ধ্বংস করিবার জন্য নিত্যপ্রয়াসী।

সোনার তরীর শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। শ্যাম ধরণীর নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া এখনো কবির সব কথা যেন বলা হয় নাই ; 'মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে'। মানসসুন্দরী তাঁহাকে আলেয়ার ন্যায় দূর হইতে দূরে আহ্বান করিয়া চলিয়াছে, কবি তাহাকে ইন্দ্রিয়ের কোনো অনুভূতির মধ্যে আনিতে পারিতেছেন না! তাই যেন তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন—

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি ?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।

সে ইঙ্গিত করিয়া সম্মুখে চাহিয়া চলিয়াছে— 'হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না ব'লে'! আমাদের জীবনের দিনগুলি এমনিভাবে নিরুদ্দেশের যাত্রায় চলিতেছে— কাহার আহ্বানে কিসের আশায় রাত্রিদিন কর্মক্লান্ত চলিয়াছি,

প্রতিদিনের সোনার ধানের কর্মবোঝা সোনার তরীতে তুলিয়া মহাকাল চলিয়া যায় ; মানুষ বিস্মৃতির তীরে পড়িয়া থাকে, জালে-ওঠা ধনরত্ন পথিকরা লইয়া যায় ; সেই রহে অনাদৃত, বিস্মৃত, উপেক্ষিত। মানুষ কাহাকে যেন অধীর হইয়া ডাকিয়া শুধায়—

কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি।
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি।

এইদিক হইতে দেখিতে গেলে, জীবন ট্রাজেডি। এ যেন চিত্রা কাব্যগ্রন্থের 'সিন্ধুপারে'র অবগুণ্ঠিতার পূর্বাভাস।

'সোনার তরী' ১২৯৮ ফাল্গুন মাস হইতে ১৩০০ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত রচিত কবিতার সংগ্রহ। দুই বৎসর কালের মধ্যে রচিত হইলেও কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের যে-আত্মীয়তা আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ও তাঁহার সাহিত্য-সমালোচকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই কাব্যখণ্ড সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা রচনাবলীর অন্তর্গত হইয়াছে।

মানসী কাব্যগুচ্ছের সহিত তুলনা করিয়া কবি বলেন যে, সোনার তরীর লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। "বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে-উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্র সাধনের ক্ষেত্রে।

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ পারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি— সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা— বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে, কিন্তু আমাকে নেবে কি।"[১]

'সোনার তরী' কাব্যখানি প্রকাশিত হয় মাঘ মাসে। কবি-ভ্রাতা কাব্যরসিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন[২] মহাশয়ের করকমলে

১ সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

২ দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকক্লান্ত হইয়া আইনব্যবসা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপরে কিছুকাল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরূপে ভারতের নানাস্থানে পর্যটন করেন। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ মিশন' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরে 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল পরিচালনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ অশোকগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ (১৯১২), শেফালিগুচ্ছ, অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা, অপরাজিতাগুচ্ছ (১৯১২), ফুলবালা, ঊর্মিলা, অপূর্ব শিশুমঙ্গল প্রভৃতি। পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে ১৯২০ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তদীয় ভক্তের এই প্রীতি-উপহার সাদরে সমর্পিত হইল। কবি দেবেন্দ্রনাথ আজ বাঙালী পাঠকের নিকট হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছেন, তরুণদের নিকট প্রায় অপরিচিত; কিন্তু এককালে লিরিক-কবি হিসাবে সুযশ অর্জন করেন ও রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। সোনার তরীর যুগ (১২৯৮ অগ্রহায়ণ-১৩০০ অগ্রহায়ণ) 'সাধনা' পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রায় সমকালীন। এ যুগে ৪৪।৪৫টি কবিতা লেখেন, অনেকগুলি গানও রচনা করেন। তা ছাড়া কাব্যনাট্য 'বিদায়-অভিশাপ' এই সময়েরই রচনা। তবে কবিতা অপেক্ষা গদ্য রচনার বৈচিত্র্য সংখ্যা ও পরিমাণ বেশি। গদ্যের দুইটি ভাগ— কথা ও প্রবন্ধ। কথাসাহিত্যের বিশেষ সৃষ্টি হইতেছে ছোটগল্প, নাটক বা নাটিকা। গত দুই বৎসরের মধ্যে তেইশটি ছোটগল্প লেখেন— এগুলি বাংলা সাহিত্যে নূতন আদর্শ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া গদ্যরচনার জন্য এ পর্বটি খ্যাত; ১২৯৯ ভাদ্র মাসে 'গোড়ায় গলদ' প্রকাশিত হয়। এবং 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থভুক্ত 'পয়সার লাঞ্ছনা' (সাধনা ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ), 'প্রাচীন দেবতার বিপদ' (আষাঢ়) ও 'বিনিপয়সার ভোজ' (পৌষ) রসরচনার নিদর্শন। এই রচনাগুলির অনাবিল হাস্যরস স্বতঃউৎসারিত, এই রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'বিনিপয়সার ভোজ'। সম্পূর্ণ নূতন ধরণে রসসৃষ্টির প্রয়াস।

'বিনি পয়সার ভোজ' রচনার নমুনা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"কী করেছি বলো দেখি। জীবনবাবুর নাম সই করে হ্যামিল্‌টনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেছি? পেয়াদা-সাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস্ করে এত বড়ো অপবাদটা দিলে?

"ও কী ও! ওটা ধরে টেনো না। ও আমার ঘড়ি নয়। শেষকালে যদি চেন্-মেন্ ছিঁড়ে যায় তা হলে আবার মুশকিলে পড়তে হবে।

"কী! এই সেই হ্যামিল্‌টনের ঘড়ি? ও বাবা! সত্যি নাকি! তা, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এখনি নিয়ে যাও। কিন্তু ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টান কেন?··তা, নিতান্তই যদি না ছাড়তে পার তো চলো। বাবা, আমাকে সবাই ভালোবাসে, আজ তা'র বিস্তর পরিচয় পেয়েছি, এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালোবাসা কোনোমতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই। যদি জোটে রোজ এমনি বিনিপয়সায় ভোজ।"

'বিনিপয়সার ভোজ' একক নাট্য বা monologue। এই শ্রেণীর রচনার বক্তা থাকেন একজন, শ্রোতার উপস্থিতি কল্পিত; তাহার কথাবার্তা অশ্রুত, অথচ বক্তা যেন শুনিয়াছে। অন্যান্য ব্যক্তিরা অদৃশ্য অথচ যেন বক্তা দেখিতেছেন কল্পনা করিয়া অভিনয় করিতেছেন। এ যেন টেলিফোনের একদিকের কথা শুনিয়া কথোপকথন বুঝা।

এই একক-নাট্য রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টি বলিয়া সর্ববাদীসম্মত। পঠনীয় রচনা হিসাবে ইহা অতুলনীয়। পরে 'নূতন অবতার' নামে এই ধরণের আর-একটি একক-নাট্য লেখেন; কিন্তু সেখানে দুইটি অংশে দুইজন পৃথক ব্যক্তির স্বগত কথোপকথন আছে। তা ছাড়া রচনাটি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গে জর্জরিত বলিয়া 'বিনিপয়সার ভোজে'র সহিত তাহার রচনাকৌশলের তুলনাই হয় না।

গদ্যপ্রবন্ধ খুব বেশি নাই; 'শিক্ষার হেরফের' সুপরিচিত। সাধনা পত্রিকার জন্য 'প্রসঙ্গ কথা' 'সাময়িক সারসংগ্রহ' প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্থায়ী গদ্যসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এইসব রচনাকে আমরা সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। যথার্থ সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার্য রচনা হইতেছে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' এবং 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'। এই 'পঞ্চভূত' গ্রন্থখানিতে যে-ষোলোটি প্রবন্ধ আছে তাহার প্রথম আটটিই এই পর্বের দ্বিতীয় বর্ষে এবং অবশিষ্টগুলি এক বৎসর পরে পুনরায় প্রকাশিত হয়। পঞ্চভূত গ্রন্থাকারে ১৩০৪ সালে মুদ্রিত হয়।

সোনার তরী পর্বের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে রাজনীতির সমালোচনার মধ্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার কথা এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। এই পর্বের অন্তে ১৩০০ সালের কার্তিক মাস হইতে ১৩০১ সালের মাঘ মাসের মধ্যে রচিত সাতটি প্রবন্ধ রাজনীতির সমালোচনাপূর্ণ। আমরা যথাস্থানে এই কয়টি প্রবন্ধের আলোচনা পৃথকভাবেই করিব।

চিত্রা কাব্য

১৩০০ সনের অগ্রহায়ণ মাসটা সিমলা শৈলে মেজদাদাদের সঙ্গে কাটাইয়া বোধ হয় পৌষের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। এবার শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবে তাঁহাকে উপস্থিত দেখি, গত বৎসর পদ্মায় ছিলেন মানসসুন্দরীর রূপকল্পনায় মুগ্ধ। এই তৃতীয় বার্ষিক ব্রহ্মোৎসবে (৬৪ ব্রাহ্মসম্বৎ) ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্যাদির কার্য করেন। শান্তিনিকেতনের প্রাতের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের পুত্র হিতেন্দ্রনাথ "মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত করিয়া উৎসবকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।"[১]

কবির সাংসারিক সংবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তাঁহার তৃতীয় কন্যা মীরার জন্ম ১৩০০ সালের পৌষ-পার্বণের দিন (১২ জানুয়ারি ১৮৯৪)।

কলিকাতায় এখন কবি ব্যস্ত 'সোনার তরী' প্রকাশের জন্য। এ ছাড়া তাঁহার ছোটগল্পগুলি সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে। মাঘোৎসবের জন্য নূতন গান রচনার প্রেরণা কম, মাত্র চারিটি গান লিখিলেন।[২] সামাজিক কর্তব্যবোধে গীতরচনার উৎসাহ ক্রমশই ম্লান হইয়া আসিতেছে, নিজের সৃষ্টি-আনন্দে এখন কাব্য উৎসারিত হয়, যদিও তাহার সংখ্যা কম। সংখ্যায় কম বলিয়াই বোধ হয় রচনাশিল্পে তাহারা অনিন্দ্য, রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের সেরা রচনা বলিয়া সেগুলি স্বীকৃত ও সমাদৃত। সোনার তরীর শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশযাত্রা' (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০) লেখার কিঞ্চিদধিক মাসকালের ব্যবধানে 'জ্যোৎস্নারাত্রে' (৬ মাঘ) যে-কবিতারাজির সূত্রপাত হইল সেগুলি সাহিত্যে 'চিত্রা' নামে পরিচিত। এই কাব্যগুচ্ছে দুই বৎসরের কবিতা সংগৃহীত (২০ ফাল্গুন ১৩০২ পর্যন্ত) সাধনার শেষ দুই বৎসরের সমকালীন রচনা। এই পর্বের মধ্যে 'বিচিত্র গল্প'[৩] (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), 'কথা চতুষ্টয়'[৪] এবং 'নদী' কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

জীবনে সাধনা দুইভাবে হইতে পারে, বিচিত্রের ও বিশেষের। আধ্যাত্মিক ধর্মসাধকরা বিশেষের মধ্য দিয়া আত্মানুভূতিলাভ করিতে চেষ্টা করেন ; তাঁহারা বিচিত্রকে, দৃশ্যমান জগতের রূপকে অস্বীকার করিতে পারিলেই যেন বাঁচেন। কিন্তু কবি বিচিত্রের সাধক ; রূপরসগন্ধময়ী ধরিত্রীর বৈচিত্র্যের পূজারী তিনি। সৌন্দর্যকে তিনি কাব্যে কলায় কেবল স্বীকার করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই, তাহা সর্বতোভাবে সম্ভোগের দ্বারা জীবনে পাইয়াছেন। তিনি জীবনশিল্পী, বিচিত্রের সাধক, কিন্তু তাঁহার কাছে বিচিত্র জগৎ বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট নহে, তাহা বিশ্বপ্রাণের অন্তর্ভুক্ত, বিশ্বাত্মার অন্তর্গত সমগ্রভাবে সংশ্লিষ্ট— বস্তু হিসাবে বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও সমন্বিত। চিত্রা কাব্যে কবি সেই বিচিত্রের পদে পূজাঅর্ঘ্য সমর্পণ করিয়াছেন 'জ্যোৎস্নারাত্রে'—

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৫ শক (১৩০০) মাঘ, পৃ ১৮৪-৮৫।

২ মাঘোৎসবে নূতন গান— ১ এ ভবন পুণ্য প্রভাবে কর পবিত্র [এসো হে গৃহ দেবতা], ২ হৃদয় নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে, ৩ আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, ৪ অন্তরে জাগিছে অন্তর্যামী। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮১৫ শক ফাল্গুন, পৃ ২১৯।

৩ বিচিত্র গল্প। প্রথম ভাগে : অসম্ভব কথা, কঙ্কাল, স্বর্ণমৃগ, ত্যাগ, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, জয়পরাজয়, সম্পত্তিসমর্পণ ; দ্বিতীয় ভাগে : দালিয়া, জীবিত ও মৃত, মুক্তির উপায়, সুভা, অনধিকার প্রবেশ, মহামায়া, একটা আষাঢ়ে গল্প, একটি ক্ষুদ্র ও পুরাতন গল্প। [১৩০১]।

৪ কথাচতুষ্টয়— মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র। ১৩০১ [১৮৯৪ অক্টোবর ৫]।

হেরো আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তিমাঝে, অসীম সুন্দর,
ত্রিলোকনন্দনমূর্তি। আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষ্ণায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তরমন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি— বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে, নাহি তার সীমা।
আজি মোরে করো দয়া, এসো তুমি, অয়ি,
অপার রহস্য তব, হে রহস্যময়ী,
খুলে ফেলো— আজি ছিন্ন করে ফেলো ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।

জ্যোৎস্না রাত্রে 'যে দিব্যমূরতি'র জন্য 'উৎসুক উন্মুখ চিত্ত', 'একরাত্রি তরে' অমর করিয়া দিবার জন্য যাহার কাছে প্রার্থনা সেই 'বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা'।

সৌন্দর্যলক্ষ্মী সেই মালা গ্রহণ করিয়াছেন; শুধু গ্রহণ করেন নাই, 'প্রেমের অভিষেক' দ্বারা কবিকে 'করেছে সম্রাট, পরায়েছে গৌরব মুকুট, পুষ্পডোরে সাজায়েছে কণ্ঠ তার'। নিষ্ঠুর রূঢ় জগতের অন্তরস্থল দিয়া প্রেমফল্গু প্রবাহিত; প্রেমই মানুষকে বরণ করে মহান রূপে সুন্দর রূপে— সকল দীনতা সকল হীনতা ভুলিয়া গিয়া তাহার শাশ্বত প্রেমিক-মূর্তির কাছে সে আত্মনিবেদন করে।—

প্রেমের অমরাবতী—
সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী; চিরসুহৃদ্‌গমান
সর্বচরাচর।

'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচার-বিতর্ক হইয়াছে। সাধনায় যখন উহা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন উহার মধ্যে কেরানির ধূলিমাখা জীবনের কথা ছিল। কবিবন্ধু লোকেন পালিত তজ্জন্য কবিকে অত্যন্ত ধিক্কার দেন। রচনাটিকে বাস্তবমূর্তি দিবার ইচ্ছায় কেরানি-জীবনের অবতারণা করিয়া কবিতাটিকে নষ্ট করেন। যাহা হউক 'চিত্রা'য় সাধনার পাঠ পরিত্যক্ত হইয়াছে।[১] রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ও সঞ্চয়িতার গ্রন্থপরিচয় অংশে সাধনায় প্রকাশিত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে।

ফাল্গুনের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ পতিসর গিয়াছেন। 'যে পারে বোট লাগিয়েছি এ পারে খুব নির্জন। গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধূ ধূ করছে।' নদীর ধারে তাঁহাদের দুইটা হাতি চরে; তাহাদের দেখিয়া লিখিতেছেন, 'এর এই প্রকাণ্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জন্যেই যেন এর প্রতি একটা কি বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়।' ঘরের ভিতর বেঠোভেনের[২] ছবির কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, 'অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে; কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়— ঐ উস্কো-খুস্কো মাথাটার ভিতরে কত বড়ো একটা শব্দহীন শব্দজগৎ। এবং কী একটা বেদনাময় অশান্তক্লিষ্ট প্রতিভা রুদ্ধঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতরে ঘূর্ণমান হত।'[৩] এই দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-বিষয় by contrast যুগপৎ মনে উদয় হওয়ার মধ্যে মনস্তত্ত্বের যোগসূত্র আছে।

ইহার পরদিন (১৩০০ ফাল্গুন ৯) লিখিলেন 'সন্ধ্যা' কবিতাটি; নির্জন পারিপার্শ্বিকের স্তব্ধ সন্ধ্যা কবিচিত্তে বিচিত্র সুর ধ্বনিয়া তুলিতেছে। কবিতাটির মধ্যে একটি বিষাদের মহাশান্তি— 'অন্তরের যত কথা শান্ত' হইয়া 'মর্মান্তিক নীরবতা'য় আত্মপ্রকাশ করে। বসুন্ধরা সম্বন্ধে নূতন অনুভূতি—

> যেন মনে পড়ে সেই বাল্যনীহারিকা;
> তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা;
> তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
> জীবধাত্রী জননীর কাজ বক্ষে লয়ে
> লক্ষ কোটি জীব— কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
> কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।

আমাদের এই জীবনের অর্থহীন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় যে-প্রশ্ন বার বার উঠে, 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি', এখানেও নিঃসঙ্গিনী ধরণীর বিশাল অন্তর হতে তেমনি আজ নীরব সন্ধ্যায় 'উঠে সুগম্ভীর একটি ব্যথিত প্রশ্ন'— 'আরও কোথা আরও কত দূর।'

নদীপথে আসিয়া পৌঁছাইলেন রাজশাহী, সেখানে তাঁহার বন্ধু লোকেন পালিত আছেন। এইখানে লিখিলেন তাঁহার অমর কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে'[৪] (২৩ ফাল্গুন ১৩০০)। চিত্রার পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করিবেন যে এই

১ "তাঁহারা বলেন, কোনও আফিস বিশেষের কেরানি বিশেষের সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণভাবে, আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস সহকারে ব্যক্ত করিলে প্রেমের মহিমা ঢের বেশি সরল উজ্জ্বল উদার এবং বিশুদ্ধ ভাবে দেখানো হয়— সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমান-ক্ষুণ্ণ নিরুপায় কেরানির মুখে এ কথাগুলো যেন কিছু অধিকমাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শুনায়— উহার সহজ স্বতপ্রবাহিত সর্ববিস্মৃত কবিত্ব রসটি থাকে না— মনে হয়, সে মুখে যতই বড়াই করুক-না কেন আপনার ক্ষুদ্রতা এবং অপমান কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। এইসমস্ত আলোচনাদি শুনিয়া আমি গোড়ায় যে ভাবে লিখিয়াছিলাম, সেই ভাবেই [চিত্রায়] প্রকাশ করিয়াছি।"— ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, শিলাইদহ ৬ চৈত্র ১৩০২। দ্র প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

২ বেঠোভেন। Ludwig von Beethoven (1770-1827): জারমান সংগীত রচয়িতা। বন্‌ নগরী ত্যাগ করিয়া বিয়েনায় (Vienna)-য় যান্‌ ও সেখানে মোৎসার্টের (Mozart) শিষ্য হন। জীবনের শেষ অবধি এখানে কাটে। রবীন্দ্রনাথ বেঠোভেন সম্বন্ধে ভালোরকমই জানিতেন।

৩ ছিন্নপত্র। পতিসর, ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ (১৩০০ ফাল্গুন ৮)।

৪ 'এবার ফিরাও মোরে', সাধনা ১৩০০ চৈত্র, পৃ. ৪১৬-৪৩১।

কবিতার সুর ছন্দ ভাব ইতিপূর্বে রচিত কবিতা ও তৎপূর্বে রচিত পত্রধারা[১] হইতে কত পৃথক। এই কবিতার মধ্যে কি এক আঘাতজনিত ক্ষুব্ধতা তাঁহার চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। কবির মন স্বভাবতই কোমল স্পর্শকাতর, কোথাকার বেদনা যেন তাঁহাকে অকস্মাৎ সচেতন করিয়াছে।—

কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল! কোন্ অন্ধ কারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়! স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।

নিরালা কাব্যজীবনের নির্জনবাস অসহ্য হইবার

'সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি-মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন,·· তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল।'

তাই পৃথিবীর দুঃখকে দূর করিবার জন্য কবি অন্তরের মধ্যে তীব্র বেদনা বোধ করিতেছেন 'এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে', কারণ যাহারা নীরবে দুঃখভোগ করে, তাহাদিগের 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা'। এই কবিতায় বলিয়াছিলেন—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

রবীন্দ্রনাথের মন কেন অকস্মাৎ এই উত্তেজিত ভাব ধারণ করিল, কেন নিপীড়িতদের জন্য হঠাৎ এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ বেদনা, তাহার কারণ 'রাজনীতির দ্বিধা'[২] শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে; আমরা কবির রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি একত্র আলোচনা করিব, সেইখানে এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে।

এই কবিতা রচিত হইবার চব্বিশ বৎসর পরে ইহার সম্বন্ধে কবি 'আমার ধর্ম'[৩] প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয় আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রায়' 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ। মাধুর্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়।··বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের এই··সংঘাত যে কেবল আরামের কেবল মাধুর্যের তা নয়; অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়।·· এ আহ্বান তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।"[৪]

যে-মাসের সাধনায় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি বাহির হইয়াছিল সেই সংখ্যাতেই কবিকৃত রাজসিংহের

১ ছিন্নপত্র, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪। ৯ ফাল্গুন।
২ রাজনীতির দ্বিধা। সাধনা ১৩০০ চৈত্র পৃ. ৪৪০-৪৪৯। দ্র. রাজাপ্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।
৩ সবুজপত্র ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক।
৪ তৃতীয় প্রবন্ধ, আত্মপরিচয়।

সমালোচনা[১] ও 'রাজনীতির দ্বিধা' -শীর্ষক রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসটা প্রায়ই কাটিয়া গেল উত্তরবঙ্গে; বেশির ভাগই পতিসরে, কয়েকদিন লোকেন পালিতের সঙ্গে রাজশাহীতে। ছিন্নপত্রের মধ্যে এই সময়ের খানকয়েক পত্র আছে,[২] মানুষ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অনেক কথা তাহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে।

তাঁহার এই নিঃসঙ্গ জীবনে এক নূতন বন্ধু জুটিয়াছিল, "আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা *Amiel's Journal* ধার করে এনেছি, যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি— ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কচ্ছি এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি।"[৩]

আমিয়েল[৪] ছিলেন ফরাসী-স্বইস দার্শনিক, জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক; সাময়িক পত্রিকায় দর্শনাদি বিষয়ে প্রবন্ধ ছাড়া তিনি দার্শনিক কোনো প্রবন্ধ রচনা করেন নাই; যে দুই-একখানা বই লেখেন তা খ্যাতি অর্জন করে নাই। নিজের চিন্তাধারা ডায়ারিতে লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেগুলি ছাপা হয়। এই গ্রন্থখানি কবির খুব ভালো লাগে, বহুবার ইহার কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।[৫] আমিয়েলের লেখা তাঁহার এত ভালো লাগে যে বলেন্দ্রনাথের 'পশুপ্রীতি' নামক একটা প্রবন্ধের মধ্যে আমিয়েলের লেখা হইতে অনেকখানি নোট বসাইয়া দিলেন।[৬]

চৈত্র মাসের মাঝামাঝির পর বা শেষাশেষি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। এবার এখানে আসিয়া কয়েকটি কবিতা লিখিলেন। ১৩০০ সালের বর্ষশেষের দিন, বর্ষশেষ (স্নেহস্মৃতি), পহেলা বৈশাখ (১৩০১), নববর্ষে, ও কয়েক দিনের মধ্যে লেখেন দুঃসময় (৫ই) মৃত্যুর পরে (৫ই) ও ব্যাঘাত (৬ই বৈশাখ)। কবিতা কয়টিরই মধ্যে মৃত্যু ও বিরহের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। 'এবার ফিরাও মোরে' (২৩ ফাল্গুন) কবিতার মধ্যে যে-প্রচণ্ড আবেগ দেখিয়াছিলাম, তাহা আর-কোনো কবিতার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাধনা'য় 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি প্রকাশিত হইলে উহা কাহার উদ্দেশ্যে রচিত তাহা লইয়া বহু গবেষণা হয়। নিত্যকৃষ্ণ বসু সাহিত্যিকের ডায়ারিতে (সাহিত্য ১৩১০)

১ রাজসিংহ, সাধনা ১৩০০ চৈত্র (নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ), পৃ. ৪০২-৪১৬। আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯।

২ ছিন্নপত্র, পতিসর, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ (১৩০০ ফাল্গুন ৮) ;—২৭ ফেব্রুয়ারি ;—১৯ মার্চ ;—২২ মার্চ ;—২৫ মার্চ ;—২৮ মার্চ ;—৩০ মার্চ (১৩০০ চৈত্র ১৭)।

৩ ছিন্নপত্র, পতিসর, ২২ মার্চ ১৮৯৪ (৯ চৈত্র ১৩০০)।

৪ Amiel, Henri Frederic (1821-1881)—Swiss philosopher; Professor of Æsthetics in Geneva 1849; Lecturer and then Professor of Philosophy, 1854. His *Journal Intime* was printed after his death (1883, Geneva) by E. Sherer. Translated with introduction and notes by Mrs. Humphry Ward, Macmillan, 1887. *Vide* Mathew Arnold *Essays in Criticism*. Second series Amiel *Philine*, unpublished fragments from the Journal of H. F. Anid, translated by Van Wyck Brooks with an introduction by D. L. Murray, 1931.

৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ' নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন (পৃ. ২৪) : "আর একবারের আর-একটা ঘটনা মনে আছে। Mrs. Humphry Wardএর লিখিত (অনূদিত) *Amiel's Journal* নামক গ্রন্থ যখন বাহির হইল (১৮৮৭), তখন চারিদিক হইতে তাহার প্রশংসা শুনিয়া আমরা কয়েকজন বন্ধু তাহা পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম এবং কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া ফেলিলাম। আমরা মনে করিতে লাগিলাম যে, কলিকাতার মধ্যে আমরাই সর্বপ্রথমে এই গ্রন্থ পড়িলাম, কিন্তু দুই-চারিদিন পরে মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন '*Amiel's Journal*' কি পড়িয়াছ? যখন শুনিলেন যে তৎপূর্বে আমরা পড়িয়াছি, তখন আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সেই গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি মুখস্থ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আমরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম তিনি যে তৎপূর্বে উহা পাঠ করিয়াছেন কেবল তাহা নহে এরূপ মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন।"

৬ ছিন্নপত্র, পতিসর, ২২ মার্চ ১৮৯৪।

বলেন যে কবিতাটি সাধনায় বাহির হইলে উহা বঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু এতদ্‌সম্বন্ধে সন্দেহও তিনি প্রকাশ করেন। উহার মধ্যে এত ব্যক্তিগত ভাবাবেগ আছে যে তাহা বঙ্কিমের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না।

'স্নেহস্মৃতি' 'দুঃসময়' 'মৃত্যুর পরে' এমনকি 'নববর্ষে' কবিতার মধ্যে যে বিরহ-মৃত্যুর কথা আছে তাহা কাহার স্মরণে রচিত তাহা স্বল্প প্রচেষ্টায় আবিষ্কার করা যায়। পাঠকের স্মরণ আছে দশ বৎসর পূর্বে এই বৈশাখ মাসে (৮ই) শুক্লা নবমীর দিন তাঁহার বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবী দেহত্যাগ করেন। তাঁহাকেই আজ স্মরণ হইতেছে, নূতন ভাবে তাঁহাকে আজ কবি দেখিতেছেন। পূর্বেও 'কড়ি ও কোমলে'র কয়েকটি কবিতার মধ্যে তাঁহারই মৃত্যুজনিত শোকবিহ্বলতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা হইতে আজিকার বেদনার সুর অন্য প্রকারের—

সেই সব এই সব, তেমনি পাখির রব,
  তেমনি চলেছে হেসে জাগ্রত সংসার
দক্ষিণ-বাতাসে-মেশা ফুলের গন্ধের নেশা
  দিকে দিকে ব্যাকুলতা করিছে সঞ্চার।
অবোধ অন্তরে তাই চারিদিক-পানে চাই,
  অকস্মাৎ আনমনে জেগে উঠে ভুল—
বুঝি সেই স্নেহসনে ফিরে এল এ জীবনে
  সেই চাঁপা সেই বেলফুল!— স্নেহস্মৃতি

'কড়ি ও কোমলে'র 'কোথায়' ও 'পুরাতন' কবিতাদ্বয়ের সহিত 'স্নেহস্মৃতি' ও 'নববর্ষে' কবিতা দুইটি তুলনীয়। 'দুঃসময়' ও 'মৃত্যুর পরে' কবিতার মধ্যে এই শোকস্মৃতি আরও স্পষ্ট। স্মৃতির মাঝে আজ যে উদয় হইতেছে তাহারই উদ্দেশ্যে কবি বলিতেছেন—

তোমারে আজিকে ভুলিয়াছে সবে,
শুধাইলে কেহ কথা নাহি কবে,· ·
যেথা এক দিন ছিল তোর গেহ
ভিখারির মতো আসে সেথা কেহ· ·
যাহারা জাগিছে নবীন উৎসবে
রুদ্ধ করি দ্বার মত্ত কলরবে,
কী তোমার যোগ আজি এই ভবে
তাদের সাথে।—দুঃসময়

এই কবিতাটির সহিত 'কড়ি ও কোমলে'র 'নূতন' কবিতাটি তুলনীয়। 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি পাঠক এখন আমাদের ব্যাখ্যার আলোকে পাঠ করুন। সেই অভাগিনী নারী কী বেদনায় তাহার তরুণ জীবনকে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল সে-সংবাদ এখনো রহস্যাবৃত। আত্মীয়স্বজনেরা তাহার এই আকস্মিক কাণ্ডকে কখনো ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া বিচার করেন নাই; মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য সকলের কাছে মৃত্যুর পরও সে নিন্দাভাগী হইতেছিল। তাই কি কবি লিখিতেছেন—

ছিলে যারা রোষভরে
বৃথা এতদিন পরে
করিছ মার্জনা।
অসীম নিস্তব্ধ দেশে
চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সান্ত্বনা।· ·
বসিয়া আপন দ্বারে
ভালোমন্দ বলো তারে
যাহা ইচ্ছা তাই।
অনন্ত জনমমাঝে
গেছে সে অনন্ত কাজে,
সে আর সে নাই
আর পরিচিত মুখে
তোমাদের দুখে সুখে
আসিবে না ফিরে।
তবে তার কথা থাক্‌,
যে গেছে সে চলে যাক
বিস্মৃতির তীরে।

প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয় ৮ই বৈশাখ ১২৯১ শুক্লা নবমী, এই কবিতাটি রচিত হইতেছে ৫ই বৈশাখ ১৩০১ শুক্লা দ্বাদশীর দিন।

চিত্রা কাব্যের পর্ব

যে চৈত্র মাসের (১৩০০) সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসের সংশোধিত সংস্করণের দীর্ঘ প্রশংসামুখর সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেই মাসেরই ২৬ তারিখে বঙ্কিমের মৃত্যু হয়; বঙ্কিমের বয়স তখন ৫৬ বৎসর।[১] রাজসিংহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা বঙ্কিম দেখিয়া গিয়াছিলেন কিনা জানি না।

বৈশাখ মাসে বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক উদ্‌যোগ করিলেন। এই সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন, "বঙ্কিমবাবুর জন্য 'শোক-সভা' হইবে, রবিবাবু শোক-প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহার সভাপতিত্ব করিতে আমি আহূত হইয়াছিলাম। আমি উহা অস্বীকার করিয়া লিখিলাম যে, সভা করিয়া কিরূপে শোক করা যায়, আমি হিন্দু তাহা বুঝি না। সভা করিয়া শোক!· ·'শোক-সভা' সম্বন্ধে আমার উপরি-উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া রবিবাবুর 'সাধনা'তে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।· ·আমাদের শোক বড় নিভৃত ও পবিত্র। উহা সভা করিয়া একটা তামাশার জিনিস করা আমি মহাপাতক মনে করি।"[২]

১ বঙ্কিমচন্দ্র, জন্ম ১৮৩৮ জুন ২৭, মৃত্যু ১৮৯৪ এপ্রিল ৮ (১৩০০ চৈত্র ২৬)।

২ 'আমার জীবন', পঞ্চম ভাগ।

নবীনচন্দ্রের এই আত্যন্তিক স্বাদেশিকতা এবং অতিমাত্র হিন্দুত্বকে রবীন্দ্রনাথ সহজ সরলতা জ্ঞানে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সভায় তাঁহার প্রবন্ধপাঠের পর সাধনায় তাহার উত্তর প্রদান করেন।[১] প্রবন্ধের একস্থানে লিখিলেন, "যেমন আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক পিতৃহীন ব্যক্তির পিতৃশোক ব্যক্ত করা প্রকাশ্য কর্তব্যস্বরূপে গণ্য হয় তেমনি পাব্লিকের হিতৈষী কোনো মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রকাশ্য সভায় শোকজ্ঞাপন একটা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট হইতে আমরা বহু জিনিস গ্রহণ করিয়াছি ও করিতে বাধ্য হইয়াছি; শোকসভা-অনুষ্ঠান তাহার অন্যতম। পাশ্চাত্য বলিয়াই তাহা বর্জনীয় হইতে পারে না।[২]

চৈতন্য লাইব্রেরীতে যে-স্মৃতিসভা হইল,[৩] তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন তাহা বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত প্রবন্ধ।[৪] তাহা হইতে একটিমাত্র অংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"অধিক দিনের কথা নহে; ইতিপূর্বেই যে-সভায় আমি সাধারণের সমক্ষে প্রবন্ধ [ইংরেজ ও ভারতবাসী] পাঠ করিয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সভাপতি থাকিয়া আমাকে পরম সম্মানিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তখন কে কল্পনা করিয়াছিল তাহার অনতিকাল পরে পুনশ্চ এই সাধারণ সভায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গদেশের হইয়া আমাকে শোক প্রকাশ করিতে হইবে। কে জানিত আমার সহিত তাঁহার সেই শেষ ঐহিক সম্বন্ধ।"

বঙ্কিমের নিকট রবীন্দ্রনাথ যে কত বিষয়ে ঋণী ছিলেন তাহার সম্পূর্ণ গবেষণা এখনো হয় নাই; কিন্তু আলোচনা হইলে দেখা যাইবে বহু বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে অনুবর্তন করিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য সংচালিত করিয়াছিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই বলা উচিত উভয়ের জীবনাদর্শ বা দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে মিল হইতে অমিল মিলিবে বেশি। তবে এ কথা নিশ্চিত যে সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশপ্রীতি-উদ্‌বোধন বিষয়ে উভয়ে সমধর্মী।

বঙ্কিমের মৃত্যুর দেড় মাসের মধ্যে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর মৃত্যু হইল (১৩০১ জ্যৈষ্ঠ ১১)। মৃত্যুর সময় বিহারীলালের বয়স ষাট বৎসর ছিল; বহু বৎসর বাংলা সাহিত্যকে তিনি নীরবে সেবা করিয়াছিলেন। বাংলার সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট তিনি বঙ্কিমাদির ন্যায় কখনো সুপরিচিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুর পর যে-দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তাহাই বোধ হয় ঐ কবি সম্বন্ধে চরম কথা। তিনি লিখিলেন, "বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না।·· তাঁহার সুমধুর সংগীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক-সমাজের দ্বারবর্তী হইত না। কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সংগীতকাকলিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের

১ শোকসভা, সাধনা ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ। আধুনিক সাহিত্য, পরিশিষ্ট; রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯।

২ তু. স্মরণ, সেঁজুতি।

ডেকোনা, ডেকোনা সভা
এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

৩ ২৮ এপ্রিল ১৮৯৪ (১৩০১ বৈশাখ ১৬); সভাপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪ বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনা ১৩০১ বৈশাখ, পৃ. ৫৩৬-৫৬৪। আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯. গ্রন্থপরিচয়।

শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।"[১] এই গ্রন্থের প্রথমাংশে আমরা রবীন্দ্রনাথের সহিত বিহারীলালের পরিচয়ের কথা সবিস্তারে বলিয়াছি, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গ্রীষ্মকালের অধিকাংশ সময় কাটিল কলিকাতায়; তবে মাঝে কয়েকদিনের জন্য যান কার্সিয়াঙ্। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে তথায় তাঁহার সহিত কয়েকদিন কাটাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। মহারাজ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সবিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হইলে তিনি কিভাবে কবিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহা রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের নিকট সুপরিচিত। বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধেও তাঁহার আগ্রহ ছিল অকৃত্রিম, তিনি স্বয়ং বৈষ্ণবগান ব্রজবুলিতে লিখিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসাহিত্য প্রকাশ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য তিনি তরুণ কবিকে নিমন্ত্রণ করেন। এই সাহিত্য প্রচারকল্পে মহারাজ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই উদার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়, রাজা ও কবির স্বপ্ন অপূর্ণই থাকিয়া গেল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজপরিবারের সহিত তাঁহার এই বন্ধন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল।

দেশের রাজাই হউক আর বিদেশের নবীন আগন্তুকই হউক, রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত প্রতিভায় সকলেই আকৃষ্ট হইত। এই সময়ে (১৮৯৩ শেষ দিকে) সুইডেন হইতে হামারগ্রেন্ নামে এক যুবক কলিকাতায় আসেন। রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া যুবকটি বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হন ও নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশের কোনো সেবার কাজে জীবন উৎসর্গ করিবেন এই সংকল্প অন্তরে বহন করিয়া এ দেশে আসেন। নিরন্তর অনিয়মে পরিশ্রম করিয়া অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে হিন্দুর ন্যায় যেন তাঁহার দাহকার্য হয়।

এই ব্যাপারে হিন্দুসমাজের সনাতনীদের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল— একজন বিদেশী বিধর্মী হিন্দুদের শ্মশানে দাহ হইবে, এমন অনাচার ধর্মপ্রাণ লোকদের অসহ্য। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটি লইয়া 'বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য' নামে এক প্রবন্ধ[২] লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিলেন, "কিছুকাল পূর্বে এক সময় ছিল যখন আমাদের স্বদেশ-প্রেমিকগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন যে, হিন্দুধর্মে উদারতা বিশ্বপ্রেম নির্বিচার আতিথ্য অন্যসকল ধর্ম অপেক্ষা অধিক।··শ্রুতিতে আছে, অতিথিদেবো ভব। কিন্তু কালক্রমে লোকাচার এমন অনুদার ও বিকৃত হইয়া আসিয়াছে যে, কোনো বিদেশীয় বিজাতীয় সাধু ব্যক্তি যদি আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়া প্রীতিপূর্বক আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন তবে কোনো হিন্দুগৃহ তাঁহাকে সমাদরের সহিত অসংকোচে স্থান দেয় না, তাঁহাকে দ্বারস্থ কুকুরের ন্যায় মনে মনে দূরস্থ করিতে ইচ্ছা করে; এই অমানুষিক মানবঘৃণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলঙ্কের কারণ নহে? অবশেষে আমাদের শ্মশানকেও আমাদের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকটে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব? জীবিতকালে আমাদের গৃহে পরদেশীর স্থান নাই। মৃত্যুর পরে আমাদের শ্মশানেও কি পরদেশীর দগ্ধ হইবার অধিকার থাকিবে না?··এই সুইডেনদেশীয় নিরীহ প্রবাসী ·পাছে কোথাও অনধিকারপ্রবেশ হয়,··এইজন্য তিনি সর্বত্র সর্বদাই ত্রস্ত সতর্ক বিনম্রভাবে একপার্শ্বে অবস্থান করিতেন। সেই দয়ালু সহৃদয় মহাশয় ব্যক্তি কাহারও কোনো অপকার করেন নাই, কেবল পরাজিত পরধর্মীর হিতচেষ্টায় আপন জীবনপাত করিয়াছেন মাত্র।··এই প্রবাসী যুবক মৃত্যুকালে পবিত্র আর্যভূমির নিকটে কোন্ অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিলেন? আমাদের সুপবিত্র সংস্পর্শ, না, আমাদের দুর্লভ আত্মীয়তা?··

১ বিহারীলাল, সাধনা ১৩০১ আষাঢ়। দ্র. আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯।

২ বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য, সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ, (১৮৯৪ অগস্ট), পৃ. ২৫০-৬০।

তিনি সুইডেনের উত্তরপ্রদেশ হইতে আসিয়া কলিকাতার যে শ্মশানে 'হাড়ি ডোম'[১] প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষিদ্ধ নহে সেই শ্মশানপ্রান্তে ভস্মসাৎ হইবার অধিকার চাহিয়াছিলেন মাত্র।"

বহুকাল পরে সুইডেন দেশ হইতে তিনি যখন নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তখন বক্তৃতাকালে এই সহৃদয় সুইডিশ যুবকের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। বহুবার তাঁহার মুখে এই যুবকের কথা শুনিয়াছি।

এই মাসেই 'অনধিকার প্রবেশ' নামক গল্পটি লেখেন। হামারগ্রেন্ হিন্দুসমাজে অনধিকার প্রবেশ অধিকার চাহিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত গল্পের জয়কালীর সকল আচার-বিচার ধ্বংস হইয়া গেল যখন অপবিত্র শূকর উন্মত্ত ডোমদের হাত হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহারই পরম পবিত্র মন্দিরে জীবন রক্ষার জন্য আশ্রয় লইল। "এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজ নামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।"

আষাঢ়ের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে দেখা যায়; এক পত্রে[২] লিখিতেছেন (১৩০১) "সবে দিন-চারেক হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই—মনে হচ্ছে, আজই যদি কলকাতায় যাই তা হলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব।"

সেখানে বই পড়িতেছেন নানা রকমের; J. E. Gore লিখিত *The World in Space* (1894) নামে জ্যোতিষ সম্বন্ধে বই সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে—জুন মাসেই কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন। আর পড়িতেছেন *Criticism on Contemporary Thought and Thinkers*।[৩] এমন সময় "তাঁহার মাথায় একটা হ্যাপি থট এসেছে।" লিখিতেছেন, "পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যা হোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর-কিছু না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে।"[৪] এই দিনেই তিনি তাঁহার অমর গল্প 'মেঘ ও রৌদ্রে'র পত্তন করিয়াছেন—"আজ সকালবেলায় গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে।"

'মেঘ ও রৌদ্র' লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা জাগিতেছিল। আমরা যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন পথে-ঘাটে ইংরেজের হাতে দেশীয়দের অপমান, সাহেবদের পদাঘাতে প্লীহা-বিদারণ প্রভৃতি ঘটনা কাগজপত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। রবীন্দ্রনাথ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দুই-একটি উৎপীড়নের ঘটনা এই গল্পের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ঘটনা দুইটি গল্পের নায়ক শশিভূষণের জীবনেতিহাসের

১ "পাঠকগণ মনে করিবেন না আমরা ঘৃণা প্রকাশ পূর্বক হাড়ি ডোম ইত্যাদি নামোল্লেখ করিতেছি, আমরা সংবাদপত্রের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি।"—কবিকৃত পাদটীকা।

২ ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ২৪শে জুন ১৮৯৪।

৩ ছিন্নপত্র, ২৬শে জুন ১৮৯৪।

৪ ছিন্নপত্র, ২৭শে জুন ১৮৯৪।

অন্তর্গত। প্রথম ঘটনাটি হইতেছে এই যে, একখানি স্টীমারের পাশ দিয়া একখানি দেশী নৌকা চলিতেছিল, দেশী নৌকার মাঝি একখানি পালের উপর দুইখানি ক্রমে তিনখানি পাল তুলিয়া স্টীমারের সহিত পাল্লা দিয়া তাহাকে পিছাইয়া চলিয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব আগ্রহভরে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, স্টীমার নদীর বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।" এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের পাঠকের নিকট সুপরিচিত বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।

'মেঘ ও রৌদ্রে'র অপর ঘটনাটি হইতেছে এই: পুলিশ সাহেব তাঁহার নৌকায় করিয়া যাইতেছেন। দুই নদীর মোহনার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা একটা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। একপার্শ্ব দিয়া নৌকা চলাচলের পথ দেওয়া আছে। সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ সাহেবের মাঝিরা জালের উপর দিয়া নৌকা চালাইয়া লইয়া গেল; জাল হালে বাধিয়া গেল; কিঞ্চিৎ বিলম্বে ও চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল। পুলিশ সাহেব অত্যন্ত গরম ও রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্তি দেখিয়াই জেলেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাহার মাল্লাদিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত আট শত টাকার জাল কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

রবীন্দ্রনাথের মন বহুদিন হইতে ইংরেজের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বরাবর দেখিয়াছেন যে বিদেশী যখন উৎপীড়ন করে, দেশীয়রা তাহা নীরবে সহ্য করে। অত্যাচার যে করে ও অত্যাচার যে সহে উভয়ের মধ্যে কে বেশি অপরাধী বলা কঠিন, কারণ এইসব অত্যাচারের প্রযোজক ইংরেজ, কিন্তু সম্পাদক দেশীয় লোক। শশিভূষণ ইংরেজের কাছে বেশি, না দেশীয় লোকের হাত হইতে বেশি লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন। কিন্তু এই গল্পটি আমরা যেভাবে দেখাইলাম আসলে উহা সেরূপ নহে, কারণ এইসব ঘটনা গল্পের সৌন্দর্যকে আচ্ছন্ন করে নাই; 'বধূ হে ফিরে এস' এ গান[1] কেবল শশিভূষণের কর্ণে নয় আজও সকল পাঠকের কর্ণেই ধ্বনিত হইতেছে।

যে-মনোভাব হইতে 'মেঘ ও রৌদ্রে'র ঘটনাগুলি লিখিয়াছেন সেই মনোভাব হইতে 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধটি লেখেন। ইংরেজ অপমান করে সেজন্য সে নিন্দার্হ; কিন্তু যাহারা সেই অপমানের প্রতিকার করিতে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগকেও তিনি শ্লাঘার পাত্র মনে করেন না। এই সময়ে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট বেট্‌সন বেল্ এক মুহুরিকে প্রহার করেন। তাহা লইয়া মোকদ্দমা হয়। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, "হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা।"

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে লাগিল প্রহারটা নয়, তাঁহার বাজিল বাঙালি ব্যারিস্টারের অপমানকর স্বীকারোক্তি; ব্যারিস্টার বলিয়াছিলেন, মুহুরি-মারা কাজটা ইংরেজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ বেল সাহেব জানিতেন যে মুহুরি তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারিবে না। এই শেষোক্ত বিষয়টির উপর ব্যারিস্টার জোরঃ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারের এই কথাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লিখিলেন, "যথেষ্ট অপমানিত হইলেও একজন মুহুরী কোনো ইংরেজকে ফিরিয়া মারিতে পারে না—এই কথাটি ধ্রুব সত্যরূপে স্বীকার করা এবং ইহারই উপর ইংরেজকে বেশি করিয়া দোহাই করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অনাবশ্যক এবং লজ্জাজনক আচরণ।"[2]

১ এই গানটিই কবি রাণাঘাটে নবীনচন্দ্রকে শোনান (১৮ ভাদ্র ১৩০১?) এবং একটি অনুলিপি দেন।

২ অপমানের প্রতিকার, সাধনা ১৩০১, ভাদ্র।

এই কথাটাই আর একদিন লিখিয়াছিলেন—

অন্যায় যে করে; আর অন্যায় যে সহে
তবু ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

বাঙালি বিচারক-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও বাঙালির মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমা হইলে অপরাধী সাহেবকে ভীতভাবে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেন, আর বাঙালিকে কিভাবে শাস্তি দেন তাহার উদাহরণ তো 'মেঘ ও রৌদ্রে' আছে। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন, "আমাদের স্বজাতিকে যে-সম্মান আমরা নিজে দিতে জানি না, আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরেজ আমাদিগকে যাচিয়া সাধিয়া দিবে।·· এক বাঙালি যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালি যখন তাহা কৌতূহল-ভরে দেখে এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকারসাধন বাঙালির নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না— এ কথা যখন বাঙালি বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজেদের স্বভাবের মধ্যে, গবর্নমেণ্ট কোন আইনের দ্বারা বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবে না।" সেইজন্য শশিভূষণ পুলিশ সাহেবকে মারিয়া পাঁচ বৎসর জেল খাটিল, কোনো সাক্ষীর সহায়তা পায় নাই।

অপমান যে কেবল ইংরেজ বাঙালিকে করিতেছে তাহা নহে; সমাজের মধ্যে যে-অপমান নিত্য মানুষকে টানিয়া টানিয়া হীন পঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছে, তাহার উদাহরণও লেখক দিলেন। "আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চ নীচে বিভক্ত, যে-ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে, সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে।"

রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো ব্যাধির মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবল একপাশ হইতে তাহা দেখিতে পারেন না। সেইজন্য তিনি ইংরেজকৃত অপমানের প্রতিকার ইংরেজের বিশেষ গুণের মধ্যে অনুসন্ধান না করিয়া দেশবাসীকে জাগ্রত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। এই প্রবন্ধ লিখিত হয় স্বদেশী যুগের দশ বৎসর পূর্বে। বাংলার জাতীয় আত্মসম্মান উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি সহায়ক তাহা তাঁহার প্রবন্ধ গল্প কবিতা গানগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে পাঠ করিলেই পাঠকের কাছে পরিস্ফুট হইবে। যাহাই হউক এই যুগের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি পরবর্তী পরিচ্ছেদে একত্র আলোচিত হইবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সত্তার সবটাই সাহিত্য, রাজনীতি ও জমিদারি নহে। রবীন্দ্রনাথ গৃহস্থ বন্ধুবৎসল স্বজনপ্রিয়; সেসব কথা উপেক্ষা করিয়া একমাত্র সাহিত্যিক তুরীয়তার মধ্যে তাঁহাকে দেখাইতে গেলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বুঝা যাইবে না; ব্যক্তিসত্তার সমগ্র চিত্রখানি না পাইলে তাঁহার কাব্যসৃষ্টির মানসিক পটভূমিও আবিষ্কৃত হইবে না; সেইজন্যই মাঝে মাঝে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে দেখা দরকার।

১৮৯৪তে প্রমথ চৌধুরী ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলাত যান; সেই বৎসর চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফেরেন; তখন রবীন্দ্রনাথের সহিত চিত্তরঞ্জনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে অনেক সংবাদ তাঁহার নিকট হইতে পান এবং এক পত্রে কলিকাতার বহু সংবাদ তাঁহাকে বিলাতে সরবরাহ করেন। তিনি লিখিতেছেন যে, "দিনটা খুব সুদীর্ঘ এবং মেঘস্নিগ্ধ— সন্ধ্যাবেলাটি ঘন অন্ধকার রিমঝিম বর্ষণে বেশ জমাট। প্রায় সে সময়টা বহুবিধ আত্মীয়-বন্ধুমণ্ডলী-পরিবৃত হয়ে পঞ্চাশ নম্বর পার্ক স্ট্রীটেই [সত্যেন্দ্রনাথের বাটিতে] যাপন

করা যায়।··গত দুদিন ধরে শারাড্[১] অভিনয় চল্‌চে, তাতেও আমাদের বর্ষার সভা সরগরম হচ্চে। এর থেকেই কতকটা বুঝতে পারবে পঞ্চাশ নম্বরে উনপঞ্চাশ পবন পূর্ব্ববৎ প্রবল প্রতাপে প্রবহমান।"[২]

এই সময়ে 'রাজা ও রানী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়াছে এবং 'কড়ি ও কোমলে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রেসে গিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে 'রাজা ও রানী'র বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছিল, আয়তনে কমিয়া প্রায় অর্ধেক দাঁড়ায়। 'কড়ি ও কোমলে'র বহু অবান্তর কবিতা বাদ যায়। আসল কথা কবির উচ্ছ্বাসের মুহূর্তের পর যখন তাঁহার আর্টিস্ট সত্তা লেখাগুলিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখে, তখন সেসব রচনার যথাযথ স্থান নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু বর্ষাকালে কবি কলিকাতায় থাকিতে চান না, তাই পূর্বোক্ত পত্রেই লিখিতেছেন "সেখানে [শিলাইদহে] বর্ষাটা বোটের মধ্যে একাকী যাপন করতে হবে। অনেকগুলি কেতাব এবং গুটিকতক খালি খাতা সঙ্গে যাবে।"

আষাঢ়ের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন ও সেখানে থাকিবার সময়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (১৪ শ্রাবণ ১৩০১) উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐদিন বাংলা পারিভাষিক শব্দ-প্রণয়নের জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়, তাহাতে সভাপতি নির্বাচিত হন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সহকারী সভাপতি হন নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ১৩০১ সালের গোড়ায় কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদ্-সৃষ্টির শুরু হইতেই রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। আজ 'সাহিত্য-পরিষদ্' বলিতেই আমাদের মনে যে-সুরম্য অট্টালিকা ও বিরাট গ্রন্থাগার প্রভৃতির কথা জাগে, তখন সেসব কিছুই ছিল না; শোভাবাজার রাজবাটীর একটি প্রকোষ্ঠে কয়েকজন মিলিয়া সভা করিতেন, নিজস্ব গৃহ বলিতে পরিষদের তখনো কিছু হয় নাই।

কলিকাতায় শ্রাবণের সপ্তাহ তিন থাকিয়া পুনরায় উত্তরবঙ্গে আসিলেন। অচিরেই পট পরিবর্তন হইয়া গেল— পুনরায় শিলাইদহে নদীবক্ষে একটি উন্মুক্তবাতায়নে তরণীর মধ্যে একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভাতে পত্র-লিখনে নিযুক্ত দেখা গেল।[৩]

পদ্মার উপর বোটের মধ্যে যে-রবীন্দ্রনাথ বাস করেন, আর জমিদারির কাছারি-বাড়িতে গিয়া যে-রবীন্দ্রনাথ উপবেশন করেন— তা যেন দুইটি পৃথক সত্তা। নদী 'পরে নৌকায় বাস করেন কবি ভাবুক, ঠাকুরবাড়ির বিষয়ভোগী জমিদারপুত্র বাস করেন কুঠিবাড়ির দরবারে। কবিচিত্তে সর্বদাই এই দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্ব; লোকেন পালিতকে এক পত্রে লেখেন "আমার নিজের মধ্যে যে একটা গৃহবিচ্ছেদ আছে সেটা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করি

১ শারাড্ অভিনয়—Acted Charade. Half-a-dozen or so of the company retire and select a certain word; let us suppose 'memento'. The next thing done is to take the first syllable 'me' and arrange a little scene and dialogue, each member taking a certain part. . . . This being accomplished, the amateur actors return and begin the performance, the rest of company consisting the spectators. Care is taken to mention conspicuously, and yet not obtrusively, in the course of the dialogue, the word 'me', which is the object of the scene. On its conclusion they repeat the process for the syllables 'men' and 'to', and for the whole world 'memento'. The company are then asked to guess the word. A variation is to dress up and act parts in dumb show to illustrate a word. *Chambers's Encyclopaedia* III, p. 279.

২ চিঠিপত্র ৫। ১৬ জুন ১৮৯২।

৩ ছিন্নপত্র, ৪ অগস্ট [১৮৯৪] বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২, পৃ. ২৩১।

না।" ইচ্ছা না-করিলেও রচনার মধ্যে, ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ হইয়াই পড়ে। একদিনের পত্রে লিখিতেছেন, "আমার মধ্যে যে দুটি প্রাণী আছে, বাইরের আমি এবং আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা, এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল ক'রে বসে থাকি।"[১] তিনি যেন অনুভব করিতেছেন দুইটি পৃথক সত্তা পাশাপাশি বিরাজিত।

নদীবক্ষের নিরালায় বসিয়া রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী হইতে বেদান্ত গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে মনে নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। বেদান্ত সম্বন্ধে স্বল্প আলোচনা করিয়া, একদিন পত্রে লিখিতেছেন যে, "সমস্তই ছায়ারই মতো, মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি· · এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি এ কথা কিছুতেই মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন, জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করাতে দিনের বেলায় যে-একটা দৃঢ় বন্ধনজাল থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় ও সৌন্দর্যময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে। যখন জগৎটাকে একেবারে নিছক মায়া ব'লেই নিশ্চয় জানব তখনই মুক্তির বাধা থাকবে না। এ কথাটা আমি ঈষৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি; হয়তো কোন দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।"[২] ইহারই পরে মনে হইতেছে বেদান্তের antithesis বৈষ্ণব-পদাবলীর কথা; "প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ এই, প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়, এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন। বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"[৩]

এই দুই পত্রখণ্ড হইতে রবীন্দ্রনাথের মূল ধর্মতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়; এক দিকে বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের আকর্ষণ— যাহা সব-কিছুকেই মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করে, অপর দিকে বৈষ্ণব ধর্মের রসলীলা— যাহা সব-কিছুকেই সুন্দর ও অনির্বচনীয় শোভায় সর্বইন্দ্রিয়ের দ্বারে উপস্থাপিত করে। এক দিকে কঠোর যুক্তিবাদ— অপর দিকে ভক্তিবাদ: এই দুইয়ের দ্বন্দ্বই মানুষকে ভাবুক ও চিন্তাশীলরূপে সৃষ্টি করিয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তি-মার্গের যুগপৎ সাধনার জন্য প্রস্তুতি হইতেছে। শান্তিনিকেতনের উপদেশমালায় এইসব তত্ত্ব নানাদিক হইতে আলোচিত হইয়াছে— যথাস্থানে সেসব কথা আসিবে।

আমাদের মনে হয় কবির এই মানসিক দ্বন্দ্বের অবস্থায় 'অন্তর্যামী' (১৩০১ ভাদ্র) কবিতা লিখিত হয়।[৪] কিছুকাল হইতেই তাঁহার ভিতরে এই সংগ্রাম চলিতেছে; তিনি লিখিয়াছিলেন, "নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারী ভয় হয়; কী করতে পারব না-পারব কিছুই জোর করে বলতে পারি নে; · · জানি নে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব— কত কী অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটছে— আমি দেখতেও পাচ্ছি নে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করছে না; অথচ সবসুদ্ধ নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে · · মনে করছি, আমি একজন আমি! · · আমি· · নিজেকে কিছুই জানি নে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো; · · কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত। কেবল কী বাজে সেইটেই জানি।"[৫]

১ ছিন্নপত্র ১৬ অগস্ট ১৮৯৪।

২ ছিন্নপত্র ১৯ অগস্ট ১৮৯৪।

৩ ছিন্নপত্র ২৪ আগস্ট ১৮৯৪।

৪ অন্তর্যামী, সাধনা, ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক। দ্র. চিত্রা।

৫ ছিন্নপত্র, পতিসর, ২৮ মার্চ ১৮৯৪ (১৫ চৈত্র ১৩০০)।

ইংরেজ কবি শেলী তাঁহার Defence of Poetry প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "Man is instrument over which a series of external and internal impressions are driver, like the alternations of an ever-changing wind over an Aeolian lyre, which move it by Their motion to ever-changing melody." রবীন্দ্রনাথের 'আমারে করো তোমার বীণা' ভাবনা হইতে লিখিয়াছিলেন 'অন্তর্যামী' কবিতাটি। ১৮৯৪, ২৫শে সেপ্টেম্বরের পত্রে লিখিয়াছেন "এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী-নামক একটি কবিতা লিখেছি, তাতে আমি আমার অন্তর-জীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।" —ছিন্নপত্র

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

প্রায় দশ বৎসর পরে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য যে-আত্মচরিত লেখেন, তাহাতে 'অন্তর্যামী' কবিতাটির দীর্ঘ ব্যাখ্যা আছে। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

বহু শতাব্দী পূর্বে রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট এই ধরণেরই কথা কি বলেন নাই যে তিনি যন্ত্র, যন্ত্রী তাঁহাকে চালাইতেছে—

রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাও, তেমত চাহি নাহিবার ॥ ১৩২ ॥
মোর জিহ্বা বীণা যন্ত্র, তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি ॥ ১৩৩ ॥[১]

উত্তরবঙ্গে জমিদারির কাজে ঘোরাঘুরি করিলেও কলিকাতায় কবিকে প্রায়ই আসিতে হয়। সেখানে স্ত্রী পরিবার আছে—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ আছে— বন্ধুবান্ধব আছে। এই আসা-যাওয়ার সময় একবার একদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে রাণাঘাটে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট নবীনচন্দ্র সেনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে দেখা গেল— বোধ হয় তারিখটা ছিল ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।[২]

নবীনচন্দ্র তাঁহার 'আমার জীবন' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড) লিখিতেছেন, "তিনি যখন গাড়ি হইতে নামিলেন, দেখিলাম সেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি সুন্দর, কি শান্ত, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ, মস্তকের মধ্যভাগে বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা, কুঞ্চিত অলকশ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণ দর্পণোজ্জ্বল ললাট; ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব শ্মশ্রু শোভান্বিত সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণ চশ্‌মা। বর্ণগৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের কথা মনে পড়ে।

১ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

২ ১৮ ভাদ্র ১৩০১; এই তারিখটা দিবার কারণ রবীন্দ্রজীবনী চতুর্থ খণ্ডের সংযোজন অংশে আলোচিত হইয়াছে।

পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরান ও রেশমী চাদর। চরণে কোমল পাদুকা, ইংরাজী পাদুকার কঠিনতার অসহ্যতা ব্যঞ্জক।"

রবীন্দ্রনাথ সদ্যরচিত একটি কীর্তনের গান নবীনচন্দ্রকে গাহিয়া শোনান এবং পরে তাঁহাকে অনুলিপি করিয়া পাঠাইয়া দেন; সেই গানটি হইতেছে— 'এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস'। গানটি 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প-পাঠকের নিকট সুপরিচিত।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাস দুটি নিরন্তর চলাফেরা করিতেছেন; ভাদ্র মাসের শেষদিকটা সাহাজাদপুরের কুঠিতে আসিয়া উঠিলেন (২১ ভাদ্র)। লিখিতেছেন, "অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস ক'রে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড়ো ভালো লাগে।· ·আজ সকালে ব'সে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম;[১] বড়ো ভালো লাগছিল। ছড়ার রাজ্যে আইনকানুন নেই, মেঘরাজ্যের মতো।"[২] এই ছড়া প্রবন্ধ সাধনায় "মেয়েলি ছড়া"[৩] নামে প্রকাশিত হয়।[৪] রবীন্দ্রনাথ দশ বৎসর পূর্বে দেশবাসীকে বাংলার গ্রাম্যসংগীত সংগ্রহ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া স্বয়ং ছড়া-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। এতকাল পরে সাহিত্য-পরিষদের প্রেরণায় তিনি লোকসাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাংলার আদিম কাব্য সাহিত্যের নাম হইতেছে 'ছড়া'; রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সম্মুখে ছড়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ধরিলেন। গ্রাম্য ছড়া যাহাকে কেহ কোনোদিন কোনো প্রকার সমাদর দেখায় নাই তাহা আজ রবীন্দ্রনাথের লেখনীর সহায়তায় অপরূপ লাবণ্যে উদ্ভাসিয়া উঠিল। এই গ্রাম্য ছড়ার মধ্যে যে এত সৌন্দর্য থাকিতে পারে তাহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ঐন্দ্রজালিকের পক্ষেই দেখানো সম্ভব। তিনি বলিলেন, কাব্য-সমালোচক যদি কাব্যের শ্রেণীনির্ণয় ও অন্যান্য যুক্তিতর্ক বাদ দিয়া কাব্যপাঠজাত তাঁহার মনের আনন্দটুকুকে পাঠকশ্রেণীর মধ্যে পরিচালনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সমালোচনার একটি নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। তাঁহার মতে এইসকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। চিরত্ব-গুণে এ যেন শিশুর মত। শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য— তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে। আপনি জন্মিয়াছে এ কথা বলিবার একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমাদের মন সর্বদাই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া সর্বদাই এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। কিন্তু "যখন আমরা সচেতনভাবে কোনো-একটা বিশেষ দিকে লক্ষ করিয়া চিন্তা করি তখন এইসমস্ত· ·ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয়, আমাদের কল্পনা আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে।" মনের এই সজাগ অবস্থায় আমাদের অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতের অধিকাংশই যখন সমাচ্ছন্ন হয় তখনই সাহিত্য সৃষ্টি হয়; আর তাহার বিপরীত অবস্থায়

১ ছিন্নপত্র, ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।

২ মেয়েলি ছড়া, সাধনা ১৩০১ ভাদ্র-আশ্বিন, পৃ. ৪২৩-৭৪। লোকসাহিত্যে ইহা ছেলেভুলানো ছড়া নামে মুদ্রিত হয় (১৩১৪), দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৫৭৭-৬০৮।

৩ প্রবন্ধটি চৈতন্য-লাইব্রেরিতে ১৬ আশ্বিন (১৩০১) কবি পাঠ করেন। সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২, পৃ. ২৩৮। "কাল র-র সঙ্গে 'মেয়েলিছড়া' নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম তিনি বুঝতে পারেন নি।"

৪ কলিকাতার নিকটবর্তী ছেলেভুলানো ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি 'সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকায়' প্রকাশ করেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা, ১৩০১ মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ছেলেভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬।

মানুষ যাহা সৃষ্টি করে তাহাকে ছড়া বলা যাইতে পারে। সুদীর্ঘকাল শিক্ষার ও নিয়মের নিগড়ে যাহাদের মন বাঁধা তাহাদের সৃষ্ট শিল্প অশিক্ষিতপটু মানবমনের সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে। শিশুর মন অশিক্ষিত, মনের প্রতাপ তাহাদের অন্তরে ক্ষীণ, সুসংলগ্ন কার্যকারণসূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই আদিম মানবের বাল্যচিত্তের অসংবদ্ধ ছড়ার ছবি তাহার এত ভালো লাগে। সেইজন্য বোধ হয় ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তিনি যে রসাস্বাদ করিতেন ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা ও তৎনিকটবর্তী স্থানে গ্রাম্যছড়া সংগ্রহ করিতেছেন ; ধীরে ধীরে অন্যান্য জেলার উপভাষায় রচিত ছড়াও সংগৃহীত হয়। এই ছড়াগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় (১৩০১ মাঘ) প্রকাশিত হয়। এই সংগ্রহের জন্য যে-ভূমিকাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি : "আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে-রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যকর্ষণে মাটি হইতে যে-সৌরভ বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত কোমল দেহের যে-স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপ-জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে— সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন।

"শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদবশত সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে ; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুর-নিক্বণ ঝংকৃত হইতেছে। অথচ, আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

"ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে ; এইজন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাংলায় অনেক উপভাষা (dialect) লক্ষিত হইবে। ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল ; ইহারা দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।"

বাংলা সাহিত্যের এই একটি দিক তিনি খুলিয়া দিলেন, এবং তাঁহার পরে অনেক লেখক এইসব সংগ্রহে মন দিয়াছেন।

ছড়ার প্রতি কবির এই-যে আকর্ষণ তাহা বহুবৎসর পরে বৃদ্ধবয়সে তাঁহার নিজ কবিতার মধ্যে দেখা দিয়াছিল ; শেষজীবনে কবির মনে শিশুর চোখের রঙ, শিশুমনের সুর ফিরিয়া আসিয়াছিল। পুরাতন বিষয় লইয়া ছড়া সম্বন্ধে দীর্ঘ অলোচনা করিতেছেন বলিয়া মধ্যে বোধ হয় একটু প্রশ্ন উঠিয়াছে ; তাই দুই দিন পরে লিখিত ডায়ারিতে পুরাতন ও নূতন সৃষ্টি লইয়া বেশ একটি মনোজ্ঞ আলোচনা আছে, "পুরাতন প্রতিদিনই নূতন করে আসে। প্রকৃতি প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না— আমাদেরই সংকোচ বোধ হয়। আমাদের দীন ভাষা তার নিত্যব্যবহারের জীর্ণতাকে নবজীবনের উৎসধারায় প্রতিবার ধুয়ে আনতে পারে না বলেই রোজ এক ভাবকে নূতন করে দেখাতে পারে না। অথচ সকল কবিই চিরকাল উল্‌টে-পাল্‌টে একই কথা বলে আসছে। যারা ক্ষুদ্র কবি তারাই

জনস্রোতের আবর্ত হইতে নিজের মনকে দূরে রাখিয়া এই সাধনা চলিবে। এই সাধনা যিনি করিবেন তিনি হইবেন ভারতের নেতা, গুরু। এই প্রবন্ধ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে রচিত; এইসব রচনাই বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করিতেছিল।[১]

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যেই ইংরেজের স্বেচ্ছাচারিতা সংযত ও শাসক সম্প্রদায়ের কূটনীতিকে ব্যর্থ করিবার জন্য আত্মশক্তি সঞ্চয় ও আত্মসম্মান জাগ্রত করিবার নূতন আন্দোলন দেখা দিল মহারাষ্ট্রদেশে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইংরেজের অধীনতা সবশেষে স্বীকার করে শিখরা এবং তার পূর্বেই মারাঠারা। মারাঠাদের অধীনতার ইতিহাস তখনো শতাব্দী-কাল অতীত হয় নাই এবং তাহারা যে একদিন সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়া বৃটিশের সহিত পাঞ্জা লড়িয়াছিল, তাহা যে-কারণেই হউক এই বীর্যবান জাতি বিস্মৃত হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের জন্য নূতন প্রচেষ্টা দেখা দিল, সে-পথ ইংরেজের নিকট আবেদন-নিবেদন-প্রতিনিবেদন প্রেরণের পথ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সুতরাং তৎকালীন কন্‌গ্রেস হইতে অন্যরূপ। এই নূতন আন্দোলনের নেতা হইতেছেন বালগঙ্গাধর টিলক। তিনি মহারাষ্ট্রদেশে সকল বর্ণের হিন্দুদের লইয়া সার্বজনীন গণপতি-পূজা প্রবর্তন করেন; দশ দিন ধরিয়া এই উৎসব চলিত। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্র জাতির অতীত গৌরবকাহিনী, শিবাজী মহারাজের কীর্তি-কলাপ, তাঁহার ধর্মপ্রীতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর বক্তৃতা হইত। এই আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল সত্য, কিন্তু 'গোরক্ষণী সভা' স্থাপিত হইলে (১৮৯৩) সমস্ত আন্দোলনটা দেশের মধ্যে নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিল। হিন্দুদের মধ্যে অসংখ্য বর্ণভেদ থাকা সত্ত্বেও গোরক্ষা সম্বন্ধে সর্বশ্রেণী সর্ববর্ণের হিন্দুই একমত। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিজ্ঞেরা গোরক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন হিন্দুজাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইহাই হইতেছে ভারতের সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমি। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস -পাঠক মাত্রেই জানেন যখন কন্‌গ্রেস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সরকার বাহাদুর ইহাকে সুনজরেই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু দুই-তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই কন্‌গ্রেস সম্বন্ধে ইংরেজের মত ও ব্যবহারের যুগপৎ পরিবর্তন হইয়া গেল। সরকার বেশ বুঝিলেন কন্‌গ্রেসের বিশেষ কোনো কার্যকরী শক্তি নাই বটে তবে ইহাকে বাড়িতে দিলে বা ইহাকে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বী লোকদের সাধারণ মিলনক্ষেত্র হইতে দিলে ইংরেজের পক্ষে শাসন ব্যাপারে অসুবিধা হইবে। এইসব আলোচনা উত্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ইংরাজের আতঙ্ক'[২] শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন; বোধ হয় অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার লইয়া আলোচনা ছিল বলিয়া প্রবন্ধটি 'রাজা-প্রজা' গ্রন্থমধ্যে সংগৃহীত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের মধ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা দেখিতেছি আজ পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধানে পরিস্থিতির সামান্যই পরিবর্তন হইয়াছে। তবে তখন যাহা বিষবীজ রূপে রোপিত হইয়াছিল, আজ তাহা বিষবৃক্ষে পরিণত

১ "যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-নেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্বগৌরব মনে রাখিব ততদিন জাতি-বৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই; এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতি-বৈর আছে ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈর ভাবের জন্যই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে চেষ্টা করিতেছি। ইংরেজের নিকট, অপমানগ্রস্ত, উপহাসিত হইলে যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাঁহাদের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না— কেননা সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাত-বৈর ঘটিয়াছে।"
বঙ্কিমচন্দ্র হইতে উদ্ধৃত দ্র. 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল পৃ. ১২৩।

২ সাধনা ১৩০০ অগ্রহায়ণ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পরিশিষ্ট।

হইয়াছে এবং সেই বৃক্ষচ্ছায়ে বাসের ফলে সকলের মনে যে-বিষক্রিয়া হইতেছে তাহার ফলে আমরা পরস্পরকে দগ্ধ করিতেছি। ভেদনীতির সূক্ষ্ম অস্ত্রপ্রয়োগফলে সমস্ত দেশ আজ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত ও বিবাদী। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কন্‌গ্রেসটার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনোরূপে আঘাত করা হয় নাই। তাহার কারণ, ঢাকের উপরে ঘা মারিলে ঢাক আরও বেশি করিয়া বাজিয়া উঠে। কন্‌গ্রেসের আর-কোনো ক্ষমতা থাক বা না থাক, গলার জোর আছে— তাহার শব্দ সমুদ্রপার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে। সুতরাং এই নবনির্মিত জাতীয় জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া তাহাকে তলে তলে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কন্‌গ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে— এবং পাঠকদের নিকট সে কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা অনাবশ্যক বোধ করি।

"কিন্তু এতদিনে ইংরাজ এ কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্‌স্ তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিকাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্‌স্ তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে; মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কন্‌গ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।" ১৮৯৫-এ পুণা নগরীতে কন্‌গ্রেস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি। এবার পুণার মুসলমানরা কন্‌গ্রেসে যোগদান করিল না; ১৮৯৩-এ গোরক্ষা-সমিতি স্থাপিত হওয়ায় কন্‌গ্রেসের হিন্দুদের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য দায়ী ছিলেন লোকমান্য টিলক। এ ছাড়া মুসলমানদের তদানীন্তন নেতা স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করিতে পারিতেছিলেন না; মুসলমানের মুক্তির পথ তিনি জানিতেন ইংরেজ ও মুসলমানের আন্তরিক প্রীতিস্থাপনে তাহাদের সহিত বৈরিতা দ্বারা নহে। কাজী আবদুল ওদুদ স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের এই বিমুখভাবের কারণ 'বুঝে ওঠা কঠিন' বলিয়াছেন।[১]

সত্যই মুসলমানের ও ইংরেজের নূতন আতঙ্ক গোরক্ষণী সভা। হিন্দুজাতীয়তাবোধ এই গোমাতাকে আশ্রয় করিয়া যেরূপ আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে, তাহাতে গবর্নমেণ্ট শঙ্কিত, কারণ গোহত্যা-নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের গুর্খা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্যন্ত সকলেই একমত। গোমাতাকে কেন্দ্র করিয়া বোম্বাইতে ও বিহারের নানা স্থানে যেসব দাঙ্গা হইল তাহাদের প্রতি গবর্নমেণ্টের তীব্র দৃষ্টি গেল। মসজিদের সম্মুখে বাজনা নিষেধ করিয়া দিয়া 'খ্যাপা পুল নাড়িস নে' নীতি প্রবর্তিত হইল। বহুশত বৎসর পাশাপাশি বাস করিয়া হিন্দু-মুসলমান কাহারও মনে যে-তুচ্ছ ব্যাপারের কথা কোনোদিন উদিত হয় নাই, তাহাকে উস্‌কাইয়া দিয়া বিরোধের বীজ বপন করা হইল। সুতরাং বিরোধ প্রশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ গবর্নমেণ্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্নমেণ্ট বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে ঐ অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া থাকেন— এ বিশ্বাস এ দেশে অনেকেরই। "সার ওয়েডার্‌বর্ন লিখিয়াছেন, এই-সমস্ত উপদ্রবে গবর্নমেণ্টের কিছু হাত আছে; ল্যান্‌স্‌ডাউন বলেন, এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট। আমরা ইহার একটা সামঞ্জস্য করিয়া লই।"

'সুবিচার অধিকার' (সাধনা ১৩০১ অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধে এ-বিষয়ে আরও পরিষ্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন; "অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্নমেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।" ইহার

১ কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ পৃ. ১০২।

ফলে "উভয় সম্প্রাদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরও অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনোকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া এক পক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্য পক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।" কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কী। "দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে— আমাদের সে শক্তিও নেই। কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটা বৃহত্ত্ব ও বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড়ো কঠিন।"

রবীন্দ্রনাথ আর-একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন এই যে ইংরেজের আঘাতে হিন্দুর মন ক্রমশ পরস্পরের নিকট আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে ; কারণ "স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিতে পারে নাই। এইজন্য বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠা-স্থানকে অধিক আশঙ্কা করি।"

দেশের মধ্য হইতে দুই চারিজনকে এক-একটি বনস্পতির ন্যায় আপন অমোঘ মূলজাল চতুর্দিকে বিস্তারিত করিয়া দিয়া ভারতবর্ষের শিথিল মৃত্তিকাকে দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া ধরিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করিলেন। যথার্থ দেশসেবকের দেশসেবার সমস্যাগুলি দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে। যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ ; আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না— কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে। কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ত্ব ও স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তা-বশত আমাদের মধ্যে দুই-চারিজন লোকও যখন শেষ পর্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায় বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।"

দেশবাসী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মর্মান্তিক বিশ্লেষণ যে কত বড় সত্য কথা তাহা যাঁহারা গ্রামঅঞ্চলে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন। 'মেঘ ও রৌদ্র,' 'গোরা,' 'ঘরে বাইরে'তে তিনি এই সমস্যাটি খুব স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন।

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধের মধ্যে সব থেকে যে-জিনিসটা চোখে পড়ে, সে হইতেছে সুবিচার। সুবিচার পাওয়াটা প্রজার জন্মগত অধিকার। ন্যায়ান্যায়বোধ গবর্নমেন্টের থাকা উচিত— এই জনমত প্রবল হইলে প্রজার নিন্দাকে গবর্নমেন্ট শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু প্রাচ্যদেশে প্রতীচ্য দেশীয় শাসকদের ধর্মাধর্মবোধ অত তীব্র থাকিলে চলে না! তাঁহাদের এই ধারণা ক্রমেই প্রবল হইতেছে যে, "য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে, সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে।" সে-নীতির এত বৎসরেও যে কোনো পরিবর্তন হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। 'রাজা ও প্রজা'[1] শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসকদের এই মনোবৃত্তির নিন্দা করিয়াছেন। ইংরেজ ভারতবাসীকে বিশ্বাস করে না, তাই সামান্য ব্যাপারও সে সন্দেহের চক্ষে দেখে, বিদ্রোহের আশঙ্কা করে। বিহার প্রদেশে গাছের ছাপ হইতে বিদ্রোহ কল্পনা করিয়া ইংরেজরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিলাত-প্রবাসী প্রমথ চৌধুরীকে একখানি সমসাময়িক পত্রে[2] রবীন্দ্রনাথ লেখেন "ভারতবর্ষে Tree daubing বলে একটা ব্যাপার চলচে । সাহেবরা বেশ একটু ত্রস্তভাবে আছে।"

১ সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পরিশিষ্ট।

২ চিঠিপত্র ৫। ১৪ সংখ্যক। ১৬ই জুন ১৮৯৪।

"বেহার প্রদেশে গাছে ছাপ হইতে বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া অনেক ইংরেজি কাগজে এমন কথা বলা হইয়াছে, যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে কোনো কালেই যথার্থ প্রেমের সম্মিলন সম্ভব নহে।"[১]

'রাজনীতির দ্বিধা' প্রবন্ধে লেখক এই ধরণের কথা দিয়া রচনা শুরু করেন যে, য়ুরোপীয়রা য়ুরোপের মধ্যে যতটা সভ্য, বাহিরে ততটা নহে, এবং তাহার প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে না। আমাদের আলোচ্যপর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় মাটাবিলিদের উপর ইংরেজ বণিকদের যে-অত্যাচার চলিতেছিল, তাহার কিছু কিছু কাহিনী বিলাতী কাগজ 'ট্রুথ' হইতে কবি জানিতে পারেন। মাটাবিলিদের রাজা লবেঙ্গুলো[২] ইংরেজ মিশনারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কিভাবে সর্বস্ব হারাইয়া অজ্ঞাত অখ্যাতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহার একমাত্র তুলনা হয় মীরকাশেমের সঙ্গে। 'ট্রুথ' নামক পত্রিকায় এই কাহিনী পাঠ করিয়া কবির মনে যে-উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহাই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। সাম্রাজ্য শাসনে ধর্মনীতির সহিত রাজনীতির দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। নিজের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে এবং অন্যের অন্ন কাড়িব না এমন ধর্ম পৃথিবীতে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইংরেজের এই মহাসমস্যা সর্বত্র—দক্ষিণ আফ্রিকায় একভাবে, ভারতে অন্যভাবে। "অতএব পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক, মোটা-বেতনের ইংরাজ কর্মচারীকে এক্স্‌চেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেইজন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মাশুল বসানো আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাঙ্কাশিয়রের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসানো যাইতে পারে। তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পবলিক ওয়ার্কস্ কিছু খাটো করিয়া এবং দুর্ভিক্ষ ফণ্ড্ বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।··ধর্মনীতি এমন সংকটেও ফেলে!" রবীন্দ্রনাথের তখনো বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজের ধর্মবুদ্ধি আছে এবং সেইজন্যই আমাদের পক্ষে রাজনীতির চর্চা ও সভাসমিতি করা সম্ভব।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত অর্থনৈতিক সমস্যা যে বিশেষভাবে জড়িত এ কথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আবিষ্কার করা কঠিন হয় নাই, কারণ গ্রামের মধ্যে বাস করিয়া দরিদ্র প্রজাদের আর্থিক অবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেশীয় শিল্পোন্নতির পৃষ্ঠপোষক বটে কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্ট যখন রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য দেশীয় বস্ত্রের উপর আমদানী-শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন।[৩] দেশীয় কলওয়ালারা এবং রাষ্ট্রনীতিকরা গবর্নমেণ্টের এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিলেন, তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, এই শুল্ক স্থাপিত হইলে দেশীয় শিল্পের সুবিধা হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে ইহার ফলে কাপড়ের দাম চড়িবে এবং সেই চড়া দাম বস্ত্রক্রেতা দিবে, ব্যবসায়ী দিবে না।

বিলাতী বস্ত্র আন্দোলন করিয়া বন্ধ করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না; দেশী বা বিলাতীর দোহাই দিয়া সাধারণ মানুষকে চালানো কঠিন। এ ছাড়া পূর্বকাল হইতে অধুনা মানুষ অধিক পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছে। চরকা কাটিয়া যে-পরিমাণ সুতা হইত তাহাতে আজকালকার ন্যায় এত পর্যাপ্ত আচ্ছাদন লোকে পাইতে

১ রাজা ও প্রজা।

২ Lobengulaর কাহিনী যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা E. D. Moreলএর The Blackman's Burden পড়িতে পারেন; পৃ. ২৯-৫২। Lobengula (1833-94), King of the Matabeli, permitted the British South African Company to settle in Mashonaland. On account of his repeated attacks on the Mashonas, he was attacked by the British and after severe fighting was defeated. He died shortly afterwards, deserted by his own followers.

৩ আব্দারের আইন, সাধনা ১৩০১ মাঘ। প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এবং সাধনায় উহা স্বাক্ষরিত নহে। তবে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি তাঁহার রচিত বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন।

পারে না। রবীন্দ্রনাথ সংগঠনশীল কর্মের পক্ষপাতী; গঠনমূলক কার্যদ্বারা যাহাতে শিল্পের উন্নতি ও বাণিজ্যের প্রসার হয় সেইদিকে তিনি নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মনে রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিচিত্রনীতি, যাহা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিত্যনিয়ন্ত্রিত করিতেছে সেই বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন তর্ক ও বিচার চলিতেছে। বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টিকালেও এইসব বিচিত্র সমস্যা কবির মানসপটে উদিত হয়; কখনো উহাদের ছায়া যথাযথ পরিপ্রেক্ষণীতে পড়িয়া অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করে; কখনো বিকৃত পরিপ্রেক্ষণীতে আঘাত পাইয়া অসুন্দরকে মন্থন করিয়া তোলে। সাহিত্যের মধ্যে বিচিত্র নীতির প্রতিক্রিয়া চলিতেছে।

সাধনার সম্পাদক

আশ্বিনের (১৩০১) গোড়ায় রাজশাহীতে কয়েকদিন থাকিয়া কবি কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। গত মাসে 'অন্তর্যামী' বলিয়া যে-কবিতাটি লেখেন তাহারই ব্যাখ্যা যেন মনের মধ্যে ঘুরিতেছে; সেই কথাটা ইন্দিরা দেবীকে একখানা পত্রে লিখিতেছেন, "যে-আমাকে লোকে প্রশংসা করচে, সেই আমিই যে কবিতা লিখে থাকে এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না।· · যে সমস্ত ভাল কবিতা আমি লিখেছি, সে আমি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারিনে, তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কিনা সন্দেহ।"[১] কলিকাতায় কয়েকদিন আছেন কিন্তু প্রাণ ক্লান্তি অনুভব করে; সেখানে "ভাববার, অনুভব করবার, কল্পনা করবার," অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়· · ভিতরে ভিতরে দিনরাত্তির একটা অবিশ্রাম খুঁৎ খুঁৎ চলতে থাকে।[২] তাই বোধ হয় বোলপুর যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব; "সেখানে গাড়িবারান্দার ছাতের উপর বড় কেদারা পেতে একলাটি শরতের সন্ধ্যালোকে বোলপুরের দিগন্ত প্রাসারিত সবুজ মাঠের উপর আমার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাঁজগুলি খুলে দিয়ে তাকে বিস্তৃত করে দিতে পারব"— এই আশায় যাওয়া।

তখনকার শান্তিনিকেতনে দোতলা অতিথিশালা ও ব্রহ্মমন্দির ব্যতীত আর-কোনো ঘরবাড়ি আশে পাশে ছিল না। "এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে, শালবনের বেষ্টনে সমস্ত দরজা-খোলা জাজিম-পাতা দোতলার একলা ঘরে" বসিয়া তিব্বত সম্বন্ধে ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিতেছেন[৩]; এইখানে 'সাধনা' নামে একটি কবিতা লিখিলেন (৪ঠা কার্তিক ১৩০১)। এই কবিতাটির মধ্যে পূর্বোল্লিখিত 'অন্তর্যামী'র সুর নূতন ছন্দে ধ্বনিত হইয়াছে। শান্তিনিকেতনে শরতের সৌন্দর্য প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছেন। পত্রগুলির মধ্যে এই সৌন্দর্য ও মনের আনন্দ ও তৃপ্তির কথাই বারে বারে প্রকাশ পাইয়াছে। লিখিতেছেন, "আমি বস্তুর উপদ্রব এড়াবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই— প্রমোদের উত্তেজনার মধ্যে থাকলে আমার অন্তঃকরণ ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে— আমার মনের অন্তঃপুরের ভিতরে যেন কে একজন আছে, যে আমাকে বাইরের সংস্রবে আসতে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।"[৪]

মানুষ সম্বন্ধে এ কথা অতি সত্য। তিনি একখানি পত্রে নিজ চরিত্রেরই সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন,

১ ছিন্নপত্র, ২৯ সেপ্টেম্বর [১৮৯৪]। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২।

২ ছিন্নপত্র, ৯ অক্টোবর [১৮৯৪]। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২।

৩ বোধ হয় W. W. Rockhill লিখিত The Land of The Lamas গ্রন্থখানি ১৮৯১-এ প্রকাশিত হয়। ইহা অনুমান মাত্র।

৪ ছিন্নপত্র, ২৩ অক্টোবর [১৮৯৪]। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২।

"আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে, এবং ভেবে দেখতে দুঃখবোধ হয়— সাধারণতঃ মানুষের সংসর্গ আমাকে বড় বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়,· · আমার চারি দিকেই এমন একটি গণ্ডী আছে আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে পারি নে। লোকের মধ্যে আমি নতুন প্রাণী, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না— আমার যারা বহুকালের বন্ধু তাদের কাছ থেকেও আমি বহু দূরে।· ·অথচ মানুষের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাও নয়— থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে· · মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে, এমন নিতান্ত আত্মীয়লোকের সহবাস, যারা সংঘর্ষের দ্বারা মনকে শ্রান্ত করে দেয় না, এমনকি, যারা আনন্দদান করে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।"[১] বৎসরাধিককাল পূর্বে প্রমথ চৌধুরীকে এই ধরণের কথাই অন্যভাবে লিখিয়াছিলেন। "আমি বন্ধুবান্ধবদের থেকে ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। কেন বলতে পারি নে। নিশ্চয় আমারই দোষ। স্বভাবটা বোধ হয় ক্রমশই কুণো এবং আত্মন্তর হয়ে আসচে— ক্রমেই বিশ্বাস হচ্ছে অন্যের সহৃদয়তা এবং সহানুভূতির উপর নির্ভর করে সর্বদা দোদুল্যমান হওয়ার চেয়ে নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে নিভৃত হয়ে থাকায় সুখ না হোক্ স্বস্তি আছে।[২]

কবি শান্তিনিকেতনেই; কার্তিক মাসে হঠাৎ জোর বাদলা শুরু হয়; বৈষ্ণব কবিতা পড়িতে মন চায়, কিন্তু সাধনার জন্য লেখা চাই ই। "এমন দিনে কি হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিকাল প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছা করে।· · আজ একটি অর্ধ সমাপ্ত পোলিটিকাল প্রবন্ধ শেষ করতে হবে।"[৩] এই প্রবন্ধটি হইতেছে পূর্ব-আলোচিত 'সুবিচারের অধিকার।' সেটি সাধনার চতুর্থ বৎসরের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইল (১৩০১ অগ্রহায়ণ)।

কার্তিক (১৩০১) মাসটা শান্তিনিকেতনে একা একা কাটাইয়া গেলেন। অগ্রহায়ণ হইতে শিলাইদহে আছেন। এই মাসে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের জন্ম হয়। এই মাস হইতে সাধনার চতুর্থ বর্ষ শুরু হইলে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হইলেন। তিন বৎসর সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে বিলাতে লিখিতেছেন, "সুধী দিনকতক সাহিত্যের সাধনা ছেড়ে দিয়ে অন্যবিধ সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং সিদ্ধও হয়েছেন।"[৪] বোধ হয় ওকালতি পাস করিয়া আদালতে যাইতে শুরু করিয়াছেন; তাই এখন আর সাধনার প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ এবং মনোযোগ দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হইয়া মহোৎসাহের সহিতই প্রথম কয়েকমাস কাজ করিলেন। গল্প প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে লিখিতে শুরু করিলেন। কিন্তু গত তিন বৎসর একটি মাসিক পত্রিকার বহুবিধ চাহিদা মিটাইতে মিটাইতে তাঁহার মন-যে এত ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল তাহা অগ্রহায়ণ মাসে বুঝিতে পারেন নাই; তিন মাস যাইতে না যাইতে মাঘ মাসে শিলাইদহ হইতে ইন্দিরাদেবীকে লিখিতেছেন, "বছরের ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলেই ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়। কারণ, সম্বৎসর খেপামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর অপ্রমত্ততা বজায় রেখে চলা আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য।"[৫]

১ ছিন্নপত্র। বোয়ালিয়া ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ (৯ আশ্বিন ১৩০১), বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২ পৃ. ২৩৫-৩৬।

২ চিঠিপত্র ৫ম। সাজাদপুর ৮ শ্রাবণ [১৮৯৩]।

৩ ছিন্নপত্র। বোলপুর, ২৫ অক্টোবর [১৮৯৪], বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২।

৪ চিঠিপত্র ৫ম। কলিকাতা ১৬ জুন ১৮৯৪।

৫ ছিন্নপত্র, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫।

কিন্তু কাজ দুঃসাধ্য হইলেও করিতে হয়। যথানিয়ম প্রতিমাসে সাধনার নিত্য-নৈমিত্তিক খোরাক সরবরাহ করিয়া চলিলেন— কিন্তু এই এক বৎসর মাত্র— অর্থাৎ ১৮৯৪ সালটা (১৩০১ অগ্রহায়ণ - ১৩০২ কার্তিক)। শেষ কয়টা মাস আর যেন চলিতেছিল না; তাই দেখা যায় শেষ সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক একত্র প্রকাশিত হইল। অতঃপর কবি সাধনা হইতে বিদায় লইলেন এবং পত্রিকাও উঠিয়া গেল। কবিরও মন এখন অন্য দিকে ধাবিত হইয়াছে। সাধনার শেষ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রবন্ধ প্রসঙ্গকথা সাময়িক সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতি তো আছেই— ইহার উপর এ বৎসরের বৈশিষ্ট্য হইল গ্রন্থ-সমালোচনামূলক সাহিত্য-প্রবন্ধ। এই বিষয়ে আমরা পরে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব।

এ বৎসরে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দান দশটি ছোটগল্প।[১] রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকদের নিকট গল্পগুলি খুবই পরিচিত; সকলগুলিই ছোটগল্প— কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণ' কেবল গল্প নহে— উহা Phantasy; নায়ক-নায়িকাহীন, ঘটনাশূণ্য এরূপ গল্প বাংলাভাষায় নূতন সৃষ্টি— যদিও এই ধরণের ভৌতিক গল্প য়ুরোপীয় সাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল না।

এই বৎসরের প্রথম গল্পগুলির মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'বিচারক' হৃদয়বান পাঠকদের মনে বেশ দাগ রাখিয়া যায়; কিন্তু লেখক পাঠকগণকে এমন অসহায়ভাবে ফেলিয়া গেলেন যে, এক হিসাবে গল্প-দুইটি নাটকীয় রূপ লইয়াছে বলা যাইতে পারে। 'বিচারকে'র ঘটনাবলী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও আমাদের সম্মুখে ক্ষীরোদার নিদারুণ দুঃখময় জীবনের চিত্র নিমেষের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াই নিভিয়া যায়; কেবল কানে বাজে পতিতার আর্তনাদ ও প্রার্থনা— 'ওগো জজবাবু, দোহাই তোমার, উহাকে বলো আমার আংটিটি ফিরাইয়া দেয়।' জীবনে এত আঘাত ও এত দুর্গতির মধ্যে মৃত্যুর সম্মুখেও সে তার প্রথম যৌবনের প্রেমকে ভুলিতে পারে নাই। জজ বাহাদুরের দিকে তাকাইয়া বলিতে ইচ্ছা করে 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ।' আর, 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পের বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর অপরাধ নীরবে বক্ষে বরণ করিয়া স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

এই গল্প-দুইটিতে বাস্তবের তীব্রতা যে-ভাবে ফুটিয়াছে, 'নিশীথে' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পদ্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে একটা অদ্ভুত লিরিসজম্। উভয় গল্পে ঘটনার স্রোত ক্ষীণ, মনের লীলাতরঙ্গই পাঠককে অভিভূত করে। 'নিশীথের' মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার উদ্বাহ হইয়াছে; ক্ষুধিত পাষাণে বাস্তব নাই, সবই কল্পনা, বা বলা যাইতে পারে স্বপ্ন। উভয় কাহিনীতে বক্তারা তাহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিতেছেন, শ্রোতারা নীরব শ্রোতা মাত্র।

সাধনার শ্রাবণ (১৩০২) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'ক্ষুধিত পাষাণ'। এ কথা আজ প্রায় সর্ববাদীসম্মত যে, ক্ষুধিত পাষাণ রবীন্দ্রনাথের সেরা গল্পের অন্যতম। গল্পটি ঠিক কবে লিখিতে বলা যায় না, তবে কবে ইহা মনের মধ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায় ছিন্নপত্রের মধ্যে। এক বৎসর পূর্বে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কবি নিরন্তর উত্তরবঙ্গে যাওয়া-আসা করিতেছিলেন— বেশির ভাগ সময় কাটিত নদীবক্ষে নৌকার উপর। অনেককাল বোটের মধ্যে বাস করিয়া হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেদিনকার পত্রে (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) লিখিয়া

১ সাধনা ৪র্থ বর্ষ ১৩০১-০২। রবীন্দ্রনাথের দশটি গল্প প্রকাশিত হয়।

১৩০১: প্রায়শ্চিত্ত, অগ্রহায়ণ; বিচারক, পৌষ; নিশীথে, মাঘ; আপদ, ফাল্গুন; দিদি, চৈত্র। [রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯ খণ্ডে মুদ্রিত]।

১৩০২: মানভঞ্জন, বৈশাখ; ঠাকুরদা, জ্যৈষ্ঠ; প্রতিহিংসা, আষাঢ়; ক্ষুধিত পাষাণ, শ্রাবণ; অতিথি, ভাদ্র-কার্তিক, [রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০ খণ্ডে মুদ্রিত]।

১২৯৮ হইতে ১৩০২ এর মধ্যে ৪৩টি গল্প লিখিত হয়। ইহার মধ্যে হিতবাদীতে ৬টি (বা ৭টি) 'গল্প ও সাথী'তে (১৩০২ আশ্বিন) ১টি, অবশিষ্ট ৩৬টি সাধনায় প্রকাশিত হয়। কবির জীবিতকালে প্রকাশিত ৯০টি গল্প; তন্মধ্যে সাধনা পর্বে চার বৎসরে সর্বাধিক।

ছিলেন, "হঠাৎ বুঝতে পারি, এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল।" এখানকার দুপুরবেলার মধ্যে-যে একটা নিবিড় মোহ আছে তাহা তাঁহাকে খুবই আবিষ্ট করিতেছে। লিখিতেছেন, "কেন জানি নে মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরী হয়েছে।" কবির মন মধ্যযুগের দামাস্কস, সমরকন্দ, বুখারার মধ্যে সঞ্চরণশীল। আমার মনে হয় সেই দিন কবির মনে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের জন্ম হয়।

কবির কল্পনায় দামাস্কস, বুখারা ছিল, কিন্তু স্মৃতির মধ্যে ছিল আমেদাবাদের শাহিবাগের জজসাহেবের বাড়ি; বোধ হয় অস্তগামী মুঘলযুগে সেটা নির্মিত হয়। ১৩০৯ চৈত্র মাসে হাজারিবাগ থেকে এক পত্রে সতীশচন্দ্র রায়কে লেখেন, "প্রবাসীতে যে শাহিবাগের ছবি বাহির হইয়াছে, এই বাড়িতেই আমি বাস করিয়াছি এবং ইহাই ক্ষুধিত পাষাণের সেই বাড়ি।"[১] বৃদ্ধবয়সে 'ছেলেবেলা'য় লিখিয়াছেন, "আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছনফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর গল্পের।"

'ক্ষুধিত পাষাণ' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সময় সম্বন্ধে আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা মনে হয়। একবার কলিকাতা হইতে শিলাইদহে ফিরিয়া 'সবে দিন চারেক' হইয়াছে— কিন্তু কবির মনে হইতেছে দীর্ঘকাল; সেই সময়ে পত্রে লিখিতেছেন, "ভাবের তীব্রতা অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়; কোনো কোনো ক্ষণিক সুখদুঃখ মনে হয় যেন অনেক ক্ষণ ধরে ভোগ করছি।· স্বপ্নের মতো ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘ কালে এবং দীর্ঘ কাল ছোটো মুহূর্তে সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয়, খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম।"[২] ক্ষুধিত পাষাণ লিখিবার পূর্বে ছিন্নপত্র-মধ্যে এই 'কালতত্ত্ব' সম্বন্ধে আলোচনাটি পাঠ করিলে হয় তো ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের মনস্তত্ত্বের হদিশটা পাওয়া যাইতে পারে।

সাধনার শেষ গল্প 'অতিথি'[৩] ছিন্নপত্রের মধ্যে একদিন এই গল্পটির পটভূমিকা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "বসে বসে 'সাধনা'র জন্যে একেটা গল্প লিখছি— খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ-রৌদ্ররঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে এক মুহূর্তে বুঝে নিতে পারত।"[৪]

সাধনায় প্রকাশিত হয় নাই এমন-একটি গল্প হইতেছে 'ইচ্ছা-পূরণ', এইটি প্রকাশিত হয় 'সখা ও সাথী' নামে ছেলেদের মাসিক পত্রিকায় (১৩০২ আশ্বিন)। এই পত্রিকার সম্পাদক ভুবনমোহন রায় রবীন্দ্রনাথের এক সংক্ষিপ্ত জীবনী এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন (শ্রাবণ সংখ্যা); রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সংখ্যায় এই জীবনীর কয়েকটি ঘটনা শুদ্ধ করিয়া এক পত্র দেন। আমাদের মনে হয় ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনী ও প্রথম আত্মপরিচয়। এই পত্রিকার

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৫ মাঘ-চৈত্র পৃ. ১২৪।

২ ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ২৪শে জুন, ১৮৯৪।

৩ ছিন্নপত্র, সাজাদপুর, ২৮ জুন ১৮৯৫ (১৫ আষাঢ় ১৩০২)।

৪ অতিথি, সাধনা ৪র্থ বর্ষ ১৩০২ ভাদ্র-কার্তিক পৃ. ৪৩০-৪৫৬। পূর্ব সংস্করণে 'ক্ষুধিত পাষাণ' লিখিয়াছিলাম; শ্রীপুলিনবিহারী সেন আমাকে জানান যে এটি 'অতিথি' হইবে।

কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের কাগজের জন্য একটি গল্প দিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে কবি 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটি লিখিয়া পাঠান।[১]

গদ্য গল্প ছাড়া শিলাইদহে বাসকালে কবিতায় দুইটি গল্প (story in verse) লেখেন— ব্রাহ্মণ (৭ ফাল্গুন ১৩০১) ও পুরাতন ভৃত্য (১২ই)। এমন দুইটি কবিতাও সমালোচকদের তিক্ত অভিমতের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইতে পারে। 'ব্রাহ্মণ' কবিতার মধ্যে উপনিষদের আখ্যানাংশের যথাযথ অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই এই হইল অভিযোগ ; অজ্ঞাতকুলশীল বালককে গুরুর পক্ষে শিষ্যরূপে গ্রহণ করাটা হিন্দু সংস্কারে বাধে বলিয়া একদল ঘোর আপত্তি তুলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির মধ্যে মাতৃত্বের যে-অপরাজেয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিপ্রববাদকে প্রচণ্ড সমর্থন করিয়াছিলেন, তার মর্ম ধর্মধ্বজীরা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এই সুন্দর সৃষ্টিতে পঙ্কতিলক লেপন করিতে লাগিলেন।

জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে
গোত্র তব নাহি জানি'—

এই উক্তির মধ্যে পবিত্র মাতৃত্বের অসংকোচ স্বীকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে ; unmarried mother বা ভর্তৃহীনা নারীর সন্তানকে সম্মানদান করিতে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের আপত্তি ছিল না— আপত্তি হইতেছে আধুনিক কালের ব্রাহ্মণের ; ইঁহাদের বিবেচনায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু ছিলেন না। বিদুর কলিতে জন্মগ্রহণ করিলে কোথাও আসন পাইতেন না।[২]

'ব্রাহ্মণ'-এর দুর্গতি হইল প্রাচীনপন্থীদের হস্তে, আর 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি' কবিতাদ্বয়ের দুর্গতি হয় নবীনতমদের হস্তে। এই কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বুর্জোয়া মনোবৃত্তি আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করা হয়। রচনার দোষগুণ বিচার করিয়া নিন্দাবাদ হইলে দুঃখের কারণ থাকে না, কারণ রচনা ভালোমন্দ দুই-ই হইতে পারে। কিন্তু লেখার মধ্যে কতখানি হিন্দুয়ানী আছে বা নাই, কতখানি সমাজতন্ত্রবাদ আছে বা নাই— তাহা দিয়া যখন বিচার হয়— তখন সে-বিচারকে আর সাহিত্য-বিচার বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের সে-দুর্গতির অবসান এখনো হয় নাই।

১ ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে পত্র ৬ চৈত্র ১২০২। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ পৃ. ৪। ইচ্ছাপূরণ গল্পটি ১৩২৫ সালে নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি সম্পাদিত 'পার্বনী' বার্ষিকে প্রকাশিত হয় ; পরে বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'গল্পগুচ্ছ' ভুক্ত হয়।

১৩০২ আশ্বিন মাসে 'মুকুল' পত্রিকায় 'কাগজের নৌকা' কবিতাটি বাহির হয়।

২ দ্র. ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ খণ্ড। ১। সত্যকাম জবাল মাতা জবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'হে পূজনীয়ে! আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিব। আমার কি গোত্র।' ২। জবালা তাহাকে বলিল, 'হে তাত! তোমার কোন গোত্র তাহা জানি না। যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া পরিচারিণী অবস্থায় (কিংবা যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহুলোকের পরিচর্যা করিয়া) তোমাকে লাভ করিয়াছি। আমি জানি না তোমার কোন গোত্র। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম জাবাল।' ৩। সত্যকাম হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিল, 'আপনার নিকট আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব ; এইজন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।' ৪। গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সৌম্য! তুমি গোত্রীয়।' সত্যকাম বলিল, 'হে (ভগবান)! আমি কোন গোত্রীয় তাহা আমি জানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমি যৌবনে' ইত্যাদি।' ৫। গৌতম সত্যকামকে বলিলেন, 'অব্রাহ্মণ কখনও এ প্রকার বলিতে সমর্থ হয় না। তুমি সমিধ কাষ্ঠ লইয়া আইস, আমি তোমাকে উপনীত করিব (অর্থাৎ তোমার উপনয়ন হইবে) ; তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।" তাহার উপনয়ন হইবার পর তিনি ৪০০ দুর্বল ও কৃশ গো বাহির করিয়া বলিলেন, 'হে সৌম্য, এই সমুদয়ের অনুগমন কর।' তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিবার সময় সত্যকাম বলিল, 'সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হইলে আমি ফিরিব না। এইরূপে সে বহু বর্ষ প্রবাস করিল, তাহাদের সংখ্যা যখন সহস্র হইল…।' দ্র. ছান্দগ্যোপনিষৎ— শ্রীমহেশচন্দ্র (ঘোষ) বেদান্তরত্ন কর্তৃক বঙ্গানুবাদ। শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত (১৯২৫) পৃ. ২২২-২৭।

সাধনার শেষ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র গদ্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে পুস্তক-সমালোচনা ব্যপদেশে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা। বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে পুস্তক-সমালোচনার একটি নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্যের সমালোচনা। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তার পর ষোলো বৎসর বয়সে ভারতীতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হয়। এইবার সাধনার পৃষ্ঠায় সাহিত্য-সমালোচনার যে-ধারা তিনি প্রবর্তন করিলেন, তাহা বঙ্কিমাদি পুর্বাচার্যের পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনাগুলি য়ুরোপীয় ক্রিটিসিজম সাহিত্যে অনুমোদিত পদ্ধতির অনুসরণ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবি বলিয়া রসানুভূতির শক্তি সাধারণ সমালোচকদের অপেক্ষা অধিক ছিল এবং তজ্জন্য সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে অনায়াস-প্রবেশ ও তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল।

এই বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে'র সমালোচনা হইতে সমালোচনা-মালার আরম্ভ (১৩০০ চৈত্র)। সমসাময়িক 'সাহিত্য' পত্রিকার (১৩০১ বৈশাখ) সম্পাদক এই সমালোচনা পড়িয়া লিখিয়াছিলেন, 'রাজসিংহের অনেক প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য রবীন্দ্রবাবু এমন কৌশলসহকারে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা তাঁহার ন্যায় সৌন্দর্যের ঐন্দ্রজালিকের পক্ষেই সম্ভব।' যে-চৈত্রমাসে রাজসিংহের সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেই মাসেই বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। পর মাসে (১৩০১ বৈশাখ) 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'বিহারীলাল সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ বাহির হয় (১৩০১ আষাঢ়) তাহাও সেই কবির কাব্য-সমালোচনা। এই দুইটি প্রবন্ধ বিশেষ গ্রন্থের সমালোচনা নহে, সমগ্র সাহিত্যিকের আলোচনা। সাধনায় অন্য যে সব গ্রন্থের সমালোচনা করেন, তাহার মধ্যে আছে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলদানি' নামে উপন্যাস (১৩০১ অগ্রহায়ণ), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্যগাথা' নামে সঙ্গীত-পুস্তক (১৩০১ অগ্রহায়ণ), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনী (১৩০১ পৌষ), বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত' (১৩০১ মাঘ, ফাল্গুন), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাস (১৩০১ চৈত্র)। এই প্রবন্ধগুলি 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার অন্যতম প্রকাশ এই ক্রিটিসিজম্‌ বা সমালোচনা-সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠু ও সমগ্র আলোচনা এখনো চোখে পড়ে নাই। সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া গবেষণার একটি বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি রবীন্দ্রনাথ যে কেবল অন্যের গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার নিজের রচনাকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও বিচার করিয়াছেন ; অনেক সময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশকালে বা পুনর্মুদ্রণকালে নির্মমভাবে কাটছাঁট করিতেন। যাহা হউক কবি ও ক্রিটিকের যুগ্মমিলনে যে-প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে তাহাতে সাহিত্যরসিকদের মনের সবিশেষ খোরাক আছে।

এই সকল গ্রন্থ-সমালোচনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের বহু মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, 'কৃষ্ণচরিত্র' আলোচনা কালে আদর্শ ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রভৃতি বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা যে উহা পাঠ করিলে মনে হয় উহা যেন পরিণত ঐতিহাসিক গবেষকের বিজ্ঞানসম্মত লেখনীপ্রসূত রচনা।

আর-একটি সমালোচনার উল্লেখ করিব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (D. L. Roy) সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন আগন্তুক ; রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কীভাবে অভিনন্দিত করিয়া সাহিত্য-দরবারে আহ্বান করিয়া আনিলেন, 'আর্যগাথা' নামে সংগীত-সংগ্রহের সমালোচনা পাঠ করিলে তাহা জানা যাইবে। এই কাব্য আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতয়ী

সংগীত সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে (১২৮৮) ভারতীতে তিনি 'সংগীত ও ভাব' এবং 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' সম্বন্ধে যে-আলোচনা করেন তাহার পর প্রত্যক্ষভাবে সংগীত সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ আর চোখে পড়ে না ; যদিও ছিন্নপত্রের মধ্যে দেশী-বিলাতি সংগীত সম্বন্ধে নানারকমের মত ইতঃস্তত ছড়াইয়া আছে। 'আর্য্যগাথা'র সমালোচনায় কবি লিখিলেন, "গানে কথার অপেক্ষা সুরেরই প্রাধান্য। সুর খুলিয়া লইলে অনেক সময়ে গানের কথা অত্যন্ত শ্রীহীন এবং অর্থশূন্য হইয়া পড়ে এবং সেইরূপই হওয়া উচিত। কারণ, সংগীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষমাত্র করাই আবশ্যক ; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সংগীত সেখানে খর্ব হইয়া পড়ে।· ·হিন্দুস্থানি গানে কথা এতই যৎসামান্য যে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না।· ·অধিকাংশ স্থলেই হিন্দি গানের কথায় কোনো ছন্দ থাকে না— সেইজন্যই ভালো হিন্দিগানের তালের গতিবৈচিত্র্য এমন অভাবিতপূর্ব ও সুন্দর। ·তাহাকে পূর্বকৃত বাঁধা ছন্দের মধ্য দিয়া চালনা করিয়া লইয়া গেলে তাহার বৈচিত্র্য ও গৌরবের হানি হইয়া থাকে। কাব্য স্বরাজ্যে একাধিপত্য করিতে পারে কিন্তু সংগীতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহার পক্ষে অনধিকারচর্চা হয়।"

রবীন্দ্রনাথের এই মত কিন্তু পরযুগে বিশেষভাবেই রূপান্তরিত হইয়াছিল ; দিলীপ রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে গান সম্বন্ধে তাঁহার যে দীর্ঘ পত্রব্যবহার চলে এবং প্রবন্ধাকারে তিনি যে-মত পরযুগে ব্যক্ত করেন— সে-সব এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। তবে আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সংগীত সম্বন্ধে প্রবন্ধে বক্তৃতায় এবং পত্রে যে-সব মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যদি কালানুক্রমিক ভাবে সঙ্কলিত করিয়া কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তবে কবির সংগীত সম্বন্ধে মতের অভিব্যক্তির ধারাবাহিকতা স্পষ্টতর হইবে।

এই পর্বে রচিত 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ চোখে পড়ে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাম্বৎসরিক উৎসব-সভায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উহা পঠিত হয় (১৩০১ চৈত্র ২৫)। বিশেষ গ্রন্থকার বা বিশেষ গ্রন্থের সমালোচনা না হইলেও এই প্রবন্ধে সাহিত্যের বহু গুরুতর বিষয় অতি নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছিল। এই ভাষণে বাংলা গদ্যের উৎপত্তির কারণ হইতে শুরু করিয়া এত বিষয়ের আলোচনা আছে যে, দীর্ঘ রচনাটি পাঠ করিলে বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ সবিশেষ উপকৃত হইবেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের উপর জাতীয় সাহিত্য আপন অটল ভিত্তি স্থাপন করিতে' না পারিলে সাহিত্য কখনো উন্নত হয় না ; এই 'সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়' কথাটি আধুনিক ভাবব্যঞ্জক নয় কি ?

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের উপরের-ক্লাসে বাংলা ভাষা অধ্যয়ন-অধ্যাপনের সুপারিশ করিতেছিলেন। আজকাল পাঠকদের কাছে এটি বিস্ময়কর সংবাদ ; কিন্তু সে-সময়ে উচ্চশিক্ষিত দেশীয় ও বিদেশীয় ভদ্রেরা স্কুলে বাংলা অধ্যাপন নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বাংলা ভাষার কোনো পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। কয়েক বৎসর পরে বালিকাদের জন্য বাংলা পরীক্ষণীয় বিষয় হয় ; বালকদের পক্ষে বহু সাধ্যসাধনার পর অনুমতি লাভ করা সম্ভব হইত। বাংলা অধ্যাপনের অবসান হইত থার্ড ক্লাসে বা বর্তমান অষ্টম মানে। গণিত বিজ্ঞান ভূগোল প্রাকৃতিক-ভূগোল ভারত-ইতিহাস ইংলন্ডের ইতিহাস সিটিজেন অব্ ইনডিয়া নামে ভারত-শাসনাদি বিষয়ক গ্রন্থ সংস্কৃতের পরীক্ষা— সমস্তই ইংরেজির মাধ্যমে হইত। রবীন্দ্রনাথ এই পরিস্থিতির অবসানের জন্য এই প্রবন্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শন করেন। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ দুই বৎসর পূর্বে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন।

সাধনার শেষ সংখ্যায় (১৩০২ ভাদ্র-কার্তিক) রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের শেষ প্রবন্ধ 'বিদ্যাসাগর চরিত'[১] প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধটি ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মজীবনী ও তদীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যাসাগর জীবন-চরিত অবলম্বনে লিখিত এবং ১৩ শ্রাবণ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুস্মরণ দিনে কলিকাতার এমারেল্ড্ থিয়েটারে পঠিত হয়।

এই রচনাকেও আমরা কবিলিখিত সমালোচনা-সাহিত্যের অন্তর্গত করিতেছি।

চিত্রার শেষ পর্ব

১৩০২এর শুরু হইতেই সাধনার কাজ যে দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। প্রতি মাসে পাঁচ-মিশালী রচনা লেখা, সংকলন, প্রসঙ্গকথা, সাময়িক পত্রিকা সমালোচনা, প্রুফ দেখা, প্রেসের টাকার ব্যবস্থা করা, কাগজওয়ালার তাগিদ মিটাইবার জন্য কর্জ করা, এবং সেই কর্জ শোধ করিবার জন্য বিবিধ পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা প্রভৃতি কর্ম কবিচিত্তের পক্ষে ক্লান্তিকর; একই ধরণের কাজ দীর্ঘকাল করিতেও ভালো লাগে না; তাই বোধ হয় কলিকাতা হইতে এক পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন (১৮৯৫ এপ্রিল ৯), "ইচ্ছা করছে কোনো একটা বিদেশে যেতে— বেশ একটি ছবির মতো দেশ।" মন কাব্যলোকে বহুদিন প্রবেশপথ পায় নাই বলিয়া অশান্ত অতৃপ্ত, মানসসুন্দরীর সহবাস জন্য মন উৎকণ্ঠিত। তেমনি নূতন কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য চিত্ত ব্যাকুল; এই দ্বন্দ্বের অবস্থায় লেখেন 'শীতে ও বসন্তে' (১৩০২ আষাঢ় ১৮) ও 'নগরসংগীত'। নূতন তত্ত্ব নূতন তথ্য নব উত্তেজনা চিরদিনই বারে বারে কবিকে আহ্বান করিয়াছে। অপরিচিতের মধ্যে অজানার মধ্যে কৌতূহল আছে, আকস্মিকতার আনন্দ আছে— হয়তো-বা কিছু কৌতুকও আছে। সুখ দুঃখ আনন্দ অবসাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে-রসসৃষ্টি হয়, তাহা কবির পক্ষে সম্ভোগের বিষয়। চিরনবীনের জন্য লালায়িত কবিচিত্ত যে-নূতনের আকর্ষণে এবার সাড়া দিল· ·আদৌ তাহা শাস্ত্রমতে কবিজনোচিত নহে, তাহা সরস্বতীর মানসকুঞ্জবনে বিহার নহে, উহা অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক বৈষয়িক ব্যাপার— 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'-রানীকে সার্থক করিবার জন্য ব্যাকুলতা। এখন আর 'যাও লক্ষ্মী অলকায়' বলিতেছেন না।

বিষয়টা ভালো করিয়া বলা উচিত। আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৩০২) সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ কুষ্টিয়াতে ব্যবসায়ের জন্য এক কুঠি (ফার্ম) খোলেন। ঠাকুর-পরিবারের পূর্বপুরুষরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ ধরিয়া ধনজনমান লাভ করেন ও আভিজাত্যের গৌরব অর্জন করেন। ব্যবসায়ের সম্পদ হইতে তাঁহাদের জমিদারির উদ্ভব। কিন্তু ক্রমে সেই ধন বদ্ধজলের মত হইয়া গেল। তাহা আর বাড়ে না; অথচ জলাশয়ের পাশে বসতি বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই বোধ হয় পূর্বপুরুষদের কীর্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া এই দুই যুবক কুষ্টিয়ায় ব্যবসায়ে নামেন। প্রত্যক্ষভাবে না নামিলেও অর্থ দিয়া, উৎসাহ দিয়া, উপদেশ দিয়া রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ার এই ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িলেন। এখন হইতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে মহাকর্মী মনে করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন, ছিন্নপত্রে এমনকি কবিতার মধ্যেও এই বিপুল কর্মচেতনার সমর্থন পাওয়া যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের তথাকথিত হীনতা আজ কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহার সর্বগ্লানিচ্যুত হইয়া নূতনভাবে দেখা দিতেছে। বোধ হয় নিজের অন্তরের বিরোধকে শান্ত করিবার জন্য একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—

'যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্চি ততই কাজ জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়চে। কর্ম যে অতি উৎকৃষ্ট

১ সাধনা ১৩০২ ভাদ্র। চারিত্রপূজা (১৯০৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪। এই প্রবন্ধ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও কীর্তি সম্পর্কীয় রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনাদি বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগরচরিত' গ্রন্থে সমাহৃত হইয়াছে।

পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশ-রূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করছি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিস চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে। দেশদেশান্তরের লোক যেখানে বহু দূরে থেকেও মিলেছে সেইখানে আজ আমি নেমেছি; মানুষের পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ এই একটা প্রয়োজনের চিরসম্বন্ধ, কর্মের এই সুদূরপ্রসারিত ঔদার্য আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। কাজের একটা মাহাত্ম্য এই যে, কাজের খাতিরে নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করে যথোচিত সংক্ষিপ্ত করে চলতে হয়।'[১]

কর্মজীবনে নামিয়া পড়িবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনের যে-আকূতি, 'নগরসংগীত' কবিতায় তাহা অন্যভাবে মূর্তিগ্রহণ করিয়াছে। এই কবিতাটির প্রত্যেক পংক্তিতে তাঁহার মনের মধ্যে কর্মের জন্য যে আনন্দ ও আবেগ সঞ্চালিত হইতেছিল, তাহারই উচ্ছ্বাসময় বাণী শ্রুত হয়। কবির বয়স এখন ৩৪ বৎসর— পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইতেছে কর্মে ও সাহিত্যে।

ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ, বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ,
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ— বাহু বাড়াইব তপনে।
নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট, কখনো ইষ্ট কভু অনিষ্ট,
কখনো তিক্ত কখনো মিষ্ট— যখন যা দেয় তুলিয়া,
সুখের দুখের চক্রমধ্যে কখনো উঠিব উধাও পদ্যে,
কখনো লুটিব গভীর গদ্যে নাগর দোলায় দুলিয়া।
হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা-কিছু আছে অতি অসাধ্য তাহারে ধরিব সবলে।
আমি নির্মম, আমি নৃশংস সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ তুলিব আপন কবলে।[২]

এই কবিতাটির মধ্যে জীবনের কর্মযজ্ঞে অন্ধ নিয়তির টানে জীবের আত্ম-বলিদানের কথা রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছে। এই কর্মের মধ্যে জড়াইয়া জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর বেশ একটু বদল হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে (ছিন্নপত্র, ২ জুলাই ১৮৯৩) 'সুখতত্ত্বশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়' বলিয়া যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এখন সুরের তফাত স্পষ্ট। "ব্রত-যাপনের মতো জীবনযাপন করলে দেখা যায়, অল্প সুখই প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর নয়।" এই পত্রেই বলিতেছেন, "হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তির প্রাচুর্যে মানুষের কোনো ভালো হয় না; তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্পই সুখ উৎপন্ন করে; এবং কেবল আয়োজনেই সময় কেটে গিয়ে উপভোগের অবসরমাত্র থাকে না।"[৩] এই উপকরণ বাহুল্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কোনোদিনই এই বাহুল্যকে বর্জন করিতে পারেন নাই, কারণ আর্টের সৃষ্টিসৌন্দর্য প্রয়োজনের অতিরিক্তের উপর বুনিয়াদ গড়ে। রবীন্দ্রনাথ কবি ও আর্টিস্ট— তাই তিনি দার্শনিকভাবে বাহুল্যের নিন্দা করিলেও আর্টিস্ট হিসাবে সেই প্রয়োজনাতিরিক্ত, সুপর্যাপ্ত

১ ছিন্নপত্র, শিলাইদা, ১৪ অগস্ট ১৮৯৫ (৩০ শ্রাবণ ১৩০২)।

২ নগরসংগীত, চিত্রা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪।

৩ ছিন্নপত্র। কুষ্টিয়া ৫ অক্টোবর, ১৮৯৫।

বাহুল্যের উপরে সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং নিজ জীবনধারার চারিপার্শ্বে এই বাহুল্যকে আর্টের নামে লালিত ও বর্ধিত হইবারও অবসর দেন। সাধনা বন্ধ হইয়া গেলে গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে কবি লিখিতেছেন, "সম্প্রতি সাধনা ছাড়িয়া দিয়া আমি বহুকাল পরে আমার চিরবন্ধু আলস্যের প্রিয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি।"[১] রবীন্দ্রনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। পত্রিকা বন্ধ হইবার সাহিত্যিক বা আধ্যাত্মিক কারণ যাহাই থাকুক, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট; সাধনা চালাইবার ব্যয়ভার ক্রমেই একা তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতেছিল। যথানিয়মে ন্যায্য প্রাপ্য টাকাপয়সা আদায়ে শৈথিল্যের জন্য ও যথানিয়ম প্রেস ও কাগজওয়ালার বিল পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকায় ঋণভার বাড়িয়া চলিতেছিল। এই ক্রমশ-বর্ধমান ঋণভার বহন করিয়া চলা অসম্ভব হইল, তা ছাড়া মনও ক্রমে 'কেজো' কাজের মধ্যে গিয়া পড়িতেছিল।

মাসিক কাগজের নিত্যনৈমিত্তিক লেখা সরবরাহের দায় হইতে আজ কবি মুক্ত। মন সেদিক হইতে নিরুদ্বিগ্ন। বহুকাল পরে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে ফিরিয়া পাইলেন! কবি নৌকায় আছেন, নাগর নদীর ঘাটে পতিসরে নৌকা বাঁধা। সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালাইয়া ইংরেজ সাহিত্যসমালোচক ডাউডেনের সদ্য প্রকাশিত *Edward Dowden in Literature* (1895) পড়িতেছেন। তত্ত্বের তপ্তখোলায় রসের পরিণতি দেখিয়া রসিকহৃদয় অতৃপ্ত; কবির হৃদয় শুকাইয়া উঠিল, বইটা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলেন, "অমনি চারি দিকের মুক্ত জানালা দিয়া এক মুহূর্তে অনন্ত আকাশভরা পূর্ণিমা আমার বোট পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দ উচ্চহাস্যে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। যখন সমস্ত আকাশে সৌন্দর্য আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তখন বাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাউডেনের পুঁথি হইতে সৌন্দর্যতত্ত্ব খুঁটিয়া খুঁটিয়া উদ্ধার করার দুশ্চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যজনক··। অনন্ত নক্ষত্রলোক হইতে এই নিস্তরঙ্গ নদীতল পর্যন্ত কি পরিপূর্ণ অসীম নিঃশব্দতা, অথচ কানের কাছে ডাউডেন সাহেবের এই অকিঞ্চিৎকর বিতর্কে অন্তহীন আকাশের বিশ্বস্তর নীরবতা একেবারে অগোচর হইয়া গিয়াছিল।"[২]

এই সন্ধ্যার কথাই তিনি লিখিয়াছিলেন 'পূর্ণিমা' কবিতায়[৩]—

আমি গৃহকোণে
তর্কজাল বিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্র পরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে
তোমারি সন্ধানে।

শিলাইদহ হইতে লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে এই কবিতাটির ভাব-ব্যাখ্যা আছে, "আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতি ক্ষুদ্র বিদ্রূপ-হাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল।"[৪]

পূর্ণিমা কবিতাটি রচনার দুইদিন পরে লিখিলেন (১৮ অগ্রহায়ণ) 'চিত্রা' নামে কবিতাটি; যেটি পরে চিত্রা কাব্য-

১ পত্র। ১৩০৯ অগ্রহায়ণ ৯। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ৬ চৈত্র ১৩০২। [পতিসর। নাগর নদীর ঘাট]) দ্র. প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

৩ পূর্ণিমা, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩০২ শিলাইদা। দ্র. চিত্রা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪।

৪ ছিন্নপত্র, শিলাইদা, ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫ (১৩০২ অগ্রহায়ণ ২৭)।

গুচ্ছের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়। পূর্ণিমায় যে 'বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী'র রহস্যরূপটি চকিতে দেখিতে পাইলেন, তাহাকে আহ্বান করিলেন নূতন সংজ্ঞায়—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী।

পূর্ণিমায় যাহাকে বলিয়াছেন 'অনন্তের অন্তরশায়িনী' তাহাকে এইখানে বলিতেছেন—

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
তুমি অন্তরবাসিনী।

এক দিকে যিনি বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী অপর দিকে তিনিই অন্তরবাসিনী অন্তরব্যাপিনী প্রেয়সী। এই নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্যসত্তা নারীরূপে কল্পিত, তাহারই সেবা কবির চিরাকাঙ্ক্ষিত। সেই সৌন্দর্য-প্রতিমার কাছে কবির 'আবেদন'—

আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।
'অকাজের কাজ যত, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়।
শত শত আনন্দের আয়োজন'

এর মধ্যে এই তাহার প্রার্থনা। আর সে কী পুরস্কার চায়!

প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি কমলের প্রাতে
আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।

কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর নিকট হইতে যাহা প্রার্থনা করেন তাহা 'ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা'। আজ কর্মসাগরে নামিয়া কবিচিত্ত অন্তরে অন্তরে বিশেষভাবেই মানসসুন্দরীর জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, কর্মযজ্ঞের উদ্দেশ্যে যতই উচ্ছ্বসিত সংগীত রচনা করুন, কবিচিত্ত পিপাসিত যথার্থ 'গীতসুধা-তরে'। কবির নিজের ভাষায় বলি, "আমি তাঁহারই কাছে আবেদন করিয়াছি যে, তোমার কাছে নানা লোক নানা বড় বড় পদ পাইয়াছে, আমি তাহার কোনটা চাই না; আমি তোমার মালঞ্চের মালাকর হইব, আমি তোমার নিভৃত সৌন্দর্যরাজ্যে তোমার গোপন সেবায় নিযুক্ত থাকিব— এক কথায় আমি কবিতা লিখিব, আমি বিশ্বহিতের জন্য সম্পাদকী করিতে পারিব না; কবিতা লিখিয়াও তোমার কাজ করা হইবে— হিতকার্য না করিতে পারি যথাসাধ্য আনন্দের আয়োজন করিতে পারিব।"[১] বহু বৎসর পরে রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্গত 'চিত্রা'র ভূমিকায় কবির নিবেদনের মধ্যে আছে, "কর্মক্ষেত্রে, যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে, সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।"[২]

সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সেবা করিয়া কবি সেবক, মালঞ্চের মালাকর। কিন্তু সেও তো সম্বন্ধ বটে, হউক-না কেন 'দীন ভৃত্য'। কিন্তু বিশ্বসৌন্দর্য-যে সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক (abstract) সেই সৌন্দর্যের সহিত কি কোনো নামযুক্ত সম্বন্ধ হইতে পারে। সত্যই তো সৌন্দর্যের সহিত যে-সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাম তাহা অনামিকা— সকল লোকাচার-

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

২ চিত্রার সূচনা রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪।

বিশ্রুত সম্বন্ধের অগোচর, সকল ভাষার অতীত, সকল মানব-অভিজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে। সেই অবিচ্ছিন্ন সুন্দরকে কবি 'উর্বশী'[১] কবিতায় বর্ণনা করিলেন—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

বিশ্বের অন্তরে চিরন্তন যে অপরিবর্তনীয় সৌন্দর্য রহিয়াছে, সে মানসলোকে অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্যরূপে বিরাজিত, উর্বশী সেই অনামিক সৌন্দর্যের প্রতীক। সমসাময়িক পত্রে কবি লিখিতেছেন, "পৌরাণিক উর্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া আমি যাহাকে কম্প্লিমেণ্ট দিয়াছি তাহাকে অনেক দিন হইতে অনেক কবি কম্প্লিমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন; গ্যেটে যাহাকে বলেন The Eternal Woman—Ewige weibliche তাহাকে উর্বশী-মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি। সে আমাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, বধূ নহে মাতা নহে কন্যা নহে সে রমণী— সে আমাদের হৃদয় হরণ করে, সে দিব্যরূপে আমাদের স্বর্গে বিরাজ করে, সে আমাদের ভুলায়, সে আমাদের পৌত্রদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিবে— অর্জুন তাহার সহিত পূর্বপুরুষগত সম্পর্ক পাতাইতে গিয়াছিলেন সেটা অর্জুনের ভ্রম— তাহার সহিত কাহারও কোন বন্ধন নাই; যে আদিম রহস্য সমুদ্র হইতে দেবতারা সংসারের সমস্ত সুধা ও বিষ উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন অতল হইতে এই চিরযৌবনা অপ্সরী উঠিয়া আজ পর্যন্ত মুনিদের ধ্যানভঙ্গ, কবিদের কবিত্ব উদ্রেক, এবং দেবতাদের চিত্তবিনোদন করিয়া আসিতেছে। সে নৃত্য করে, গান করে, আনন্দ দান করে, এবং আমাদের বাসনার চরমতীর্থ স্বর্গলোকে বাস করে। আর একটি Woman পৃথিবীতে থাকেন তিনি আমাদের সেবা করেন, কাজ করেন, কল্যাণ বিধান করেন, তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাকে আমরা কাঁদাই দুঃখ দিই, তিনি তাঁহার অশ্রুধারাধৌত প্রফুল্লতার কিরণ আমাদের এই মাটির ঘরটুকু উজ্জ্বল করিয়া রাখেন। আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিয়া দেখিলে এক ভাগে the beautiful এক ভাগে the good পড়ে। উর্বশী কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে— 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় দ্বিতীয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।"[২]

কিন্তু মানুষ এই abstractionকে, নামহীন সম্বন্ধহীন প্রেমকে লইয়া সুখী হইতে পারে না; সে চায় প্রেমকে নিতান্ত আপনার করিয়া অন্তরঙ্গভাবে পাইতে। যে-প্রেম নাহি জ্বালে সন্ধ্যাদীপখানি অথবা সলজ্জ বাসরশয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে স্মিতহাস্যে আসে না, সেই নিষ্ঠুরা বধিরা অবচ্ছিন্নতা মানুষের প্রেমপিপাসা কে মিটাইতে পারে। তাই প্রেমার্ত মানুষ স্বর্গ চায় না; 'শোকহীন হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি মানুষের দুঃখে উদাসীন,' তাহার দুর্বলতায় কঠোর। দেবতাদের মধ্যে লক্ষ বৎসর বাস করিয়া স্বর্গ হইতে বিদায় লইবার সময় যে-মানুষ আশা করে 'লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে' দেখে যাবে, সে মর্মান্তিক ভুল করে, স্বর্গের দেবতারা মর্ত্যের পাষাণদেবতাদের ন্যায়ই ভাবশূন্য মূর্তি মাত্র। তাহাদের মুখচ্ছবি সুখদুঃখের চঞ্চলতায় কখনো বিকার প্রাপ্ত হয় না। তাই 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

১ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে (২ ফেব্রুয়ারি ১৯১১) রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর ব্যাখ্যা করেন। দ্র. রবি-রশ্মি। উর্বশী কবিতা ১৮৯৫ ডিসেম্বরে (২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২) শিলাইদহে জলপথে রচিত। ছিন্নপত্রে লিখিতেছেন, "কাল থেকে জলপথেই আছি।··আজ ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙে গেল, উঠে কতকগুলো গরম কাপড় জড়িয়ে বাতি জ্বেলে উর্বশী নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেল্লুম"— বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৩ পৃ. ৬।

২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।

তাই আজও স্বর্গের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি— তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু দণ্ডের তরে।

'উর্বশী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীর সকল সম্বন্ধকে নেতি নেতি করিয়া অবচ্ছিন্ন সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন; কিন্তু সেখানে নারীর অখণ্ড পরিপূর্ণ মূর্তি কবি দেখান নাই। 'বিজয়িনী' সেই হিসাবে 'উর্বশী'র পরিপূরক কবিতা, অথবা 'উর্বশী' সার্থকতা লাভ করিয়াছে 'বিজয়িনী'র মধ্যে। 'সৌন্দর্যকে সমস্ত মানব-সম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা হইতে দূরে, তাহার বিশুদ্ধতায় ও তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব নিহিত আছে' এই কবিতায়। এই বিশুদ্ধ অখণ্ড সৌন্দর্যে কামনার স্পর্শ পৌঁছায় না; অনঙ্গের সায়ক ব্যর্থ হয়, সৌন্দর্যের অন্তস্থলে সে যাইতে অক্ষম।

মদন, বসন্তসখা· ·অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।

কিন্তু বিজয়িনীর নগ্ন নিরাভরণ অবিচলিত কামনাহীন নির্বিকার সৌন্দর্যের নিকট মদন পরাজিত হইল।

উঠিল অনঙ্গদেব।· ·
মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল-তরে। পরক্ষণে ভূমি'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

আবেদন, উর্বশী ও স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতাত্রয়ের[১] মধ্যে কবিচিত্তের একটি অখণ্ড ধারা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার

১ আবেদন, উর্বশী ও স্বর্গ হইতে বিদায় পর পর তিন দিনে রচিত, ২২, ২৩, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২।

পরের তিনটি কবিতার[১] মধ্যে মানবীয় প্রেমের সত্যকার মাধুর্যটুকু দেখাইয়াছেন; এই ধরিত্রীকে এই পৃথিবীর প্রেমকে নিবিড়ভাবে পাইবার আকুলতা ব্যক্ত হইয়াছে। 'হৃদিহীন শোকহীন, পরিপূর্ণ সুখের নিবাস' স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া মানুষ দিনশেষে এই অক্ষমা ধরণীর প্রিয়তমের বক্ষে 'সান্ত্বনা' সন্ধান করে ও তাহাকে তাহার 'শেষ উপহার' নিবেদন করে।

সাময়িকভাবে কাব্যরচনায় ছেদ পড়িল। শান্তিনিকেতনে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পঞ্চম সাম্বৎবিক ব্রহ্মোৎসব। রবীন্দ্রনাথকে বোলপুর যাইতে হইল; মহর্ষির ব্যবস্থায় সমস্ত এখনো নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি উপাসনার বিবিধ অংশ গ্রহণ করেন; রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে 'দণ্ডায়মান হইয়া· ·'ভোজ্যোৎসর্গ করিলেন।[২] ইহার বেশি করিবার অধিকার তখনো প্রাপ্ত হন নাই, ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহা হইতে বয়োকনিষ্ঠ হইলেও মহর্ষির ধর্ম সাহিত্য আলোচনায় সর্বদাই পিতামহকে সাহায্য করিতেন। তখন পর্যন্ত এইসব ধর্ম-অনুষ্ঠানের দিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যায় নাই; তাই বলিয়া পারিবারিক কর্তব্যপালনে তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হইতেন না।

মাঘোৎসবের জন্যে পূর্বের ন্যায় অজস্র গান এখন আর নাই; তবে এই বৎসর যে-গানটি রচনা করেন— সেটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংঘ-সংগীতরূপে প্রতি বৎসর মাঘোৎসবের দিন গীত হয়। সেটি হইতেছে 'পদপ্রান্তে রাখ সেবকে'। মাঘোৎসবের কয়েকদিন পরে বলেন্দ্রনাথের বিবাহ[৩] হইল, তদুপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ উৎসব (২২ মাঘ) নামে কবিতাটি রচনা করেন, 'মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি বসন্ত উদয় কত পত্রপুষ্পময়'—চিত্রা। আর বিবাহোপলক্ষে 'নদী' কবিতাটি উৎসর্গ করেন।[৪] কবিতাটি নিশ্চয়ই কিছুকাল পূর্বে রচিত, নতুবা বিবাহের দিনে মুদ্রিত হইয়া উপহৃত হইতে পারে না।

নদী কবিতাটি এখন 'শিশু' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে, কিন্তু প্রথমে উহা পৃথক বই ছিল। বাংলাদেশের নদী রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি পর্বে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া নদীর ন্যায় কবিতা রচনা সম্ভব হয়। তিনি ছিন্নপত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন পদ্মা তাঁহার কাছে বড়ো প্রিয়; সেটা-যে কত সত্য তাহা কবির পদ্মা-জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্ট হয়।

নদী কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই চোখে পড়ে ইহার যুক্তবর্ণহীন শব্দচয়নে[৫] কবি প্রতিভা; ছন্দের গতিলালিত্য শিশুমনে বিচিত্র হিল্লোল সৃষ্টি করে। কিন্তু সব থেকে লক্ষণীয় হইতেছে এই কাব্যের imagery বা রূপসৃষ্টি। ইহার একমাত্র তুলনা হইতেছে জাপানী চিত্রশিল্পী তাইকানের নদীর দীর্ঘ ছবি (scroll)— পর্বত হইতে নামিয়া মহাবিচিত্রের মধ্য দিয়া নদীর গতি ও মহাসাগরে তাহার অবসান।

১ দিনশেষে (২৮), সান্ত্বনা (২৯ অগ্রহায়ণ), শেষ উপহার (১লা পৌষ) রচিত।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৭ শক (১৩০২) পৃ. ১৫১।

৩ প্রফুল্লময়ী দেবী (বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ও বলেন্দ্রনাথের জননী), আমাদের কথা, দ্র. প্রবাসী ১৩৩১।

৪ নদী (বাল্যগ্রন্থাবলী ২) ২২ মাঘ ১৩০২। বাল্যগ্রন্থাবলীর প্রথম সংখ্যক বই 'শকুন্তলা' শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬। অবনীন্দ্রনাথ 'নদী' পুস্তিকার উপর কতকগুলি ছবি আঁকেন; সেটি মুদ্রিত হয় নাই। অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র মোহনলাল মাতামহের কাগজ পত্রের মধ্যে এই চিত্রিত 'নদী' একখণ্ড পান। ২১ খানি ছবিসহ উহা শারদীয়া সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৬১) প্রকাশিত হইয়াছে। 'নদী' কবিতাটির সহিত সদি Robert Southey লিখিত Falls of Ladore নামে কবিতাটির মিল আছে। এটি নানাছন্দে ঝর্ণার ইতিহাসপূর্ণ কবিতা; সদিও নাকি তাঁর ছেলেদের জন্য লেখেন।

৫ প্রস্তরমূর্তি (২৪ মাঘ ১৩০২) চিত্রা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪।

নদী রচনার আরো-একটি-প্রেরণা ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বয়স আট বৎসর, জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স ছয় বৎসর। তাহাদের কল্পনাশক্তি সৌন্দর্যবোধ উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য অনুকূল কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজন বোধে এই যুক্তাক্ষরহীন কবিতাটি রচনা করেন বলিয়া আমাদের অনুমান।[1]

কাব্যধারা বহিয়া চলিয়াছে; সৌন্দর্যের যে-কল্পনায় কবিচিত্ত মুগ্ধ তাহার প্রকাশ-প্রতীক উর্বশী ও বিজয়িনী— একজন স্বর্গের অপ্সরী, অপরজন মর্তের নারী; দুইটি দুই রূপের প্রতীক— উর্বশী তাহার সৌন্দর্য, তাহার নৃত্যকুশলতা, তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। অন্যকে মুগ্ধ করিবার কলা সে জানে, কিন্তু কাহারো প্রেমে মুগ্ধ না হইবার শক্তি সে রাখে। দেব মানব সকলেই তাহার প্রেমকণা পাইবার জন্য উন্মত্ত, কিন্তু সে নির্বিকার; সে সুখ দেয় কিন্তু শান্তি দেয় না। 'বিজয়িনী'র মধ্যে নারীর আত্মচেতনা যেন আজও কুসুমিত হয় নাই, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ অথচ নিজ পরিপূর্ণ যৌবনশোভা সম্বন্ধে অচেতন; মুগ্ধ করিবার কলা সে জানে না, মুগ্ধ হইবার প্রেরণা সে পায় না। সে যেন জীবন্ত 'প্রস্তরমূর্তি'।[১] সেই পাষাণীর দিকে তাকাইয়া মানুষের অন্তর তৃপ্তি মানে না। সে সেই 'অনশ্বরা অনাসক্তা চির-একাকিনী' আপন সৌন্দর্যধ্যানে তপস্যামগনাকে বলে 'কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে'। মানবের আকুলিত মনের দুঃসহ বেদনা বুঝিবার শক্তি তাহার নাই; কিন্তু তাহার অনাঘ্রাত পুষ্পসৌন্দর্য যথার্থ প্রেমিকের স্পর্শচেতন চিত্তকে ভরিয়া তোলে। সে অন্ধ, বিজয়িনীর ন্যায় মূঢ়; তাহার পুষ্পমালিকা কবির চিত্তে—

কী ধন তুমি করিছ দান
না জান আপনি।
পুষ্পসম অন্ধ তুমি
    অন্ধ বালিকা,
দেখনি নিজে মোহন কী যে,
    তোমার মালিকা।[২]

চিত্রার শেষ কয়টি কবিতার মধ্যে ভাব-সামঞ্জস্য অস্পষ্ট নহে। এই কবিতারাজির মধ্যে 'জীবনদেবতা' (২৯শে মাঘ) ও সিন্ধুপারে (২০ ফাল্গুন) পাঠক ও সমালোচকগণের দৃষ্টি ও ক্রিটিসিজম্ সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিয়াছে। বৎসরাধিককাল পূর্বে রচিত 'অন্তর্যামী' ও 'সাধনা' কবিতার সুর 'জীবনদেবতা'র মধ্যে পুনরায় ধ্বনিত হয়; যে-সৌন্দর্যসুধা কবি এতকাল চিত্ত ভরিয়া পান করিয়াছেন তাহা তাঁহার অন্তরে কী সার্থকতা আনিয়াছে সেই প্রশ্ন মনে উদয় হইতেছে। তাই যেন তিনি চিরসুন্দরকে শুধাইতেছেন—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

এই কবিতার অর্থ লইয়া 'চিত্রা' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যিকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তরে 'জীবনদেবতা' ও 'সিন্ধুপারে' সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা[৩] দান করেন, তাহাই বোধ হয় এই কবিতা সম্বন্ধে কবির সব প্রথম কৈফিয়ত।

১ 'নদী' কবিতায় যুক্তবর্ণ আছে স্খলন, ক্ষেত ও ক্রমে।

২ নারীর দান (২৫ মাঘ ১৩০২), চিত্রা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪।

৩ পত্র, ৬ চৈত্র ১৩০২। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

কয়েক বৎসর পরে অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন যখন কবির 'কাব্যগ্রন্থ' নূতনভাবে সাজাইতেছেন, সেই সময়ে 'জীবনদেবতা' খণ্ডের অর্থ স্পষ্ট করিয়া জানিবার জন্য কবিকে তিনি পত্র লেখেন ; তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে জীবনদেবতাবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া পত্র দেন (৫ ফাল্গুন ১৩০৯)। জীবনদেবতার এই রহস্যবাদ মোহিতচন্দ্র 'কাব্যগ্রন্থে'র ভূমিকায় আলোচনা করেন। ইহাই জীবনদেবতা সম্বন্ধে প্রথম মুদ্রিত ব্যাখ্যা (১৩১০)।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার এক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতাবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যায় স্বয়ং প্রবৃত্ত হন। বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে কবি তাঁহার জীবনকথা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু যাহা লিখিলেন তাহাতে জীবনকাহিনী ছিল না— ছিল তাঁহার কাব্যজীবনের অভিব্যক্তির কাহিনী বা জীবনদেবতাবাদের ব্যাখ্যান। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই— এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই— সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি— তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।··কিন্তু আজ জানিয়াছি, সেসকল লেখা উপলক্ষমাত্র, তাহারা যে-অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর-একজন রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।··শুধু কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন ? তাহা নহে। সেইসঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা-যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে-অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন।— তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন··যে-শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।"[১]

কবিতাটির শেষে আছে, এই প্রশ্ন—

এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ,
যা কিছু আছিল মোর।— · ·
জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা
আজি কি হয়েছে ভোর ?

১ পত্র, ৬ চৈত্র ১৩০২। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

তাই একখানি পত্রে[১] লিখিয়াছিলেন, "আমার দ্বারা যা কিছু হওয়া সম্ভব সব যদি শেষ করে থাক, এখন যদি তোমার আঘাতে আমার এ বীণা আর না বেজে ওঠে, তোমার ইঙ্গিত মাত্রে আমার মনোঅশ্ব আর ছুটতে না পারে, তবে এই জীর্ণতা অসারতা ভেঙে চুরে ফেলে আবার আমাকে নূতন রূপ নূতন প্রাণ দাও ; নূতন লোকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদের অনাদি কালের চিরপুরাতন বিবাহ-বন্ধন নবীকৃত করে দাও।"—

নূতন করিয়া লহ আরবার চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনডোরে।

জীবনদেবতার মূলসূত্রটি 'সিন্ধুপারে' (২০ ফাল্গুন ১৩০২) কবিতায় শেষ বলা হইয়াছে রূপকচ্ছলে— অনেকটা কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণের ভৌতিক বর্ণনার সঙ্গে ইহার মিল। জীবন ও মৃত্যু দুইটি পরস্পর-বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাপার নহে, উহাদের একটি অপরের প্রতিবাদ নহে, উহারা উভয়ে একই অস্তিত্বধারার দুইটি দিক মাত্র। মৃত্যু জীবনকে সমষ্টি-জীবনের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যায়, মৃত্যু অবসান বা নির্বাণ নহে।[২] রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যে-প্রাণলক্ষ্মীর সঙ্গে ইহজীবনে আমাদের বিচিত্র সুখদুঃখের সম্বন্ধ, মৃত্যুর রাত্রে আশঙ্কা হয় সেই সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন করে বুঝি আর কেউ নিয়ে গেল। যে নিয়ে যায়, মৃত্যুর ছদ্মবেশে, সেও সেই প্রাণলক্ষ্মী। পরজীবনে সে যখন কালো ঘোমটা খুলবে তখন দেখতে পাব চিরপরিচিত মুখশ্রী।· · আসল কথা, পুরাতনের সঙ্গে মিলন হবে নূতন আনন্দে।"[৩] এই কবিতা লিখিবার কয়েকমাস পরে তিনি প্রভাতকুমারকে লিখিয়াছিলেন— "মৃত্যুর পরে 'সিন্ধুপারে' এই জীবনদেবতার আমাকে চিরপরিচিত প্রিয় মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন— আমি মিথ্যা ভয় করেছিলাম, মনে করেছিলাম, যিনি আমাদের এই জীবন-লীলাভূমির মাঝখানে আনিয়া আমাদের সহিত খেলা করিয়াছিলেন তিনি বুঝি চিরকালের মত ছুটি লইলেন, আর-এক জন কোন্ অচেনা লোক আমাদের পূর্বাপরের মাঝখানে একটা ভয়ংকর বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে— কিন্তু সে লোকটি যেমনি ঘোমটা তুলিয়া ফেলিল অমনি দেখিলাম আমাদের সেই চিরকালের সঙ্গীটি একটুখানি ভয় দেখাইয়া আরো যেন অধিকতর ভালবাসার সঙ্গে কাছে টানিয়া লইল।"[৪]

সমগ্র 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের একটি মূল স্বর আবিষ্কারের চেষ্টা শুধু-যে সাহিত্যিকরা করিয়াছেন তাহা নহে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সমগ্রের মধ্য হইতে একটি সাধারণ স্বর বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চিত্রা গ্রন্থ প্রকাশের কয়েকদিন পরে লিখিতেছেন— "যিনি 'আমি' নামক এই নৌকাটিকে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে লোক-লোকান্তর যুগ-যুগান্তর হইতে একাকী কালস্রোতে বাহিয়া আনিতেছেন,· · যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যাপ্ত ভাবে সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীর ভাবে আনন্দ, 'চিত্রা' গ্রন্থে আমি তাহাকেই বিচিত্র ভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই— যিনি বিশেষ রূপে আমার· · যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে।"[১] চিত্রা রচনার পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে (১৩৪৭) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই কাব্য সম্বন্ধে 'রচনাবলী'তে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ভক্ত যখন বলেন, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি, তখন হৃষীকেশের থেকে ভক্ত

১ পত্রাবলী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৯ শ্রাবণ, পৃ. ৩১-৩৫।

২ রবিরশ্মি পূর্ব-ভাগে।

৩ পত্র, ৬ চৈত্র ১৩০২। প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

৪ রবিরশ্মি, পূর্ব-ভাগে।

নিজকে পৃথক্ করে দেখেন, সুতরাং তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একা হৃষীকেশের 'পরেই। চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে দুঃখে আমার ভালোয় মন্দয়। এই সংকল্প-সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সংগীত যা উদ্‌ভূত হচ্ছে— যন্ত্রেরও স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ। পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি। এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা।· ·

"পরমদেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদেশের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ।· · আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কি না এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রার কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে।"

ছিন্নপত্র

ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের অতি সুপরিচিত গ্রন্থ ; ১৩১৯ সালে উহা প্রকাশিত হয়। এই পত্রগুলির অধিকাংশ হইতেছে 'সাধনা' যুগের রচনা অর্থাৎ ১২৯৮ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩০২ কার্তিক (১৮৯২-১৮৯৫) পর্যন্ত চারিটি বৎসরের মধ্যে লিখিত। এই পর্বটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির স্বর্ণময় যুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না ; এই পর্বের মধ্যে সাধনার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁহার ছোটগল্পগুলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া সর্বশ্রেণীর সমালোচকদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশী বৎসর জীবনের ষাট বৎসরের মধ্যে নব্বইটি গল্প লেখেন। তন্মধ্যে সাধনার এই চার বৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন আটত্রিশটি। সুতরাং সাধনার পর্বটিকে ছোটগল্পের পর্ব বলা যাইতে পারে। কিন্তু গল্পই তাঁহার একমাত্র সাহিত্যসৃষ্টি নহে ; গল্প ছাড়া সোনার তরী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, গোড়ায় গলদ, ব্যঙ্গকৌতুক, পঞ্চভূতের কাল্পনিক ডায়ারি ও য়ুরোপযাত্রীর বাস্তবিক ডায়ারি, বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধ, বিবধ প্রসঙ্গকথা, নানা শ্রেণীর গ্রন্থসমালোচনা প্রভৃতি রচনা-সম্ভারে এই পর্বটি পূর্ণ ; এমন নিবিড় সাহিত্যসমারোহ সচরাচর চোখে পড়ে না। এইসব রচনার সহিত বাংলাদেশের সমসাময়িক শিক্ষিত পাঠকের পরিচয় ঘটে, রচনার রসাস্বাদ প্রত্যক্ষভাবেই উহাদের গোচরীভূত হয়। কিন্তু কবি-জীবনের নিঃসঙ্গমানসের অবিকৃত ও নিখুঁত চিত্রের সন্ধান তাঁহারা পান নাই— সেইটি পাইয়াছিল পরবর্তী যুগের পাঠকেরা ; তাহার আকরগ্রন্থ হইতেছে 'ছিন্নপত্র'।

সাধনা বন্ধ হইয়া যাইবার বারো বৎসর পরে বিচিত্র প্রবন্ধ ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-মানসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল ঐ গ্রন্থের দুইটি প্রবন্ধ হইতে— জলপথে ও স্থলে। কিন্তু সে-রচনার পটভূমি তখন অজ্ঞাত ছিল। কাহাকে লিখিত, কেন লিখিত, কোথা হইতে রচনাগুলি গৃহীত ও সংকলিত তাহার কোনো আভাস পাওয়া যায় নাই ; এইভাবে আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

অতঃপর ১৩১৯ সালে ছিন্নপত্র নামে গ্রন্থ প্রকাশিত[১] হইলে রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকেরা কবির মানস-জীবনের এক নবতর সত্তার সন্ধান পাইল। এই সময়েই কবির 'জীবনস্মৃতি'ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই দুইখানি গ্রন্থ যুগপৎ প্রকাশন আমাদের মতে বিশেষ অর্থপূর্ণ। আমাদের মতে 'ছিন্নপত্র' জীবনস্মৃতিরই অনুক্রমণ বা পরিশিষ্ট। জীবনস্মৃতি যেখানে আসিয়া থামিয়াছে, ছিন্নপত্র যেন তাহারই পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

১ ছিন্নপত্র। প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিলাইদহ, নদীয়া। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে মুদ্রিত, ১৩১৯ বৈশাখ। পৃ. ২৩৩।

জীবনস্মৃতিতে কবি 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত আসিয়া আর অগ্রসর হন নাই; ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে 'মানসী' হইতে তাঁহার কাব্য স্বকীয়তা বা সৃষ্টি -ধর্মী হইয়াছে। ইহার পূর্বের যুগ প্রস্তুতির পর্ব, সেইটুকু মাত্র জীবনস্মৃতির বিষয়। কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ অব্দে। কবির বয়স তখন ২৫ বৎসর। ছিন্নপত্রের প্রথম পত্র ১৮৮৫ অক্টোবরে লেখা ও শেষ পত্র লেখা ১৮৯৫ ডিসেম্বরে। কড়ি ও কোমল পর্যন্ত লিখিবার পর জীবনস্মৃতি যে তিনি আর লিখিলেন না, তাহার কারণ এই পর্ব হইতে তাঁহার পত্রধারার মধ্যে তিনি আত্মকথা বলিতে শুরু করেন; মানসীপর্বের অনেকগুলি চিঠি প্রমথ চৌধুরী প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতিকে লেখা। 'ছিন্নপত্র' সম্পাদনকালে সেগুলি যদি কবির হস্তগত হইত তবে তিনি নিশ্চয়ই এই গ্রন্থমধ্যে তাহাদের সন্নিবেশিত করিতেন এবং আমরা 'মানসী' হইতে 'চিত্রা' পর্যন্ত পর্বের একটি ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন জীবনভাষ্য পাইতাম; তবুও আমরা 'ছিন্নপত্রে' তাঁহার কড়ি ও কোমল -উত্তর দশ বৎসরের জীবনেতিহাসের যে-উপাদান পাইয়াছি, তাহা প্রচুর। রবীন্দ্রনাথের আর্টিস্ট ও ক্রিটিক -সত্তার যুগ্মরূপ এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে প্রকট। রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের ও কর্মজীবনের তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ উপাদান জীবনীকারের পক্ষে অপরিহার্য সম্পদ হইয়াছে।

জীবনস্মৃতির সূচনাংশে কবি লিখিয়াছিলেন, "এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু, বিষয়ের মর্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।"

ছিন্নপত্র সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। দশ বৎসর নানা স্থানে নানা অবস্থায় যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, যাহা পড়িয়াছেন, যাহা ভাবিয়াছেন তাহারই সংগ্রহালয় যেন এই পত্রগুচ্ছ। তাহার মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ভাবরূপে ফুটিয়াছে তাহাকে সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্যজ্ঞানে চয়ন করিয়াছেন— সেগুলিকে কাটিয়া-কুটিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন; আমরা সেইজন্য বলিয়াছি যে ছিন্নপত্র জীবনস্মৃতির পরিশিষ্ট, পরবর্তী দশ বৎসরের আত্মকথা— স্মৃতিকথা নহে।

১৩১৯ সালে ছিন্নপত্র যখন প্রকাশিত হয় তখন পত্রগুলি কাহাকে লেখা, তাহা কোথাও বিবৃত হয় নাই। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জীবনী লইয়া গবেষণাদি করিলেন, তাঁহাদের পক্ষেই এইসব তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ছিন্নপত্রের মুদ্রিত সংস্করণের প্রথম আটখানি পত্র লিখিত হয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। তার পর ১২৯৪ আশ্বিন হইতে ১৩০২ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত কালের মধ্যে পত্রগুলি ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত; ১৪ বৎসর হইতে ২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইন্দিরা দেবী এই পত্রগুলি পান। এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে প্রথম পাঁচ বৎসরে (১২৯২-৯৭) লিখিত পত্র ছিন্নপত্রের ৭৪ পৃষ্ঠা ও সাধনা পর্বের (১২৯৮-১৩০২) চারি বৎসরের পত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। সেইজন্য আমাদের মতে এই পত্রগুলি সাধনার যুগের সৃষ্টিরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের নাম দেন 'ছিন্নপত্র'; আমরা বলিব ইহা কবির কড়চা বা রোজনামচা বা ডায়ারি— পত্রাকারে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের বিরাট গদ্য-সাহিত্যের একটা বড় অংশ হইতেছে তাঁহার পত্রধারা। আঠারো বৎসর বয়সে বিলাত হইতে লিখিত 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' হইতে আরম্ভ করিয়া সত্তর বৎসর বয়সে লিখিত 'রাশিয়ার চিঠি' পর্যন্ত বিরাট পত্রসাহিত্য তাঁহার গদ্য-সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অংশ। ইহারা নামেমাত্র পত্র বা চিঠি; কারণ এইসব ক্ষেত্রে পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তি অনেক সময়েই গৌণ— সম্মুখে মনের মত কেহ নাই যাহার সহিত ভাববিনিময় বা নিজের ভাবনারাজি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন; তাহার অভাবে গরহাজিরা বন্ধু, আত্মীয়, শিষ্যের নিকট মনের কথা বলিয়া যাইতেছেন; কিন্তু সেসব রচনা পাবলিকের উদ্দেশে লিখিত অর্থাৎ পত্রগুলি সদ্য সদ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার জন্যই

রচিত। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধাকারে মতামত ব্যক্ত না করিয়া পত্রমাধ্যমে অনেক সময়ে নিজ মতামত কেন লিখিতেন, তাহার কারণ নানা স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৯১২ সালে বিলাত হইতে যে-পত্রধারা লিখিয়াছিলেন, তাহা সদ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; তখন হইতে এই ধারার অনুবর্তন।

কিন্তু আমাদের আলোচ্যপর্বের পত্রধারা রচনাকালে কবির মনে সদ্য সেসব প্রকাশনের কোনো ভাবনা ছিল না ; কেবল মনের কথা ব্যক্ত করিবার আনন্দেই সেগুলি লিখিত হয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, দিনের পর দিন পত্র লিখিতেছেন, ডায়ারির মত ; অথচ ঠিক যে ডায়ারি, তাহাও বলিতে পারা যায় না। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' যথার্থ ডায়ারির মত করিয়া লেখা। বিশ্বভারতী পত্রিকায় এই ডায়ারির যে-মূল খসড়া মুদ্রিত হইয়াছে,[১] তাহাকে রোজনামচা বলা যায় ; কিন্তু কবির সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিতে সেগুলি যেভাবে লিখিত সেভাবে প্রকাশযোগ্য মনে হয় নাই। সাধনা পত্রিকায় যে-সংশোধিত পাঠ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকাশিত হইল, তাহা ডায়ারি-আকারে থাকিলেও, তাহা বিশুদ্ধ সাহিত্য-রূপেই পুনর্লিখিত হইয়াছিল। উভয় পাঠ মিলাইলেই তাহা পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হইবে। এই গ্রন্থকে যথার্থ ডায়ারি বলা চলে। কিন্তু 'যাত্রী' গ্রন্থের একাংশের নাম পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি— উহা প্রায় দিনের পর দিন লিখিত হইলেও উহাকে যথার্থভাবে 'ডায়ারি' বলিতে পারি না ; কারণ কেহ ডায়ারি লিখিয়া সদ্য সদ্য মাসিক পত্রিকায় পাঠায় না। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি রচনার দুই বৎসর পর সংশোধিত পরিবর্জিত আকারে মুদ্রিত হয়— সদ্য প্রকাশভাবনা রচনাকালে ছিল না। এই দুই ডায়ারির এইখানেই পার্থক্য। ১৯১২ সাল হইতে লিখিত পত্রধারা সদ্য প্রকাশনের জন্য রচিত, সেইজন্য এইসব রচনার মধ্যে কবির আত্মচেতন ভাব খুবই স্পষ্ট। যে-পত্র একজন প্রিয় ব্যক্তির জন্য লিখিত, আর যে-পত্র মাসিক পত্রিকার সহস্র চক্ষুর জন্য লিখিত, এই দুই শ্রেণীর রচনার মধ্যে গুণগত ভেদ আছে। ডায়ারি লেখার জন্য 'পঞ্চভূতে' শ্রীমতী দীপ্তি অনুরোধ করিলে গ্রন্থকার বলেন, 'ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন'। উহা যেন দুইটি লোককে সৃষ্টি করে। এই লইয়া পঞ্চভূতের পরিচয় অধ্যায়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

ডায়ারি লিখিবার বিরুদ্ধে কবি যত যুক্তিই দিয়া থাকুন, 'ছিন্নপত্র' এক হিসাবে তাঁহার দৈনিক কড়চা বা রোজনামচা। ইহাতে ঘটনার প্রাচুর্য না থাকিলেও জীবনীকারের পক্ষে এগুলি জীবন-ইতিহাসের পর্যাপ্ত আকর বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে।

কিন্তু এই পত্রধারার বৈশিষ্ট্য ঘটনা সরবরাহের খনি-গুণত্ব নহে, ইহার সুপ্রতিষ্ঠ স্থান হইতেছে রবীন্দ্র-মানসের বিবর্তন-ইতিহাসের আকরত্ব-গুণে। আর পরিশোধিত ছিন্নপত্র বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবেও উপভোগ্য। সেইজন্য বহুবার পাঠ করিলেও ছিন্নপত্র ম্লান হয় না। ইহার মধ্যে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবনযৌবনের, পরিচ্ছন্ন দেহমনের অসংখ্য অভিজ্ঞতা ও অনুভাব কিভাবে ধীরে ধীরে নানা বর্ণে, শতদলের কোরকের ন্যায় প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইতেছে তাহার সন্ধান পাই।

এই পত্রগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট মমতা ছিল। শিলাইদহ হইতে কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন[২]। —

"আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে, তোকে যে-সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কত দিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করছি— সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির

১ য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৬, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৭, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭।

২ ১৮৯৫ মার্চ ১১ : ১৩০১ ফাল্গুন ২৮।

বাক্সর মধ্যে ধরা আছে— আমার চোখে পড়লেই আবার সেই-সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা-কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয়, কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, সেটা এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন— যা হয়তো আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই— তার মর্যাদা আমি যেমন বুঝব এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস— আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব— কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি, তা হলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব— তখন এই-সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে— তখন পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর— এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্তজ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাট্‌কা ভাবে ফিরে পাব— আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।"[১]

রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের যাবতীয় চিঠি ইন্দিরা দেবী দুইটি খাতায় নকল করিয়া এক সময়ে খুল্লতাতকে উপহার দিয়াছিলেন। ১৩১০ সালে আলমোড়া হইতে সতীশচন্দ্র রায়কে এই চিঠির খাতা দুইখানি মোমজাম দিয়া মজবুত করিয়া মুড়িয়া রেজেস্ট্রি করিয়া পাঠাইবার জন্য পত্র দিতে দেখি।[২]

বোধ হয় এই দুইখানি খাতা হইতে অংশ চয়ন করিয়া বিচিত্র প্রবন্ধের জলপথে ও স্থলে পরিচ্ছেদ রচিত হয়। অতঃপর ১৩১৯ সালে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন ; এই সংস্করণে অনেক চিঠির অংশবিশেষ সাধারণের সমাদরযোগ্য নহে বলিয়া পরিবর্জন করেন।[৩]

উত্তরবঙ্গ বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নানা ব্যক্তিকে যে-অজস্র পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা যদি কখনো কালানুক্রমিক সাজাইয়া প্রকাশিত হয়, তবে একজন কবি মনীষী ও কর্মীর জীবনের যে অপূর্ব ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইবে, তাহা বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ সম্পদরূপে সমাদৃত হইবে। 'ছিন্নপত্র' সম্পাদন কালে যদি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত তাঁহার পত্রগুলির সন্ধান পাইতেন, তবে হয়তো সেগুলির বহু অংশ এই গ্রন্থ মধ্যে সংযোজিত করিতেন ; কারণ এই যুবক সাহিত্যিকের সহিত এই সময়ে (এবং পরেও) বহু পত্রবিনিময় হয়। এইসব পত্রে রবীন্দ্রনাথের মনস্বিতা অতি স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'মানসসুন্দরী' কবিতা লিখিবার কয়েকদিন পরে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "চিঠিতে এমন সকল আভাস ইঙ্গিত নিয়ে ফলাতে হয়— কেবল ভাবের চিকিমিকিগুলি মাত্র— যে, সে প্রায় কবিতা লেখার শামিল বললেই হয়।"— চিঠিপত্র ৫ম। এ কথা অতি সত্য— এ যুগের পত্রগুলি সেই সৌধশিখরেই উঠিয়াছে। সেইজন্যই বলিয়াছি যে, এই দশ বৎসরের পত্রগুলি কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত করিয়া তাহাদের ব্যাপক ও গভীর আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাই হইবে জীবনস্মৃতির অনুক্রমণ ও পরিশিষ্ট।

১ ছিন্নপত্র, সংযোজন, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮০ আশ্বিন।

২ খাতা দুইখানি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সদনে আছে।

৩ যে-সকল চিঠি ছিন্নপত্রে মুদ্রিত হয় নাই ঐ খাতা হইতে সেগুলির অধিকাংশ বিশ্বভারতী পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ হইতে শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২) ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। কতকগুলি চিঠির ছিন্নপত্রে-বর্জিত অংশ ১৩৬১ সনের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈতালি পর্ব

চিত্রার শেষ কবিতা (২০ ফাল্গুন) লিখিত হইবার অব্যবহিত পরে কবিকে কলিকাতায় আসিতে হয়। ২৬ ফাল্গুন (১৩০২) আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সুহৃৎনাথ চৌধুরীর দীক্ষাকালে কবিকে সংগীত করিতে দেখি। সুহৃৎনাথ হইতেছেন আশুতোষ ও প্রথম চৌধুরীর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা, ডাক্তার। অল্পকাল পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা পৌত্রী দ্বিপেন্দ্র-নাথের কন্যা ও দিনেন্দ্রনাথের দিদি নলিনী দেবীর সহিত সুহৃৎনাথের বিবাহ হয় (১৩ বৈশাখ ১৩০৩)। এই বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'উজ্জ্বল করছে আজি এ আনন্দরাতি'[১] গানটি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

চিত্রা ফাল্গুন মাসে বোধ হয় প্রকাশিত হয়,[২] ইহার অনতিকালপরেই তাঁহাকে শিলাইদহে দেখি; ৬ই চৈত্র সাহিত্যিক প্রভাতকুমারকে এক পত্রে তিনি তাঁহার আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে পত্র লিখিতেছেন।[৩] চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হইতে কবিকে পতিসরের সম্মুখে নৌকায় দেখা যাইতেছে। "পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসল-কাটা শস্যক্ষেত ধূ ধূ করছে।· দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এতে স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার ও প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে 'এটাই যথেষ্ট' তখন তার উপরে রঙ লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এইজন্যেই।"[৪]

চিত্রা কাব্যগুচ্ছ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে গত মাসের শেষে (ফাল্গুন ১৩০২); সেই কবিতারাজির সুরের রেশ এখনো সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায় নাই, তাই দেখা যায় এর প্রথম কয়েকটি কবিতায় "পূর্বতন কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক।" 'উৎসর্গ' (আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে) কবিতাটি মোহিতচন্দ্র সেন 'কাব্যগ্রন্থে'র জীবন-দেবতা খণ্ডের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। 'গীতহীন' 'স্বপ্ন' প্রভৃতি কয়েকটি এই লিরিকগুচ্ছের অন্তর্গত।

কবির অন্তরে নানা প্রশ্ন উঠে, নানা ছবি জাগে। মানুষকে তো সদাসর্বদাই দেখিতেছেন, অন্তর্যামী ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্নও নিত্য জাগে। অন্তর্যামী বা ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক হইলেও অদৃশ্য নহেন, তিনি পৃথিবীতে মানুষের মধ্যেই আছেন। পৃথিবীকে ভালোবাসিয়াছেন এ কথা কবি বহু কবিতায় নানাভাবে বলিয়াছেন; কিন্তু কবির সে-ভালোবাসায় প্রকৃতিকে বেশি করিয়া নিকটে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে, মানুষ সেখানে গৌণ। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়াছে মাত্র। কিন্তু এই নূতন কবিতাগুচ্ছে মানুষ এবং প্রকৃতি হাত ধরাধরি করিয়া জগৎসংসারে অবতীর্ণ। তাই দেখি মানবলোকের মহিমায় চৈতালির নূতন কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। 'দেবতার বিদায়' 'পুণ্যের হিসাব' 'বৈরাগ্য' কবিতাত্রয়ে 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' বাক্যটির তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কড়ি ও কোমলের

১ সাহিত্য, সপ্তম বর্ষ, ১৩০৩ বৈশাখ; গীতবিতান, পৃ. ৬০৭।

২ ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দাসী পত্রিকায় (১৩০৩) চিত্রার পনেরো পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা করিয়াছিলেন। দ্র. শান্তাদেবী লিখিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দী বাংলা (১৯৪৭), পৃ ৪৪।

৩ পত্র, শিলাইদহ কুমারখালি, ৬ চৈত্র (১৩০২), প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ, পৃষ্ঠা ৪-৫।

৪ সূচনা, চৈতালি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫। ১৩৪৭ হেমন্তকালে লিখিত।

'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতালির কবিতা-কয়টির মধ্য দিয়া 'নৈবেদ্যে'র 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ' এই সুরে পৌঁছাইয়াছিলেন।

নৌকার খড়খড়ি খুলিয়া বাহিরকে দেখিতেছেন, সম্মুখ দিয়া ছায়ার মত ঘটনাস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহাই কাব্যের তুলিতে আঁকিয়া চলিয়াছেন। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় 'ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর স্থির স্রোতোহীন' চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে। 'পল্লীগ্রামে' 'সামান্য লোক' 'দুর্লভ জন্ম' 'কর্ম' কবিতায় সামান্য জিনিসের চিত্র। কর্ম, স্নেহদৃশ্য ও করুণা কবিতার মধ্যে আর্তের জন্য বেদনা অত্যন্ত স্পষ্ট। কর্মের ঘটনাটি সত্য, ছিন্নপত্রে[১] বিবৃত আছে। 'বন ও রাজ্য' 'সভ্যতার প্রতি' 'বন' 'তপোবন' কবিতা-চতুষ্টয় একত্র পঠনীয়; কবির মন একটি বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে যাইতে তপোবনে আসিয়াছে ও কালিদাসের কথা স্মরণে উদয় হইতেছে; কালিদাসের কাব্য ঋতুসংহার ও মেঘদূতের কথা মনে পড়ে। অত্যন্ত পুরাতন কথা কল্পনার চোখে দেখেন, আবার হঠাৎ বাতায়ন-পথ দিয়া চোখে পড়ে অত্যন্ত বাস্তব সত্য "নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা পশ্চিমি মজুর"। আর-একদিন দেখেন, "উলঙ্গ সে ছেলে ধূলি-পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে"। চোখে পড়ে "ছোটো মেয়ে খেলাহীন, চপলতাহীন", তাহার জন্য অকারণ দরদ মনকে ব্যথিত করিয়া তোলে।

> কোন্ অজানিত গ্রামে, কোন্ দূরদেশে
> কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
> তার পরে সব শেষ— তারো পরে, হায়,
> এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়! — অনন্ত পথে

শান্ত সমাহিত ভাবে ধরিত্রীর দিকে তাকাইয়া উঁহাকে বড়ই ভালো লাগিতেছে, তাই 'মধ্যাহ্নে' যেন বলিতেছেন—

> আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে;
> ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
> বহুকাল পরে।

'চৈতালি'র সুর পৃথিবীকে, মানবজীবনকে স্বীকার করিয়া নেওয়ার সুর। তাই এই পৃথিবীকে এত সুন্দর দেখেন—

> ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
> ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো। — প্রভাত

এই ধরায় জন্মলাভ দুর্লভ; সুতরাং ইহার আনন্দ কবি নিঃশেষে পান করিতে চান—

> যাহা-কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়।
> সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়। — দুর্লভ জন্ম

এবং

> ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার-আলো,
> মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো। — ধরাতল

এই সৌন্দর্য ও আত্মতৃপ্তির চোখে তিনি পদ্মাকে দেখিতেছেন; সেই চোখেই বিশ্বের 'তরুলতা, পশুপক্ষী, নদনদী বন, নরনারী' সকলের মিলনের মাঝে অপরূপ সুন্দরকে দেখিতেছেন; কবির চোখে কোথাও কোনো অসংগতি নাই,

১ ছিন্নপত্র, ১৮৯৫ অগস্ট ১৪। [১৩০২ শ্রাবণ ৩০]।

সমস্ত অর্থপূর্ণ প্রাণময়। 'পদ্মা' কবিতায় তাঁহার অন্তরের একটি কথা খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন; ছিন্নপত্রে বহুবার পদ্মার প্রতি তাঁহার মনের এই একান্ত অনুরাগের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে· ·
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ?· ·
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায় ?

সেই দিনে লিখিত হইলেও 'স্নেহগ্রাস' সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিঘাতে রচিত; পরদিনের লেখা 'বঙ্গমাতা' 'দুই উপমা' 'অভিমান' 'পরবেশ' (২৬ চৈত্র) কবিতা-চতুষ্টয়ও যে একই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া-উদ্বুদ্ধ তাহা কবিতা-কয়টি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের ধ্যানে ধরাকে অখণ্ডরূপে দেখিতেছেন; সেই ধরিত্রীর অখণ্ড জীবনের মধ্যে মানুষের সৃষ্ট আকস্মিকতা বা আংশিকতার বাধা তাঁহার কবিচিত্তকে পীড়িত করে: সে বেদনা তিনি চিরদিনই পাইয়াছেন, 'মানসী'র যুগে বাঙালির খর্বখণ্ডিত জীবনের দিকে তাকাইয়া তিনি সেই বেদনায় বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন"। আজও বাঙালির অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র সীমায়িত পঙ্গু জীবনের কথা ভাবিয়া অত্যন্ত বেদনায় বলিতেছেন—

· ·অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি—
বেষ্টন করিয়া ভাবে আগ্রহ-পরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ ?· ·
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার,
সন্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার। — স্নেহগ্রাস

'বঙ্গমাতা'কে আহ্বান করিয়া বলেন—

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে· ·
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে ক'রে।· ·
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি।

'দুই উপমা'য় বলিতেছেন—

সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনোমতে ;
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ-পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।

'অভিমান' কবিতায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়াছে—

যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করে নি সম্মান।··
যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ
তারি কাছে তারি 'পরে তোমার নালিশ !
নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পায় ফিরাতে—
তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্‌বিদিকে বাজাস নে ঢাক।

বিদেশী পোশাকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবজ্ঞা চিরদিনের ; 'পরবেশ' কবিতায় লিখিতেছেন—

কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ।
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ।

এই পাঁচটি কবিতার মধ্যে কিছুদিন পূর্বে রচিত 'অপমানের প্রতিকার' প্রভৃতি প্রবন্ধের রেশ ধ্বনিত হইতেছে। নাগর নদীতীরে অকস্মাৎ এই উত্তেজনা-বোধের কারণ কী আমরা জানি না। ইহার পরের কবিতাগুলি সেই ধরণের। যাহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "চৈতালিতে অনেক কবিতা দেখতে পাই যাতে গানের বেদনা আছে, কিন্তু গানের রূপ নেই।" 'তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো এসে হৃদয়ে আমার'কে গান বলিলেও সেটি গান হয় নাই ; কারণ "তখন যে-আঙ্গিকে আমার লেখনীকে পেয়ে বসেছিল তাতে গানের রস যদি বা নামে, গানের সুর জায়গা পায় না।"[১]

এই নাগর নদীতীরে বর্ষশেষ উদ্‌যাপন করিলেন ; সেদিন মনকে অভয় দিয়া ভয়কে বলিতেছেন—

দেবতা রাক্ষস নহে মেলি মৃত্যুগ্রাস ;
প্রবঞ্চনা করি তুমি দেখাইছ ত্রাস।··
তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের ?
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের। — অভয়

শেষ পংক্তিটির মধ্যে-যে একটি গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহার সহিত এখন আমাদের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইবে। ইহার দুই-তিন দিন পরে পতিসর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। গত ১১ই চৈত্র হইতে ২রা বৈশাখ ১৩০৩ সালের মধ্যে এই কবিতাগুলি রচিত ; স্বল্প সময়ের মধ্যে রচিত হইলেও কবিমনের বিচিত্র স্পন্দনের লীলা আমরা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না।

১ সূচনা : চৈতালি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫।

মালিনী

উত্তরবঙ্গ হইতে জমিদারি সংক্রান্ত কার্য উপলক্ষ্যে এবার চলিলেন উড়িষ্যা। জমিদারি পার্টিশনের কথা উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে ভ্রমণকালে তিনি বিস্তর বই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature in Nepal* তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই থাকিত। বইখানিতে প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথির বর্ণনা ও অবদানগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত গল্প দেওয়া আছে। এইসব গল্প হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু কবিতা ও নাট্য-উপাদান সংগ্রহ করেন, যথাযথস্থানে আমরা সেসব দৃষ্টান্তের কথা বলিয়া যাইব। এবার এই গ্রন্থ হইতে 'মহাবস্তু অবদান' অন্তর্গত এক উপাখ্যান অবলম্বনে 'মালিনী' নাট্যকাব্য রচনা করিলেন। তার মূলের সহিত কবির সৃষ্টি এত তফাত যে উহাকে চেনাই মুশকিল। এই নাট্যকাব্য রচনায় যে-একটু ইতিহাস আছে তাহা কবি অল্পকালপূর্বে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত। তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিম্‌রোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। গোলেমালে রাত হয়ে গেল। তাই পালিতসাহেবের অনুরোধে তাঁর ওখানেই রাত্রি-যাপন স্বীকার করে নিলুম। স্বপ্ন দেখলুম যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল, দুই হাতে শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।

"জেগে উঠে যেটা আমাকে আশ্চর্য ঠেকল সেটা হচ্ছে এই যে, আমার মনের এক ভাগ নিশ্চেষ্ট শ্রোতা মাত্র, অন্য ভাগ বুনে চলেছে একখানা নাটক। স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক, একটা কথাবার্তার ধারা গল্পকে বহন করে চলেছিল। জেগে উঠে সে আমি মনে আনতে পারলুম না।"[১]

'মালিনী'র গল্পটি রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা এই—

কাশীরাজ কিকির কন্যা মালিনী বুদ্ধশিষ্য কাশ্যপের উপদেশে ভিক্ষুণী হইয়াছে। এই সংবাদে নগরীর ব্রাহ্মণগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া রাজকন্যার নির্বাসন চাহিল। প্রজারা নির্বাসন চাহে জানিতে পারিয়া মালিনী স্বয়ং গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণসভায় উপস্থিত হইলেন। এই শান্তসমাহিত নারীমূর্তি দেখিয়া উদ্যতরোষ ব্রাহ্মণগণ মুহূর্তে শান্ত হইয়া গেল। তাহাদের বিদ্রোহভাব দূর হইল। তাহারা 'জয় জয়' রবে রাজকন্যাকে প্রাসাদে পৌছাইয়া দিল।

বিদ্রোহের নেতা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ক্ষেমংকর ও তাহার বন্ধু সুপ্রিয়। ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় ব্যতীত সকল ব্রাহ্মণই রাজকন্যার ধর্ম গ্রহণ করিল। ক্ষেমংকর বুদ্ধির দ্বারা সমস্তই বুঝে, কিন্তু সংস্কার ধর্মবোধ হইতে প্রবল। সে বুদ্ধের ধর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অপমানিত হইতে দিবে না। আবাল্যবন্ধু সুপ্রিয়কে রাজধানীতে রাখিয়া ক্ষেমংকর বিদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া বুদ্ধের ধর্মকে কাশী হইতে দূর করিবার জন্য প্রস্থান করিল। রাজধানীতে থাকিল সুপ্রিয়।

সুপ্রিয় রাজকন্যা মালিনীর সহিত শাস্ত্র-আলোচনা করিতে প্রায়ই যায়। ক্রমে ক্রমে পরস্পরের মধ্যে গভীর একটি আকর্ষণ দেখা দিল। সুপ্রিয় চিরদিন শাস্ত্র পড়িয়াছে, হৃদয় হইয়াছে প্রখর মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক। নারীচিত্তের সংস্পর্শে সেই কঠিন হৃদয় গলিল। এমন সময় ক্ষেমংকরের পত্র আসিল ; কার্যসিদ্ধি হইয়াছে, বিদেশী সৈন্য আনিয়া সে অচিরেই

১ সূচনা : মালিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪।

বেদবিরোধী ধর্মকে দূর করিবে। সুপ্রিয় সেই পত্র রাজাকে দিল। রাজা মৃগয়ার ছলে বাহিরে গিয়া ক্ষেমংকরকে বন্দী করিয়া আনিলেন।

রাজা ফিরিয়া আসিয়া মালিনীকে সুপ্রিয়র হাতে দান করিবেন স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে ক্ষেমংকরকে লইয়া বিচারার্থে প্রহরীরা সভায় উপস্থিত করিল; ক্ষেমংকরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল, কিন্তু মালিনী ও সুপ্রিয়র অনুরোধে রাজা তাহাকে ক্ষমা করিবেন ঠিক করিলেন। ক্ষেমংকরকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছাড়িয়া দিলে তুমি কী করিবে?" ব্রাহ্মণ নির্ভীকভাবে উত্তর করিয়াছিল, 'পুনরায় স্বকার্য সাধন'। ক্ষেমংকর বন্ধু সুপ্রিয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া যাহা বলিবার সবই বলিল, তার পর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হত্যা করিল। অবশেষে ঘাতককে আহ্বান করিল। রাজা ক্ষেমংকরকে হত্যা করিবার আদেশ করিলেন; মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

এই নাটকের মধ্যে ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় দুই বিরুদ্ধ চরিত্র। সুপ্রিয় মানবের ন্যায়ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে; লৌকিক বা আচারগত ধর্মকে বড় বলিয়া সে মানে না। তাহার মন শান্ত, কিন্তু সে দুর্বল এমনকি ভীরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ যেন 'গোরা'র বিনয়, 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ, 'বিসর্জনে'র জয়সিংহ।[১] ক্ষেমংকর দীপ্ত, গর্বিত, কঠোর; সংস্কারগত ধর্মকেই সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে; সে রঘুপতির ন্যায় কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ক্ষেমংকরকে কোথাও ভীরু বা দুর্বলভাবে বর্ণনা করেন নাই; আচারধর্মকে তিনি বিশ্বাস করেন না, তাঁহার সহানুভূতি সুপ্রিয়র সহিত, তাহার সংস্কারহীন ন্যায়ধর্মকে তিনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সে-পক্ষপাতিত্ব লেখার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই; ক্ষেমংকরকে তিনি মহৎ করিয়াছেন।

চৈতালি— দ্বিতীয়ার্ধ

উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া মাসখানেক কলিকাতায় কাটাইতে হইল। তাঁহার কাব্যের প্রথম সংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থা চলিতেছে। আর চলিতেছে জমিদারি পার্টিশন লইয়া নানা সাংসারিক অশান্তিকর আলোচনা; এতাবৎকাল ঠাকুরবাড়ির জমিদারি এজমালিতে দেখাশুনা হইত, রবীন্দ্রনাথের উপর ছিল তদারকের ভার। পাঠকের স্মরণ আছে, মহর্ষির ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারের জন্য জমিদারির অংশ পৃথক করিয়া দেওয়া হয়; তাঁহার পুত্রদ্বয় উভয়েই অল্পবয়সে মারা যান; জমিদারির আদায়পত্র শাসনব্যবস্থা এজমালিতে বরাবর হইত। গুণেন্দ্রনাথের পুত্রগণ গগনেন্দ্র সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্র সাবালক হইলে মহর্ষি তাঁহাদের এস্টেট পৃথক করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। মহর্ষির বয়স তখন আশির কাছাকাছি; মৃত্যুর পূর্বে সকলের যথাযথ প্রাপ্য যথোচিতভাবে বণ্টন ও সুব্যবস্থিত করিবার জন্য তিনি উদগ্রীব হইয়াছিলেন। তদনুসারে গগনেন্দ্রনাথের জমিদারি পৃথক করিয়া দেওয়া হইল; সাজাদপুরের জমিদারি তাঁহাদের অংশে পড়িল। জমিদারি সংক্রান্ত কার্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর চলিলেন, এই পরগণার সহিত সম্বন্ধ এইখান হইতে চুকিল।

কবি নৌকায়; মন শান্ত, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের মধ্যে সমাহিত হইবার জন্য আকুলিত। নদীযাত্রা, মৃত্যুমাধুরী, স্মৃতি, বিলয় (৭ শ্রাবণ ১৩০৩) এই কবিতা-কয়টির মধ্যে একটি মৃত্যুর কথা আছে। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞা

১ একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার যে, সুপ্রিয় বিনয় জয়সিংহ প্রত্যেকেই নারীর প্রেমের কাছে তাহাদের মত ও ব্যক্তিত্বকে খর্বিত করিয়াছে; নারীশক্তির জয় কবি আরও অনেক জায়গায় দেখাইয়াছেন।

তাঁহার বড় আদরের ছিল ; তাহার কথা তিনি পত্রের মধ্যে নানা স্থানে বলিয়াছেন, তাহারই মৃত্যুর কথা স্মরণ হইতেছে, এই স্বল্প আঘাতে কবির মন বোধ হয় একটু বেশি করিয়া ঈশ্বরনির্ভর হইতেছে।

সাজাদপুরে এবার আসিয়া দিন-সাতেক বোধ হয় ছিলেন। ৭ই হইতে ১৪ই শ্রাবণের মধ্যে বাইশটি কবিতা লেখেন। মন নানাভাবে উত্তেজিত। বিষয়ভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে যে তৃণাঙ্কুশপত্র পান তাহাতে মন বিষণ্ণ ও উৎক্ষিপ্ত হয়, নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। 'যাত্রী' কবিতাতে লিখিতেছেন—

কার কথা শুনে
মরিস জলিয়া মিছে মনের আগুনে ?· ·
কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুর ক্ষত।

'তৃণ' (১১ শ্রাবণ) কবিতায় বলিতেছেন—

হে বন্ধু, প্রসন্ন হও, দূর করো ক্রোধ।
তোমাদের সাথে মোর বৃথা এ বিরোধ।

'স্বার্থে' আছে—

কে রে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক
তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ,
লুকায় অনন্ত সত্য— স্নেহ সখ্য প্রীতি
মুহূর্তে ধারণ করে নির্লজ্জ বিকৃতি,
থেমে যায় সৌন্দর্যের গীতি চিরন্তন
তোর তুচ্ছ পরিহাসে।

সাজাদপুরের সহিত কবির মনের একটি গভীর যোগ ছিল, ছিন্নপত্র পাঠে[১] তাহা আমরা জানিতে পারি। এই পরগণা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইলে কবির মনে খুবই আঘাত লাগিয়াছিল, এই মনোভাব সাময়িক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে শান্তিমন্ত্র কবিতাটি পাঠ করিলে কবিতাটি স্পষ্টতর হইবে। এই বিদায়ের পূর্বে তিনি 'অতিথিবৎসলা নদী'র নিকট হইতে যে সুধাধারা 'দগ্ধহৃদয়ের মাঝে' পাইয়াছেন, তাহাই স্মরণ করিতেছেন 'শুশ্রূষা' কবিতায়।

এইসব বৈষয়িক অশান্তির মধ্যে কবির মনে পড়িতেছে কবি কালিদাসের কথা। কালিদাস তাঁহাকে চিরদিনই আনন্দ দান করিয়াছে ; কালিদাস-কল্পিত তপোবন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাঁহারই ঋতুসংহার মেঘদূত কবির যৌবনে মধুর সৌন্দর্য-আবেশ আনিয়াছিল ; প্রাচীন ভারতের মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা এই অতীত তপোবনের গৌরবে তাঁহার মনকে সাময়িকভাবে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল। আসল কথা, এই সময় হইতে কালিদাসের প্রভাব তাঁহার সাহিত্যে প্রবেশ করিতে দেখা যাইতেছে। অতীত ভারতের মধ্যে আদর্শের সন্ধান করিবার শিক্ষা তিনি কালিদাসের নিকট হইতেই বোধ হয় লাভ করিলেন ; কালিদাস গুপ্তযুগের ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের মিলিত দম্ভের মধ্যে বাস করিয়া অন্তরে অন্তরে পীড়া অনুভব করিয়াছিলেন ও প্রাচীনতর ভারতের মধ্যে কল্পনার মোহমন্ত্রবলে আদর্শের সন্ধানে ঘুরিয়াছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও সমসাময়িক সভ্যতা ও তাহার ব্যর্থতায় বিরক্ত মনে কালিদাসকেই স্মরণ

১ ছিন্নপত্রের শেষ পত্র, ১৩০২ অগ্রহায়ণ ৩০।

করিতেছেন ('কালিদাসের প্রতি' 'কুমারসম্ভব' 'মানসলোক')। কিন্তু বাস্তবের সহিত নিজ জীবনের ক্ষুদ্র সংগ্রাম দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছে বাস্তব জগতের ক্ষুদ্র দুঃখ কি সেই মহাকবিকেও ভোগ করিতে হয় নাই।

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত,
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো
হে অমর কবি! ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন? — কাব্য

রবীন্দ্রনাথের ভরসা আছে সবের ঊর্ধ্বে মহাকবি কালিদাস যেমন আজ উঠিয়া গিয়াছেন, তাঁহারও জীবনের উপর দিয়া যে নির্যাতন "অপমানভার অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার, অভাব কঠোরক্রূর", বহিয়া যাইতেছে তাহারও অবসান হইবে। কবির স্পর্শকাতর মন সামান্য বেদনাকেও অত্যন্ত তীব্র করিয়া তোলে; আবার প্রচণ্ড আঘাতকেও অত্যন্ত তীব্র করিয়া তোলে; আবার প্রচণ্ড আঘাতকেও অত্যন্ত শান্তভাবে বহন করিতে দেখি। তাই কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্য-পানে; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখদৈন্যদুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান। — কাব্য

রবীন্দ্রনাথের ইহাই আশার কথা; এই আশ্বাসেই বল পাইলেন, মহাকবির কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা পাইলেন। চৈতালির ন্যায় কাব্যও বাংলার সাহিত্য ক্রিটিকদের তীব্র সমালোচনা হইতে নিস্কৃতি পায় নাই। যুবক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩০৪ (কার্তিক?) মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে চৈতালির এক বিরুদ্ধ সমালোচনা পাঠ করেন।

চৈতালি পৃথক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল না, যে কাব্যগ্রন্থ সম্পাদিত হইতেছিল উহা[১] তাহার অন্তর্গত করা হইল, মালিনীও সর্বপ্রথম ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়, এই কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগৃহীত কাব্য। ইহার মধ্যে কবি তাঁহার বাল্যবয়সের রচনাসমূহকে স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে স্থান দিলেন না; বনফুল কবিকাহিনী ভগ্নহৃদয় শৈশব-সংগীত, রবিচ্ছায়া, কালমৃগয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে সেই-যে অপাংক্তেয় হইয়া গেল, তাহার পর আর তাহারা সাহিত্যের জাতে উঠে নাই। এইসব গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া কৈশোরক খণ্ড গঠিত হয় মাত্র। বলিতে গেলে এই সময়েই কবি সন্ধ্যাসংগীতকে তাহার কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাগুচ্ছ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সেই ধারাই

১ কাব্যগ্রন্থাবলী ১৩০৩ আশ্বিনে প্রকাশিত হয়। বোধ হয় ১৩০৪ সালের কার্তিক মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যুবক সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ চৈতালির এক তীব্র সমালোচনা-প্রবন্ধ পাঠ করেন: উহা সাহিত্য ১৩০৫ সালে প্রকাশিত হয়। দ্র. রমনীমোহন ঘোষ 'চৈতালি সমালোচনা' প্রতিবাদ, প্রদীপ প্রথম বর্ষ, ১৩০৫ শ্রাবণ। তরুণ সাহিত্যিক ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'প্রশ্ন' কবিতায় অত্যন্ত তীব্রভাবে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে আক্রমণ করেন। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

তবুও রবির আলো ম্লান হোল নাহি।...
হে কুক্কুর, ঘোষ কেন, কেন আক্রোশ নিষ্ফল
অত ঊর্ধ্বে পৌঁছে কি কণ্ঠ ক্ষীণ বল। ইত্যাদি

১ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, ১৫ আশ্বিন ১৩০৩। গ্রন্থাবলী অন্তর্গত কাব্যাদি কালানুক্রমে সজ্জিত।

এ পর্যন্ত চলিতেছে। এই সংগ্রহের জন্য কবি তাঁহার সমগ্র কাব্যসাহিত্যটাকেই নাড়াচাড়া করেন ; সেই নাড়াচাড়ার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'বিসর্জন' নাটকের পরিবর্তন। আমরা যে 'বিসর্জন' পড়ি তাহা প্রথম সংস্করণ হইতে অনেক পৃথক ; এই সময়ে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জিত ও সম্পাদিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে বিসর্জনের যেসব পরিবর্তন করা হয়, তাহার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এইসব পরিবর্তনের দ্বারা বিসর্জন যে সর্বাংশে স্থন্দর হইয়াছে তাহা উভয় সংস্করণের পাঠকদের নিকট সহজেই প্রতিভাত হইবে। ক্রিটিক হিসাবে নিজ রচনার কঠিন বিচার করিতে তাঁহার কোনো মায়া ছিল না।

কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়া গেলে কবি কয়েকদিন কার্সিয়াঙে গিয়া বাস করিয়াছিলেন ; সেই সময়ে (১৩০৩ কার্তিক ৭) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত' নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। অঘোরনাথ কবির সাধনায় প্রকাশিত 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উৎসাহিত হইয়া এই সংগ্রহকার্যে ব্রতী হন।

কাব্যসম্পাদন ছাড়া অন্যান্য কাজের মধ্যে চোখে পড়ে ছেলেমেয়েদের জন্য গ্রন্থ সম্পাদন ; পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহায়তায় 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে দুই খণ্ড গ্রন্থ এই সময়ে প্রকাশিত হয় (৮ অগস্ট ১৮৯৬)। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন, তাঁহার অনূদিত রামায়ণ বাংলাভাষায় স্থপরিচিত। পরযুগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে শিক্ষাদানকল্পে বহু পাঠ্য বই রচনা ও সম্পাদন করিয়াছিলেন, এই 'সংস্কৃত শিক্ষা' তাহার সূচনা। আমাদের মনে হয় তাঁহার পুত্রকন্যাদের সহজে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য এই গ্রন্থ সম্পাদিত হয় ; এই সময়ে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বয়স দশ বৎসর ও জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রের বয়স আট বৎসর— সংস্কৃত শিক্ষারম্ভের যথোপযুক্ত বয়স। মহর্ষির পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের সংস্কৃত মন্ত্র ও শ্লোক প্রত্যেক বালক-বালিকাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত আবৃত্তির দ্বারা আয়ত্ত করানো ছিল আবশ্যিক বিধান। সংস্কৃত শিক্ষার সম্বন্ধে মহর্ষির যেমন নিষ্ঠা ছিল, রবীন্দ্রনাথেরও সে-বিষয়ে উৎসাহের অভাব ছিল না। তাঁহার নিজের সংস্কৃত বুনিয়াদ খুব পাকা না থাকিলেও, প্রতিভাবলে সংস্কৃত-সাহিত্যের রসগ্রহণের ক্ষমতা অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতী স্থাপনের মুখে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণকে পাণিনির ব্যাকরণের সাহায্যে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য কবির কী উৎসাহ তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাহারো জানিবার কথা নহে।

সাহিত্যরচনা এখন বড়ই মন্দা। নানা অবান্তর বিষয় তাহাকে টানিতেছে। ১৮৯৬এর ডিসেম্বরে (১৩০৩ পৌষ) কলিকাতায় কন্‌গ্রেস কলিকাতার বিডন্ স্কোয়ারে সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র। অধিবেশনের প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথ উদ্‌বোধন-সংগীত 'বন্দে-মাতরম্' গাহিলেন ; তখন কবির কণ্ঠ ছিল যেমন মিষ্ট তেমনি তীক্ষ্ণ। সে-যুগে মাইক্রোফোন আবিষ্কৃত হয় নাই। কবির কণ্ঠ বিরাট প্যাণ্ডেলের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত শোনা গিয়াছিল ; তবে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, আজকালকার কন্‌গ্রেস প্যাণ্ডেলের তুলনায় সেযুগের প্যাণ্ডেল নিতান্তই সামান্য ছিল। শোনা যায় বঙ্কিমের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম্'এর প্রথমাংশ নিজে স্থর বসাইয়া বঙ্কিমকে শুনাইয়াছিলেন।[১] কন্‌গ্রেস হইতেছিল বিডন্ স্কোয়ারে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নিকটেই। ঠাকুরবাড়ি হইতে কন্‌গ্রেসের প্রতিনিধিদের জন্য একটি জমকালো পার্টি দেওয়া হইল।[২] রবীন্দ্রনাথ এই প্রীতি-সম্মেলন উপলক্ষে একটি গান রচনা করিয়া স্বয়ং গাহিয়াছিলেন ; গানটি 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'।[৩]

১ দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৪, ৫ আশ্বিন। দ্র. শ্রীকালিদাস রায়, রবীন্দ্রনাথের গৃহভূত, জয়ন্তী উৎসর্গ (১৩৩৮), পৃ. ২৪৮-৫৯।

২ শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ।

৩ গানটি ভারতীতে ১৩০৩ মাঘ সংখ্যায় স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়। দ্র. কল্পনা।

কন্‌গ্রেসের অল্পকাল পরেই মাঘোৎসব। এবার রবীন্দ্রনাথ উৎসবের জন্য এগারোটি গান রচনা করিলেন; চৈতালির কবিতার মধ্যে গানের বিষয় ছিল কিন্তু সুর আসে নাই মনে। এতদিন পরে ব্রহ্মসংগীত রচনার মধ্য দিয়াই সুরের মুক্তি হইল; নিজ অন্তরের গানের সুর অল্পে আসিতেছে।

পত্রিকার দায় না থাকায় লিখিবার প্রেরণাও কম, তবে 'খামখেয়ালী সভা'র আহ্বানে গল্প মাঝে মাঝে লেখেন, এবার লিখিলেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। নাটকটি খামখেয়ালীদের নিকট পড়িয়া শোনান (১৩০৩ চৈত্র) এবং সকলে মিলিয়া তাহার অভিনয়ও হয়। 'খামখেয়ালী সভা'র মোটামুটি বৃত্তান্ত পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'য় — পৃ. ১২৯-৩৬।

অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ কেদারের, গগনেন্দ্র বৈকুণ্ঠের, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অবিনাশের ও অবনীন্দ্র তিনকড়ির ভূমিকা গ্রহণ করেন।— ঘরোয়া পৃ. ১৩১। এই নাটকও বোধ হয় সংগীত-সমাজের উৎসাহে প্রণীত হইয়াছিল।

বৈকুণ্ঠের খাতার গল্পাংশ সংক্ষেপে এই: বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠ জ্ঞানতপস্বী, প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র আলোচনায় মত্ত, বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অবিনাশ তাহার ভাই, বড় চাকুরি করে, বয়স অনেক হইয়াছে, বিবাহ করে নাই, বাগানের শখ খুব বেশি। কেদার ও তিনকড়ি দুই লক্ষ্মীছাড়া লোক, জুয়াচোর ও ঠক। কেদার তাহার শ্যালীর সহিত অবিনাশের বিবাহ দিবার মতলবে বৃদ্ধের পুঁথি শোনে, চীনাবাজারের জুতার হিসাব চীনা-সংগীতশাস্ত্রের বই বলিয়া বৈকুণ্ঠের নিকট বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করে। অবিনাশ মনোরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। বিবাহ হইয়া গেলে কেদার তাহার যত আত্মীয়-কুটুম্ব একে একে আনিয়া বাড়ি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহার ইচ্ছা বৃদ্ধকে কোনোরূপে তাড়ায়। অন্তঃপুরে বৈকুণ্ঠের বিধবা কন্যা নীরুর উপর কেদারের এক পিসির অত্যাচার অবিনাশের দৃষ্টিগোচর হইলে সে আত্মীয়-কুটুম্বদের তাড়াইয়া দিল।

বৈকুণ্ঠের খাতায় স্বচ্ছ হাস্যরসের মধ্যে এমন-একটি করুণরস ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত যে উহা কেবল পাঠককে হাসায় না, উহা তাহার চক্ষুপল্লবকে অশ্রুসিক্ত করে। বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বী বৈকুণ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশের কল্পিত সুখের জন্য সংসারে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে উদ্যত, বিরোধ করিতে তিনি অনিচ্ছুক ও অক্ষম। এই ঘটনাটি 'বিসর্জনে'র গোবিন্দমাণিক্যের কথা মনে পড়াইয়া দেয় যিনি ক্ষমতা থাকিতেও শক্তির প্রয়োগ না করিয়া ভ্রাতাকে সিংহাসন ও রাজ্য দিয়া গেলেন। এই প্রহসনের মধ্যে যথার্থ চরিত্র ফুটিয়াছে তিনকড়ির; এটি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি। এই অত্যন্ত লক্ষ্মীছাড়া জুয়াচোর লোভী লোকটাকে ভালো না বাসিয়া থাকা যায় না। ভুলে-ভ্রান্তিতে ভরা সত্যকার হাড়ে-মাসে গড়া মানুষটা দেখা দিয়াছে অপরূপ ভঙ্গিতে।

বৈকুণ্ঠের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রচিত্তের আভাস আছে বলিয়া একবার মনে হয়। চক্ষুলজ্জার খাতিরে কাহাকেও কিছু না বলিতে পারার দুর্বলতা কবির মধ্যেও যথেষ্ট ছিল। 'গল্পসল্পে' যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত বানানো কথা নহে।[৪]

'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রকাশিত হইবার একমাসের মধ্যেই 'পঞ্চভূত' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইল; গ্রন্থখানি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সুহৃদ্বর করকমলেষু উৎসর্গ করেন। পাঠকের স্মরণ আছে 'সাধনা' পত্রিকায় পঞ্চভূতের ডায়ারি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ সৃষ্টি। বাংলাভাষায় এ শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয় নাই। প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী-কথা'র মধ্যে দূরতম অনুকৃতির আভাস পাওয়া যায়। তবে রবীন্দ্রনাথের গোরা চতুরঙ্গ শেষের কবিতা প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে এই ধরণের বাক্-চাতুর্যপূর্ণ কথাবার্তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উভয় শ্রেণীর

৪ দ্র. বিজ্ঞানী, গল্পসল্প।

আলোচনার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পার্থক্য রহিয়াছে ; পঞ্চভূতের ভূতগুলি নানাবিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন বটে তবে সে-আলোচনা আর্টিস্টের আনন্দ, উদ্দেশ্যহীন চিত্তবিনোদন মাত্র : কোনো সমস্যার সামঞ্জস্যগত সমালোচনা যে সম্ভব নহে, এবং রচনার উদ্দেশ্যও নহে তাহা কবি মুখবন্ধেই বলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু উপন্যাসগুলির মধ্যে কেবল আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথকেই পাই না, সেখানে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায় ; বিচিত্র সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়।

কল্পনার সূত্রপাত

চৈতালির শেষ কবিতা রচনার পর কয়েকমাস কবির কাব্যলেখনী বন্ধ হইয়া আছে। ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মানসসুন্দরীর উদ্দেশে স্বতঃউৎসারিত গীতধারা কোথায়—যে-গানে কবির কল্পনা, সৌন্দর্যের সাধনা সার্থক হয়, সে গান প্রাণে আসে নাই। কবিজীবনের দিক হইতে সে পর্বটা কবির পক্ষে দুঃসময় বলিতে হয়। সেই বেদনা সত্যই প্রকাশ পাইয়াছে 'দুঃসময়' কবিতায় (১৫ বৈশাখ ১৩০৪)। অন্তরে ক্লান্তি আসিয়াছে বলিয়াই যেন অন্তরকে সাবধান করিয়া দিতেছেন ; বাত্যাবিক্ষুব্ধ জীবনযাত্রায় মধ্যপথে যেন সে থামিয়া না যায়, তাহার উদ্যমকে রক্ষা করিতে হইবে। এই কথাটিই কবি কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন,

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী কবির এই কাব্যজীবনপর্ব সম্বন্ধে যে-মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা অন্য দৃষ্টিকোন হইতে লিখিত। "বিগত জীবনের স্মৃতিতে কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নূতন জীবনযাত্রায় পক্ষবিস্তার করিতে যাইতেছেন। কবি জীবনের এমন এক অবস্থার দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাহার পূর্ণ পরিচয় তিনি অবগত নহেন ; কিন্তু পিছনে ফেলিয়া আসা ঐশ্বর্যের দিকে চাহিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত পাইতেছেন না।" সমালোচকের এই ব্যাখ্যায় সকলের মন সাড়া দিবে কিনা সন্দেহ।

নূতন বৎসরে কবির কাব্যশ্রী ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সংখ্যার দিক হইতে এবারকার রচনা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে না সত্য, কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্যে তাহা অতুলনীয়। বৈশাখ মাসে রচিত চারিটি মাত্র কবিতা ; এই কবিতা-কয়টিকে পুরোভাগে রাখিয়া যে-কাব্যখণ্ড 'কল্পনা' নামে তিন বৎসর পরে (১৩০৭ বৈশাখ) প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে কবিমনের বিচিত্র লীলামাধুরী দেখা যায়, যথাযথ স্থানে আমরা তাহাদের আলোচনা প্রয়োজনমত করিব। কবির কল্পনাক্ষেত্র বিচিত্র। 'বর্ষামঙ্গল' লিখিয়া (১৭ বৈশাখ ১৩০৪) বর্ষার আবাহন করিলেন বৈশাখ মাসে ; সে কবিতা 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'—আজ অতি সুপরিচিত গান ; বাক্ ও অর্থের গাম্ভীর্যে বর্ষার উৎসব-ক্ষেত্রকে মুখরিত করিয়া তোলে। বৈশাখে যদি বর্ষামঙ্গল রচিত হইতে পারে, তবে 'চৈত্ররজনী'র (১৯ বৈশাখ) কল্পনা করা অসম্ভব নয়। বসন্তনিশীথের জ্যোৎস্না-প্লাবিত ধরার দিকে তাকাইয়া কত কথা মনে পড়ে—

কত নদীতীরে কত মন্দিরে
কত বাতায়ন তলে,
কত কানাকানি, মন-জানাজানি,
সাধাসাধি কত ছলে !

শাখাপ্রশাখার, দ্বার জানালার
আড়ালে আড়ালে পশি,
কত সুখদুখ কত কৌতুক
দেখিতেছ একা বসি। — চৈত্ররজনী

এই গোপন মন-জানাজানির মর্মকথাটি 'চৌরপঞ্চাশিকা'র মধ্যে অমর ভাষায় কবি প্রকাশ করিলেন (২৩ বৈশাখ ও ৪ জ্যৈষ্ঠ)। চোর কবি বিহ্লন পঞ্চাশটি শ্লোকে প্রেমের আদিরস বর্ণনা করেন; বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র তাহার অনুবাদ করিয়া প্রেমিকদের কণ্ঠে শ্লোকের মালা গাঁথিয়া সমর্পণ করিয়া যান।[১] আজ রবীন্দ্রনাথও সেই কবির জয়গান করিয়া কহিলেন—

ওগো সুন্দর চোর,
তোমারি রচিত সোনার ছন্দ
পিঞ্জরে তারা ভোর।
দেখিতে পায় না কিছু চারি ধারে,
শুধু চিরনিশি গাহে বারে বারে
তোমাদের চিরশয়নদুয়ারে—
ওগো সুন্দর চোর,
আজি তোমাদের দুজনের চোখে
অনন্ত ঘুমঘোর।

জ্যৈষ্ঠ মাসের[২] প্রথম সপ্তাহে কবি শান্তিনিকেতনে গিয়া কয়েকদিন আছেন। মনের মধ্যে কল্পনার বিচিত্র সুরতরঙ্গ চলিতেছে। সেখানে গিয়া লিখিলেন, 'ভ্রষ্টলগ্ন' (৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪), 'মার্জনা' (৮ই), 'স্বপ্ন' (৯ই), 'মদনভস্মের পূর্বে' (১১ই), মদনভস্মের পরে (১২ই)। এই কবিতাগুলি একত্র পাঠ করিলে কবিচিত্তে প্রেমের দ্বন্দ্ব কিভাবে নানা মূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছে তাহার একটি অখণ্ড রূপ দেখা যাইবে; প্রথম তিনটি কবিতায় লাজনতা প্রেমিকার ব্যর্থ-প্রেমের রুদ্ধ ক্রন্দন গুমরিয়া মরিতেছে; সে 'শরমে মরিয়া বলিতে' পারে না 'নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি'। 'মার্জনা'র মধ্যে প্রেমের ভীরুতা আরো স্পষ্ট; ভালোবাসিবার অপরাধের জন্য প্রেমাস্পদের কাছে এই প্রার্থনা—"মোরে দয়া করে কোরো মার্জনা, কোরো মার্জনা।" ইহা দুর্বলতা, দীনতার পরকাষ্ঠা। কিন্তু প্রেমিকা আশা রাখে সে একদিন রানীর মতন প্রিয়তমকে রত্নাসনে বসাইবে, প্রণয়শাসনে তাহাকে বাঁধিবে, দেবীর মত সকল বাসনা পুরাইবে। সকলই প্রেমের কল্পনা—রামধনুর ন্যায় সপ্তবর্ণ। চোখকে মুহূর্তের জন্য কেবল ধাঁধায়, মনকে ক্ষণিকের জন্য রঙিন করে। কিন্তু প্রেমের জন্য এমন দীনতা কেন। বাস্তবতার রূঢ়স্পর্শে মন যখন ক্লিষ্ট, তখন সে কল্পনার জগতে আশ্রয় খোঁজে, বাস্তব জগত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'দূরে বহু দূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে শিপ্রানদীপারে পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়া'রে খুঁজিতে যাওয়াই মনে করে নিরাপদ প্রয়াণ।

১ ভারতচন্দ্র মাত্র তিনটি শ্লোক অনুবাদ করেন। দ্র. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণ ভূমিকা, পৃ. ৮, ১৫-১৬, পৃ. ৩০০। ১৩০৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় রসিকচন্দ্র বসু লিখিত 'ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

২ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৩০৪) কবি কলিকাতায় ছিলেন। সেদিন চৌরপঞ্চাশিকা পরিবর্ধন করিয়া লেখেন। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭।

মনোলোকে মালবিকা 'দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের পরে', 'ফেলিল সর্বাঙ্গে উতলা নিঃশ্বাস'। স্বপ্নের মধ্যেও মধুর বাস্তবের জন্য দেহমন পিপাসিত।

প্রেমের ব্যর্থতায় চিত্ত আজ আকুল হইয়া আবাহন করিতেছে প্রেমের দেবতা মদনকে। শিবকোপানলে ভস্মীভূত হইবার পূর্বে মদন অঙ্গ ধরিয়া নবভুবনে ফিরিত; আজ তাহারই নিকট করুণ প্রার্থনা জানাইতেছে— উচ্ছ্বাসহীন প্রেমকে, প্রাণহীন প্রণয়কে সঞ্জীবিত করিবার প্রার্থনা—

এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে—
নবীন করো মানবঘর, ধরণী করো বিবশ
দেবতাপদ-সরস-পরশে।

কিন্তু মদন আজ কোথায়? সে তো অন-অঙ্গ। সে তো আজ বিশ্বময়, নরনারীর হৃদয়দ্বারে, অমূর্তভাবে বিরাজিত—

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণাযন্ত্রে মহাপুলকে!

আজ তরুণ-তরুণীরা মর্মভেদী সায়কের অপেক্ষায় নাই, ইহা আজ বিশ্বব্যাপী মর্মন্তুদ বেদনায় রূপ পাইয়াছে। তাই কবি লিখিতেছেন—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

'মদনভস্মের পর' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কুমার-সম্ভবের কাহিনীর যে-অপরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা কোনো সাহিত্যাচার্য ইতিপূর্বে করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

জ্যৈষ্ঠের শেষদিকে কবি শিলাইদহের বোটে 'পসারিনী' (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪) কবিতাটি লেখেন। শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন পূর্বে 'ভ্রষ্টলগ্ন' লিখিয়াছিলেন, এ যেন তাহারই পরিপূরক; সেই কবিতাটিতে যে-কথাটি 'মরমে মরিয়া' বলা হয় নাই, আজ 'পসারিনী'কে তাহা বলা হইল—

দাঁড়াও, যেয়ো না আর, নামাও পসরাভার
মোর হাতে দাও তব ডালি।

ভ্রষ্টলগ্ন ও পসারিনী পর পর পড়িলেই পাঠক বুঝিবেন যে এই দুইটি যেন যুগ্মকবিতা।

কল্পনায় কুসুম গাঁথিয়া, স্বপ্নে উজ্জয়িনী গড়িয়া মানসলোকে মালবিকা ও কাব্যলোকে পসারিনী সৃষ্টি করিতেছেন, সে-কবিকে কেহ দেখিতে পায় না, সে-কবিও কাহাকে দেখা দেন না। "কাব্যে যেমন দেখ গো কবি তেমন নয়"। কবি সম্বন্ধে এ যে কত বড় সত্যকথা, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে নৌকায় যখন থাকেন, তখন তিনি অন্তরে কবি হইলেও বাহিরে জমিদার। বাস্তব জগতের রূঢ়তা বোটের চারি দিকে অন্ধবেগে নিত্য খরস্রোতে ভাসিয়া চলে। মানুষ তাঁহাকে রেহাই দেয় না, তিনিও কাহাকে রেহাই দেন না। জমিদারির কাগজপত্র দেখাশুনা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করা, খাজনার হিসাব করা, সুদ কষা, বকেয়া আদায় ও মকুব করা, পূজার আশীর্বাদ ও অভিশাপ গ্রহণ প্রভৃতির তরঙ্গাভিঘাত চলে জমিদারকে ঘিরিয়া। এ সব

কল্পনা নহে, নিষ্করুণ বাস্তবতা। এই বাস্তবের মধ্যে জীবন যতই ডুবিতেছে, মন যেন তদূর্ধ্বে উঠিবার জন্য ততই তাহাকে অস্বীকার করিতেছে। স্বপ্নময় কল্পনার জীবন ও বাস্তবময় জমিদারের জীবনের বাহিরে আছে ভাবময় দেশের কাজ বা পলিটিক্স।

জ্যৈষ্ঠের শেষে (২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪, ১৮৯৭ জুন ১১) নাটোরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন। কলিকাতার ও মফস্বলের বহু গুণী জ্ঞানী নিমন্ত্রিত। অভ্যর্থনা সভার সভাপতি নাটোরের রাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। ইনি রবীন্দ্রনাথ হইতে বয়সে প্রায় সাত বৎসরের ছোট (১৮৬৮-১৯২৬)। উভয়ের জমিদারি ছিল সংলগ্ন; সৌহার্দ অবশ্য সেইজন্য হয় নাই; সৌহার্দ হয় জগদিন্দ্রনাথের সাহিত্যের রসগ্রাহিতার জন্য। সংগীতশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান থাকায় উভয়ের মধ্যে এই বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ১৮৯৩ সালে তিনি এস্টেটের মালিক হন ও সেই হইতে উভয়ের মধ্যে আসা-যাওয়া প্রায়ই চলিত। কবি এই মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ মহারাজকে 'পঞ্চভূত' উৎসর্গ করেন (১৩০৪ বৈশাখ)। জগদিন্দ্রনাথ জমিদারশ্রেণীর লোক হইলেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের সর্বপ্রকার আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিতেন। বাংলার ধনী জমিদারদের মধ্যে তিনিই প্রকাশ্যভাবে কন্‌গ্রেসের সদস্য হন।

জগদিন্দ্রনাথের উৎসাহে ও উদ্যোগে ১৮৯৭ সালের নাটোরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন আহূত হইল। সম্মিলনীর মনোনীত সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে সিবিল সার্বিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। সে-যুগে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী রাজকর্মচারীদের পক্ষে এভাবে যোগদান করাটা গবর্নমেণ্টের চক্ষে দূষণীয় হয় নাই; কারণ তাৎকালিক রাজনীতি আবেদন-নিবেদনের অভিযোগ ও ক্রন্দন পর্যায়ের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই, আত্মশক্তি লাভের প্রচেষ্টায় তাহার কল্পনা স্পষ্টভাবে উদ্দীপ্ত হয় নাই; সেইজন্য গবর্নমেণ্ট এইসব সভা-সমিতিকে আদৌ ভয়ের চক্ষে দেখিতেন না।

প্রাদেশিক সম্মিলনীকে এখন বলা হয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভা বা প্রভিন্‌শিয়ল কন্‌গ্রেস। পূর্বে ইহার অধিবেশন হইত কলিকাতায়; ১৮৯৫ সাল হইতে বাংলার প্রধান প্রধান শহরে সম্মিলন আহূত হইবার ব্যবস্থা হয়। প্রথম বৎসরে সম্মিলন হয় বহরমপুরে, সভাপতি হন আনন্দমোহন বসু; দ্বিতীয় বৎসরে কৃষ্ণনগরের সম্মিলনের সভাপতি হন গুরুপ্রসাদ সেন। তৃতীয় বৎসর উহা নাটোরে আহূত হইল।

তখনকার রাজনীতিকদের অভ্যাস ও বিশ্বাস-অনুসারে রাষ্ট্রনীতিক সম্মিলনের সকল কার্যই ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হইত। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণ ইংরেজিতেই লেখেন। এ দিকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকদিগের দেশের মঙ্গলকর্মে বিদেশী ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। সম্মিলনীর কাজকর্ম যাহাতে বাংলাভাষায় পরিচালিত হয়, তাহার জন্য নবীন দল বিশেষ আগ্রহান্বিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠের অভিভাষণ বাংলায় তর্জমা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ও ইংরেজি অভিভাষণ পাঠের পর উহা সভায় পাঠ করেন। অনুবাদের ভাষা শুনিয়া কোনো-একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মন্তব্য করেন যে উহা 'চাষাভুষা'দের বোধগম্য নহে। লেখা বাংলা বোধগম্য যদি না হয় তো ইংরেজি কেমন করিয়া সাধারণের বোধগম্য হইবে, এ কথা প্রতিবাদীরা ভাবেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠিক করিয়াছিলেন স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ দিবার সময় তিনি তাঁহার মন্তব্য জ্ঞাপন করিবেন। কিন্তু সে-সুযোগ মিলিল না; সভার দ্বিতীয় দিনে (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ : ১২ জুন ১৮৯৭) বৈকালে ভীষণ ভূমিকম্পে সভার কার্য বন্ধ হইয়া গেল। প্রলয়ান্তে আর সভা বসিল না।[১]

১ ঘরোয়া গ্রন্থে এই ভূমিকম্পাদির অতি সুন্দর ও সরস বর্ণনা আছে।

বহু বৎসর পরে কবি এই যুগের রাজনীতিক ব্যবস্থা স্মরণ করিয়া শচীন্দ্রনাথ সেনের গ্রন্থ[১] সমালোচনা ব্যপদেশে লিখিয়াছিলেন— "'সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা, ও গলা মোটা করে গবর্নমেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না।[২] সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলী সভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজশাহী সম্মিলনীতে নাটোরের ৺মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলা ভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। পর বৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা কন্‌ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্যোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে-গালি সব চেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে। এত বড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি, দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হত।" বোধ হয় নাটোরের ব্যাপারের পর মনের গ্লানি যেন দূর করিতে চাহিয়াছিলেন 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' লিখিয়া।[৩]

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তার বেশ। —কল্পনা

আশ্বিন মাসে (১৩০৪) কবি উত্তরবঙ্গের নদীতে নদীতে ঘুরিতেছেন, জমিদারির কাজ তদারকে ব্যস্ত। আকাশ

১ রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, প্রবাসী ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৭৩। Sachindranath Sen, *Political Philosophy of Rabindranath Tagore* গ্রন্থের সমালোচনা।

২ তু. কলিকাতা কন্‌গ্রেসে (১৮৯৭) সভাপতি রহমতুল্লা সিয়ানী বলেন, "That our business is to represent to Government our reasonable grievances and political disabilities and aspiration."

৩ 'কল্পনা' কাব্যখণ্ডে 'জগদীশচন্দ্র বসু' শীর্ষক একটি কবিতা ১৩০৪ সালে লিখিত দেখা যায়। তখন জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানী-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। সেই কথার উল্লেখ আছে কবিতার মধ্যে—

বিদেশের মহোজ্জ্বল-মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিতসভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে।

ইহার তিন বৎসর পরে স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস প্রদর্শনীতে জগদীশচন্দ্রের প্রশস্তি করেন। দ্র. গিরিজাশংকর, শ্রীঅরবিন্দ· ·পৃ. ২৯১।

মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে ঝড়, বর্ষণেরও অভাব নাই— কবির মনেও সুরের বন্যা নামিল। 'কল্পনা'র অনেকগুলি গান এই সময়ের রচনা— লজ্জিতা, হতভাগ্যের গান, যাচ্‌না, কাল্পনিক, মানসপ্রতিমা, সংকোচ, প্রার্থী, সকরুণা, প্রণয় প্রশ্ন, ভিখারি প্রভৃতি। 'হতভাগ্যের গান'এ সুর দেওয়া থাকিলেও উহা একটি দীর্ঘ কবিতা; ইহার মধ্যে 'ক্ষণিকা'র ক্ষীণ পূর্বাভাস ধ্বনিত হইয়াছে। চলন বিলের মধ্যে নৌকা চলিতেছে। ভীষণ ঝড়, নৌকা টলমল করিতেছে, আর কবি সুর করিয়া গান লিখিতেছেন—

> যদি বারণ কর, তবে গাহিব না,
> যদি শরম লাগে, মুখে চাহিব না।

মন কতটা আত্মস্থ থাকিলে প্রবল ঝড়ের মধ্যেও প্রাণে গান আসে তাহা সাধারণের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। এই সময়ে রচিত 'বিদায়' শীর্ষক গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার অগ্নিযুগের বহু যুবক—

> এবার চলিনু তবে।
> সময় হয়েছে নিকটে, এখন
> বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আবৃত্তি করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিল। সেইদিন এই কবিতার বাণী রুদ্রের আহ্বানের ন্যায় তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। গানটি প্রকাশিত হয় 'প্রদীপ' পত্রিকায়।[১] কোন পরিপ্রেক্ষায় ইহা রচিত তাহা আমরা অন্যত্র অলোচনা করিয়াছি।

গানের পালা শেষ হইলে শুরু হইল গল্প বলার পালা। তবে এ গল্প গদ্যে বলা হইল না— এ গল্প রূপ লইল ছন্দে, নাট্যকাব্য ও গাথারূপে। শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা (৫ই কার্তিক ১৩০৪), প্রতিনিধি (৬ই), গান্ধারীর আবেদন, পতিতা (৯ই), ভাষা ও ছন্দ, দেবতার গ্রাস (১৩ই), সতী (২০শে), মস্তক বিক্রয় (২১শে), নরক বাস (৭ই অগ্রহায়ণ), লক্ষ্মীর পরীক্ষা (২৯শে অগ্রহায়ণ) মাসাধিক কালের মধ্যে রচিত হয়; শেষ দুইটি নাট্যকাব্য শান্তিনিকেতনে লেখা। দুই বৎসর পরে রচিত হয় 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'। এই নাট্যকাব্যগুলির সহিত 'ভাষা ও ছন্দ' এবং কবিতা-দুইটি যোজনা করিয়া 'কাহিনী' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অপর কবিতাগুলি 'কথা' গ্রন্থের মধ্যে যায়; এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

বাংলা সাহিত্যে নাট্যকাব্য রবীন্দ্রনাথের একটি নূতন সৃষ্টি। এগুলিকে Reading Drama বলা যাইতে পারে, কারণ ইহাদের মধ্যে নাটকীয় গুণ স্বল্প, লিরিসিজিম্ই প্রবল। আমাদের মনে হয় রবার্ট ব্রাউনিঙের নাটকের সহিত এগুলির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই রচনার মধ্যে ব্রাউনিঙের প্রেরণা ছিল বলিলে কবিকে ছোট করা হইবে না। এই শ্রেণীর প্রথম নাট্যকাব্য প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১)। তার পর লেখেন চিত্রাঙ্গদা (১২৯৮), বিদায়-অভিশাপ (১৩০১) ও মালিনী (১৩০৩)। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত নাট্যকাব্য-সংগ্রহে তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে পৃথকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। কারণ যথাভাবে উহা নাটকও নহে, নাট্যকাব্যও নহে। কাঁচা কাব্য হিসাবে তত্ত্বের দিক হইতে পাকা কথা থাকা সত্ত্বেও উহা সাহিত্যের বড় আসন পায় নাই।

১ প্রদীপ, ১৩০৫ বৈশাখ। ১৩০৪ পৌষ (১৮৯৭ ডিসেম্বর) হইতে প্রদীপ প্রকাশিত হয়; সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ হইতে উহা পরিচালনা করিতেন। কলিকাতায় বৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত হইত। রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রিয়নাথ সেন ও বৈকুণ্ঠনাথ দাসের একটি ফটো ছিল। দ্র. Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Supplement, 1941, Vol. XII.

এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস এক শ্রেণীর রচনা; সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর নাটিকা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র ভাষা ও ভঙ্গি তাঁহার সকল নাটক ও নাট্যকাব্যের ভাষা ও রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহার ভাষা সরল, বলিবার ভঙ্গি সরস, বিষয়টিও আনন্দোজ্জ্বল হাস্যকৌতুকপূর্ণ। বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ভাষার ও রীতির পরিবর্তন হয়; এই ভাষায় গান্ধারীর আবেদন লিখিলে তাহা অপাঠ্য হইত। সুতরাং ভাষা ছন্দ ও ভাবের মধ্যে যে একটি সংগতি আছে তাহা এই নাট্যকাব্যগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টতর হয়। ভাষা ও ছন্দের কথা যখন উঠিল তখন নাট্যকাব্যগুলির আলোচনার পূর্বে কবির 'ভাষা ও ছন্দ'[১] কবিতাটি সম্বন্ধেই আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই কবিতায় একটি বড় সত্যের ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা হইতেছে—যাহা ঘটে, তাহা সত্য নহে, যাহা কবি সৃষ্টি করেন তাহাই সত্য।

> নারদ কহিলা হাসি, সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনী লইয়া নাট্য রচনা করিতেছেন, প্রশ্ন উঠিতে পারে মহাভারতের বা পুরাণের উপাখ্যানের সহিত কবি-রচিত আখ্যানভাগের মিল পাওয়া যায় না। কবি তাহারই উত্তর যেন পূর্ব হইতে এই কবিতার মধ্য দিয়া বলিয়া রাখিলেন—'সেই সত্য, যা রচিবে তুমি'।

এই কথার সমর্থনে 'কৃষ্ণচরিত্র'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি স্পষ্টতর হইবে। "তথ্য, যাহাকে ইংরেজিতে ফ্যাক্ট কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনা-বলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ফ্রুসাহেব বলিয়াছেন 'সেই কারণেই কবি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।' মহৎ ব্যক্তির কার্যবিবরণ কেবল তথ্যমাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য, সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।" ভাষা ও ছন্দে কবিদের সাহিত্যসৃষ্টির যে অধিকার নারদ বাল্মীকিকে দিয়াছিলেন, তাহা কবির নিজ রচনাসৃষ্টির সমর্থনে কৈফিয়ৎ। তিনি রামায়ণোল্লিখিত ঋষ্যশৃঙ্গ-উপাখ্যান লইয়া 'পতিতা' ও মহাভারত-বর্ণিত গান্ধারীর জীবনী লইয়া 'গান্ধারীর আবেদন' রচনা করিলেন বটে, তবে সেগুলি পরম্পরাগত আখ্যান হইতে পৃথক, নিজ কল্পনাপ্রসূত আখ্যান; কল্পনার যুগেরই উপযুক্ত কাব্য। একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে বলিতেছি; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত বিশিষ্ট কর্মী অধ্যাপক ধীরেন্দ্রচন্দ্র পাল *In search of Jesus* নামে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐতিহাসিক যীশুখ্রীষ্ট যে অলীক কল্পনা, তাহাই এক শ্রেণীর বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া প্রমাণ করেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে কবি তাঁহাকে বলেন যে, ইতিহাসে তাহাই সত্য যাহা মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা বা বোধ হইতে সৃষ্টি করিয়াছে। যীশু ছিলেন কি না সে প্রশ্ন সত্য নহে; এ কথা নিশ্চিত যে যীশুখ্রীষ্ট বহু মানবের অন্তরে স্থান পাইয়াছেন। যীশুর মহত্ত্বই মানব হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠ।[২]

প্রথম তিনটি নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে-কথাটি পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহা হইতেছে তাঁহার নিজের ধর্মবোধের কথা। লোকধর্ম রাজধর্ম ব্যবহারিকধর্ম মোক্ষধর্ম প্রভৃতি নানাকোঠায় মানুষ মানবধর্মকে ভাগ করিয়া সত্যধর্মের মধ্যে বিরোধ

১ ভাষা ও ছন্দ, ভারতী ১৩০৫ ভাদ্র, পৃ. ৪১১-৪১৬। দ্র. কাহিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫।

২ এই আলোচনাকালে জীবনীলেখক উপস্থিত ছিলেন; সেই স্মৃতি হইতে ইহা লিখিত হইল।

কল্পনা করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। রাজধর্ম নিঃসংকোচে লোকধর্মকে অবমাননা করিতে পারে, মোক্ষধর্ম মানবধর্মকে অনায়াসে লাঞ্ছনা করিতে পারে। মানবের শাশ্বত ধর্ম, নিত্য ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; সে সত্য লোকাচার ও রাজধর্মের ঊর্ধ্বে, এমনকি মোক্ষধর্মেরও উপরে। 'গান্ধারীর আবেদনে' দুর্যোধন রাজধর্মের নিকট লোক-ধর্মকে বলি দিয়া গর্ব করিতেছেন। গান্ধারী সত্যধর্মের পূজারী; তাঁহার কাছে "ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু, ধর্মেই ধর্মের শেষ!" সকল ধর্মের উপর মানবধর্ম; আচারের ধর্ম হইতে প্রেমের ধর্ম মহৎ; সংস্কারের ধর্ম হইতে মানুষের সহজধর্ম শ্রেষ্ঠ। প্রচলিত সত্যাসত্য, লৌকিক ধর্মাধর্মের সহিত তিনি শাশ্বত সত্যের আপোষ করিতে রাজি নহেন; সত্যকে অখণ্ডভাবে গ্রহণই মানবের ধর্ম। এই নাট্যে রবীন্দ্রনাথ সেই অখণ্ড সত্যই যে মানবের সত্যধর্ম এই তত্ত্বটি অতুলনীয় ভাষায় ও নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

'সতী' নাট্যটি মিস্ ম্যানিং-সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠিগাথা সম্বন্ধে অ্যাক্‌-ওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধবিশেষে বর্ণিত ঘটনা হইতে সংগৃহীত। এই মারাঠিগাথার গল্পে বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাঈ নাট্যের নায়িকা। অমাবাঈ কোনো মুসলমানকে ভালোবাসিয়া তাহাকে বিবাহ করে। অমাবাঈ-এর মাতা ম্লেচ্ছের সঙ্গে কন্যার এই বিবাহকে অস্বীকার করিয়া কন্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। যুদ্ধে অমাবাঈ-র যবন স্বামী নিহত হয়। বিনায়ক স্বহস্তে তাহাকে বধ করেন। পিতা কন্যাকে তাহার যবনঔরসজাত শিশুপুত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার জন্য বলিলেন; তাহার পতি ও পুত্র বিনায়কের চক্ষে মিথ্যা পাপ মাত্র, তাহাদিগকে ভুলিলেই ভালো, ভুলিলেই তাহার মুক্তি। জীবাজী ছিল অমাবাঈ-এর বাক্‌দত্ত। সেও সেই রাত্রের যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। বিনায়ক বলিলেন জীবাজী তাহার পতি, যবন পতি নহে। ইহার উত্তরে অমাবাঈ বলিল—

> তব ধর্ম-কাছে
> পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে· ·
> সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।
> · ·হৃদয় অর্পণ
> করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
> সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
> অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
> সেথায় সমান দোঁহে।

প্রেম মানবের ধর্ম; ইহা শাশ্বত ধর্ম— লৌকিক ধর্ম নহে। লৌকিক ধর্মে প্রেম জাতি বর্ণ বিচার করে। তাই মানুষের রচিত ধর্মানুসারে অমাবাঈ জীবাজীর পত্নী যবনের নহে। তাহাকে মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া জীবাজীর মৃতদেহের সহিত সহমৃতা করা হইল। অমাবাঈ প্রার্থনা করিল—

> তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
> ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

অমাবাঈ যথার্থ সতী; কিন্তু তাহার মাতা কন্যাকে পরপুরুষের সঙ্গে দাহ করিয়া সতীধর্মের জয় ঘোষণা করিলেন। প্রেম নিত্য; সেই নিত্যধর্ম ক্ষুদ্র করিলেন। প্রেম নিত্য; নিত্যধর্ম ক্ষুদ্র আচারধর্মের নিকট অপমানিত হইল। ধর্ম কুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ আচারধর্ম-বিরোধী, তিনি মানবের সত্যধর্ম, নিত্যধর্মের বিশ্বাসী।

তৃতীয় নাট্য 'নরকবাস'। এখানেও সেই মহান্ সুরটি পাই। পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নিত্য সত্য, যেমন সত্য স্বামীস্ত্রীর

নিত্যসম্বন্ধ। রাজা সোমক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রক্ষা করিতে গিয়া পিতৃধর্ম পালনে বিরত। নিজ পুত্রকে যজ্ঞে আহুতি দিয়া মহাপুণ্য অর্জন করিয়া স্বর্গে চলিয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয়ের অন্যতম ধর্ম বাক্যরক্ষা, তাহা পালন করিয়া যশস্বী। লৌকিক ধর্মের আদর্শে তিনি পুণ্যাত্মা। স্বর্গের পথে ঋত্বিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। নরকে ঋত্বিককে দেখিয়া রাজার চেতনা হইল। তিনি পুণ্যলোভাতুর হইয়া নিজের নিষ্পাপ পুত্রকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, এই কথা মনে জাগিল; তিনি ধর্মকে বলিলেন, ঋত্বিক যে-পাপে পাপী তিনিই তো সেই অপরাধে অপরাধী: তা ছাড়া পিতাপুত্রের নিত্য সত্য সম্বন্ধকে তিনি আঘাত করিয়াছেন, তাঁহার স্বর্গে যাইবার অধিকার নাই। যে-লৌকিক ধর্ম তাঁহাকে গৌরব দান করিতেছিল তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বয়ং নরকবাস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। লৌকিক ধর্ম অপেক্ষা মানুষের 'মনুষ্যত্ব ধর্ম' শ্রেষ্ঠ সেই কথা লেখক তাঁহার এই নাট্যকাব্যেও দেখাইলেন।

যদিও দুই বৎসর পরে রচিত, তবুও এই নাট্যগুলির সহিত একই ভাবে যুক্ত 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'। কর্ণ-যে বিদ্রোহী তাহার কারণ কুন্তী তাঁহার আদিম মাতৃত্বধর্ম পালন করিতে পারেন নাই, লোকভয়ে সমাজভয়ে তিনি তাঁহার মাতৃত্বধর্মকে অবমাননা করেন— যে-ধর্ম মানবের আদিম ধর্ম। কুন্তী কর্ণকে পাণ্ডবদের পক্ষে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলে কর্ণ উত্তর করিলেন—

> যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ—
> তাহারে দিতেছ মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস।
> মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
> এক মুহূর্তেই মাতঃ, করেছ নির্মূল
> মোর জন্মক্ষণে। সূতজননীরে ছলি
> আজ যদি রাজজননীরে বলি,
> কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
> ছিন্ন ক'রে ধাই যদি রাজসিংহাসনে,
> তবে ধিক্ মোরে।

তত্ত্বের দিক ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্যের দিক হইতেও এই নাট্যকাব্যগুলি অতুলনীয়। মনের যে ঘাত-প্রতিঘাতে ইহাদের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য। দুর্যোধন, ভানুমতীকে আমাদের যতই খারাপ লাগুক, তাহাদের তেজোদীপ্ত নির্ভীক ক্ষত্রোচিত বাণী তাহাদেরই উপযুক্ত বলিয়া মন প্রশংসমান হয়। বিনায়ক রাও তাহার যবন জামাতাকে হত্যা করিয়া কন্যাকে বিধবা করেন, সে কঠোরভাবে কন্যাকে তিরস্কার করিতেছিল। কিন্তু যেই তাহার স্ত্রী কন্যার বিরুদ্ধে গেল তখনই তাহার কাতর পিতৃহৃদয় কন্যার দুঃখে কাতর হইল— পিতা কন্যার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ঘটনাটি সামান্য হইলেও সূক্ষ্ম বিচারে ইহার সৌন্দর্য ধরা না পড়িয়া যায় না। শেষোক্ত নাটকে কর্ণের প্রার্থনা—

> জয়লোভে যশলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি
> বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

কর্ণের যে যুক্তি তাহার উপর কেহই বলিতে পারে না যে কর্ণের পক্ষে পাণ্ডবপক্ষে আসা উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের আর্ট এইসব জায়গায় অপরূপ সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এ তর্জমা— The Foundling Hero— স্টার্জ মুর-এর করা। তিনি এই ছোটো নাট্যরচনার

মধ্যে গভীর epic সুরের সন্ধান পাইয়াছিলেন। Sturge Moore ইংরেজি তর্জমা অবলম্বন করিয়া অমিত্রাক্ষরে আগাগোড়া রচনাটিকে ইংরেজি কাব্যরূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১]

এই কয়খানি নাট্যকাব্যের বিশ্লেষণ করিলে কবির মনোভাব সম্বন্ধে একটি কথা খুবই স্পষ্ট দেখিতে পাই। সেটি হইতেছে লৌকিক মতামত বা আচার সংস্কারাদি না মানিবার একটা বিদ্রোহ ভাব। প্রাচীন লৌকিক ধর্মই যে মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম নহে, সবার উপরে একটি যে নিত্য সত্য ধর্ম রহিয়াছে— যাহা অহিংস, অসাম্প্রদায়িক, যাহা সর্বজীবের কল্যাণ-ইচ্ছায় পূর্ণ, যাহা যুক্তিতে সুদৃঢ়— সেই ধর্মই মানবের ধর্ম। নাট্যগুলি সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া প্রচার করিতেছে।

একখানি পুরাতন পত্রেও রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি বলিয়াছেন; "ঠিক যাকে সাধারণ ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠেছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়— একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব— আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তা অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব, সেই আমার চরম সত্য।"[২]

'গান্ধারীর আবেদন' (১৩০৪) অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে কবি পড়িয়া শোনান; এই সময়ে অনেকেরই ধারণা হয় যে এই নাট্যকাব্যের মধ্যে লোকনিন্দা সম্বন্ধে যে-উক্তি আছে, তাহার অন্তরালে কোনো রাজনৈতিক অর্থ আছে। "নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে, নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।" এই যে উক্তি, ইহার পশ্চাতে আছে সমসাময়িক বৃটিশ গভর্নমেণ্টের liberty of speech and freedom of the press সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের চেষ্টা। এই সময়ে ভারতীয় ফৌজদারি আইনের ১২৪ক ধারা ও ৫০৫ ধারার সংশোধন হইবার প্রস্তাব চলিতেছিল; বৃটিশরাজ অন্ধের ন্যায় যেন বলিতে চাহিতেছিলেন— "অব্যক্ত নিন্দায় কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজমর্যাদায়।" ১৮৯৭-এ অমরাবতীতে ত্রয়োদশ কন্‌গ্রেস অধিবেশনে এই আইনের পরিবর্তনবিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কয়েকদিন পরে কবি 'কণ্ঠরোধ' শীর্ষক যে-প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা ইহারই অনুক্রমণ। কবির মনে এই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ব্যতীত তৎকালীন আরও কয়েকটি সামাজিক ঘটনা জাগিতেছিল। গান্ধারীর এই যে উক্তি "পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ যে নর পত্নীরে হানি' লয় তার শোধ সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।"— ইহার মধ্যেও যে সত্য ইঙ্গিত আছে তাহা সমসাময়িক পত্রিকাদি দেখিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন। "পুরুষেরে ছাড়ি' অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ 'পরে" কলঙ্কের বোঝা প্রকাশের ফলে কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকের কারাগার হয়। সাহিত্যজীবের

১ Thomas Sturge Moore (1870-1944) English poet. Born at Hastings. Best known for his poetry The Vinedresser (1899). Is also known as a wood engraver and art critic; also distinguished as a designer of bookplates and bookbindings. . . . The Foundling Hero is to be found in the *Collected Works* of Moore (1931).

২ 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে উদ্ধৃত পত্র, পৃ. ৯৭১। দ্র. আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী।

এই অপমানকর, রুচিবিগর্হিত ব্যবহারের জন্য কবি যেন অত্যন্ত লজ্জিত; তাহাকে তিনি 'শুধু পাষণ্ড' বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে 'কাপুরুষ' বলিয়া চরম নিন্দা করিলেন।[১]

১৩০৫ সালের সংসার

১৩০৫ সালে ভারতী পত্রিকার সম্পাদকত্বের দায়িত্ব আসিয়া রবীন্দ্রনাথের উপর পড়িল; সাধনা বন্ধ হইয়া যাইবার পর (১৩০২ কার্তিক) প্রায় আড়াই বৎসরকাল প্রত্যক্ষত কোনো পত্রিকার ভার ছিল না। গত দুই বৎসর ভারতীর ভার ছিল তাঁহার ভাগিনেয়ী হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবীর উপর, তার পূর্বে দশ বৎসর ছিল ইঁহাদের জননী, কবির জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারীর পরিচালনাধীন।

এই সময়ে প্রদীপ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় এই প্রথম ত্রিবর্ণ-চিত্রাদিযুক্ত মাসিকপত্র (১৩০৪ পৌষ)। এই পত্রিকার প্রকাশক ও মালিক ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ দাস। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৩০৪ পৌষ - ১৩০৬ মাঘ)। রবীন্দ্রনাথ প্রদীপের পাঠক ছিলেন এবং দ্বিতীয় বর্ষে (১৩০৫-০৬) পাঁচটি কবিতা ও 'মন্দিরাভিমুখে' নামক মূর্তি বিষয় লইয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার সুপরিচিত কবিতা 'সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে' 'প্রদীপে' প্রকাশিত হয় (১৩০৫ বৈশাখ)।

ভারতী মাসিকপত্রের সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথকে দুইটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিতে হইত; একটি হইতেছে সাময়িক রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ঘটনা লইয়া প্রবন্ধ রচনা এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে পাঠকদের মনোরঞ্জনার্থ গল্প রচনা। সেইজন্য ভারতীর সম্পাদকত্ব কালটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির গদ্যযুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ কয়েকটি গান ও দুই-চারিটি কবিতা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কাব্য এ-বৎসরে রচিত হয় নাই এবং কোনো গ্রন্থই মুদ্রিত হয় নাই।

দেশের ও দশের সমস্যা লইয়া প্রবন্ধ লিখিলেই কিয়দপরিমাণে মানসিক শান্তি আসে— মনে হয় কর্তব্য করিলাম; কিন্তু নিজ সংসারের যে সব সমস্যা— তাহা তো তাহাকে একাকীই বহন করিতে হয়। সাহিত্যসৃষ্টি, জমিদারি পরিচালনা, কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ের দায় পোহানো প্রভৃতি তো আছেই; কিন্তু এখন তাঁহার নিজজীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইতেছে সন্তানদের শিক্ষার প্রশ্ন। কবি নিজজীবনে শিক্ষা বিষয়ে গতানুগতিক পথে চলেন নাই; বিদ্যালয়ে প্রকোষ্ঠমধ্যে বিদ্যালাভের বেদনাময় স্মৃতি তাঁহার স্পষ্ট আছে বলিয়াই তিনি নিজ সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা গোড়া হইতেই পৃথকভাবে করিয়াছিলেন; গৃহ-শিক্ষকরা তাঁহার প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন; শিবধন বিদ্যার্ণবের সাহায্যে 'সংস্কৃত শিক্ষা' (১৮৯৬) সম্পাদন করিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকোর বৃহৎ বাড়িতে বহু গোষ্ঠিসমন্বিত, বহু কুটুম্ব-কুটুম্বিনী পরিবেষ্টিত সংসারে সকলেই গতানুগতিকের পথাশ্রয়ী। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রেরা, হেমেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাগণ যথাবিধি স্কুলে কলেজে গিয়া পড়িয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ সেই পথ গ্রহণ করেন নাই। কিছুদিন হইতে তাঁহার মনে হইতেছে জোড়াসাঁকোর পরিবেশের বাহিরে তাঁহার পরিবার লইয়া যাইবেন। বাড়ির কোনো কোনো ভ্রাতুষ্পুত্রের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা মহর্ষির পবিত্র জীবনাদর্শকে পদে পদে নিন্দিত করিতেছিল— সেসব কোনোপ্রকারে কেহ সংযত বা শমিত করিতে পারেন নাই। এইখানে কবির অন্তরে সংগ্রাম চলে আদর্শের সহিত বাস্তবের। এ ছাড়া একটা বৃহৎ বাড়ির মধ্যে বহু পরিবারে একত্র বাস

৩ দ্র. রবিরশ্মি, পূর্ব ভাগে, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪।

করিলে, নারীদের মধ্যে মন-কষাকষি অনিবার্য। বিরোধের বিষয় ক্ষুদ্র হইলেও বালুকণার ন্যায় চোখে পড়িলেই উহা জগতকে অন্ধকার করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ইতিমধ্যে স্থির হইল রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রের উপনয়ন হইবে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে শেষজীবনে দেখিয়াছেন, বা যাঁহারা তাঁহার জীবনের শেষের দিককার রচনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহারা কবিকে সর্বধর্ম সর্বসমাজ সর্বদেশকাল-অতীত বাণীর প্রচারক বলিয়া জানিবেন। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, এখন তিনি সামাজিক ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে পৈতৃক পথের অনুবর্তক। তাঁহাদের পরিবারের সকলকেই আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মানিয়া চলিতে হইত— কারণ মহর্ষি এখনো জীবিত। আদি ব্রাহ্মসমাজে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ব্যতীত হিন্দুসমাজের অনেক কিছুই অনুসৃত হইত— বর্ণভেদ স্বীকৃত হইত— বিবাহাদি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারো সহিত নিষ্পন্ন হইতে পারিত না— উপনয়নাদি যথাবিহিত সম্পাদিত হইত; পৌরোহিত্যাদি কর্মে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অধিকার ছিল না; তবে সকল অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণরূপে অপৌত্তলিকভাবে সম্পাদিত হইত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আলোচ্যপর্বে যে এইসব অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে মতবাদ পোষণ করিতেন, তাহার কোনো ব্যবহারিক প্রমাণ আমরা পাই না; তাঁহার সে-যুগের এব পরবর্তী কয়েক বৎসরের রচনার মধ্যে হিন্দুসমাজের বহু লোকাচার, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বাদির সমর্থন পাই— এমনকি আচারিক শৈথিল্যকেও সামাজিক অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন দেখা যায়।

মহর্ষির ইচ্ছানুসারে রথীন্দ্রের উপনয়ন হইল শান্তিনিকেতনে (১০ বৈশাখ ১৩০৫);[১] রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন-সংস্কার উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ পঞ্জাবের আর্যসমাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের আর্যসমাজের সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিয়া অমূর্ত একেশ্বরের পূজা প্রবর্তন ও প্রচারের উদ্দেশ্যে বলেন্দ্রনাথ কিছুকাল হইতে চেষ্টান্বিত ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে, আমাদের মনে হয়, আর্য ও ব্রাহ্ম-সমাজের মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া পঠন-পাঠনের আয়োজনও করেন; সেই উদ্দেশ্যে গৃহও নির্মিত হয়— কিন্তু বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে (১৩০৬ ভাদ্র) তাহা কার্যকর হয় নাই; সেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গৃহটিকে কেন্দ্র করিয়া ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন 'বোর্ডিং স্কুল' স্থাপন করেন। সেসব কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

রথীন্দ্রনাথ তাঁহার উপনয়নের স্মৃতি সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "১৮৯৭ অব্দের কাছাকাছি একটা সময়ে বলুদাদা (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নিখিল ভারত ধর্মসম্প্রদায় গঠন করার জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। বাংলাদেশের আদি, নববিধান ব্রহ্মসমাজ, পঞ্জাবের আর্যসমাজ ও বোম্বাইএর প্রার্থনাসমাজ— এই তিন সমাজের সমন্বয় করে একটি Theistic Society গঠন করা— এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ইতিপূর্বে তিনি পঞ্জাব বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে বিভিন্ন সমাজের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহযোগিতার সম্ভাবনা কতখানি আলাপ করে বাড়ি ফিরেছেন। কর্তাদাদামশায়ের (দেবেন্দ্রনাথ) কাছে বলুদাদা প্রস্তাব করলেন যে শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সমাজের নেতাদের আহ্বান করা হোক, সেইখানে আলাপ আলোচনা অন্তে একটা মীমাংসায় পৌঁছানো যাবে।"[২]

রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র, কলিকাতায় তাঁহারা সকলে আছেন; শিবধন বিদ্যার্ণব সংস্কৃত শেখান। মহর্ষি আদেশ করিলেন যে— রথীন্দ্রের উপনয়ন-সংস্কার শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়। উপনয়ন মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হয়। যথা নিয়ম রথীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মণ বটুর ন্যায় ভিক্ষাপাত্র

১ জন্মভূমি, ৯ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা ১৩০৭ পৌষ, পৃ. ১৮৬।

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২৬৪।

লইয়া ঘুরিতে ও তিন দিন শূদ্রাদির মুখদর্শন না করিয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এইভাবে কবির জ্যেষ্ঠপুত্রের উপনয়ন-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইল।

কলিকাতার বাড়িতে কবির মন কেন টিঁকিতেছে না, তাহার কারণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলন হইতে ফিরিয়া শিলাইদহ হইতে তিনি যে-দীর্ঘ পত্র তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পারিবারিক অশান্তির আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন, "তুমি অনর্থক মনকে পীড়িত কোরো না। শান্ত স্থির সন্তুষ্ট চিত্তে সমস্ত ঘটনাকে বরণ করে নেবার চেষ্টা কর।··স্বার্থহানি, ক্ষতি, বঞ্চনা— এ সব জিনিসকে লঘুভাবে নেওয়া শক্ত, কিন্তু না নিলে জীবনের ভার ক্রমেই অসহ্য হতে থাকে এবং মনের উন্নত আদর্শকে অটল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।"[১] এই পত্রের একস্থানে কবি তাঁহার পারিবারিক জীবনের আদর্শের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন; তিনি লিখিতেছেন, "আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক, আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক্ আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য্য আপনাদের চেয়ে প্রধান হোক্··। সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লিগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।"

এই পত্রখানি লিখিত হয় জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি সময়ে এবং ইহারই কিছুকাল পরে কবি সপরিবারে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে গৃহবিদ্যালয় পত্তন করিলেন। এ ছাড়া কুষ্টিয়ার ঠাকুর-কোম্পানির ব্যবসায়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জড়িত; শিলাইদহ হইতে কুষ্টিয়ায় আসা-যাওয়া সহজ— সেজন্যও হয়তো শিলাইদহে সংসার পাতিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভারতীর সম্পাদক—১৩০৫

১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণ করিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত কার্যে ব্রতী হইলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা রাজনৈতিক সমাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা। এইসব প্রবন্ধের পটভূমে যে সব ঐতিহাসিক কারণ ছিল, তাহা কালান্তরে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে; অথচ সেই তথ্যগুলি না-জানিলে প্রবন্ধগুলির অর্থ অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে; সেইজন্য পরবর্তী যুগের পাঠকদের নিকট তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ভারতবর্ষময় জাতীয়তাবোধের যে-নূতন প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহার হোতা ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক (১৮৫৬-১৯২০)। ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কন্‌গ্রেস দেশের সকল শ্রেণীর লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে আর পারিতেছিল না। গত বারো বৎসরের কন্‌গ্রেস আইন-অনুগত আন্দোলন পরিচালনার অজুহাতে বৃটিশরাজের কাছে আবেদন ও নিবেদন করিয়া আসিয়াছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ন্যায়পরায়ণতার দোহাই দিয়া, ইংরেজ জাতির স্বাধীনতা-প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিপাহীবিদ্রোহোত্তর ঘোষণা-পত্রকে ভারতীয়দের ম্যাগ্‌না কার্টা বা স্বাধীনতার কবচপত্র কল্পনা করিয়া, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া— আমরা আপনাকে স্বাধীনতা পাইবার পরমযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছিলাম। এই সব কারণে কন্‌গ্রেস একশ্রেণীর

১ চিঠিপত্র ১ম। [শিলাইদহ, জুন ১৮৯৮]।

লোকের নিকট হইতে সম্মান হারাইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিলকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে নূতন প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহার আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি। টিলকের কাছে স্বদেশ ও স্বধর্ম প্রতিশব্দবাচক; এই চিন্তাপদ্ধতি মহারাষ্ট্রীয়দের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, কারণ আজ ভারতময় হিন্দু-জাতীয়তাবোধের যে-আন্দোলন চলিতেছে, তাহার প্রবর্তক মহারাষ্ট্র বীর দামোদর সবরকার। অত্যাধুনিক উদাহরণ আর দিলাম না।

পাঠকদের স্মরণ আছে কয়েক বৎসর পূর্বে (১৮৯৩) মহারাষ্ট্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র পুণা নগরীতে গো-বধ-নিবারণী সভা স্থাপিত হইলে, কিভাবে তাহার তরঙ্গ হিন্দুভারতের নানাস্থানে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। অতঃপর টিলক মহারাষ্ট্রীদের গণপতি পূজাকে 'সার্বজনিক' গণদেবতার পূজায় রূপান্তরিত করিয়া মারাঠাদের ধর্মীয় জীবনে সংঘচেতনা আনয়ন করেন। এই গণধর্মবোধের সহিত রাজনৈতিক আত্মচেতনা প্রবুদ্ধ করিবার জন্য শিবাজী-উৎসব প্রবর্তিত হয় (১৮৯৫)। এমন সময়ে বোম্বাইএ প্লেগ দেখা দিলে (১৮৯৬) টিলক ও তাঁহার যুবক স্বেচ্ছাসেবকদল প্লেগের বিভীষিকা ও তাহা হইতে ভীষণতর প্লেগ-প্রতিষেধক-কর্মচারীদের উৎপীড়ন হইতে মারীভয়গ্রস্ত নগরীকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজী-উৎসব মারীভয়ের জন্যে শিবাজীর জন্মদিনে অনুষ্ঠিত না হইয়া ১৩ই জুন (১৮৯৭) সম্পন্ন হইল। এই উৎসবক্ষেত্রে হিন্দুমেলার ন্যায় নানাবিধ শারীরিক ব্যায়াম প্রদর্শিত হইত, সভায় স্বদেশ ও স্বধর্ম সেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত ও কবিতা আবৃত্ত হইত। এই উৎসব-অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরে টিলক-সম্পাদিত 'কেশরী' সাপ্তাহিকে (১৫ই জুন) শিবাজী-উৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা ও উৎসবে পঠিত কবিতাটি প্রকাশিত হইল। ইহার কয়েকদিন পরে (২২শে) দুই জন প্লেগ অফিসার (W. C. Rand, I. C. S. Lieutenant Ayerst) পুণার রাজপথে দুইজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক দ্বারা নিহত হন। ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রীয় যুবসঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় নাটু ভ্রাতৃযুগলকে বোম্বাই গবর্নমেণ্ট ১৮২৭ সালের এক রেগুলেশন আইনবলে বিনাবিচারে নির্বাসিত করিয়াছিলেন এই ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন যুব-আন্দোলনের নেতা ও টিলকের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ।

র‍্যান্ড্ হত্যার জন্য গবর্নমেণ্ট টিলককে পরোক্ষভাবে দায়ী করিলেন ও ২৭শে জুন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। দীর্ঘকাল মোকদ্দমা চলিয়াছিল; অবশেষে টিলকের দেড় বৎসরের জন্য জেল হইল। বিচারক স্ট্রাচি (Strachy) ছয় জন য়ুরোপীয় ও তিন জন ভারতীয় জুরি (Juror) লইয়া বিচারে বসেন, য়ুরোপীয় জুরি টিলককে দোষী, ভারতীয় জুরি টিলককে নির্দোষ বলিলেন। সংখ্যাধিক্যের মতে তাঁহার সাজা হইল। রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কারাবরণ জাতীয়-আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথম; সুতরাং সমস্ত দেশময় এই ব্যাপারে যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা গবর্নমেণ্ট যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল; লোকের জেলের ভয় ভাঙিয়া গেল। অচিরে এই দমননীতির প্রতিক্রিয়া দেশমধ্যে নানা ভাবে, নানা মূর্তিতে দেখা দিল; সেটি হইতেছে জাতীয় আন্দোলনে রুদ্রপন্থা।

টিলকের প্রতি সহানুভূতি সর্বত্রই প্রকাশিত হইল; বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র মল্লিক ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত টিলকের মোকদ্দমার সাহায্যকল্পে জনসাধারণের নিকট অর্থসংগ্রহ করিয়া পুণায় পাঠাইয়াছিলেন।[১] টিলকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তেমন ঘনিষ্ঠতার সুযোগ কোনোদিনই হয় নাই; তৎসত্ত্বেও একজন অপরকে বিশেষভাবেই শ্রদ্ধা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ যাত্রীতে লিখিয়াছিলেন যে টিলক তাঁহার "কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে পোলিটিকাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি

১ কংগ্রেস, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭৩। "বাঙ্গালার লোক টিলকের বিপদে আপনাদিগকে বিপন্ন মনে করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে ব্যবহারজীবী পাঠাইয়াছিল।— রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সে-কার্যে অগ্রণী ছিলেন।"

বললুম, 'রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না।' তিনি বলে পাঠালেন আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি এ তাঁর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ।· ·আমি জানতুম জনসাধারণ টিলককে পোলিটিকাল নেতা রূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এই জন্য আমি তার পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তার পরে, বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন, এর চেয়ে বড়ো আর-কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশা করি নি।' আমি বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল ; সেই অধিকার মহৎ অধিকার।"[১]

ভারতের এই উদ্যত জাতীয়তাবোধ টিলকের কারাবরণের পর মুখর হইয়া উঠিল ; সুতরাং গবর্নমেণ্ট যে-কণ্ঠ হইতে কেবল আবেদন ও ক্রন্দন শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহা হইতে স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ প্রচারিত হইতে দেখিয়া অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন ; সেই কণ্ঠ রোধ করিবার জন্য সিডিশন বিলের খসড়া প্রস্তুত হইল, গোপনে প্রেসকমিটি[২] বসিল। সিডিশন বিল পাস হইবার পূর্বদিন টাউনহলের জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে প্রবন্ধ[৩] পাঠ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ আরম্ভ করিলেন এই বলিয়া "অদ্য আমি যে ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙালির ভাষা, দুর্বলের ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা, তথাপি সে ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ ভাষা তাঁহারা জানেন না এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।"

কবি লিখিলেন যে কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর এবং সেই ভয় হইতে তাহারা দমননীতি অবলম্বনে অগ্রসর হইলেন। "গবর্নমেণ্ট অত্যন্ত সচকিতভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। ·রোষরক্ত গবর্নমেণ্ট· ·পুণা-শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন।· ·রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন্-এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্যুতের মতো নাটুভ্রাতৃযুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে।"

দেশের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইলে তাহাকে প্রকাশ করিতে দিতে হয়, 'সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ'। সেইজন্যই "সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম-অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।· ·রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয়স্থান· ·রুদ্ধবাক্ সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়োই ভয়ংকর অবস্থা।· ·শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যবর্তী শাসনশৃঙ্খলটা সর্বদা ঝংকার না দিয়া, সেটাকে আত্মীয়সম্বন্ধবন্ধনরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অধীন জাতির ভার লাঘব হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

১ যাত্রী, পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। দ্র. বিজলী ২০শে আশ্বিন ১৩৩০। Modern Review 1923 Vol. II, pp. 6 ff.

২ ১৮৯৮ সালে Secret Press Committee গবর্নমেণ্ট স্থাপন করেন। মাদ্রাজের কনগ্রেসে ইহার প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 1898, Dec. 30. Resolution No. viii. 'Resolved that the Congress is strong of opinion that the establishment of secret Press Committee in certain part of India is highly objectionable and inconsistant with spirit of British administration.' Besant, 'How India wrought her freedom', p. 285.

The Hon. Mr. C. Jambuligam Mudaliar moved Resolution iv, a protest on the law of sedition which had been passed in the supreme Legislative Council against the stubborn opposition of the non-official members and an unprecedented agitation in the country.' *ibid.*, p. 274.

৩ কণ্ঠরোধ, ভারতী ১৩০৫ বৈশাখ, পৃ. ২৯-৩৪। রাজা ও প্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

এই প্রচারের আচ্ছাদনপট।· ·মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল এক মুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে।· ·দুই শত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানব-সম্বন্ধের এই কি অবশেষ।"[১]

উনবিংশ শতকের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে। ইংরেজের অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘুচে নাই। এক হাতে দান করিয়া অপর হাতে চতুর্গুণ আদায়ের চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলিতেছে। এখনো সেই প্রশ্ন— মানব-সম্বন্ধের এই কি পরিণাম?[২]

এমন সময়ে কলিকাতায় প্লেগের আবির্ভাব হইল। বোম্বাইতে প্লেগের সময় সরকার যে-ভাবে উপদ্রব করিয়া তথাকার অধিবাসীকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কলিকাতায় তাঁহারা সেরূপ করিলেন না। সরকারের ভাবখানা এইরূপ হইল, প্রজারা যখন পুবদেশী এবং পরিবারমণ্ডলীর প্রতি হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে উহাদের যখন এতই দৃঢ় সংস্কার তখন সেটা বিবেচনা করিবা এবং যথাসম্ভব বাঁচাইয়া কাজ করাই রাজার কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের মতে "এইরূপ দুর্যোগই বিদেশী রাজার পক্ষে প্রজাদের হৃদয়জয়ের দুর্লভ অবকাশ। এই সময়েই রাজা প্রমাণ করিতে পারেন যে, আমরা পর হইয়াও পর নহি। এই সময়েই তাঁহাদের পক্ষে ক্ষমা ধৈর্য ও সমবেদনা, ফৌজ কেল্লা ও গুলিগোলার অপেক্ষা রাজশক্তির যথার্থ পরিচয়স্থল।" তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "পতিতের উপর পদ-প্রহার, ব্যথিতের উপর জবরদস্তি ভয়ের নিষ্ঠুরতা মাত্র। ইহাতে রাজার রাজশক্তি নহে, বিদেশীর দুর্বলতা প্রকাশ পায়।"

মারীগ্রস্ত পুণার দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিলেন যে গোরা-সৈন্যের আতঙ্কজনিত কাতরোক্তিকে প্রজার স্পর্ধা বলিয়া গণ্য করিয়া সরকার উত্তরোত্তর নির্দয় হইয়াছিলেন; তাঁহারা প্রবলজনোচিত ঔদার্য অবলম্বন করিলেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, "স্বীকার করা গেল গোরা-সৈন্যগণ শিষ্ট শান্ত সংযত, এবং দেশীয় লোকদের প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু দেশের মূঢ় লোকের যদি এমন একটা সুদৃঢ় অন্ধ সংস্কার জন্মিয়াই থাকে যে, গোরাসৈন্য দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং শ্রদ্ধা-অভাবে দেশীয় লোকের প্রতি অবিবেকী, তবে সেই চরম সংকটের সময় বিপন্ন ব্যক্তিদের একটা অনুনয় রক্ষা করিলে দুর্বলতা নহে মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত।" এই ধর্ষণনীতি অবলম্বনের ফলে ভারতের "আভ্যন্ত মধ্যে অশান্তির আক্ষেপ কোথাও প্রকাশ্যে ফুটিবার উপক্রম করিল, কোথাও গোপনে গুমরিয়া উঠিল।" ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ন্যায় তিনি বলিলেন, "কঠিন আইন ও জবরদস্তিতে সম্পূর্ণ উল্টা ফল ফলিবে।"

১৩০৫ জ্যৈষ্ঠের ভারতী পত্রিকায় এই প্রসঙ্গকথায় রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, প্রজাবিদ্রোহ।

১ রমেশচন্দ্র দত্ত আই.সি.এস. তখন বিলাতে আছেন; তিনি পুণার হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়াছিলেন; কিন্তু পুণায় 'পিউনিটিভ' পুলিশ মোতায়েনের বিরুদ্ধে ও সংবাদপত্র-দলনে যে-ব্যবস্থা হইতেছিল, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লণ্ডনের Daily News-দৈনিকে দুইখানি পত্র দেন। তিনি বলেন, 'The suppression of such papers will be like the extinguishing of streetlights to burglar': দ্র. J. N. Gupta লিখিত Life and Work of Romesh Chandra Dutt. p. 222-24। গিরিজাশঙ্করের শ্রীঅরবিন্দ··· হইতে উদ্ধৃত, পৃ. ১৭২।

২ পশ্চিমভারতের যে রাজনৈতিক আন্দোলন টিলক কর্তৃক প্রবর্তিত হয়, রবীন্দ্রনাথ সে-সম্বন্ধে ভালোরূপেই ওয়াকিবহাল ছিলেন; দামোদর চাপেকর প্রভৃতির ব্যাপার লইয়া দেশমধ্যে কেহ কিছু বলিতে পারেন নাই; তবে টিলকের শাস্তি-যে অন্যায়ভাবে দেওয়া হইয়াছিল— সে-কথা অমরাবতী কন্‌গ্রেসে (১৮৯৭) সুরেন্দ্রনাথ স্পষ্টই ঘোষণা করেন; তিনি বলেন, "আমাদের মতে টিলকের ও পুণার সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের কারাদণ্ডবিধান করিয়া সরকার ভুল করিয়াছেন।" কন্‌গ্রেস সভাপতি শঙ্কর নায়ার বলিলেন যে টিলকের বিচার— a farce of trial।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'বিদায়' (প্রদীপ ১৩০৫ বৈশাখ) নামে একটি কবিতা লেখেন; আমাদের মনে হয় ইহার মধ্যে যে বীরযুবকরা সেদিন ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়াছিল এ কবিতা যেন তাহাদেরই জবানীতে লিখিত হইল— এবার চলিনু তবে। সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। সমগ্র কবিতা(গান)টি পাঠ করিলে ইহার নিহিতার্থ স্পষ্ট হইবে।

"ক্ষমতা যাহার হস্তে, বিচারের শেষ ফল সেই দিতে পারে। আমাদের মন বিগড়াইয়া গেলে আমরা কাগজে দু-চার কথা বলিতে পারি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইয়া গেলে তাঁহারা আমাদের কাগজের গলা চাপিয়া ধরিতে পারেন। আমরা ক্ষুব্ধ হইলে তাহা রাজবিদ্রোহ কিন্তু রাজারা রুখিয়া থাকিলে তাহা প্রজাবিদ্রোহ নহে ? উভয়েরই ফল কি রাজ্যের পক্ষে সমান অমঙ্গলজনক নহে ?"

দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার দিনে দিনে কিভাবে রুদ্ররূপ ধারণ করিতেছে তাহারই উদাহরণ দিয়া তিনি বলিলেন, "পূর্বদেশীয়দের এই নীরব সহিষ্ণুতা, যাহাতে পশ্চিমদেশীয়দিগকে অলক্ষ্যে অসতর্কতা এবং ঔদ্ধত্যে লইয়া যায়, ইহাই প্রাচ্য প্রজা ও পাশ্চাত্য রাজা উভয়েরই পক্ষে বিপদের মূল। ইহা হইতেই গোরা-সৈন্যদের মজার খেলা ও কালা আদ্‌মিদের অকস্মাৎ উন্মত্ততার সৃষ্টি হয়।"

এককালে সাধারণ ইংরেজ গোরা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কথায় কথায় প্রহার এবং কটু সম্ভাষণ করিয়া ইতর ভদ্র ও শিক্ষিত লোককে প্রায়ই অপমানিত করিতেন ; ঘটনার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "তাঁহারা প্রত্যহই ভারতবর্ষে কি প্রকার বিপৎপাতের ভিত্তি রচনা করিতেছেন তাহা তাঁহারা জানেন না, এবং যে-ইংরেজসমাজ এইরূপ রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতায় বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার নৈতিক বাধা প্রদান করেন না, তাঁহারা যে শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা ছেদনে প্রবৃত্ত। আমাদের প্রতি সাধারণ ইংরেজের এই প্রকার ভাবই প্রজাবিদ্রোহের ভাব।" রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক অবস্থার যে-বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন— তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় সত্য হইয়াছে, বর্তমান ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে।

১৩০৫ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার (Bengal Provincial Conference) অধিবেশন হয় ঢাকায়। সভার সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।[১] এই নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান সাধক পরম দেশভক্ত ছিলেন ; সে-যুগের রীতি-অনুসারে তিনি সভাপতির অভিভাষণ ইংরেজিতে পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ও তিনিই সভাপতির সম্ভাষণের সারমর্ম বাংলায় পাঠ করিয়াছিলেন।[২] সভারম্ভে রবীন্দ্রনাথ একটি জাতীয় সংগীত গাহিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি হইতে দূরে ছিলেন এবং ছিলেন না— এই দুই কথাই সত্য। এ কথা যথার্থই সত্য যে তিনি সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাদের ন্যায় কখনো রাজনৈতিক কর্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই ; কিন্তু যখনই দেশের ডাক পড়িয়াছে তখনই যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা দেশবাসীর বা সরকার বাহাদুরের অপ্রিয় হইলেও নির্ভীকভাবে ও নিঃসংকোচে বলিয়া গিয়াছেন। সরকারের দোষ প্রচুর পরিমাণে দেখাইয়া আমাদের একদল নেতা নিজ কর্তব্য সমাপন হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন— রবীন্দ্রনাথ সে-ধরণের সমালোচক নহেন। দেশবাসীর মধ্যে যে-পাপ পুঞ্জীভূত হইয়া বিদেশীর এই শাসনকে সম্ভব করিয়াছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি বারবার বলিয়াছেন ; পরাধীনতার কারণ বাহিরে নাই— তাহা আমাদের মধ্যেই আছে। সাধারণত স্বাধীনতা অর্থে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বুঝায় ; কিন্তু উহা যে মানবের সর্ববিধ স্বাধীনতা বা মুক্তি বিষয়ে প্রযোজ্য, এ কথা সহজে স্বীকৃত হয় না। রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর জন্য এই সর্ববিধ স্বাধীনতা চাহেন— কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতায় তিনি তুষ্ট নহেন।

ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রাদেশিক কনফারেন্স সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সমালোচনা করিলেন, তাহা আদৌ লোকের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। এইসব কনফারেন্সে ডেলিগেট বা প্রতিনিধিদের আদর-আপ্যায়ন একটা রাজসূয় যজ্ঞের তুল্য ছিল। দেশের কাজের জন্য সকলে সমবেত হইয়াছেন, অথচ তাঁহাদের আবদার অভিযোগের অন্ত নাই—

১ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (Rev. K. C. Banerjee M. A. B. L. : ১৮৪৭-১৯০৭ ফেব্রুয়ারী ৬)।

২ প্রাদেশিক সভার উদ্বোধন (ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার সভাপতি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরাজি বক্তৃতার অনুবাদ ; ভারতী ১৩০৫ আষাঢ়, পৃ ২৪৮-২৫৭। সভা হয় ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৮-১৯-২০ (১৮৯৮ মে ৩১, জুন ১-২)।

এই দৃশ্য রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়াছিল। "অতিরিক্ত মাত্রায় আদর-অভ্যর্থনা উপভোগ করিয়া আমরা বরযাত্রীর মতো অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছি। গৃহস্বামীর অতিথি হইয়া সর্বদা সহস্র খুঁটিনাটি ধরিয়া সেবকদলকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছি; কত অসংগত আদেশপালনে অনুজ্ঞা প্রচার করিয়া ক্ষুদ্র নবাবরূপে প্রতিভাত হইতেছি।· ·ইহাতে দেশের কতটুকু কল্যাণ?"[১] এইসব কন্‌ফারেন্স এককালে কি অন্তঃসারশূন্য ছিল, তাহা পাঠকমাত্রই জানেন। কারণ "আমাদের দেশের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ন্যায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডও একটা অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরের দিকে ছুটিয়া চলিতেছে।· ·আশার কথা এই যে প্রাদেশিক সমিতি বিলাতী ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া দেশী সাজে দেশের দ্বারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে-সকল পুরোহিত দেশী মন্ত্রে দেশী অনুষ্ঠান বিধিতে অনভ্যস্ত, এ জনসভা হইতে তাঁহাদের দুর্বোধ জল্পনা ক্রমশ নির্বাসিত হইবে এবং দেশের জনসাধারণ মাতৃভূমির নিজের মুখে নিজের ভাষায় আহ্বান পাইয়া এ সভায় আপন স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ক্রমশঃ অনিবার্য হইয়া পড়িতেছে।"

রাজদ্বারে আবেদন ছাড়া দেশের স্বচেষ্টাসাধ্য গুরুতর কর্তব্যও যে পড়িয়া আছে, এবং দেশের ধনবৃদ্ধি শিল্পোন্নতির উপর নির্ভর করে, এই কথা এই সম্মিলনে আলোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই লিখিলেন, "কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন-দ্বারা আমাদের লজ্জা দূর হইবে না। আমরা বিবেচনা করি এই মন্তব্য প্রকাশ ঢাকা প্রাদেশিক সমিতির বিশেষ গৌরবের কারণ।"

ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া একাই কবি নৌকাযোগে উত্তরবঙ্গে ঘুরিতেছেন। নাগর নদীতে আত্রাই এর পথে লিখিলেন 'মাতার আহ্বান' ও সেইদিনেই 'হতভাগ্যের গান'টির পরিবর্তন সাধন করেন (৭ আষাঢ় ১৩০৫)। আমাদের মনে হয় 'আশা' 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'শরৎ' কবিতা কয়েকটিও এই সময়ের বা এরই কাছাকাছি সময়ের রচনা, সমস্তগুলির মধ্যে এই ভাবসংগতি আছে। দেশমাতৃকার নূতনরূপ কবির লেখনীতে মূর্তি লইতেছে; তাহারই একটি কল্যাণসুন্দর মূর্তি গড়িয়া কবি দেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিবার উদ্‌যোগ করিলেন— অচিরেই জাতীয় জীবনের পূজাবেদীতে সম্পূর্ণ একটি নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের যেসব গদ্য, রাজনৈতিক প্রবন্ধ বা সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিতে হইয়াছিল, তাহা দেশের ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সঙ্গে নিরর্থক হইয়া যাইবে, তাহার পটভূমি ভবিষ্যৎ বংশধরগণ জানিবে না, রচনার ইতিহাস কেহ যুগে যুগে স্মরণ করিয়াও রাখিবে না। তবে সেই ভাবীকালকে গড়িবার জন্য যেসব মানসিক উপাদানের প্রয়োজন, তাহার আয়োজন হয় এই কালেই; রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল সাহিত্যস্রষ্টা কবি ঔপন্যাসিক হইতেন তবে বাঙালীর জাতীয়জীবন-গঠনের ইতিহাসে তাঁহার স্থান থাকিত না, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর পাঁচজন প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের সহিত তাঁহার নাম পাওয়া যাইত। দেশের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল বলিয়া তিনি সাহিত্যিক তুরীয়তার মধ্যে অচল হইয়া থাকিতে পারেন নাই, প্রিয়-অপ্রিয় কথা অযাচিত ভাবে বলিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বাংলাদেশে ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছিল। তাহাকে ব্যর্থ করিবার বিবিধ প্রকাশ্য ও গোপন চেষ্টা যে গবর্নমেণ্ট করিতেছিলেন, জাতীয় ইতিহাসের পাঠকের তাহা অবিদিত নহে। 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যেসব প্রবন্ধ লেখেন তাহার কথা আমরা পূর্বেই

১ প্রসঙ্গকথা, ভারতী আষাঢ় ১৩০৫।

বলিয়াছি। ১৩০৫ পৌষ মাসে (১৮৯৯ জানুয়ারি ৬) লর্ড কর্জন বড়লাট হইয়া আসিবার পর হইতে বাংলার জাতীয়তাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য বিধিবদ্ধ চেষ্টা শুরু হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গচ্ছেদ হইল। ইহা একটা রাজনৈতিক ব্যাপার। কিন্তু কর্জনের আগমনের পূর্ব হইতে ইহা অপেক্ষা গভীরভাবে আঘাত করিবার প্রস্তাব হয় ভাষাবিচ্ছেদের দ্বারা। ইংরেজ-শাসনের ফলে যে-একটা ঐক্যসূত্রে ভারতের বিভিন্ন অংশ গ্রথিত হইয়াছে, সে-সত্য রবীন্দ্রনাথ কখনো অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই ঐক্যসূত্র কখনো যাহাতে সুদৃঢ় রজ্জুতে পরিণত না হয় সে-বিষয়ে সরকার চিরদিনই হুঁশিয়ার। কংগ্রেস হইতে কেমনভাবে মুসলমান সমাজকে পৃথক করিয়া লইয়া গিয়া একটি প্রতিরোধক স্রোত তৈয়ারী করিতে গবর্নমেণ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে-যোগ তাহা সংস্কৃতিমূলক; তাই তাহার ভিত্তি দৃঢ়। সুতরাং সেই দৃঢ়ভিত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা রাজনৈতিক বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। এক সময়ে উড়িষ্যা ও আসামে বাংলা ভাষাই শিক্ষিত সমাজের ভাষা ছিল। কিন্তু বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা হইতে যথাসম্ভব নির্বাসিত করিয়া সরকার বাহাদুর স্থানীয় ভাষাগুলিকে কৃত্রিম উত্তেজনায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শ্যেনদৃষ্টি গবর্নমেণ্টের এই কূটনীতির উপর যথাসময়ে পতিত হইয়াছিল।

একটি প্রবন্ধে[১] রবীন্দ্রনাথ বহু উদাহরণ দিয়া দেখাইলেন যে ওড়িয়া ভাষার সহিত ভদ্র বাংলা ভাষার পার্থক্য সামান্য; কৃত্রিম উপায়ে এই ভাষার বিচ্ছেদকে স্থায়ী করাই সরকারের উদ্দেশ্য। "উড়িষ্যা এবং আসামে বাংলাশিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলার এই দুই উপবিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া দিয়া একদিন এক-গৃহবর্তী হইতে পারিত।" রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রান্তবাসী এই দুই ভাষাকে উপভাষা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিলেন, "যে-ভাষা ভ্রাতাদের মধ্যে অবাধ ভাব-প্রবাহ সঞ্চারের জন্য হওয়া উচিত তাহাকেই প্রাদেশিক অভিমান ও বৈদেশিক উত্তেজনায়, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান প্রাচীর স্বরূপে দৃঢ় ও উচ্চ করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা, তাহাকে স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ বলা যায় না এবং তাহা সর্বতোভাবে অশুভকর।"

অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষা পৃথক করিবার পর আরও কয়েক বৎসর পর বাংলা ভাষাকে চারিটি উপভাষায় বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল— সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। প্রাদেশিক ভাষাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য কতদূর ঐতিহাসিক তাহা আমাদের বিচারের বিষয় নহে; তবে তিনি সরকারের এইসব প্রয়াসের মধ্যে যে ভেদনীতির প্রকোপ দেখিতেছিলেন, তাহাই নিঃসংকোচে প্রকাশ করিলেন। এই সময় হইতে সরকারী মহলে বাংলা বিভাগের জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়।

বৃটিশ গবর্নমেণ্ট বাঙালির ও বিশেষভাবে বাঙালি-হিন্দুর সংস্কৃতিগত ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য গোপনে যখন নানারূপ সায়ক প্রস্তুতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মান ও আত্মকর্তৃত্ব উদ্‌বুদ্ধ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে[২] বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি নূতন প্রাণের সাড়া পড়িয়া যায়। হিন্দুগণ বিশেষ একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল; মারাঠাদেশে টিলক যে হিন্দু-আত্মবোধ জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজির অভ্যুত্থানে বাংলাদেশে নূতনভাবে প্রাণ পাইল।

১ ভাষাবিচ্ছেদ, ভারতী শ্রাবণ ১৩০৫।

২ ১৮৯৭, ফেব্রুয়ারি ২১ (১১ ফাল্গুন ১৩০৩) স্বামীজি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ২৮-এ শোভাবাজারের রাজবাড়িতে এক মহতী সভায় স্বামীজিকে অভিনন্দন দেওয়া হইল।

হিন্দুসমাজের এই নূতন চেতনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক সুচিন্তিত মন্তব্য আমরা এই সময়ে পাই। রবীন্দ্রনাথের মতে "জগতে হিন্দুজাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ইহাকে বিশেষ জাতিরূপে গণ্য করা যায় এবং যায়ও না। জাতীয়ত্বের সংকীর্ণতা ইহার মধ্যে আছে অথচ জাতীয়ত্বের বল ইহার মধ্যে নাই। ইহা এক অথচ অনেক, ইহা বিপুল অথচ দুর্বল। ইহার বন্ধন যেমন কঠিন তেমনি শিথিল, ইহার সীমা যেমন দৃঢ় তেমনি অনির্দিষ্ট।" এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিলনে কি ভাবে এই হিন্দুসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। যে কথা বহু বৎসর পরে 'ভারতে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বাভাস পাই এই প্রবন্ধে। তিনি বলিয়াছিলেন যে আর্য-অনার্যের বাহ্যিক যুদ্ধ যদিও বহুকাল শেষ হইয়াছে, তথাচ "তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গদের বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে। তাহার এক কারণ আমাদের পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য এত অধিক যে, প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে যখন আমরা মিলিতেছিলাম তখনও শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্য চেষ্টার বিরাম ছিল না। আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ কেহই সম্পূর্ণ হার মানিতে চাহে নাই।"

এই কারণে বহু সংখ্যক আর্য অনার্য এবং শংকর জাতি হিন্দুত্ব নামক এক অপরূপ ঐক্য লাভ করিয়াছে; তথাপি তাহারা বল পায় নাই। হিন্দুসমাজ যেমন এক, তেমনি বিচ্ছিন্ন। এই দুর্বলতার কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, "আমরা অভিভূতভাবে এক, আমরা সচেষ্টভাবে এক নহি।" তাঁহার মতে "রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা আমাদের ছিল না।··আমরা চিরদিন খণ্ড খণ্ড দেশে খণ্ড খণ্ড সমাজে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দ্বারা বিভক্ত। আমাদের স্থানীয় আচার স্থানীয় বিধি স্থানীয় দেবদেবীগণ বাহিরের আক্রমণ ও সংশোধন হইতে নিরাপদভাবে সুরক্ষিত হইয়া একদিকে ক্ষুদ্র অসংগত, অন্যদিকে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে।··আমরা প্রাদেশিক, আমরা পল্লীবাসী; বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ সমাজের উপযোগী মতের উদারতা, প্রথার যুক্তিসংগতি এবং সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই। এক কথায়, বৃহৎ ক্ষেত্রে জীবনযাত্রানির্বাহ করিবার যে-সফলতা তাহা আমরা লাভ করিতে পারি নাই।"

ভারতবর্ষের এই সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সজাগ; তাই বলিতেছেন, "আমাদের সংস্কার ও শিক্ষা এত দীর্ঘকালের, তাহা আমাদিগকে এমন জটিল বিচিত্র ও সুদৃঢ় ভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে যে, বৃহৎ জাতিকে চিরকালের মতো তাহার বাহিরে লইয়া যাওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই চিরোদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে।..অতএব এক দিকে আমাদের দেশীয়তা, অপর দিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবি অনুকরণে আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।"[১] স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই আরও ওজস্বিতার সহিত আত্মনিবেদন দ্বারা এই সময়ে প্রচার করিতেছেন।

সাহেবিয়ানা কথাটি আরো পরিষ্কার করিয়া লেখেন 'কোট ও চাপকান' প্রবন্ধে[২] দেশীয়তা দেশীয়ভাবকে রক্ষা করা ঠাকুর-পরিবারের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত নানাভাবে দেশীয় শিল্প আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদকে একটি বিশেষ দেশীয় রূপ দান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাহেবিয়ানার অনুকরণ তাঁহাদের পরিবারের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও উদগ্র জাতীয়তা বা হিঁদুয়ানি তাঁহাদের ধর্মসাধনার পরিপন্থী। পাঠকগণের কাছে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'নকলের নাকাল' প্রবন্ধ সুপরিচিত।[৩] 'কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ'— এই কবিতাটিও সেই সঙ্গে স্মরণীয়। ১৯১২ অব্দে যখন বিলাত

১ ভারতী ১৩০৫ শ্রাবণ, পৃ ৩৫৮-৩৬১।

২ ভারতী ১১ ৫ আশ্বিন, পৃ ৫০১-৫১০।

৩ বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৯৯-১০৫। সমাজ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

যাইতেছেন তখনো আলোয়ার মহারাজার পোশাকের প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন।[১] এই পরিচ্ছেদের দেশীয়তা কবির মতে আত্মশক্তি ও আত্মসম্মানের অন্যতম পরিচায়ক। কিন্তু এই দেশাত্মবোধ-যে কেবল পরিচ্ছদের দেশীয়তায় পর্যবসিত তাহা নহে; আচার-ব্যবহারে এবং জীবনের প্রতি একটা দৃষ্টিতে এই দেশীয়তা দেখিতে পাই।

এই দেশীয়তার বোধ হইতে বাংলার জমিদারগণের আদর্শ কী সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুয্যে'[২] শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'মুখুয্যে' হইতেছেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়[৩], এক পত্রিকায় কংগ্রেস-পক্ষীয়দের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশপূর্বক লিখিয়াছিলেন যে দেশের যাঁহারা 'ন্যাচারাল লীডার' বা স্বাভাবিক নেতা বা প্রকৃত মোড়ল, নানা অস্বাভাবিক কারণে ক্ষমতা তাঁহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। রাজা সাহেবের এই আক্ষেপ-উক্তি লইয়া রবীন্দ্রনাথ জমিদার-সম্প্রদায় যে প্রকৃত নেতৃস্থানীয় নহেন, তাহাই প্রমাণ করেন। রবীন্দ্রনাথ দেখান যে ইংলণ্ডের জমিদারশ্রেণী বা অ্যারিস্টক্রেসীর সহিত বাংলাদেশের জমিদারদের তুলনা হয় না, কারণ ইহাদের অধিকাংশের ইতিহাস শতাধিক বৎসর যায় না। ইংলণ্ডের 'অভিজাত' শ্রেণী বাংলায় অজ্ঞাত; বাংলার সুপরিচিত হইতেছে 'কুলীন'। কিন্তু 'কুলীনে'র সম্মান বা আভিজাত্য অর্থ দিয়া হয় নাই। তা ছাড়া আমাদের দেশে ধন-গৌরবের উপর সমাজ-মর্যাদা নির্ভর করে না। ধনী জমিদারদের অতি নির্ধন মূর্খ আত্মীয় হয়, তাহার মাপকাঠি কুল, অর্থ নহে। সুতরাং যাহাকে 'লীডারশীপ' বলে তাহা অর্থের দ্বারে এখনো উপনীত হয় নাই। যাঁহাদের হাতে ধন আছে তাঁহারা যে ইচ্ছা করিলে প্রজাসাধারণের আনুগত্য আকর্ষণ করিতে পারেন—এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জমিদার ভ্রাতাগণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

"সেকালের ধনী জমিদাগণ নবাব সরকারে প্রতিপত্তি ও পদবী লাভের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেন ও কোনো চেষ্টা করিতেন কি না তাহা আমরা ভালরূপ জানি না। তখন নবাব-দরবারের প্রসন্নতা হইতে কেবল শূন্যগর্ভ খেতাব ফলিত না, তখন সম্মানের মধ্যে সৌভাগ্য এবং রাজপদের মধ্যে সম্পদ পূর্ণ থাকিত, অতএব তাহা লাভের জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনকার যাহা সাধারণ হিতকার্য,—অর্থাৎ দীঘিখনন মন্দিরস্থাপন বাঁধনির্মাণ—এই সকলকেই তাঁহারা যথার্থ কীর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন, খেতাবলাভকে নহে। দশের নিকট ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের প্রবল ছিল। তখন এই সকল হিতকার্য রাজসম্মানের মূল্যস্বরূপ ছিল না, ইহাতে সাধারণের সম্মান আকর্ষণ করিত। সেই সাধারণের সম্মানের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা ছিল না।" কিন্তু বর্তমানের জমিদারগণ "নিজ গৌরবেও উচ্চ নহেন, সর্বসাধারণের সহিত ঐক্য দ্বারাও বৃহৎ বলিষ্ঠ নহেন।" ইঁহারা বিলাতের জননায়কদের ন্যায়ও প্রবল নহেন। ইঁহারা কুষ্মাণ্ডলতার ন্যায় একমাত্র গবর্নমেণ্টের আশ্রয়যষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন, ভুলিয়া যান যে সেই সংকীর্ণ রাজদণ্ডবাহী উচ্চতা অপেক্ষা গুল্মসমাজের খর্বতা শ্রেয় এবং তৃণসমাজের নম্রতা শোভন।"

কেবল তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি প্রবন্ধ শেষ করেন নাই, কিভাবে জমিদারগণ দেশের ও দশের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন সে কথা বলিলেন; "এদেশে পূর্বকালে জমিদার-সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না, তাহা দান অর্চনা, কীর্তিস্থাপন, আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্প সাহিত্যের পালন পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছে।"

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৯ শ্রাবণ।

২ মুখুয্যে বনাম বাঁড়ুয্যে, ভারতী ১৩০৫ ভাদ্র, পৃ ৪২১-৪৩১।

৩ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮০৮-১৮৮৮) পুত্র। প্যারীমোহনের জন্ম হয় ১৮৪০ সালে; ১৮৬৪-এ এম.এ. ও ১৮৬৫-এ বি.এল. পাশ করেন। ১৮৭৯-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য; ১৮৮৪; ১৮৮৬ সালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ১৮৮৭ সালে তিনি 'রাজা' উপাধি পান।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের মনোভাব যে কেবল এই 'মুখুয্যে বনাম বাঁড়ুয্যে' প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, 'রাজটীকা'[১] নামে গল্পেও তাহা হাস্যকর প্রহসনের মধ্যে শেষ হইয়াছে। এই দুইটি প্রবন্ধ ও গল্প লিখিবার কারণ হইতেছে তখন বাংলা দেশের বড়লোকদের মধ্যে সার্ আলফ্রেড ক্রফ্ট-এর প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করিবার জন্য চাঁদা উঠিতেছিল। এই বিসদৃশ ব্যাপারে অর্থ সংগ্রহে দেশীয় অভিজাত শ্রেণীর উৎসাহ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল।[২] কবি কি তাই লিখিয়াছিলেন 'উন্নতিলক্ষণ' কবিতায়।

সিংহদুয়ারে পথের দু ধারে
রথের না দেখি অন্ত
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে
যত উষ্ণীষবন্ত ?
রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ
কাহারে করিতে ধন্য ?
বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা
কাহার পূজার জন্য ?
গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব
করিয়া উদর পূর্তি,
এঁরা বড়োলোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাঁহার মূর্তি।[৩]

পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ পাঠে পাঠকদের সহজেই মনে হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ বাংলার জমিদারদের নেতৃত্বকে অস্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং বাংলার স্বাভাবিক নেতা হইতেছেন—রাজনৈতিক বক্তা ও নেতারা। তিনি জমিদারগণের নেতা হইবার দাবিকে ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে অপরপক্ষের নেতৃত্বের দাবিকে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাহা নহে। তিনি লিখিলেন, "জমিদারগণ দেশের জন্য যাহা করেন তাহা গবর্নমেণ্টের মুখ তাকাইয়া, ইঁহারা যাহা করেন তাহাও ইংরেজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। তাহার ভাষা ইংরেজি তাহার প্রণালী ইংরেজি, তাহার প্রচার ইংরেজিতে।" আমরা দেশের হিত করিব, কিন্তু দেশকে স্পর্শ করিব না, ইহা হইতে পারে না। দেশকে কেমনভাবে স্পর্শ করা যায় তাহার খুব সহজ উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়াছিলেন; যে কথা আজ অতি সামান্য ও সাধারণ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তখন উহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়াই রাজনীতিকদের মনে হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেশের ভাষা বলিয়া দেশের বস্ত্র পরিয়া ইংরেজের প্রবল আদর্শ যদি মাতার ভাষা ও ভ্রাতার বস্ত্র হইতে আমাদিগকে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায় তবে জননায়কের পদ গ্রহণ করিতে যাওয়া নিতান্তই অসংগত।" যাহা বাক্যে বলিতেছেন, জীবনেও তাহা রূপায়িত করিবার প্রয়াস চলিতেছে।

১ রাজটীকা, ভারতী ১৩০৪ আশ্বিন, পৃ ৪৮১-৪৯৭ গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১।

২ In February 1897 Sir Alfred Croft, K.C.I.E., who had been connected with the Education Department of Bengal for more than 31 years and had been Director of Public Instruction for nearly 20 years, left India. (Buckland, Bengal under the Lieutenant Governors II, p. 399).

৩ ভারতী ১৩০৬ অগ্রহায়ণ। কল্পনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭।

রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে জমিদারগণকে ও অপর প্রবন্ধে জননায়কগণকে আক্রমণ করিলেন—সুতরাং উভয়পক্ষই অসন্তুষ্ট হইল। তাঁহার কাছে যাহা অযৌক্তেয়, যাহা সমগ্র কল্যাণ হইতে বিচ্যুত, তাহা অশ্রদ্ধেয়। যাঁহারা দেশের সমগ্র কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া কেবল স্থানিক অভাব-অভিযোগকেই একান্ত বিবেচনা করিয়া চলেন, তাঁহাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই কঠোর সমালোচনা যথার্থই অপ্রিয় সত্যের ন্যায় অসহ্য হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জমিদারদের ও শিক্ষিত শ্রেণীর নেতৃত্বের দাবির উপযুক্ততা সম্বন্ধে তিনি যে কেবল লিখিলেন তাহা নহে, ধর্ম সম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোকের একাধিপত্যের দাবিকেও তিনি অস্বীকার করিলেন। অপর-একটি প্রবন্ধে ধর্ম সম্বন্ধে অযৌক্তিক অন্ধ নিষ্ঠাও যে জাতীয় জীবন গঠনের অন্তরায় এ কথাও তিনি বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। হিন্দুত্বের নামে অন্ধ মূঢ়তার সমর্থনও জাতীয়ভাব অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। এই মনোভাবকে নীরবে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব।

কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের শিক্ষিতদের মধ্যে যে নূতন প্রাণশক্তি আসিয়াছিল তাহা স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয়বাদের প্রচারের ফলে বিশেষ বল লাভ করে। শিক্ষিত বাঙালি পরমহংসদেবের ভক্তিবাদ ও মূর্তিপূজায় নূতনভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার উপাসনাকে মানবের বিচিত্র সাধনপন্থার অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁহার এক গ্রন্থে বলিলেন যে 'নিরাকার উপাসনা হইতেই পারে না; হয় সোহং ব্রহ্ম হইয়া যাও, নয় মূর্তিপূজা করো।' তিনি কালাপাহাড়ের ঠিক বিপরীত মুখে সংহারকার্য শুরু করিয়াছিলেন; মূর্তিপূজাকে তিনি যে কেবল রক্ষা করিতে চান তাহা নহে, অমূর্তপূজাকে তর্কের দ্বারা ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই মতের দীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি সমর্থন করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন "মুসলমানেরা মূর্তি পূজা করে না। অথচ মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্ত কেহ নাই বা কখনো জন্মেন নাই এ কথা বিশ্বাস্য নহে।· ·নানক যে জগতের ভক্তশ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন নহেন তাহা কেহ সাহস করিয়া বলিবেন না।" আজও দেশমধ্যে যে এই তর্কের মীমাংসা হইয়াছে তাহা নহে; সুতরাং কবির যুক্তিধারা এখনো উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।[১]

এই বৎসরের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ যেসকল রাজনৈতিক সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ প্রসঙ্গকথা ও পুস্তক-সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। রাজনৈতিক প্রবন্ধ ব্যতীত গল্প সাহিত্য ও ব্যাকরণ-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। বিচিত্র রচনার অবসরের মধ্যে ভাষাতত্ত্ব-আলোচনা তাঁহার শ্রান্তি-অপনোদনের অন্যতম সঙ্গী। ভাষাতত্ত্ব-আলোচনায় বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার আনন্দ দেখিতে পাই; ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তিনি আলোচনায় মগ্ন আছেন দেখিয়াছি।

সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'গ্রাম্য সাহিত্য' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা। বহু বৎসর বাংলা দেশের গ্রামের মধ্যে বাস করিবার ফলে বাংলার নারীকে সমগ্রভাবে দেখিবার সুযোগ এবং বাংলার মানুষের মনের সন্ধান লইবার অবসর তিনি পাইয়াছিলেন। বাংলার চাষী, মাঝিমাল্লা, গৃহস্থ, প্রজা, নায়েবগোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারী, এবং দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে মিশিবার যে অসাধারণ সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা খুব কম কবির ভাগ্যে ঘটে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা যাহা তিনি লেখেন, অসাধারণ কল্পনাশক্তির বলে

১ সাকার ও নিরাকার। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি.এ. প্রণীত 'সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব' নামে গ্রন্থের সমালোচনা।— ভারতী ১৩০৫ আশ্বিন, পৃ ৫২২-৫৩৪। দ্র. আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯। ১২৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ সাকার ও নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

তাহাকে অপরূপ করিয়া তুলিবার অসামান্য শক্তিও তিনি রাখেন। ইহার উপর সহানুভূতি ও অনুকম্পার দ্বারা যে-রচনা সৃষ্টি হয় সাহিত্যে তাহা অপরূপ। গ্রামের সহিত এই পরিচয়ের ফলে কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি 'সাধনা'য় 'মেয়েলি ব্রতকথা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা'য় 'ছড়া' সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন; এবারও লোকসাহিত্য বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য-আলোচনার দীক্ষাগুরু।

গ্রন্থ-সমালোচনা এই বৎসরের রচনাবলীর আর-একটি বিশেষত্ব। পাঠকের স্মরণ আছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আর্যগাথা নামক গান ও কবিতার বই বাহির হইলে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় তাহার সমালোচনা করিয়া বাংলার পাঠকমণ্ডলীর কাছে এই নবীন লেখককে পরিচিত করাইয়া দেন। তাঁহার 'আষাঢ়ে' নামক হাস্যোদ্দীপক কাব্যগ্রন্থ এই বৎসর অ-নামে প্রকাশিত হইলেও রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে[১] ইহার দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। সমালোচনায় ভালোমন্দ উভয়ই ছিল, তবে প্রশংসা ও বিচারই অধিক। রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে নির্গত সমালোচনা দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক যশ লাভের সহায়তা করিয়াছিল, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই।

বৎসরের গোড়ায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র এক মনোজ্ঞ সমালোচনা প্রকাশিত হয়।[২] দীনেশচন্দ্রের শ্রম ও নিষ্ঠার ফলে তিনি যে অমর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়া উহাকে গ্রহণ করেন। ১৩০২ (১৮৯৬) সালে যখন দীনেশবাবুর এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তিনি কুমিল্লায়; রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর জানাইয়া যে-পত্র দেন তাহার মূল্য দীনেশবাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তাহা একটি গৌরবের জিনিস বলিয়া আমি অনেকদিন রাখিয়া দিয়াছিলাম। ছোটো একখানি কাগজ দোভাঁজ করিয়া মুক্তার মতো হরফে কবিবর লিখিয়াছিলেন, সেই প্রত্যেকটি হরফ আমার নিকট মুক্তার মতো মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমেয়।"[৩] দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ বাঙালির আত্মপ্রকাশের অন্যতম প্রয়াস।

সাহিত্যেও যেমন, ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তেমনি যুগপৎ আত্মচেতনা দেখা দিল বাঙালি প্রতিভার মধ্যে। বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়; ইনি রাজশাহীর উকিল ও রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। ইহার 'সিরাজদ্দৌলা' নামক গ্রন্থ ১৮৯৯-অব্দে প্রকাশিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে (১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ) ইহার দীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া এই গ্রন্থকে অভিনন্দিত করিলেন। যুবক দীনেশচন্দ্র সেন যেমন বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের মধ্যে ঘুরিয়া প্রাচীন পুঁথিপত্র হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংকলন করিলেন, অক্ষয়কুমারও তদ্রূপ ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসের দপ্তর ঘাঁটিয়া বাংলাদেশের নবাব সিরাজদ্দৌলার কাহিনী বিবৃত করিলেন; তিনিই প্রমাণ করিলেন যে ইংরেজ-ইতিহাস-লেখকদের অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী মিথ্যা ঘটনা।

অক্ষয়কুমারের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে; ১৩০২ কার্তিক মাসে সাধনা বন্ধ হইয়া গেলে 'সিরাজদ্দৌলা'র অবশিষ্টাংশ 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে (১৮৯৯)

১ আষাঢ়ে। ভারতী ১৩০৫ অগ্রহায়ণ, পৃ ৭৫৭-৭৬১; আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯।

২ বঙ্গভাষা, ভারতী ১৩০৫ বৈশাখ, পৃ ৭৪-৮১; সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পরিশিষ্ট।

৩ দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য পৃ ৩৪৩। ১৩০৯ শ্রাবণ বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আর-এক সমালোচনা করেন। উহা 'সাহিত্য' গ্রন্থে আছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে (১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ) উহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া লিখিলেন, "নিপুণ সারথি যেমন এককালে বহু অশ্ব যোজনা করিয়া রথ চালনা করিতে পারে, অক্ষয়বাবু তেমনি প্রতিভাবলে এই বহু নায়কসঙ্কুল জটিল দ্বন্দ্ববিবরণকে আরম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত সবলে অনিবার্যবেগে ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছেন।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সুক্ষ্মবিচার-পন্থা অবলম্বন করিয়া লিখিলেন, "কেবল একটা বিষয়ে তিনি ইতিহাস-নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন।· ·শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদৃঢ় প্রতিকূল সংস্কারের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া এবং প্রচলিত বিশ্বাসের অন্ধ অন্যায়পরতার দ্বারা পদে পদে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি স্বভাবতই এইরূপ বিচলিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সত্যের শান্তি নষ্ট হইয়াছে এবং পক্ষপাতের অমূলক আশঙ্কায় পাঠকের মনে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে।"[১] এই কয় পংক্তি সুপরিণত ঐতিহাসিকের লেখনীর উপযুক্ত।

সমসাময়িক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ সম্বন্ধে তীব্র মত প্রকাশ করিলে, রবীন্দ্রনাথ কী কঠিনভাবে তাহাদের সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে এখনো পাঠকরা আনন্দ পাইবেন।[২]

অক্ষয়কুমার 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে (১৩১১) লিখিয়াছেন যে, "রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলে (১৩০৫) তাঁহার সহায়তা ও তাঁহার প্রস্তাবে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন; ঐ পত্র এক বৎসরের অধিক চলে নাই।" রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকাকে অভিনন্দিত করিয়া লেখেন, "আজকাল সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষা এবং আন্দোলনের যে-জীবনশক্তি নানা আকারে কার্য করিতেছে, এই ইতিহাসক্ষুধা তাহারই একটা স্বাভাবিক ফল।" রবীন্দ্রনাথের মতে গত পনেরো বৎসর কন্‌গ্রেস দেশের মধ্যে যে-চেতনার সৃষ্টি করিয়াছে, এই 'ইতিহাস-বুভুক্ষা' তাহারই প্রকাশ। "এখন আমরা বোম্বাই মাদ্রাজ পঞ্জাবকে যেমন নিকটে পাইতে চাই তেমনি অতীত ভারতবর্ষকেও প্রত্যক্ষ করিতে চাহি। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া এক্ষণে আমরা দেশে এবং কালে এক রূপে এবং বিরাট রূপে আপনাকে উপলব্ধি করিতে উৎসুক।· ·সেই মহৎ আবিষ্কারব্যাপারের নৌযাত্রায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' একটি তরণী।"[৩] এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাস কী ভাবে এবং কোন্ আদর্শে রচিত হওয়া উচিত তাহার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।[৪]

এই বৎসর 'ভারতী'তে কবিকে ইতিহাসের দুইখানি পাঠ্যগ্রন্থও সমালোচনা করিতে দেখি; বাংলাদেশে তখন স্কুলের উপর-ক্লাসে ভারত-ইতিহাস ইংরেজিতে পড়িতে ও ইংরেজিতে প্রশ্নোত্তর লিখিতে হইত। নিম্নশ্রেণীর জন্য বাংলায় ভারত-ইতিহাস লেখা হইত। সেই শ্রেণীর দুখানি[৫] বইকে কেন্দ্র করিয়া কবি ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করেন। সে ইতিহাস ও ইতিহাসলেখকদের নাম লোকে ভুলিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই রচনা এখনো দিগ্‌দর্শনের কার্য করিতেছে।

'ভারতী'র সম্পাদকত্ব-পর্বটা বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে বন্ধ্যা নহে; আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে

১ সিরাজদ্দৌলা, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫, পৃ ১৪৩-১৪৭। আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯।

৩ ভারতী, ভাদ্র ১৩০৫। ইতিহাস, বিশ্বভারতী।

৪ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কবির নির্দেশ, শারদীয়া দেশ ১৩৬২, পৃ ৪৯।

৫ ভারতবর্ষের ইতিহাস, হেমলতা দেবী (শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা), ভারতী ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ। মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, শ্রীআবদুল করিম বি.এ. প্রণীত ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত প্রথম খণ্ড। ভারতী ১৩০৫ শ্রাবণ, পৃ ২০৯-৩১৫।— রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ ৪৯৪-৪৯৮।

সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বহু রাজনৈতিক সাহিত্যিক সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার রস-কল্পনায় বুঝি দৈন্য আসিয়াছে। এত কাজের মধ্যেও এই এক বৎসরে সাতটি ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন ; সে গল্প পড়িতে পড়িতে মনে হয় না যে এই লেখকই কণ্ঠরোধের সমস্যা, ভাষাবিচ্ছেদের বিতর্ক ও বহুবিধ সমস্যা লইয়া প্রায় প্রতি মাসেই প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এই মানুষই কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ে ভ্রাতুষ্পুত্রদের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছেন।

এ বৎসরের সাতটি গল্প হইতেছে (১৩০৫) দুরাশা পুত্রযজ্ঞ ডিটেকটিভ অধ্যাপক রাজটিকা মণিহারা ও দৃষ্টিদান। বিচিত্র রসে কল্পিত এ গল্পগুলি। দুরাশার আখ্যানবস্তু রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকের নিকট সুপরিচিত। আচারধর্ম ও মানবধর্মের মধ্যে যে শাশ্বত বিরোধ চলিতেছে এখানে তাহাই গল্পাকারে রূপ পাইয়াছে— যেমন পাইয়াছে 'কাহিনী'র আখ্যানগুলিতে। এতো বড় ট্রাজেডি তাঁহার ছোটগল্পের মধ্যে কমই দেখা যায় ; ঘটনার দিক হইতে ইহার সমাবেশ যেমন সম্পূর্ণ, অনুভূতির দিক হইতে ইহা তেমনি তীব্র। যে ব্রাহ্মণের সদাচারদীপ্ত নৈষ্ঠিকতা মুসলমানী তরুণীর হৃদয়কে একদা হরণ করিয়াছিল, তাহা কেশরলালের সত্যধর্ম ছিল না— তাহা ছিল তাহার সংস্কারগত অর্জিত আচারধর্ম। "যে ব্রাহ্মণ আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম, তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম, তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত।" কিন্তু কেশরলাল বহির্বাসের ন্যায় আচারধর্ম ত্যাগ করিয়া সহজেই ভুটানী স্ত্রী ও ভুট্টাখেতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এই নবাবদুহিতা সকল লৌকিক ধর্মনিরপেক্ষ নারীহৃদয়ের বিশুদ্ধপ্রেম উৎসর্গ করিয়াছিল ; আজ ত্রিশ বৎসর পরে শূন্যের মধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হইল। সে বলিতেছে, 'হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর-এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।" বিদায় লইবার সময় নবাব-দুহিতার ত্রিশ বৎসরের চর্চিত হিন্দু অভ্যাসমত 'নমস্কার' জানাইয়াই যেন বুঝিতে পারিল যে সেখানে তাহার আশ্রয় নাই— তাই তাহার পুরাতন প্রায়বিস্মৃত সংস্কারমত বলিল 'সেলাম বাবুসাহেব।'

'পুত্রযজ্ঞ' গল্পটি ভারতীতে সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয় (১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ) ; আসলে গল্পটির প্লট কবিই দেন। সমরেন্দ্রনাথ খামখেয়ালী সভার জন্য সেটা খসড়া করেন ; তার পর রবীন্দ্রনাথ তাহার আমূল সংশোধন করেন ও তাঁহার নিজ ভাষায় লিখিয়া দেন।[১] এ-গল্পটি 'সম্পত্তিসমর্পণের' ন্যায়ই নিষ্ঠুর।

ভারতী চৈত্র (১৩০৫) সংখ্যা প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলেন ; একই কর্মের মধ্যে বহুকাল নিমগ্ন থাকা কবিধর্ম নহে। পত্রিকা-পরিচালনার ঝামেলা, তার উপর আছে ঠাকুর-কোম্পানির ব্যবসায়ের ঝঞ্ঝাট। এ ছাড়া শিলাইদহে পরিবার লইয়া গিয়াছেন— সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, সেখানে আরও মন দেওয়া প্রয়োজন। এইসব বিচিত্র কারণের অভিঘাতে বৎসরান্তে ভারতীর ভার অন্যের স্কন্ধে চালনা করিয়া দিলেন।

চৈত্র মাসে কবিতা দুই-একটি দেখা দিতেছে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বিদায়' (১০ চৈত্র ১৩০৫) ও 'বর্ষশেষ' (৩০ চৈত্র)। দুইটি কবিতার মধ্যে ভাব-ঐক্য আছে। এই বর্ষশেষ লেখার সাতাশ বৎসর পরে[২] কবি এক ভাষণে এই কবিতার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, "ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল ; আমি বুঝলুম, বেরিয়ে আসতে হবে।"

কবি স্পষ্ট করিয়া বেরিয়ে আসার ব্যাখ্যা করেন নাই। কেবল ভারতীর সম্পাদকত্ব ত্যাগ নিশ্চয়ই এতবড়

১ প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থের পুলিনবিহারী সেন-কৃত সংযোজন দ্রষ্টব্য, পৃ ২৬।

২ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩২। দ্র. গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭।

কবিতার উৎস হইতে পারে না। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের পুরাতন জোড়াসাঁকোর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নূতন জীবন যাপন করিতে গ্রামে আসিতেছেন, এই কবিতা তাহাই সূচিত করিতেছে। যখন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, যখন তাঁহার সমশ্রেণীর জমিদারগণ সকলেই নগরবাসের সুখসম্ভোগ ও উত্তেজনার জন্য গ্রামত্যাগী, ঠিক সেইসময়েই তিনি সপরিবারে কলিকাতা মহানগরীর মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে নূতন নীড় রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই বৎসরের গোড়ার দিকে স্ত্রীকে লিখিত পত্রের কথা স্মরণ করিলে বর্ষশেষের কবিতার মর্মার্থ অস্পষ্ট থাকিবে না; কলিকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণমন্দির হইতে দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে চলিয়া আসেন। 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' হইতে মুক্ত হইয়া আসিবার জন্য মনপ্রাণ উৎসুক।

লাভ-ক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

এই ভাবনাকে স্মরণ করিয়া মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের 'কবিকথা' খণ্ডের প্রবেশক কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে—
পাব না কিছুই রাখিব না কোনো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।

কণিকা, কথা, কাহিনী

জমিদারীর কাজ, পুণ্যাহযজ্ঞ, কুষ্টিয়ার ব্যবসায়, কলিকাতার রোগ তাপ, অর্থকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলা ও সাহিত্যচর্চা চলিতেছে— লেখনী স্তব্ধ নহে। এ কথা অতি সত্য যে, সুমহৎ চিন্তা, সুবৃহৎ সাহিত্যসৃষ্টির জন্য সুপ্রশস্ত অবসরের প্রয়োজন; সে অবসর কম, মনও আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্ত। কিন্তু সেই স্বল্প অবসরের ফাঁকে ফাঁকেও 'কণিকা'র কবিতাগুলি লিখিতেছেন। এগুলিকে কবিতা বলা উচিত নয়, বলা যাইতে পারে epigrams বা 'সুভাষিতাবলী'। "এপিগ্রাম জাতীয় কবিতার বিশেষত্ব এই যে অতি সহজ সত্যকে বলা, বাহুল্যের আবর্জনা হইতে মুক্ত করিয়া সহজভাবে অল্প কথায় প্রকাশ করা, যাহা সাধারণ তাহাকে অসাধারণ দৃষ্টিতে দেখিয়া গভীর তত্ত্ব অতি অল্প কথায় কবিত্বমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করা।"[১] কণিকার মধ্যে কবিতাকারে যেসব তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পৃথিবী সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লব্ধ সত্য। আমাদের মনে হয়, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া যে-অভিজ্ঞতা— যাহাকে প্রায় নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা বলা যায়— তাহাই যেন বিদ্রূপের ভাষায় রূপ পাইয়াছে। পার্থিব সত্যের দিক হইতে পৃথিবীর সেরা epigramsএর সহিত এগুলির তুলনা করা যায়, এমনকি চাণক্য মুনির লেখা বলিয়া যাহা চলিত আছে তাহার সঙ্গে তুলনায় কণিকার সত্যোক্তিগুলির ঔজ্জ্বল্য

১ রবিরশ্মি পূর্ব ভাগে, পৃ ৩৭৮।

ম্লান হইবে না। বহুকাল পরে প্রকাশিত 'লেখন' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কণিকার এই হালকা ভাষায় গম্ভীর বাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

কণিকার কবিতাগুলিতে কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কবি সকলের জানা কথাকে কবিত্বমণ্ডিত করিয়া অতি সূক্ষ্ম একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং উপমা রূপক শ্লেষ ও বিপরীতভাবের একত্র সমাবেশ করিয়া এমন-একটি আকস্মিক বিস্ময় পাঠকের ও শ্রোতার মনে উৎপাদন করেন যে, কবির সূক্ষ্মদৃষ্টির গভীর জ্ঞানের কৌতুকের কৌশলের এবং নিপুণ শ্লেষপটুতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়।

গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন সাহিত্যিক বন্ধু প্রমথনাথ রায়চৌধুরীকে। প্রমথনাথ ময়মনসিংহ সন্তোষের অন্যতম জমিদার; ইঁহার কনিষ্ঠ মন্মথনাথ বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। প্রমথনাথ এককালে বাংলা সাহিত্যে নাম করিয়াছিলেন; তাঁহার 'গৌরাঙ্গ' কাব্যখানি তাঁহাকে যশস্বী করে। প্রমথনাথের সহিত পরযুগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিষয়ে আর-কোনো যোগ ছিল বলিয়া জানি না।

কণিকার কবিতাগুলি দুই পংক্তি হইতে দশ পংক্তির মধ্যে রচিত; পাঁচ বৎসর পর 'কাব্যগ্রন্থ' সম্পাদনকালে কণিকার যে প্রবেশক কবিতা লিখিয়া দেন তাহা কবির নিজ ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায়—

'হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে,
করিতে পারি নে সেবা।'
শিশির কহিল কাঁদিয়া
"তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহি যে আমার বল,
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন
    কেবলি অশ্রুজল।'
'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
   বাসিতে পারি যে ভালো।'
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
'ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি;
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
   হাসির মতন করি।'

বৎসরের মাঝামাঝি হইতে যে কাব্যলক্ষ্মীর সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল তিনি মানসসুন্দরী নহেন, তিনি সুবচনী কথালক্ষ্মী। অন্তর্বিষয়ী কাব্যের প্রেরণা আজ ম্লান, তাই আজ বহির্বিষয়ী বস্তু-বর্ণনায় গল্প বা কাহিনী-রচনায় মন যাইতেছে। পাঠকের স্মরণ আছে ১৩০৪ কার্তিক মাসে কবি চারিটি গাথা লিখিয়াছিলেন— শ্রেষ্ঠভিক্ষা প্রতিনিধি দেবতার গ্রাস ও মস্তকবিক্রয়। এইবার এই ধরণের কুড়িটি নূতন কবিতা লিখিলেন; ১৮ই আশ্বিন হইতে ১১ই কার্তিকের মধ্যেই অধিকাংশ রচিত, দুইটি মাত্র অগ্রহায়ণে লেখা।

এই কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনের একটি নূতন সুর ধ্বনিত হইয়াছে দেখি; 'চৈতালি'র মধ্যে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে কবিচিত্তে প্রথম সজাগ সাড়া পড়ে। কল্পনার কাব্যকাকলিতে উহা স্পষ্টতর হয়। নৈবেদ্যের মধ্যে এই দেশপ্রীতি ও ভগবৎপ্রেম এমনভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে যে উহাদিগকে পৃথক করা কঠিন।

ভাবলোকে যে-ভারতকে আশ্চর্যরূপে দেখিতেছিলেন, জীবনে তাহাকে দেখিতে চান আদর্শরূপে; কবি খুঁজিতেছেন সেই বাস্তব রূপকে। তাই বৌদ্ধসাহিত্য বৈষ্ণবগ্রন্থ রাজপুত শিখ ও মারাঠাদের কাহিনী তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্তগুলি অবলম্বনে 'কথা'গুলি রচনা করিলেন।[১]

'কথা' কাব্যগ্রন্থ বাংলাদেশে জাতীয়তাবোধ উদ্‌বুদ্ধ করিতে কী পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে তাহা বাঙালী পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। কয়েক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই কবিতাগুচ্ছের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—

কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।

বহুকাল পরে কবি তাঁহার কথা কাব্যকে কি ভাবে দেখিয়াছিলেন তাহার সন্ধান পাই রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডের সূচনায়। তিনি লিখিতেছেন, "ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক-একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য। ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেইজন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। সেই সময়ে এই বহির্দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে। এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটি মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।" এই মন্তব্যটি কবি যখন লেখেন তখন তিনি 'ছবি-আঁকিয়ে' শিল্পী, সকল জগৎকে চিত্রশালারূপেই দেখিতেছেন।

১ "এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরেজী গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই একটি ইংরাজি শিখ-ইতিহাস (Cuningham, *History of the Sikhs*) হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে, আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্যনীতি-বিধান মতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।"—প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত। ১ মাঘ ১৩০৬।

'কথা'র ন্যায় অপরূপ কাব্যগুচ্ছও সমালোচকদের হাতে বিপর্যস্ত হইয়াছে। 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা'য় অশ্লীলতার ইঙ্গিত আছে; 'বন্দীবীর' মুসলমানদের আত্মসম্মানে আঘাত দিয়েছে; 'শেষশিক্ষা'য় শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের নিন্দা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ! শিখদের অভিযোগ গুরুগোবিন্দ সিংহের মৃত্যুবিষয়ক কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য নহে। দুঃখের বিষয়, উনিশ শতকের মধ্য ভাগে রচিত কানিংহাম সাহেবের শিখ-ইতিহাসে ঐ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে, এতদিন তাহা কাহারও আত্মসম্মানে লাগে নাই, কবিতা প্রকাশিত হইবার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে এই বিষয় লইয়া সাময়িক পত্রিকায় সমুদ্রমন্থন হয়। যথাস্থানে এই আলোচনা পুনরায় আসিবে।

'কথা'র কয়েকটি কবিতাকে পরবর্তী যুগে কবি নূতন রূপ দেন। 'পূজারিনী'র আখ্যানবস্তুকে আশ্রয় করিয়া 'নটীর পূজা' নাটিকা ও 'পরিশোধে'র কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য লেখেন।

'কথা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন জগদীশচন্দ্র বসুকে।[১] বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের সহিত কবির সম্পর্ক বিষয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। উভয় উভয়কে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন এবং পরস্পর পরস্পরের গুণগ্রাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দুই বৎসর (১৩০৪) পূর্বে জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন, "বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে দূর সিন্ধুতীরে হে বন্ধু গিয়েছ তুমি" (কল্পনা)। জগদীশচন্দ্র তখন বিলাতে (১৮৯৫-৯৭)।

'কথা' প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরেই বাহির হইল 'কাহিনী' নামে কাব্য। আমরা ইতিপূর্বে কাহিনী কাব্য-গুচ্ছের নাট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। নাট্যকাব্যগুলি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় জগদীশচন্দ্র শোনেন এবং তিনি কবিবন্ধুকে কর্ণ সম্বন্ধে একটি নাট্যকাব্য লিখিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।[২] 'কাহিনী' খণ্ড ছাপাইতে দিবার পর কবি 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'[৩] লিখিতে আরম্ভ করেন বলিয়া মনে হয়। উহার রচনা সমাপ্ত হইল ১৫ই ফাল্গুন, গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ২০শে ফাল্গুন। সহজেই অনুমান করা যায় যে মুদ্রণের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে রচনায় হাত দেন।

'কাহিনী'[৪] কাব্যখণ্ড উৎসর্গ করিলেন (২০ ফাল্গুন ১৩০৬) "শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেবমাণিক্য মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরের করকমলে।" ত্রিপুরার মহারাজা রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতের কক্ষমধ্যে কখন ও কিভাবে আসিলেন তাহা আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করিব।

১ শিলাইদহ, অগ্রহায়ণ ১৩০৬। 'কথা' প্রকাশিত হয় ১লা মাঘ ১৩০৬।

২ জগদীশচন্দ্রের পত্র, দার্জিলিং ২০মে ১৮৯৯ (৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৫৭। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'চিঠিপত্র' ৬ষ্ঠ খণ্ড।

৩ মন্মথনাথ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তীসংবাদ, দেশ, ১৩৬২, ১৩ শ্রাবণ, পৃ ১০৮১-৮৫। লেখক কুন্তীর ব্যবহার ও বাক্যকে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

৪ এইখানে 'কথা', 'কাহিনী' এবং 'কথা ও কাহিনী' সম্বন্ধে মন্তব্য প্রয়োজন:

কথা— ১লা মাঘ ১৩০৬, পৃ ১১০। উৎসর্গ জগদীশচন্দ্র বসুকে।

কাহিনী—২০শে ফাল্গুন ১৩০৬, পৃ, ১৬৪। উৎসর্গ শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেবমাণিক্যকে (গান্ধারীর আবেদন, পতিতা, ভাষা ও ছন্দ, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, কর্ণকুন্তীসংবাদ)। পরে নাট্যগুলি কাব্যগ্রন্থের ৯ম ভাগ নাট্য অংশে (ক) মুদ্রিত হয়— সতী, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী-সংবাদ, বিদায় অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

কথা ও কাহিনী— মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত (১৯০৩) কাব্যগ্রন্থের ৫ম ভাগ, কাহিনী পৃ ৬১-৯৪; কথা ৯৫-১১২। ইহাই 'কথা ও কাহিনী' নামে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে ১৯১০-এ প্রকাশিত হয়। ইহার বহু সংস্করণে বহু রকমের গ্রহণ বর্জন হইয়াছে।

কবির ইচ্ছা কাব্যচর্চা করেন; কিন্তু বাহিরের বিভিন্ন রকম কাজ নিত্য তাঁহাকে আহ্বান করে। কর্তব্যবোধে অনুরোধ-উপরোধের দায়ে অনেক কাজ করিতে হয়। ১৩০৬ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের নবম সাম্বৎসরিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রহ্মোপনিষদ' নামে এক ভাষণ পাঠ করেন; ইহাই কবির প্রথম ধর্মদেশনা।

কলিকাতায় আসিলেই কবিকে সামাজিক বিচিত্র আহ্বানে সাড়া দিতে হয়; কলিকাতার ভদ্রসমাজের বহু কাজ 'রবিবাবু'কে না হইলে চলে না। সমসাময়িক একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। এই সময়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন। পরিষদ সৃষ্টির পর হইতে আজ এই ছয় বৎসর উহা গ্রে স্ট্রীটস্থ শোভাবাজারের রাজবাটীতে অবস্থিত ছিল। পরিষদের নিজের কোনো গৃহ ছিল না। নবীন সাহিত্যিকরা এইরূপ একটা পাবলিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিবিশেষের বাটীতে কায়েমিভাবে রাখার বিরোধী। ইহার প্রতিবাদকল্পে যে এগারো জন সদস্যের সহিযুক্ত পত্র সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয়, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল। এই পত্রে পরিষদের কার্যালয় কোনো সাধারণ প্রকাশ্যস্থানে স্থানান্তরিত করিবার জন্য সাধারণ সভা আহ্বানের অনুরোধ ছিল। ৩রা ফাল্গুনের (১৩০৬) অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দলেরই জয় হইল। তাঁহাদের চেষ্টায় পরিষদ ভাড়াটিয়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হইল। সাময়িকভাবে একটি দল পরিষদের সংস্রব ত্যাগ করিলেও অচিরে সদস্যসংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি পাইল।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীত-সমাজের সহিত খুবই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পাঠকের স্মরণ আছে ১২৯৮ সাল হইতে এই সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক এখানে অভিনীত হয়। এবং কোনো কোনো অভিনয়ে স্বয়ং তিনি অবতীর্ণ হয়েন। 'বিসর্জন' নাটক সংগীত-সমাজের ব্যবস্থানুসারে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথই তাহার মহড়া দেন ও স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেন, হেমচন্দ্র বসুমল্লিক জয়সিংহ সাজেন। অভিনয়ভঙ্গির নূতন একটি আদর্শ রবীন্দ্রনাথ বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রবর্তিত করিলেন। এই রঙ্গমঞ্চে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০৩) অভিনয়ে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ অবিনাশের ও রবীন্দ্রনাথ কেদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কেদারের সাজপাট ও মেক্‌আপে কবি এমন-একটা অসংবৃত কপট বিনয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন, যাহাতে চরিত্রের অন্তর্লিখিত ভাবটি সহজেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। চেষ্টাকৃত অযত্নের অবরণে স্বার্থসাধনের গূঢ় অভিপ্রায় ঢাকা দিবার চেষ্টা যেন সহজেই নজরে পড়ে, এই ভাবটিই প্রকাশ পাইয়াছিল।[১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' প্রহসনে রবীন্দ্রনাথ 'অলীকবাবু'র ভূমিকায় নামেন। প্রহসনখানি ফরাসী হাস্যনট মোলিয়েরের একটা নাটক ভাঙিয়া লেখা। পাঠকের স্মরণ আছে ১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'এমন কর্ম আর করব না' নামে একটা প্রহসন লেখেন; 'অলীকবাবু' এই নাটকেরই নায়ক। প্রথমবার বিলাত যাইবার পূর্বে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিজেদের মধ্যে ইহার অভিনয় হয়; রবীন্দ্রনাথ তাহাতে 'অলীকবাবু'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। হেমাঙ্গিনী সাজেন অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী শরৎকুমারী। প্রায় বিশ বৎসর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকখানিকে 'অলীকবাবু' বলিয়া প্রকাশ করিলে সংগীত-সমাজে উহার অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু অভিনয় করাইতে গিয়া দেখা গেল রঙ্গমঞ্চে সফল করিতে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় লিখিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ "অনেক অদল বদল করে দিয়ে তা ফরাসী গন্ধ থেকে মুক্ত করলেন। এইখানেই হোলো রবিকাকার আর্ট· · হেমাঙ্গিনীর প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। আগে ছিল এক অলীকবাবুই নানা সাজে ঘুরে ফিরে এসে বাপকে ভুলিয়ে হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করে।

১ দ্র. খগেন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র-কথা।

রবিকাকা সেখানে অনেকগুলো লোক এনে ফেললেন। তাতে হোলো কী, অনেকগুলো ক্যারেকটারেরও সৃষ্টি হোলো। হেমাঙ্গিনীকে রাখলেন একেবারে নেপথ্যে।··আর বেরই করলেন না।"

সংগীত-সমাজের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; প্রিয়নাথ সেন এই অভিনয় দেখেন ও কিছুকাল পরে তৎসম্বন্ধে লেখেন, "এমন সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। নিজে রবিবাবু অলীকপ্রকাশ সাজিয়াছিলেন। যাঁহারা রবিবাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচূড়ামণিও বটে।"[১]

সংগীত-সমাজের গোড়ার দিকে কবি একটু নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিতে ভালোবাসিতেন, স্টেজেও সহসা নামিতে রাজি হইতেন না। কিন্তু ক্রমে আভিজাত্যের সংকোচ কাটিয়া যায় ও স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পুনর্বসন্ত' নামে গীতনাট্যের রিহার্সালে কোমরে চাদর বাঁধিয়া হাততালি বাজাইয়া সখিদের নাচ দেখাইয়া দেন। —রবীন্দ্র-কথা পৃ. ২২৬। সংগীত-সমাজের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ প্রায় দশ বৎসর (১২৯৮-১৩০৮) পর্যন্ত বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই ছিল ; তার পর কলিকাতা মহানগরী হইতে কবির জীবনের কর্মকেন্দ্র বোলপুরের প্রান্তভাগে চলিয়া গেল এবং স্বভাবতই কবি এই সমাজ হইতে দূরে সরিয়া গেলেন—

জীবনযাত্রা আগে চলে যায় ছুটে—
কালে কালে তার খেলার পুতুল
পিছনে ধুলায় লুটে।[২]

রবীন্দ্রনাথ অভিনয়-শিক্ষা বিষয়ে যেসব মন্তব্য করিতেন তৎসম্বন্ধে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "তাঁহার মত যে, অভিনয়ে কিছু তেজস্বিতা বরং ওভার-একটিং ভালো, তাহাতে অভিনেতার আত্মাভিমানজনিত সংকোচের যে অভ্যাসদ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ও দর্শকের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু বাঙালি জাতির সামাজিক জীবনযাত্রার ফলে স্বাভাবিক প্রবণতা আণ্ডার-একটিংএর দিকে।"

ক্ষণিকার পর্ব

১

পত্রিকা-পরিচালনার দায়িত্ব নাই বটে, কিন্তু রচনা-সরবরাহের দায় হইতে অব্যাহতি নাই। নূতন বৎসরের (১৩০৭) শুরু হইতে ভারতীতে 'চিরকুমার সভা' ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে। 'কল্পনা'র শেষ কবিতা (২০ ফাল্গুন ১৩০৬) রচিত হইয়া যাইবার পরই বোধ হয় 'ক্ষণিকা'র কবিতা ও 'চিরকুমার সভা' যুগপৎ আরম্ভ হয়। সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের রচনা হইলেও উভয় গ্রন্থে পরিস্ফুট ব্যঙ্গের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা সাধারণ পাঠকও আবিষ্কার করিতে পারেন। জীবনের অতীত স্মৃতি ও অলীক কল্পনার মধ্যে বহুকাল বাস করিয়া আজ তাহাকেই ভুলিবার জন্য কবির আপ্রাণ চেষ্টা ; সে বন্ধন ছিন্ন করার প্রয়াসমাত্রেই ভাষায় আসিল সরলতা, ছন্দে আসিল চটুল গতি, ভাবনায় আসিল পরিহাস। 'ক্ষণিকার গান'[৩] সত্যই এই কবিতাগুচ্ছের ভূমিকা।

১ সাহিত্য ১০ম বর্ষ ১৩০৬ চৈত্র, পৃ ৭৭১। প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ১২৮।

২ খগেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-কথা পৃ ২১৮। ইহার পর প্রায় ষোলো বৎসর পরে কবি কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাটিতে পাবলিকের কাছে ফাল্গুনীতে নামেন কবিশেখর ও অন্ধ বাউলের ভূমিকায়। যথাস্থানে তাহার অলোচনা হইবে।

৩ ভারতী, ১৩০৭ বৈশাখ। ক্ষণিকায় 'উদ্বোধন' নামে প্রকাশিত।

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর
বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী।
যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যাহা চলে যায় মুছে যাক শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী।

এই কবিতার চারিটি মাত্র স্তবকে কবি তাঁহার কাব্যজীবনের ও জীবনকাব্যের দার্শনিক কথাটি পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূল সূত্র ছিল নৈর্ব্যক্তিকভাবে সমস্তকে স্পর্শ করা; কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রতি অন্ধ আকর্ষণ না থাকায় তিনি যাহা এই কবিতায় লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনসাধনায় সত্য—

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া অলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে;
ধরণীর 'পরে শিথিলবাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে।

ক্ষণিকার কবিতাগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে রচিত তাহা কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। নূতন বৎসরের (১৩০৭) বৈশাখ হইতেই বোধ হয় শুরু হয়; জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় দিন দশের জন্য ত্রিপুরার মহারাজার নিমন্ত্রণে দার্জিলিঙ[১] যান। মহারাজ রাজকুমারদের শিক্ষা-ব্যাপার লইয়া খুব চিন্তান্বিত। সেই বিষয়ে পরামর্শের জন্য তাঁহার আহ্বান। কারণ এসব ব্যাপারে নিঃস্বার্থভাবে সদুপদেশ দিতে পারে এমন লোক রাজদরবারে প্রায়ই দুর্লভ।[২] দার্জিলিঙে থাকেন আনন্দেল হাউসে। এইখানে গোটা-দুই কবিতা লেখেন। তার পর শিলাইদহে ফিরিয়া আসেন ও ১০ই আষাঢ় পর্যন্ত ক্ষণিকার কবিতা লেখেন। ক্ষণিকার মুদ্রণকার্য খুব ঢিলা ভাবে চলিতেছে; 'চিরায়মানা' কবিতাটির মধ্যে তাই যেন লিখিলেন—

যেমন আছ তেমনি এসো,
আর কোরো না সাজ।...
এসো হেসে সহজ বেশে,
নাই বা হল সাজ।

১ জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় কবি দার্জিলিঙে আনন্দেল হাউসে দিন দশ থাকেন। আনন্দমোহন বসুর কন্যা ৺ নলিনী নাগের (অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ নাগের পত্নী) অটোগ্রাফের খাতায় (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) 'সমুদ্র ও গিরিরাজ' কবিতাকণা লিখিয়া দেন।

২ স্বর্গীয় বসন্তকুমার গুপ্তকে লিখিত পত্র। শিলাইদহ (১৩০৭) ৯ বৈশাখ। রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ। শনিবারের চিঠি ১৪শ বর্ষ, ১৩৪৮ কার্তিক।

৬ই আষাঢ় (১৩০৭) প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন, 'ক্ষণিকা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়চি।'

দশ দিন পরে কলিকাতায় গেলেন (১৬ই আষাঢ়), পর দিন দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র কৃতীন্দ্রনাথের বিবাহ। কিন্তু শ্রাবণের গোড়ায় ফিরিয়া গিয়াছেন শিলাইদহে। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন আসিবেন লিখিয়াছিলেন, আসিলেন না; প্রিয়নাথকে আসিবার জন্য বারে বারে তাগিদ করিতেছেন; তিনিও নড়িলেন না। সাহিত্যিক সঙ্গী পাইলে মনটা কয়েকদিন অন্য জগতে বিচরণ করে তাই ইহাদের জন্য মন প্রতীক্ষমান। কবিকে নিরন্তর চলাফেরা করিতে হয়; কুষ্টিয়া যাইতে হয়, ব্যবসায়ের খাতিরে আবার হাইস্কুল সম্বন্ধে স্থানীয় মুন্সেফ বাবুর সহিত আলোচনাও করিতে হয়। এইভাবে শিলাইদহে দিন যায়। এমন সময়ে শ্রাবণ মাসে ক্ষণিকা প্রকাশিত হইল।[১]

'কণিকা'র কবিতাকণা ও 'ক্ষণিকা'র কবিতাবলীর মধ্যে কালের ব্যবধান দীর্ঘ নহে; উভয়ের সুরের মধ্যে একটা আপাত-লঘুতা থাকিলেও গভীর তত্ত্বের সমাবেশ সুস্পষ্ট। কণিকায় কবি বিশ্বসংসারের বিবিধ বিষয় ও বস্তুর মধ্যে যে-যোগসূত্র দেখিয়াছিলেন তাহা কবিতাকণায় প্রকাশ করেন, আর ক্ষণিকার কবি সেই বিশ্বকে কালের মধ্যে সহজভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া নূতন রীতিতে আত্মমোচন করিলেন। রচনার মধ্যে কোথাও কোনো কষ্টকল্পনা বা অতিশয়োক্তি দ্বারা বিশ্বকে স্বীকার করা হয় নাই—"মনেরে আজ কহ যে, ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।"

পুরাতন জীবন, পুরাতন সমাজ— সকল কিছু হইতে কবি যেন তাঁহার নাড়ির যোগকে ছিন্ন করিয়া দিতে চান। পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে কেবল গূঢ় নিবিষ্ট জীবন তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্তি দিতেছে না— আপনার বেষ্টন ছাড়াইয়া একটা বড় ত্যাগের জীবনের জন্য তাঁহার বেদনা জাগিতেছিল— অজিতকুমার, 'রবীন্দ্রনাথ'। নিজ জীবনের ক্ষুদ্র সামাজিক বেষ্টনী হইতেও বাহিরে আসিবার বেদনা অন্তরকে পীড়িত করিতেছিল। সেই গভীর বেদনার উচ্ছ্বাসকে তিনি যেন লঘুভাবে উড়াইতে চাহেন, সুখদুঃখকে মিলাইয়া লইয়া মনের একটি সহজ মাধুর্যের ছন্দ রচনা করিতেছেন। "বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখির জল।"

সমাজের ও সংসারের চিরাচরিত রীতি তাঁহার কাছে আজ অর্থহীন; সংসারের অভ্যস্ত মূল্য সবই বদলাইয়া গেল, নব নব ব্যঞ্জনার আলোক বিদ্রোহী কবিকে সম্পূর্ণ নূতন পথে, জীবনকে জানিবার পথে, প্রবৃত্ত করিল। 'মাতাল' কবিতায় এই বেপরোয়া বিদ্রোহের সুর ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। অথচ স্রোতের এই উচ্ছলতার তলে তলে গভীর তন্ময়তার বেদনা ও আনন্দ তরঙ্গায়িত। কবি নিজ নায়ের হালের দড়ি নিজ হাতে কাটিয়া দিয়া পালে অসীমের খোলা হাওয়া লাগাইয়া মাতালের মত চলিতে উদ্যত। এইখানে দেখি সংস্কারমুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথকে, যিনি লিখিয়াছিলেন, 'অযাত্রায় ভাসাই তরী' 'ভালো মানুষ নই গো মোরা' 'উল্টো কথা কই'। ক্ষণিকার কাব্যগুচ্ছে সেই বন্ধন-বিরোধী নূতন পথের পথিক মুক্তিকামী রবীন্দ্রনাথ।

আমরা বলিয়াছি এই কাব্যখানির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অতীত জীবনের সকল অবস্থার কথা তুলির রেখায়-টানা ছবির মত ফুটিয়াছে। রেখাঙ্কণে শিল্পীর প্রয়াসমাত্র নাই, অত্যন্ত সহজভাবে পরিহাসচ্ছলে যেন আঁকা। পৃথিবীকে ভোগ করিবার জন্য দেহীর জন্ম হয় ধরার বুকে, "আজকে শুধু এক বেলারই তরে আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।" —যুগল। কিন্তু কে সে পৃথিবীকে ভোগ করিতে পারে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বৃদ্ধ পঞ্চাশ-উর্ধ্বে বনে গিয়া কী করিবে? বিশ্বপ্রকৃতির চিন্ময়লীলার সহিত তাহার যোগ কোথায়? "আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।"

১ জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু শিলাইদহে যান ও তাঁহার মোলাকাত বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে সেই সময়ে ক্ষণিকা ছাপাখানায় গিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ বসু, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ (সচিত্র), সাহিত্য ১১শ বর্ষ ১৩০৭ আষাঢ় পৃ ১৪৪-৪৮।

ফাগুন-মাসে লগ্ন দেখে
যুবারা যাক বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্যসাধন
থাকুক রত কঠিন ব্রতে। —শাস্ত্র

সৌন্দর্যভোগ তো যৌবনেরই ধর্ম। যৌবনের মন বিচারী নহে, চিরাচরিতের লৌহশৃঙ্খল যুগে যুগে তাহারা ভাঙিয়াছে, যৌবনই সগর্বে বলিতে পারে—

চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।" —অতিবাদ

সে বলে জীবনে যাহাই আসুক তাহাকে সহজভাবে স্বীকার করিব; মনের সঙ্গে 'বোঝাপড়া' করিয়া বলে—

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

জগৎ বিচিত্র— এই বিচিত্রতাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে অন্তরে বাহিরে সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়; "তোমার মাপে হয় নি সবাই, তুমিও হও নি সবার মাপে" এই সহজ কথাটি বুঝিতে পারিলে পৃথিবীর অনেকখানি অশান্তিকে মন হইতে দূরে রাখা যায়। সেই সুরেই 'অচেনা' কবিতায় বলিলেন—

চাই নে রে মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে, মন তাই নে।

বিশ্বের যে বিচিত্র রস নিত্য সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে, কবি ছাড়া আর কে সেই সহজ গতিচ্ছন্দকে প্রকাশ করিতে পারে? 'পুরস্কার' কবিতায় কবি এই ধরণীকে আর-একটু সুন্দর করিবার জন্য অন্তরের আকূতি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগের কতকগুলি নাটকে ঠাকুর্দা সন্ন্যাসী প্রভৃতির চরিত্রে আমরা চিরযৌবন-কবিকে পাই যিনি গাহিয়াছিলেন 'মোদের পাকবে না চুল গো' ইত্যাদি। ক্ষণিকার 'কবির বয়স' হইয়াছে, কেশে তাঁহার 'পাক ধরেছে বটে', কিন্তু তিনি 'পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো সবার আমি একবয়সী জেনো' বলিয়া সকলকে আশ্বাস দিতেছেন। তরুণ তরুণীরা যখন 'মিলিতে চায় দুরন্ত সংগীতে', তখন

কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভাবের কূলে বসে
পরকালের ভালো মন্দই গনি।

গৃহত্যাগীর জন্য কে গান গাহিবে? সে কবি।

ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগিয়ে তুলবে তাহার মনে
আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে ?

কবি যে সবার সমান-বয়সী এ কথা খুবই সত্য। শিশুর হইয়া শিশুর কবিতা, প্রেমিকের হইয়া প্রেমের গান, ধার্মিকের হইয়া ঈশ্বরের গুণানুকীর্তন, স্বাদেশিকের জন্য তেজোময়ী বাণী সবই তিনি সকল বয়সেরই জন্য দিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার নিরুদ্ধ ভাবরাজিকে ভাষা দেন কবি, সুর দেন তিনি ; সর্ব মানবের হৃদয়ে তিনি অমর। "সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি, কখন শুনি পরকালের ডাক ? সবার আমি সমান-বয়সী যে, চুলে আমার যত ধরুক পাক।"

ক্ষণিকার প্রত্যেকটি কবিতার স্বতন্ত্র সমালোচনা আমাদের গ্রন্থের বিষয়-বহির্ভূত। তবে একটি কথা মনে হয় যে, এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি অখণ্ড চিত্র ফুটিয়াছে। তাঁহার অতীত জীবনের শুরু হইতে ভাবরাজ্যে যেসব স্তর পর পর অতিক্রম করিয়া তিনি আসিয়াছেন কবিতাগুলির মধ্যে সবেরই চিহ্ন যেন রহিয়া গিয়াছে। যৌবনের চঞ্চলতা ধীরে ধীরে গ্রন্থের মাঝখানে স্বচ্ছ সরোবরের শান্তি-সৌন্দর্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া আসিয়াছে। এই কবিতাগুলি প্রথমদিককার কবিতা হইতে গভীর ও স্নিগ্ধ। গ্রন্থের শেষদিকে আসিয়া দেখি কবি বিগত জীবনের অনেক শ্রান্তি অনেক ক্লান্তি অনেক মোহকে বিসর্জন দিতে উদ্যত। 'কল্যাণী' কবিতায় নারীর নূতন মূর্তি গড়িয়া গাহিয়াছেন, "সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে-গান আছে তোমার তরে।" 'অন্তরতম' কবিতাকে রুচিভেদে অর্থ করা যায়— প্রেমের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য 'সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান' তাহা নারীর উদ্দেশে গীত হইয়াছে বলিতে পারা যায়, আবার জীবনদেবতার উদ্দেশে রচিত হইয়াছে বলিলেও কাব্যবোধের কোনো ক্ষতি হইবে না। 'সমাপ্তি' কবিতায় সত্যই কাব্যগুচ্ছ একটি সমে আসিয়া শান্ত হইয়াছে। "কখন যে পথ আপনি ফুরালো সন্ধ্যা হল যে কবে। পিছনে চাহিয়া দেখিনু কখন চলিয়া গিয়াছে সবে।" কিন্তু "সব শেষ হল যেখানে সেখানে তুমি আর আমি একা।" অত্যন্ত লঘুভাবে সহজভাবে জীবন ও জগতকে দেখিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না, হইতে পারেও না। কাব্যের উৎস পরম বেদনার নির্জনতায় ; যাহাকে হাসির ছটার দ্বারা বাহিরে প্রকাশচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে যে 'আঁখির জল' জমিয়াছিল ! তাই 'সমাপ্তি'তে বলিতেছেন—

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে অশ্রুজলের রেখা ?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী আছে কি ললাটে লেখা ?

এই বেদনার মাঝে ফিরিয়া পাইলেন জীবনদেবতাকে—

পথে যতদিন ছিনু ততদিন অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা।

বারে বারে পাইয়া যাহাকে হারাইয়াছেন, নবীন করিয়া তাহাকে কবি যেন আজ পাইলেন। ক্ষণিকার প্রথম দিককার আপাত-লঘুতা এখন নাই, জীবন অচঞ্চল হইয়াছে, এ যেন একটি গভীর অধ্যাত্মজীবনের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে প্রতীক্ষা, বিরাটের জন্য নৈবেদ্যের আয়োজন। যৌবনের কাছে শেষ আরতি নিবেদন করিয়া কবি বিদায় লইলেন।

ক্ষণিকার কবিতাকে মোহিতচন্দ্র সেন তাঁহার সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) লীলা নাম দিয়াছেন। তিনি

উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন— ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সংগতকে নহে অসংগতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালোবাসার ধনকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সত্যকে সত্যকথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়, তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক-পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। প্রেমলীলার এই অঙ্গটি এই গ্রন্থাবলীর 'লীলা' খণ্ডে পাঠকেরা পাইবেন। ইহা ছাড়া লীলা-র মধ্যে আর-একটি জিনিস আছে— তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্ধাপূর্বক আপনাকে বিরূপ মূর্তিতে প্রকাশ করিতেছে। 'মাতাল' যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে, আমি সমাজসংগত ভব্যতার ধার ধারি না— বিদ্রোহী প্রেম বলে, আমি ক্ষণকালের খেলা মাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না। একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।"

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে উৎসর্গ করেন। লোকেন তখন যশোহরের জেলা-জজ (জুন ১৮৯৮-মে ১৯০১)। দুঃখের বিষয় উৎসর্গ-পত্রখানি বহুকাল কবির প্রচলিত সংস্করণে ছিল না। পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম—

> ক্ষণিকারে দেখেছিলে ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,
> সাজিয়ে তারে এনে দিলেম ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।
> আশা করি নিদেন-পক্ষে ছ'টা মাস কি এক বছরই
> হবে তোমার বিজন-বাসে সিগারেটের সহচরী।
> কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে—
> কতকটা কি অগ্নিকণায় ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে ?
> কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে আপনি খসে পড়বে ধুলোয়,
> তার পরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

ক্ষণিকা সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে যদি আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একখানি চিঠি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করি। চন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথের বহুবার মসীযুদ্ধ হইয়াছে তথাচ রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বরাবর অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা এবং চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিকভাবে স্নেহ করিতেন। এই পত্রখানি সেই স্নেহের নিদর্শন। তিনি কবিকে লিখিতেছেন— "তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই। তোমার গতি এতই দ্রুত এতই বিদ্যুৎবৎ! তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই— উহার বৈচিত্র্যও যেমন প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। কণিকা কথা কল্পনা ক্ষণিকা— বলিতে গেলে চারি মাসের মধ্যে চারিখানা— পারিয়া উঠিব কেন? ··যে চারিখানার নাম করিলাম সকলগুলিই মিষ্ট হৃদয়স্পর্শী সুগভীর সুললিত, (অনেকস্থলে) সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ। কিন্তু ক্ষণিকায় বঙ্গের পল্লীজীবনের পল্লীপ্রকৃতির যে অনির্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি— পল্লীপ্রিয় পাড়াগেঁয়ে— মুগ্ধ হইয়াছি। এ সৌরভ তোমার আর-কোনো কাব্যে

পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এ সৌরভ শিলাইদহজনিত। প্রকৃতির প্রাণের সৌরভ পল্লীতেই পাওয়া যায়। কোনটার কথা বলিব? অনেকগুলাতে ঐ সৌরভ পাইয়াছি। কিন্তু, কি জানি কেন, 'বিরহে'র সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।· · তোমার প্রতিভার পরিমাণ হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পূর্বে মাত্র প্রিয়নাথ সেনকে ক্ষণিকা সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ বাবুর অযাচিত পত্র পাইয়া কবি এতই সুখী হইয়াছেন যে বন্ধুকে পত্রখানি আদ্যোপান্ত কপি করিয়া পাঠাইলেন।[১] প্রিয়নাথকে কবি লিখিতেছেন যে, ক্ষণিকার "ভাষা ছন্দ প্রভৃতি এতটা অধিক নতুন হয়েছে যে, যারা স্বাধীন রসগ্রাহী লোক নয়, তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্চে না এটা তাদের ভাল লাগা উচিত কি না— সুতরাং পনেরো-আনা পাঠক ইতস্ততঃ করচে— আর যদি অধিককাল তাদের এই দ্বিধার মধ্যে ফেলে রাখা যায় তাহলে তারা চটেমটে বইটাকে গাল দিতে আরম্ভ করবে— একটা সমালোচনা পেলে তারা আশ্রয় পেয়ে বাঁচবে।"[২]

ক্ষণিকার সুরের মধ্যে যে কেবল বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা নহে, উহার ছন্দ ও রীতির বৈশিষ্ট্যও বাংলায় নূতন। বহু বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "ক্ষণিকায় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগেঁয়ে টাটু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশী।"[৩] কবির এই উক্তি যে কত সত্য তাহা গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা কবিতার বিচিত্র ছন্দ পরীক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। সে আলোচনার ক্ষেত্র এ গ্রন্থ নহে।

২

ক্ষণিকার কবিতা ছাড়া ১৩০৭ সালের গোড়া হইতে ভারতীতে মাসে মাসে 'চিরকুমার সভা' দিতেছেন। ২০ শ্রাবণ 'দীনদান' কবিতাটি লিখিত হয়। প্রিয়নাথ সেনকে এক পত্রে (২৬শে শ্রাবণ) লিখিতেছেন যে, বিনোদিনীর সুদীর্ঘ কাহিনীটি খাতার মধ্যে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেটিকে বাহির করিয়া কাটাকুটি করিতেছেন। ইহা 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রথম পাণ্ডুলিপি। বঙ্গদর্শনে ১৩০৮ হইতে ইহা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে।

চিরকুমার সভা ছাড়া কয়েকটি ছোটগল্প এই সময়ে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। শুনিয়াছি জগদীশচন্দ্র বসু বিলাত যাইবার (১৩০৯ শ্রাবণ) পূর্বাহ্ণে কিছুকাল শিলাইদহে কবির আতিথ্য গ্রহণ করেন; সেই সময়ে প্রতিদিন রবীন্দ্রনাথকে একটি করিয়া গল্প লিখিয়া বন্ধুর চিত্তবিনোদন করিতে হইত।[৪] সাময়িক পত্রিকাওয়ালাদের তাগিদে সেগুলি ১৩০৭ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পূর্বে রচনাগুলির প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি যে দেন নাই, তাহা গল্পগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। এই গল্পগুলি ভারতী ও প্রদীপ মাসিকপত্র ও প্রভাত নামে এক আকস্মিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতীতে 'উদ্ধার' (১৩০৭ শ্রাবণ), 'দুর্বুদ্ধি' (ভাদ্র), 'ফেল' (আশ্বিন) ও প্রদীপে 'সদর-অন্দর' (আষাঢ়) 'শুভদৃষ্টি' (আশ্বিন) প্রকাশিত হয়। 'প্রভাত' পত্রিকা এ পর্যন্ত আমরা দেখি

১ প্রিয়নাথকে লিখিত পত্রমধ্যে উদ্ধৃত। ৩১ শ্রাবণ ১৩০৭। দ্র. প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৭৭-৭৯।

২ পত্র। ২৪ শ্রাবণ ১৩০৭। দ্র. শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন।

৩ ভাষার কথা, সবুজপত্র ১৩২৩ চৈত্র। দ্র. প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২৩-২৫।

৪ দ্র. চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, পরিশিষ্ট।

নাই; এই সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেছিলেন কবির অন্যতম বন্ধু ও গুণগ্রাহী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। বন্ধুর আগ্রহে ও অনুরোধে দুইটি প্রবন্ধও দিয়াছিলেন—'তৈলাক্ত শিরে তৈলসেক' (? শ্রাবণ) ও 'চুম্বক কৌশল' (ভাদ্র)। আমাদের মতে এই 'প্রভাত' কাগজে কবির তিনটি গল্পও প্রকাশিত হয়। সেই গল্প তিনটি হইতেছে 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' 'উলুখড়ের বিপদ' ও 'প্রতিবেশিনী'। এই সময়ের গল্পগুলি সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্পাদক তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন; 'উদ্ধার' গল্প সম্বন্ধে তিনি লেখেন, "রবীন্দ্রবাবুর গৌরী অমোঘবাহিনী বিদ্যুল্লতাই বটে, তাহার চকিত দীপ্তি নিমেষের জন্য চক্ষের উপর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার সমস্তটা কখনই কল্পনার কারায় ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। গল্পটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, গল্পের কঙ্কাল বলিলেও চলে। এই পঞ্জর-পিঞ্জরে তিনটি প্রাণী· ·। অতি ক্ষুদ্র গল্পের সংকীর্ণ পরিসরে তিনজনের স্থান পর্যাপ্ত নয়। কবি কেবল রেখায় গল্পটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আখ্যানবস্তুর একটা অস্পষ্ট আভাসমাত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। ছায়ালোক সম্পাতে আর-একটু পরিণত হইলে গল্পটি সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত।"— সাহিত্য ১৩০৭ ভাদ্র পৃ ১১৯। নিরপেক্ষ বিচারে এই সময়ের গল্প সম্বন্ধে এই মতেই উপনীত হইতে হইবে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবির বন্ধু অথচ 'প্রভাত' কাগজখানা তাঁহার ভালো লাগিতেছে না, সে কথাটা বন্ধুকে সরাসরি বলিতেও পারিতেছেন না। তাই প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন যে কাগজটার "না আছে ঝাঁজ, না আছে নূতনত্ব।" বন্ধুর 'তপস্বিনী' (১৯০০) নামে উপন্যাস পড়িয়াও যাহা মনে হইতেছে তাহাও বন্ধুকে না লিখিয়া লিখিতেছেন প্রিয়নাথকে; বোধ হয় বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়েই এইটি করেন—অথচ নিজের মত ব্যক্ত না-করিয়াও পারিতেছেন না। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই উপন্যাসখানিকে বাংলাভাষায় বাস্তব সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম প্রয়াস বলিতে পারা যায়। সাহিত্যে বাস্তবতা ও ভাবুকতা বা আদর্শবাদিতা সম্বন্ধে তখনো সাময়িক সাহিত্যে মসীবর্ষণ-ক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই। এই উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত বন্ধুর অনুকূলে গেল না; তিনি তাঁহার মত প্রিয়নাথকে ব্যক্তিগত-ভাবে লিখিয়াছিলেন[১] (১২ আশ্বিন ১৩০৭)।

"নগেন্দ্র গুপ্তর তপস্বিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক হয় নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত realism-এর অবতারণা করতে চাচ্চেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এ রকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভালো, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইএ তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সব কথা পরিষ্কারভাবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন নি, সেইজন্য তাঁহার selfconscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটাকে লজ্জিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্চে নিঃসংকোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করে করেচেন।· ·এ সব জিনিস তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্যে সব কথা ভালো করে প্রকাশ করতেও পারেন নি।"

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে শুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক অবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া অ্যাডভেঞ্চার এবং গার্হস্থ্য— চিত্রময় রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।[২] ১৯০১ সালে নগেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব The Twentieth Century নামে ইংরেজি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা ইংরেজিতে তর্জমা করিয়া গ্রন্থ বাহির করেন।

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১ম বর্ষ ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ ৫৯৮।

২ সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড।

আমাদের এই আলোচ্য পর্বে (১৩০৬-৭) রবীন্দ্রনাথের গদ্য প্রবন্ধাদি রচনা বড়ই কম—তার প্রধান কারণ কোনো বিশেষ পত্রিকার সহিত তিনি যুক্ত নহেন, কোথা হইতে কোনো তাগিদ নাই। 'প্রভাতে' যে-দুইটি প্রবন্ধ দিয়াছিলেন বলিয়া প্রিয়নাথের পত্র হইতে জানা যায়, তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই।

গত বৎসর (১৩০৫ পৌষ) 'প্রদীপ' মাসিকপত্রের জন্য 'মন্দিরাভিমুখে' শীর্ষক প্রবন্ধে মহারাষ্ট্রীয় ভাস্কর ক্ষাত্রের একটি ভাস্কর্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন; এবারও তরুণ চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণ তৈলে অঙ্কিত পটের সমালোচনার জন্য প্রদীপ-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে অনুরোধ আসিল। বাংলাদেশে প্রদীপই সর্বপ্রথম পত্রিকা যাহাতে হাফটোন ব্লক ও ত্রিবর্ণীচিত্র মুদ্রিত হয়। আমাদের মনে হয় এই শ্রেণীর চিত্র দেখিতে অনভ্যস্ত সাধারণে মনঃশিক্ষার জন্য সম্পাদক-মহাশয় রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিষয়-উপযোগী প্রবন্ধ চাহিয়া থাকিবেন। চিত্রপটের বিষয় ছিল বাণভট্টকৃত কাদম্বরী কথাকাব্যের প্রারম্ভে রাজসভার দৃশ্য।

'কাদম্বরী চিত্র' দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে স্বভাবতই সংস্কৃত কথাসাহিত্য ও অনুরূপ বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন ও সমস্যা উদিত হইতেছে তাহাই এই প্রবন্ধে সুনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে উপভোগ্য হইতেছে বাণভট্টের দীর্ঘসমাসবদ্ধ বাক্যশৃঙ্খলের বাংলায় সুললিত অনুবাদ; বহু বৎসর পরে শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর সেই দুরূহ কার্য সম্পন্ন করিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

কাদম্বরী কথাকাব্য পড়িতে পড়িতে চন্দ্রাপীড় ও পত্রলেখার কাহিনী কবির মানসপটে সাহিত্যের নূতন প্রশ্ন উদ্রিক্ত করিল; পত্রলেখার স্থান কোথায়? এই প্রশ্ন হইতেই বোধ হয় 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধের জন্ম।

'কাব্যের উপেক্ষিতা'[১] সম্পূর্ণ অন্যপ্রকারের রচনা; মহৎ চরিত্র মহৎ আদর্শের কথাই কবি-মহাকবিরা কাব্যে-মহাকাব্যে মহোৎসাহে বর্ণনা করিয়া থাকেন; কিন্তু পথের ধারে যে-একটি ড্যাফোডিল বা ঘাসের ফুল আপন আনন্দে মাথা দুলাইতে থাকে—তাহার দিকে কয়জন কবির দৃষ্টি যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণে লক্ষ্মণপত্নী বধূ উর্মিলা, ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া সখীদ্বয় এবং কাদম্বরী কথাকাব্যের সহচরী পত্রলেখা—এই চরিত্রচতুষ্টয় কবির মতে সাহিত্যে অনাদৃতা, সীতা শকুন্তলা কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা—ইহারাই কবির ও পাঠকের সমগ্র মনোভাব ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। এই অনাদৃতাদের কেহ স্মরণে আনে না।

কাদম্বরী সম্বন্ধে বহু আলোচনার মধ্যে কবি বলেন যে বাণভট্ট বাক্যের মধ্য দিয়া চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। মনে হয় কাদম্বরী কথাকাব্য যেন ভাষার তুলিতে অঙ্কিত চিত্রকাব্য। এই দুই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের নবতর ব্যাখ্যা করিয়া নূতন রসের পরিবেশন করিয়াছিলেন।

শিলাইদহে সপরিবারে

১৩০৫ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের লইয়া শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বাস করিতেছেন। ছেলেমেয়েদের পড়াইবার জন্য লরেন্স নামে এক ইংরেজ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন; অল্পকাল মধ্যে জগদানন্দ রায় আসিয়া ইঁহার সহিত যুক্ত হইলেন। প্রথমে ইনি ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন, গণিতে ও বিজ্ঞানে ইঁহার ঔৎসুক্য দেখিয়া কবি ইঁহাকে সন্তানদের শিক্ষকরূপে গ্রহণ করিলেন।

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে কবির নানা বিষয়ের পরীক্ষা চলিতেছে, যেমন, নূতন নূতন ফসল ও রেশমের গুটির পরীক্ষা। রাজশাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কবির বিশেষ বন্ধু; আমাদের আলোচ্য পর্বে রাজশাহীতে

১ ভারতী ২৪ বর্ষ ১৩০৭ বৈশাখ। প্রাচীন সাহিত্য (১৩১৪)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫।

রেশমের একটি কারখানা তাঁহারই উৎসাহে স্থাপিত হয়। অক্ষয়কুমারকে লোকে ঐতিহাসিক বলিয়াই জানে, কিন্তু বাংলার মৃতকল্প রেশমশিল্পের পুনর্গঠন কার্যে তাঁহার সহায়তার কথা বড় কেহ জানে না। ১৩০৫ চৈত্র মাসে ত্রিপুরার কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিতেছেন যে, "রাজশাহী শিল্প-বিদ্যালয়কে উৎসাহ দিবার জন্য সেখান হইতে আমি সর্বদাই রেশমের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকি।··বন্ধুদের নিকট আমার এই উপহার কেবল আমার উপহার নহে, তাহা স্বদেশের উপহার।" এই পত্রের সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট চাদর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।[1] রেশমগুটির পরীক্ষা করিতে গিয়া কবির কী যে দুর্দশা হইয়াছিল তাহা জগদীশচন্দ্রকে লিখিত একখানি পত্রে বিবৃত হইয়াছে; অক্ষয়কুমার "কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি— দশ বারো জন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে— লরেন্স স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত।"[2] কবি 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' নামক পুস্তিকায় শিলাইদহে এই রেশমগুটির পরীক্ষার কাহিনী সবিস্তারে বলিয়াছেন। এই পত্রে আরও আছে যে তিনি আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়া তাহার চাষ করিতেছেন ও মাদ্রাজি সরু ধান রোপন করিয়াছেন। কবির এই চাষবাস দেখিতে কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন (২৬ জুন ১৮৯৯)।

গুটিপোকা পালন, চাষবাসের দুঃখ তো স্বখাতসলিল; কিন্তু আসল দুঃখ পাইতেছেন 'সাহিত্য'-সম্পাদকের তীব্র সমালোচনা হইতে। বহু বৎসর ধরিয়া সাহিত্যপত্রিকা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল প্রকার রচনারই প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। এইসব সমালোচনার অধিকাংশই অর্থহীন, এমনকি কিছু কিছু বিদ্বেষ-প্রসূত; তবে কখনো কখনো সমাজপতি যাহা বলিতেন তাহার মধ্যে তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভা প্রকাশ পাইত। ভারতীর সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলে 'সাহিত্য' লিখিয়াছিলেন "মাসিকের জন্য অনবরত লিখিয়া তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] সাহিত্যশিল্পের যতটা অবনতি হইয়াছে, তাহা বঙ্গভাষার ক্ষতি বলিয়া গণ্য করি।"[3] কিন্তু এ একপ্রকার ব্যাজস্তুতিই। আসল তীব্র সমালোচনাই কবিকে চঞ্চল করিত। সাহিত্যের কোনো-এক গল্পে কবিকে অত্যন্ত কুৎসিতভাবে আক্রমণ করা হয়। কবি প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন, "এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোনো বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে তো করিবে।"[4] কয়েকদিন পরে পুনরায় এক পত্রে লিখিতেছেন যে, সাহিত্যের লেখকের 'কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা' এবং তাঁহার প্রতি 'সমবেদনা প্রকাশ করিয়া' তিনি ও জগদীশচন্দ্র যেসব পত্র লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাকে বিশেষ বল দান করিয়াছে, "মন শান্ত না থাকিলে আমি কোনো কাজ করিতে পারি না সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি।"[5]

সপরিবারে শিলাইদহে থাকিলেও কবিকে প্রায়ই কলিকাতা আসিতে হয়। বলেন্দ্রনাথের কঠিন পীড়া; তিনি ঠাকুর-কোম্পানির কর্ণধার ছিলেন। কোম্পানির একটা আপিস ছিল কলিকাতায়। বাণিজ্য-তরণী নিমগ্ন-প্রায় দেখিয়া কবি খুবই উদ্‌বিগ্ন হইয়া কাজকর্ম দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতায় আসিলে পারিবারিক

১ পূর্বাশা ১৩৪৮।

২ পত্র। জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত। ১০ আষাঢ় ১৩০৬। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ।

৩ সাহিত্য, ১০ম বর্ষ, ১৩০৬ বৈশাখ, পৃ ৬৮।

৪ আষাঢ় ১৩০৬। প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৭৫।

৫ ১০ আষাঢ় ১৩০৬। প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৭৬।

সামাজিক বৈষয়িক সাহিত্যিক অসংখ্য কাজ যেন তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, তিনিও যে নানা কাজের পিছনে ধাবিত না হন সে কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। ফলে কলিকাতায় যখন থাকেন উদয়-অস্ত কাজ তাঁহার পিছু লাগিয়া থাকে। এই সময়ে একটি বিশেষ মঙ্গলকর্ম তাঁহাকে করিতে দেখি; সেটি হইতেছে অন্ধকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থসাহায্য দান ও তদ্‌বিষয়ে ব্যবস্থা করা। কবি হেমচন্দ্র এককালে কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন, কিন্তু বার্ধক্যের পূর্বেই অন্ধ হইয়া যান। সেই হইতে তাঁহার দারিদ্র্য-দুঃখের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ ইহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং মাসিক ২০৲ করিয়া এবং গগনেন্দ্রনাথদের বলিয়া ১০৲ করিয়া সাহায্য ব্যবস্থা করিয়া দেন।[১]

সাহিত্যিক দুঃখভোগব্যতীত আসল দুঃখভোগের কারণ তিনি স্বয়ং জুটাইয়াছিলেন যাহার জের তাঁহাকে বহু বৎসর ভোগ করিতে হইয়াছিল। এ স্থলে গোড়ার দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি ১৩০২ সালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়ায় 'ঠাকুর-কোম্পানি' নামে এক কারবার খোলেন। মফস্বলের জমিদারি হইতে ভুষি মাল ও পাট কিনিয়া বাঁধি কারবার কাজের সূত্রপাত হয়। কিছুকাল পরে আখমাড়াই-কলের কাজেও তাঁহারা হাত দেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে আখের চাষ ভালোই ছিল ও গ্রামে গ্রামে আখমাড়াই হইত। সে সময়ে আখমাড়াই-কলের একমাত্র সরবরাহক ছিল রেনউইক নামে এক ইংরেজ কোম্পানি; তাহাদের কল, তাহাদেরই দালাল গ্রামে গ্রামে বিলি করিত। ঠাকুর-কোম্পানি এই ইংরেজ কোম্পানির সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের একচেটিয়া ব্যবসা ভাঙিয়া দিতে সমর্থ হইলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রদের কর্মোৎসাহ দেখিয়া স্বয়ং ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হইলেন ও ব্যবসায়কে বহুবিস্তৃত করিবার জন্য প্রয়োজনমত অর্থসাহায্য ও পরামর্শ দিতে লাগিলেন। গোড়ার দিকে ব্যবসায়ের খুঁটিনাটি লইয়া রবীন্দ্রনাথ কখনো মাথা ঘামাইতেন না, কারণ জমিদারির কাজই তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি কাজের বিস্তার ও সফলতা দেখিয়া বাস্তবের সহিত কল্পনা জুড়িয়া সব জিনিসটাকে রঙিন করিয়া দেখিতেন। কাজ ভালোই চলিতেছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের মন ক্রমশ জীবনবীমা সমবায় প্রভৃতি জাতীয়-জীবনের বৃহত্তর কর্মাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ব্যবসায়ের দেখাশুনা সম্পূর্ণরূপে গিয়া পড়িল বলেন্দ্রনাথের[২] উপর। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যিক, আদর্শবাদী, মনুষ্যচরিত্রে অনভিজ্ঞ; তাঁহার স্কন্ধে মৈত্রেয় নামে এক শনি চাপিয়াছিল। সে ছিল ম্যানেজার; সেই লোকটি বাণিজ্যতরণীর তলদেশে এমন সুনিপুণভাবে ছিদ্র করিয়া দিয়াছিল যে, উহা যে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইতেছে তাহা কেহই উপর হইতে বুঝিতে পারেন নাই। অতি বিশ্বাসী ম্যানেজার ৭০।৮০ হাজার টাকার হিসাব গরমিল করিয়া উধাও হইলেন।

এ দিকে বলেন্দ্রনাথ ১৩০৫ সালের শেষ দিকে অসুস্থ হইয়া পড়ায় ব্যবসায়ের অবস্থা খুবই জটিল হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, বলেন্দ্রনাথের "বিষয়কার্য তাঁহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহা সত্বেও পঞ্জাবী আর্যসমাজের সহিত বাঙালি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মিলন সাধনের জন্য তিনি দিনরাত সচিন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেই মহৎ

১ পত্র। জোড়াসাঁকো, ৩ শ্রাবণ ১৩০৬। দ্র. মন্মথনাথ, হেমচন্দ্র, ৩য় খণ্ড পৃ ২৪৬।

২ বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৩০৬, ৬ই ভাদ্র। ইঁহার মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশেষ আঘাতরূপেই আসিয়াছিল; 'বলু' ছিলেন আকৃতিতে প্রকৃতিতে তাঁহার মতন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিজহাতে তৈয়ারি করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বড় আশা ছিল এক কালে বলেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে গদ্য রচনায় অমর স্থান লাভ করিবেন।— অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত, রচনাকার বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা ও সাহিত্য, ২৩শ বর্ষ, ১৩৫৩ মাঘ, পৃ ১১-১৭।

উদ্দেশ্য মনে লইয়া তিনি গত বৎসর [১৩০৫] মাঘ মাসের শেষে পঞ্জাবে যাত্রা করেন। পথকষ্টে অনিয়মে ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বাভাবিক দুর্বল দেহে কঠিন রোগের সূত্রপাত হয়।"[১] এই মারাত্মক যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। ১৩০৬ সালের ৬ই ভাদ্র কলিকাতার বাটিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

বলেন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া পড়িবার পর হইতে ব্যবসায়ের অর্থাদি ব্যাপারের অনেক দায় ও দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ পিতৃসম্পত্তির মালিক, কিন্তু বলেন্দ্র ও সুরেন্দ্র উভয়েরই পিতা জীবিত থাকায় এজমালি ঠাকুর-এস্টেটের উপর তাঁহাদের অধিকার কায়েম হইতে পারে না। আইনের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথই দায়ী।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও কুষ্টিয়ার ব্যবসায় প্রায় দুই বৎসরকাল চলিয়াছিল, কিন্তু খুবই টলমল অবস্থায়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একা এই দুরূহ কার্য করা অসম্ভব— অথচ এত টাকা ব্যবসায়ে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, চারি দিকে এত দেনা ও এত পাওনা যে তাহা হঠাৎ গুটাইতে পারিতেছেন না; তাই কোম্পানির ব্যবসায় এখনো চলিতেছে। তবে ব্যবসায় করিতে গেলেই চালু টাকার প্রয়োজন। সে সঞ্চিত ধনের অনেকখানি নষ্ট করিয়া গিয়াছেন পুরাতন ম্যানেজার। ব্যবসায় চালু রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ কবি হইয়াও আজ অর্থের সন্ধানে ঘুরিতেছেন— লোকেন পালিতের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা ধার করিয়াছেন। লোকেন কখনো টাকার তাগিদ করে না বলিয়া কবির আরও সমস্যা; তাই বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে অনবরত পত্র দিতেছেন কোন্ উৎস হইতে কি ভাবে টাকার জোগাড় হইতে পারে। চাঁচলের রাজা, আমলা-সদরপুরের ব্যবসায়ী, কলিকাতায় মাড়োয়ারীর নিকট হইতে অর্থ ঋণ করিবার কত কথাবার্তা ও পরামর্শ চলিতেছে। একবার লিখিতেছেন, "একজন মাড়োয়ারী baler এবং তার সঙ্গে একজন ইংরেজ আমাদের সঙ্গে অর্ধেক ভাগে আগামী বৎসর কাজ করতে চায়— যা-কিছু খরিদ হবে তার অর্ধেক খরচ আমাদের অর্ধেক খরচ তাদের— তারা নিজব্যয়ে কলকাতায় establishment চালাবে, আমরা নিজব্যয়ে কুষ্টিয়ায় চালাব— আমরা খরিদ করব, তারা বিক্রী করবে। এ বৎসর কালিগ্রামে ধানের কারবার সুবিধা নয় বলে আমরা তাতে হাত দিই নি, কেবল আখের কল পূর্ববৎ চলচে।"[২] এইটি লিখিতেছেন বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পরে।

ঐ অঞ্চলে আখমাড়াই-কল তৈয়ারি একচেটিয়াত্ব ছিল রেনিউইক নামে সাহেব কোম্পানির; তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়া তাঁহারা আজ ছয়-সাত বৎসর টিকিয়া আছেন। আসল কথা, এই সময়ে প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতিকে লিখিত পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে ১৩০৮ সাল পর্যন্ত ঠাকুর-কোম্পানির কাজ চালু ছিল। তার পর চলিয়া আসেন শান্তিনিকেতনে।

এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে কবি বুঝিতেছেন যে শিলাইদহে বাস চিরস্থায়ী হইতে পারে না, ছেলে-মেয়েরা বড় হইতেছে, তাহাদের শিক্ষা ও বিবাহাদির প্রশ্ন আছে; স্ত্রীর পক্ষে এই নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। তখন কুষ্টিয়ার ব্যবসায় উঠাইয়া দেওয়া স্থির করিলেন; এই সময় ব্যবসায়ে লোকসানের অঙ্কও বাড়িয়া চলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মাথায় যখন যেটা একবার ঢুকিত, তাহা সহজে দূর হইত না; তখন লাভ-লোকসান স্তুতি-নিন্দার কোনো কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তাই কুষ্টিয়ার ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া কারবারের জিনিসপত্র কোম্পানির যজ্ঞেশ্বর নামে এক কর্মচারীকে সামান্য খাজনায় দান করিয়া দিলেন; কালে এই যজ্ঞেশ্বর কুষ্টিয়ার অন্যতম ধনীমহাজন রূপে খ্যাতিমান হন।[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমনোনীত রচনার প্রতি যেমন নির্দয়— কাটিয়া কুটিয়া, চিত্রবিচিত্র করিয়া সেগুলিকে অপাঠ্য

১ প্রদীপ ১৩০৬ আশ্বিন-কার্তিক পৃ ৩৪৮।

২ পত্র। ২৬ ফাল্গুন ১৩০৭, শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃ ৭৩৮।

৩ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

করিয়া ফেলিতেন— তাঁহার জীবনের ব্যর্থতার নিদর্শনগুলিও তেমনি ভাবেই নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মুদ্রিত কোনো রচনার মধ্যে কুষ্টিয়ার ঠাকুর-কোম্পানির সফলতা-ব্যর্থতার কোনো উল্লেখ নাই; এবং তিনি যে এক কালে পাটের ব্যবসায় ভুষিমাল খরিদ-বিক্রয় আখমাড়াই-কল তৈয়ারি ও মেরামতির মত অ-কবিজনোচিত 'হীন' কর্মে লিপ্ত ছিলেন, তাহা কোথাও কবুল করেন নাই— অস্পষ্ট ইঙ্গিত পর্যন্ত তাঁহার রচনায় পাওয়া যায় না। কারণ, সত্যই তো এই ব্যবসায়-সংক্রান্ত আলোচনা সাহিত্যের বস্তু হইতে পারে না।

এইসব ব্যবসায়-সংক্রান্ত ঋণজাল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি তারকনাথ পালিতের নিকট হইতে টাকা ধার করেন; সেই টাকা ১৯১৭ সালে পরিশোধিত হয়। যথাস্থানে সে আলোচনা আসিবে।

১৩০৭ সালটা কবির আর-একটি উদ্বেগের কারণ যাইতেছে জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার বিবাহ-সম্বন্ধ লইয়া। প্রিয়নাথ সেনই খানিকটা ঘটকের কাজ করিতেছেন; পাত্র বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্র— মজঃফরপুরের উকিল। যৌতুকাদির জটিল প্রশ্ন লইয়া প্রিয়নাথের সহিত দীর্ঘকাল বহু পত্র ব্যবহার চলে। পাত্রপক্ষের দাবী প্রায় দশ হাজার টাকার; কিন্তু অত টাকা দিবার সাধ্য রবীন্দ্রনাথের নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যৌতুক দেন বিবাহের পর— তিনি কখনো বিবাহের পূর্বে কোনো টাকার প্রতিশ্রুতি দিতেন না। কিন্তু বিবাহের পূর্বে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ একান্ত আবশ্যিক এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া জানাইতেছেন। বহু পত্র বিনিময় হয়— অবশেষে স্থির হইল বিবাহ ১৩০৮ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ নিষ্পন্ন হইবে। শেষকালে দিন বদলাইয়া বিবাহ হয় ১লা আষাঢ়।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কারসমূহ বিলাতে রয়েল সোসাইটির নিকট প্রমাণ করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন (শ্রাবণ ১৩০৭)। রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রায়ই পত্র দেন, রবীন্দ্রনাথ উত্তর লেখেন, দুইজনে তখন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। লণ্ডন হইতে জগদীশচন্দ্র তাঁহার ভ্রমণকাহিনী ও বিজ্ঞানীদের সহিত আলোচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ পাঠান। জগদীশচন্দ্রের এক পত্রের[১] উত্তরে লিখিতেছেন, "আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছি— আমার চার দিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোদুল্যমান। শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্য তৈরি করচিনে, এবং কোন দেশের ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এ রকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে ষোলো আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হচ্ছে, সুতরাং রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে— অতএব মৃত র‍্যাফেল্ তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরে থাকতে পারেন— আমার দ্বারা তাঁর যশের কোন লাঘব হবে না।"[২]

পত্রশেষে ঝড়বৃষ্টির আভাস দেওয়া আছে, তাহা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ভীষণ সাইক্লোনে পরিণত হইল। প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন, "আঃ, কি দুর্যোগ! ক'দিন অবিশ্রাম ঝড় ও বৃষ্টি চলচে· ·। এই অবিশ্রাম দুর্যোগে চারি দিকের লোকসান আর ত দেখা যায় না! বড় বড় আখের ক্ষেত ভূমিশায়ী, শস্যক্ষেত্র প্লাবিত, কূলপ্লাবিনী নদী পুরাতন পল্লী এবং বৃদ্ধ ছায়াতরুগুলিকে গ্রাস করে চলেছে। কোনো দরবারে এর নালিশ নেই,· ·অন্ধ হাওয়া হাঁ হাঁ

১ জগদীশচন্দ্রের পত্র, ৩১ আগষ্ট ১৯০০। পত্রাবলী, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

২ পত্রাবলী, শিলাইদহ, ১ আশ্বিন [১৩০৭]। চিঠিপত্র ৬।

করে ছুটে আসচে, অন্ধ স্রোত নৃত্য করতে করতে কি করচে কিছুই জানে না· ·। কিন্তু এ ব্যাপারটি যে কি কারণে না হলেই নয় এবং না হলে দূরদূরান্তর এবং কালকালান্তর পর্য্যন্ত তার কি ফল ফল্‌ত তা আমি কিছুই জানি নে— অতএব যতই ব্যথিত হই পীড়িত হই কারো নামে কোন নালিশ আনব না— এটা বল্‌ব না যে, আমরা যেটা চাচ্চি সেটা কেন হচ্চে না।"[১]

কবির দিন কাটে নানা কাজে, তার ফর্দ একাধিকবার দেওয়া হইয়াছে। সন্তানদের পড়াশুনা ব্যবস্থা করা এই বিচিত্র কর্মের অন্যতম— লরেন্স, জগদানন্দ রায়, শিবধন বিদ্যার্ণবের সঙ্গে আলোচনা করেন শিক্ষা বিষয়ে। কবির মতে বর্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজি-চর্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে সংস্কৃত শিক্ষাটা একান্ত দরকার। — চিঠিপত্র ৬। সহজে সংস্কৃত শিক্ষার প্রণালী উদ্‌ভাবন করেন তিনি। কবি বলেন, "ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষা শিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না।"[২] তিনি বলেন তাঁহার পদ্ধতি মতে যদি কেহ সংস্কৃত শেখেন তাহলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে। প্রসঙ্গক্রমে বলি ১৮৯৬ অব্দে কলিকাতায় সন্তানদের জন্য হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

পত্রিকার দায় নাই বলিয়া লেখার প্রেরণা কম, কেবল 'চিরকুমার সভা' কিস্তিতে কিস্তিতে লিখিয়া ভারতীতে পাঠাইতেছেন। নিজের ইচ্ছা বই পড়েন, অন্যের অনুরোধেও সমালোচনার জন্য বই পড়িতে হয়। শেষোক্ত ধরণের বই হইতেছে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তপস্বিনী'; এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। স্ব-ইচ্ছায় যে-সব বই পড়িতেছেন তার মধ্যে টলস্টয়ের *What is Art* উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নাথকে পত্রে (২৩ আশ্বিন ১৩০৭) লিখিতেছেন যে বইখানা খুব suggestive; ইচ্ছা হইতেছে এ কথা বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন ও আর্ট সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করেন।[৩]

টলস্টয়[৪] ছাড়া অনেকগুলি ফরাসী উপন্যাসের তর্জমাও করিতেছেন; আনতোল ফ্রাঁসের ক্রাইম্ অব্ সিলভস্টার বনার্ড উপন্যাসের মূল ফরাসীটির খোঁজ করিতেছেন— ইচ্ছা, মূল ফরাসীর সঙ্গে মিলাইয়া তর্জমাটা পড়েন। এই উপন্যাসটি কবির খুবই প্রিয় ছিল, তাঁহার কথামত আমরাও এই বই পড়িয়াছিলাম।

শিলাইদহে গৃহবিদ্যালয়ে পূজার ছুটি হইল— শিক্ষকরা স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথও কলিকাতায় আসিলেন; জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে লিখিতেছেন (চিঠিপত্র ৬) "আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত

১ পত্রাবলী, [শিলাইদহ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০] বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ ৫৯৫। এই সময়ে কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদার 'মজুমদার এজেন্সী' নাম দিয়া একটি পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায় শুরু করেন। এই নূতন প্রকাশকরা কবির ছোটো গল্পের প্রথম সংগ্রহ মুদ্রিত করেন; 'গল্পগুচ্ছ' প্রথমাংশ (পৃ ৪৪৮) ১লা আশ্বিন, ১৩০৭ সালে বাহির হয়।

২ সম্পাদকের নিবেদন, [শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত] সংস্কৃত প্রবেশ ১ম। দ্র. চিঠিপত্র ৬, গ্রন্থপরিচয়।

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০ পৃ ৭১৪।

৪ Tolstoy's new views on art were stated in the iconoclastic pamphlet *what is Art* (1897) in which he denounced most of the accepted works of art as bad and immoral and propounded his theory of 'infectious' art which must be fundamentally religious. In practice Tolstoy's new attitude to art was reflected in his own short stories for the people. . . . ." Chamber's Encyclopedia. Vol. XIII. Article by Gleb struve, Prof. of Russian, California Univ.

বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি— প্রায় আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই নাই।· ·শরীর অবসন্ন।· ·মনে করিয়াছি দুই-চারিদিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাইব।"

অগ্রহায়ণের গোড়ায় আবার কবিকে কলিকাতায় দেখিতেছি; এবার আসিয়াছেন হাইকোর্টের তাড়ায়— 'জুরি'তে বসিতে হইবে। কলিকাতায় হঠাৎ লোকেন পালিত আসিয়া জুটিলেন— তখন তিনি যশোহরের জেলাজজ; কবি প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন (৩ অগ্রহায়ণ ১৩০৭) যে "লোকেন পালিতের সহিত রাত তিনটা পর্যন্ত সাহিত্যচর্চ্চা করা গেছে।"

ইহার পর কয়েকদিন অসুস্থ হইয়া শিলাইদহে ছিলেন, বলিয়া মনে হয়; কারণ, কলিকাতায় ফিরিয়া জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন "সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সংগীতসমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি।"[১] স্ত্রীকে শিলাইদহে লিখিতেছেন (১ পৌষ): "কাল বেলা ১টা থেকে রাত্রি সাড়ে সাতটা পর্যন্ত রিহার্সাল ছিল।" সেইদিনই অভিনয় হয়। অভিনয় হইয়াছিল সংগীতসমাজে— ১লা পৌষ ১৩০৭ (১৬ ডিসেম্বর ১৯০০)।

কিন্তু অভিনয় ছাড়াও বহু কাজ ও ঝামেলা তাঁহার আছে; মহর্ষির আদেশে এবার শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষ উৎসবে রবীন্দ্রনাথকে উপাসনা করিতে হইবে। পয়লা পৌষ স্ত্রীকে লিখিতেছেন যে তখনো উৎসবের ভাষণ লেখায় হাত দিতে পারেন নাই। দিন দুই পরে পুনরায় লিখিতেছেন "সমস্ত সকাল ধরে লোকসমাগম হয়েছিল— ভেবেছিলুম ৭ই পৌষের লেখাটা লিখব তা আর লিখতে দিলে না।" তবে 'নৈবেদ্য'র দুটি কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া মনটা তৃপ্ত।

মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটা সত্তা আছে, তাহাকে সংসার করিতে হয়— সেখানে অশেষ সমস্যা; স্ত্রী-পরিবার শিলাইদহে রাখিয়া অনেকদিন কলিকাতায় আছেন; সন্তানদের জন্য তাঁহার সদাই উদ্বেগ; স্ত্রীর পত্র না পাইলেও উদ্বিগ্ন কম হন না, আবার স্ত্রীর শুষ্ক পত্র পাইলেও মন তৃপ্ত হয় না; একখানি পত্রে লিখিতেছেন "তোমার সন্ধ্যা বেলাকার মনের ভাবে আমার কি কোন অধিকার নেই? আমি কি কেবল দিনের বেলাকার? সূর্য্য অস্ত গেলেই তোমার মনের থেকে আমার দৃষ্টিও অস্ত যাবে? তোমার যা মনে এসেছিল আমাকে কেন লিখে পাঠালে না? তোমার শেষের দু চার দিনের চিঠিতে আমার যেন কেমন একটা খট্‌কা রয়ে গেছে। সেটা কি ঠিক analyze করে বলতে পারিনে কিন্তু একটা কিসের আচ্ছাদন আছে। যাক গে! হৃদয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করাটা লাভজনক কাজ নয়, মোটামুটি সাদাসিধে ভাবে সব গ্রহণ করাই ভালো।"[১] দিন দুই-তিন পরে (৬ই পৌষ) পুনরায় লিখিতেছেন; "আমাকে সুখী করবার জন্য তুমি বেশি কোন চেষ্টা কোরো না— আন্তরিক ভালবাসাই যথেষ্ট। অবশ্য তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকল ভাবেই যদি যোগ থাকত খুব ভালো হত— কিন্তু সে কারো ইচ্ছায়ও নয়। যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল রকম বিষয়ে সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পার ত খুসি হই— আমি যা কিছু জানতে চাই তোমাকেও তা জানাতে পারি— আমি যা শিখতে চাই তুমিও আমার সঙ্গে শিক্ষা কর, তাহলে খুব সুখের হয়। জীবনে দুজনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়— তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করিনে— কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার

১ ১২ ডিসেম্বর [১৯০০], চিঠিপত্র ৬।

শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে— আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই— সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎ খুঁৎ না করে ভালোবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর— আমাকে অনাবশ্যক দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।"[১]

কবিজীবনের এইসব অন্তর্লীন সংগ্রামের সংবাদ বাহিরের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী হইতে জানিতে পারা যায় না। নিরন্তর কর্মসাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে দিন কাটিলেও অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হৃদয় থাকায় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো কোনো কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। মৃণালিনী দেবীর চরিত্রের মধ্যে এমন-একটি কর্ত্রীশক্তি ছিল যে রবীন্দ্রনাথ কখনো তাঁহাকে অবহেলা করিতে সাহসী হইতেন না। আবার এমন একটা নিস্পৃহ আবেগ-হীনতা ছিল যাহা কবিকে পীড়িত করিত। শিক্ষায় ও মনস্বিতায় আসমান-জমিন ফারাক ছিল— তাই তাঁহার দৈনন্দিন ডায়ারি বা রোজনামচা পাঠাইতেন ইন্দিরা দেবীকে। যাহা হউক, কলিকাতার সমাজ ও সংসার হইতে দূরে নির্জনে শিলাইদহবাসকে মৃণালিনী দেবী সম্পূর্ণ অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই; এবং কলিকাতায় কবিও তাঁহার সমস্ত শক্তিকে কবরিত করিয়া থাকিতে অনিচ্ছুক। অবশেষে কবিকেই শিলাইদহের বাস উঠাইতে হইল। ইহাই হইল আদর্শের সহিত বাস্তবের সংগ্রাম। কিছুকাল পরে শিলাইদহে আসিয়া তিনি স্ত্রীকে কলিকাতায় লিখিতেছেন, "অনেক রাত্রে জেগে উঠে জ্যোৎস্নায় বসে বসে মনে পড়ছিল এই ছাদের উপর তোমার অনেক মর্মান্তিক দুঃখের সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটেছে— আমারও অনেক বেদনার স্মৃতি এই ছাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। যদি অনেক রাত্রে এই ছাদের জ্যোৎস্নায় তুমি বসতে তা হলে বোধ হয় আবার তোমার মন ধীরে ধীরে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসত। আমি এখন সংসারকে এত মরীচিকার মত দেখি যে, কোন খেদের কথা মনে উঠলে পদ্মপত্রে জলের মত শীঘ্রই গড়িয়ে যায়···।"[২]

যাহাই হউক যখন 'ভিতরে থাকে চোখের জল' তখন বাহিরে চলে 'হাসির ছটা'। সুতরাং সংসারের অসংখ্য কাজ যথানিয়ম করিতে হয়— জমিদারী-তদারক, কুষ্টিয়ার ব্যবসায় পরিদর্শন, ভারতীর জন্য উপন্যাস রচনা, জগদীশ-চন্দ্রের জন্য ত্রিপুরার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ, সংগীতসমাজে বিসর্জনের অভিনয় পরিচালনা প্রভৃতি। কিন্তু বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে চোখের জল! এই সবেরই মাঝে অন্তরের আকুল প্রার্থনা প্রকাশ পায় 'নৈবেদ্যে'র মধ্যে।

এবার শান্তিনিকেতনে মন্দির-প্রতিষ্ঠার দশম সাম্বৎসরিকের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'ব্রহ্মমন্ত্র' নামে ভাষণ লিখিয়া মহর্ষিকে শুনাইলেন। 'তিনি দুই একটা জায়গায় বাড়াতে বল্লেন।' কবি লিখিতেছেন "এখনি তাই বসতে হবে— আর ঘণ্টা-খানেক মাত্র সময় আছে।" রবীন্দ্রনাথ ৬ই পৌষ বোলপুর আসিলেন ও পরদিন যথানিয়মে ব্রহ্মমন্দিরে ভাষণ পাঠ করিলেন; আদি ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হয়— রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মমতের দীপ্তি এখনো হয় নাই।[৩] গত বৎসর এই দিনে (১৩০৬) শান্তিনিকেতন মন্দিরে তিনি প্রথম ভাষণ দান করিয়াছিলেন— 'ব্রহ্মোপনিষদ'। এই দিন হইতে এক বৎসর পরে ঠিক এই দিনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেন; কিন্তু এ দিনে তাহার আভাস পাই না।

১ [২-৩ পৌষ ১৯০০], চিঠিপত্র ১।

২ [শিলাইদহ, ১৯০১], চিঠিপত্র ১।

৩ ব্রহ্মমন্ত্র, ৮ মাঘ ১৩০৭। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২। এই প্রবন্ধটি কবির 'ধর্ম' গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

শান্তিনিকেতনের সাতই পৌষের উৎসবের পর কবি শিলাইদহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন কিংবা কলিকাতায় আসিয়া মাঘোৎসব পর্যন্ত থাকিয়া গিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট নয়। মাঘোৎসবের (১৩০৭) সময় কবিকে কলিকাতায় খুবই ব্যস্ত দেখা যায়; শিলাইদহে স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "সংগীতসমাজওয়ালারা তাঁদের রিহার্সালের জন্যে আমাকে ধরতে আসবে— সেখানে ৪টে পর্যন্ত চেঁচামেচি করে সুরেনকে দেখতে বালিগঞ্জে যাব— সেখান থেকে সরলাকে তুলে নিয়ে এসে গান (মাঘোৎসবের) শেখানর ব্যাপারে রাত নয়টা বেজে যাবে— তার পরে সংগীতসমাজে আবার রিহার্সালে রাত দুপুর হয়ে যাবে।"[১]

এই-যে অভিনয়ের রিহার্সাল চলিতেছে ইহার কারণ কি? এবার কলিকাতায় ত্রিপুরার নবীন মহারাজা রাধা-কিশোর মাণিক্য আসিতেছেন। তিনি বাঙালি হিন্দুরাজা— স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি— হিন্দুবাঙালি তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দান করিবে।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'বিসর্জন' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে— মহারাজের এক পূর্বপুরুষের মহান জীবনের কথা এই নাটকে অঙ্কিত আছে। অভিনয় হইল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্কস্ট্রীটস্থ বিশাল ভবনপ্রাঙ্গণে। রবীন্দ্রনাথ মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য একটি গান রচনা করেন—

রাজ-অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,
ত্রিপুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা,
গুণী-রসিক-সেবিত উদার তব দ্বারে,
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে;
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণ-রস ঢালা।
ক্ষীণ জন ভয়-তারণ অভয় তব বাণী;
দীনজন দুঃখহরণ নিপুণ তব পাণি
গুণ-অরুণ-কিরণে তব সব ভুবন আলা।[২]

বিসর্জন অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমসাময়িক এক দর্শক দুই বৎসর পরে লিখিতেছেন[৩]: "একবার পার্কস্ট্রীটস্থ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে রবীন্দ্রবাবু তাঁহাদের পরিবারস্থ যুবকদিগকে লইয়া 'বিসর্জন' অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়স্থলে আগরতলার মহারাজা· ·গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়· ·উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সঞ্জীবনীর সম্পাদক [কৃষ্ণকুমার মিত্র] প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।· ·সেদিন রবীন্দ্রবাবু রঘুপতি সাজিয়া এমন চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন যে সঞ্জীবনী-সম্পাদক মহাশয় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" শেষ বাক্যটি বিশেষ তাৎপর্য সূচক; কারণ সঞ্জীবনী-সম্পাদক মিত্রমহাশয় অত্যন্ত নিষ্ঠাবান puritan ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি লঘুসাহিত্য ও অভিনয়াদির পক্ষপাতী ছিলেন না; তৎসত্ত্বেও তিনি-যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, ইহাই অভিনয়ের উৎকর্ষের পরিচায়ক।

কলিকাতার উত্তেজনাশেষে শিলাইদহে ফিরিয়াছেন। ফাল্গুনের গোড়ায় বোধ হয় এলাহাবাদ হইতে অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পত্র পাইলেন যে তিনি প্রবাসী বাঙালির মুখপত্র হিসাবে 'প্রবাসী' নামে এক

১ কলকাতা, জানুয়ারি ১৯০১।

২ ত্রিপুরা-দরবার হইতে শ্রীসত্যরঞ্জন বসু লেখককে গানটি পাঠাইয়া দেন।

৩ প্রবাসী, ২য় বর্ষ মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যা, পৃ ৩৫৫। অমৃতলাল গুপ্ত, বাঁকিপুর হইতে লিখিত।

মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, তজ্জন্য কবির নিকট কিছু রচনা চাহিতেছেন। কবি ৩ ফাল্গুন (১৩০৭) 'প্রবাসী' নামে কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। প্রবাসীর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩০৮ বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশিত হইল—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।

কবিতাটি নৈবেদ্যর যুগের রচনা; নৈবেদ্যর মধ্যে যে একটি শান্ত আধ্যাত্মিক আকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, এই কবিতাটির মধ্যেও সেই ভাবই ব্যাপকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

অবশ্য এ ভাবনা রবীন্দ্রকাব্যে নূতন নহে।

শিলাইদহে বাস কবির পক্ষে আদৌ নির্বাসন ছিল না; ঘোরাঘুরি আছে, বিচিত্র কর্ম-উপলক্ষ্যে বিচিত্র মানুষের সাক্ষাৎ হয়— জমিদারী-তদারকী কাজে নৌকাযোগে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালোই লাগে— কুষ্টিয়ার ব্যবসায় দেখিতে আসিলেও জীবনের একঘেঁয়েমি কাটিয়া যায়। অতিথি-অভ্যাগত তো বরাবরই নৌকাবাসের আনন্দ উপভোগের জন্য আসা-যাওয়া করেন; লোকেন পালিত প্রমথ চৌধুরী সুরেন ঠাকুর জগদীশচন্দ্র যতীন বসু দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি অনেকেই আসিয়া গিয়াছেন। এবার আসিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, কুঠিবাড়িতে দিন-পনেরো কাটাইয়া গেলেন। প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন, "কিছুদিন থেকে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থায় অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। প্রাতঃকাল থেকে রাত দেড়টা পর্য্যন্ত লেশমাত্র অবসর পাইনে— গৃহিনীর অবস্থা ততোধিক।· ·গোলমালের মধ্যেও গোটা ৯০ নৈবেদ্য লিখেছি।"[১] অবশ্য এই নব্বইটি কবিতা এখনই লিখিত হয় নাই, গত কয়েকমাসের নানা প্রকার উদ্বেগ ও উত্তেজনা ও ঘোরাঘুরির মধ্যেই এগুলি লিখিত হয়। নৈবেদ্য ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়, আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যাহাই হউক, ইহারই মধ্যে চিরকুমার সভা কিস্তিতে কিস্তিতে দিয়া আসিয়াছেন; শেষ কিস্তি লিখিয়া ১০ই চৈত্র (১৩০৭) প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন, "নিতান্ত অনিচ্ছা এবং নিরুদ্যমের মধ্যে কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞার জোরে ওটা শেষ করেছি— মনের সে অবস্থায় কখনো রস নিঃসরণ হয় না। যেখানে থামা উচিত এবং যেরকম

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০।

ভাবে থামা উচিত তা হয়েছে কিনা নিজে বুঝতে পারছি নে। একবার সমস্ত জিনিষটা একসঙ্গে ধরে ফেলতে পারলে তবে ওর পরিমাণ সামঞ্জস্য করা যায়।··যখন বই বেরবে, তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরবে।"[১]

প্রিয়নাথকে আর-একদিন লিখিতেছেন যে, "বিনোদিনী নামে পুস্তকখানি অন্ততঃ মাস-তিনেকের মতো লেখা সংশোধন করে ঠিক করে লিখে রেখেছি, সুতরাং কতকটা রয়ে-বসে ওটা সমাধা করতে পারব।" সেই পত্রেই লিখিতেছেন, "ভারতীর জন্য আজকালের মধ্যেই একটা লেখা শুরু করতে হবে— আজ খুব শক্ত তাগিদ এবং প্রলোভন এসেছে।" ভারতীর জন্য যাহা লিখিলেন তাহা হইতেছে 'নষ্টনীড়'। ১৩০৮সালে বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি' ও ভারতীতে 'নষ্টনীড়' যুগপৎ প্রকাশিত হইতে থাকিল। যথাস্থানে উহাদের আলোচনা হইবে।

ভারতীতে চিরকুমার সভা ১৩০৮এর জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চলে; এই প্রহসন-উপন্যাসখানি হিতবাদী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর (১৩১১) মধ্যে সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩১৪ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীর (৮ম) অন্তর্গত হইয়া উহা যখন প্রকাশিত হয়, তখন উহার নামকরণ হয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। ১৩৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটিকে পরিবর্তিত করিয়া নাটকীয় রূপ দান করেন; এই নাটকের অনেক অংশ নূতন করিয়া লিখিত হয় এবং অনেকগুলি নূতন গানও যোগ করেন। তখন উহার নামকরণ পুনরায় হয় 'চিরকুমার সভা'[২]।

'চিরকুমার সভা' উপন্যাসের ন্যায় শুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায়ই নাটকের রীতিতে লেখা। এই বৃহৎ গ্রন্থের উপাখ্যান অংশ অতি অল্প, সামান্য সূত্র ধরিয়া ঘটনাকে রঞ্জিত করা। লেখক পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনের মধ্যে প্রচুর হাস্যরস আনিয়াছেন, কিন্তু সে হাস্যরস অত্যন্ত মার্জিতরুচি সুশিক্ষিত শ্রোতা বা পাঠক ব্যতীত সাধারণকে তৃপ্তিদান করিতে পারে কি না সন্দেহ। ভাষার subtlety ও শব্দচাতুর্য punning অত্যন্ত সূক্ষ্ম; সেইজন্যই কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন কবির মধ্যে humour হইতে wit বেশি। আমাদের সে সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রয়োজন নাই; তবে এ কথা সত্য, ঘটনা সমাবেশে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে বাক্যরস দ্বারা যে হাস্যরস সৃষ্টি হয় তাহা মনস্বী পাঠকদেরই উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনে তাহারই প্রাধান্য। রসিকতার মধ্যে কোথাও রূঢ়তা গ্রাম্যতা নাই, বাক্যালাপ হাস্যমুখর অনাবিল।

'চিরকুমার সভা' প্রহসন বলিয়া যে উহার সকল কথাই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত তাহা নহে। এই গ্রন্থের মধ্যে কবি এমন-অনেকগুলি মানুষের অবতারণা করিয়াছেন, যাঁহাদের চিনি বলিয়া মনে হয়; এমনকি নিজের অজ্ঞাতে লেখক নিজেও গ্রন্থমধ্যে ধরা দিয়াছেন। চন্দ্রমাধববাবুর কথাবার্তার মধ্য দিয়া এসব মত প্রকাশ করিতে গিয়া লেখক অনেক সময়ে দীর্ঘ বক্তৃতাদির অবতারণা করিয়াছেন; তাহা স্বভাবতই গ্রন্থকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

ভারতীতে যখন এই উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশ হইতেছে তখন প্রিয়নাথ উহার চরিত্রগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তাহারই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল্ আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারায়ণবাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ— এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে। কিন্তু কোন রিয়াল্ মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে রকম প্রতীয়মান সেরকম ভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ রিয়াল্ মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানবার শক্তি আমাদের না থাকাতে আমরা তাকে প্রতদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় পূর্বাপর বিরোধীভাবে না দেখে উপায় পাইনে— কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং

১ প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৯০।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪, প্রজাপতির নির্বন্ধ (উপন্যাস); রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, চিরকুমার সভা (নাটক)।

কাব্যে যদিচ কোন কোন রিয়াল্ লোকের আভাসমাত্র থাকে তবু তাকে সম্পূর্ণ করতে অন্তর বাহির নানা দিক থেকে নানা উপকরণ আহরণ করতে হয়। চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছসারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে— কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিষ আছে যা তাঁদের কারোই নয়।"[১]

চিরকৌমার্যকে কবি পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শরূপে স্বীকার করেন নাই; তাঁহার মতে চিরকুমার জীবন অস্বাভাবিক ও অসামাজিক। আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তখন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে তাঁহার নূতন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গঠনের আয়োজনে ব্রতী। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর জন্য একটি নবীন চেতনা দেখা দিয়াছিল। আমাদের মনে হয় এই প্রহসন রচনার সময় সন্ন্যাসের নূতন আন্দোলনকে বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে লেখকের মনে ছিল। 'ক্ষণিকা'র কবিতায় "আমি হব না তাপস"· ·ইত্যাদি পংক্তি এই আন্দোলনেরই প্রতিক্রিয়ায় রচিত। ক্ষণিকায় বিদ্রূপের সুরে বলেন, তাহা ঐ বৎসরেরই শেষ ভাগে দেখা দেয় "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" বাণী রূপে। শ্রীশের জবানীতে যে নবীন সন্ন্যাসীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সে বৈরাগ্য নাই, যাহা সাধারণত লোকে সন্ন্যাসীর নিকট হইতে আশা করে। রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসবে' 'প্রায়শ্চিত্তে' 'রাজা'য় যে-বৈরাগ্যের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা লৌকিক সন্ন্যাসীর আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবার স্বামী বিবেকানন্দও যে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ করিতেছেন তাঁহারাও ভারতের চিরাচরিত 'সন্ন্যাসী' নহেন। একজনের আদর্শ রায় রামানন্দ, আর একজনের চৈতন্য মহাপ্রভু।

চন্দ্রমাধববাবুর বক্তৃতা হইতে আমরা একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি— সে অংশটি নিতান্ত প্রহসনের বিষয় নহে; কারণ পরযুগে স্বয়ং কবি ও দেশের অনেক নেতা এই সমস্যাগুলি পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন।

"আমি বলছিলুম, সন্ন্যাসব্রতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ অপঘাত ঘটলে, কিংবা সাধারণ জ্বর-জ্বালায়, কিরকম চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে।"· ·"আর-একটি আমাদের করতে হচ্ছে— গোরুর গাড়ি, ঢেঁকি তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাবশ্যক জিনিসগুলিকে একটু-আধটু সংশোধন করে যাতে কোনো অংশে তাদের সস্তা বা মজবুত বা বেশি উপযোগী করে তুলতে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে।" "আমার মত এই যে, এই সমস্ত ব্যবহার্য সামান্য জিনিসগুলির যদি আমরা কোনো উন্নতি করতে পারি তা হলে তাতে করে চাষাদের মনের মধ্যে যে-রকম আন্দোলন হবে, বড়ো বড়ো সংস্কারকার্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকেলে ঢেঁকি-ঘানির কিছু পরিবর্তন করতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তারা বুঝতে পারবে।

"মানুষ অগ্রসর হচ্ছে অথচ তার জিনিসপত্র পিছিয়ে থাকছে, এ কখনো হতেই পারে না। আমরা পড়েই আছি— ইংরেজ আমাদের কাঁধে করে বহন করছে, তাকে এগোনো বলে না। ছোটো-খাটো সামান্য গ্রাম্য জীবনযাত্রা পল্লীগ্রামের পঙ্কিল পথের মধ্যে বদ্ধ হয়ে অচল হয়ে আছে। আমাদের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে সেই গোরুর গাড়ির চাকা ঠেলতে হবে— কলের গাড়ির চালক হবার দুরাশা এখন থাক।"· ·"আমাদের একদল কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ করবেন, একদল কুমারব্রত ধারণ করে এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে কাজ করবেন, আর একদল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য অনুসারে একটা-কোনো প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন করে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। যাঁরা পর্যটক-সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ প্রস্তুত, জরিপ ভূতত্ত্ববিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি

১ পত্রাবলী। [শিলাইদহ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০] (১৩০৭, ৫ আশ্বিন) বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৫৯৬।

শিখতে হবে ; তাঁরা যে দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করবেন— তা হলেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে— হণ্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কাটাতে হবে না।”

তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে যে-কথাগুলি চন্দ্রমাধববাবু বলিলেন সেগুলি উপন্যাসের নায়কের মুখের কথামাত্র নহে। কারণ বহুবার রবীন্দ্রনাথ তথ্যসংগ্রহের জন্য ছাত্র ও যুবকবর্গকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি ভালো করিয়া জানিতেন তথ্যপূর্ণ সরণী পূর্ণ না হইলে তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না ; কবি হইলেও তিনি বিজ্ঞানবাদী।

প্রহসনটিতে কবি চিরকৌমার্যের ব্যর্থতাই দেখাইয়াছেন ; এবং শেষকালে নরনারীর মিলনের দ্বারা সংসারের মধ্যে শান্তি ও জীবনের মধ্যে synthesis আনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রহসনে যে-কয়টি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের অনেকেই তাঁহার অন্যান্য উপন্যাস-নাটকের মধ্যে নানাভাবে দেখা দিয়েছে। চন্দ্রমাধববাবুর শান্ত সমাহিত জীবনাদর্শ পরেশবাবু, জ্যেঠামহাশয়ের মধ্যে ফুটিয়াছে ; নির্মলা ললিতার মধ্যে দেখা দিয়াছে। রসিক একটি অদ্ভুত সৃষ্টি ; ইনি যেন ‘শারদোৎসবে’র ও ‘রাজা’র ঠাকুর্দারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। এই চিরকুমার সভার মধ্যে কবি বহু সংস্কৃত শ্লোক বাংলায় পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন।[১]

কবি ও বিজ্ঞানী

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইতেছে এই যুগের একটি বিশেষ ঘটনা, সাহিত্যিকের বিজ্ঞানী বন্ধুলাভ ও বিজ্ঞানীর সাহিত্যিক বন্ধুলাভ। জগদীশচন্দ্রের সহিত কবির পরিচয় কবে হয় আমরা জানি না, তবে ঘনিষ্ঠতা হয় ১৩০৪ হইতে। বিলাত হইতে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন (২ নভেম্বর ১৯০০) “তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তার পর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম।”[২] কবি বা বিজ্ঞানী কেহই তখনো খ্যাতির চূড়ায় উঠেন নাই। কবির ভাষায় কবি “পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্তি-সূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি।”[৩]

জগদীশচন্দ্র বিলাত হইতে ১৮৮৪ সালে ফিরিয়া আসিবার পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর মাত্র। তার পর দশ বৎসর নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এ দেশ হইতে বিদেশে সেইসব গবেষণার জন্য মান পাইয়াছিলেন বেশি। কারণ এ দেশে তখনো শিক্ষাবিভাগের ইংরেজ অধ্যক্ষেরা বা গবর্নমেণ্ট-তরফের শিক্ষাপরিচালকগণ দেশীয় অধ্যাপকদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহাদের মতে দেশীয় অধ্যাপকদিগকে গবেষণার জন্য কোনোপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বা অবসর দান করাটা সরকারী অর্থের অপব্যয় ; তাঁহাদের বিশ্বাস অধ্যাপক নিযুক্ত হয় অধ্যাপনার জন্য, অধ্যয়নের জন্য নহে। জগদীশচন্দ্রই সেই ভুল ভাঙিয়া দিলেন। কিন্তু কী অপমান ও উপেক্ষার মধ্যে তাঁহাকে এই কার্য সমাধান করিতে হয়, আচার্যের জীবনচরিত-পাঠকগণ ব্যতীত আর কাহারো নিকট সেসব তথ্য বিদিত নহে। জীবনের এই

১ ক্ষিতিমোহন সেন, বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৬০১-৮।

২ পত্রাবলী, জগদীশচন্দ্র বসু, ১৭ কার্তিক ১৩০৭। প্রবাসী ১৩৩৩, আষাঢ় পৃ ৪১২।

৩ পত্র-পরিচয়, চিঠিপত্র ৬।

সংগ্রামের সময় জগদীশচন্দ্রের প্রধানতম সহায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া উভয় বন্ধুর মধ্যে যেসব পত্র-বিনিময় হইত, তাহার কিছু মহাকালের নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

জগদীশচন্দ্র যখন দ্বিতীয় বার গবেষণার জন্য বিদেশে ছিলেন (১৮৯৪ ৯৭), সেই সময় আচার্যের প্রতিভার দীপ্তি রবীন্দ্রনাথকে মোহিত করে এবং তাহারই স্মরণে 'কল্পনা'র বিখ্যাত কবিতা 'জগদীশচন্দ্র' (৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪) লেখেন। তিনি বিলাতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে কোনো সময়ে "আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করে আপনার জীবনচরিতের একটা অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছে করি।" রবিকে প্রকাশের জন্য কোনো আলোকের প্রয়োজন হয় না, রবি স্বয়ংপ্রকাশ, এ কথা তখনো রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই।

১৮৯৭ সালে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিলেন। দেশে বাসকালে তিনি কয়েকবার শিলাইদহে যান; কবি তাঁহার বিজ্ঞানী বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ 'কথা' কাব্যগ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন (অগ্রহায়ণ ১৩০৬)। তিন বৎসর পরে পুনরায় বিলাত যান; ১৯০০ জুলাই হইতে ১৯০২ অক্টোবর বা ১৩০৭ সালের আষাঢ় হইতে ১৩০৯এর আশ্বিন পর্যন্ত সময়টি জগদীশচন্দ্রের তৃতীয় বার বিলাত প্রবাসকাল। বিচিত্র সংগ্রামে পূর্ণ এই পর্বটি। য়ুরোপে ও বিশেষভাবে ইংলণ্ডে তাঁহার গবেষণা ও প্রতিভা স্বীকৃত হইবার অন্তরায় ছিল অনেক, পদে পদে অবিশ্বাস; পদে পদে লাঞ্ছনা। ইহার উপর বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষা-বিভাগ তাঁহাকে ছুটি দিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহার জীবনের এই অগ্নিপরীক্ষার সময়ে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের উৎসাহবাণী ও তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্য তাঁহাকে কর্মে অটল রাখিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ?· ·নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য্য তোমাকে তোমার কর্ম্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক।· ·তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি।· ·বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া থাকে— তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়— আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি— আর কোনো ভারতবর্ষের পথ নহে— তপস্যার পথ সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিস দান করিয়াছি, কিন্তু সে কথা কাহারো মনে নাই— আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে— নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই।"

বাংলা গবর্নমেণ্ট জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে দীর্ঘকাল গবেষণা-কার্য করিবার জন্য ছুটি মঞ্জুর না করায় সমস্যা জটিল হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ সেই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "গভর্মেণ্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে-সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।"[১] কত বড়ো ভরসা দিয়া রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহিত করিলেন।

অপর দিকে জগদীশচন্দ্রও তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুকে ইংরেজমহলে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্বন্ধে কবির প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনিই। তিনি বিলাত হইতে লিখিতেছেন, "তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোনো ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি

১ জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী ১২ ডিসেম্বর ১৯০০ (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৭) প্রবাসী ১৩৩৩ ফাল্গুন পৃ ৬৩। চিঠিপত্র ৬।

আমি এদেশে প্রকাশ করিব।· ·লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।"[১] কয়েকদিন পরে পুনরায় লিখিতেছেন, "তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এ দেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না।"[২]

বিলাতে বাসকালে জগদীশচন্দ্র তাঁহার বন্ধু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তর্জমা ইংলণ্ডে প্রকাশের চেষ্টা করেন। 'কাবুলিওয়ালা'র তর্জমা পাঠ করিয়া প্রিন্স ক্রোপাটকিন জগদীশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে এরূপ মর্মন্তুদ গল্প তিনি পাঠ করেন নাই (declared it to be the most pathetic story he had ever heard)। তাঁহার দেশের অর্থাৎ রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের কথা তাঁহার স্মরণ হইতেছে। জগদীশচন্দ্র Harper's Magazine-এ গল্পটি পাঠান, তাহারা ছাপাইল না, বলিল তর্জমা তাহারা ছাপায় না। জগদীশ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'তোমার নাম জাল করিবার যদি অধিকার দাও তাহা হইলে Translation-এর কথা না বলিয়া একবার তোমার নাম দিয়া পাঠাইতে পারি। কি বল?'[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিচিত্র কর্মের মধ্যে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখেন; জগদীশের রচিত প্রবন্ধ ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মতামত এবং আলোচনা তিনি নিয়মিত পড়েন। য়ুরোপের বিজ্ঞানমন্দিরে উপস্থিত হইয়া যে কোনো ভারতীয় তথাকার বিজ্ঞানীদের সমক্ষে বক্তৃতা করিবেন— ইহা গর্বান্ধ ইংরেজের পক্ষে কল্পনা করা এবং সহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু যেদিন জগদীশ জড়ের সজীবতা সম্বন্ধে তত্ত্বটি পরীক্ষার দ্বারা রয়েল সোসাইটিতে প্রমাণিত করিলেন সেদিন সত্যই বাঙালি তথা ভারতীয়দের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর সাফল্যে গর্ব অনুভব করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে 'জগদীশচন্দ্র বসু' শীর্ষক কবিতাটি লিখিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দিলেন।[৪]

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য জগদীশ? কী অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?

বাংলা ভাষায় জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথই লেখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জগদীশ খুবই বিস্মিত হন; আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত কবি হইয়া তিনি এই দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন।[৫]

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এ দিকে বিলাতে গবেষণার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন জগদীশচন্দ্রের সে সন্ধান ছিল না;

১ পত্র। লণ্ডন ২ নভেম্বর ১৯০০। প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ় পৃ ৪১৩। পত্রাবলী, জগদীশচন্দ্র বসু।

২ পত্র। ২৬এ নভেম্বর ১৯০০। প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ়। পত্রাবলী।

৩ পত্রাবলী, ২২ মে ১৯০১।

৪ বঙ্গদর্শন ১ম বর্ষ ১৩০৮ আষাঢ়। ৬ জুলাই ১৯০১ জগদীশচন্দ্র এই কবিতার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন।

৫ "আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেক্‌ট্রিশ্যান্ প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের [১৩০৮] বঙ্গদর্শনের জন্য তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে লিখিতে দিয়াছিলাম— পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম— ভুলচুক থাকার সম্ভবনা আছে— দেখিয়া তুমি মনে মনে হাসিবে।
"আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে যেটুকু আভাস দিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথাযথ হয় নাই—তখন ইলেকট্রিশ্যান্ দেখিতে পাই নাই।" পত্র, ৩রা জুলাই ১৯০১। চিঠিপত্র ৬।

সেই গবেষণাকার্য সফল করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোরের শরণাপন্ন হইলেন। মহারাজকে লিখিতেছেন, "আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম।"[১] এই অর্থের জন্য অবশেষে রবীন্দ্রনাথ মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১৩০৮ কার্তিক)। মহারাজ কবি ও বিজ্ঞানীর সম্মান রক্ষা করিয়া দশ সহস্র মুদ্রা কবির হস্তে সমর্পণ করিলেন। ত্রিপুরা-দরবারে এই অর্থ ভিক্ষা করিতে গিয়া কবিকে পারিষদমণ্ডলীর নিকট যে নীরব লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহা তিনি কখনো বিস্মৃত হন নাই। তিনি কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিতেছেন—"কেবল জগদীশবাবুর কার্য্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না—লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব—ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য্য নহে, স্বদেশের কার্য্য। সুতরাং ভিক্ষুভাবেই আমি এবার অসঙ্কোচে মহারাজের দ্বারে দাঁড়াইব।"[২] জগদীশচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই ঘনিষ্ঠতার নিদর্শন আরও পরে দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'খেয়া' কাব্যগুচ্ছ তাঁহার বিজ্ঞানী বন্ধুকে উপহার দেন (আষাঢ় ১৩১৩)। উৎসর্গে লিখিয়াছিলেন—

এ যে আমার লজ্জাবতী লতা
কী পেয়েছে আকাশ হতে
কী এসেছে বায়ুর স্রোতে
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।

যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

কবি ও রাজা

অন্তর-জীবনের গভীরতার সঙ্গে চলিতেছে কর্মজীবনের ব্যাপ্তি। কবির কাব্যজীবনের বন্ধু ছিলেন প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি। ক্রমে জীবন যতই জটিল, কর্ম যতই বিচিত্র হইতেছে, নূতন নূতন মানুষ রবিকক্ষে জ্যোতিষ্ককণার ন্যায় প্রবেশ করিতেছে। জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি বহু মনীষী ও মনস্বিনীদের সহিত বিচিত্র কর্মসূত্রে বা ভাবসূত্রে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইতেছে। এখানে আমরা কেবল ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুরের সহিত কবির পরিচয়কাহিনী বিবৃত করিব। ত্রিপুরার পূর্বতন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাধাকিশোর মাণিক্য রাজা হইলে তাঁহার সহিত পূর্বের সামান্য পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। যুবরাজ-জীবনে একদা কলিকাতায় পিতার দরবারে রাধাকিশোরের সহিত কবির ক্ষণকালের সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু সেই মুহূর্তের দর্শনেই একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। যুবরাজী আমলে নানা রাজনৈতিক কারণে রাধাকিশোর মাণিক্য নিজ রাজধানীর বাহিরে কাহারো সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই।

১ ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১ম বর্ষ ১৩৪৯ আশ্বিন পৃ ১৬৯। চিঠিপত্র ৬, পরিশিষ্ট।

২ পূর্বাশা রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা ১৩৪৮, পৃ ১১১। চিঠিপত্র ৬, পরিশিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় হওয়ায় তিনি শুধু তাঁহাকেই বন্ধুরূপে পাইলেন তাহা নহে, তিনি বাংলাদেশের বহু গুণী-জ্ঞানীর পরিচয় লাভ করিলেন; কলিকাতার শিক্ষিত অভিজাত সমাজের সহিত তাঁহার পরিচয় ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষেও কল্যাণকর হইল। রাধাকিশোর মাণিক্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে বীরচন্দ্র মাণিক্যের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কাসিয়ঙে, দার্জিলিঙে; কলিকাতায় বহুবার সাক্ষাৎ হয় তাঁহার সঙ্গে। কিন্তু ত্রিপুরার রাজধানীতে কখনো যান নাই। "তখন বসন্তকাল, রাজধানীর উত্তরভাগে পাহাড়ের উপর কুঞ্জবনের বসন্তোৎসবে কবি-সম্মেলনের ঘটা, রাজা-প্রজার সমব্যবহার কবি রবীন্দ্রনাথের যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময় উৎপাদন করিল।" আমাদের মনে হয় এই বসন্তোৎসবের স্মৃতি বহন করে 'কাহিনী' কাব্যগুচ্ছের উৎসর্গপত্র (২০ ফাল্গুন ১৩০৬)।

১৩০৭ সালের শীতকালে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কলিকাতায় আসিলেন, ইতিপূর্বে আসিয়াছিলেন যুবরাজরূপে। কলিকাতার অভিজাত হিন্দুরা তাঁহার যোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন; সংগীতসমাজ ও রবীন্দ্রনাথই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয়, তাহাতে রাধাকিশোর ছিলেন সম্মানার্হ অতিথি; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্দেশে বিশেষ সংবর্ধনাসংগীত রচনা করেন; সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

এই সময়ে বিলাতে অর্থাভাবে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকার্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়; রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় ও অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি কিভাবে ত্রিপুরাধিপতির অর্থ সাহায্য লাভ করেন, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

যাহাই হউক, ইহার পর হইতে কবির সহিত রাজার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাধাকিশোর মাণিক্য নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন; রাজপুত্রদের শিক্ষা রাজ্যশাসন মন্ত্রীনিয়োগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত ব্যাপারে তিনি প্রায়ই কবির সহায়তা কামনা করিতেন। কিন্তু অনেক সময়ে রাজপারিষদবর্গের ও ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁহার বহু সদিচ্ছা কার্যে পরিণত হইতে পারিত না, তাই তিনি কবিকে বলিতেন "রবিবাবু, আপনি আমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবেন।"

মহারাজের প্রধান সমস্যা হইল রাজকুমারদের শিক্ষা লইয়া। তৎকালীন আগরতলার নৈতিক আবহাওয়া উচ্চাঙ্গ জীবনযাপনের পক্ষে অনুকূল ছিল না, অথচ রাজকুমারদের জন্য গবর্নমেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা ভারতীয় রাজধর্ম-আদর্শের পরিপন্থী। এই জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া তিনি রবীন্দ্রনাথেরই শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহারই উপর শিক্ষকাদি সংগ্রহের ভার অর্পণ করিলেন। এ দিকে যুবরাজদের শিক্ষাব্যবস্থা লইয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্জন অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার একান্ত ইচ্ছা আজমীড়ের মেয়ো কলেজে য়ুরোপীয় অভিভাবকদের হস্তে 'রাজোচিত' শিক্ষালাভ করিয়া কুমারগণ 'মানুষ' হন।

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে সর্বোত্তম উপদেশ পাওয়া যাইবে কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে। ইতিপূর্বে নানা কারণে এই দুই দেশীয় বাঙালি রাজাদের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় দার্জিলিঙে উভয় নৃপতির মধ্যে সাক্ষাৎ হয়; সাক্ষাৎকারের সময় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, বিশেষ কাজে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয়। এই সূত্রে দুই মহারাজার মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় হয়। নৃপেন্দ্রনারায়ণের পরামর্শে বিলাত হইতে উপযুক্ত শিক্ষক আনাইয়া গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করাই ঠিক হইল। কিন্তু এই শিক্ষক-নির্বাচনের ব্যবস্থাভার রবীন্দ্রনাথের উপরই মহারাজ অর্পণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাতপ্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষক সন্ধানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। জগদীশচন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া লিখিয়াছিলেন যে

রাজ্যমধ্যে খাল কাটিয়া কুমীর আনিবার প্রয়োজন কী। তিনি ইংরেজ শিক্ষক নিয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংরেজ শিক্ষক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন একেবারে সংস্কারশূন্য ছিল না, কারণ নিজ পুত্রকন্যাদের জন্য তিনি লরেন্সকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কোচবিহারের মহারাজার সহিত তিনি কেন ত্রিপুরার মহারাজার পরিচয় করাইয়া দেন তাহা একখানি পত্রে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। "দুই মহারাজার মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে মন্ত্রণাদি দ্বারা উভয়ে বললাভ করিবেন।··রাজকার্য্য সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের সহিত কোনো গুরুতর আন্দোলন হইলে নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ ও মহারাজের সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের [Peers] সহিত পরামর্শযোগে মহারাজের সেই অভাব মোচন হইবে কল্পনা করিয়া আমি আশ্বস্ত আছি।"[১]

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনের ভার আসিয়া পড়ে। ১৩০৮এর জ্যৈষ্ঠ মাসে কয়েকদিনের জন্য দার্জিলিঙ যান; সেখান হইতে বিলাতে জগদীশচন্দ্রকে জানাইতেছেন যে, "মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন।" অর্থাৎ ইহার পরিচালন-ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।[২] কিন্তু রাজ-ইচ্ছা ও রাজকার্যের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর, বাধাও দুস্তর। 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে মহারাজার আশ্বাস পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজানুগৃহীত পার্ষদদের তাহা মনঃপূত হয় নাই। শিলাইদহ হইতে (১৩০৮ আষাঢ়) একখানি পত্রে মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিতেছেন, "বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে যদি তোমাদের মনে লেশমাত্র দ্বিধা থাকে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিয়ো না,··আমি মহারাজকে কোন বিষয়ে লেশমাত্র সঙ্কটে ফেলিতে চাহি না। তাঁহার সুপ্রসন্ন সৌহার্দ্যই আমি চাই; আর সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করি।"[৩]

লোকের সাধু উদ্দেশ্যে পারিষদদের বিশ্বাস কম— সকলকেই তাঁহারা সন্দেহের চক্ষে দেখেন ও মহারাজের স্বাভাবিক ঔদার্যকে তাঁহারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা অস্ফুটভাবে দেখা দেয়। কবির মনে বোধ হয় অস্পষ্ট ভাবে এই আশ্রমে রাজানুগ্রহ লাভের ইচ্ছাও ছিল এবং সেই বিদ্যায়তনে রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিবেন বলিয়া মনে মনে আশা পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজসভার চক্রান্তে সে-প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে এক পত্রে লিখিতেছেন (১৮ শ্রাবণ ১৩০৮), "এরূপ অবস্থায় কোন প্রকার সদভিপ্রায় সাধন প্রায় অসাধ্য বলিয়া আমার মনে এক এক সময় নৈরাশ্য উপস্থিত হয়— এবং ঐশ্বর্য্যশালীদের দ্বার হইতে বহুদূরে থাকিয়া যথাসাধ্য নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে ইচ্ছা বোধ করি। লক্ষ্মীমান্ পুরুষেরা নিজে মহদাশয় হইলেও ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা এমন পরিবেষ্টিত যে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের শুভচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহাদিগকে পৃথিবীর শুভকার্যে প্রবৃত্ত করা অসম্ভব।"[৪]

কবির মনে এই স্বপ্ন জাগিতেছিল যে ত্রিপুরা-রাজদরবারের মধ্য দিয়া একটি রাজ্যশাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিবেন, যাহার পটভূমে থাকিবে হিন্দু নৃপতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সাহিত্যে, শিক্ষায়, শাসনপরিকল্পনায় তিনি মহারাজকে নানাভাবে

১ দ্র. মহিমচন্দ্র ঠাকুর, দেশীয় রাজ্য, পৃ ৩১৫। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে মহৎভাব ছিল, তাহা আবিষ্কার করা এখন কঠিন নহে।

২ দ্র. পূর্বাশা ১৩৪৮ রবীন্দ্রস্মৃতিসংখ্যা পৃ ১১০। চিঠিপত্র ৬।

৩ প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন।

৪ পত্রাবলী। জোড়াসাঁকো। [১৩০৮ আষাঢ়] এই পত্রে আছে: শ্রাবণ মাসের [১৩০৮] আগামী বঙ্গদর্শনে "হিন্দুত্ব প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি সমাজই হিন্দুর হিন্দুত্ব এবং রাজা ব্রাহ্মণ বণিক শূদ্র সেই সমাজকেই নানা দিক হইতে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য।" বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ আশ্বিন, পৃ ১৬৭।

সদুপদেশ ও সহায়তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। ত্রিপুরার মহারাজকে বর্ণাশ্রমের মহিমা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গৌরব ব্যাখ্যা করিয়া যে-পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজ্যকে নূতনভাবে চালাইতে এবং নূতন আদর্শে গড়িতে কবি মহারাজকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁহারই পরামর্শে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা অ্যাটর্নি কৃতবিদ্ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের দেওয়ান্-পদে ও অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা যতীন্দ্রনাথ বসু রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন। ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে বিদেশী অধ্যাপক ও অভিভাবকগণের শিক্ষা ও সঙ্গ ভারতীয় রাজকুমারগণের পক্ষে আদৌ মঙ্গলকর হইবে না; তিনি আশা করিতেছিলেন বাংলার এই প্রত্যন্তবাসী তেজস্বী জাতির মধ্যে ভারতের প্রাচীন হিন্দুরাজাদের সুস্থ বলিষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের মঙ্গল সুনিশ্চিত। রাজকোষের অপব্যয় প্রবাদগত; সেই অপব্যয় কথঞ্চিত রোধ করিয়া সাহিত্যসেবায় শিক্ষাকর্মে রাজসভার মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য যে-সাহায্য চাহিয়াছিলেন তাহা ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রচারের জন্য, তপোবনের পরিকল্পনা ও ভারতে হিন্দুবর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে যেসব পত্র লেখেন তাহার অধিকাংশের মধ্যে ভারতীয় হিন্দু আদর্শবাদের আলোচনা থাকিত; তাঁহার চিত্তকে নানা মঙ্গলকর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার সকল প্রকার সাধু চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ সাধ্যমত করেন। কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকেও যেসব পত্র লেখেন তাহাও ক্ষত্রিয়ধর্মের গৌরব ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ। আসল কথা, ত্রিপুরা রাজদরবারের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা আলোচনা করিলে গ্যেটের সহিত Weimer রাজদরবারের সম্বন্ধের কথা স্মরণ হয়।

—

ওগো যৌবন-তরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ করে দিলাম বিদায় করি।
কতই খেয়া, কতই খেয়াল,
কতই-না দাঁড়-বাওয়া,
তোমার পালে লেগেছিল
কত দখিন-হাওয়া।

. .

অনেক খেলা, অনেক মেলা,
সকলি শেষ করে
চল্লিশেরি ঘাটের থেকে
বিদায় দিনু তোরে।

নির্দেশিকা

ই

ঈ

উ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ট

ঠ

ড

ধ

ন

ভ

ম

য

র

ল

শ

গ্রন্থতালিকা

১২৮৭-১৩০৭

কবিকাহিনী (১২৮৫) [পাণ্ডুলিপিতে উপহার আছে, নাম নাই]
বনফুল (১২৮৬) —
ভগ্নহৃদয় (১২৮৮) [কাদম্বরী দেবী]
রুদ্রচণ্ড (১২৮৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (১২৮৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সন্ধ্যাসংগীত (১২৮৮) —
কালমৃগয়া (১২৮৯)—
বউঠাকুরানীর হাট (১২৮৯) সৌদামিনী দেবী
প্রভাতসংগীত (১২৯০) ইন্দিরা দেবী
বিবিধ প্রসঙ্গ (১২৯০) —
ছবি ও গান (১২৯০) [কাদম্বরী দেবী]
প্রকৃতির পরিশোধ (১২৯১) [কাদম্বরী দেবী]
নলিনী (১২৯১) —
শৈশবসংগীত (১২৯১) [কাদম্বরী দেবী]
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১২৯১) [কাদম্বরী দেবী]
রামমোহন রায় (১২৯১) —
আলোচনা (১২৯১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
রবিচ্ছায়া (১২৯২) —
কড়ি ও কোমল (১২৯৩) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজর্ষি (১২৯৩) —
চিঠিপত্র (১২৯৩) —
সমালোচনা (১২৯৪) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
মায়ার খেলা (১২৯৫) সরলা রায়
রাজা ও রানী (১২৯৬) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিসর্জন (১২৯৭) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মন্ত্রি অভিষেক (১২৯৭) —
মানসী (১২৯৭) [মৃণালিনী দেবী ?]
য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ভূমিকা (১২৯৮) লোকেন পালিত
চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গোড়ায় গলদ (১২৯৯) প্রিয়নাথ সেন
য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (১৩০০) লোকেন পালিত
সোনার তরী (১৩০০) দেবেন্দ্রনাথ সেন
ছোটোগল্প (১৩০০) বিহারীলাল গুপ্ত
বিচিত্র গল্প (১৩০১) —
কথাচতুষ্টয় (১৩০১) —
গল্পদশক (১৩০২) আশুতোষ চৌধুরী
নদী (১৩০২) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্রা (১৩০২) —
কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩) —
বৈকুণ্ঠের খাতা (১৩০৩) —
পঞ্চভূত (১৩০৪) জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়
কণিকা (১৩০৬) প্রমথনাথ চৌধুরী
কথা (১৩০৬) জগদীশচন্দ্র বসু
কাহিনী (১৩০৬) রাধাকিশোর মাণিক্য
কল্পনা (১৩০৭) শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
ক্ষণিকা (১৩০৭) লোকেন পালিত

১২৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর। ক্ষণিকা প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালে, তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। এই তালিকায় কাহাকে কোন্ গ্রন্থ উপহৃত হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল। যেখানে নাম স্পষ্ট করিয়া নাই, সেখানে নামটি বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছি। যে গ্রন্থ উৎসর্গিত হয় নাই, তাহার পাশে রেখা টানা হইল।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃ. ১৫। মীরাদেবীর জন্মতারিখ (১৩০০ পৌষ ২৯ ॥ ১৮৯৪ জানুয়ারি ১২) শ্রীক্ষিতীশ রায় মীরাদেবীর জন্মতারিখ সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছিন্নপত্রে'র (১০৬ সংখ্যক) শিলাইদহ হইতে ২৭ জুন ১৮৯৪ তারিখের পত্রে 'আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমাটি'র যে বর্ণনা আছে, তাহা দেড় বৎসরের [যদি জন্ম ১২৯৯-এ হইত] শিশুর বর্ণনা হইতে পারে না।

পুনশ্চ, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২, ৪র্থ সংখ্যা— ছিন্নপত্র। কলিকাতা ১৬ জুলাই ও ১৯ জুলাই ১৮৯৪ পত্র দ্রষ্টব্য।

অপিচ, চিঠিপত্র ৫। ১৮৯৪ জুন ১৬। 'আমার সবকটি সন্তান (শেষটিকে তুমি দেখ নি)'। প্রমথ চৌধুরী ১৮৯৩-এর অক্টোবরে বিলাত যাত্রা করেন। পূর্বোক্ত পত্রে বিলাতপ্রবাসী প্রমথকে লিখিত।—

শমীন্দ্রনাথের জন্মতারিখ রবীন্দ্রসদনে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাগজেপত্রে পাওয়া গিয়াছে; জানাইয়াছেন শ্রীক্ষিতীশ রায়। জন্ম ১৮৯৬ ডিসেম্বর ১২ ॥ ১৩০৩ অগ্রহায়ণ ২৮। মৃত্যু ১৯০৭ নভেম্বর ২৩ ॥ ১৩১৪ অগ্রহায়ণ ৭।

পৃ. ২৭, পাদটীকা ২। রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য স্থলে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃ. ৩১। ডেঙ্গুজ্বর কলিকাতায় দেখা দেয় ১৮৭১ সালের শেষদিকে "end of 1871 and was rife in 1872. It prevailed during the cold weather and increased rapidly as the hot weather advanced" (Buckland, *Bengal under the Lt. Governors.* Vol I. p 506) ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকেই ঠাকুর-পরিবার পেনেটি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ছাতুবাবুর বাগান বাড়ি। কলিকাতার ধনী রামদুলাল সরকারের পুত্র, ছাতুবাবু বা আশুতোষ দেব (১৮০৪-৫৬) দানধ্যানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই ছাতুবাবু ও ইহার ভাই লাটুবাবু কলিকাতার বিখ্যাত 'আটবাবু'র অন্যতম বলিয়া উক্ত হইতেন। এখনো কলিকাতার ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাজার আছে। পেনেটির বাগানবাড়ি ১৮৮৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ সেরপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার চৌধুরী ক্রয় করেন। ইঁহার পুত্র দানবীর গোপালদাস চৌধুরী ১৯২৮ সালের ২৯ মার্চ এই বাটি ও বাগান 'গোবিন্দকুমার হোম' নামে ট্রাস্ট করিয়াছেন।

এই পেনেটির বাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী সরলাদেবীর অন্নপ্রাশন হয় বোধ হয় ১৮৭২ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে। ইহার পর ১৮৭৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথদের উপনয়ন হয় জোড়াসাঁকোর বাটিতে। সুতরাং এখানে বাড়ির অনেকেই ছিলেন কয়েক মাস।

সরলাদেবীর 'ঝরাপাতা' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত গোবিন্দকুমার ভবন [গোবিন্দমোহিনী নহে] (১৯২৮ সালে) বোধ হয় দ্বারউন্মোচন উৎসব উপলক্ষে গিয়াছিলেন। "তাঁর হাত দিয়ে উদ্যোক্তারা··বাড়ির একপ্রান্তে একটি আম্রবৃক্ষ রোপণ করালেন··।"

দ্র. ঝরাপাতা। কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু (1/1B Krishnaram Basu Street. Calcutta 4) উপরের অনেকগুলি তথ্য রবীন্দ্রসদনের শ্রীক্ষিতীশ রায়কে সরবরাহ করেন। তথ্যগুলি সেইসব পত্রাদি হইতে সংকলিত)

পৃ. ৪৩ পাদটীকা ৩। প্রকৃতির খেদ··১৭৯৭ শক ১২৮২ [১৮৮২ নহে]··

তত্ত্ব-বোধিনী-পত্রিকা ১৭৯৭ (১২৮২) আষাঢ় সংখ্যায় প্রকৃতির খেদ মুদ্রিত হয়। তৎপূর্বে 'প্রতিবিম্ব' মাসিক ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ১২৮২ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকৃতির খেদ আংশিক প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিকার সম্পাদক রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ, ভূতপূর্ব কল্পলতিকা সম্পাদক, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষক।...১২৮২ অগ্রহায়ণ মাসে এই পত্রিকা 'জ্ঞানাঙ্কুর'এর সহিত সম্মিলিত হইয়া 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নাম ধারণ করে। (দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র ২য় খণ্ড। পৃ. ১৮)

পৃ. ১১৯। 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতার যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেটি শেলী হইতে অনূদিত।

ও'শগনেশি (ও'শনেসি : A. W. Edgar O'shaughnesey 1844 - 1881).

পৃ. ১৪২। Hecate হইবে : Zeus হইবে। 'হেকেটি ঠাকুরাণী' এই নামটি মালতীপুঁথির এক পাতায় আড়ভাবে লেখা আছে।

পৃ. ১৫৫। পাদটীকা ৪। ১৮৮৬ স্থলে ১৮৮২ হইবে।

পৃ. ১৮১, ছত্র ৯। নবজাতকের 'বধূ' স্থলে আকাশপ্রদীপ হইবে।

পৃ. ১৮৬, পাদটীকা (১৬ শ্রাবণ ১২৯১) হইবে।

পৃ. ২৪১, ছত্র ৩—'ধর্মপ্রসার' স্থলে 'ধর্মপ্রচার' হইবে।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ৫—'করিতেন' স্থলে 'করিলেন' হইবে।

পাদটীকা ১০ ·(১৮৮৮ নভেম্বর ২৭) ৭ নহে।

পৃ. ২৪৯, শেষ পংক্তি। 'আয় মহিলা সমিতি স্থলে' 'আর্য মহিলা সমিতি' হইবে।

পৃ. ৩০২, ছত্র ৫— কবিতা লিখিতেছিলেন। 'একটি আষাঢ়ে গল্প' নামে গল্পটি সেই সময়ের রচনা।

পৃ. ৩৪১ গেটে স্থলে গোটে।

পৃ. ৩৪৫। ৩ পাদটীকা ৪ হইবে ; ৪ পাদটীকা ৩ হইবে। পঞ্চম কবিতা 'লজ্জা' (২৮ আষাঢ়)

পৃ. ৩৫৬ ছত্র ৮ 'গদ রচনা'র স্থলে 'গন্ধরসরচনা' হইবে।

পৃ. ৩৫৮ পাদটীকা ৩৫৯ পৃষ্ঠায় গিয়াছে।

পৃ. ৩৭১। চৈতন্য চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃতাংশের ২য় পংক্তি 'যেমত নাচাও তেমত চাহি নাচিবার' হইবে।

পৃ. ৩৭৬ পাদটীকা ১ 'যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ' হইবে : 'নেতৃ' নহে।

পৃ. ৩৭৮ "ভারতবর্ষে Tree-daubing বলে একটা ব্যাপার চলচে।"

'গাছের ছাপ সম্বন্ধে ইতিহাস—

"The Tree-daubing mystery also afforded the widest grounds for speculation. This movement consisted in marking trees with daubs of mud in which were stuck hairs of different animals, buffaloes' hair and pigs' bristles, according to the reports predominating ; and it slowly spread through the North Gangetic districts eastwards into Bhagalpur and Purnea, and westwards through many of the districts of the N. W. Provinces. [u. p.] It also appeared in a few places in the districts to the South of the Ganges, and was generally attributed to wandering gangs of sadhus, or religious mendicants. The movement died out in a few months and the result seemed to show that it

had no real political significance." Buckland, ***Bengal under Lieutenant Governors. Vol.*** 11. p. 954.

দ্র. L. S. S. O'Malley, Gaya District Gazetteer, 1819, P. 104 : for a fuller discussion of the subject he refers to an article in the *Calcutta Reveiew*, 1894, January.

"বেহারপ্রদেশে গাছের ছাপ হইতে বিদ্রোহ আশঙ্কা করিয়া অনেক ইংরেজি কাগজে এমন কথা বলা হইয়াছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে কোনো কালেই যথার্থ প্রেমের সম্মিলন সম্ভব নহে।" রাজা ও প্রজা। সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ. ৫৪৫।

পৃ. ৩৮১। শমীন্দ্রনাথের জন্মের কথা এখানে ভুল।

পৃ. ৩৮২ পাদটীকাতে 'গল্প ও সাথী' স্থলে 'সখা ও সাথী' হইবে।

পৃ. ৩৮৫। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' হইবে! 'ফুলদানী' নয়!

শেষ-পংক্তি 'ভারতীয়' হইবে।

পৃ. ৩৮৯, ছত্র ২ নূতন প্যারাগ্রাফ হইবে।

ছত্র ১১ ডাউডেনের সদ্য প্রকাশিত Edward Dowden in Literature স্থলে। New Studies in Literature হইবে।

„ পাদটীকা ১। পত্র। ১৩০৯ স্থলে ১৩০২ হইবে।

পৃ. ৩৯০। 'ফুলের কঙ্কন গড়ি কমলের প্রাতে স্থলে 'কমলের পাতে' হইবে।

পৃ. ৩৯৩ পাদটীকা ৫ প্রস্তরমূর্তি ৩৯৪ পৃষ্ঠায় যাইবে। ৩৯৪ পাদটীকা ১, ৩৯৩ পৃষ্ঠায় আসিবে।

পৃ. ৪০১। 'উজ্জ্বল করহে' হইবে। ছত্র ৬।

পৃ. ৪১৭। ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী হইবে, 'পাল' নহে।

ঐ ফ্র সাহেব স্থলে ফ্রুড্ (Froude) হইবে।

পৃ. ৪১৮। 'সতী' নাট্যকাব্যর মূল পত্রিকাদি কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে খোঁজ করিয়া সন্ধান পাই নাই। আরও সন্ধানের প্রয়োজন।

পৃ. ৪২১। শিবধন বিদ্যার্ণব স্থলে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন হইবে।

পৃ. ৪২২ স্ট্রাচি (Strachey)

„ পাদটীকা ১· ·পৃ· ·6 II স্থলে 611